দিনের পরে দিন

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ ঃ চৈত্র ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট
অংকন ঃ সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
মুদ্রণ ঃ চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিঃ ৭৩ হইতে এস. এন. রায়
কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিঃ ৬ হইতে
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

দিনলিপির সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

"দিনের পর দিন" কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই অনন্য রচনা—সমস্ত দিনলিপিগুলির একত্র সংকলন। বিভূতিভূষণের এই ডায়েরী বা দিনলিপি-ধর্মী গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যে অনন্য বলছি কেন? ভাষার গম্ভীর সারল্যে, চিন্তার ঐশ্বর্যে, লেখকের সৃষ্টি-কল্পনার সম্ভারে এবং সবচেয়ে ঈশ্বর ও তাঁর সৃষ্টির চিন্তায়—কতকটা সমাহিত অবস্থার অনুভূতিতে এই গ্রন্থগুলি অপরিসীম মূল্যবান। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, 'বিভূতিভূষণের এই দিনলিপি জাতীয় রচনাগুলি একদেহে রোজনামচা, ভ্রমণকাহিনী, গল্প ও আত্মচিন্তা।...এইসব রচনার ফলশ্রুতি একটি পরিপূর্ণ রচনাপাঠের আনন্দলাভ।'...গল্পের বদলে নিজের ব্যক্তিত্বটিকে প্রায় দেবত্ব-রসে জারিয়ে বিতরণ করেছেন পাঠকদের পাতে। 'দিনলিপি'র একস্থানে বিভূতিভূষণ স্বয়ং বলেছেন, 'কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, গহন পর্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে মন যেখানে নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল—এইসব রচনার সৃষ্টি সেখানে।' অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্তব্য করেছেন, 'জীবন সাধনার ফলশ্রুতি আনন্দ। এই আনন্দের সাময়িক অনুভূতি বিভূতিভূষণের জীবনে বহুবার এসেছে। দিনলিপির একাধিকস্থানে আছে এই অপার্থিব আনন্দ মুহূর্তের বর্ণনা। ঈশ্বর, মানুষ ও প্রকৃতি এই ত্রিতত্ত্ব সমন্বিত চেতনাকেই বিভূতিভূষণ সত্যকার জীবনচেতনা বলে মনে করেছেন।' অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'দিনলিপিগুলির সাহিত্যমূল্য ছাড়াও শিল্পীর অন্তর্জীবনের পরিচয়ের জন্য বিভূতি-সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের কাছে এগুলি অপরিহার্য। উপন্যাস ও ছোটগল্পের অনেক আইডিয়ার নেপথ্যের রূপ পাওয়া যাবে দিনলিপি-গুলিতে। এগুলি প্রকৃত বিচারে শিল্পীর আত্মজীবনী।' আর চরম কথা বলেছেন পরিমল গোস্বামী, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরে এ সাহিত্য এদেশে আর লেখা হয় নি, সম্ভবত আর কখনো হবেও না।'

বিভূতিভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী

বিভূতিভূষণের জন্ম হয় তাঁর মাতুলালয় কাঁচড়াপাড়ার সমীপবর্তী ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে। জন্মতারিখ ২৮ ভাদ্র, ১৩০১ (ইং ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪)। তাঁর পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলার (বর্তমানে ২৪ পরগণা জেলার) অন্তর্ভুক্ত বনগ্রাম মহকুমায় অবস্থিত ইছামতী নদীতীরস্থ ব্যারাকপুর গ্রাম। তাঁর পিতার নাম মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী, পেশা ছিল কথকতা ; মাতা মৃণালিনী দেবী। মহানন্দ কিছু পরিমাণে ভবঘুরে ও উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন বলে সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জন করতে পারেন নি—অর্জন করার চেষ্টাও বোধ হয় করেন নি। পিতামাতার পাঁচটি সন্তানের মধ্যে বিভূতিভূষণই সর্বজ্যেষ্ঠ।

তাঁর শিক্ষা শুরু হয় গৃহে পিতার নিকটে। তারপর স্বগ্রামে ও বিদেশে কয়েকটি পাঠশালায় কিছুদিন করে পড়ার পর বনগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি সেখানে অবৈতনিক ছাত্র রূপে পড়ার অনুমতি পেয়েছিলেন। যখন তিনি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র সেই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। নানা দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার রিপন কলেজ (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজ থেকেই ডিস্টিংশনে বি. এ. পাস করেন। এর পর তিনি এম. এ. ও ল ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু নানা কারণে আর অধিকদূর লেখাপড়া করা সম্ভব হয় নি।

তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ার সময় বিভূতিভূষণের সঙ্গে বসিরহাটের মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা গৌরী দেবীর বিবাহ হয়। কিন্তু এর মাত্র এক বৎসর পরেই গৌরী দেবীর অকালমৃত্যু ঘটে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কিছুদিন তিনি প্রায় সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করেন। এই দুর্ঘটনার বহুদিন পরে ১৩৪৭ সালের ১৭ অগ্রহায়ণ (ইং ৩ ডিসেম্বর, ১৯৪০) ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছয়গাঁও নিবাসী ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা রমা দেবীকে তিনি বিবাহ করেন। বিবাহের সাত বৎসর পরে তাঁর একমাত্র সন্তান তারাদাস (ডাকনাম বাবলু) জন্মগ্রহণ করে।

ইত্যবসরে তিনি হুগলি জেলার জাঙ্গিপাড়ায় মাইনর স্কুলে শিক্ষকের চাকুরি গ্রহণ করেন এবং তারপর ২৪ পরগণার হরিনাভি গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এইখানেই তাঁর সাহিত্যিক জীবন শুরু হয়। তাঁর প্রথম রচনা 'উপেক্ষিতা' নামক গল্পটি রচিত ও ১৩২৮ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরপর কিছুদিন তিনি 'গোরক্ষণী সভা'-র প্রচারকের চাকুরি গ্রহণ করে বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকানের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন।

তারপর তিনি খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে কিছুদিন সেক্রেটারীর কাজ ও গৃহ-শিক্ষকতা করার পর খেলাত ঘোষ এস্টেটের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নিযুক্ত হন এবং উক্ত জমিদারির ভাগলপুর বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে ঐ শহরের 'বড় বাসা' নামক গৃহে অবস্থান করেন। এই ভাগলপুর-প্রবাসকালেই তাঁর অমর উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' রচিত হয়।

দ্বিতীয়বার বিবাহের পূর্বে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের পর থেকেই বিভূতিভূষণ বিহারের ঘাটশিলা ও গালুডি অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হতে আরম্ভ করেন। এর কিছুদিন পরে তিনি ঘাটশিলায় একটি বাড়ী ক্রয় করেন এবং প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে তার নামকরণ করেন 'গৌরীকুঞ্জ'। ক্রমে ঘাটশিলা তাঁর অতিপ্রিয় স্থান হয়ে দাঁড়ায়—অবসর পেলেই সেখানে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যেতেন।

দ্বিতীয়া পত্নী রমা দেবীকে নিয়ে বারাকপুরে তিনি স্থায়ীভাবে সংসার পেতে বসেন ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে। এ সময় থেকে প্রতি বৎসর তিনি নিয়মিত ভাবে কয়েক মাস ঘাটশিলায় গিয়ে অবকাশ যাপন করতেন—পূজার প্রারম্ভে সস্ত্রীক সেখানে যেতেন এবং মাঘের শেষে অথবা ফাল্গুনের প্রথমে দেশে ফিরতেন। প্রধানতঃ তাঁর আকর্ষণেই পুজার ছুটিতে ঘাটশিলায় সে সময় বহু জ্ঞানী ও গুণী জনের এবং খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সমাবেশ ঘটত।

তিনি দেশভ্রমণ করতে বড় ভালবাসতেন—ভ্রমণ করেছিলেনও প্রচুর। 'গোরক্ষণী সভা'-র ভ্রাম্যমাণ প্রচারক রূপে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে তাঁর 'অভিযাত্রিক' গ্রন্থে। তা ছাড়া বিহার সরকারের বনবিভাগের উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে তিনি সিংভূম, হাজারিবাগ, রাঁচী ও মানভূম জেলার বহু আরণ্য-পার্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করে-ছিলেন। এই সব বিচিত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে রোমাঞ্চক স্থানে ভ্রমণের মনোজ্ঞ কাহিনী তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'বনে পাহাড়ে' ও 'হে অরণ্য কথা কও' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এবং তাঁর দিনলিপিজাতীয় গ্রন্থাবলীতে।

জীবনের শেষ দশ বৎসর বিভূতিভূষণ তাঁর অতি প্রিয় পিতৃভূমি বারাকপুরে বাস করেছিলেন। এই সময়ে তিনি অজস্র শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টি করেন। অনেক-গুলি বিখ্যাত উপন্যাস ও বহু সার্থক রসোত্তীর্ণ ছোট গল্প এই সময়েই রচিত হয়। জীবনের প্রায় শেষ দিনটি পর্যন্ত তিনি সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী ছিলেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৫৭-র ১৫ কার্তিক তারিখে (ইং ১ নভেম্বর, ১৯৫০) ঘাটশিলায় স্বগৃহে রাত্রি ৮টা ১৫ মিনিটের সময় তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৬ বৎসর।

বিভূতিভূষণের গ্রন্থতালিকা

উপন্যাস: পথের পাঁচালী (১৯২৯); অপরাজিত (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৩২); দৃষ্টি-প্রদীপ (১৯৩৫); আরণ্যক (১৯৩৯); আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০); বিপিনের সংসার (১৯৪১); দুই বাড়ী (১৯৪১); অনুবর্তন (১৯৪২); দেবযান (১৯৪৪); কেদার রাজা (১৯৪৫); অথৈ জল (১৯৪৭); ইছামতী (১৯৫০); অশনি সংকেত (অসমাপ্ত, বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); দম্পতি (১৯৫২)।

গল্প-সংকলন: মেঘমল্লার (১৯৩২); মৌরীফুল (১৯৩২); যাত্রাবদল (১৯৩৪); জন্ম ও মৃত্যু (১৯৩৮); কিন্নরদল (১৯৩৮); বেণীগির ফুলবাড়ী (১৯৪১); নবাগত (১৯৪৪); তাল নবমী (১৯৪৪); উপলখণ্ড (১৯৪৫); বিধু মাষ্টার (১৯৪৫) ক্ষণভঙ্গুর (১৯৪৫); অসাধারণ (১৯৪৬); মুখোশ ও মুখশ্রী (১৯৪৭); আচার্য কৃপালনী কলোনি (বর্তমান নাম 'নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব') (১৯৪৮); জ্যোতিরিঙ্গন (১৯৪৯); কুশল-পাহাড়ী (১৯৫০); রূপহলুদ (১৯৫৭); অনুসন্ধান (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); ছায়াছবি (বঙ্গাব্দ ১৩৬৬); সুলোচনা (১৯৬৩)।

ভ্রমণ-কাহিনী ও দিনলিপি: অভিযাত্রিক (১৯৪০); স্মৃতির রেখা ((১৯৪১); তৃণাঙ্কুর (১৯৪৩); ঊর্মিমুখর (১৯৪৪); বনে পাহাড়ে (১৯৪৫); উৎকর্ণ (১৯৪৬); হে অরণ্য কথা কও (১৯৪৮)।

কিশোর-পাঠ্য: চাঁদের পাহাড় (১৯৩৮); আইভানহো (সংক্ষেপানুবাদ, ১৯৩৮); মরণের ডঙ্কা বাজে (১৯৪০); মিস্‌মিদের কবচ (১৯৪২); হীরা মাণিক জ্বলে (১৯৪৬); সুন্দরবনে সাত বৎসর (ভুবনমোহন রায়ের সহযোগিতায়, ১৯৫২)।

বিবিধ: বিচিত্র জগৎ (১৯৩৭); টমাস বাটার আত্মজীবনী (১৯৪৩);

গ্রন্থ পরিচয়

'অভিযাত্রিক'

'অভিযাত্রিক' বিভূতিভূষণ রচিত সচিত্র প্রথম দিনলিপি ও ভ্রমণ কাহিনী। প্রথম প্রকাশ: 'অভিযাত্রিক', প্রথম সংস্করণ: ২২ মার্চ ১৯৪১, ডবল ক্রাউন ষোল পেজী সাইজ। পৃঃ ২৫৮। হার্ড বোর্ড কাগজে-বাঁধাই। প্রকাশক: মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ' বিভূতি-ভূষণের গ্রন্থের মধ্যে 'অভিযাত্রিক' সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। গ্রন্থ-আকারে প্রকাশের আগে এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটি কোনো মাসিক বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়নি। 'মিত্র ও ঘোষ'-এর অন্যতম কর্ণধার গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নির্বন্ধাতিশয্যেই এই ডায়েরি-জাতীয় ভ্রমণ কাহিনী বিভূতিভূষণ রচনা করেন।

প্রথম যৌবনে কেশোরাম পোদ্দারের 'গো-রক্ষা সভা'র ভ্রাম্যমান পরিদর্শক রূপে অবিভক্ত বাংলার বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম এবং ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা ও নিম্ন বার্মার আরাকান অঞ্চলের বিস্তৃত এলাকা পরিভ্রমণ করেছিলেন—তার বর্ণনা এই বইটিতে পাওয়া যায়। সেই সঙ্গে কলকাতার আশেপাশে এবং ভাগলপুরে থাকাকালীন বিহার রাজ্যের দুই-এক জায়গায় বেড়ানোর বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। 'অভিযাত্রিক' রচনায় দিনলিপির সাহায্য নিলেও তিনি রোজনামচার আকারে এই সুন্দর বইটি রচনা করেন নি।

'স্মৃতির রেখা'

'স্মৃতির রেখা' (দিনলিপি), প্রথম প্রকাশ: ১ শ্রাবণ ১৩৪৮ (ইং ১৯৪১)। পৃঃ ১৫৫। ডবল ক্রাউন ষোল পেজী সাইজ। প্রকাশক: মাধব ঘোষাল, কলিকাতা।

'স্মৃতির রেখা' বিভূতিভূষণের প্রথম প্রকাশিত দিনলিপি। অন্তত এই বইটিতে সন তারিখের কিছুটা হিসেব মেলে। 'পথের পাঁচালী' রচনার পূর্বে বিভূতিভূষণের চিন্তাধারা এবং 'পথের পাঁচালী' রচনার সমসাময়িক চিন্তাধারা 'স্মৃতির রেখা' দিন-লিপির পাতায় পাওয়া যায়।

'তৃণাঙ্কুর'

(১৯ জুন ১৯২৯—জানুয়ারী ১৯৩৯)

'তৃণাঙ্কুর' বিভূতিভূষণ রচিত দ্বিতীয় দিনলিপি গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ: মার্চ ১৯৪৩ (বাংলা চৈত্র ১৩৪৯), পৃঃ ১২৪। ডিমাই আট পেজী হার্ড বোর্ড কাগজের মলাট। প্রকাশক: মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

'ঊর্মিমুখর'

[রচনাকাল: মে ১৯৩৫--সেপ্টেম্বর ১৯৩৬]

'ঊর্মিমুখর (দিনলিপি), প্রথম প্রকাশ: আগস্ট ১৯৪৪ খ্রীঃ, হার্ড বোর্ড বাঁধাই। কাগজের মলাট। ডবল ডিমাই সাইজ। পৃঃ ৮৫। প্রকাশক: মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

'ঊর্মিমুখর' বিভূতিভূষণের মধ্য জীবনে রচিত দিনলিপি। এই সময় বিভূতি-ভূষণের পুনরায় স্বগ্রাম বারাকপুরের সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনের উপকরণ গ্রামের সাধারণ জীবনের মধ্য থেকে সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। বিভূতিভূষণ পরবর্তী কালে রচিত অনেক গল্প ও উপন্যাসের চরিত্র এই দিনলিপির পাতায় খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' ও 'ইছামতী' উপন্যাসেরও অনেক চরিত্র এ দিনলিপিতে দেখতে পাওয়া যায়।

'উৎকর্ণ'

[রচনাকাল: ১১ অক্টোবর ১৯৩৬—১৬ নভেম্বর ১৯৪১]

'উৎকর্ণ বিভূতিভূষণ রচিত চতুর্থ দিনলিপি। প্রথম প্রকাশ: ১৯৪৬ খ্রীঃ,

পৃঃ ২৫৪। ষোল পেজী ডবল ক্রাউন সাইজ। প্রকাশকঃ 'মিত্র ও ঘোষ', ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। কাগজের মলাট—হার্ড বোর্ড বাঁধাই।

'উৎকর্ণ' দিনলিপি নানাদিক থেকে বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। এই কালে তিনি বারাকপুর গ্রামে বর্তমান বাসগৃহ ক্রয় করেন। ছোট ভাই নুটুবিহারীর যমুনা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। ঘাটশীলায় বাড়ী ক্রয় করেন এবং লোকান্তরিতা প্রথমা পত্নীর নামে বাড়ীর নামকরণ করেন 'গৌরী কুঞ্জ'। বিভূতিভূষণের বড় বোন জাহ্নবী দেবীর জলে ডুবে মৃত্যু হয়। বিভূতিভূষণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন প্রধান পুরুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪০ খ্রীঃ ৩ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর নাম শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক নাম কল্যাণী)। আবার তিনি এই কালেই জীবনের একান্ত সাধ বারাকপুর গ্রামে দীর্ঘ আট বৎসর সস্ত্রীক বাস করেন।

'বনে পাহাড়ে'

'বনে পাহাড়ে' বিভূতিভূষণ রচিত দ্বিতীয় ভ্রমণ কাহিনী। অনেকটা দিনলিপির আকারে লেখা। 'বনে পাহাড়ে' পুস্তক-আকারে প্রকাশের পূর্বে ধারাবাহিক রচনা হিসেবে 'মৌচাক' মাসিক পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৫০—আষাঢ় ১৩৫২ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ-আকারে প্রথম প্রকাশঃ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫। পৃঃ ৮৯। প্রকাশকঃ মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯৪২-৪৩ খ্রীঃ বিভূতিভূষণ তাঁর বন্ধু বর্তমানে বিহার সরকারের অবসরপ্রাপ্ত বনসংরক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিনহার সঙ্গে ছোট নাগপুরের সিংভূম ও রাঁচী জেলার সারান্দা, কোলাহান ও সিংভূম বন-বিভাগের গভীর এবং বিস্তৃত অরণ্য ভ্রমণ করেন। কখনো বিভূতিভূষণ সস্ত্রীক উক্ত দুর্গম অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত Forest Rest House-এ বাস করেন।

তারই অপূর্ব বর্ণনার পরিচয় পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের 'বনে পাহাড়ে' ও 'হে অরণ্য কথা কও' বই দুইটিতে।

'থলকোবাদে একরাত্রি'
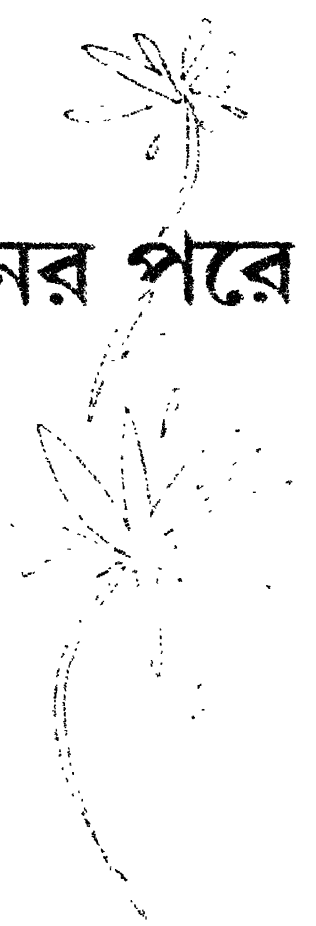
'বনে পাহাড়ে' গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে 'থলকোবাদে একরাত্রি' 'বিভূতি-রচনাবলী'তে মুদ্রিত হয়। চিঠিটি 'বনে পাহাড়ে' গ্রন্থের সম-সাময়িক কালে লেখা। পত্রটি তিনি তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু ও সাহিত্যরসিক ও 'লিচুতলা ক্লাব'-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বগর্ত মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন। মূল পত্রটি প্রথমে বনগ্রামের বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'পল্লীবার্তা'য় মুদ্রিত হয় (বনগ্রাম, ১৭ অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৫০ সাল)। (পত্রটির সাহিত্যমূল্য বিবেচনা করে 'বিভূতি-রচনাবলী'তে মুদ্রিত হয়।)

'হে অরণ্য কথা কও'

'হে অরণ্য কথা কও' বিভূতিভূষণের জীবিতকালে মুদ্রিত শেষ-দিনলিপি। এরপর আর বিভূতিভূষণের জীবিতকালে কোনো দিনলিপি বই হয়ে মুদ্রিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অপ্রকাশিত দিনলিপির অংশ-বিশেষ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে শারদীয়া সংখ্যা 'কথা সাহিত্য'-এ প্রকাশিত অংশটি প্রধান।

'হে অরণ্য কথা কও'-এর অংশ-বিশেষ সম্ভবত কোনো কোনো পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল। এ বিষয়ে নিশ্চিত হবার মত উপকরণের অভাব। গ্রন্থ-আকারে প্রকাশঃ 'হে অরণ্য কথা কও', জানুয়ারী ১৯৪৮ খ্রীঃ। পৃঃ ১১৮। হার্ড বোর্ড কাগজের মলাট। প্রকাশকঃ 'আরতি এজেন্সী', ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

'হে অরণ্য কথা কও' গ্রন্থের ভূমিকাটি বিভূতিভূষণের নির্দেশে লিখেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র।

দিনের পরে দিন

অভিযাত্রিক

কল্যাণী উমাকে

আজ চোদ্দ-পনেরো বছর আগের কথা। কি তারও বেশী হবে হয়তো। আমার বন্ধু রমেশবাবু আর আমি দুজনে কলকাতার মেসে একঘরে আছি বহুদিন। ভালো লাগে না এ রকম কলকাতায় পড়ে থাকা।

দেশেও তখন যাওয়ার নানারকম অসুবিধা ছিল। কিন্তু একটু বাইরে না বেরুলে ধুলো আর ধোঁয়ায় প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

রমেশবাবুকে বললুম—চলুন কোথাও বেড়িয়ে আসি।

রমেশবাবুর ট্যাঁকের অবস্থাও খুব ভাল নয় আমার চেয়ে। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে বললেন—বেড়াতে যাবো কিন্তু হাতে টাকাকড়ি কই—

—টাকাকড়ি লাগবে না—

—বিনা টিকিটে গিয়ে জেল খাটবো নাকি?

—রেলে চড়ে নয়, পায়ে হেঁটে।

—কতদূর যাবেন পায়ে হেঁটে?

তাঁকে বুঝিয়ে বললুম—বেশীদূরে মোটেই নয়। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বার হয়ে পায়ে হেঁটে যতদূর যাওয়া যায়। কি করবো যখন হাতে পয়সা নেই, এ ছাড়া তখন উপায় কি? তিনি কি মনে করে রাজি হয়ে গেলেন।

হাঁটতে হাঁটতে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা বাগানবাড়িতে আমরা কিছুক্ষণ বসি। বাগানের উড়ে মালী এসে আমাদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করে গেল। তাকে দিয়ে আমরা বাগানের গাছ থেকে ভালো কাশীর পেয়ারা পাড়িয়ে আনলুম। সে ডাব পেড়ে দেওয়ারও প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তাতে দেরি হবে বলে আমরা রাজি হইনি।

ডানদিকের একটা পথ ধরে আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে দিলুম। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে বার হয়েচি—কতদূর আর এসেচি, না হয় মাইল পাঁচ-ছয় হবে—কিন্তু যেন মনে হচ্ছে কতদূর এসে গিয়েছি কলকাতা থেকে—স্বপনপুরীর দ্বারে এসে পৌঁছে গিয়েছি যেন। প্রত্যেক বন ঝোপ যেন অপূর্ব্ব, প্রতিটি পাখীর ডাক অপূর্ব্ব, ডোবার জলে এক-আধটা লালফুল তাও অপূর্ব্ব।

জীবনে একটা সত্য আবিষ্কার করেচি অভিজ্ঞতার ফলে। যে কখনো কোথাও বার হবার সুযোগ পায়নি, সে যদি কালেভদ্রে একটু-আধটু বাইরে বেরুবার সুযোগ পায়—যতটুকই সে যাক না কেন, ততটুকুই গিয়েই সে যা আনন্দ পাবে—একজন অর্থ ও বিত্তশালী Blase' ভ্রমণকারী হাজার মাইল ঘুরে তার চেয়ে বেশি কিছু আনন্দ পাবে না। কাজেই আমার সেদিনকার ভ্রমণটা এদিক থেকে দেখতে গেলে তুচ্ছ তো নয়ই—বরং আমার জীবনের মধ্যে অত্যন্ত মূল্যবান সেদিনটির আনন্দ। কারণ, আসলে দেখে চোখ আর মন।

যখন ওই দুটি ইন্দ্রিয় বহুদিন বুভুক্ষু, তখন যে কোন মুক্ত স্থান, সামান্য একটা বাঁশঝাড়, একটি হয়তো ধানের মরাইওয়ালা গৃহস্থবাড়ি, আঁকা-বাঁকা গ্রাম্য নদী, কোথাও একটা বনের পাখীর ডাক—মধুর, স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

পয়সা যাদের আছে, খুব ঘুরে বেড়াতে পারে তারা—ভালো কথাই, কিন্তু Blase' হবার ভয়ও যথেষ্ট। তখন ভীম নাগের সন্দেশও মুখে রোচে না।

পরবর্ত্তীকালে জীবনে অনেক বেড়িয়েচি, এখনও বেড়াই—পাকা Blase' টাইপ অনেক দেখেচি, যথাস্থানে তাদের গল্প করবো।

সেদিনকার প্রভাতের নবীন আলোয় মুখ চিনে Blase' কারো তা ভাববার অবকাশ মাত্র পাইনি—সোজা চলেছিলুম দুই বন্ধুতে পথ বেয়ে ঘর থেকে বার হবার আনন্দে বিভোর হয়ে।

হঠাৎ একটা গ্রামের পথে উপস্থিত হয়ে গিয়েচি, কোন্ সময়, খেয়াল করিনি—সে পথের একদিকে খুব উঁচু লম্বা একটা পাঁচিল। একজন লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাকে জিগ্যেস করতে সে বললে, ওটা চাঁদমারির পাঁচিল।

—কোথায় চাঁদমারি?

—পাশেই মশাই। সোলজারেরা বন্দুক প্র্যাকটিস—

—বুঝেচি—তা এখন করচে না তো?

—করলেই বা কি। পাঁচিল তো দিয়ে রেখেচে।

—সামনে ওটা কি গাঁ?

—নিমতে।

কিন্তু নিমতে গ্রামে ঢুকবার পূর্ব্বে একটা বাঁশবাগান দেখে বড় ভালো লাগলো। খুব বড় বাঁশবন, অজস্র শুকনো বাঁশপাতা ছড়িয়ে আছে—পা দিয়ে মচ্‌কে যাবার সময় কেমন সুন্দর শব্দ হয়, শুকনো পায়ে-দলা বাঁশ পাতার গন্ধ বার হয়, মাথার উপর পাখী ডাকে, সূর্য্য আলোছায়ার জাল বোনে বাঁশগাছের ডালে, পাতায়, তলাকার মাটির ওপর।

সেই বাঁশবনে একরকমের গাছ দেখলুম। শুধুই একটা লম্বা ডাঁটা। তার আগার একটা আফোটা বড় কুঁড়ির মতো ব্যাপারের মধ্যে অনেকগুলো ছোট মটরের মতো দানা। গাছের গায়ে হাত দিলে হাত চুলকোয়।

কি ভালোই লেগেছিল সেই গাছগুলো সেদিন! বাঁশবনের ছায়ায় বনকচু-জাতীয় উদ্ভিদ যেন অমৃতফল প্রসব করেচে।

ছায়া ঘন হয়ে আসচে—বিকেল নেমেচে। বাঁশবন পার হয়ে একটা মাঠে আমরা বসলুম। বনফুল ও অন্যান্য লতাপাতার ঝোপ মাঠের ধারে সর্ব্বত্র। ঝোপের মাথায় মাথায় লতাপাতায় আলোকলতার জাল। দূরে দু'একটা পুরনো কোঠাবাড়ি দেখা গেল। একটা বাড়ির ছাদে একটি পল্লীবধূ চুল শুকোতে বসেচে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা সামনের মাঠে হা-ডু-ডু খেলচে।

মাঠ থেকে উঠে নিমতে গ্রামের শেষপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছুলাম আমরা। সেখানে মুচি বাউরিরা বাস করে, তাদের একটা ছোট পাড়া। কিন্তু এরা সকলেই নিকটবর্ত্তী কলে কাজ করে, শহর এসেচে গ্রামের পাশে, শহরের সভ্যতা ও জীবনযাত্রাপ্রণালী গ্রামের শান্ত গৃহকোণে এনে দিয়েচে ব্যস্ততা কোলাহল ও শৌখিনতার মোহ।

একজন বললে—কাছেই পাষাণকালী মন্দির, দেখবেন না? নিমতের পাষাণ কালী জাগ্রত দেবতা—ছোট্ট মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহটি ভাল চোখে পড়ে না, বড় অন্ধকার ভেতরটাতে। মন্দিরের সামনে একটা পানাভরা পুকুর। পুকুরের ওপারে বাউরিদের ঘাটে বাউরিদের ঝি-বৌয়েরা জল নিতে নেমেচে।

কিছুক্ষণ বাঁধা ঘাটে বসে থাকবার পরে একটি ছোট ছেলে এসে বলল—বাবা আপনাদের ডাকচেন—আসুন আপনারা—

আমরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে এগিয়ে গেলুম। ইঁটের দেওয়াল দেওয়া একখানি খড়ের ঘর। দারিদ্র্যের ছায়া সে বাড়ির সারা অঙ্গে। বাড়ির মালিক হলেন ওই পাষাণকালীর পূজারী—তিনিই আমাদের ডেকেচেন তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে।

অনেক দিনের কথা। পূজারী ঠাকুরের বয়েস বা চেহারা আমার মনে নেই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথা থেকে আসচেন?

—কলকাতা থেকে।

—আপনারা ?

—আমি ব্রাহ্মণ, আমার এই বন্ধুটি কায়স্থ।

—পুজো দেলেন মায়ের ?

আমার মনে হল এখানে দিলে ভালো হয়। লোকটা গরীব, দিলে ওর উপকার করা হয় বটে।

ইতিমধ্যে দেখি একটি বৌ, সম্ভবত পুজারী ব্রাহ্মণটির স্ত্রী, দুখানা আসন আমাদের জন্যে বিছিয়ে দিয়ে গেল। আমার বাস্তবিক কষ্ট হতে লাগলো—এরা ভেবেচে কলকাতা থেকে পয়সাওয়ালা বাবুরা এসেচে—ভালো ভাবেই পুজো দেবে—দু পয়সা আসবে।

কলকাতার বাবু যে দুটি পয়সা অভাবে হেঁটে সারাপথ এসেছে—সে খবর এরা রাখে না। রমেশবাবু পকেট থেকে দুটি পয়সা বার করলেন, আমার পকেট থেকে বেরুলো একটা পয়সা। পুজারী ঠাকুর বেশি কিছু আশা করেছিলেন, তা হল না, তবুও দুটি নারিকেলের নাড়ু প্রসাদ দিলেন আমাদের হাতে।

সন্ধ্যা হয়েচে, বাঁশবাগানের তলায় অন্ধকার বেশ ঘন।

আমরা বেলঘরিয়া স্টেশনে এসে কলকাতার গাড়ি ধরলুম।

আমার বন্ধু নীরদ আমার সঙ্গেই মেসে থাকে।

দুজনেরই অবস্থা সমান। কলকাতা থেকে বেরুনো হয়নি কোথাও অনেকদিন।

নীরদ বললে—চল, কোথাও বেড়িয়ে আসি—

রেলে কোথায় যাওয়া যায় বেশ ভেবেচিন্তে দেখলুম। দূরে কোথাও যাওয়া চলবে না, তত পয়সা নেই হাতে। সুতরাং আমি পরামর্শ দিলাম, মার্টিনের ছোট রেলে চলো কোথাও যাওয়া যাক। সে বেশ নতুন জিনিস হবে এখন।

হাওড়া ময়দান স্টেশনে ছোট লাইনে চেপে আমরা জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে রওনা হলুম।

দুধারে যখন পড়লো ফাঁকা মাঠ আর বাঁশবন, আমবন—আমাদের মন যেন মুক্তির আনন্দে নেচে উঠলো।

বেলা তিনটের সময় আমরা নামলুম গিয়ে জাঙ্গিপাড়া। দুজনে গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম—বড় বড় বাঁশবন ঝোপঝাড় আর ছোটবড় পানাপুকুর চারিধারে।

বেলা তিনটের মধ্যে এমন ছায়া নেমে এসেচে যেন এখনি সন্ধ্যা হবে। আমরা একটা ময়রার দোকানে বসলুম—ময়রার সম্বল কালো দড়ির জালের পেছনে কলঙ্ক-ধরা পেতলের থালায় সাজানো চিনির ডেলা সন্দেশ,তেলেভাজা বাসি জিলিপি, কুচো গজা, চিঁড়ে মুড়কি আর বাতাসা।

কলকাতার বাবু দেখে ময়রা খাতির করে বসালে। নীরদ ইংরাজিতে বললে—যে রকম খাতির করলে এরপর নিতান্ত মুড়কি তো কেনা যায় না—উপায় কি ?

—এসো একটু চাল দেয়া যাক—তুমিই আরম্ভ করো।

ময়রাকে ডেকে নীরদ বললে—ওহে, ভালো সন্দেশ আছে ?

ময়রা করুণদৃষ্টিতে চিনির ডেলা সন্দেশের থালার দিকে চেয়ে বললে—আজ্ঞে খুব ভালো হবে না। একটু চিনি বেশি হবে—আপনাদের তা দেওয়া যায় না।

আমি চুপি চুপি বললুম—ময়রা আমাদের কি ভেবেচে হে ? দুজনের পকেট এক করলে খাবার খাওয়ার বাজেট কত ?

নীরদ উত্তর দিলে—সাত পয়সা। তার মধ্যে একটা পয়সা পান খাওয়ার জন্যে রাখো—ছ' পয়সা।

আমি তখন তাচ্ছিল্যের সুরে বললুম—চিঁড়ে-মুড়কিই দাও তবে ছ' পয়সার, ও বরং ভালো, এসব জায়গায় বাজে ঘি তেল—

খেতে খেতে ময়রাকে জিজ্ঞেস করা গেল, তোমাদের এখানে এত ডোবা আর জঙ্গল, ম্যালেরিয়া আছে নাকি?

ময়রা আমাদেব জন্যে তামাক সাজতে সাজতে বললে—ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন গেল সব বাবু, আর আপনি বলেন আছে নাকি? ভেতরে ঢুকে দেখুন কি অবস্থা গাঁয়ের।

বেলা পড়ে এলে আমরা গ্রামের মধ্যে ঢুকলুম। বাংলার ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত দরিদ্র গ্রামের এমন একখানি ছবি সেই আসন্ন হেমন্তসন্ধ্যায় সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, যা চিরদিন আমার মনে আঁকা রয়ে গেল। ছবি নিরাশার, দুঃখের, অপরিসীম নিঃসঙ্গতার ও একান্ত দারিদ্র্যের।

সেই বনজঙ্গলে ভরা গ্রামখানির ওপর ধ্বংসের দেবতা যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর করাল কালো ডানার ছায়ায় সারা গ্রাম অন্ধকার।

আমাদের মন কেমন দমে গেল—যেন এখান থেকে পালাতে পারলেই বাঁচি। একটা ডোবার ধারে জনৈক গ্রাম্যবধূকে বাসন মাজতে দেখলুম। পথের ধারে অন্ধকার পুকুরটা—সরু হাতদুটি ঘুরিয়ে মেয়েটি বাসন মাজচে, পরনে মলিন কাপড়, অথচ গায়ের রং দেখে মনে হয় সে উচ্চবর্ণের গৃহস্থের কুলবধূ। বাংলার মেয়েদের শত কষ্টের কথা মনে পড়ে গেল ওকে দেখ—বাংলার সমস্ত নিপীড়িতা অভাগিনী বধূদের ও যেন প্রতিনিধি।

এক জায়গায় একটা পাঠশালা বসেচে। তার একদিকে শিবমন্দির। পাঠশালার ছেলেরা ছুটির আগে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে সমস্বরে নামতা পড়চে। একটা ছেলেও স্বাস্থ্যবান নয়, প্রত্যেকের মুখ হলদে, পেট মোটা—কারো গায়ে মলিন উড়ানি, কারো গায়ে ছেঁড়া জামা—প্রায় কারো পায়ে জুতো নেই।

আমরা দাঁড়িয়ে দেখচি দেখে গুরুমশায় নিজে এগিয়ে এসে বললেন—আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

—বেড়াতে এসেচি কলকাতা থেকে।

তিনি খুব আগ্রহের সুরে বললেন, আসুন না, বসুন, এই বেঞ্চি রয়েছে—

নীরদের বসবার তত ইচ্ছে ছিল না হয়তো—কিন্তু আমার বড় ভালো লাগলো এই গুরুমশায়টি ও তাঁর দরিদ্র পাঠশালা।

কি জানি, হয়তো আমার বাল্যের সঙ্গে এখানে কোন একটি গ্রাম্য পাঠশালার সম্পর্ক ছিল বলেই। নীরদকে টেনে নিয়ে এসে বসালাম পাঠশালার বেঞ্চিতে।

গুরুমশায়ের বয়েস ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল প্রায় সব সাদা, শীর্ণ চেহারা। পরনে আধময়লা ধুতি আর গায়ে হাতকাটা ফতুয়া। তিনি বসেচেন একখানা হাতল-হীন চেয়ারে, চেয়ারখানার পিঠটা বেতের কিন্তু বসবার আসনটা কাঠের। মনে হয় সেটাও এক সময়ে বেতেরই ছিল, ছিঁড়ে যাওয়াতে সোজাসুজি কাঠের করে নেওয়া হয়েচে, হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে।

সেদিন ভারি আনন্দ পেয়েছিলুম এই পাঠশালায় বসে।

আমরা বললুম—আপনার পাঠশালায় কত ছেলে?

—আজ্ঞে ত্রিশজন, তবে সবাই আসে না—জনকুড়ি আসে।

—ছেলেদের মাইনে কত?

—চার আনা, আর ছ' আনা—তা কি সবাই ঠিকমত দেয়? তা হলে আর ভাবনা কি বলুন। গভর্ণমেন্টের মাসিক সাহায্য আছে পাঁচ সিকে, তাই ভরসা।

মাসে পাঁচসিকে আয়ের ভরসা কি সেটা ভালো বুঝতে না পেরে আমরা গুরুমশায়ের মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু লোকটা মনে হল তাতেই দিব্যি খুশী—যেন ও জীবনে বেশ একটু পাকাপোক্ত আয়ের দৃঢ় ভিত্তির ওপর বসে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

আমি বললুম—আপনার বাড়িতে ছেলেপুলে কি?

গুরুমশায় হেসে বললেন—তা মা ষষ্ঠীর বেশ কৃপা। সাতটি ছেলেমেয়ে—দুটি মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়েচে, বিয়ে না দিলেই নয়। তবুও তো একটি আর বছর ম্যালেরিয়া জ্বরে—সতেরো বছরের হয়েছিল—

বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ কাহিনী। আমরা সেখান থেকে উঠলুম, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে। গুরুমশায় কিন্তু আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না, বললেন—চলুন, আপনাদের গাঁ দেখিয়ে আনি। একটা ছোট মাঠ পেরিয়ে গুরুমশায়ের ঘর। ইটের দেওয়াল, টিনের চালা। বেশ বড় উঠোন, তবে ঘরদোরের অবস্থা খুব ভালো নয়। উঠোনে পা দিয়ে গুরুমশায় বললেন—ওরে হারু, বাইরে মাদুরটা পেতে দে।

আমরা বললুম—আবার মাদুর কেন, আমরা বসবো না আর।

—না না, তা কখনো হয়? এলেন গরীবের বাড়ি, একটু কিছু মুখে না দিলে—একটু চা।

—ওসব আবার কি, গাঁ দেখাতে নিয়ে বেরুলেন, ওসব কথা তো ছিল না?

আমাদের কোন কথাই শুনলেন না তিনি। মাদুর এল, বসালেনও আমাদের। গুরুমশায় বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

একটু পরে তিনি আবার তামাক সেজে এনে আমাদের হাতে দিতে গেলেন এবং আমরা কেউ তামাক খাইনে শুনে দুঃখিত হলেন। আমরা বললুম—আপনাদের গাঁয়ের ময়রাও ওই ভুল করেছিল, সেও তামাক সাজছিল আমাদের জন্যে।

একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে এই সময় একখানা থালাতে প্রায় আধ কাঠাখানেক মুড়ি, একটা ছোট বাটিতে পোয়াটাক আখের গুড়, অনেকখানি নারকেল কোরা নিয়ে এল। গুরুমশায় বললেন—এই এঁদের সামনে রাখ মা—এই আমার ছোট মেয়ে, এই চৌদ্দ হল, এর ওপরে দুই দিদি—যা, চায়ের কতদূর হল দেখ গে—না না, ও হবে না—একটু মুখে দিতেই হবে—গরীবের বাড়ি, আপনাদের উপযুক্ত নয়—পাড়াগাঁ জায়গা।

তখন নীরস মুড়ি নারকেল কোরার বৈজ্ঞানিক ভিটামিনতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো যে, এমন চমৎকার পুষ্টিকর জলযোগ বহুদিন আমাদের অদৃষ্টে জোটেনি। মেয়েটি আবার চা নিয়ে এল।

—এইখানে রাখ মা, হয়ে গেলে অমনি দুটি পান আনবি—আর দুটি মুড়ি...?

—আজ্ঞে না, এই খেয়ে ওঠা দায়, এ কি কম দেওয়া হয়েচে?

জলযোগ সবে শেষ হল। মেয়েটি কৌতূহলের দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে ছিল এতক্ষণ। গুরুমশায় বললেন—এর নাম কমলা—এইটি মেয়েদের মধ্যে খুব বুদ্ধিমতী। বাংলা যে কোনো বই পড়তে পারে, এর দিদিরা লেখাপড়া জানে না—পড়াশুনোর ঝোঁক খুব এর—কেবল বই পড়তে চাইবে, তা আমি কোথা থেকে নিত্য বই দিই বলুন।

আমার হাতে একখানা কি মাসিকপত্র ছিল, ট্রেনে পড়বার জন্যে এনেছিলুম—

মেয়েটিকে ডেকে সেখানা তার হাতে দিয়ে বললুম।—এখানা প'ড়ো তুমি। নীরদ পিতাপুত্রীর অলক্ষিতে আমার গায়ে একবার চিমটি কাটলে। আমার তখন বয়স তেইশের বেশি নয়—মেয়েটি চৌদ্দ বছরের।

মেয়েটি আমার হাত থেকে সেখানা নিয়ে নম্রমুখে একটু হাসলে। তারপর আমাদের থালা ও কাপগুলি নিয়ে চলে গেল।

গুরুমশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন—বইখানা দিয়ে দিলেন? বেশ ভালো নতুন বইখানা—অমন বই ও পেয়ে বড় খুশী হয়েচে। এ গাঁয়ে ওসব কে দেবে বলুন?

আমরা গুরুমশায়ের বাড়ি থেকে যখন বার হয়ে পথে পড়লুম তখন বেশ অন্ধকার হয়েচে, বাড়ির সামনে বাতাবী লেবু গাছের ডালে জোনাকি জ্বলচে। গুরুমশায় বললেন—চলুন আপনাদের এগিয়ে দিই। ট্রেনের এখনো দেরি আছে—সাড়ে আটটায় —আমাদের আড্ডাটা দেখে যাবেন না একবার?

কলকাতায় ক্লাব আছে, সিনেমা আছে, ফুটবল আছে, এখানে লোকে অবসর সময় কি করে কাটায় জানবার আগ্রহ অত্যন্ত বেশি ছিল আমার।

একটা নীচু চালাঘরের সামনে গিয়ে গুরুমশায় বললেন—দেখবেন নাকি? আসুন না?

ঘরের মাটির মেঝেতে আগাগোড়া মাদুর পাতা। জনচারেক লোক বসে আছে মাদুরের ওপর, একজন হুঁকোতে তামাক টানচে। আর তিনজন লোক একেবারে চুপচাপ বসে। আশ্চর্য্য এই যে, এরা কথাবার্ত্তা বলতে এসে এমনধারা চুপচাপ বসে আছে!

একজন আমার দিকে চেয়ে বললে—কোত্থেকে আসা হচ্চে?

গুরুমশায় বললেন—ওঁরা কলকাতা থেকে এসেচেন আমাদের দেশ দেখতে, তাই আমার ওখানে—

—বেশ বেশ, বসুন। তামাক চলে? চলে না। তা বেশ—

কথাবার্ত্তার ইতি। এ মজলিসে কেউ কথা বলে না দেখচি। আরও তিন-চারজন লোক ঢুকলো—একজন বললে—তেঁতুল কি দরে বিক্রি করলে চক্কোত্তি?

যে লোকটি হুঁকো টানছিল সে উত্তর দিলে—বিক্রি করিনি। সাড়ে সাত টাকা পর্য্যন্ত উঠলো, আর উঠলো না। সামনের হাটে আবার দেখি—

বেশ লাগলো ওদের এই গ্রাম্য কথা। কথাও যদি বলে তো বেশ লাগে। এ যেন কাশ্মীর ভ্রমণের চেয়েও কৌতূহলপ্রদ; যদিও কখনো কাশ্মীর ভ্রমণ করিনি, বলতে পারিনে তার আনন্দ কি ধরনের। আর একজন বললে—আর একবার কুতুবপুরে যাই, মেয়েটার একটা সম্বন্ধ জুটেচে—পাত্র কুতুবপুরের কাছারিতে নায়েবি করে—

—কুতুবপুরের নায়েব? হাঁ হাঁ, দেখে এসো, বেশ ছেলেটি, বয়েস বেশি না—

এই সময় একজন ঘরে ঢুকে সকলের সামনে কলার পাতায় মোড়া কি একটা জিনিস রাখলে। সবাই ঝুঁকে পড়লো। এসো হরিশ, কি, কি হে এতে?

আগন্তুক লোকটি হাসিমুখে বললে—খাও না, দ্যাখো না কি। বাড়ির গাছে কৎবেল পেকেছিল, তারই আচার—বলি, যাই আড্ডার জন্যে একটু নিয়ে যাই—

সকলেই ঝুঁকে পড়লো কলার পাতার ওপর। আমাদের হাতেও ওরা একটু তুলে দিলে জিনিসটা। আমদের কোন আপত্তি টিকলো না।

বেশ আড্ডা। খুব ভালো লাগলো আমার। আমি ভাবলুম কাছে এত, মাঝে মাঝে এক আধ শনিবার কলকাতা থেকে এখানে এসে এই আড্ডায় যোগ দিয়ে গেলে কলকাতা বাসের একঘেয়েমিটা কেটে যায়। কলকাতায় ফেরবার ট্রেনের সময় প্রায় হল। আমরা

ওদের সকলের কাছে বিদায় নিলাম। গুরুমশায়টি সত্যিই বড় ভদ্র, তিনি উঠে এলেন আমাদের সঙ্গে আমাদের স্টেশনের রাস্তায় তুলে দিতে।

—আসবেন আবার—কেমন তো? বড় কষ্ট হল আপনাদের—

—কি আর কষ্ট—খুব আনন্দ পেয়েচি। আসি তাহলে।

খানিকটা চলে এসেচি—দেখি গুরুমশায় পেছন থেকে আবার ডাকচেন। নীরদ বললে—ছাতি ফেলে আসোনি তো?

—না, ছাতি আনিই নি—

গুরুমশায় হাঁপাতে হাঁপাতে আসচেন পথের বাঁকে।

—একটা ভুল হয়ে গিয়েচে—আপনাদের ঠিকানাটা? যদি মেয়েটার বিয়ে-টিয়ে দিতে পারি মশায়দের চিঠি লিখব, আসবেন আপনারা। বড় খুশী হবো। বড় ভালো লেগেচে আপনাদের।

ট্রেনে উঠে নীরদ বললে, বেশ বেড়ানো হল, না?

—বেশই তো।

—গুরুমশায়ের মেয়েটি বেশ—কি বল? তোমাদের পাল্‌টি ঘর তো—না?

—সে খোঁজে তোমার দরকার কি?

—তাই বলছিলাম। গরীবের মেয়েটি উদ্ধার করা রূপ মহৎ কাজে—

—কি বাজে কথা বলচো সব! থাক্ ওকথা।

এরপরে আমরা আর কখনো ওই গ্রামে অবিশ্যি যাইনি—কিন্তু পাঁচ-ছ' বছর পরে বৌবাজারে এক দরজির দোকানে একজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তার বাড়িও জাঙ্গিপাড়া। কথায় কথায় তাকে তাদের বৃদ্ধ গুরুমশায়ের কথা জিজ্ঞেস করে জানি তিনি এখনও বেঁচে আছেন, মেয়েগুলির মধ্যে বড়টিকে অতিকষ্টে পার করেচেন কিন্তু অন্য মেয়েগুলির আজও কোনো কিনারা করতে পারেননি।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হলে জীবন সম্বন্ধে—পাড়াগাঁয়ে পায়ে হেঁটে বেড়ানো উচিত কিছুদিন, আমার এইরকম ধারণা। দশদিন কাশ্মীরে ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে আসার চেয়ে তা কম শিক্ষাপ্রদ নয়, আনন্দও তা থেকে কম পাওয়া যায় না। এই ধরনের আর একটা অভিজ্ঞতার কথা এবার বলবো।

পিসিমার বাড়ি যাচ্ছিলাম পায়ে হেঁটে।

১৯২৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। গ্রীষ্মের ছুটিতে তখন আমি আছি স্বগ্রামে। আম বট তেঁতুলের ছায়াভরা গ্রাম্য পথ। যে গ্রামে যাবো সেখানে এর আগে একটিবার মাত্র গিয়েছিলাম বছর কয়েক আগে—কাজেই রাস্তা পাছে ভুল হয়, এজন্যে লোকজনকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করতে করতে চলেচি।

একজন বললে—বাগান গাঁ যাবেন, তা অত ঘুরে যাচ্ছেন কেন বাবু? কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সবাইপুরের মধ্যে দিয়ে চলে যান না কেন?

তার কথা শুনে ভুল করেছিলুম, পরে বুঝলুম। প্রথম তো যে রাস্তায় এসে পড়লুম—সে হচ্ছে একদম মেঠোপথ—তার ত্রিসীমানায় কোনো বসতি নেই। তার ওপর রাস্তার কিছু ঠিক নেই, কখনো মাঠের আলের ওপর দিয়ে সরু পথ, কখনো প'ড়ো জলা আর নলখাগড়ার বন, কখনো শোলা বন।

মাঠের গায়ে রৌদ্রও প্রচণ্ড। খেয়া পার হয়ে ক্রোশখানেক অতি বিশ্রী পথ হেঁটে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। দূরে একটা বটগাছ দেখে তার তলায় বসে একটু জিরিয়ে নেবো বলে সেদিকে খানিকদূর গিয়ে দেখি আমার আর বটগাছের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড

জলার ব্যবধান। সুতরাং আবার ফিরলুম।

মাঠের মধ্যে একটা রাখাল ছোকরা গরু চরাচ্ছে, তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে। তাকে বললুম—সবাইপুর আর কতদূর রে?

—ওই তো বাবু দেখা যাচ্ছে—

সে অনেক দূরে মাঠের প্রান্তে বনরেখার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে। আমি খানিকটা এগিয়ে যেতেই সে আবার ডেকে বললে—কোথায় যাবেন বাবু?

বাগান গাঁ। চিনিস?

—না বাবু। তা আপনি সবাইপুরের খোঁজ কত্তিছেন কেন তবে?

—ওই তো যাবার পথ—

—ও পথে আপনি কি যাতি পারবেন বাবু? সবাইপুরে বাঁওড় পার হবেন কেমন করে?

সবাইপুরের বাঁওড়ের নাম শুনেচি, কিন্তু সে যে এ পথে পড়ে তা জানতুম না। জিজ্ঞেস করে জানা গেল খেয়ার নামগন্ধ নেই—সাঁতার দিয়ে পার হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? ফিরে আসবো ভাবচি, এমন সময় রাখাল ছোকরা আবার বললে—আপনি বাবু এক কাজ করুন, সবাইপুরের বিশ্বেসরা বাঁধল দিয়েচে, সেখান দিয়ে পার হয়ে যান—

মাছ ধরবার জন্যে বাঁশ বেঁধে যে লম্বা জাল টাঙিয়েছে—বাঁশের ওপর চড়ে অতিকষ্টে বাঁওড় পার হয়ে এপারে এলুম।

কিছুদূরে গাঁয়ের মধ্যে একটা কাদের খড়ের বাড়ি।

আমি গিয়ে বললুম—ওহে একটু জল খাওয়াতে পারো?

একটা লোক বেড়া বাঁধছিল উঠোনের কোণে, সে বললে—আপনারা?

—ব্রাহ্মণ।

লোকটা তাড়াতাড়ি উঠে দু' হাত জুড়ে প্রণাম করে বললে—তবে হবে না বাবু। আমরা জেলে—

—জেলে তাই কি? আমার ওসব—

—না বাবু, আমি হাতে করে দিতি পারবো না—তবে ওই কাঁটাল বাগানের মধ্যে টিউকল আছে—আপনি টিউকলে জল খেয়ে আসুন—একটা ঘটি নিয়ে যান, দিচ্ছি। ঝকঝকে করে মাজা একটা কাঁসার ঘটি লোকটা বাড়ির মধ্যে থেকে এনে দিলে। টিউ-কল অর্থাৎ টিউবওয়েলে জল খেয়ে আবার রাস্তা হাঁটি।

গ্রাম আর বড় নেই, মাঠ আর বনঝোপ। হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার করে মেঘ করে এল—নীল কালবৈশাখীর মেঘ—হয়তো ভীষণ ঝড় উঠবে। কিন্তু তখুনি কিছু হল না, মেঘটা থমকে গেল আকাশে। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় পথ বেশ চলতে লাগলুম।

এক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড জিউলি গাছ। দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে এই জিউলি গাছের দৃশ্য আমাকে কি মুগ্ধই করলো! দাঁড়িয়ে রইলুম সেখানে অনেক-ক্ষণ। প্রকাণ্ড গাছের সারা গা বেয়ে সাদা আঠা গলা-মোমবাতির অকারে ঝুলচে——গাছের তলায় কলকাতর রাস্তার ধারের সাজানো পিচের মতো একরাশি আঠা। যেন আমি বাংলা দেশে নেই, অফ্রিকার মত বন্য মহাদেশের অরণ্যপথ ধরে কোন্ অজ্ঞাত সুদূর গন্তব্যস্থান অভিমুখে যাত্রা করেচি। কি ভালোই যে লাগছিল!

আউশ ধানের ক্ষেতে সবে কচি কচি সবুজ জাওলা দেখা দিয়েচে। চারা ধান-গাছের এক ধরণের সুন্দর ঘ্রাণ আসচে বাতাসে।

খাওয়া-দাওয়ার কথা ভুলে গিয়েচি। বেলা এগারোটার কম হবে না কোন রকমে, কিন্তু সেজন্যে আমার কোন কষ্ট নেই। চারিধারে সবুজ আউশের জাওলা যেন বিরাট সবুজ মখমল বিছিয়ে রেখেচে পৃথিবীর কালো মাটির বুকে। নীলকণ্ঠ আর কোকিলের ডাক আসচে মাঠের চারিদিক থেকে—মেঘ থম্‌কানো আকাশের নীলকৃষ্ণ শোভা আর অবাধ মুক্তির আনন্দ—সব মিলে এরা আমায় যেন মাতাল করে তুলেচে।

বৃষ্টি এল—একটা বড় বটতলায় আশ্রয় নিলুম। টপ্ টপ্ করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা গাছের ডাল ভেদ করে মাঝে মাঝে গায়ে পড়তে লাগলো। বৃষ্টিতে বড় মাঠ-গুলো ধোঁয়ার মতো দেখাচ্চে।

বটতলায় একটা ছোট রাখাল ছেলে আমার মতো আশ্রয় নিলে। তার বয়েস দশ-বারো বছরের বেশী নয়। হাতে পাঁচন, মাথায় তালপাতার টোকা।

—বড্ড পানি এয়েল বাবু—

—হ্যাঁ, তাই তো—বোস্ ওখানে—বাড়ি কোথায়?

—সুন্দরপুর বাবু। ওই ঝে দেখা যাচ্চে—

বৃষ্টি থামলে সুন্দরপুর গ্রামের মধ্যে ঢুকলাম। গ্রামের মধ্যে দিয়েই পথ। বড় বাড়ি দুচারখানা চোখে পড়লো, খুবই বড় বাড়ি—বর্ত্তমানে লোকজন আর বিশেষ আমবন, যেমন এ অঞ্চলের সব গ্রামেই দেখতে পাওয়া যাবে।

একটা খুব বড় বাড়ি দেখে তার সামনে দাঁড়ালুম। এক সময়ে খুব ভালো অবস্থার গৃহস্থের বাড়ি ছিল এটা, নইলে আর এত বড় বাড়ি তৈরি করতে পারে না। এখন যারা থাকে, তাদের অবস্থা যে খুব ভালো নয়, এটা ওদের দোতলার বারান্দাতে পুরানো চাঁচের বেড়া দেখে আন্দাজ করা কঠিন হয় না। করগেট টিন জোটেনি তাই বাঁশের চাঁচ দিয়েচে।

একজনকে জিগ্যেস করলুম—এটা কাদের বাড়ি বাপু?

—বাবুদের বাড়ি। এ গাঁয়ের জমিদার ছেলেন ওঁয়ারা—

—এখন কেউ নেই?

—থাকবেন না কেন বাবু, কলকাতায় থাকেন। বাবুদের ছোট সরিকেরা এখন থাকেন এ বাড়িতে। তেনাদের অবস্থা ভালো নয়। বাবুরা সব উকিল, মোক্তার, অনেক পয়সা রোজগার করেন, এখানে আর আসেন না।

অথচ যখন সুন্দরপুরের বাইরে এলুম, তখন মুসলমান ও কাঙালী পাড়ার অবস্থা দেখে চোখ জুড়ুলো। ওরা প্রায়ই বাস করে ফাঁকা মাঠে, বাড়ির কাছে বন-জঙ্গল কম, খড়ের বাড়ি হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ধানের গোলা দুতিনটি অনেকের বাড়িতেই চোখে পড়ে, তরিতরকারির বাগান করে রেখেচে বাড়ির পাশেই, দুপাঁচটা গোরু সকলেরই আছে।

এদের স্বাস্থ্য খুব খারাপ নয়—যারা খেটে খায় এমন লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া হতে বেশি দেখিনি—ডায়েবেটিস, ডিসপেপসিয়া, ব্লাডপ্রেসারের নামগন্ধ নেই সেখানে।

ওরা যখন মরে, তখন বেশির ভাগ মরে কলেরাতে। শীতের শেষে বাংলার পাড়াগাঁয়ে চাষাপাড়া মরে ধুলধাবাড় হয়ে যেতে দেখেচি কলেরাতে—অথচ ভদ্রলোকের পাড়ায় এ রোগ খুব কম ঢুকতে দেখেচি।

তবে আজকাল গ্রামে গ্রামে নলকূপ বসবার ফলে ম্যালেরিয়া যতটা না কমুক, কলেরার মড়ক অনেক কমেচে। নলকূপের জল বারোমাস ব্যবহার করে, অথচ বারো-মাস ম্যালেরিয়ার ভুগে জীর্ণশীর্ণ, এমন লোক বা পরিবার অনেক দেখেচি।

কিন্তু আমি যা বলতে যাচ্ছিলুম—

পায়ে হেঁটে বাংলার অনেক গ্রামেই ঘুরেচি, সর্ব্বত্রই দেখেচি সমান অবস্থা—ভদ্রলোকের পতন, মুসলমান ও অনুন্নত জাতির অভ্যুদয়। ভদ্রলোকের পাড়ায় ভগ্ন অট্টালিকা, মজাপুকুর, ভগ্ন দেবালয়, ঘন বনজঙ্গল—আর চাষাপাড়ায় ক্ষেত-ভরা তরিতরকারি, গোয়ালভরা গোরু, ধানের মরাই, ছাগল, ভেড়া, হাঁস ইত্যাদি গৃহ-পালিত পশুপক্ষীর পাল। হলফ নিয়ে অবিশ্যি বলতে পারব না যে সব চাষারই এই অবস্থা—তবে অনেকেরই বটে।

ভদ্রলোকদের মধ্যে সাধারণত যারা শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম, তারা থাকে বিদেশে শহরে, আর ঝড়তি-পড়তি মাল যেগুলি, তারা নিরুপায় অবস্থায় পড়ে থাকে গ্রামে, শিক্ষিত ও প্রবাসী জ্ঞাতিদের পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘরে।

এরা বেলা বারোটা পর্য্যন্ত কোনো গাছতলায় কি কারো বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক টানে আর বাজে গল্প ও পরচর্চ্চা করে, সন্ধ্যাবেলা বসে তাস খেলে, কিংবা শখের যাত্রার দলে আখড়া দেয়। এ অঞ্চলে থিয়েটর বড় একটা দেখিনি কোথাও—ওটা হল কলকাতা-ঘেঁষা জায়গার ব্যাপার।

এই সব ভদ্রবংশের লোকের না আছে খাটবার ক্ষমতা, না আছে উদ্যম-উৎসাহ কোনো কাজে। কোনো নবাগত উৎসাহী লোক জনহিতকর কোনো কাজ করতে চাইলে এরা তাদের বুঝিয়ে দেবে যে ও রকম অনেক হয়ে গেছে, ও করে কোন লাভ নেই। কুঁড়ে লোকেরা সর্ব্বজ্ঞ হয় সাধারণত।

শুধু সুন্দরপুর নয়, অন্যান্য গ্রামেও ঠিক এই রকম দেখেচি এবং পল্লীগ্রামের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হয়েচি। আর পঞ্চাশ বছর এইভাবে চললে, গ্রাম থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—এখনই যেতে শুরু করেচে।

সুন্দরপুর ছাড়িয়ে একটা বড় বাঁওড় পড়লো সামনে, নদীর মতো চওড়া, জলও বেশ স্বচ্ছ, পার হবো কি করে বুঝতে পারচি নে, এমন সময়ে একটি বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা হল। সে নীচু হয়ে জলের ধারের কলমির বন থেকে কাঁচ কলমি শাক তুলে আঁটি বাঁধছিল।

জিগ্যেস করতেই সে হাত তুলে দেখিয়ে বললে—সামনে দিয়ে যাও বাবা, ওইদিকি আগাড় পড়বে।

বাঁওড়ের আগাড় মানে বাঁওড়ের একদিকের প্রান্তসীমা, যেখানে গিয়ে বাঁওড় শুকিয়ে বা মজে শেষ হয়ে গেল—সুতরাং ঘুরে পার হওয়া যায় সেখানটাতে।

আধ মাইলের কিছু বেশি যেতে আগাড় দেখা গেল - সেখানে একটা বড় বট গাছের তলায় কি একটা হচ্চে দেখতে পেলাম।

কাছে গিয়ে দেখি ওপারে বাঁওড়ের ধারে একটা বট গাছের তলায় কারা কলের গান বাজাচ্চে, আর তাই শুনবার লোভে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি ছেলে মেয়ে ঝি বৌ একত্র জড় হয়েচে। বাঁওড়ের ঘাটে জল নিতে এসে বউয়েরা শুনচে, সবই চাষা লোক, এ সব গ্রামে ভদ্রলোকের বাস আদৌ নেই।

বেলা প্রায় একটা হবে। আমিও একটু বিশ্রাম করে নেবার জন্যে বটতলার ছায়ায় গিয়ে বসলুম। কলের-গানওয়ালারা গাছের উঁচু শেকড়ের ওপর বসেচে, আমায় ভদ্র-লোক দেখে ওরা লাজুক মুখে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে।

সস্তা খেলো গ্রামোফোনের টিনের লম্বা চোঙের মুখ দিয়ে কর্কশ, উচ্চ, অস্বাভাবিক ধরনের গলার আওয়াজ বেরুচ্চে। বাজে হালকা সুরের গান বা ভাঁড়ামির রেকর্ড সবই—আমি জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের ভালো কিছু আছে?

—বাবু, আপনাদের যুগ্যি কনে পাবো, এ সব এই চাষা-ভুলোনো—

—তোমরা যাবে কোথায়?

—অমাদের বাড়ি ওই নাভারনের কাছে। কুলে রণঘাটের মেলায় কলের গান নিয়ে যাচ্চি বাবু, যদি দু'চার পয়সা হয়—আপনাদের শুনবার যুগ্যি এ জিনিস নয়, সে আমরা জানি।

—তোমরা কি এমনি মেলায় মেলায় বেড়াও?

—হ্যাঁ বাবু, ইদিকির সব মেলা, ওই ডুমোর মেলা, হলদা-সিন্দরিনীর চড়কের মেলা, গাঁড়াপোতায় চড়কের মেলা, গোপালনগরের বারোয়ারির মেলা, বেনাপোলে হরিদাস ঠাকুরের মেলা—সব জায়গায় আমরা যাই। আমাদের এতেই পয়সা রোজগার—

—কি রকম রোজগার হয়?

—তা বাবু আপনার কাছে আর বলতি কি, আগে এক একটা মেলায় ত্রিশ-চল্লিশ করে পাতাম। পাটের দর একবার উঠিছিল আটাশ টাকা। সেবার সব মেলা বেড়িয়ে পাঁচ ছ-শো টাকা পাই। পাটের দর যেবার কম থাকে, সেবার এত দেবে কে। চাষার হাতে পয়সা থাকলি তো দেবে। চাষার হাতেই নক্ষি বাবু—আসুন বাবু একটা বিড়ি খান—শোনবেন গান? ওরে আলি, একখানা সেই বাজনার রেকর্ট ছেলো যে, সেখানা দে—বাবু ওসব গানের আর কি শোনবেন—

এরা অশিক্ষিত মুসলমান, কিন্তু এদের যে উৎসাহ ও উদ্যম দেখেচি, শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসন্তানের তার অর্ধেকও থাকলে বেকার সমস্যা এত জটিল হয়ে দেখা দিত না। এদের সঙ্গে মনে মনে হিন্দু ভদ্রসন্তানের তুলনা করবার সুযোগ এবারই আমার ঘটেছিল, সে কথা পরে বলচি। আমি সেখান থেকে উঠে আর মাইল দুই ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে এমন এক জায়গায় পড়লুম, যেখানে কাছে কোন গ্রাম নেই।

মাঠের মধ্যে একটা চমৎকার বটগাছ তার বড় ডালপালা মাটিতে নুইয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোনো দিকে আছে কিনা দেখে একটা নীচু ডালে চড়ে বসলুম।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, বেলা দুটো বাজে, এখন পিসিমার বাড়ি গিয়ে পড়লে তিনি রান্না চড়াবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন—সে কষ্ট আর কেন তাঁকে দেওয়া—তার চেয়ে আর আধ ঘণ্টাখানেক পরে গেলে বলতে পারবো যে কাথাও থেকে খেয়ে এসেচি।

আধঘণ্টাও হয়নি, এমন সময় পেছন থেকে কে বলে উঠলো—এখানে কি কচ্চেন বাবু?

পেছনে ফিরে চেয়ে দেখি একজন বৃদ্ধ, তার মাথায় ধামাতে খুব বড় একটা তেলের ভাঁড়।

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়তে হল বৈকি তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি ডালটা থেকে। একটু হেসে বলি—এই একটু হাওয়া খাচ্চি, বড্ড গরম—

যেন হাওয়া খেতে হলে গাছের ডালে চড়াই প্রশস্ত উপায়।

—কোথায় যাবেন আপনি?

—বাগান গাঁ—কতদূর জানো?

—চলুন বাবু, আমি তো সেই গাঁয়েই থাকি—কাদের বাড়ি যাবেন?

—মুখুজ্জেদের বাড়ি।

লোকটা যে ভাবে আমার দিকে চাইতে লাগলো তাতে আমার মনে হল আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নয়।

এই গ্রামে আমি ছেলেবেলায় একবার এসেছিলুম—তখনই বেশ জঙ্গল দেখে গিয়েচি, সে জঙ্গল এখন সুন্দরবনকে ছাড়িয়ে যাবার পাল্লায় মেতেচে। এমন বন যে এ'কে অরণ্য নামে অভিহিত করা চলে অনায়াসেই। এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে কি করে মানুষ বাস করে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

দু-তিন দিন সে গ্রামে ছিলুম। তিনঘর মাত্র ভদ্রলোকের বাস, তিনঘরই ব্রাহ্মণ—তা বাদে কামার, কলু, কাঙ্গালী আজ আছে হিন্দুর মধ্যে—বাকি চল্লিশ-পঞ্চাশ ঘর মুসলমান। সাধারণতঃ হিন্দুর চেয়ে মুসলমানদের স্বাস্থ্য ভালো।

সকলের চেয়ে খারাপ অবস্থা হিন্দু ভদ্রলোকের। তাদের স্বাস্থ্য নেই, অর্থ নেই। মুখুজ্জেরা এককালে এ গ্রামের জমিদার ছিলেন—এখন তাঁদের ভাঙা কোঠা-বাড়ি আর নারকেল গাছের লম্বা সারি ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই—গোলায় পিঁড়ি পড়ে আছে, গোলা বহুকাল অন্তর্হিত, সংস্কার অভাবে অট্টালিকার জীর্ণ দশা ফাটলে বট-অশ্বত্থের গাছ, সাপের খোলস।

যে ক'জন ছেলে ছোকরা এই তিন বাড়িতে থাকে, সন্ধ্যাবেলায় তারা মুখুজ্জে বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বড় তাসের আড্ডা বসায়—দাবাও চলে। এরা কোনো কাজ করে না, লেখাপড়ার ধারও ধারে না। অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা এদের মধ্যে যা ছিল, তা ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্চে। দিন কতক পরে এরা সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য প্রকৃতির বেকার হয়ে পড়বে।

পল্লীবাসী হিন্দু ভদ্রলোকের এই সমস্যা সর্ব্বত্রই উগ্রমূর্ত্তিতে দেখা দিয়েচে। অর্থ নেই বলেই এদের স্বাস্থ্যও নেই—মনে স্ফূর্ত্তি নেই, পঁচিশ বছরের যুবকের মন পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধের মতো নিস্তেজ।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেচি, তা এর চেয়েও সর্ব্বনাশজনক। পল্লীগ্রামে এই ধরনের ভদ্রসন্তানদের মধ্যে পানদোষ অত্যন্ত ছাড়িয়ে পড়েচে। প্রায় সকলেরই এ দোষটি আছে, যে মদ পয়সা অভাবে না জোটাতে পারে, সে সস্তার তাড়ি খায়। এর সংগে আছে গাঁজা ও সিদ্ধি।

আমি এই গ্রামেরই একটি লোককে দেখলুম, সে বর্ত্তমানে একেবারে ঘোর অকর্ম্মণ্য ও স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়েচে। পূর্ব্বে সে কোথায় চাকরি করতো, চাকুরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে বসে প্রথমটাতে মহা উৎসাহে চাষ-বাস আরম্ভ করে। কিন্তু কৃষি-কার্য্যের সাফল্যের মূলে যে কষ্টসহিষ্ণুতা প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা তার ছিল না, ফলে হাতের টাকাগুলি নষ্ট হতে দেরি হয়নি। এখন বাড়ি বসে গাঁজা খায় এবং নাকি হরিনাম করে।

এ গেল পুরুষদের কথা। মেয়েদের জীবন আরও দুঃখময়। তাদের জীবনে বিশেষ কোনো আনন্দ-উৎসবের অবকাশ নেই, ধানভানা, রান্না, সংসারের দাসীবৃত্তি এই নিয়েই তাদের জীবন। অবসর সময় কাটে পরের চালচলনের নিন্দাবাদে। এতটুকু বাইরের আলো যাবার ফাঁক নেই ওদের জীবনে কোনো দিক থেকেই। অথচ তারা নিজেদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয়। তারা ভাবচে, তারা বেশ আছে। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা এইবারেই হয়েছিল।

পাশের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ, পিসিমার সম্পর্কে তাঁরাও আমার আত্মীয়। সেই বাড়িরই একটি বধূ, ত্রিশের মধ্যে বয়স, দেখতে শুনতে নিতান্ত খারাপ নয়—আমার খাবার সময় পরিবেশন করলে। তারপর বাড়ির ছেলে দুটি বললে—আসুন একটু দাবা খেলা যাক। আমি দাবা খেলা জানলেও ভালো জানি না, ওরা সে আপত্তি কানে তুললে না—অগত্যা ওদের মধ্যে গিয়ে বসলুম ওদের সংগে।

বধূটি আমায় পান মশলা দিতে এল।

আমি বললাম—বৌদি, বসুন না—

—না ভাই, বসলে চলে, কত কাজ—তোমরা থাকো শহরে, পাড়াগাঁয়ের কিই বা জানো—

—আচ্ছা বৌদি, আপনি কখনো শহর দেখেননি?

—দেখবো না কেন, কেষ্টনগর গোয়াড়ি দু-দুবার গিয়েচি। সে অনেকদিন আগে। ভালো কথা, আমার একটা উপকার করবে ঠাকুরপো?

—বলুন না—কেন করব না?

—আমার মেয়ে বীণার একটা পাত্র দেখে দাও না, কত জায়গায় তো ঘোরো—

—সে কি বৌদি, কতটুকু মেয়ে ও! এগারো-বারো বছরের বেশি নয়, এখুনি ওর বিয়ে দেবেন? ও লেখাপড়া শিখুক তার চেয়ে, কেষ্টনগরে আপনার মামার কাছে, ওকে রেখে দিন। এ গাঁয়ে থাকলে তো পড়াশুনোর আশা কিছুই দেখচি নে।

—কি হবে ভালো লেখাপড়া শিখে? সেই বিয়ে করতেই হবে, শ্বশুরবাড়ি যেতেই হবে—হাঁড়ি ধরতে হবে। মেয়েমানুষের তাই ভালো। এই যে আমি আজ ষোল বছর এই গাঁয়ে এদের বাড়ি এসেচি, খাটচি উদয়াস্ত দেখচো তো—আসবার দশ-দিনের মধ্যে হেঁসেলের ভার দিলেন শাশুড়ী, তার পর তিনি মারা গেলেন, আর সেই হেঁসেল এখনও আগলে বসে আছি।

—বেশ ভালোই লাগে?

—কেন লাগবে না ভাই! তোমরা এখন পুরুষমানুষ, উড়ুউড়ু মন। এ আমার নিজের সংসার, নিজের ছেলেমেয়ে, কেন খারাপ লাগবে বলো। লেখাপড়া করে কি দুটো হাত বেরুতো?

—আচ্ছা কোনো কিছু দেখতে আপনার ইচ্ছে করে না? কোনো বই পড়তে, কি কোথাও বেড়াতে?

—তা কেন করবে না—নবদ্বীপে রাসের মেলায় একবার যাবো ভেবে রেখেচি। বই কোথায় পাচ্চি এ পাড়াগাঁয়ে, আর পেলেও পড়বার সময় আমার নেই। আমরা কি মেমসাহেব যে বসে বসে সব সময় বই পড়বো?

—বীণাকে একটুও লেখাপড়া শোখাননি? ক-খ জানে তো?

—তা জানে। ডেকে জিজ্ঞেস করো না। রাঁধতে জানে, ধান ভানতে শিখেচে, দিব্যি চিঁড়ে কুটতে পারে, আমার সঙ্গে থেকে শিখেচে—সব দিক থেকে মেয়ে আমার—তবে ওই দোষ, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়ায় ভোগে। এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলো—পেটজোড়া পিলে, হাবুল ডাক্তারের ওষুধ দু শিশি খাইয়ে এখন একটু—

বাগান গাঁ থেকে চলে আসবার পথে আমার কতবার মনে হয়েচে পল্লীজীবনের এই সব গুরুতর সমস্যার কথা। এসব নিয়ে প্রবন্ধ লেখা চলতে পারে কিন্তু এ সমস্যার সমাধান করবে কে? এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

এবারের ভ্রমণ সম্পর্কে আর একটি ঘটনা আমার বড় মনে আছে। ফিরবার পথে একটা সাঁকোর ওপর বসেচি, বেলা তিনটে—জ্যৈষ্ঠমাসের খররৌদ্র মুখের ওপর এসে পড়েচে, একটি বৃদ্ধা কাঠ কুড়িয়ে ফিরচে। আমার দিকে চেয়ে সে আমার সামনে দাঁড়ালো। তারপর মায়ের মতো স্নেহসিক্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে—বাবা, বড্ড রদ্দুর লাগচে মুখটাতে, উঠে এসো—

বৃদ্ধার গলার সুরে আন্তরিক স্নেহ ও দরদের পরিচয় পেয়ে আমি চমকে উঠলুম যেন। সে আবার বললে, উঠে এসো বাবা, ওখানডাতে বোসো না—পড়ন্ত

রুদ্ধরেটা—

হয়তো আমি উঠে গিয়েছিলাম অন্যত্র, হয়তো তার সঙ্গে আমার আরও কি কথা হয়ে থাকবে—কিন্তু সে সব আর আমার মনে নেই। সে লিখতে গেলে বানানো গল্প হয়ে যাবে। এতদিন পরেও ভুলিনি কেবল বৃদ্ধার সেই মাতৃমূর্ত্তি, তার সেই দরদভরা উদ্বিগ্ন গলার সুর।

আমি চাকুরি উপলক্ষে এক বছর পূর্ব্ববঙ্গ আরাকানের মাংড়ু অঞ্চলে যাই। সে সময় রেলে স্টীমারে আমার অনেক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। অন্য কোনো ভাবে এদের বলা যায় না, এক এই ধরনের ভ্রমণ-কাহিনী ছাড়া। তাই এখানে সেগুলি লিপিবদ্ধ করবো। গোড়া থেকেই কথাটা বলি।

কলকাতায় বসে আছি, চাকুরি নেই—যদিও চাকুরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি করি।

একটি মাড়োয়ারী ফার্ম্মের বাইরে দেখলুম বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে, দুজন লোক তারা চায়। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা ঢুকে পড়লুম আপিসের ভেতরে। আপিসটি স্বনামধন্য ব্যবসায়ী কেশোরাম পোদ্দারের। বিজ্ঞাপন দেখে এসেচি শুনে আপিসের দারোয়ান আমায় একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। সামনেই বসে ছিলেন কেশোরাম পোদ্দার, তখন অবিশ্যি চিনতুম না।

কেশোরাম পোদ্দার হিন্দীতে জিগ্যেস করলেন—আপনি কি পাস?

বললুম, বি এ পাস করেচি ও বছর।

—কি জাতি?

—ব্রাহ্মণ।

—বক্তৃতা দিতে পারেন?

কিসের বক্তৃতা? ভালো বুঝতে পারলুম না, কিন্তু চাকুরির বাজার যেমন কড়া, তাতে কোনো কিছুতেই হঠলে বা ভয় খেলে চাকুরিপ্রাপ্তির যা-ও বা সম্ভাবনা ছিল তাও তো গেল। এ অবস্থায় বক্তৃতা তো সামান্য কথা, কেশোরামজি যদি জিগ্যেস করতেন "আপনি নাচতে জানেন?" তা হলেও আমার মুখ দিয়ে হাঁ ছাড়া না বেরুতো না।

সুতরাং বললুম, জানি।

—আচ্ছা, আপনার ঠিকানা দিয়ে যান, কাল বেলা দশটার সময় আসবেন।

পরদিন দশটার সময় কেশোরামবাবুর আপিসে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। আমার মতো আরও পঞ্চাশ-ষাটটি বেকার কেশোরামবাবুর খাস বাইরের হলে অপেক্ষা করচে। এরা সবাই বক্তৃতা দেবে আজ এখানে। বুঝলুম, সবারই মরীয়া অবস্থা। বক্তৃতা বক্তৃতাই সই।

আমার পূর্ব্বে একে একে আট-দশজন লোকের ডাক পড়লো। এদের মধ্যে বৃদ্ধ থেকে ছোকরা পর্য্যন্ত সব রকমের লোকই আছে। লক্ষ্য করে দেখলুম কেউ দু' মিনিট পরে ফিরে আসচে, কেউ আসছে পাঁচ মিনিট পরে—কেউ বা ঢুকবা মাত্র বেরিয়ে আসচে।

অবশেষে আমার ডাক পড়লো। কেশোরামজি দেখলুম তাঁর খাস কামরায় নেই, ওদিকের বারান্দায় দূর কোণে একখানা চেয়ারে তিনি বসে।

কাছে যেতেই বললেন, আপনি কিছু বলুন—

—ইংরিজিতে না বাংলাতে?

—বাংলায় বলুন—

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্যে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা খানিকটা মুখস্থ করেছিলুম, মনেও ছিল। সামনের থামের দিকে চেয়ে মরীয়ার সুরে তাই আবৃত্তি করে গেলুম। কেশোরাম খুশী হলেন। চাকুরি আমার হয়ে গেল।

দিন পাঁচ-ছয় পরে ট্রেনে কুষ্ঠিয়া গিয়ে নামলুম। কলকাতার কাছে কুষ্ঠিয়া, নদীয়া জেলায় একটা মহকুমা। এখানে কি থাকবে? কিন্তু আমার কাছে একটা দেখবার জিনিস ছিল। আমার মাতামহ সেকালের এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, গোরাই নদীর ওপর রেলওয়ে ব্রিজ তিনি তৈরি করেন এ গল্প অনেকদিন থেকে মাতুলালয়ে শুনে আসচি।

ঘুমের ঘোরে ভালো দেখতে পেলুম না ব্রিজটা।

জীবনে চাকুরি উপলক্ষে সেই প্রথম বিদেশে যাওয়া। ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠলুম, তিনদিন মাত্র এখানে থাকতে হবে।

পথে বেরিয়েচি, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, কলেজে তার সঙ্গে পড়েছিলুম। সে আমায় দেখে তো অবাক। ধরে নিয়ে গেল তাদের বাসাতে একরকম জোর করেই—আমার কোনো আপত্তি শুনলে না।

আমি তাকে বললুম—ভাই, গোরাই নদীর ব্রিজটা দেখাবি?

—সে আর বেশি কথা কি, চলো আজই।

বনজঙ্গল আর কচুবন ঠেলে ঠেলে গোরাই নদীর ধারে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। গোরাই নদীর উভয় তীরের মাঠে, জঙ্গল বাঁশবনের শোভা দেখে সত্যি আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। কত কাল কলকাতায় পড়ে আছি, বেরুতে পারিনি কোথাও।

বন্ধুকে বললুম—ভাই, বসি একটু—

এখানে কেন? চলো এগিয়ে—

—ভাই, বেশ লাগচে। তুমিও বোসো না—

—নাঃ, এসব কবিদের নিয়ে কোথাও বেরুনোই দেখচি দায়। বোসো তবে।

উঁচু পাড়ের নীচেই বর্ষার গোরাই নদী। সাদা সাদা এক রকম ফুল ফুটে আছে জলের ধারে। গাছপালায় শ্যামলতার প্রাচুর্য্য দেখে মন যেন অনন্দে নেচে ওঠে। তখনকার দিনে আমার একটা বড় বাতিক ছিল, নতুন জায়গায় নতুন কি কি বনের গাছ জন্মায় তাই লক্ষ্য করা। গোরাই নদীর ধারের মাঠে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, যশোর জেলাতেও যা, এখানেও প্রায় সেই গাছ, সেই শেওড়া, ভাঁট, কালকাসুন্দে, ওল, বনচালতে। বেশির মধ্যে এখানে দু'একটা বেতঝোপ নদীর ধারে, আমাদের দেশে বেতগাছ চোখে পড়ে না।

বেলা ন-টার সময় গোরাই নদীর পুল দেখে বাড়ি ফিরে এলুম। আমার বন্ধু বললে—চলো, এখানকার এক কবির সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—

ভদ্রলোকের নাম তারাচরণবাবু বোধ হয়, আমার ঠিক মনে নেই। গোরাই নদীর ধারেই তাঁর বাড়ি। বৃদ্ধ ভদ্রলোক। অমন অমায়িক-স্বভাব লোক বেশি চোখে পড়ে না। আমি তখন ছোকরা আর তিনি আমার বাপের বয়সী। কিন্তু তাঁর আচার-ব্যবহারে কথাবার্ত্তায় এতটুকু পরিচয় দিলেন না যে তিনি বয়সে বা জ্ঞানে আমার চেয়ে অনেক বড়। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মতো জ্ঞানপিপাসু লোক মফস্বলের ছোট শহরে ক্বচিৎ দু-একটি দেখা যায় কি না যায়। যতক্ষণ রইলুম, তিনি আমার সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথ ও ব্রাউনিং সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, কিন্তু তা যেন কত সঙ্কোচের সঙ্গে। যেন পাছে আমি একটুও মনে করি যে তিনি আমার সামনে তাঁর বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করচেন। মোহিনী মিল নামক বিখ্যাত কাপড়ের কল এখানেই অবস্থিত,

ভেবেছিলুম দেখবো, কিন্তু সময়ের অভাবে হয়ে উঠলো না।

পথে পড়ে গেলুম বিপদে, ট্রেনের যে কামরায় উঠেচি সে কামরায় আর দুজন বন্দুকধারী সেপাই টাকার থলে পাহারা দিয়ে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্চে।

আমাকে ওরা প্রথমে বারণ করেছিল সে গাড়িতে উঠতে। কিন্তু গাড়িতে বেজায় ভিড় ছিল বলে আমাকে বাধ্য হয়ে ওদের কামরায় উঠতে হল। গাড়ি তো ছাড়লো—মাঝরাস্তায় তারা কি বলাবলি করল। একজন চলন্ত গাড়ির ওদিকের দরজা খুললে—আর একজন আমার হাত ধরে টানতে লাগলো—ওরা গাড়ি থেকে আমায় ফেলে দেবে।

আমি প্রথমটা ওদের মতলব কিছু বুঝতে পারিনি। কারণ এ ধরনের ব্যাপার ধারণা করা শক্ত—আমি নিরীহ রেলযাত্রী, আমাকে তারা কেন ফেলে দেবে, এর যুক্তি-সঙ্গত কারণও তো একটা খুঁজে পাইনে।

ওদের অভিসন্ধি সম্বন্ধে আমার প্রথম সন্দেহ হল গাড়ির ওদিকের দরজা খুলতে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে হাত ধরে টানতে। যখন ওদের সঙ্গে জোরে পারবো না বেশ বুঝলাম—তখন আর একটা স্টেশনে না আসা পর্যন্ত যে ভাবেই হোক আমায় রেলগাড়ির মধ্যে থাকতে হবে।

আমি ওদের বললুম—কেন তোমরা আমাকে এ রকম করচো?

ওরা সে কথার কোনো জবাব দেয় না, শুধু হাত ধরে টানে। ওরা সে রাত্রে আমায় নিশ্চয়ই ফেলে দিতো—কিন্তু ওদের প্রধান অসুবিধে দাঁড়ালো গাড়ির দরজাটা। দরজা যদি বাইরের দিকে খোলা থাকতো তবে দুজনে মিলে ঠেলতে পারতো বা ওই রকম কিছু। কিন্তু এটা ভিতর দিকে খোলা যায়, সেই ধরনের দরজা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সেটা কেবল ঝুপ ঝুপ করে বন্ধ হয়ে যাচ্চে—সুতরাং একজনকে ধরে থাকার দরকার সেটাকে।

আমি ওদের সঙ্গে কোনো চেঁচামেচি কি গোলমাল করচিনে—মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা করে রেখেচি, কারণ আমার মনে হল ক্রমে যে এরা মাতাল হয়েচে—এরা কি করচে এদের জ্ঞান নেই। ঝগড়া কি চেঁচামেচি করলে মাতাল অবস্থায় রেগে চাই কি আমায় গুলি করেও বসতে পারে।

ট্রেনের বেগও কমে না, কোনো স্টেশনেও আসে না। শেকল টানবার উপায় নেই - কারণ যে দরজা দিয়ে তারা আমায় ফেলে দেবে, শেকল টানতে গেলে তো সেই দরজার কাছেই যেতে হয়—দরজার মাথার ওপর শেকল টানার হাতল।

আমি ওদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করচি, একজনকে মেরে ফেলে তাদের লাভ কিছু নেই—বরং তাতে পুলিসের ভীষণ হাঙ্গামে পড়ে যেতে হবে। তা ছাড়া নরহত্যা মহাপাপ, রামচন্দ্রজি ওতে যে রকম চটেন অমন আর কিছুতেই চটেন না। স্বর্গে যাবার অত বড় বাধা আর নেই। তুলসীদাসের দোঁহা এক-আধটা মনে আনবার চেষ্টা করলুম—কারণ 'রামচরিতমানস' আমার পড়া ছিল—কিন্তু বিপদের সময় ছাই কি কিছু মনে আসে!

এমন সময়ে গাড়ির বেগ কমে এল—কোনো এক স্টেশনে আসচে এতক্ষণ পরে। মাঠের মধ্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল, সামনেই কি স্টেশন, লাইন ক্লিয়ার দেওয়া নেই সিগন্যালে। গাড়ি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা আমায় ছেড়ে দিলে। আমিও একটি কথাও বললুম না। মাতালকে চটিয়ে কোনো লাভ নেই।

পরের স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো একটু পরেই। আমি আমার জিনিসপত্র সামান্য যা ছিল, নিয়ে অন্য কামরায় চলে গেলুম। রাত তখন এগারোটা কি তার বেশি।

একবার ভাবলুম গার্ডকে ঘটনাটা জানাই—কিন্তু ছোট স্টেশন, অন্ধকার রাত—গার্ডের গাড়ি অনেক পেছনে, যেতে যেতে ট্রেন ছেড়ে দেবে।

মনে মনে ভাবলুম, রাজবাড়ি স্টেশনে ট্রেন এলে রেলপুলিসকে বলবো—কিন্তু রাজবাড়ি নেমে আর গোলমালের মধ্যে যেতে ইচ্ছে হল না। মাতালদের সঙ্গে এক-গাড়িতে ওঠা আমরই ভুল হয়েছিল।

এর পরে যেখানে গিয়ে নামলুম সেটা হল ফরিদপুর।

নাম শুনে আসচি চিরকাল, অথচ কখনো দেখিনি ফরিদপুর—কি ভালো লেগে গেল জায়গাটা।

এখানে পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের স্নেহস্পর্শ লাভ করবার সৌভাগ্য আমার সর্ব্বপ্রথম ঘটেছিল। কি জানি কেন তখনও মনে হয়েছিল এবং আমার আজও মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা উদারতায়, নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তায় ও মনের ঐশ্বর্য্যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের চেয়ে অনেক বড়। লেখাপড়ার দিক থেকেও পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েরা আমাদের অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে শিক্ষিতা। এমন সব পরিবার দখেচি, তারা আর কিছু না পড়ালেও অন্তত ম্যাট্রিক পাস করিয়ে রাখে। ম্যাট্রিক পাস করে লেখা-পড়া শেখার বড় মাপকাঠি না হতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন, এটুকুও তো তা থেকে বোঝা যায়।

ফরিদপুর ডাকবাংলোয় গিয়ে উঠবার আগে আমার মনে পড়লো আমহার্স্ট স্ট্রীটের মেসে যে অমুক বাবু থাকতেন, তাঁর বাড়ি ফরিদপুর, দেখি তো খোঁজ করে।

দেখা পেলাম এবং ভদ্রলোক (বন্ধু ঠিক নন, কারণ এর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল সামান্যই) আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাড়ি যাবার এক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মা আমাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। এমনভাবে আলাপ করলেন, যেন আমি কত কালের পরিচিত।

তিন দিন সেখানে ছিলুম, কাজ শেষ করে বিকেলের দিকে স্টীমারে ফরিদপুর থেকে বেরুবো, ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে বাসার জিনিসপত্র তুলতে এলাম।

বাইরের যে ঘরটাতে থাকি, সেটাতে ঢুকে দেখি বন্ধুটির দিদি আমার বিছানাটা বেশ ভালো করে ঝেড়ে পেতে দিচ্চেন। মশারিটা টান টান করে টাঙিয়ে দেবার চেষ্টায় আপাতত তিনি খুব ব্যস্ত।

আমি বন্ধুর দিদির সঙ্গে তত বেশি আলাপ করিনি ইতিপূর্ব্বে। তিনি বিধবা, বয়েসও খুব বেশি নয়। তাঁকে দেখে আমি সমীহ করে ঘরের বাইরে চলে যাচ্চি, উনি বললেন—চা না খেয়ে যেন আর কোথাও বেরুবেন না।

আমি বললুম—দিদি, আমি গাড়ি এনেচি ডেকে, টেপাখোলা গিয়ে স্টীমার ধরবো।

তিনি একটু অবাক হয়ে বললেন—আজই? কেন?

হেসে বলি—পরের চাকরি দিদি, থাকবার কি যো আছে—

দিদি স্নেহের সুরে জোর গলায় বললেন—আজ ভরা আমাবস্যে, আজ আপনার যাওয়া হতেই পারে না—আজ থাকুন—

আমি অবাক হয়ে ও'র মুখের দিকে চাইলুম। নিজের বোনের মতো সহজ সরল দৃঢ় আত্মীয়তার সুর।

কোথাকার কে আমি, নামধাম জানা নেই, দুদিনের মেসের বন্ধু ও'র ভাইয়ের—তাও কতদিন আগের!

যেতে মন সরলো না। গাড়ি সেদিন ফিরিয়ে দিলুম।

আর একটি ঘটনা ঘটেছিল মাদারিপুর ডাকবাংলোতে।

ফরিদপুর থেকে গিয়েচি মাদারিপুর। হাতের পয়সাকড়ি ফুরিয়ে যেতে কেশোরামজিকে পত্র লিখলাম, তিনি কিছু টাকা মনিঅর্ডার করে পাঠিয়ে দিলেন খরচ-পত্রের জন্যে। ডাকবাংলোয় থাকি, পাঁচ-ছদিন মাত্র আছি, কেউ আমাকে চেনে না মাদারিপুরে, পোস্টমাস্টার আমায় মনিঅর্ডার বিলি করতে অস্বীকার করলে। যার নামে মনিঅর্ডার, সেই লোক যে আমি তা সনাক্ত করবে কে?

এদিকে পাঁচ দিনের ডাকবাংলোর ভাড়া বাকি, হাতে বিশেষ কিছুই নেই, বিষম মুশকিলে পড়তে হল।

সেই সময় ডাকবাংলোয় আমার পাশের কামরায় একজন মুসলমান ভদ্রলোক কাজ উপলক্ষ্যে এসে দিন-তিনেক ছিলেন। তাঁর নাম আমার মনে নেই—মাদারিপুর থেকে কিছু দূরে কোনো স্থানের তিনি জমিদার। ডাকবাংলোর চৌকিদারের মুখে তিনি আমার বিপদের কথা সব শুনেছিলেন। একদিন আমায় ডাকিয়ে বললেন—আপনি কলকাতায় থাকেন?

বললাম—হ্যাঁ, তাই বটে, কলকাতায় থাকি।

তিনি বললেন—আমি সব শুনেচি আপনার বিপদের কথা। এখানে আপনাকে টাকা ওরা দেবে না—আমি আপনাকে সনাক্ত করতে পারতাম, কিন্তু তাতে মিথ্যে কথা বলা হবে, সত্যিই আমি আপনাকে চিনি না। আমার প্রস্তাব এই যে, কলকাতার ভাড়া আপনাকে আমি দিচ্ছি, তাতে আপনি কিছু মনে করবেন না—পথিক ভদ্রলোক বিপদে পড়েচেন, অমন বিপদে সকলেই পড়তে পারে। আপনি আপনাদের আপিস থেকে গিয়ে টাকা নিয়ে আসুন, আমার নাম-ঠিকানা রাখুন, আমার টাকাটা আমায় সুবিধেমত পাঠিয়ে দেবেন।

তিনি আমার কলকাতার ভাড়া দিলেন—তাই নিয়ে আবার কলকাতয় ফিরি। কেশোরামজি শুনে হাসতে হাসতে বললেন—তবেই অপনি আমাদের কাজ করেচেন! মনিঅর্ডার ধরতে পারলেন না, তবে আপনি ফি বারই কি টাকা নিতে কলকাতায় আসবেন নাকি?

আমি বললুম—এবার থেকে নোট রেজেস্ট্রি খামে পাঠাবেন, নইলে বিদেশে এই রকমই কান্ড। মুসলমান ভদ্রলোকের ঠিকানাতে কেশোরামজি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে নিজেই তাঁর টাকাটা পাঠিয়ে দিলেন।

কতদিনের কথা, ভদ্রলোকের নাম পর্য্যন্ত মনে নেই—কিন্তু তাঁর সে উপকার জীবনে কখনো ভুলবো না। বিশেষ করে আজকাল হিন্দু-মুসলমানের এই বিবাদের দিনে সে কথা বেশি করে আমার মনে পড়ে।

বরিশালে গেলুম মাদারিপুর থেকে স্টীমারেই।

আড়িয়ল খাঁ নদীর ওপর দিয়ে স্টীমার কিছুদূর গিয়ে পড়ে কালাবদর নদীতে, তারপর মেঘনার মুখ দিয়ে ঘুরে যায়। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপথের শোভা যাঁরা দেখচেন, তাঁদের চোখের সামনে সেই সুন্দরিবন দিয়ে ঘেরা গ্রামগুলির ছবি আবার ভেসে উঠবে এ গাঁয়ের কথা উল্লেখ করলেই। আমি সেই একটিবার মাত্র ওপথে যাই, আর কখনো যাইনি—কিন্তু মনের পটে সে সৌন্দর্য্য আঁকা হয়ে গিয়েচে চিরকালের জন্য। কত রোমান্সের এরা স্বপ্ন জাগায়—কত নতুন সৃষ্টির সাহায্য করে। মানুষের অন্তরের বিচিত্র অনুভূতিরাজির সন্ধান যেন মেলে এদের শ্যামল পরিবেশের মধ্যে; যত অপরিচয় ততই স্ফূর্ত্তি, ততই আনন্দ। দিনে রাতে সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নায় এদের নিয়েই স্বপ্ন-পসারীর কত কারবার!

তবে কথা এই, সন্ধ্যাবেলায় নৌকা ভিড়লো গ্রামের ঘাটে, বেসাতি করি কখন? কত ধানক্ষেত, খেজুর গাছ, তারাভরা রাত। সন্ধ্যায় গ্রামের বধূরা কলসী কাঁকে জল নিতে এসে গা ধুয়ে নিলে, জলের আলপনা এঁকে চলে গেল বাড়ি ফিরে। কত কথা বলে এই মাঠঘাট, কতদিনের জনপদবধূদের চরণচিহ্ন আঁকা নদীর ঘাটের পথটি, বৃদ্ধ বকুল কি বট গাছ—আর এই সুপুরির সারি, অদ্ভুত শোভা এই সুপুরি বাগানের! শুধু চোখ চেয়ে বসে থাকা স্টীমারের ডেকে, খাওয়া নয়, ঘুমানো নয়, শুধু জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত ডেকে বসে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকা।

আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের স্টীমারেই আলাপ হল। তিনি আমায় পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠতে হবে। বরিশালে স্টীমার লাগলো যখন, তখন তাঁর অনুরোধ ক্রমে সক্রিয় হয়ে উঠলো—তিনি আমার জিনিসপত্র তাঁর কুলির মাথায় চাপিয়ে দিলেন। কাউনিয়াতে তাঁর বাড়ি। বেশ বড় বাড়ি, জমিদার লোক, দেখেই বোঝা গেল।

ভদ্রলোকের দাদা বাড়ি পেঁছিলে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। বরিশালে দুজন লোক আমার বড় ভালো লেগেছিল, তার মধ্যে ইনি একজন। শুধু ভালো লেগেছিল বললে এঁর ঠিক বর্ণনা দেওয়া হল না—ইনি একজন অদ্ভুত ধরনের লোক। পাড়াগাঁয়ের শহরে এমন একজন লোক দেখবো এ আমি আশা করিনি।

তাঁর মস্ত বাতিক শেক্সপিয়ারের ভুল বার করা। এই নাকি তাঁর জীবনের ব্রত। কি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য শেক্‌স্‌পিয়ারে, কি চমৎকার পড়াশোনা! কীর্ত্তনখোলা নদীর ঝাউবনের ধারে সন্ধ্যাবেলায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি 'রোমিও জুলিয়েট' অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে লাগলেন এবং ওর মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে কি অসঙ্গতি তাঁর চোখে লেগেচে সেগুলো ব্যাখ্যা করে গেলন। কখনও 'রোমিও জুলিয়েট', কখনও 'হ্যামলেট', কখনও 'টেম্পেস্ট',—এটা থেকে আবৃত্তি করেন, ওটা থেকে আবৃত্তি করেন—সে এক কাণ্ড আর কি! স্মৃতিশক্তি কি অদ্ভুত!

কিন্তু খানিকটা শুনেই আমার মনে হল শেক্সপিয়ারের সৌদর্য্য উপভোগ করা এঁর উদ্দেশ্য নয়। এমন কি ভালো সমালোচনাও নয়—শেক্‌স্‌পিয়ারের খুঁত বার করে তিনি একখানা বইও লিখেছিলেন—আমায় একখানা উপহার দিলেন বরিশাল থেকে আসবার সময়। আমার আরও ভালো লাগতো এই ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহার ও ভদ্রতা। আমার তখন বয়স চব্বিশ-পঁচিশের বেশি নয়। তাঁর বয়স তখন অন্তত-পক্ষে পঞ্চান্ন। কিন্তু আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ বন্ধু বা সতীর্থের মতই কথাবার্ত্তা বলতেন, দোতলার ঘরে আমায় নিয়ে একসঙ্গে খেতে না বসলে তাঁর খাওয়াই হত না।

তিনি খুব হাসাতে পারতেন, সামান্য একটা কি কথার সূত্র ধরে এমন হাসির মশলা তা থেকে বার করতেন, আমার তো হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার উপক্রম হত। আমার মনে আছে একদিন কে তাঁকে বললে আমার সামনেই—ভেরিওরাম শেক্‌স্‌পিয়ারের নোটগুলো দেখেছেন?

ভদ্রলোক দুটি আঙুল নিজের দিকে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—আরে, ভেরিওরাম লাগবে না (বরিশালের ইডিয়ম), আত্মারাম আছেন, আত্মারাম!

আমি তো হেসে গড়িয়ে পড়ি আর কি! কি বলবার ভঙ্গি, আর কি হাত নাড়ার কায়দা! বড় শ্রদ্ধা হয়েছিল এই লোকটির ওপর আমর—এমন নির্ব্বিরোধ, নিস্পৃহ, সদানন্দ, জ্ঞানতপস্বী চোখে বড় একটা তখনও পর্য্যন্ত দেখিনি—বইয়েতে টাইপ হিসেবে অবিশ্যি অনেক পড়েছিলুম। আমার বেশ মনে হয়, আজও পর্য্যন্ত সে ধরনের মানুষ আর দ্বিতীয়টি চোখে পড়েনি।

প্রায়ই বিকেলবেলা আমায় নিয়ে তাঁর বেড়াতে যাওয়া চাই-ই। কোনোদিন কলেজের দিকে, কোনোদিন নদীর দিকে। বরিশাল শহরে আমি নতুন গিয়েচি—আমাকে জায়গা দেখিয়ে নিয়ে বেড়াতেন তিনি। আর মুখে মুখে চলত শেক্‌স্‌পিয়ারের শ্রাদ্ধ। শিক্‌স্‌পিয়ার ভুলে ভরা, পাতায় পাতায় ভুল। এতদিন সমালোচকদের চোখে ধুলো দিয়ে লোকটা মহাকবি সেজে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু আর চলবে না। শেক্‌স্‌পিয়ারে জারিজুরি সব বেরিয়ে গিয়েচে! মিথ্যে ক-দিন টেঁকে?

আমার খুব ভালো লাগতো এই সদানন্দ বৃদ্ধের সঙ্গ। শেক্‌স্‌পিয়ারের ভ্রম-প্রমাদ সম্বন্ধে তাঁর অত ব্যাখ্যাসহ বক্তৃতা সত্ত্বেও আমি মনে মনে বিশ্বাস করতুম না তাঁর কথা। কলেজ থেকে সবে বেরিয়েচি, বড় বড় শেক্‌স্‌পিয়ারী সমালোচকদের নাম শুনে এসেচি সদ্য, তাঁদের অনেকের কান্ড দেখে এসেচি কলেজের লাইব্রেরিতে। তাঁদের বিরুদ্ধে বরিশালে কীর্ত্তনখোলা নদীর ধারে উড়ানি গায়ে দেওয়া বৃদ্ধের মতবাদ আমার কাছে প্রলাপ ছাড়া আর কিছু মনে হয়নি। তবুও অবিশ্যি শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনে যেতুম।

আর একজন লোককে এই বরিশালেই দেখেছিলাম।

তাঁর নাম কুঞ্জবাবু। গলির মোড়ে একটি বাড়ির বারান্দায় প্রতিদিন বিকালে কুঞ্জবাবু বসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ধর্ম্মমূলক গল্প শোনাতেন। আমি একদিন শুনেছিলাম তিনি প্রহ্লাদের গল্প শোনাচ্চেন ওদের।

এমন সুন্দর বলবার ক্ষমতা যে, রাস্তার লোক কুঞ্জবাবুর গল্প শোনার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যেতো। সে গল্প শোনবার মতো জিনিস। যখনই আমি কুঞ্জবাবুকে দেখতাম, সব সময়েই একদল ছেলেমেয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতো।

কুঞ্জবাবুর সঙ্গে একদিন আলাপ হল অমনি এক রাস্তার ধারে। আমি তাঁকে বললুম—আপনার নাম আমি শুনেচি, বড় ভালো লাগে আপনার গল্প।

কুঞ্জবাবু দেখলুম লজ্জিত হয়ে পড়লেন। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম—কলকাতা থেকে আপিসের কাজে এসেচি, আবার দু-চারদিন পরে চলে যাবো।

—এখানে আছেন কোথায়?

—কাউনিয়াতে আছি—এক বন্ধুর বাড়িতে—

আমায় সঙ্গে করে তিনি একটি নীচু গোছের গোলপাতার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি ঠিক জানিনে সে ঘরটাতে তিনি সব সময় থাকতেন কিংবা তাঁর আলাদা কোথাও বাসা ছিল। ঘরের মধ্যে বসিয়ে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে অনেক ভক্তিমূলক কথা-বার্ত্তা কইলেন। আমায় একটা ছোট্ট রেকাবি করে বাতাসা আর শশা কাটা খেতে দিয়ে বললেন—ঠাকুরের প্রসাদ, মুখে দিন একটু। সরল-বিশ্বাসী ঈশ্বর-ভক্ত লোক। তাঁর পাণ্ডিত্য ততটা ছিল না, যত ছিল ভগবানে বিশ্বাস ও ভালোবাসা; যতদিন বরিশালে ছিলাম, মাঝে মাঝে তাঁর সেই ছোট্ট ঘরটাতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে বড় আনন্দ পেতাম।

দুঃখের বিষয় আমি বরিশাল থেকে চলে আসবার অল্প কয়েক মাস পরেই উপরোক্ত দুই ভদ্রলোকই পরলোকগমন করেন। কলকাতায় বসে এ খবর আমি কার কাছ থেকে যেন শুনেছিলুম। আমার যতদূর মনে আছে, শেক্‌স্‌পিয়ারের সমালোচক ভদ্রলোকের নাম অমূল্যবাবু। এমন আত্মভোলা ধরনের পণ্ডিত লোক আমি জীবনে খুব বেশি দেখিনি।

বরিশাল থেকে খালপথে উজীরপুর বলে একটা গ্রামে আমার এক সহপাঠীর বাড়ি গেলুম বেড়াতে। একটা খালের মধ্য দিয়ে গিয়ে আর একটা খালে পড়লুম, সেখানে

থেকে আর একটা খাল—সারা রাত্রিই চলচে নৌকো। রাত এগারটায় সময় ইসলাম-কাটি বলে একটা বাজারে নৌকো থামিয়ে মাঝিরা খেতে গেল।

বরিশালের মাঝিদের কথা ভালো বুঝিনে। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলুম, কত দেরি হবে রে রেঁধে খেতে? ওরা কি একটা বললে, আমি ধরে নিলাম দু ঘণ্টা দেরি হবে। অন্ধকার রাত, আমি নৌকো থেকে নেমে ইস্‌লামকাটির বাজারে বেড়াচ্চি, ক্রমে বাজারের পেছনের পথ দিয়ে ক্রমশ এগিয়ে চলেচি।

আমার মনে তখন নতুন দেশ দেখার তাজা নেশা, যা দেখচি তাই ভালো লাগে। পথের ধারের বন্য শঠি ঝোপ, তাই যেন কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! নতুন এক হিসেবে বটে, কারণ শঠিগাছ আমাদের দেশে না থাকায় কখনো চোখে দেখিনি এর আগে।

পুজোর ষষ্ঠী সেদিন, যে বন্ধুর সঙ্গে কলেজে একত্র পড়তুম সে আমায় বলেছিল, বরিশালে যদি যাও তবে আমাদের গ্রামে অবিশ্যি করে যেও পুজোর সময়। সেই উপলক্ষে যাওয়া। কখনো এদিকে আসিনি, বরিশাল জেলার নামই শুনে এসেচি এত-দিন—কতদূর এসে পড়েচি কলকাতা থেকে, কতদূর এসে পড়েচি নিজের গ্রাম থেকে—জগতে এত আনন্দ ও এত বিস্ময়ও আছে!

কে কবে ভেবেছিল একদিন আবার ইস্‌লামকাটি বলে একটা বহুদূর অজ্ঞাত স্থানে বুনো শঠিগাছের ঝোপ দেখবো রাত্রিবেলা!

বন্ধুর বাড়ি গিয়ে পেঁাছাই সকালবেলা।

সে গ্রাম আমার ভালো লাগেনি—ছোট কর্দ্দমাক্ত খাল বাড়ির সামনে, তার আবার বাঁধা ঘাট, আমাদের দেশের নদীর সৌন্দর্য্য অন্য ধরনের এবং এর চেয়ে কত ভালো; কেবল সেই কথা মনে হচ্ছিল। গ্রামের লোকের কথা ভালো বুঝতে পারিনে—কথার উচ্চারণের মধ্যে মিষ্টত্ব ও সরলতা আদৌ নেই, কতকগুলি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-রীতি কর্ণকে পীড়া দেয়।

এ রকম আমার মনে হবার একটি কারণ, সেই আমার প্রথম পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়া—তখন আমি ওখানকার গ্রাম্যকথা শুনতে মোটেই অভ্যস্ত ছিলাম না—এখন কানে অনেকটা সয়ে গিয়েচে। একটি ব্রাহ্মণ-বাড়িতে পুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলুম বন্ধুর সঙ্গে। আমাদের অঞ্চলে শহরের টানে ক্রিয়াকর্ম্মের খাওয়ানো ব্যাপারে যে সব শৌখিনতা ও বিলাসিতা এসে পড়েচে, বরিশাল জেলায় একটি সুদূর পল্লীগ্রামে সে সব থাকবার কথা নয়, সন্দেশ রসগোল্লার পরিবর্ত্তে তাই এখানে নারিকেলের নাড়ু আর পক্কান্ন মেঠাই দিলেও নিন্দা হয় না। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম ওখানে, প্রায় সকলেই ছাঁদা নিয়ে যায় এবং যেতে অভ্যস্ত, তাতে কোন সঙ্কোচ নেই কারো—প্রায় প্রত্যেকেই বসে যে পরিমাণ খেলে, সেই পরিমাণ মেঠাই নাড়ু গামছায় কি চাদরে বেঁধে নিয়ে এল।

আমাদের দেশে এ প্রথা আগে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল, এখন আর কেউ ছাঁদা বাঁধে না—শহরের টানে এ প্রথা একেবারে উঠে গিয়েচে।

পূর্ণিমার রাত্রে আবার খালপথে ওখান থেকে এলুম বরিশালে—সারারাত্রি জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ, তারা আর শঠির বনের শোভা দেখতে দেখতে ফিরলুম।

ঝালকাঠি বলে একটা বড় গঞ্জ আছে বরিশাল জেলার মধ্যে। এখান থেকে একটা স্টীমার ফ্রেজারগঞ্জ পর্য্যন্ত যায় সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে। আমার যাওয়ার কথা ছিল মরেলগঞ্জ। অনেকে বললে ওখানে সুন্দরবনের অনেকখানিই দেখা যাবে।

ঝালকাঠিতে এলুম সেই উদ্দেশ্যে। বরিশাল অঞ্চলে এমন জায়গাকে বলে 'বন্দর'। বাংলাদেশের গৃহ-স্থাপত্য কোনো কালেই ভালো নয় বলে আমার ধারণা,

আজকাল কলকাতা বা ছোট-বড় শহরে আধুনিক গৃহ-স্থাপত্যের যে নিদর্শন দেখা যায়, তাদের ছাঁচ এ-দেশী নয় সকলেই জানেন। ঝালকাঠিতে এসে এখানকার বাড়িঘর দেখে মন এমন দমে গেল—একটুকু সৌন্দর্য্যবোধ থাকলে কেউ এ ধরণের বাড়ি করে না।

এত বড় গঞ্জ, কিন্তু এখানে প্রায় সব বাড়ির করোগেট টিনের—কি ব্যবসা-বাণিজ্যের গুদামঘর, কি গৃহস্থবাড়ি। ফলে দোকান, গুদোম ও ভদ্রাসন বাড়ির একই মূর্ত্তি। তারপর অবিশ্যি লক্ষ্য করেচি পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সর্ব্বত্রই এই টিনের ছাউনির চলন হয়েছে আজকাল। খড়ের ঘরের যে শান্ত শ্রী আছে, টিনের ঘরের তা নেই, বরং টিনের চেয়ে লাল টালির ঘরও অনেক ভালো দেখতে। ঝালকাঠিতে বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়িও দেখেছি টিনের ছাউনি।

বাড়ির সামনে একটু-আধটু ফুলের বাগান কি সুদৃশ্য দু-একটা গাছপালাও কেউ শখ করে করেনি। টিনের ঘরের পাশে তা থাকলেও অন্তত বাড়ির কর্কশ রুক্ষতা একটু দূর হয়—কিন্তু ফুলের বালাই নেই কোনো বাড়িতে।

এক জায়গায় কেবল আছে দেখেছিলুম, তাও কলকাতার টানে।

নদীর ধারে ভূকৈলাসের জমিদারের প্রকাণ্ড কাছারিবাড়ি আছে—খুব বড় বড় থামওয়ালা সেনেট হাউসের মত চওড়া ধাপওয়ালা বাড়ি—এই টিনের ঘরের রাজ্যে এ বাড়িখানা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

ঝালকাঠি আমার ভাল লেগেছিল অন্য দিক থেকে। আমাদের গ্রামে নেপাল মাঝি বলে একজন লোক ছিল আমার ছেলেবেলায়, সে অত্যন্ত সামান্য অবস্থা থেকে ব্যবসা করে হাতে বিলক্ষণ দু'পয়সা করেছিল। তার মুখে ঝালকাঠির কথা খুব শুনতাম।

নেপাল মাঝি একবার ঝালকাঠি বন্দরে নৌকো লাগিয়েছিল, তখন সে অপরের নৌকোতে মাঝিগিরি করতো—সে সময়ে বন্দরে আগুন লাগে।

একজন লোক একটা কাঠের হাতবাক্স নিয়ে জ্বলন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওকে বলে—মাঝি, বাক্সটা ধরে রাখো তো—আমি আসচি—

এরপরে লোকটা আর নাকি ঠিক করতে পারেনি কার হাতে বাক্সটা দিয়েছিল, নেপালও স্বীকার করেনি। সেই হাতবাক্সটি সে আত্মসাৎ করে। অনেক টাকা পেয়েছিল বাক্সের ভেতর, সেই টাকায় ব্যবসা করে নেপাল অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছিল।

এ গল্প অবিশ্যি নেপাল মাঝির মুখে শুনিনি, নেপালের শত্রুরা বলতো এ কথা। তিনখানা বড় মহাজনী নৌকোতে সুপুরি আর বালাম চাল বোঝাই দিয়ে সে ঝালকাঠি থেকে আমাদের দেশে যেতো প্রতি বছর।

আমি ঝালকাঠি বাজারের একটা বড় আড়তে নেপালের নাম করতেই আড়তের মালিক তাকে চিনতে পারলে। বললে—সে অনেকদিন আসে না, বেঁচে আছে কি জানেন?

এতদূরে এসে যদি দেশের লোকের কথা শোনা যায় অপরের মুখে, আমার বাল্যকালের নেপাল মাঝির সন্ধান রাখে এমন লোকের সঙ্গে দেখা হয়, তবে সত্যিই বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

তিনদিন পরে স্টীমারে বরিশাল থেকে চাটগাঁ রওনা হই।

ছোট স্টীমার, লোকজনের ভিড়ও বেশি নেই—ডেকচেয়ার পেতে সামনের ডেকে বসে দূরের তীররেখা ও ঘোলা জল দেখে সারাদিন কোথা দিয়ে কেটে যায়! ভোলা

বলে বরিশালের একটা বন্দরে স্টীমার লাগলো পরের দিন সকালে।

এই ভোলার নামও করতো আমাদের গ্রামের নেপাল মাঝি। কি দুঃসাহসিক লোকই ছিলো, ধনপতি সদাগর কি ভাস্কো-ডা-গামা জাতীয় লোক ছিল আমাদের নেপাল, ছেলেবেলায় কি তাকে ভালো করে চিনতাম? কোথায় আমাদের সেই ছোট্ট নদী, নদীতীরে বাঁশবনে ছায়া, কুঁচলতার ঝোপটি—আর কোথায় সাত সমুদ্র তেরো নদী পারের বন্দর ভোলা!

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যার সময় সন্দ্বীপের উপকূলে স্টীমার গিয়ে নোঙর করলে আর স্টীমার থেকে সব লোক নেবে চলে গেল—এমন কি খালাসীগুলো পর্য্যন্ত নেমে গেল। সন্দ্বীপের উপকূলে এই সন্ধ্যাটি আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমার একদিকে বঙ্গোপসাগর, তার কূলকিনারা নেই—আসলে যদিও এটা সন্দ্বীপের খাঁড়ি, ঠিক বহিঃসমুদ্র নয়, কিন্তু দৃষ্টি যখন কোথাও বাধে না, তখন আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে সমুদ্রের যে রূপ ফুটে উঠেচে তার সঙ্গে কি বঙ্গোপসাগর, কি ভারত মহাসমুদ্র—কারো কোনো তফাতই নেই।

অদূরের তীরভূমি অপূর্ব্ব সুন্দর, তাল আর নারকেল সুপারির বনে ঘন সবুজ। সন্ধ্যায় যখন সবাই নেমে গেল, আমি স্টীমারে একেবারে একা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম শেষ বৈকালের ক্রমবিলীয়মান রৌদ্র পীত থেকে স্বর্ণাভ, ক্রমে রাঙা হয়ে কি ভাবে তালীবনরেখার শীর্ষদেশে উঠে গেল, আকাশ কি ভাবে পাটকিলে, তারপর ধূসর, ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল।

অনেক দিন আগের সেই সন্ধ্যায় যে সব কথা আমার মনে এসেছিল—তা আমার আজও মন থেকে মুছে যায়নি, সন্দ্বীপের সমুদ্র-উপকূলে বহুবর্ষ আগেকার সেই সন্ধ্যাটির ছবি মনে এলে, কথাগুলোও কেমন করে মনে পড়ে যায়।

পরদিন খুব ভোরে স্টীমার ছাড়লো।

চট্টগ্রামের যাত্রীদল শেষরাত্রে ডিঙি করে এসে স্টীমারে উঠলো—তাদের হৈ-চৈ আর গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল। ডেকে ভিড় জমে গেল খুব, তার ওপর বস্তা বস্তা শুঁটকি মাছ এসে জুটলো, বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো মাছের দুর্গন্ধে।

সকালে যখন সূর্য্যোদয় হল, তার আগে থেকেই দক্ষিণদিকে কূলরেখাবিহীন জলরাশি, বামে নোয়াখালি আর চট্টগ্রামের ক্ষীণ তীররেখা, আর কিছুদূর গিয়েই নীল শৈলমালা। সন্দ্বীপ চ্যানেল ছেড়ে স্টীমার অল্প কয়েক ঘণ্টার জন্যে বা'র সমুদ্রে পড়ল—তার পরেই কর্ণফুলির মোহনায় ঢুকে ডবল মুরিংস্‌এ নোঙর ফেললে।

চট্টগ্রাম সুন্দর শহর, তবে অত্যন্ত অপরিষ্কার পল্লীও আছে শহরের মধ্যেই। একটি জিনিস লক্ষ্য করেচি, কলকাতার বাইরে সব শহরের এক মূর্ত্তি। সেই সংকীর্ণ ধুলোয় ভর্ত্তি রাস্তা, গলিঘুঁজি, খোলা ড্রেন, টিনের ঘরবাড়ি।

কেন জানিনে, এসব ছোট শহরে দিনকয়েক থাকলেই প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে—দীর্ঘকাল এখানে যাপন করা এক রকম অসম্ভব। তবুও চাটগাঁ বেশ সুদৃশ্য শহর একথা স্বীকার করতেই হবে। শহরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় পাহাড় ; এর যে কোনো পাহাড়, বিশেষ করে কাছারির পাহাড়ের ওপর উঠলে একদিকে সমুদ্র ও অন্যদিকে বহুদূরে আরাকানের পর্ব্বতমালার নীল সীমারেখা চোখে পড়ে।

এখানে একটি পরিবারের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়ে পড়েছিল।

আমি স্টীমার থেকে নেমেই এদের বাড়িতে গিয়ে উঠি। বাড়ির কর্ত্তার নামে আমাদের সমিতির একখানা চিঠি ছিল।

কখনো এদের চিনিনে, চাটগাঁয়ে এই আমার প্রথম আগমন।

বেশ বড় বাড়ি, ঢুকে বাইরের ঘরে দুজন চাকরের সঙ্গে দেখা—জিজ্ঞেস করে জানলুম বাড়ির কর্ত্তা কাছারিতে বেরিয়েচেন, আসতে প্রায় চারটে বাজবে।

সুতরাং বসেই আছি. কাউকেই জানিনে এখানে, কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করবার পরে যাবো, না হয় একটু বসি।

বাড়ির মধ্যে থেকে এসে চাকরে জিজ্ঞেস করলে—মা জিজ্ঞেস করচেন, আপনি কি স্নান করবেন?

বললুম—স্নানাহার করবার কোনো দরকার নেই এখন। আমার সকল দরকার শেষ হলে আমি এখান থেকে চলে যাবো।

—না, তা হবে না বাবু, আপনাকে খাওয়াদাওয়া করতে হবে, মা বলে দিলেন।

বাড়ির কর্ত্রীর আদেশ অমান্য করতে মন উঠলো না। স্নানাহার সেখানেই করলুম এবং কর্ত্তা কাছারি করে বাড়ি ফিরে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করবার পরে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন, এখানেই থাকুন না কেন?

আমি আপত্তি করলুম—ডাকবাংলোয় যাবো ভেবেচি, কেন মিছে আপনাদের কষ্ট দেওয়া?

আমার আপত্তি গ্রাহ্য হল না। বৈঠকখানার পাশের ঘরটায় আমার থাকবার জায়গা হল এবং এর পরে দিন দশেক কাজের খাতিরে চাটগাঁয়ে ছিলুম—অন্য কোথাও আমায় ওঁরা যেতে দিলেন না।

বড় উদার পরিবার, দু-পাঁচ দিনের মধ্যে আমি যেন তাঁদের বাড়ির ছেলের মতো হয়ে গেলুম। বাড়ির মধ্যে গিয়ে রান্নাঘরের মধ্যে খেতে বসি, মেয়েরা পরিবেশন করে, কাউকে দিদি কাউকে মাসিমা বলে ডাকি। তাঁরাও আমায় স্নেহের চোখে দেখেন। বারো দিন পরে যখন আমি চাটগাঁ ছেড়ে কক্সবাজার গেলুম, তখন সত্যিই তাঁরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পড়লেন, বার বার বলে দিলেন, আমি যেন ফিরবার সময় আবার এখানে আসি।

কক্সবাজারে যাবার পথে মহেশখালি চ্যানেল নামে ক্ষুদ্র সমুদ্রের খাড়ি পড়ে।

দূরে চর কুতুবদিয়াতে লাইট হাউস ও আদিনাথ পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে আমি এদের কথা কতবার ভেবেচি। এতদূর বিদেশে যে আত্মীয়-বন্ধু লাভ করবো, তাদের ছেড়ে আসতে যে কষ্ট হবে, তারাও চোখের জল ফেলবে আমার আসবার সময়ে—এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে তখন নতুন, তাই বড় আশ্চর্য্য মনে হচ্ছিল ব্যাপারটা।

কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে কতবার এ অভিজ্ঞতা আমার যে হয়েচে। পর কতবার আপন হয়েচে, এমন কি আমার বিশ্বাস পর যত সহজে আপন হয়, আপনার লোকে তত সহজেও হয় না এবং তত আপনও হয় না।

কক্সবাজারে একদিন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

জীবনের সে এক বিপদ্‌জনক অভিজ্ঞতা—প্রাণসংশয়ও ঘটতে পারতো সেদিন।

কক্সবাজারে সমুদ্রের ধারে সাগরবেলায় জোয়ার নেমে গেলে কড়ি, শঙ্খ, ঝিনুক ইত্যাদি কত পড়ে থাকে : বড় বড় সমুদ্রের ঢেউ এসে কূলে তুলে দেয়। জ্যোৎস্না-পক্ষের রাত্রি, কত রাত পর্য্যন্ত সেখানে একা চুপ করে বসে থাকি, যশোর জেলার একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম থেকে কতদূর যেন চলে এসেচি, সেখানকার ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর দুপাড়ের বাঁশবনের কথা ভুলতে পারিনে, এতদূরে বসে দেশের স্বপ্ন দেখতে কি ভালোই যে লাগে!

কাউখালি বলে ছোট্ট একটি নদী বা খাল কক্সবাজারের পাশ দিয়ে এসে সমুদ্রে

পড়েচে। একদিন একখানা সাম্‌পান ভাড়া করে কাউখালি থেকে বার হয়ে সমুদ্রে বেড়াতে গেলুম।

মাঝি মাত্র একজন, চাটগাঁয়ের বুলিতে বললে, কতদূর যাবেন বাবু?

—অনেক দূর, চলো সমুদ্রের মধ্যে। সন্ধ্যের পর ফিরবো—

—আদিনাথ যাবেন?

একটা ছোট পাহাড় সমুদ্রগর্ভ থেকে খাড়া উঠেছে—তার মাথায় আদিনাথ শিবের মন্দির। এ অঞ্চলের এটি একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, অনেক দূর থেকে লোকে আসে আদিনাথ দর্শন করতে, শিবরাত্রির সময় বড় মেলা হয়। কাউখালি নদী যেখানে এসে সমুদ্রে পড়লো, তার ডাইনে প্রায় মাইল দুই দূরে আদিনাথ পাহাড় সমুদ্র থেকে উঠেচে, আর ঠিক সামনে অদূরেই একটা বড় চড়ার মতো কি দেখা যাচ্চে। মাঝিকে বললুম—ওটা কি চড়া পড়েচে?

মাঝি বললে—না বাবু, ওটা সোনাদিয়া দ্বীপ। ভাঁটার পরে ওখানে অনেক কড়ি, শাঁক, ঝিনুক পড়ে থাকে।

শুনে আমার লোভ হল। মাঝিকে সোনাদিয়া দ্বীপে যেতে বললুম।

মাঝি একবার কি একটা আপত্তি করলে, আমি ভালো বুঝলুম না ওর কথা।

সাম্‌পান সাগর বেয়ে চলেচে, বিকেল পাঁচটা, সমুদ্রের বুকে সূর্য্য ডুবুডুবু, হু-হু খোলা হাওয়া কাউখালির মোহানা দিয়ে ভেসে আসচে, আদিনাথ পাহাড়ের মাথায় অস্ত-সূর্য্যের রাঙা রোদ। মনে হয় যেন কত কাল ধরে সমুদ্রের বুকে ভাসচি, দূরের সাউথ সি দ্বীপপুঞ্জের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি সাগরবেলা, যা ছবিতে ছাড়া কখনো দেখিনি—তাও যেন অনেক নিকটে এসে পৌঁছেচে—তাদের শ্যাম নারিকেলপুঞ্জের শাখাপ্রশাখার সঙ্গীত যেন শুনতে পাই।

সোনাদিয়া দ্বীপে যখন সাম্‌পান ভিড়লো তখন জ্যোৎস্না উঠেচে।

ছোট্ট চড়ার মতো ব্যাপারটা, গঙ্গার বুকে বালি হুগলি শহরের সামনে অমন ধরনের চড়া কত দেখেচি ছেলেবেলায়। একটা গাছপালা নেই, বাড়িঘর তো নেই-ই, শুধু একটা বালির চড়া—জল থেকে তার উচ্চতা কোথাও হাত খানেকের বেশি নয়।

কিন্তু সে কি সুন্দর জায়গা! অতটুকু বালির চড়া বেষ্টন করে চারিধারে অকূল জলরাশি, জ্যোৎস্নালোকে দূরের তটরেখা মিলিয়ে গিয়েচে। আদিনাথ পাহাড়ও আর দেখা যায় না, সুতরাং আমার অনুভূতির কাছে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বুকে যে-কোনো জনহীন দ্বীপই বা কি, আর কক্সবজারের সমুদ্র-উপকূল থেকে মাত্র দু মাইল দূরের সোনাদিয়া দ্বীপই বা কি, আমাদের গ্রামের মাঠে বসে বৈকালে আকাশের দিকে চেয়ে মেঘস্তূপের মায়ায় রচিত তুষারমৌলী হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গ কি ত্রিশূল কতদিন প্রত্যক্ষ করিনি কি!

মনে কল্পনায় এই জগৎকে আমরা অহরহ সৃষ্টি করে চলেচি—আমরা নিজেরাই স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার—সে তেমনই সৃষ্টি করে।

বই লেখা, উপন্যাস লেখাই শুধু সৃষ্টি নয়। প্রতিদিনের ধ্যান ও স্বপ্ন আমাদের তার স্রষ্টা। প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা; যার যেমন কল্পনা, যার যেমন ধারণাশক্তি, যেমন চারপাশে মায়াজালের যে বুনুনি রচনা করে তাও সৃষ্টি। তারই বাহ্যপ্রকাশ হয় সঙ্গীতে, কথাশিল্পে, ছবিতে, নাটকে, কথাবার্ত্তার মধ্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে। কোন্ মানুষ স্রষ্টা নয়?

ঝিনুক ও কড়ি যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে আছে সারা চড়ার ওপরে। আর আছে এক ধরণের লাল কাঁকড়া। বালির মধ্যে এরা ছোট ছোট গর্ত্ত করে গর্ত্তের মুখে চুপ

করে বসে আছে, মানুষের পায়ের শব্দ পেলে তাড়াতাড়ি গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। বোধ হয় ঘণ্টাখানেক কেটে থাকবে—এমন সময় সাম্পানের মাঝি বললে—বাবু, শীগ্গির নৌকোয় উঠে বসুন—জোয়ার আসচে!

ওর গলায় ভয়ের সুর। বিস্মিত হয়ে বললুম—কেন, কি হয়েচে?

মাঝি বললে—সোনাদিয়া দ্বীপ জোয়ারের সময় ডুবে যায়—সাঁতার জানলেও অনেকে ডুবে মরেচে। একটু তাড়াতাড়ি করুন কর্ত্তা।

বলে কি! শেষকালে বেঘোরে ডুবে মরতে রাজি নই! একটু বেশি তাড়াতাড়ি করেই সাম্পানে উঠলুম। বড় বড় ঢেউ সোনাদিয়া চড়ায় আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলো—তার আগেই আমরা চড়া থেকে দূরে চলে এসেচি।

কিন্তু যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্চি, সেটা ঘটলো এর ঠিক পরেই—জোয়ারে ডুবে মরবার সম্ভাবনার চেয়ে সেটা কম বিপদ্জনক নয়।

খানিক দূরে এসে সমুদ্রের মধ্যে কুয়াশা নামলো। কোনোদিক দেখা যায় না, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র কুয়াশার বর্ণনা মনে পড়লো। কুয়াশা এমন ঘন যে অত বড় আদিনাথ পাহাড়টা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে পড়েচে।

মাঝে মাঝে সাম্পানের দাঁড় ফেলার সময় যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হচ্চে তার মধ্যে অসংখ্য জোনাকি পোকার মতো কি জ্বলে উঠচে—বসে বসে লক্ষ্য করচি অনেকক্ষণ থেকে। সমুদ্রের আলোকোৎক্ষেপী উর্ম্মিমালার কথা বইতেই পড়েছিলুম এর আগে, এইবার চোখে দেখলুম।

ঘণ্টাখানেক সাম্পান চলেচে—কূলের দেখা নেই।

মাঝি কখনো বলে, ওই সামনে ডাঙ্গা দেখা যাচ্চে—কখনো বলে, আদিনাথ পাহাড়ের দিকে গিয়ে পড়চি। আমার ভয় হল সে দিক ভুলে আদিনাথ পাহাড়ের দিকেই যাচ্চে—আদিনাথের নীচে সমুদ্রের মধ্যে দু'চারটি মগ্নশৈল থাকা অসম্ভব নয়; তাতে ধাক্কা মারলে সাম্পান চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে বেশি দেরি লাগবে না।

যদি বারসমুদ্রে পড়ি দিক ভুল হয়ে, তবে বিপদ আরও বেশি। একবার কাগজে পড়েছিলুম, সুন্দরবনের কি একটা জায়গা থেকে কয়েকটি লোক একখানা ডিঙি নৌকো করে কোন্ দ্বীপে কুমড়ো আনতে যায়। ফিরবার পথে তারা দিক ভুল করে বারসমুদ্রে গিয়ে পড়ে—সমুদ্রে কি করে নৌকো চালাতে হয় তাদের তা জানা ছিল না—এগারো দিন পরে ব্রহ্মদেশের উপকূলে যখন তাদের ডিঙি গিয়ে ভাসতে ভাসতে ভিড়লো তখন মাত্র একজন জীবিত আছে। এ সময় হঠাৎ সে কথাটাও মনে পড়লো।

মাঝিও যেন একটু বিপন্ন হয়ে পড়েচে। সে বললে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? সাম্পানে মশাল আছে, একটা ধরিয়ে নিই।

তাকে বললুম, মশাল কি হবে?

—মশাল জ্বালা দেখে অন্য নৌকো কি স্টীমার আমাদের পাবে। একটা বিপদ আছে বাবু, এই পথ দিয়ে বড় জাহাজ রেঙ্গুন কি মংডু থেকে চাটগাঁ যায়—কুয়াশার মধ্যে যদি ধাক্কা লাগে তবে তো সাম্পান ডুবে যাবে—আর একটা বিপদ বাবু, মাঝে মাঝে বয়া আছে সমুদ্রের মধ্যে, তাদের মাথায় আলো জ্বলে—যদি কুয়াশার মধ্যে আলো টের না পাই তবে বয়ার গায়েও ধাক্কা লাগতে পারে—

—ঠিক সেই কারণে তো আমাদের মশালও না দেখা যেতে পারে অন্য নৌকো বা স্টীমার থেকে?

মাঝি সে কথার কোনো উত্তর দিলে না। আমি দেশলাই বার করে মাঝির হাতে দিতে যাবো, এমন সময় কি একটা শব্দে চমকিত হয়ে বলে উঠলুম—কিসের শব্দ

মাঝি ?

মাঝির গলার সুর ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেচে—সে বলে উঠলো, বাবু, সাম্পানের কাঠ আঁকড়ে ধরুন জোর করে—সামনে পাহাড়—

একমুহূর্ত্তে বুঝে ফেললুম আমাদের সঙ্কটের গুরুত্ব। সামনে আদিনাথ পাহাড়, দিক ভুল করে মাঝি সাম্পান নিয়ে এসেচে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে—কিছুই চোখে দেখা যায় না, শুধু সাগরের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ানোর শব্দে বোঝা যায় যে পাহাড় নিকটবর্ত্তী। কিন্তু আরও দশ মিনিট কেটে গেল। পাহাড়ের গায়ে ঢেউয়ের শব্দ তখনও সামনের দিকে, কিন্তু সাম্পান যেন সে শব্দকে ছাড়িয়ে আরও উত্তরে চলে যাচ্ছে।

ব্যাপার কি! মাঝিও কিছু বলতে পারে না।

হঠাৎ আমার মনে হল ঠিক সামনেই কাউখালি নদী সমুদ্রে পড়চে ; কুয়াশা তখনও খুব ঘন, এসব কুয়াশা ক্রমে ক্রমে পাতলা হয় না, অতর্কিতে এক মুহূর্ত্তে চলে যাবে। আমি মাঝিকে বললুম—মাঝি, নদীর মোহানা সামনে—

মাঝি বললে—বাবু, ও কাউখালি নয়, আদিনাথের ঝরনা, কুয়াশার মধ্যে ওই রকম দেখাচ্ছে, আমরা উত্তর দিকে যাচ্চি ভেসে। এ জায়গাটা আরও ভয়ানক—

মাঝি আমাকে যাই বলুক, ভয়ের চেয়ে একধরনের অদ্ভুত আনন্দই বেশি করে দেখা দিয়েচে মনে। সমুদ্রে দিক্‌হারা হয়ে সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়বো এ তো বাল্যকালের স্বপ্ন ছিল : নাই বা হল খুব বেশি দূর- মাত্র চট্টগ্রামের উপকূল—সমুদ্র, সব জায়গাতেই সমুদ্র, মাথার ওপরকার আকাশ সব জায়গাতেই নীল, কল্পনা সর্ব্বত্রই নীল, কল্পনা সর্ব্বত্রই মনে আনে নেশার ঘোর। কিন্তু আমার অদৃষ্টে বেশি ঘটলো না। আদিনাথের নীচে কয়েকখানা জেলেডিঙি বাঁধা, আমাদের সাম্পানের আলো দেখতে পেয়েছিল। তাদের লোক মঝিকে ডাক দিয়ে কি বললে, সেখানে অতি সহজেই আমাদের নৌকো ভিড়লো।

আরও আধ ঘণ্টা পরে কুয়াশা কেটে গেল। সেই জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষে সাম্পান ছেড়ে আমরা এসে পৌঁছলুম কাউখালি মোহানায়। দূরের সমুদ্র স্থির নিস্তরঙ্গ, তটভূমির ঝাউয়ের সারির মধ্যে নৈশ বাতাসের মর্ম্মরধ্বনি : বড় বড় ঢেউ যখন এসে ডাঙায় আছড়ে পড়চে, তখন তাদের মাথায় যেন অসংখ্য জোনাকি জ্বলচে।

কক্সবাজার থেকে গেলুম মংডু।

'নীলা' বলে একখানা ছোট স্টীমার চাটগাঁ থেকে কক্সবাজারে আসে, সেখানা প্রতি শুক্রবারে তখন মংডু পর্য্যন্ত যেতো। শুঁটকি মাছ স্টীমারের খোলে বোঝাই না থাকলে এ সব ছোট জাহাজের ডেকে যাওয়া অত্যন্ত আনন্দদায়ক। উপকূল আঁকড়ে জাহাজ চলে, সুতরাং একদিকে সব সময়েই সবুজ বনশ্রেণী, মেঘমালা, জেলেডিঙির সারি, কাঠের বাড়ি, বৌদ্ধমন্দির, মাঝে মাঝে ছোট নদীর মুখ, কখনো রৌদ্র কখনো মেঘের ছায়া—যেন মনে হয় সব মিলিয়ে সুন্দর একখানি ছবি।

কিছুদূর গিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কিসের কারখানা আছে, চর থেকে কলের চিমনির ধোঁয়া উড়চে দেখা যায়। স্টীমারের লোকে বললে—করাতের কল, বনের কাঠ চিরে ওখান থেকে জাহাজে বিদেশে রওনা করা হয়।

বিকেলে মংডুতে স্টীমার ভিড়লো। মংডু একেবারে ব্রহ্মদেশ। সেখানে পা দিয়েই মনে হল বাংলাদেশ ছাড়িয়ে এসেচি। বর্ম্মী মেয়েরা মোটা মোটা এক হাত লম্বা চুরুট মুখে দিয়ে জল আনতে যাচ্চে, টকটকে লাল রেশমী লুঙি পরা যুবকেরা

সাইকেলে চড়ে সতেজে চলাফেরা করচে, পথের ধারে এক এক জায়গায় ছোট ছোট চালা-ঘর, সেখানে পথিকদের জলপানের জন্যে এক কলসী করে জল রাখা আছে।

এখানে একটি ব্রহ্মদেশীয় পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে যায় খুব অদ্ভুত ভাবে। একদিন মংডুর পুরনো পোস্টাপিসের পেছনের রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের ধারে যাচ্চি, একটি বৃদ্ধ চাটগাঁয়ে মুসলমান মাল্লা আমায় বললে, বাবু, আমায় মেহেরবানি করে একটা কাজ করে দেবেন, একখানা দরখাস্ত লিখে দেবেন ইংরিজিতে?

তারপর আমাকে সে একটি টিনের বাংলো ঘরে নিয়ে গেল। বাংলোর ভেতরটাতে কারা আছে তখন জানতুম না, বাইরের একসারি ছোট ঘরে অনেকগুলো জাহাজী মাল্লা বাসা করে আছে বলে মনে হল। আমার হাতে তখন পয়সার সচ্ছলতা নেই, দরখাস্ত লিখতে ওরা আট আনা পারিশ্রমিক দিলে, আমিও তা নিয়েছিলাম।

দরখাস্ত লিখে চলে আসচি, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধ মাল্লাটি বললে, বাবু, ওই বর্ম্মী সাহেব আপনাকে ডাকচে, ভেতরের ঘরে থাকে ওরা।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। অপরিচিত স্থানে যেতে মন সরল না, কি জানি কার মনে কি আছে! কিছুক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধ বর্ম্মী ভদ্রলোক আমায় হাসিমুখে বাঁকা চাটগাঁয়ের বুলিতে বললেন—আসুন বাবু, আপনাকে একটু দরকার আছে।

যে ঘরে তিনি আমায় নিয়ে গেলেন, সে ঘরে তিন-চারটি সুবেশা তরুণী বসে ছিলেন, সকলেই দেখতে বেশ সুশ্রী। প্রত্যেকের সামনে একটা ছোট বাটি, তাতে সাদা মতো কি গুঁড়ো, একটু ঢুকেই চোখে পড়লো; ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলে আমি আর ওঁদের দিকে চাইনি। ভদ্রলোক আমায় বাংলায় বললেন—একটু চা খাবেন? আমার বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটেনি, আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই মেয়েরা ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ বল্লেন, আপনাকে ডেকেচি কেন বলি। আমি কাঠের ব্যবসা করি, বাজারে আমার কাঠের আড়ৎ আছে। একজন বাঙালী বাবু আমার আড়তে ইংরিজি চিঠিপত্র লিখতো আর আমার মেয়ে-তিনটিকে ইংরিজি পড়াতো, সে চলে গিয়েচে আজ দু-মাস। আর আসে না, চিঠি লিখলে জবাব দেয় না, অথচ আমার জরুরী চিঠি দু-তিনখানার উত্তর না দিলে নয়। আপনি মোবারক খালাসির দরখাস্ত লিখছিলেন শুনে আপনাকে ডাকলুম। যদি দয়া করে লিখে দেন, আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক যা হয় আমি দেবো।

আমি আনন্দের সঙ্গে রাজি হলুম। আমি যে কদিন এখানে থাকবো, তিনি আমায় দিয়ে তাঁর চিঠি লিখিয়ে নিতে পারেন। যা ইচ্ছে হয় দেবেন, সে বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য নেই।

একটু পরে ওঁর মেয়েরা চা নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে মেয়েদের আলাপ করিয়ে দিলেন, সকলেই বাংলা বলতে পারেন বটে কিন্তু তাঁদের বাংলা বোঝা আমার পক্ষে বড় কষ্টকর হয়ে উঠছিল প্রতিবার। কথাটা তাঁদের বিনীত ভাবে বুঝিয়ে বললুম। আমার বাড়ি কলকাতায়, চট্টগ্রামের ভাষা ভাল বুঝি না, তার ওপরে বিকৃত চট্টগ্রামের বুলি তো আমার পক্ষে একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। ইংরিজিতে যদি বলেন তবে আমার সুবিধে হয়।

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে কথাগুলি বললুম বটে, কিন্তু মেয়েদের উদ্দেশ করে। মেয়েরা আমার বাংলা বোঝেন না, তাঁদের বাবা বর্ম্মিজ ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন আমার বক্তব্য।

আমি বাটিতে সাদা গুঁড়ো দেখিয়ে বললুম—ওটা কি কোনো খাবার জিনিস?

মেয়েরা ভদ্রতার খাতিরে অতি কষ্টে হাসি চেপে গেলেন, বুঝলুম তাঁদের পর-

স্পরের মধ্যে কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় হল।

বড় মেয়েটি বললেন—ওটা তানাখা, চন্দনকাঠের পাউডার, মুখে মাখে।

গম্ভীর ভাবে বললুম—ও!

মেয়েটি আমায় বললেন, তাঁরা ইংরিজি কথা বলতে পারেন না। বাঙালী বাবুরা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ, এমন একটি ইংরিজিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তির সামনে তাঁরা তাঁদের বাজে ইংরিজির নমুনা বার করতে পারবেন না, ভারি লজ্জা করবে।

ওঁদের বাবা বললেন—আপনি এখানে ক'দিন থাকবেন?

–দিন পনেরো বোধহয় আছি।

—দয়া করে রোজ সন্ধ্যেবেলা আমার এখানে আসুন না কেন? এখানে চা খাবেন আর আমার মেয়েদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথাবার্ত্তা কইবেন। ওদের শেখা হয়ে যাবে। আপনাকে দিয়ে আমার আড়তের চিঠিপত্রও তা হলে লিখিয়ে নেবো। এক টাকা করে পাবেন এজন্যে—কি বলেন? আমি আসতে রাজি হলুম। এক টাকাই দেবেন, আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে দু-ঘণ্টার বেশি আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হবে না, কারণ আমার নিজের আপিসের কাজও রাত্রে আমায় করতে হবে।

একদিন খুব বৃষ্টি হল।

আমি সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখি চট্টগ্রামবাসী সুকবি ও সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ ধর সেখানে আপন মনে এক জায়গায় চুপ করে বসে। সুরেনবাবু আমার বিশেষ বন্ধু, এবার চট্টগ্রামে যে কদিন ছিলাম, কর্ণফুলির ধারে একসঙ্গে মাঝে মাঝে দুজনে বেড়াতুম।

সুরেন ধর খামখেয়ালী ও ভবঘুরে ধরনের লোক। বললেন—চলো হে আমার সঙ্গে, কাল বন বেড়াতে যাই—

আমারও খুব উৎসাহ, বললুম—বেশ চলুন, কোন্ দিকে যাবেন?

–আরাকান ইয়োমা রেঞ্জ, যেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, ওইদিকে নিবিড় টিক-উড ফরেস্ট। চলো ওদিকে যাবো—

সুরেনবাবুর জীবনে পায়ে হেঁটে এরকম বেড়ানো অভ্যেস অনেকদিন থেকেই আছে জানি, তাঁর কথায় তখনি সম্মতি দিলুম—বললুম—এখানে কবে এলেন?

—এখানে আমার এক বন্ধু আছেন ডাক্তার, তাঁর ওখানে বেড়াতে এসেছিলুম, প্রায় দশ দিন আছি। শরীরটা ভালো ছিল না, এখন একটু সেরেচে। যদি বেরুতে হয়, এইবার—এই হপ্তার মধ্যেই।

আমি সন্ধ্যেবেলা বর্ম্মী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে বেড়াতে যাওয়ার কথা বলতে তিনি আমায় অনেক ভয় দেখালেন। আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতশ্রেণী বন্যজন্তু-সঙ্কুল, দুষ্প্রবেশ্য ও প্রায় জনহীন। তা ছাড়া সামনে যে পর্ব্বত দেখা যায়, ওটা আসল রেঞ্জ নয়, ওর ত্রিশ-বত্রিশ মাইল পেছনে যে ধোঁয়ার মতো পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে, ওখানে তাঁদের ফরেস্ট ইজারা করা আছে, কার্য্যোপলক্ষে অনেকবার তিনি সেখানে গিয়েচেন, অত্যন্ত দুর্গম জায়গা। দুজন মাত্র লোকের পক্ষে সেখানে যাওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। ভদ্রলেকের নাম মৌংপে। কাঠের ব্যবসা করে দু'পয়সা করেচেন, তা তাঁর বাড়ির আসবাবপত্র দেখেই বোঝা যায়।

মৌংপে বললেন—আমার এই বড় মেয়েটি আমার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিল—

আমি বিস্ময়ের সুরে বললুম—গাড়ি যায় নাকি সেখানে? কিসে গেলেন?

—হাতীর পিঠে। কাঠ বয়ে আনবার জন্যে আমাদের হাতী আছে জঙ্গলে, আমার

নিজের ছ'টা হাতী আছে—আপনাকে হাতীর সুবিধে করে দিতে পারি, কিন্তু নদী পেরিয়ে সে সব হাতী এদিকে তো আসে না। চিঠি লিখে আনাতে গেলে পনেরো দিন দেরি হয়ে যাবে।

মোংপের বড় মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। লেখাপড়ায় আগ্রহ তারই বেশি। প্রাকৃতিক দৃশ্য বলে যে একটা জিনিস আছে—মংডু শহরের মধ্যে সে-ই একমাত্র বর্ম্মী মেয়ে যে এ খবর রাখে।

তার বাবা উঠে গেলে সে আমায় বললে—আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

—বেশি দিন না। দশ-বারো দিন যদি থাকি খুব বেশি।

—তবে আপনি আরাকান ইয়োমা দেখবার আশা ছাড়ুন—পায়ে হেঁটে যাবেন বলচেন, তাতে এক মাসের মধ্যে ওখান থেকে ফিরতে পারবেন না। আমি আপনাকে আর একটা পথ বলে দিই—একটা রাস্তা আছে, দেবাং আর আরাকান ইয়োমার মাঝখান দিয়ে চীনদেশ পর্য্যন্ত গিয়েচে—এ পথে গভর্নমেণ্টের ডাক যায় মংডু থেকে। আপনি মেলভ্যানে সিংজু পর্য্যন্ত যান, সেখান থেকে হেঁটে যাবেন—আমি বন্দোবস্ত করে দিতে পারবো। কিন্তু দুজন লোক নেবে না মেলভ্যানে।

আমি বললুম, তাহলে আমারও যাওয়া হবে না, কারণ বন্ধুকে ফেলে তো যেতে পারিনে!

মেয়েটি বড় ভালো। ওর এক মামা ডাক-বিভাগে কাজ করেন, তাঁকে দিয়ে সে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা মেলভ্যানে নিতে রাজী হল না দুজনকে।

সুরেনবাবু পিছিয়ে গেলেন। তিনি এগার টাকা ভাড়া দিয়ে মেলভ্যানে যেতে রাজী নন। হেঁটে যতদূর হয় যেতে পারেন।

এর কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রবাবু মংডু থেকে চলে গেলেন এবং আমি একা মেলভ্যানে সিংজু রওনা হলুম।

মংডু ছাড়িয়ে প্রথম পঞ্চাশ-ষাট মাইল যেতে যেতে মনে হয় বাংলাদেশের নোয়াখালি বা ময়মনসিং জেলার ধানক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলেচি। এমন কি আম-কাঁঠালের বাগানও চোখে পড়ে। তার পর নিবিড় জঙ্গল, আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতশ্রেণীর বহু নীচু শাখা-প্রশাখা পথের দুপাশে দেখা যেতে থাকে।

ছোটবড় গ্রাম সর্ব্বত্র, নিবিড় বন কোথাও নেই, মাঝে মাঝে ঝোপঝাপ ও সেগুন গাছের সাজানো বাগান। বৌদ্ধমন্দির প্রত্যেক গ্রামেই আছে, আর আছে ছোটখাটো দোকানপশারওয়ালা বাজার। দু'তিনটি চা-বাগানও পথে পড়ে।

সিংজু পৌঁছে গেল প্রায় সন্ধ্যার সময়। ডাকগাড়ির চালক হিন্দুস্থানী, তার সঙ্গে ইতিমধ্যে খুব ভাব করে নিয়েছিলুম, রাত্রে তার তৈরী মোটা-হাতে-গড়া-রুটি খেয়ে তার ঘরেই শুয়ে রইলুম।

পরদিন সে বললে—চলুন বাবুজি, এখান থেকে মেলপিওন ডাকব্যাগ নিয়ে জঙ্গলের পথে অনেকদূর যাবে, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, তার সঙ্গে যাবেন।

সকাল আটটার সময় সিংজু থেকে বার হয়ে আকিয়াব-গামী বড় রাস্তায় পড়লুম। এখান থেকে আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতের উচ্চ অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্ব্বতমালা সমুদ্রোপকূলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আকিয়াব থেকে প্রায় রেঙ্গুন পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সিতাং এ অঞ্চলের একটি বড় নদী, এই নদীর শাখাপ্রশাখা অনেকবার পার হতে হয়, আকিয়াব রোডের ওপর অনেকগুলি সেতু আছে, এই নদীর বিভিন্ন শাখার

ওপরে।

এদিকে আরণ্য-প্রকৃতির রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এক এক গাছের গ‌ুঁড়ির গায়ে এত ধরনের পরগাছার জঙ্গল আর কোথাও কখনও দেখিনি। অনেক পরগাছে অদ্ভুত রঙিন ফ‌ুল ফ‌ুটে আছে। মাঝে মাঝে পার্ব্বত্য ঝরনা, বড় বড় ট্রিফার্ন, এ বনের চেহারা আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত! এ ধরনের বন বাংলাদেশের কুত্রাপি দেখিনি, কিন্তু বহ‌ুদিন পরে আসাম অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে শিলং থেকে সিলেট যাওয়ার মোটর রোডের দ‌ুধারে, বিশেষ করে ডাউকি প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চলে, অবিকল অরণ্যের এই প্রকৃতি আমার চোখে পড়েচে।

বাংলাদেশের পরিচিত কোনো আগাছা, যেমন শেওড়া, ভাঁটা, কাল-কাস‌ুন্দে প্রভৃতি এদিকে একেবারেই নেই। এদিকে উদ্ভিজ্জসংস্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তাতেই বোধ হয় যা দেখি তাই যেন ছবির মত মনে জাগায় অপ‌ূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অন‌ুভূতি। সর্ব্বত্র অসংখ্য সব‌ুজ বনটিয়ার ঝাঁক। বড় বড় বেত-ঝোপ। কাঁটাবনের নিবিড় জঙ্গল মাঝে মাঝে।

এই পথে প্রথম রবারের বাগান দেখি।

আগে রবারের বাগান বলে ব‌ুঝতে পারিনি, বড় বড় গাছ, অনেকটা কাঁটাল পাতার মতো পাতা। গাছের গায়ে নম্বর মারা—কোনো কোনো বাগান কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, কোনো কোনো বাগান বেষ্টনীশ‌ূন্য ও অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে– শ‌ুনেছিলাম অনেক বাগান পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

এক জায়গায় ডাকপিয়াদার থাকবার জন্যে বনের মধ্যে ছোট খড়ের ঘর।

আমার সঙ্গে যে পিয়াদা এসেছিল, সে এর বেশি আর যাবে না। রাত্রে আমরা সেই খড়ের ঘরেই রইল‌ুম, সকালে অন্যদিকের পিওন এসে এর কাছ থেকে ডাকব্যাগ নিয়ে যাবে, এ পিয়াদা ওর ব্যাগ নিয়ে চলে আসবে সিংজ‌ুতে।

আমরা যখন সে ঘরে পেঁাছ‌ুলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে।

ডাকপিয়াদার ঘরে যাপিত সেই রাত্রিটি আমার জীবনে মনে করে রাখবার মতো। দ‌ুধারে আরাকন ইয়োমার উন্নতকায় শাখা-প্রশাখা, সারা পর্ব্বত-সান‌ু নিবিড় অরণ্যময়। অরণ্যের সান্ধ্য স্তব্ধতা ভঙ্গ করচে পার্ব্বত্য ঝরনার কুলকুল শব্দ, অন্ধকার বনের দিক থেকে কত কি পাখীর ডাক আসচে ; যদিও স্থানটির মাইলখানেকের মধ্যে খ‌ুব বড় একটা রবারের বাগান, তব‌ুও সন্ধ্যায় যেন মনে হচ্ছিল প‌ৃথিবীর প্রান্তসীমায় এসে পড়েচি দ‌ুজনে, জনমান‌ুষ নেই ব‌ুঝি এর কোনো দিকে।

বেশি রাত্রে ডাকপিয়াদা এসে পেঁাছ‌ুলো।

নবাগত ডাকপিয়াদার নাম কাচিন, একট‌ু একট‌ু ইংরিজি জানে ; লোকটির চেহারা এমন কর্কশ ও র‌ুক্ষ যে পথে-ঘাটে দেখলে ডাকাত বলে ভুল হবার কথা। তার সঙ্গে সারাদিন কাটাতে হবে বলে প্রথমটা ইতস্তত করেছিলাম, শেষ পর্য্যন্ত সকালবেলা তার সঙ্গেই নতুন পথে পা দিলাম।

এবার পথ নিবিড় অরণ্যময়।

আমরা ক্রমশ এক মহারণ্যে প্রবেশ করল‌ুম। দ‌ুধার বড় বড় বনস্পতিতে সমাচ্ছন্ন। মান‌ুষ নেই, জন নেই, গ‌ৃহ নেই, পল্লী নেই, মাঠ নেই, একট‌ুকু ফাঁকা স্থান নেই। কেবল নিবিড় জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে আকিয়াব থেকে প্রোমে যাবার রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেচে।

ছোটবড় নানা রকমের গাছ, শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করে যেন এ ওর গায়ে এলোমেলো ভাবে পড়ে। বড় গাছগ‌ুলির মাথা যেন আকাশ ছ‌ুঁয়ে আছে—এক একটা

গাছ প্রায় দেড়শো ফুট উঁচু। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম এমনটি কোথাও দেখেচি বলে মনে হল না।

প্রকৃতি এখানে যেন ভৈরবীর বেশে দর্শকের মনে ভীতি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে দেয়।

সম্মুখে একটি নদী। পাহাড়ী নদী, বালুময় চড়া, ক্ষীণ নদীস্রোত উপলরাশির ওপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইচে, নদীর এপারে ওপারে সুবিশাল অরণ্য, স্তরে স্তরে ক্রমোন্নত বৃক্ষশ্রেণী। বৃক্ষশ্রেণীর পিছনে সুদূরবিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী, তাও স্তরে স্তরে সাজানো।

নদী হেঁটে পার হওয়া গেল—হাঁটু পর্য্যন্ত জল, তার তীক্ষ্ম প্রস্তরখণ্ডে পা কেটে যেতে পারে বলে আমরা একটু সাবধানে জল পার হই। আবার ঢুকে পড়ি বনের মধ্যে, বেলা প্রায় দশটা, কিন্তু শাখা-প্রশাখার এমন নিবিড় জড়াজড়ি মাথার ওপরে যে, অত বেলাতেও সূর্য্যের আলো ঢোকেনি বনের পথে।

এইবার প্রোম রোড পাহাড়ের ওপর উঠেচে। খুব বড় বড় ঘাস, হোগলা বা নল-জাতীয়, তার মধ্যে দিয়ে পায়ে চলার পথের মতো সরু রাস্তা—মাঝে মাঝে আবার খুব চওড়া হয়ে এসেছে।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা বললে—খুব সাবধানো চলো, এখানে বুনো হাতীর ভয় খুব।

ওরই মুখে শুনলুম এই বনের মধ্যে গভর্নমেণ্টের হাতী-খেদা আছে : বছরে অনেক হাতী নাগা পাহাড়ের লিদু উপত্যকা থেকে এখানে আসে ব্রহ্ম ও আসাম সীমান্তের পাহাড়শ্রেণী ডিঙিয়ে—হাতীর নাকি অগম্য স্থান নেই, কোনো উঁচু পাহাড়ই তার পথ রোধ করতে পারে না।

এখান থেকে পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে বনের মধ্যে পেট্রলের খনি আছে, ওরই মুখে শুনলুম। আকিয়াব-প্রোম রোড থেকে তারা রাস্তা বের করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খনিতে নিয়ে যাবার চেষ্টা করচে।

আমি ওকে বললুম—হাতীর কথা তো শুনচি, কিন্তু এ বনে বাঘ থাকা তো বিশেষ আশ্চর্য্যের ব্যাপার নয়—তুমি কি বল?

সে বললে, বাঘের ভয় এখন নয়, সন্ধ্যার পরে। তার আগে আমরা আশ্রয় পাবো। হাতী দিনের আলো মানে না।

বেলা চারটে বাজতে না বাজতে সে বনে সন্ধ্যা হয়ে এল। দুপুর থেকে চারটের মধ্যে আমরা কিন্তু খুব বেশি পথ অতিক্রম করিনি, বড় জোর আট মাইল, সকাল থেকে এ পর্যন্ত পনেরো মাইলের বেশি আসিনি।

খুব সতর্ক হয়ে চলতে হয় বলে বনের মধ্যে পথ মোটে এগোয় না।

পাঁচটার সময় রীতিমত অন্ধকার নামলো। আমাদের খড়ের ঘর এখনও কত-দূরে তার ঠিকানা নেই, অথচ ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আমার সঙ্গী বলচে সামনেই ঘর।

এ পথে ডাকপিয়াদা সশস্ত্র চলে তাই কতকটা রক্ষে। আমার সঙ্গী দেখতে বেঁটে-খাটো লোকটি, কিন্তু তার দেহ যেন ইস্পাতে তৈরী, যেমন নির্ভীক, তেমনি আমুদে। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কত রকমের হাসির গল্প করতে করতে আসচে সারাপথ।

বনের মধ্যে যখন পথ দেখা যায় না, তখন আশ্রয় মিললো।

নিবিড় বনপর্ব্বতের মধ্যে খড়ের ঘর। এত বড় নির্জ্জন বনের মধ্যে আমরা মোটে

দুটি প্রাণী।

রাত্রে রান্না হল শুধু ভাত। অন্য কোনো উপকরণ নেই, নুন পর্য্যন্ত না, এদেশের লোকের দেখলুম নুন না হলেও চলে। এর আগেও অনেকবার দেখেচি, নুনকে এরা রন্ধনের একটা অত্যাবশ্যক উপকরণ বলে আদৌ মনে করে না। সমস্ত দিন পথ হাঁটার পর শুধু ভাতই অমৃতের মতো লাগলো আমাদের মুখে।

বিছানায় শুয়ে পড়বার আগে আমি একবার বাইরে গিয়ে অরণ্যানীর নৈশরূপ দেখতে চাইলুম, ডাকপিয়াদা আমাকে বাইরে যেতে বারণ করলে।

তারপর সে একটা গল্প বললে।

মান্দালে থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে কোথায় গভর্নমেণ্টের রিজার্ভ ফরেস্ট আছে। সেখানে একজন নতুন ফরেস্ট রেঞ্জার এসে একবার ডাকবাংলোয় উঠলো। ডাকবাংলোটির চারিধারে নিবিড় বন, সঙ্গের কুলিরা বলে দিলে সন্ধ্যা হলেই সাহেব যেন আর বাইরে না থাকে, ডাকবাংলোর দরজা-জানালা ভালো করে বন্ধ করে দেয়, আর বেশ ভালো করে রোদ উঠবার আগে যেন দরজা খুলে বারান্দাতে না আসে।

রেঞ্জার ছিল মাদ্রাজী মুসলমান, খুব সাহসী, ত্রিশের মধ্যে বয়স। সন্ধ্যা হবার একটু আগেই সে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলো। কিছুক্ষণ পরেই তার মনে পড়লো তামাক খাওয়ার পাইপটা বারান্দায় টেবিলে ফেলে রেখে এসেচে। তখনও ভালো করে অন্ধকার হয়নি—সাহেবের সঙ্গে যে আরদালি ছিল সেও এ সব অঞ্চলে নতুন লোক। আরদালি ভাবলে চট করে দরজা খুলে পাইপটা নিয়ে আসবে। বাইরে গেল কিন্তু সে ফিরলো না ; তার দেরি হতে দেখে সাহেব বারান্দায় গিয়ে কোনো-দিকে আরদালির চিহ্ন দেখতে পেলে না। বাংলোর বাইরে কিছু দূরে কুলিদের থাকবার ঘরে আট-দশজন কুলি ছিল, সাহেবের চীৎকারে তারা মশাল জ্বালিয়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে এসে জড় হল। বারান্দার ও-প্রান্তে দেখা গেল বাঘের পায়ের থাবার দাগ। পরদিন দূর বনের মধ্যে হতভাগ্য আরদালির দেহাবশেষ পাওয়া যায়। এ ধরনের গল্প আমি কিন্তু এর আগে সুন্দরবন সম্বন্ধে শুনেছিলুম। সুতরাং এ গল্পে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে বনের মধ্যে খড়ের ঘরের কোণে শুয়ে মন্দ লাগে না শুনতে এ ধরনের কাহিনী।

আমি ওকে বললুম—তুমি ইংরিজি শিখলে কোথায় ?

ডাকপিয়াদা বললে—প্রোমের মিশনারী স্কুলে।

—তোমার বাড়িতে কে কে আছে ?

—কেউ নেই, আজ দশ বছর হল মা মারা গিয়েচেন, তারপর বাড়িও নেই। ডাক-পেয়াদার কাজ করি, সিংজুতে বাসা নিয়ে থাকি।

লোকটাকে বেশ লাগলো। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে ওর সঙ্গে গল্প করলুম। ওর ইচ্ছে বিয়ে করে, কিন্তু সামান্য মাইনে পায় বলে সাহসে কুলোয় না।

আমি বললুম—কেন, তোমাদের দেশে তো তোমার চেয়ে অনেক কম মাইনে পেয়েও লোকে বিয়ে করচে ? মংডুতে তো সামান্য ফিরিওয়ালাকে সস্ত্রীক জিনিস ফিরি করতে দেখেচি ?

—বাবু, ওরা লেখাপড়া জানে না তাই অমনি করে। আমি ইংরিজি স্কুলে তিন-চার বছর পড়ে তো আর ওদের মতো ব্যবহার করতে পারিনে!

আরও জিজ্ঞেস করে জানলুম ওখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব। মেয়েটি সিংজুতে চুরুটের কারখানায় কাজ করে, সপ্তাহে দু টাকা করে মাইনে পায়।

আমি বললুম—সে কি বলে ?

—সে বলে বিয়ে করো। আমি সাহস পাইনে কিন্তু, কোথায় রাখবো, কি খেতে দেবো। এই তো সামান্য মাইনে।

—ওর বাপ-মা নেই?

—কেউ নেই, আমারই মতো অবস্থা।

ডাকপিয়াদা আসলে বড় প্রেমিক, যেমন তার প্রণয়িনীর কথা উঠলো, সে আর অন্য কথা বলে না প্রণয়িনীর কথা ছাড়া। মেয়েটি নাকি বড় ভালো, তাকে খুব ভালোবাসে, চুরুটের কারখানায় কাজ করে যা পায়, নিজের খাওয়া পরা বাদে সব জমিয়ে রাখে ওদের ভবিষ্যৎ সংসারের জন্যে, একটি পয়সা বাজে খরচ করে না।

অত বড় বনের মধ্যে কিন্তু রাত্রে কোনো রকম শব্দ শুনলাম না বন্যজন্তুদের। একটি শেয়াল পর্য্যন্ত ডাকলো না। খানিক রাত্রে দুজনেই ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে এদিকের ডাকপিয়াদা এল। ঠিক করাই ছিল যে আমি তার সঙ্গে মোংকেট পর্য্যন্ত উনিশ মাইল পথ হেঁটে যাবো।

কিন্তু আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা কথায় কথায় রাত্রেই আমায় বলেছিল যে, পাহাড় জঙ্গলের পথ এখানে শেষ হয়ে গেল, এরপর আর বেশি জঙ্গল নেই, কেবল পড়বে রবারের বাগান আর ধানক্ষেত। আবার জঙ্গল আছে মান্দালে ছাড়িয়ে গোয়েটেক্ সেতু পার হয়ে উত্তর-পূর্ব্ব ব্রহ্মসীমান্তে। সেদিকের বন অত্যন্ত নিবিড়, সে পথ অনেক বেশি দুর্গম।

আমি ডাকপিয়াদাকে বললুম, এই নতুন লোকটিকে জিজ্ঞেস করো তো কতদূর আর জঙ্গল পড়বে ; ততদূর ওর সঙ্গে যাবো—

নবাগত ডাকপিয়াদা খাস বর্ম্মিজ ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না, ওর সঙ্গে কথা বলা সম্ভব নয় আমার। আমার পূর্ব্ব সাথী বললে—বাবু, ও বলছে সাত মাইল পর্য্যন্ত এই রকম জঙ্গল আর পাহাড়, তারপরে আবার বর্ম্মা রবার কোম্পানির বড় একটা বাগান পড়বে দু'তিন মাইল, তারপরে ধানের ক্ষেত আর বস্তি।

এই সাত মাইল আমি ওর সঙ্গে গেলুম।

প্রভাতের সূর্য্যালোক বনের ডালে ডালে বাঁকা ভাবে পড়েছে, কারণ পাহাড়ের পূর্ব্ব দিকের অংশটা খুব নীচু।

অনেক রকমের বন্যপুষ্পের মধ্যে সাদা সাদা কি এক ধরনের ফুল ছোট-বড় সব গাছের মাথা ছেয়ে রেখেচে ; কোনো লতার ফুল হবে, কিন্তু লতা আমার চোখে পড়লো না। খুব ঘন সুগন্ধ সে ফুলের, যে যে গাছের মাথায় সে ফুলের মেলা, তার তলা দিয়ে যাবার সময় উগ্র সুবাসে মাথার মধ্যে যেন ঝিম ঝিম করে, আমি ইচ্ছে করে খানিকটা দাঁড়িয়ে থেকে দেখেচি, মনে হয় যেন শরীর টলচে।

একটি জায়গায় সৌন্দর্য্যের ছবি মনে গভীর দাগ কেটে রেখে গিয়েচে।

পথের ধারে একটি পাহাড়ী নদী, মাথার ওপর সেখানে আকাশ দেখা যায় না, বড় বড় বনস্পতিদের শাখাপ্রশাখার মেলা, মোটা লতা ঝুলে জলের ওপর পর্য্যন্ত পৌঁছেচে, বাঁদিকের বন এত ঘন যে কালো-মত দেখাচ্চে, ডানদিকে জলের ওপরে শিলাখণ্ডের অগ্রভাগ জেগে আছে।

রাস্তাটা ওপার থেকে এসেচে টেরচা ভাবে, বনের মধ্যে ঘুরে ফিরে নদীর ধারে এসে যেন হঠাৎ খানিকটা ঢালু হয়ে নেমে নদীগর্ভে ঢুকেচে। সেই দিকটা এপার থেকে দেখাচ্চে যেন চীনা চিত্রকরের হাতে আঁকা ছবির মতো। একটা শিলাখণ্ডের ওপর বসে সেই দৃশ্য কতক্ষণ উপভোগ করলুম একমনে, আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা এখানে জলে স্নান করতে নামলো।

নদী চওড়া হবে হাত-কুড়ি কি বাইশ! হেঁটে পার হতে হয় অবিশ্যি, হাঁটু-জলের বেশি নেই কোথাও। আমরা যখন বসে, তখন ওপার থেকে পাঁচ-ছ'জন লোক একজন সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মদেশীয় মহিলাকে সিডান চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে এসে জলে নামলো।

আমার সঙ্গী ডাকপিয়াদা সিডান চেয়ার কখনো দেখেনি, হাঁ করে চেয়ে রইল। শুনলুম এদেশে এ জিনিসের প্রচলন নেই, রবার-বাগানওয়ালা ধনী লোকেরা চীন ও মালয় উপদ্বীপ থেকে এর আমদানি করেচে।

মহিলাটি যখন জল পার হলেন চেয়ারে বসে, তখন লক্ষ্য করলুম সাধারণ বর্ম্মিজ মেয়ের তুলনায় তিনি অনেক বেশি সুন্দরী। এমন কি আমার মনে হল, গায়ের রং বর্ম্মিজদের মতো নয়, গোলাপী আভা ধপধপে সাদার ওপর।

আমার সংগী জলে নেমে স্নান করছিল, সে তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়লো।

এধারে এসে সিডান চেয়ারের বাহকেরা চেয়ার নামিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে। মহিলাটি এবার কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন। আমিও চেয়ে দেখলুম বেশ সুন্দর মুখশ্রী।

পরে সিংজুতে জিজ্ঞেস করে আমি জেনেছিলুম তিনি বর্ম্মিজ নন, সান্ দেশীয় মেয়ে। সান্ মহিলারা সাধারণত ব্রহ্মদেশীয় মেয়েদের চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী। মহিলাটি জনৈক ইউরোপীয় রবার-বাগানের মালিকের বিবাহিতা পত্নী, অনেক টাকার মালিক ওঁর স্বামী।

ওঁরা প্রায় আধঘণ্টা খেয়াঘাটে বসে রইলেন, আমার সংগী ডাকপিয়াদা আরও দূরে গাছপালার আড়ালে গিয়ে স্নান সেরে এল।

সেদিনই ওখান থেকে সিংজুর দিকে ফিরলাম।

আবার সেই বনানী, আগের দিনের সেই খড়ের ঘরে রাত্রিযাপন।

মংডুতে ফিরে মিঃ মোংপের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম সন্ধ্যাবেলা। ওরা সকলেই খুব খুশী হল আমায় দেখে। মেয়ে-দুটি রোজ বর্ম্মিজ গান গাইতেন, বড় মেয়েটির গলা বেশ সুরেলা বলে মনে হত আমার কাছে, যদিও গানের অর্থ এক বর্ণও বুঝতুম না। এদিন ওঁরা দুজনেই অনেকগুলি গান গাইলেন, বনের অনেক গল্প শুনলেন, শেষে রাত্রে তাঁদের ওখানে খেতে বললেন।

ব্রহ্মদেশীয় পরিবারে একটি জিনিস লক্ষ্য করেচি, যাকে তারা একবার বন্ধুভাবে পরিবারের মধ্যে গ্রহণ করেচে, তার সংগে ওদের ব্যবহার নিঃসঙ্কোচ ও উদার আত্মীয়তাতে ভরা। ব্রহ্মদেশীয় খাদ্য কখনও খাইনি, আমার ভয় ছিল হয়তো এমন সব খাবার টেবিলে আসবে যা মুখে তোলা আমার পক্ষে শক্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু ওঁদের ব্যবহার এত সুন্দর—এমন কোনো আহার্য্য তাঁরা আমার সামনে স্থাপিত করলেন না যা আমার অপরিচিত। মিষ্টি পোলাও, মাংস, মাছ, মংডুর বাঙালী ময়রার দোকানের সন্দেশ ও রসগোল্লা।

আমি বড় মেয়েটিকে বললুম—আপনাদের বাড়ির রান্না ভারি চমৎকার—বাংলা-দেশের রান্নার মতই ধরন তো অবিকল।

বড় মেয়ে মোংকেট হেসে বললে, এ যা খেলেন, আমাদের দেশের খাবার কিন্তু এ নয়। হয়তো সে আপনি খেতে পারতেন না।

—তাই কেন খাওয়ালেন না?

—আপন্যর মুখে ভালো লাগতো না। আপনি সুঁটকি মাছ খেয়েচেন কখনো?

—খাইনি কখনো। তবে একবার খেয়ে না হয় দেখতুম। আর নাপ্পি? সেটা বাদ গেল কেন?

—নাপ্পি সব সময় বা সকল ভোজে খায় না। ও এক ধরণের চাটনি হিসেবেই খাওয়া হয়। নাপ্পি টেবিলে দিলে আপনি উঠে পালাতেন।

—বাঙালী-রান্না আপনারা জানেন?

—আমাদের রান্না একটাও নয়। বাঙালী বাবুর্চ্চি দিয়ে সব রাঁধানো। আমরা পোলাওটা রাঁধতে পারি। মংডু বাংলা দেশের কাছে, অনেক বাঙালী এখানে থাকেন, আমাদের খাওয়াদাওয়া অনেকটা বাঙালী ধরণের হয়ে গিয়েচে।

হাসিগল্পের মধ্যে খাওয়া শেষ হল।

পরদিন আমি ওঁদের একটি বাঙালী হোটেলে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালুম। ওঁদের সঙ্গে এত আলাপ হয়ে গিয়েছিল একদিনে যে, সাতদিন পরে যখন মংডু ছেড়ে চলে আসি তখন সত্যিই বড় কষ্ট হয়েছিল ওঁদের ছেড়ে আসতে। আসবার সময় মিঃ মৌংপে মেয়ে দুটিকে নিয়ে জাহাজঘাটে আমায় বিদায় দিতে এলেন। মৌংকেট একটা সুদৃশ চন্দনকাঠের ছোট বাক্স ভর্ত্তি সমুদ্রের কড়ি, ঝিনুক আমায় উপহার দিলেন। দুঃখের বিষয় এই বাক্সটি সেইবারেই ঢাকা আসবার সময় ট্রেনে খোয়া যায়।

মংডু থেকে চাটগাঁ ফিরে আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে উঠলুম। এই উপলক্ষ্যে একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। চট্টগ্রাম আমার কাছে তো বহুদূর বিদেশ, কিন্তু যখন ডবল মুরিংস্ জেটি থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে ওদের বাড়ি যাচ্চি, তখন মনে হল যেন অনেকদিন পরে বাড়ি ফিরলুম।

ওদের সেই বৈঠকখানার পাশেই মুলী বাঁশের চাঁচে ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানি আমার কত প্রিয় পরিচিত হয়ে উঠেছিল, যেন আমার কতদিনের গৃহ সেটি। উঠানের বাতাবি-লেবু গাছের ছায়া যেন কতকালের পরিচিত আশ্রয়।

পথে পথে অনেকদিন বেড়িয়ে এই ব্যাপারটি আমি লক্ষ্য করেচি, মন যেখানে এতটুকু আশ্রয় পায় সেইখানেই তার আঁকড়ে ধরে থাকবার কেমন একটা আগ্রহ গড়ে ওঠে। সে আশ্রয় যখন চলে যায় তখন মন আশ্রয়ান্তরে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে অত্যন্ত সহজে ও অবলীলাক্রমে।

একটা ছবি আমার এই সম্পর্কে বহুদিন মনে ছিল।

যখন চাটগাঁ আসচি স্টীমারে, দূর থেকে দেখতে পেলাম কর্ণফুলির মোহানার বাইরে সমুদ্রের মধ্যে একখানা বড় পালতোলা জাহাজ নোঙর করা আছে। নীল সমুদ্রের মধ্যে বহুদূর থেকে জাহাজখানা দেখাচ্চে যেন একটি দ্বীপের মতো, যেন অকূল সমুদ্রের কূলে দুঃখসুখবিজড়িত একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণ ; তার সাদা ভাঁজকরা গোটানো পালগুলো, লম্বা লম্বা মাস্তুলগুলো আর মস্ত বড় কালো খোলটা আমার মনে বহুদিন স্থায়ী রেখাপাত করেছিল।

চাটগাঁয়ে ওদের বাড়ি আসতে ওরা আমাকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা করলে—মুলী বাঁশে ছাওয়া সেই ছোট ঘরটাতে আবার বিছানা পেতে দিলে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে মংডু থেকে বর্ম্মিজ পুতুল ও খেলনা এনেছিলুম—তারা সেগুলো পেয়ে খুব খুশী।

একদিন বাড়ির কর্ত্তা বললেন, চলুন সীতাকুণ্ড যাবেন? আপনি তো চন্দ্রনাথ যাননি, অমনি চন্দ্রনাথও ঘুরে আসবেন, এ অঞ্চলে এসে চন্দ্রনাথ না দেখলে বাড়ি ফিরে লোককে বলবেন কি?

পরদিন সকালের ট্রেনে দুজনে গিয়ে নামলুম সীতাকুণ্ডে।

বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম আসবার পথে একদিন এই চন্দ্রনাথ পাহাড়কে দূর থেকে দেখেছিলুম, তখন মনে ভেবেছিলুম চাটগাঁ পৌছেই আগে চন্দ্রনাথ দেখতে হবে। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় তা আর তখন হয়ে ওঠেনি।

আজ দেরাং আর আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতশ্রেণী ও অরণ্যভূমি বেড়িয়ে এসে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতকে নিতান্ত উইঢিবির মতো মনে হচ্চে। হাজার-দেড় কি সতেরোশ' ফুট উঁচু পাহাড় আবার কি একটা পাহাড় নাকি! কিন্তু এ ভুল আমার পরে ভেঙে-ছিল, সে কথা বলচি।

সীতাকুণ্ড গ্রামের মধ্যে কর্ত্তার পরিচিত এক পাণ্ডার বাড়ি গিয়ে দুজনে উঠলাম। আমার সঙ্গী এ অঞ্চলে একজন বিখ্যাত লোক ও জমিদার, সীতাকুণ্ড গ্রামে তাঁর নিজের একখানা বাগানবাড়ি আছে, অপরিষ্কার হয়ে পড়ে আছে বলে সেখানে ওঠা হয়নি--এই পাণ্ডাটি এঁর আশ্রিত ও অনুগত ব্যক্তি, তাই এখানেই ওঠা হল—তীর্থ করে পুণ্য অর্জ্জন করবার জন্যে নয়।

পাণ্ডাঠাকুর অবিশ্যি বাঙালী ব্রাহ্মণ, আমায় বললে,—পাহাড়ে উঠবেন না? চলুন নিয়ে যাই—

আমার সঙ্গী হেসে বললেন—তোমায় নিয়ে যেতে হবে না ঠাকুর মশাই। উনি নিজেই যেতে পারবেন, অনেক পাহাড় জঙ্গল ঘুরেচেন একা—তোমাদের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে একা যেতে আটকাবে না ওঁর।

পাণ্ডাঠাকুরের প্রাপ্য তাহলে মারা যায়—সে তা ছাড়বে কেন! আমাকে নিয়ে সে পাহাড়ে উঠলো। চন্দ্রনাথের বৃক্ষলতার শোভা আমার মন মুগ্ধ করলে ওঠবার পথে, বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়েই। অনেক বড়লোক পাহাড়ে ওঠবার সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েচে নিজেদের পরলোকগত আত্মীয়দের স্মৃতিরক্ষার জন্যে, মার্ব্বেল পাথরের ফলকে তাদের নামধাম লেখা আছে, আমার তো খুব ভালো লাগছিল প্রত্যেকখানি মার্ব্বেল পাথরের ফলক পড়তে, ওঠবার সময় অনেক দেরি হয়ে গেল সেজন্যে।

বিরূপাক্ষ মন্দির ছাড়িয়ে অনেক দূর উঠে একটা পাহাড়ী ঝরনা নেম আসচে, সেখান থেকে পথ দুভাগে ভাগ হয়ে দুদিক দিয়ে ওপরে উঠেচে। এই পর্ব্বতে উঠে হঠাৎ পিছন ফিরে চেয়েই দেখি নীল সমুদ্র ও সন্দ্বীপের অস্পষ্ট সবুজ তটরেখা!

সেখানে বাঁধানো সিঁড়ির ওপরে বসে রইলুম খানিকটা। সামনের পার্ব্বত্য ঝরনার কুলু কুলু ধ্বনি, বন-ঝোপের ছায়া, বন-কুসুমের সুবাস ও দূরের নীল সমুদ্রের দৃশ্য যেন চোখের সামনে এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে, উঠতে ইচ্ছে হয় না।

পাণ্ডা বললে, বড় দেরি হয়ে যাবে বাবু, চলুন ওপরে।

আমরা দুজনে ওপরে উঠতে লাগলুম। নিবিড় মুলী বাঁশের বন, গাছ পাতা ও লতাঝোপের বিচিত্র সমাবেশ। মাঝে মাঝে ঝরনা নেমে আসচে বড় বড় পাথরের পাশ কাটিয়ে মাঝে মাঝে বনের ফাঁক দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্চে, মাঝে মাঝে আড়াল পড়চে বন-ঝোপের।

চন্দ্রনাথে পাহাড়ের দৃশ্য এদিক দিয়ে অন্য অনেক পার্ব্বত্য দৃশ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

অন্য সব জায়গায় পাহাড় আছে, কিন্তু হয়তো বনানী নেই ; যদিও বন থাকে তবে একঘেয়ে বন। একই গাছের, ইংরেজিতে যাকে বলে **homogenous forest**, যেমন আছে সিংভূম, মানভূম, সারেণ্ডা প্রভৃতি অঞ্চলে। সে বনের বৈচিত্র্য নেই, মনকে তত আনন্দ দেয় না, চোখকে তত তৃপ্তি দেয় না।

আরাকান ইয়োমা পর্ব্বতের বনভূমি যে প্রকৃতির, চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বনও সেই

একই প্রকৃতির, বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই ; কেবল মাত্র এইটুকু যে, পূর্ব্বোক্ত অরণ্যে বনস্পতিজাতীয় ফার্ণ যথেষ্ট, চন্দ্রনাথের বনে ও-জাতীয় ফার্ণ আদৌ নেই।

তাছাড়া এমন পাহাড়, বনানী ও সমুদ্রের একত্র সমাবেশ আর কোথাও দেখা যাবে না বাংলাদেশে। ভারতবর্ষেও দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ উপকূলের কয়েকটি স্থান ও মালাবার উপকূল ছাড়া আর কোথাও নেই।

অনেকে ভাবেন চন্দ্রনাথ ছোট একটি পাহাড় হয়তো ; আসলে চন্দ্রনাথ একটি পাহাড় নয়, পাহাড়শ্রেণী। দৈর্ঘ্যে ষাট মাইলের কম নয়। পরস্পর সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত এর চারটি থাক্ আছে, সামনেরগুলি তেমন উঁচু নয় ; সকলের পেছনের থাকটির উচ্চতা গড়ে দেড় হাজার ফুট।

চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণী আসলে পূর্ব্ব হিমালয়ের একটি ক্ষুদ্র শাখা, যেমন আরাকান ইয়োমা বা সমগ্র উত্তরব্রহ্ম, আসাম, পার্ব্বত্য ত্রিপুরার ছোট বড় সকল শৈল-শ্রেণীই হিমালয়ের দক্ষিণ বা পূর্ব্বমুখী শাখাপ্রশাখার বিভিন্ন অংশ। সেই একই নগাধিরাজ হিমালয় বিভিন্ন নামে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে পরব্রহ্মের বহু অবতারের মতো এসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে।

এদিন পাণ্ডাঠাকুরের তাড়ায় বেশিক্ষণ পাহাড়ের চূড়ায় বসা সম্ভব হল না। সন্ধ্যা হয়ে যাবে এই বনে, সারাপথে একটাও লোক নেই।

সেদিন নেমে এলুম বিকেলের দিকে।

ওদের সুপুরি বাগানের মধ্যে ছোট্ট চাঁচের আর টিনের বাড়ি, পথের ধারে পাটি-পাতার গাছ আর বেতবন। পাটি-পাতার গাছ থেকে শীতল পাটি বোনা হয়—এ অঞ্চলের সর্ব্বত্র এ গাছ বনে-জঙ্গলে দেখা যায় ; ঘন সবুজ চওড়া পাতা, অনেকটা আমাদের দেশের বন-চালতে গাছের মতো ডাল-পালার আকৃতি।

সেদিন সন্ধ্যায় সুপুরি বনের মধ্যে, ছোট ঘরে একা চুপ করে বসে আছি, সামনে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলচে, বাইরে তারাভরা আকাশ, দূরে চন্দ্রনাথ পাহাড় শ্রেণীর কৃষ্ণ সীমারেখা।

কতবার দেখেচি এমন সব সময়ে যেন মাটির পৃথিবী আর জ্যোতির্লোকের গ্রহতারা এক হয়ে যায়—স্বপ্ন ভেঙে উঠে চাঁদের বাতির তলায় নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর রূপ দেখে কতবার অবাক হয়ে গিয়েচি—খানিকটা চিনি, খানিকটা চিনি না একে।

কি বিরাট ইঙ্গিত সমগ্র ছায়াপথের, পত্রপল্লবের মর্ম্মরধ্বনির, শান্ত জ্যোৎস্না-লোকের ঝিল্লীমুখর নিশীথ রাত্রির!—

পথের ধারে শুধু ওদের ডাক, বহুদূর পথ ব্যেপে। ঘর থেকে অন্য রকম শোনাবে, পথ থেকে অন্য রকম।

তারপর যা বলছিলুম—

ঘরের মধ্যে বসে আছি, এমন সময় একটি তরুণী বধূ ঘোমটা দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার সামনে একবাটি মুগের ডাল আর একটু কি গুড় রাখলেন। কোনো কথা বললেন না। আমি একটু আশ্চর্য্য না হয়ে পারলুম না—হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে মুগের-ডাল-ভিজে কি রকম জলখাবার!

ভাবলুম—হয়তো এখানে এইরকমই খায়। পরের বাড়ি অতিথি, আহার্য্য সম্বন্ধে নিজের মতামত এখানে চলবে না আমার। ডাল-ভিজে কিছু খেয়ে যখন বাটিটা রেখে দিয়েচি, তখন বধূটি একবাটি গরম দুধ এনে সামনে রাখলেন। এবার আমার সন্দেহ হল, আমি বললুম—এখন দুধ কেন মা? সন্ধ্যেবেলা আমি তো দুধ খাইনে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায় নিম্নস্বরে কি বললেন ভালো বুঝলাম

না। যাই হোক, ভাবলাম দুধ খাওয়ানোর জন্যে যখন এত পীড়াপীড়ি, না হয় দুধটা খেয়েই নিই।

পুনরায় পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী দু-টুকরো হর্তুকি নিয়ে এসে আমার সামনে রাখলেন। ব্যাপার কি, আমায় কি এরা সন্ন্যাসী ভেবেছে — সবাই খাচ্চে পান, আমার বেলা হর্তুকি কিসের? রাত্রে আমার সাথীর খাবার ডাক পড়লো, আমায় কেউ ডাকলে না—আমি তো অবাক, ব্যাপার কিছু বুঝতে পারিনে।

আমার সঙ্গী খেতে গেলেন, কারণ তিনি বেড়িয়ে ফিরেছিলেন অনেক রাত্রে, ভাবলেন আমি বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া সেরে বসে আছি।

আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। খিদে বেশ পেয়েচে, এত লম্বা রাত না খেয়ে কাটাই বা কি করে? বড় মুশকিলে ফেলেচে এরা।

অবশেষে শুয়ে পড়লুম রাত্রে। সকালে উঠে আমার সঙ্গীর চা এল, আমাকে কেউ চা দিলে না। বিরক্ত হয়ে ভাবলুম, এরা বড় অভদ্র, এদের এখান থেকে চলে যাবো, বড়লোক দেখে ওঁর খাতির করচে খুব, আর আমাকে কাল রাত্রে খেতে দিলে না, সকালে একটু চা পর্য্যন্ত দিলে না—আজই চলে যাবো।

আমার সঙ্গী বললেন, চলুন বেড়িয়ে আসি—

পাণ্ডাঠাকুর ইতিমধ্যে একটা পুঁটুলি, খান-দুই কুশাসন, একটা ঘটি হাতে এসে আমায় বললেন—চলুন যাই, এর পরে বেলা হয়ে যাবে—

আমি অবাক হয়ে বলি, কোথায় যাবো?

শ্রাদ্ধের কাজগুলো সকাল সকাল সারি—

—কার শ্রাদ্ধ?

আপনি মা-বাপের শ্রাদ্ধ করবেন তো?

কে বললে আমি শ্রাদ্ধ করবো?

পাণ্ডাঠাকুরের মুখ দেখে মনে হল জীবনে তিনি কখনো এত বিস্মিত হন নি, আমায় বললেন—সে কি! আপনি কাল রাত থেকে সংযম করে আছেন কেন তবে? আমার স্ত্রী বললেন—

আমার এতক্ষণে সব পরিষ্কার হয়ে গেল—কাল রাত্রের গোটা ব্যাপারটার অর্থ এতক্ষণ বুঝলাম। আমি ওঁর স্ত্রীর কথা বুঝতে পারিনি, তা থেকেই সমস্ত ভুলটার উৎপত্তি। আমার সঙ্গী সমস্ত ব্যাপারটা শুনে তো হো হো করে হেসে উঠলেন। পাণ্ডাঠাকুর মহা অপ্রতিভ। তিনি বাড়ির মধ্যে স্ত্রীকে গিয়ে তিরস্কার করলেন—আমি তাঁকে শান্ত করে বাইরে নিয়ে এলুম।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে যথেষ্ট ত্রুটি স্বীকার করলেন, কাল রাত্রে না খেতে দিয়ে রেখে দিয়েচেন সেজন্যে খুব লজ্জিত হলেন।—সংযম করবেন আপনি সে কথা ভেবেই আমার স্ত্রী দুধ আর মুগের ডাল ভিজে খেতে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

আমার সাথী আমাকে বললেন—আপনিই বা বললেন না কেন, যে আপনি শ্রাদ্ধ করবেন না? আপনি তো দিব্যি শুধু দুধ খেয়েই বসে রইলেন—

আমি বললুম—তা কি করে জানবো? আমি কি ছাই মায়ের কথা কিছু বুঝলুম?

—বেশ, বেশ! কথা না বোঝার দরুন আপনাকে উপোস করতে হল সারারাত—

পাণ্ডাঠাকুর বাঙালী ব্রাহ্মণ, বড় ভালো লোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই; আর বড় নিরীহ। এই ব্যাপারে দুজনে এত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন যে তারপরে যে দুদিন ওখানে ছিলাম, ওঁরা যেন নিতান্ত অপরাধীর মতো সঙ্কুচিত হয়ে রইলেন

আমার কাছে।

একটু বেলা হলে আমি বললুম—আজ আমি একা বাড়বাকুণ্ড আর সহস্রমায়া যাবো—

পাণ্ডাঠাকুর বললেন—দুটো দুদিকে—আজ একদিকে যান ; সহস্রমায়া কিন্তু একা যেতে পারবেন না—বাড়বাকুণ্ড যাওয়া সহজ। রাস্তা বলে দেবো, চলে যাবেন।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথ। এবার সম্পূর্ণ একা চলেচি। লোক সঙ্গে থাকলে প্রকৃতিকে ঠিক চেনা যায় না, বোঝা যায় না। আরাকান ইয়োমার পথে দেখেচি, সঙ্গে লোক থাকলে এত বক্ বক্ করে যে মন কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারে না।

বাড়বাকুণ্ডের পথের দুধারে ঘন জঙ্গল, সমস্ত পথের পাশে কোথাও একটি লোকালয় নেই। মাঝে মাঝে বন্য পেয়ারা ও বন্য-কদলীর বন, করবীফুলের সমারোহে শৈল সজ্জিত। কোথাও বা একটি পাহাড়ী ঝরণা সংকীর্ণ পথের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে ; আশেপাশে বন-ঝোপের শান্ত, শ্যামল সৌন্দর্য্য।

পথের ধারে দু-জায়গায় পাহাড়ের ফাটল দিয়ে নীলবর্ণ অগ্নিশিখা বার হয়ে সমস্ত শৈলশ্রেণীর আগ্নেয়-প্রকৃতি প্রমাণ করে দিচ্চে।

বাড়বাকুণ্ড পেঁাছতে প্রায় তিন ঘণ্টা লেগে গেল। এর প্রধান কারণ আমি একটানা পথ হাঁটিনি, মাঝে মাঝে বনগাছের ছায়ায় শৈলাসনে বসে বিশ্রামের ছলে চারিপাশের অনুপম গিরিবনরাজির শোভা উপভোগ করছিলুম। এক এক জায়গায় শৈলসানুতে এত বন্য-কদলীর বন, প্রথমটা মনে হয় সেখানে কেউ কলার বাগান করে রেখেচে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করে জানা গেল মানুষের বসতি নিকটে কোথাও নেই, ওগুলি পাহাড়ী বনকলার গাছ।

পরে এই পাহাড়ী কলা খেয়ে দেখেচি, অনেকটা বাংলাদেশের দয়া কলার মতো বীচিসর্ব্বস্ব। তেমন সুমিষ্টও নয়। বাড়বাকুণ্ড স্থানটি একটি উষ্ণ প্রস্রবণ, গরম জলের সঙ্গে সধূম অগ্নিশিখা বার হচ্চে, জলে ও আগুনে ভীষণ গন্ধকের গন্ধ। পাণ্ডাঠাকুরেরা নিজেদের সুবিধের জন্যে জায়গাটা বাঁধিয়ে রেখেচে—যাত্রীরা গিয়ে দাঁড়ালেই তারা নানারকমে পয়সা আদায় করবার চেষ্টা করে, আমাকেও তারা ঘিরে দাঁড়ালো।

আমি বললুম—আমি যাত্রী নই, পথিক, পুণ্য করতে আসিনি, দেখতে এসেচি।

তারা ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেল, এমন অদ্ভুত কথা যেন জীবনে কোনোদিন শোনেনি।

বললে—কোথা থেকে আসচেন ?

—কলকাতা থেকে—

—হিন্দু না খ্রীষ্টান ?

—হিন্দু !

একটি অল্পবয়সী পাণ্ডাঠাকুর আমায় একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—আমি সস্তায় আপনার কাজ করিয়ে দেবো—পাঁচসিকে পয়সা দেবেন আমায়। আমি বড় গরিব, বাবা মারা গিয়েছেন আজ দুবছর হল, সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠেচে। আমায় যা দেবেন, তাই নেবো।

ছেলেটির ওপর মমতা হল। আমি বললুম—বেশ, তোমায় আমি একটা টাকা দেবো—কিন্তু কোনো কাজকর্ম্ম করার দরকার নেই আমার। তোমার প্রণামী স্বরূপ টাকাটা নাও—

ও বললে—আমার বাড়ি এবেলা খেয়ে যান—দুপুর ঘুরে গেল, না খেয়ে গেলে

কষ্ট হবে।

দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরের ঘরবাড়ি দেখবার আগ্রহেই আমি তার সঙ্গে তার বাড়ি গেলাম। পাহাড়ের একপাশে কয়েকটি ক্ষুদ্র মুলী-বাঁশের ঘর, তারই একখানাতে সে আর তার বিধবা মা বাস করে।

আমি যেতে ওর মা বার হয়ে এসে হাসিমুখে আমার জন্যে একখানা মোটা বুনুনির শীতলপাটি পেতে দিলেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে একটা টাকা তাঁর পায়ে রাখলুম।

পাণ্ডাঠাকুরের মায়ের খাঁটি দেহাতী চাটগাঁয়ে বুলি আমার পক্ষে ভীষণ দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠলো।

তিনি বললেন—বাবা, তুমি কি চা-পানি খাও?

—না মা, এত বেলায় আর চা খাব না।

—আমাদের বাড়ি চা নেইও। যদি অসুবিধে হয় তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিতাম, তোমরা কলকাতার লোক কিনা, চা না খেলে হয়তো কষ্ট হতে পারে, তাই বলচি।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললুম, চা খেয়ে আমি সীতাকুণ্ড থেকে রওনা হয়েচি সকালে, এখন না খেলে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তারপর আহারের ব্যবস্থা।

আমি নগদ একটাকা প্রণামী দিয়েচি বলে আমায় খাতির করতে তাঁরা বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়লেন—কিন্তু দরিদ্রের সংসারে অনেক চেষ্টাতেও কিছু যোগাড় করতে পারলেন না। কিছু পরেই সে কথা বুঝলুম।

খাবার এল ভাত আর ডাল, এর সঙ্গে আর কোনো ভাজাভুজি পর্য্যন্ত নেই। আমি প্রথমে ভাবলুম ডাল দেবার পরে আরও কিছু দেবে। এদেশে তাই করে থাকে। ডালই এদেশে একটা পৃথক তরকারির মধ্যে গণ্য।

বরিশাল থেকে শুরু করে কক্সবাজার পর্য্যন্ত দেখেচি সর্ব্বত্র এই একই নিয়ম। প্রথমে বরিশালে যেদিন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে খেতে বসেচি, শুধু দিয়ে গেল ভাত আর এক বাটি ডাল, তখন আমি তো অবাক। অতিথিকে শুধু ডাল দিয়ে ভাত দেওয়ায় আমি প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য না হয়ে পারিনি, কিন্তু তারপর শুধু ডাল দিয়ে ভাত খাবার পরে অন্যান্য অনেক ব্যঞ্জন একে একে আসতে শুরু করলে। এখানে অবিশ্যি তা হল না।

ডালের পরে অন্য কোনো ব্যঞ্জন এসে পেঁছিলো না দেখে শুধু ডাল দিয়ে ভাত-মেখেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল।

সন্ধ্যার দিকে আবার বাড়বাকুণ্ড থেকে চন্দ্রনাথের পথে উঠলুম।

আসবার সময় পাণ্ডাঠাকুরের মা আমার নাম-ঠিকানা লিখে নিলেন, পুনরায় আসতে বার বার অনুরোধ করলেন। দেখলুম তিনি এমন খুশী, যেন খুব একজন বড়লোক যজমান পেয়ে গিয়েছেন, এবার থেকে যেন তাঁর সকল দুঃখ ঘুচবে। কষ্ট হল ভেবে যে এই দরিদ্র পরিবার আমার কাছে যা আশা করেচেন, আমার দ্বারা তা কতটুকু পূর্ণ হবে। হায়রে মানুষের আশা!

সন্ধ্যার কিছু পরে সীতাকুণ্ড গ্রামে ফিরে এসে দেখি আমি যাঁর সঙ্গে এসে-ছিলুম, তিনি জরুরী চিঠি পেয়ে চাটগাঁ চলে গিয়েছেন। আমায় আরও তিনদিন এখানে থাকতে বলেচেন, তিনি আবার আসবেন তিনদিন পরে। পাণ্ডাঠাকুর আমাকে যত্ন করে ভালো বিছানা পেতে দিয়েচে বাড়ির মধ্যে একটা ঘরে।

আমি যেতেই বললে, বাবু আপনার জন্যে চায়ের জল চড়ানো রয়েচে, বসুন বেশ আরাম করে। আমার স্ত্রীকে বলে দিয়েচি, বাবুর সামনে বেরুবে, কথা বলবে তাতে কি! উনি তো আমাদের যজমান, বাড়ির লোক।

আমি বললুম—ঠিক, উনি তো মায়ের মতো। আমার সামনে আসবেন, এ আর বেশি কথা কি।

কিছুক্ষণ পরে পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী চা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বয়েস তেইশ-চব্বিশ, একহারা গৌরবর্ণা মেয়ে। মোটা লালপাড় শাড়ি পরনে। আমায় চাটগাঁয়ের বুলিতে যা বললেন তার মর্ম্ম এই যে, আমি রাত্রে ভাত খাই, না রুটি খাই?

আমি বললুম—যা-ইচ্ছে করুন মা, আমার খাওয়ার কিছু বাঁধাবাঁধি নেই।

আর কিছু না বলে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। যেন কত সঙ্কুচিত, লজ্জিত হয়ে আছেন নিজেদের আতিথ্যের ত্রুটির জন্যে। বাড়বাকুণ্ডে দেখেচি, এখানেও দেখলুম এই সব দরিদ্র পাণ্ডাঠাকুরেরা অত্যন্ত সৎ ও ভদ্র। সুদূর চট্টগ্রাম অঞ্চলের ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করে বলে এরা নিতান্ত অনাড়ম্বর, সরল। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর এরা রাখে না। একটু পরেই সেটা কি চমৎকার ভাবেই ফুটে উঠেছিল পাণ্ডাঠাকুরের কথাবার্ত্তার মধ্যে।

রাত্রে আহারাদির ব্যবস্থা এ অঞ্চলে সব জায়গায় যেমন দেখেচি তেমনি।

প্রথমে শুধু ভাত আর এক বাটি ডাল। অন্য কিছুই নেই এর সঙ্গে।

ডাল দিয়ে মেখে কিছু ভাত খাওয়ার পরে এল বেগুন ভাজা। শুকনো ভাত দিয়ে বেগুন ভাজা খেতে হবে। তারপর শুঁড়ি কচুর তরকারি, কিন্তু তাতে এত সাংঘাতিক ঝাল দেওয়া যে আমার পক্ষে তা খাওয়া সম্ভব হল না। খাওয়ার পর্ব্ব এখানেই শেষ।

রাত্রে পাণ্ডাঠাকুর আমার কাছে বসে নানারকম কথা বলছিলেন। আমি কলকাতা থেকে যখন এসেচি, তখন তাঁদের কাছে যেন কোনো অদৃষ্ট-পূর্ব্ব জীব। কলকাতায় যারা বাস করে, তারা সবাই খুব বিদ্বান্ আর খুব ধনী। বোধ হয় আমি কোনো ছদ্মবেশী ক্রোড়পতি হবো।

আমায় বললেন, আপনি কলকাতার কোন্ জায়গায় থাকেন?

—শেয়ালদার কাছে।

কোথায় কাজ করেন বাবু?

কেশোরাম পোদ্দারের আপিসে।

· কত টাকা মাইনে পান?

--তিনশো টাকা।

কথার মধ্যে সত্য ছিল না। মাইনে পেতুম পঞ্চাশ টাকা।

-বাবু বেশ বড়লোক।

আমি বিনীত হাস্যের সঙ্গে মাথা নিচু করে রইলাম।

—বাবুর কি কলকাতায় বাড়ি?

--হুঁ।

—ক-খানা বাড়ি আছে?

—তা আছে খান পাঁচেক। ভাড়াও পাই মাসে মাসে প্রায় তিনশো টাকা।

—উঃ!

আমার মুখে পুনরায় লজ্জা ও বিনয়ের হাস্যরেখা ফুটে উঠলো।

—বাবু, আপনি যখন আমার বাড়ি এলেন, তখন আপনার চাল-চলন ধরন-ধারণ

দেখে আমার স্ত্রী বলেছিল, এই বাবু খুব বড়লোকের ছেলে। আমরা বাবু, দেখলেই মানুষ চিনতে পারি।

সে বিষয়ে অবিশ্যি কোনো সন্দেহ রইল না।

—বাবু আপনি বিয়ে করেচেন?

—ওঃ কোন্ কালে। তিন-চারটি ছেলেমেয়ে হয়ে গেল।

—তাহলে খুব অল্প বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল?

—হাঁ, তখন আমার বয়স আঠারো। আমার শ্বশুর একজন বড়লোক। কলকাতায় মস্ত ব্যবসা।

—তা তো হবেই বাবু, তা আপনি যখন আমার যজমান হলেন, যদি কখনো কলকাতায় যাই, আমার একটা থাকবার জায়গা হল।

—নিশ্চয়! আমার বাড়িতে গিয়েই দয়া করে উঠবেন।

পাণ্ডাঠাকুর আমার কথায় খুশী হয়ে তাঁর স্ত্রীকে বললেন—ওগো শোনো, বাবু কি বলচেন।

আমি বিপদে পড়লুম, মেয়েদের কাছে বাজে কথা বলি কি করে? কিন্তু ভগবান আমায় সে-বার দায় থেকে মুক্ত করলেন; পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী এসেই আমাকে বললে, আপনি যদি কাল কুমারী পুজো করেন তবে আমায় বলবেন, আমি যোগাড় করে রেখে দিয়েচি দুজনকে।

আমি বললুম, কাল আমি বাড়িয়াডাল যাবো, ওদিকের পাহাড় আর জঙ্গলগুলো দেখে আসি, কাল আমার দরকার হবে না।

এদের আমার বড় ভালো লেগেছিল। অত্যন্ত সরল এরা, যা বলেচি, সব এরা বিশ্বাস করে নিয়ে খুশী হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন বেলা পড়লে আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তলায় একটি ঝরনার ধারে বেড়াতে যেতুম। সন্ধ্যাবেলায় স্থানটি এক অপরূপ শ্রী ধারণ করতো। গাছপালার শ্যামলতা, বনকুসুমের শোভা, সম্মুখের শৈলশ্রেণীর গম্ভীর উন্নত সৌন্দর্য্য, বনের পাখীর ডাক, ঝরণার কুলুকুলু শব্দ—আর সকলের ওপরে স্থানটির নিবিড় নির্জ্জনতা আমাকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টেনে নিয়ে যেতো সেখানটিতে।

চুপ করে বসে থাকবার মতো জায়গা বটে।

দু'ঘণ্টা বসে থেকেও আমার যেন তৃপ্তি হত না। সন্ধ্যার ঘণ্টাখানেক পর পর্য্যন্ত, ঝরনাটার ওপরে একটা ছোট কাঠের পুল আছে সেখানে বসে থাকতুম।

কোনো স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার একটি বিশেষ টেকনিক আছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি সে টেকনিক অর্জ্জন করেচি, তাতে হয়তো অপরের উপকার নাও হতে পারে। আমার মনে হয় প্রত্যেক প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজের টেকনিক নিজেই আবিষ্কার করেন।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের যেতে হয় একাকী, তবেই প্রকৃতির রানী অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন দর্শকের সামনে, নতুবা নয়। চুপ করে বসে থাকতে হয়, একমনে ভাবতে হয়, মাঝে মাঝে চারিদিকে চেয়ে দেখলে মনে আপনিই কত ভাবনা এসে পড়ে।

সে সব চিন্তার সঙ্গে কখনোই পরিচয় ঘটে না লোকালয়ের ভিড়ে।

এমন কি, সঙ্গে কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকলেও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে পরিপূর্ণ-ভাবে উপভোগ করা যায় না।

সন্ধ্যার পরে অস্পষ্ট মেটে জ্যোৎস্না উঠে সে বনপর্ব্বতের শোভা শতগুণ বাড়িয়ে দিতো, কি একটা বনফুলের সুবাস ছড়াতো বাতাসে, মনে হত সমগ্র পৃথিবীতে

আমি ছাড়া যেন আর দ্বিতীয় মানুষ নেই, সমস্ত পৃথিবী আমার, গোটা তারাভরা আকাশটা আমার। অলস স্বপ্নাতুর মনের অবকাশ-ভরা এক-একটি দিন, এক-একটি জ্যোৎস্নালোকিত সন্ধ্যা, যেন সহস্র সহস্র বর্ষজীবী কোনো দেবতার জীবনে এক-একটি পল বিপল।

অন্য সময়ে সেখানে কখনো যাইনি, যেতুম শুধু সন্ধ্যাবেলা—যখন সে পথে লোক চলাফেরা করতো না, মানুষজনের কণ্ঠস্বর কোনোদিকে শোনা যেতো না।

একদিন সেখানে বসে আছি, এমন সময়ে পথের দিকে কাদের কথাবার্ত্তা শোনা গেল। চেয়ে দেখি কয়েকজন লোক লণ্ঠন জেবলে এইদিকেই আসচে। তাদের হাতে বড় বড় লাঠি।

আমাকে দেখে বিস্ময়ের সুরে বললে—এখানে কি করেন বাবু এত রাত্রে?

আমি বললুম—এই বসে আছি।

তারা দস্তুরমত অবাক হয়ে গেল। বললে—এখানে একা বসে আছেন। বাড়ি কোথায় বাবুর?

—কলকাতায়—

—আমরাও তাই ভেবেচি বিদেশী লোক।

—কেন বল তো?

—বাবু, এখানকার কোনো লোক এখানে এই সময় একা বসে থাকবে? বিদেশী লোক আপনি, কিছুই জানেন না, তাই দিব্যি বসে আছেন। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বড় বাঘের ভয়। বিশেষ করে এই যে ঝরনার ধারে আপনি বসে আছেন, সন্ধ্যার পরে বাঘে এখানে জল খেতে নামে। প্রতি বছর দু-তিনটি মানুষকে বাঘে নিয়ে থাকে চন্দ্রনাথে। আপনি এখন আমাদের সঙ্গে চলুন—

—কোথায় যাবেন আপনারা?

—আমরা চন্দ্রনাথের মন্দিরে আরতি করতে যাচ্ছি, এই দেখুন আমরা চারজন লোকে আলো নিয়ে লাঠি নিয়ে যাচ্চি—রাত্রে ফিরবো না। সকালে পাহাড় থেকে নেমে আসবো—আপনিও চলুন, একা গাঁয়ে যাবেন না এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে।

আমি তাদের সঙ্গে যেতে রাজি হয়ে গেলুম। বন পাহাড়ের নৈশ সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার এ সুযোগ কি ছাড়া যায়! তবে আমি ওদের বললুম, যাঁর বাড়ি উঠেচি, সন্ধ্যার পরে না ফিরলে তিনি খুব ভাববেন। তারা বললে—আপনার কোনো বিপদ ঘটলে তাঁকে আরও বেশি ভাবতে হবে, আপনি চলুন। ওদের সঙ্গে উঠতে উঠতে একবার পিছনে ফিরে চেয়ে দেখলুম—দূরের জ্যোৎস্নালোকে অতি অস্পষ্ট দেখা যায়, সমুদ্র বলে মনে হয় না, সমুদ্র হতে পারে, মাঠও হতে পারে।

সেই বিশাল বনস্পতিদের তলা দিয়ে পথ, জ্যোৎস্নার আলো সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি, রীতিমত অন্ধকার।

আর, কি জোনাকির মেলা! অন্ধকারে বনের মধ্যে জোনাকির এমন ঘোরাফেরা এমন ওঠানামা, এমন মেলা আর কখনও দেখেচি বলে মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ জোনাকির সে কি বিচিত্র সমারোহ! আরণ্য প্রকৃতিকে যিনি ভালোবাসেন, তিনি এই ধরনের অন্ধকার রাত্রে গভীর বনের মধ্যে গিয়ে যদি অরণ্যের নৈশরূপ না দেখে থাকেন, তবে তিনি একটি অদ্ভুত সৌন্দর্য্যময় অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত আছেন জীবনে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি অন্ধকারে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে, মাথার ওপর শাখাপ্রশাখার অন্ধকার চন্দ্রাতপ, মাঝে মাঝে এক-আধটু ফাঁক দিয়ে আকাশ চোখে পড়ে। সে আকাশকে ঠিক তারা-ভরা বলা চলে না, কারণ, জ্যোৎস্নালোকে নক্ষত্রের ভিড় অনেক পাতলা হয়ে

গিয়েচে। তবুও বহু নক্ষত্র দেখা যায় ডালপালার ফাঁকে।

মাঝে মাঝে মুলী বাঁশের বন। নৈশ বাতাসে বাঁশপাতার মধ্যে সরসর শব্দ। রাত-জাগা কি পাখীর ডাক বাঁশবনের মগডালের দিকে! মাঝে মাঝে দূরের সমুদ্র দেখা যায়—এবার বেশ স্পষ্ট দেখা যায় জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রবক্ষ, তবে সন্দ্বীপের তীররেখা চিনে নেবার উপায় নেই।

চন্দ্রনাথের মন্দিরে আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম।

চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির—এখান থেকে একটা দৃশ্য বড় অদ্ভুত দেখলুম এই রাত্রে। মন্দিরের পাদদেশ থেকে ধাপে ধাপে গাছপালা ও বনঝোপের মাথা নেমে গিয়েচে কত নিচে, জ্যোৎস্নামণ্ডিত বনঝোপের মাথাগুলি অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়—তারপর নৈশকুয়াশায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে।

মনে হয় আমি একা আছি, আমার পায়ের তলায় সারা বনময় পৃথিবীটা—জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্র, শৈলশ্রেণী। মন্দিরের চারপাশে বারান্দাতে বসে রইলুম অনেক রাত পর্য্যন্ত।

চাঁদ অস্ত গেলে আমার পায়ের তলায় বনভূমি গভীর অন্ধকারে ভরে গেল।

সে রকম গম্ভীর দৃশ্য দেখবার সুযোগ জীবনে বেশিবার আমার ঘটেনি—দেখে বুঝেছিলাম মৃত্যুর আগে প্রত্যেক মানুষ যেন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে আরণ্য-প্রকৃতির অন্ধকার রূপ কোনো উত্তুঙ্গ শৈলশিখরে বসে-দেখে, নতুবা সে বুঝতে পারবে না বিশ্বপ্রকৃতির অসীম ঐশ্বর্য্য।

মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরে আমরা শুয়ে রাত কাটাই।

রাত্রে আমার ভালো ঘুম হল না—একটা বিরাট শৈলারণ্যের মধ্যে আমি শুয়ে আছি এ চিন্তাটা মন থেকে ঘুমের ঘোরেও গেল না, কতবার মনে হয়েচে জানালা দিয়ে চেয়ে বসে থাকি।

নামবার পথে একটা পাহাড়ী ঝরনার হাতমুখ ধুয়ে নিলাম।

বড্ড শিশির পড়েচে সারারাত ধরে গাছপালার বনঝোপে। টুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়চে, প্রভাতের সূর্য্যালোক মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাঁধানো সোপান-শ্রেণীর ওপর আলোছায়ায় জাল বুনচে।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়ি এসে দেখি—যা ভেবেচি তাই।

তাঁরা কাল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমায় খোঁজাখুঁজি করেচেন। গ্রামের আট-দশজন লোক একত্র হয়ে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে পাহাড়ের তলায় পর্য্যন্ত এসে অনুসন্ধান করেচেন। আজ সকালে থানায় খবর দেবার আয়োজন করচেন। আমার আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে গ্রামের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েচে। তবে শেষ পর্য্যন্ত অনেকে নাকি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি সন্ধ্যার ট্রেনে হঠাৎ কোনো কাজে হয়তো চাটগাঁয়ে চলে গিয়েচি।

পাণ্ডাঠাকুরের বাড়িতে অনেকে একসঙ্গে আমায় ঘিরে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন, আমি কোথায় ছিলুম, রাত্রি কেথায় কাটালুম—ইত্যাদি।

আমি রাত্রের ঘটনা বলতে ওরা সবাই মিলে, যারা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের দোষ দিতে লাগলো। না জানিয়ে তাদের এ রকম নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি পাহাড়ের ওপরে।

আমি বললুম—কেন, বাঘ?

পাণ্ডাঠাকুর বললে—সেকথা কিন্তু ঠিক। বাঘের ভয় বিলক্ষণ আছে ওখানে। আপনি যে সন্ধ্যার সময় ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে বসে থাকবেন তা আমি কি করে

জানবো? আমি ভেবেচি আপনি ইষ্টিশানে বেড়াতে যান সন্ধ্যাবেলা ট্রেন দেখবার জন্যে।

পাণ্ডাঠাকুরের স্ত্রী আমায় বললেন এর পরে—আমি আপনার জন্যে ভাত রেঁধে কত রাত পর্য্যন্ত বসে রইলুম। শেষে রাতে ঘুমুতে পারিনি আপনার কি হল ভেবে।

এতগুলি নিরীহ লোক আশঙ্কা ও উদ্বেগের মধ্যে রাত কাটিয়েচে আমার জন্যে এবং আমিই এ জন্যে মূলত দায়ী, এতে আমি যথেষ্ট লজ্জিত হলুম।

সেদিন দুপুরের ট্রেনে আমি পরের স্টেশনে নেমে বারিয়াডাল রওনা হই।

শুধু বারিয়াডাল নয়, পায়ে হেঁটে এই সময় আমি চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর অনেক অংশ দেখে বেড়িয়েছিলুম। বারিয়াডাল একটা গিরিবর্ত্ম, পাহাড়শ্রেণীর যেখানটাতে নীচু খাঁজ, সেখান দিয়ে একটা রাস্তা পাহাড় টপকে ওপারে নেমে গিয়েচে।

বারিয়াডাল অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় ঝরনা ও সহস্রধারা নামে জলপ্রপাত আছে।

আমি সহস্রধারা দেখবার সুযোগ পাইনি—কিন্তু শৈলশ্রেণীর অনেক অংশে প্রায় তিনদিন ধরে ঘুরেছিলুম।

একটা কথা আমার মনে হয়েচে এই শৈলমালা ও অরণ্যের সম্বন্ধে। বাংলাদেশের মধ্যে এমন পাহাড় ও বনের শোভা আর কোথাও নেই। এই বনের প্রকৃতি যেরূপ, আসাম ছাড়া ভারতের কুত্রাপি এ ধরনের বন দেখা যাবে না।

বারিয়াডাল পার হয়ে পাহাড়ের পূর্ব্বে সানুতে এসে বনের শোভা আরও চমৎকার লাগালো। এত বড় বড় ঝোপ, আর বড় বড় লতা চন্দ্রনাথ তীর্থ যেদিকে, সেখানে নেই। এদিকে খুব বড় বড় গাছ নেই। গাছের গুঁড়িগুলো সোজা উঠেচে অনেকদূর, যেন কলের চিমনির মতো। একটা গাছের কথা আমার মনে আছে। শিমুল গাছের গুঁড়ির মতো তিন দিকে তিনটি বড় বড় খাঁজ, এক একটা খাঁজের মধ্যে এতটা জায়গা যে সেখানে এক একটি ছোটখাটো পরিবারের রান্নাঘর হতে পারে। এই জাতীয় গাছ চন্দ্রনাথ পর্ব্বত ছাড়া অন্য কোথাও দেখিনি—বা এখানে যত অপরিচিত শ্রেণীর গাছ দেখেচি, এমনটিও বাংলাদেশের আর কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না।

এবার একটি **beauty spot** এর কথা বলি।

স্থানটি আমার আবিষ্কার, এর বিবরণ কারো মুখে আমি শুনিনি বা কেউ কোথাও লেখেনি। বারিয়াডাল ছাড়িয়ে সাত মাইল উত্তরপূর্ব্ব দিকে পাহাড়ের তলায় তলায় গেলে আওরঙ্গজেবপুর বলে একটা গ্রাম পড়ে। গ্রামটিতে মুসলমানের বাস, হিন্দু আদৌ নেই। আমি যে জায়গাটির কথা বলচি, আওরঙ্গজেবপুর থেকে সেটা আড়াই মাইল কি তিন মাইল দূরে দুটি পাহাড়ের মধ্যে।

আওরঙ্গজেবপুরের মুসলমান গৃহস্থদের অতিথিবৎসলতা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আজকালকার উগ্র সাম্প্রদায়িকতার যুগে চোদ্দ পনোরো বৎসর পূর্ব্বেকার সে কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়।

এই গ্রামটির পথের ওপর একটা গাছতলায় দুপুরে বসে বিশ্রাম করছিলাম। সারা সকাল লেগে গিয়েছিল বারিয়াডাল থেকে এতদূর আসতে। বনজঙ্গল অঞ্চল, কোথাও খাবারের দোকান নেই, কিছু পাওয়াও যায় না, সকাল থেকে কিছু খাইনি।

কাছেই গ্রাম দেখে সেখানে ঢুকলাম, মুড়ি বা চিঁড়ের সন্ধানে। প্রথমেই একটি লুঙ্গিপরা প্রৌঢ় মুসলমান গৃহস্থের সঙ্গে দেখা। তার ভাষা উৎকট দেহাতী চাটগেঁয়ে। আমার কথার উত্তরে প্রথমেই সে কপালে হাত ঠেকিয়ে আমায় সেলাম করলে, তারপর বললে—বাবু কোথা থেকে আসচেন?

তার ভদ্রতা আমায় যেন লজ্জা দিলে। সে আমায় শিষ্ট নমস্কার জ্ঞাপন করলে,

আমি তো করলুম না! গ্রাম্য লোক শিষ্টাচারে আমাকে হারিয়ে দিলে।

আমার পরিচয় শুনে সে আমায় তার বাড়ি নিয়ে গেল। তাদের প্রকাণ্ড মুলী-বাঁশের ছাউনি বড় আটচালা ঘর, দাওয়াতে নিয়ে গিয়ে পাটি পেতে বসালে। গ্রামের আরও চার পাঁচজন মাতব্বর লোক এসে আমায় ঘিরে প্রশ্ন করতে লাগলো। আর কি সব সরল প্রশ্ন!

—বাবু, ইদিকে কেন আসচেন, জঙ্গল কিনবেন নাকি?

—না, বেড়াতে এসেচি তোমাদের দেশে।

—তা বাবু, আপনাদের কলকাতা তো খুব বড় শহর, এখানে কি দেখবারই বা আছে আপনাদের উপযুক্ত!

—কলকাতা দেখা আছে নাকি?

দুজন নীল লুঙ্গি পরা লোক পেছন দিকে বসে ছিল, তাদের দেখিয়ে একজন বললে—এরা বাবু সব জায়গায় গিয়েচে, বম্বে, বিলেত, জাপান—

আমি তো অবাক। বললুম—এরা কি করে গেল?

তখন পেছনের লোক-দুটি বললে—বাবু, আমরা জাহাজে কাজ করি। আমাদের এই গাঁয়ের বারো আনা লোক জাহাজ আর স্টীমারের খালাসী। আমরা এখন ছুটিতে আছি তিন মাস বাড়ি থাকবো, তারপর আবার কলকাতায় গিয়ে জাহাজে উঠবো।

ওদের সঙ্গে বসে অনেক কথা হল। সত্যিই দেখলুম অনেক দেশ বেড়িয়েচে ওরা। রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর, কলম্বো, জাপান—এমন কি লণ্ডনের কথা পর্য্যন্ত ওদের মুখে শোনা গেল।

খানিকটা গল্প-গুজবের পরে ওরা বললে—বাবুর এবেলার খাওয়া-দাওয়া?

—অমনি কিছু মুড়ি বা চিঁড়ে কিনে—

—সে কি কথা, তা হবে না, ভাত না খেয়ে যেতে পারবেন না। হাঁড়ি, কাঠ, চাল, ডাল সব দেবো, আমাদের গ্রামে এখন আপনি দুদিন থাকুন না! একখানা ঘর দিচ্চি আপনাকে—

আমার কোনো আপত্তি ওরা শুনলে না। রান্নার যোগাড় ওরা করে দিলে। আবার এমন ভদ্রতা, আমি বললুম রান্না করবার আমার দরকার নেই, ওদের রান্না খেতে আমার আপত্তি নেই—তা ওরা শুনলে না। আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ—কেন তারা আমার সামাজিক প্রথায় ও আচারে একদিনের জন্যে হস্তক্ষেপ করবে? ওরা রেঁধে দেবে না। আমাকেই রান্না করতে হবে।

আওরঙ্গজেবপুর হতে বের হয়ে আমি যদৃচ্ছাক্রমে পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ সেই অপূর্ব্ব স্থানটিতে এসে পড়লুম।

একদিকে পাহাড়, একদিকে বন, পাহাড় থেকে বন নেমে এসেচে যেন সবুজ জল-স্রোতের মতো, একটা অবিচ্ছিন্ন সবুজের প্রবাহের মতো উচ্ছ্বসিত প্রাচুর্য্যের উল্লাসে নৃত্যশীল সাগরোর্ম্মির মতো।

তারই মধ্যে অনেকগুলি পত্রবিহীন অদ্ভুত ধরনের গাছ—তাদের ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেমন যেন আলুথালু ছন্নছাড়া অবস্থায়, নটরাজ শিবের নৃত্যভঙ্গির মতো।

এক রকম লতা উঠেচে গাছপালার সর্ব্বাঙ্গ বেয়ে, তাদের মগডাল পর্য্যন্ত সাদা সাদা ফুলে লতাগুলো ভর্ত্তি—গাছের মাথা সেই সাদা ফুলে ছাওয়া। একদিকে একটা ক্ষীণস্রোতা পাহাড়ী ঝরনা সেই অপূর্ব্ব বনভূমির মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে, ছোটবড় শিলাখণ্ড বিছানো অগভীর পথে। তার দুধারে জলের ধারে ধারে ফুটে আছে রাঙা

বন-করবী।

আমি কতক্ষণ সেখানে একটা পাথরের ওপর বসে রইলুম। একদৃষ্টে কতক্ষণ চেয়ে দেখেও যেন দেখবার পিপাসা মেটে না। গাছপালা, পুষ্পিত লতা, বনভূমি, দীর্ঘ শৈলমালা ও ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদী—সব নিয়ে একটা অতি চমৎকার ছবি, এ ছবির কি একটা অস্ফুট রহস্যময় ভাষা আছে, খানিকটা বা বোঝা যায়, খানিকটা যায় না।

বিকেলে বেশ ছায়া পড়ে এসেচে স্থানটিতে—কতরকমের পাখী ডাকচে, বনলতার ফুলের সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাতাসে। এখানে হঠাৎ যদি কোনো বনদেবীকে আবির্ভূতা দেখতুম, তবে যেন তার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু ছিল না, এখানে তো তাঁরা নামতেই পারেন, লোকালয়ের বাইরে এই বিহগকূজিত নির্জ্জন বন-প্রান্তেই তো তাঁদের আসন।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখান থেকে আবার আওরঙ্গজেবপুরে চলে এলুম।

এরা থাকে যে গ্রামে, বাইরের খবর সেখানে যথেষ্ট পোঁছোয় অন্য অনেক গ্রামের চেয়ে, কারণ এ গ্রামের অধিকাংশ লোক কাজ করে বাইরে। জাহাজে স্টীমারে চড়ে তারা অনেক দূরের সমুদ্রে পাড়ি জমিয়েচে বহুবার।

শৈলপাদমূলের এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে বসে তাদের মুখে জাপানের, লণ্ডনের, সিংহলের অনেক গল্প শুনলুম। ওরা সে রাত্রে আমার জন্যে একটা খাসি ছাগল মারলে। যার বাড়ি ছিলুম, সে তার অনেক প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করলে ওর বাড়িতে।

আমাকে আলাদা রান্না করতে হল—কিছুতেই ওরা ওদের রান্না আমায় খেতে দিতে রাজি হল না। এদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ খালাসী ছিল, তার নাম আবদুল লতিফ ভুঁইয়া। আবদুলের বয়স নাকি একানব্বই বছর, অথচ তার চুলদাড়ি এখনও সব পাকেনি। দেখলে পঞ্চান্ন কি ষাট বলে মনে হয় তার বয়স। সে আগে সমুদ্র-গামী বড় বড় জাহাজে মাল্লার কাজ করেচে এখন তার নাতি সমুদ্রে বার হয়, সে বাড়ি বসে চাষবাস দেখে।

আমি তাকে বললুম—আবদুল, তুমি বিলেত গিয়েচ?

—ও! বিলেতে তো ঘরবাড়ি ছিল।

—কোথায় থাকতে?

—সেলরস্ হোম আছে আমাদের জন্য। সেখানেই থাকতুম।

—কেমন জায়গা?

—উঃ, পরীর দেশ বাবু, মেয়েমানুষ তো নয়, যেন সব পরী।

—মিশতে ওদের সঙ্গে?

—বাবু, ওসব দেশের তারা আপনি গায়ে এসে পড়ে। তাদের এড়িয়ে আসা যায় না।

তারপর সে তার ডজনখানেক প্রণয়কাহিনী আমার কাছে বলে যেতে লাগলো। লোকটির অভিজ্ঞতা সত্যিই অদ্ভুত, তার সঙ্গে একটি মেমের নাকি বিয়ে হয়। দু বছর তাকে নিয়ে ও ইংলণ্ডের কোনো একটা গ্রামে ছিল, গ্রামের নাম উইটেনহ্যাম। নামটা আবদুল বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করেছিল, যদিও ইংরিজি কিছুই জানে না সে। আমি বললুম, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কি-ভাষায় কথা বলতে?

—ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলতুম, আর হাত নেড়ে তাকে বুঝিয়ে দিতুম।

—কি করে চালাতে সে গাঁয়ে? চাকরি করতে?

—না বাবু, জিনিসপত্র ফিরি করে বেড়াতুম, মাঝে মাঝে আপেল বাগানে চাকরিও

করেচি। উইটেনহ্যামে অনেক আপেল বাগান ছিল। বেশ জায়গা বাবু—

—তোমার স্ত্রী বেশ ভালো ছিলেন নিশ্চয়ই—

—ভালো মানুষ ছিল আর খুব ছেলেপুলে ভালোবাসতো। আমায় যত্ন করতো খুবই। আমায় বলতো, তোমার দেশে আমায় নিয়ে যাও, কি রকম দেশ দেখবো—

—এনেছিলে নাকি?

—আনতাম হয়তো, কিন্তু বাবু সে দু-বছর পরে মরে গেল। আমার কিছু ভালো লাগলো না, সেখান থেকে বেরিয়ে একেবারে সোজা দেশে চলে এলুম। সে বাঁচলে উইটেনহ্যামেই বরাবর থাকতুম হয়তো। আপেলের বাগান করবার বড্ড শখ ছিল—

—আচ্ছা এসব কতদিন আগের কথা হবে?

—পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগেকার কথা বাবু, কি তারও আগের কথা। উইটেন-হ্যামে একবার ধুমধাম হল, গির্জ্জায় গান বাজনা হল, শুনলাম নাকি মহারানীর কত বছর বয়স হল, সেই জন্যে ওরকম হচ্চে। মহারানী তখন বেঁচে—কি ধুমধাম হল পাড়াগাঁয়ে!

আবদুল লোকটা ভিকটোরিয়ান যুগের লোক, মহারানীর ডায়মণ্ড জুবিলী দেখে এসেচে বিলেতে বসে। কিন্তু ওকে দেখে কে ভাববে সে কথা! আবদুল এখন পাহাড়ের ধারের ধানের ক্ষেতে ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে বসে পাহারা দেয় আর শীতলপাটি বোনে। বয়স হল এত, তবু সে বসে থাকে না।

আওরঙ্গজেবপুর গ্রামে সবই মুসলমান। আমার বড় ভালো লেগেছিল ওদের, আমাকেও বড় পছন্দ করত ওরা। যেদিন আসি, অনেকে গ্রাম ছেড়ে অনেকদূর পর্য্যন্ত এসে আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল।

পথ বেয়ে চলেচি। এবার দেখলুম পাহাড়ের নীচে মাঝে মাঝে অনেক গ্রাম পড়ে এ দিকটাতে। পাহাড়েই এসব গাঁয়ের একটা বড় সম্পদ। পাহাড় যোগায় জ্বালানি কাঠ ঝরাপাতা; ঝরনা যোগায় জল; তা ছাড়া পাথর কুড়িয়ে এনে এরা ঘরবাড়ির দেওয়াল করেচে, রোয়াক করেচে।

লম্বা টানা চন্দ্রনাথ পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য এখান থেকে দেখা যায় বড় সুন্দর। বনের শোভাও অদ্ভুত। মনে হয় এ একটা আলাদা জগৎ। যারা এ বনের কোলে গ্রামে বাস করে, এর বিচিত্র বৃক্ষলতার সমাবেশ, বনফুলের শোভা, পাখীর ডাক, ঝরনার কলতানের মধ্যে যাদের শৈশব কেটেচে, তারা একটা বড় সৌন্দর্য্যময় অভিজ্ঞতাকে লাভ করেচে জীবনে।

তবে মাঝে মাঝে বাঘ আসে এ অভিযোগ সকল গ্রামেই শুনেচি। শীতকালের দিকে বেশি বার হয়, গোরু ছাগল ভেড়া তো নেয়ই, মানুষ পেলেও ছাড়ে না।

গ্রামের লোকদের বিশ্বাস, সন্ধ্যার পরে পাহাড়ে ওঠা-নামা বা জঙ্গলে ঢোকা উচিত নয়। ভূত আছে, অপদেবতা আছে, আরও কত কি আছে। সন্ধ্যার পরে এরা প্রাণান্তেও পাহাড়ে যাবে না।

এখানকার এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ি মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম। স্থানটি ফেণী সবডিভিসনের অন্তর্গত ধুম স্টেশন থেকে পনের যোল মাইলের মধ্যে। এদের দেশে ভোজের পূর্ব্বে ফল ও মিষ্টান্ন খেতে দেয়, তারপর আনে লুচি, তারপরে ভাত আর তরকারি। মেয়ের বিয়েয় ভাত খাওয়ায়, এ অন্য কোথাও দেখিনি।

ধুম স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়ে চলে এলুম আখাউড়া।

এক সময়ে এ অঞ্চল বঙ্গোপসাগরের কুক্ষিগত ছিল তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়—বিশাল সমতলভূমি ক্রমশ নীচু হতে হতে সমুদ্রের জল ছুঁয়েচে। ধানের সময়

মনে হয় সবুজের সমুদ্র গোটা দেশটা।

আখাউড়া থেকে আগরতলা মাইল পাঁচ ছয় দূরে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা অনেকদিন ধরে দেখবার বড় শখ ছিল। আমি যে সমুদ্রের কথা বলচি, তখন মোটর বাস হয়নি, আখাউড়া থেকে ঘোড়ার গাড়িতে আগরতলা গিয়ে পৌঁছুলাম বেলা প্রায় দশটার সময়।

কোথায় গিয়ে উঠবো কিছু ঠিক ছিল না, গাড়িতে একজন বলেছিল বিদেশী ভদ্রলোক গেলে মহারাজার অতিথিশালায় উঠতে পারে। আমার দেখবার ইচ্ছে হল সে ব্যাপারটি কি রকম একবার দেখতে হবে। শুনলুম মহারাজের দপ্তরের কোনো একজন কর্ম্মচারীর সইকরা চিঠি ভিন্ন রাজার অতিথিশালায় থাকতে পারা যায় না। আমি রাজদপ্তরের কাউকে চিনতুম না, তবুও সাহস করে গেলাম এবং কেশোরাম পোদ্দারের প্রদত্ত পরিচয়-পত্র দেখিয়ে সেখান থেকে একখানা টিকিট যোগাড় করে রাজার অতিথিশালায় এসে উঠলুম।

অতিথিশালায় অনেকগুলো ঘর, মুলী বাঁশে ছাওয়া বেশ বড় বাংলো, দুদিকে বড় বারান্দা, পেছনদিকে রান্নাঘর ও বাবুর্চ্চিখানা। দুরকম থাকার কারণ অতিথিরা ইচ্ছামত ভারতীয় খাদ্য ও সাহেবী-খানা দুরকমই খেতে পারেন। প্রত্যেক ঘরে কলকাতার মেসের মতো তিন চারটি খাট পাতা, তাতে শুধু গদি পাতা আছে। অতিথিরা নিজেদের বিছানা পেতে দেবেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা চমৎকার। সকালে চা, বিস্কুট, টোস্ট দেয়, দুপুরে ভাত, তিন-চারটি ব্যঞ্জন, মাছ, মাংস ও পোয়াটাক দুধ, রাত্রে অতিথির ইচ্ছামত ভাত বা রুটি। শীতকালে ব্যবহারের জন্যে গরম জল দেওয়ার বন্দোবস্ত আছে।

যে ক-জন চাকরবাকর আছে, তারা সর্ব্বদা তটস্থ, মুখের কথা বার করতে দেরি সয় না, তখুনি সে কাজ করবে। তিনদিন এখানে থাকবার ব্যবস্থা আছে স্টেটের খরচে—তারপর থাকতে হলে অনুমতি-পত্রের মেয়াদ বাড়িয়ে আনতে হয় রাজদপ্তর থেকে।

প্রকৃতপক্ষে অনেকে সাতদিন আটদিন কি তার বেশিও থাকে, চাকরবাকরদের কিছু দিলে তারাই ওসব করে নিয়ে এসে দেবে।

আমি গিয়ে দেখি অত বড় বাংলোতে একজন মাত্র সংগী—আর কোনো অতিথি তখন নেই। জিজ্ঞেস করে জানলুম তিনি প্রায় মাসখানেকের বেশি আছেন রাজ অতিথিরূপে। ইনি অদ্ভুত ধরনের মানুষ—একাধারে ভবঘুরে দার্শনিক, কবি ও মাইনিং এঞ্জিনিয়ার।

অনেক দিন হয়ে গেলেও এই ভদ্রলোকের কথা আমার অতি স্পষ্ট মনে আছে। আমার বইগুলির দু একটি চরিত্রের মূলেও ইনি প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান। পরে এঁর কথা আরও বলচি।

আগরতলা ছোট শহর, রাজপথে বেজায় ধুলো, ঘরবাড়িগুলোও দেখতে ভালো নয়—এ শহরের কথা বলবার মতো নয়। আমার ভালো লেগেছিল মহারাজার নতুন প্রাসাদ, ছোট্ট একটা চিড়িয়াখানার কয়েকটি বন্যজন্তু, 'কুঞ্জবন' প্রাসাদ ও বড় একটা ফুলের বাগান। আর ভালো লেগেছিল সুলেখক ও সুপণ্ডিত কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মনকে। ইনি মহারাজের জ্ঞাতি ও খুল্লতাত, রাজদপ্তরে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সে সময়ে, বৌদ্ধদর্শন ও ইতিহাসে তাঁর যথেষ্ট পড়াশুনো। অত্যন্ত অমায়িক ভদ্র-লোক, যখন আমি তাঁর বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিলুম তাঁর সঙ্গে, তখন আমি তরুণ-বয়স্ক, তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বৎসরের কাছাকাছি—কিন্তু আমার সঙ্গে সমবয়সী

বন্ধুর মতো মিশেছিলেন, কত আগ্রহ করে তাঁর বৌদ্ধগ্রন্থের লাইব্রেরি দেখিয়েছিলেন, সে কথা আমার আজও মনে আছে।

মহারাজার নতুন প্রাসাদের বড় ফটকে বন্দুকধারী গুর্খা বা কুকি পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। অনুমতি ভিন্ন কাউকে প্রাসাদ দেখতে দেওয়ার নিয়ম নেই।

একদিন আমি নিঃসঙ্কোচে ছড়ি ঘুরিয়ে সহজভাবে ফটকের মধ্যে ঢুকে গেলুম যেন আমি নতুন লোক নই, মহারাজের প্রাসাদে যাতায়াত করা আমার নিত্যকর্ম্ম। কুকি পাহারাওয়ালা চেয়ে চেয়ে দেখলে কিন্তু কিছু বলতে সাহস করলে না, কেন যে সে কিছু বললে না, তা আমি আজও জানিনে।

একাই প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লুম—বিভিন্ন ঘর দেখে বেড়ালুম, কেউ কিছুই বললে না। একটা বড় হলঘরে অনেকগুলো বড় বড় বিলিতি ছবি। হল ঘরটিতে সুন্দর সুন্দর কোচ কেদারা পাতা, সুদীর্ঘ ভিনিসিয়ান আয়না দেওয়ালে, সিল্কের কাজ করা পরদা, ভেলভেটে মোড়া গদি, চমৎকার কার্পেট পাতা মেজের ওপর।

একটি ছোট্ট সুন্দরী খুকি ঘরটিতে বসে প্রাইভেট টিউটারের কাছে লেখাপড়া করচে। খুকিটি এত চমৎকার দেখতে! আমি প্রাইভেট টিউটারের সঙ্গে আলাপ করলুম। তাঁর বাড়ি কুমিল্লা জেলায়, নামটা আমার মনে নেই, আমার সঙ্গে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁর খুব ভাব হয়ে গেল।

তিনি বললেন—আপনাকে দরবার-ঘর দেখাই চলুন। ওখানে সকলকে যেতে দেওয়া হয় না—ঘর বন্ধ থাকে, দাঁড়ান চাবিটা আনিয়ে নিই।

দরবার-ঘরে ঢুকে তার ঐশ্বর্য্য ও জাঁকজমক দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এক-কোণে উঁচু বেদীর ওপর হাতীর দাঁতের সিংহাসন, সোনালী ব্রোকেডের কাজকরা লাল মখমলের গদি মোড়া। পাছে ধুলো-বালি জমে নষ্ট হয় বলে সিংহাসনটি তুলো দিয়ে ঢাকা। দুটি প্রকাণ্ড হাতীর দাঁত সিংহাসনের দুদিকে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করানো। মাস্টার মশায় বললেন, হাতীর দাঁত-জোড়া স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের পার্ব্বত্য অঞ্চল থেকে কোনো কুকি সামন্ত সর্দ্দার রাজদরবারে নজর দিয়েছিল।

—কুকি সামন্তেরা কোথায় থাকে?

—পার্ব্বত্য অঞ্চলে ওদের জায়গীর, মহারাজ ওদের ফিউডাল চিফ, দরবারের সময়ে কুকি সামন্ত সর্দ্দারেরা তাদের জাতীয় পোশাক পরে যখন আসে, সে একটা দেখবার জিনিস! ওদের সঙ্গে তীর ধনুক নিয়ে কত অনুচর আসে। সে সময় থাকেন তো দেখতে পাবেন।

—কতজন সামন্ত আছে?

—ঠিক বলতে পারবো না, তবে পনেরো-কুড়ি জনের কম নয়। ওদের অঞ্চলে ওরা নিজেদের ধরনে শাসন করে, ওদের নিজেদের আইন ও রীতি-নীতি সেখানে চলে।

বিকেলে আমি 'কুঞ্জবন' প্যালেসের দিকে বেড়াতে গেলুম।

পথে এক জায়গায় একটা ছোট চিড়িয়াখানা আছে মহারাজের। তার মধ্যে **Ciret Cat** জাতীয় একটি বন্যজন্তু আমার বড় ভালো লেগেছিল।

সেটা দেখতে কতকটা বিড়ালের মত—কিন্তু বিড়ালের চেয়ে অনেক বড়। যতবার গায়ে লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায়, ততবার সেটা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে 'ফ্যাঁচ' করে তেড়ে আসে, খাঁচার লোহার ডাণ্ডার গায়ে মারে এক থাবা। এ যেন তার বাঁধা নিয়ম —যতবার খোঁচা দেওয়া যাবে, ততবার সেটা ঠিক ওই একই রকম ভাবে ফ্যাঁচ করে তেড়ে আসবেই।

তার ওই ব্যাপারটা দেখা শেষকালে আমার এমন ভালো লেগে গেল যে অতিথি-

শালা থেকে প্রায় আধ মাইল হে'টে দু-বেলা আমাকে চিড়িয়াখানা যেতে হত, কে ক-দিন আগরতলা ছিলাম!

'কুঞ্জবন' প্যালেস একটা অনুচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পুরনো আমলের তৈরী বলেই দেখতে ঢের ভালো লাগলো, মার্টিন কোম্পানীর তৈরী মহারাজের নতুন প্রাসাদের চেয়ে। কুঞ্জবন প্যালেসের একটা ঘরে অনেক প্রাচীন চিত্র, হাতীর দাঁতের শিল্প, ত্রিপুরা রাজবংশের পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবি ইত্যাদি আছে—এসব খুঁটিনাটি করে দেখতে অনেক সময় গেল।

একটি হাতীর দাঁতের ক্ষুদ্র নারীমূর্ত্তি আমার কি ভালোই লেগেছিল! চার-পাঁচ ইঞ্চির বেশি বড় নয়, পুরনো হাতীর দাঁত, হলদে হয়ে গিয়েচে—কি কমনীয়তা আর জীবন্ত লাবণ্য মূর্ত্তিটির সারা গায়ে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। শুনলুম এক সময়ে এখানে হাতীর দাঁতের জিনিসপত্রের ভালো শিল্পী ছিল। এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি কোন্ অজ্ঞাত কারিগরের শিল্পপ্রতিভার অবদান জানিনে, মন কিন্তু তার পায়ে আপনিই শ্রদ্ধা নিবেদন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

প্রাসাদের ছাদ থেকে সূর্য্যাস্ত দেখে মনে হল এমন একটা সূর্য্যাস্ত কতকাল দেখিনি!

গোটা আকাশটা লাল হয়ে এল, যেন পশ্চিম দিগন্তে লেগেচে আগুন, তারই ছোঁয়াচে রক্তশিখা সারা আকাশে হালকা সাদা মেঘে আগুন ধরিয়েচে, প্রকাণ্ড আগুনের গোলাবের মতো সূর্য্যটা কুঞ্জবন প্রাসাদের পিছনকার ঢেউ খেলানো অনুচ্চ শৈলমালা ও সবুজ অরণ্যভূমির মধ্যে ডুবে যাচ্চে।

যতদূর চোখ যায়, শুধু উঁচুনীচু পাহাড় আর উপত্যকা, উপত্যকা আর পাহাড়; ঘনবনানীমণ্ডিত রাঙা সরু পথটি বনের মধ্যে এঁকেবেঁকে পাহাড়ের ওপর একবার উঠে একবার নেমে, কতদূর চলে গিয়ে ওদিকের দিগন্তে মিশে অদৃশ্য হয়েচে।

একদিন আমি একা এই পথে অনেকদূর গিয়েচি, সেও বিকেলবেলা। কুঞ্জবন প্যালেসের চূড়া আর দেখা যায় না, চারিপাশে শুধু বন আর পাহাড়।

একজন টিপ্রাই লোক তীরধনুক হাতে সেপথে আসচে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম—এদিকে কি দেখবার আছে? গ্রাম্য টিপ্রাই জাতির কথা বোঝা ভীষণ শক্ত; সে কি বললে প্রথমটা ভালো বুঝতেই পারলুম না, তারপর মনে হল সে বলচে, ওদিকে আর যাবেন না সন্ধ্যার সময়।

—কেন?

—বুনো হাতীর ভয়, এই সব বনে এই সময় আসে।

—তুমি কোথায় থাকো?

—ওদিকে আমাদের গ্রাম আছে এই পাহাড়ের ওপারে—

—তীরধনুক হাতে কেন?

—তীরধনুক না নিয়ে আমরা বেরুই না, জঙ্গলের পথে নানা উৎপাত।

—আমাকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে চল, দেখবো।

—এখন আর সময় নেই, সেখান থেকে ফিরতে রাত হয়ে যাবে—

—তুমি আমায় পেঁছে দিও শহরে, বকশিশ দেবো—

লোকটা রাজি হল না। তার অনেক কাজ আছে, সে যেতে পারবে না।

অতিথিশালায় ফিরে দেখি আমার সঙ্গী টেবিলে আলো জেলে কি লেখাপড়া করচেন। এই ভদ্রলোকটিকে আমার কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হত—কি কাজ করে, কি ভাবে, কি ওর জীবন, এসব জানতে আমার খুব আগ্রহ ছিল মনে মনে। কিন্তু

কোনো কথা সেসব নিয়ে জিজ্ঞেস করা ভদ্রতাসঙ্গত হবে না বলে, তার নিজের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন ইতিপূর্ব্বে করিনি।

আজ হঠাৎ কি জানি কেন বললুম—কি লিখচেন?

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—একটা রিপোর্ট লিখচি—

—কিসের রিপোর্ট?

—আমি পাহাড়ে পাহাড়ে বেরিয়ে দেখলুম ত্রিপুরার পাহাড় অঞ্চলে খনিজ সম্পদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায়নি। মহারাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করচি। এমন কি আমার মনে হয় পেট্রোলিয়ামের সন্ধানও এখানে পাওয়া কঠিন হবে না। সেই সব সম্বন্ধে একটা রিপোর্ট লিখচি। বসুন, আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্চি এখানে পেট্রোলিয়ামের খনি থাকা অসম্ভব নয় কেন।

তারপর ভদ্রলোক আমাকে স্বাধীন ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে বোঝাতে শুরু করলেন। অনেক কিছু বললেন, আমি কিছু বুঝলাম, বেশির ভাগই বুঝলাম না। কেমন করে পৃথিবীর স্তর দুমড়ে বেঁকে উৎসের সৃষ্টি করে, পেট্রোলিয়াম আর কয়লা একই পর্য্যায়ভুক্ত জিনিস, আরও সব কত কি।

ভদ্রলোকের কথাবার্ত্তা আমার বড় ভালো লাগলো।

আমি তাঁর বিষয়ে কখনও কোনো প্রশ্ন করিনি, কেবল পূর্ব্বের প্রশ্নটি ছাড়া। তাঁকে দেখে আমার মনে হল লোকটি বৈষয়িক নয়, অর্থোপার্জ্জন এ'র ধাতে নেই, পয়লা নম্বরের ভবঘুরে মানুষ। সে রাত্রে তাঁর কথাবার্ত্তা শুনে আমার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল।

আমায় তিনি বড়লোক হবার অনেক রকম ফন্দী বাৎলে দিলেন। সামান্য মাইনের চাকরি করে কোনো লাভ নেই। এই সব অঞ্চলের পাহাড়ে কয়লা আছে, পেট্রোলিয়াম আছে, সোনা আছে, জঙ্গলের কাঠ কেটে চালান দিতে পারলে দু বৎসরে ফেঁপে ওঠা যায়। তিনি মহারাজকে ভজিয়ে সত্বর একটা মাইনিং সিন্‌ডিকেট গড়ে তুলবেন, এই আগরতলাতেই তার হেড আপিস হবে, কোনো বড় বিলিতি কোম্পানীর সঙ্গে তিনি চিঠি চালাচালি করবেন এ নিয়ে—ইত্যাদি অনেক কথা।

আমি বললুম—আপনি আর কতদিন আছেন এখানে?

—তা কি বলা যায়? কাজ শেষ না হলে তো যাচ্চিনে। এক মাসের কম নয়, দু মাসও হতে পারে।

—কলকাতায় বুঝি থাকেন আপনি?

—সেখানে ছিলাম কিছুদিন। ঢাকাতেও ছিলাম—আরও অনেক জায়গায় ছিলাম। এখানকার কাজ সেরে রেঙ্গুন যাবার ইচ্ছে আছে। আপার বর্ম্মা অঞ্চলে একবার ঘুরে প্রস্‌পেকটিং করবো। যেতাম এতদিন, শুধু আমার এই শরীরের জন্যে—

—আপনার কি অসুখ?

—হজম হয় না যা খাই। তবুও তো আগরতলা এসে অনেক ভালো আছি। দেখেচেন তো কত লেবু খাই, সারাদিনে পনেরো কুড়িটা কাগজি লেবু না খেলে আমার শরীর ভালো থাকে না।

—আপনার দেশ বুঝি কলকাতায়?

এ প্রশ্নটি করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বাড়ি ও আত্মীয়স্বজনের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। কিন্তু তিনি আমার অযথা কৌতূহলকে তেমন প্রশ্রয় দিলেন না বলেই মনে হল। অন্য কথা পাড়লেন, আবার সেই ভূতত্ত্ব সংক্রান্ত তথ্য। ধীরভাবে কিছু-আমায় সে-যাত্রা উদ্ধার করলে।

খেতে গেলে চাকর আমায় বললে, বাবু, আপনি সাহেবের খবর কি জিজ্ঞেস করছিলেন। উনি এখানে অনেকদিন আছেন, আমরা ওঁর টিকিট বদলে আনি আপিস থেকে। তিনদিন থাকবার পরে টিকিট না বদলালে এখানে থাকতে দেবার নিয়ম নেই। একটা কথা বলচি বাবু, উনি এতদিন আছেন, কখনও কোনো চিঠি আসেনি ওঁর নামে! কেউ নেই বাবু, থাকলে আর চিঠি দেয় না!

আমি ধমক দিয়ে চাকরটাকে চুপ করালুম। তার অত কথার দরকার কি।

একদিন দেখি ভদ্রলোক গ্যেটের ফাউস্ট-এর ইংরিজী অনুবাদ পড়ছেন। আমায় ডেকে দু-এক জায়গা শোনালেন, গ্যেটে সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। বায়রন যখন যুবক, গ্যেটে তখন বৃদ্ধ, বায়রনের মতো সুশ্রী তরুণ কবিও প্রেমিক গ্যেটের মনে কি রেখাপাত করেছিলেন প্রধানত সেই সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। এই বইখানা তাঁর অত্যন্ত প্রিয়, বহুবার পড়েচেন। সর্ব্বদা সঙ্গে রাখেন।

আমি তাঁর টেবিলে 'ফাউস্ট'-খানা পড়ে থাকতে দেখলুম বিকেলেও, তখন তিনি বেরিয়ে গিয়েচেন। বই দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের অবস্থা ভালো নয়। বইয়ের পাতাগুলো ময়লা, বাঁধুনি আলগা, এত প্রিয় বই অথচ এমন অযত্নে রেখেছেন কেন? হাতে পয়সা থাকলে কি আর বই বাঁধাতেন না?

বড় দরের কবিকে ভালোবাসে, এমন লোক দুজন দেখলুম আমার ভ্রমণের মধ্যে, বরিশালের সেই শেক্সপিয়ারের ভক্ত ভদ্রলোক, আর ইনি। কিন্তু দুজনের মধ্যে একটা বড় তফাত রয়েছে, বরিশালের সে ভদ্রলোকের অবস্থা সচ্ছল, এমন কি তাঁকে ছোটখাটো জমিদার বলা চলে, কিন্তু ইনি একেবারে নিঃসম্বল। অথচ কি অদ্ভূত কাব্যপ্রিয়তা! যত রাত্রেই ফিরতেন, তাঁকে দেখতাম 'ফাউস্ট'-এর কয়েকখানা পাতা না পড়ে কিছুতেই ঘুমোতেন না।

আমি যেদিন 'কুঞ্জবন' প্যালেস দেখতে গেলুম দ্বিতীয় বার, সেদিন সকালবেলা ধোপা তাগাদা করতে এসে ভদ্রলোককে অনেক কড়া কথা শুনিয়ে গেল দেখে আমার বড় কষ্ট হল। হিন্দুস্থানী ধোপা, সে গেস্ট-হাউসের অনেক বাবুসাহেবের কাপড় কেচেছে, এমন তাগাদা কাউকে কখনও করতে হয়নি, আজ সাত-আট দিন হাঁটাহাঁটি করচে, আর সে কতদিন হাঁটবে? আমার ইচ্ছে হল ভদ্রলোককে বলি, তাঁর কাছে না থাকে, আমার কাছ থেকে কিছু না হয় নিতে, কিন্তু তাতে যদি তিনি কিছু মনে করেন?

আগরতলায় আমার থাকবার দিন ফুরিয়ে এল। কর্নেল মহিমচন্দ্র দেব বর্ম্মন মহাশয়ের দুটি তরুণ আত্মীয় যুবকের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, এদের যুবক না বলে বালক বলাই সঙ্গত, কারো বয়স সতেরোর বেশি না।

ওরা রোজ গেস্ট-হাউসে আসতো, গল্পগুজব করে চলে যাবার সময় আমায় টেনে নিয়ে যেতো তাদের সঙ্গে। একদিন ওরা বললে, চলুন পিকনিক করা যাক শহরের বাইরে কোথাও—

আমি বললুম, পাহাড়ের দিকে যাওয়া যাক—

আমার গেস্ট-হাউসের সঙ্গীটি তখন ছিলেন না, রাত্রে তাঁর কাছে প্রস্তাব করতেই তিনি তখনি রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, আমায় কি দিতে হবে?

আমরা হিসেব করে দেখেছিলুম জন-পিছু এক টাকা করে দিলেই চমৎকার পিকনিক হয়ে যায়। সস্তার দেশ, তা ছাড়া সাদাসিদে সাধারণ জিনিস ছাড়া পাওয়াই যখন যায় না। ওঁকে সেকথা বললুম, উনি তখন বললেন, তাহলে টাকাটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেবেন সকালবেলা।

আমার ইচ্ছে ছিল না টাকার কথা তোলবার, উনিই তুললেন, কাজেই আমায় বলতে হল। রাত্রে শুয়ে কেবলই মনে হতে লাগলো উনি এখন একটা টাকা পাবেন কোথায় ? বলে ভালো করিনি। কিন্তু টাকা নিতে না চাইলে ভদ্রলোকের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া হয় এদিকে, সুতরাং টাকা দিতে চাইলে নেবো নিশ্চয়।

ভোরে উঠে দেখি আমার সঙ্গী কোথায় বেরিয়েচেন আর আসেন না। আটটার সময় আমাদের রওনা হবার কথা, ছেলে দুটি আমায় ডাকতে এসে বসে রইল, দশটা বাজে, তখনও দেখা নেই তাঁর। প্রায় সাড়ে দশটার সময় তিনি এলেন, আমাদের দেখে যেন কেমন হয়ে গেলেন। আমরা বললুম, আপনার জন্যেই বসে আছি। চলুন বেলা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক আমতা আমতা করে বললেন—হাঁ, এই একটু কাজে বেরিয়েছিলাম। তা এইবার—। খানিক পরে আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমার তো যাওয়া হবে না বিভূতিবাবু, আমার একটু কাজ আছে আজ—

আমি বললুম, তা কখনো হয়! আপনাকে যেতেই হবে। আপনার জন্যে আমরা বসে আছি দেখুন কতক্ষণ থেকে।

তিনি কিছুতেই যেতে চাইলেন না। তাঁর মুখ দেখে যেন বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ বলে মনে হল। আমার তখন কিছু মনে হয়নি কিন্তু তারপরে আমার এ ধারণা হয়েছিল যে ওঁর যাবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও চাঁদার একটি টাকা যোগাড় করে উঠতে না পেরে যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। হয়তো বা সকালে টাকার চেষ্টাতেই বেরিয়ে থাকবেন।

আমি বিশেষ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লাম ভদ্রলোক না যাওয়াতে। কিন্তু কি করি, কোনো উপায় ছিল না। কুঞ্জবন প্যালেস ছাড়িয়ে আরও প্রায় দু মাইল পিছনে একটা ভাঙা বাড়ি আছে কাদের। সেখানে চারদিকে ঘন বন, পাহাড়ী ঝরনা, মুলী বাঁশের ঝাড়, বাঁশবনের আড়ালে টিপ্রাইদের ক্ষুদ্র গ্রাম—চমৎকার নিরিবিলি জায়গা। একটা টিলার মাথায় সেই ভাঙা বাড়িটা। নীচে বাঁশবনের ছায়ায় ঝরনার ধারে রান্নাবান্না করলাম, গান গাইলাম, কবিতা আবৃত্তি করলাম, কাঠ কুড়িয়ে আনলাম রান্নার জন্যে, জল তুললাম। গ্রাম থেকে টিপ্রাইদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে আমাদের কাণ্ড দেখতে লাগলো।

বেলা যখন প্রায় তিনটে বাজে, তখন হঠাৎ 'বিভূতিবাবু! বিভূতিবাবু!' বলে কে যেন ডাকচে—দূর থেকে শুনতে পেলুম। আমরা সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলাম। বাঁশবনের ওপারের পথে টিলার পাশে দূর থেকে কে যেন ডাকচে ঠিকই। আমরা প্রত্যুত্তরে খুব জোরে হাঁক দিলাম, এই যে এখানে! আমাদের একজন রাস্তার দিকে ছুটে গেল।

অল্পক্ষণ পরেই দেখি আমার গেস্ট-হাউসের বন্ধুটি লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবন ভেঙে হাসিমুখে আমাদের দিকেই আসচেন।

—এলুম আপনাদের কাছে, না এসে কি পারি! কাজটা শেষ হয়ে গেল, তাই বলি, যাই। তারপর, কতদূর হল ?

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁকে পেয়ে আমরা তো অত্যন্ত খুশী। আমার সত্যিই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল ভদ্রলোক না আসাতে। তিনি বললেন—এসব জায়গা আমার পরিচিত, পায়ে হেঁটে কতবার এসেছি। আপনারা যখন বললেন কুঞ্জবন প্যালেসের উত্তরের পাহাড়ে যাবেন, তখনই ভেবেচি এই জায়গা। একটু চা খাওয়ান তো আগে, উঃ হাঁপিয়ে গিয়েচি—

আমরা তাঁকে পেয়ে যেমন খুশী, তিনিও আমাদের পেয়ে তেমনই খুশী।

একটু পরে আমরা সবাই মিলে গান আরম্ভ করলুম—তার মধ্যে দুজন রান্না করতে লাগলো। আমার সঙ্গীটি তাঁর বয়স ভুলে আমাদের সঙ্গে গানে আমোদে এমন করে যোগ দিলেন যে সেদিন বুঝলুম তাঁর মনের তারুণ্য, যা জীবনের আর্থিক অসাফল্যে বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

সেইদিন রাত্রে ফিরে এসে তাঁর জীবন সম্বন্ধে কিছু কিছু আমায় বললেন। শুনে আমার পূর্ব্বের অনুমান আরও দৃঢ় হল, লোকটি পয়লা নম্বরের ভবঘুরেও বটে, স্বপ্নালুও বটে।

তখন আমার অটোগ্রাফ নেবার বাতিক ছিল—বললুম তাঁকে আমার অটোগ্রাফের খাতায় কিছু লিখে দিতে। আজও আমার কাছে তাঁর লেখা আছে—নামটি প্রকাশ করবার অনুমতি তাঁর কাছ থেকে আমি নিই নি, কাজেই নাম এখানে দিলাম না। তবে আমার মনে হয় যে প্রকাশ করলেও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না—আজকাল কেউ তাঁর নাম জানে না।

আগরতলা থেকে এলুম ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

এখানে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়িতে উঠি, তিনি ওখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে তাঁর মৃত্যুসংবাদ জেনেছিলাম।

আমি তাঁর ওখানে গিয়ে পৌঁছুই বিকেলবেলা। সন্ধ্যার কিছু আগে তিনি বললেন—আপনি ব্রাহ্মণ, আমার বাড়িতে রাঁধুনী ঠাকুর নেই, আপনাকে নিজে কিন্তু রাঁধতে হবে। আমাদের রান্না তো আপনাকে খেতে দিতে পারিনে—

আমার কোনো আপত্তি ছিল না অবিশ্যি—কিন্তু তাঁদের দিক থেকে ছিল।

সেই বুঝেই আমি রাঁধতে রাজী হয়ে গেলুম।

সন্ধ্যার সময় চাকর এসে আমার বাড়ির মধ্যে রান্নাঘরে ডেকে নিয়ে গেল। আয়োজন দেখে তো আমার চক্ষুস্থির! তিন-চার রকমের মাছ, কপি, বেগুন, শাক, আলু, আরও কত কি পৃথক পৃথক থালায় কোটা। হলুদ বাটা, জিরে বাটা, ছোট ছোট পাত্রে সাজানো।

একবার জীবনে নিজে রান্না করে খাওয়ার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছিল—শুধু ভাতে ভাত রাঁধবার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছিলাম সেই ক-দিন। এত আয়োজনের মহাসমুদ্রে তাতে পাড়ি জমানো যায় না। আমি বিষণ্ণমুখে এটা ওটা নাড়াচাড়া করচি, পাশের ঘর থেকে একটি অল্পবয়সী বিধবা মহিলা এসে আমার রান্নাঘরের দরজার পাশে দাঁড়ালেন।

বোধ হয় আমার হাতা খুন্তি ধরবার ভঙ্গি দেখেই তিনি এক চমকে আমার রন্ধন-বিদ্যার দৌড় বুঝে নিলেন।

চাকরদের ডেকে আমায় কি বলতে বললেন—চাকর বললে, দিদিমণি বলচেন আপনি রাঁধতে জানেন তো? আমি দেখলাম, যদি বলি রাঁধতে জানিনে এদের মুশ-কিলে ফেলা হয়। আমার জন্যে এরা কিভাবে কি খাওয়া দরকার আয়োজন করবে ওই রাত্রিকালে? সেভাবে এদের এখন বিব্রত করা অত্যন্ত অসঙ্গত হবে।

সুতরাং তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললুম—রান্না? কেন জানবো না?—কত রেঁধেছি—

ভাবলুম আর দেরি করা উচিত নয়। যা হয় একটা হাঁড়িতে চড়িয়ে দিই।

কি একটা হাঁড়িতে চড়িয়েচি, মহিলাটি আবার এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আমার রান্নার বহর দেখে তিনি বুঝলেন এভাবে রন্ধনকার্য্য চললে

আমার অদৃষ্টে আজ খাওয়া নেই। অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ করেই বোধ হয় তিনি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। বললেন—আমি দেখিয়ে দিচ্চি আপনি রাঁধুন তো—হাঁড়িটা নামিয়ে ফেলুন। তারপর তিনি সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলে দিতে লাগলেন। দু'তিন ঘণ্টা লেগে গেল সব জিনিস রাঁধতে।

যখন খেতে বসেচি তিনি একটু দূরে বসে আমায় যত্ন করে খাওয়ালেন। হেসে বললেন—আপনি যে বললেন রাঁধতে জানেন?

—একটু একটু জানি, সামান্য। মানে খুব ভালোরকম নয়।

—কিছুই জানেন না আপনি রান্নার।

আমি চুপ করে রইলাম। বিদ্যে যেখানে ধরা পড়ে গিয়েচে সেখানে কথা বলা সঙ্গত নয়। দুদিন আমি তাঁদের বাড়ি ছিলাম। ভদ্রমহিলা চারবেলা কেবল আমার রান্নার জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আমায় রান্না দেখিয়ে দিতেন তাই নয়, তিনি শুধু হাঁড়িটা ছুঁতেন না, বাকি কাজ সব নিজের হাতেই করতেন, তরকারিতে মশলা মাখানো, তরকারি হাঁড়িতে ছেড়ে দেওয়া—সব।

তিনি গৃহস্বামীর বিধবা কন্যা, যেমন শান্ত তেমনি স্নেহময়ী ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা। আমি তাঁকে দিদি বলে ডেকেছিলুম। তিনিও আমার ওপর ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছিলেন যে-দুদিন তাঁদের ওখানে ছিলাম।

আমার ভ্রমণপথে আর একটি মহিলার সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম। সেকথা যথাস্থানে বলবো।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে নোয়াখালি রওনা হই দুপুরের ট্রেনে।

এখানে এসে স্থানীয় জনৈক উকিলবাবুর বাড়িতে উঠি। এক একটা জায়গা আছে যা মনের মধ্যে অবসাদ ও অস্বস্তির সৃষ্টি করে, নোয়াখালি সেই ধরনের শহর।

হয়তো এখানে একটি দিন মাত্র থেকেই চলে যেতাম কিন্তু যে ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়ে উঠেছিলাম তিনি আমায় যেতে দিলেন না। তাঁর আতিথেয়তার কথা আমার চিরদিন স্মরণে থাকবে। ভদ্রলোক নোয়াখালি 'বার'-এর একজন বড় উকিল, তাঁর বাড়ি যেন একটি হোটেলখানা। বাইরের দিকে এক সারি টিনের ঘরে কয়েকটি দরিদ্র স্কুলের ছাত্র থাকে, ভদ্রলোক তাদের শুধু যে খেতে দেন তা নয়, ওদের সমুদয় খরচ নির্ব্বাহ করেন। এ ছাড়া আহূত ও অনাহূত কত লোক যে তাঁর বাড়ি দুবেলা পাতা পাতে তার কোনো হিসেব নেই। এই ভদ্রলোকটির নাম আমি এখানে উল্লেখ করলুম না, তার কোনো প্রয়োজন নেই। আশা করি তিনি আজও বেঁচে আছেন এবং ভগবানের কৃপায় দীনদরিদ্রের উপকার সমান ভাবেই করে যাচ্চেন।

আমার চেয়ে তাঁর বয়স অনেক বেশি, কিন্তু আমার সঙ্গে তিনি মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সী বন্ধুর মতো। সকালে উঠে আমার ঘরে এসে বসে কত গল্প করতেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো ছিল না তাঁর বাড়ি, অত লোককে খেতে দিতে গেলে রাজভোগ দেওয়া চলে না গৃহস্থের বাড়ি। কিন্তু ভদ্রলোকও আমাদের সঙ্গে বসে সেই মোটা চালের ভাত, ডাল আর হয়তো একটা চচ্চড়ি কি ভাজা দিয়ে খেয়ে উঠতেন। তিনি গৃহস্বামী, এত টাকা উপার্জ্জন করেন, নিজের পৃথক ভোগের আয়োজন ছিল না তাঁর।

দেশ বেড়িয়ে যদি মানুষ না দেখলুম, তবে কি দেখতে বেরিয়েচি?

চিরযৌবনা নিসর্গসুন্দরী সব কালে সব দেশেই মন ভুলায়, মন ভুলায় তার শ্যামল চেলাঞ্চল, বনময় ফুলসজ্জা, মধুমল্লীর সৌরভভরা তার অঙ্গের সুবাস।

তাকে সব স্থানে পাওয়া যায় না সে রূপে, কিন্তু মানুষ সব জায়গাতেই আছে। প্রত্যেকের মধ্যেই এক একটা অদ্ভুত জগৎ, দেখতে জানলেই সে জগৎটা ধরা দেয়। তাই দেখতেই পথে বার হওয়া। মানুষের বিভিন্ন রূপ দেখবার আমার চিরকাল আগ্রহ, নতুন দেখলেই মনে হয় ওর সঙ্গে বসে একটু আলাপ করে ওকে চিনি। দেখতে চেয়েছিলুম বলেই বোধ হয় কত রকমের মানুষকেই যে দেখালেন জীবনে!

মানুষকে জেনে চিনে লাভই হয়েচে, ক্ষতি হয়নি, একথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলবো। হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপাতত ক্ষতি বলে মনে হলেও, ভবিষ্যতে মনের খাতায় তাদের অঙ্ক পড়ে গিয়েচে লাভের দিকেই। মানুষের অন্তর একটি রহস্যময় বিরাট বিশ্ব, এর সীমা নেই, শেষ নেই। মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের অভিযান, উত্তর-দক্ষিণমেরু অভিযানের মতই কষ্ট ও অধ্যবসায় সাপেক্ষ, সেই রকমই বৈচিত্র্যময়।

ভদ্রলোক আমাকে বললেন, আপনি এখানে থাকুন আরও কিছুদিন।

আমি বললুম, আমার থাকবার যো নেই, নইলে নিশ্চয়ই থাকতুম।

—এখন আপনাকে ছাড়তে ইচ্ছে হয় না, আবার কবে আসবেন বলুন।

—তার কোনো ঠিক নেই, তবে এদিকে এলেই আপনার এখানে আসবো।

ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও চেহারা এখনও যুবকের মতো। অমন উদার মুখশ্রী আমি খুব বেশি লোকের দেখিনি। আর সব সময়েই আনন্দ হাসিখুশি নিয়েই আছেন।

আমায় বললেন, দেখুন, আমার ইচ্ছে করে লোকজন নিয়ে খুব আমোদ করি। সকলেই আমার এখানে খাওয়াদাওয়া করুক, সবাইকে নিয়ে থাকি। একবার কি হল জানেন, ক-দিন ধরে একটি পয়সা আর নেই, আমার জমানো টাকা বলে কিছু বড় নেই তো—যা আয়, তাই-ই ব্যয়। একদিন আমার স্ত্রী বললেন, শুধু ডাল আর ভাত ছাড়া আর কিছুর ব্যবস্থা নেই। শুধু ডাল দিয়ে ভাত মেখেই সবাইকে নিয়ে আমোদ করে খাওয়া গেল। আমি একা বসে খেতে পারিনে।

সত্যিই তাই দেখেছি এঁর বাড়ি। দিনমানে সকলের একসঙ্গে খাওয়া বড় একটা হয়ে ওঠে না ; কারো কাছারি, কারো স্কুল। কিন্তু রাত্রে ভিতরবাড়ির রান্নাঘরের দাওয়ায় আঠারো-উনিশখানা পিঁড়ি পড়বে। উকিলবাবুর পিঁড়ি মাঝখানে, তাঁর আশেপাশে তাঁর আশ্রিত দরিদ্র ছাত্রগণ, তাঁর ছেলেমেয়েরা, অতিথি-অভ্যাগতের দল। সবাই যা খাবে তাঁকেও তাই দেওয়া হবে।

খাওয়ার সময় সে একটা মজলিসের ব্যাপার।

উকিলবাবু গল্প করতে ভালোবাসেন, গল্প করতে পারেনও। ছাত্রদের উপদেশ দেন, তাঁর প্রথম জীবনের ছোটখাটো ঘটনা বলেন, হাসির গল্প করেন। আমি মজলিশে বিশেষ কোনো আনন্দ পাই নি তার কারণ আমি নবাগত, ওদের কাউকে চিনিনে, অল্পদিনের পরিচয়। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, উকিলবাবু যখন কথা বলচেন, সেখানে আর কেউ বলতো না কিছু, তিনিই একমাত্র বক্তা। যেমন, আমাকে কখনো তিনি কিছু বলবার অবকাশ দেননি। আমার ইচ্ছে করলেও বলতে পারতাম না। আমার মনে হত ভদ্রলোক খুব ভালো কিন্তু বড় সংকীর্ণ জগতে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন।

ওঁর জগৎ এই নিজের বাড়িটি নিয়ে, এই আশ্রিতজনদের নিয়ে, এদের মধ্যে রাজত্ব করেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। এদের বাইরে অন্য কোনো জগৎ ইনি দেখেচেন কি? কখনও দেখবার তৃষায় ব্যাকুল হয়েচেন কি? না দেখলেও কোনো ক্ষতি নেই, যদি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার আকুলতা মনের মধ্যে সদাজাগ্রত থাকে।

বাসনা ও ব্যাকুলতা মনের যৌবন। ও দুটো চলে গিয়েচে যে মন থেকে সে মনে

জরা বাসা বেঁধেচে। নিজে তো সুখ পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। সব বাসনার অবসান যে মনে, আকুলতা তীব্রতা যে মন থেকে—তৃপ্তির দ্বারা ভোগের দ্বারাই হোক, বা ক্ষীয়মাণ কল্পনার জন্যেই হোক—চলে গিয়েচে, সে মন স্থবির।

যেখানে গিয়েচি, সেখানেই দেখেচি ঊর্ণনাভ যেমন নিজের জালের মধ্যে জড়িয়ে বসে থাকে, গুটিপোকা যেমন গুটির মধ্যে নিজেকে বন্দী রাখে, প্রত্যেকে এক এক নিজস্ব ক্ষুদ্র জগতে নিজেদের বন্দী রেখে হৃষ্টমনে জীবনের পথে চলেচে, এজন্যে তারা অসুখী নয়, অতৃপ্ত নয়।

কত জগৎ দেখে বেড়ালে তবে সংকীর্ণতার জ্ঞান মানসপটে প্রতিভাত হয়। এই জ্ঞানটাই বড়, এই জ্ঞান অর্জ্জন করা সময়সাপেক্ষ তাও জানি ; মনুষ্যত্বকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার পথে প্রধান সহায় প্রসারতাকে চেনা, তাহলেই সংকীর্ণতাকেও চেনা যায়।

নোয়াখালি থেকে আমি গেলুম মেঘনার তীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রামে।

সেখানে কোনো কাজের জন্যে যাইনি, বিস্তৃত মেঘনা নদীর তীরে বসে একটা দিন অলসভাবে কাটাতে গিয়েছিলুম। বিদায় নিয়েই এসেচি নোয়াখালি থেকে, এখানে দুদিন কাটিয়ে অন্য দিকে চলে যাবো।

আমার কাজ ছিল মেঘনার ধারে একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ছায়ায় চুপ করে সারাদিন বসে থাকা। বড় গাছ সেখানটাতে নেই, নদীর ধারে বর্ষার ভাঙনে সব গিয়েচে, আছে এখানে-ওখানে দু-একটা ছোটখাটো ঝোপ।

ভারি আনন্দে কাটিয়েছিলাম এখানে এই দুটি দিন।

এত বড় নদী আমাদের দেশে নেই, মেঘনার বিরাট বিস্তৃতিকে সমুদ্র বলে মনে হত, যেন কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে বসে আছি, আমার সামনে যেন চিরজীবন অবসর, কত স্বপ্নজাল বোনার অবকাশ, দীর্ঘ, দীর্ঘ অবকাশ। সব চেয়ে ভালো লাগতো বিকেলে।

ধীরে ধীরে ছায়া পড়ে আসতো বড় বড় ধানের মাঠের উপর, মেঘনার বিস্তৃত জলরাশির উপর। জলচর পাখীর বিরাট দল আকাশ অন্ধকার করে যেন সুদূর কালের চরের দিকে উড়ে যেতো—সন্ধ্যারাগরক্ত আকাশের আভা পড়ত জলে, দূরের বৃক্ষশ্রেণীর মাথায় ; তারপরে আকাশে নবেন্দুলেখা ফুটে উঠতো আমার মাথার ঠিক উপরে। খুব বড় পাল উড়িয়ে মহাজনী বহর চলে যেতো নদী বেয়ে সন্দ্বীপে কি চাটগাঁয়ে!

যাদের বাড়ি উঠেছিলাম, তারা এখানকার বেশ বড় ধরনের গৃহস্থ। কোনো পুরুষে কেউ কাজ করে না, বিস্তৃত ধানের জমির ফসলে বছর চলে যায়—বাড়িতে অনেক গোরু, হাঁস ও ছাগলের পাল।

আমি থাকতাম বাইরের একটা ঘরে। সেদিন বেড়িয়ে ফিরলে গৃহস্বামী আমার কাছে তামাক টানতে টানতে গল্প আরম্ভ করলেন। আমার কৌতূহল হল ওঁদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে জানবার।

জিগ্যেস করলাম—আপনাদের এ বাড়ি কতদিনের?

—আজ প্রায় বিশ বছরের, এদিকে ভাঙন ধরেনি অনেক দিন।

—ধানের জমিতেই আপনাদের চলে বোধ হয়?

—তা আড়াইশো বিঘে জমি আছে।

—নিজেরা লাঙলে চাষ করেন, না ভাগে?

—বর্গা দিই, অত জমি কি নিজ লাঙলে চষা যায়।

—ধান ছাড়া অন্য কোনো চাষ আছে?

—আর যা আছে তা সামান্যই। ধানই এদেশের প্রধান ফসল। গোলার ধান বেচে সংসারের কাপড়চোপড়, ওষুদবিষুদ, বিয়ে-থাওয়া সব হয়।

শুধু মাত্র ধানের ফসলের ওপর এখানকার জীবনযাত্রা প্রতিষ্ঠিত। দেখেচি সকালে উঠে ছেলেমেয়েরা পান্তা ভাত খায়, বড়লোকেরা খায় চিঁড়ে, মুড়ি বা খই। মুড়ির চেয়ে এখানে চিঁড়ে বা খইয়ের চলনই বেশি। দুপুরে গরম ভাত—বিকেলে ছেলেমেয়েদের জন্যে আবার বাসি ভাত বা খই চিঁড়ে। রাত্রে সকলের জন্যে আবার গরম ভাত। ধান থেকে যা পাওয়া যায়—তা ছাড়া অন্য কোনো খাদ্য এখানে মেলে না, খেতেও এরা অভ্যস্ত নয়। অবিশ্যি তরিতরকারি মাছ দুধের কথা বাদ দিই। ফলের মধ্যে নারিকেল ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না।

যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি এখান থেকে চলে যাই, সেদিন সকালবেলা গৃহস্বামী বৈষয়িক কাজে কোথায় চলে গেলেন। আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রাখলুম ; তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন যে, আমার যাবার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

বাড়িতে পুরুষমানুষের মধ্যে একজন চাকর, ক্ষেতখামারের কাজ দেখে আবার ক্ষেতের তরি-তরকারি হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে। আমার খাওয়ার জায়গা বাইরের ঘরের সঙ্গে একটা ছোট কুঠুরিতে হ'ত, এদিন সে-ই খাবার সময় উপস্থিত রইল। মেয়েরা আমার সামনে বেরুতেন না, ভাত দিয়ে তাঁরা চলে যেতেন, খেতে বসে কোনো জিনিসের দরকার হলে ন-দশ বছরের একটি ছোট মেয়ে নিয়ে আসতো।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গরুর গাড়ি এল। আমি জিনিসপত্র গাড়িতে তুলে দিতে বললাম। এমন সময় সেই ছোট মেয়েটি এসে বললে—বাড়ির মধ্যে আসুন—ডাকচে মা—

আমি ভাবলাম আমায় ভুল করে ডাকচে, ছেলেমানুষ। আমায় কেন ডাকবেন তাঁরা? বললুম—কাকে ডাকচেন খুকি? আমি নয়, তোমার ভুল হয়েছে।

—না, মা বললেন আপনাকে ডেকে নিয়ে আসতে—

অগত্যা খুকির সঙ্গে আমি বাড়ির মধ্যে গেলাম। গিয়ে দেখি নীচুমত চালা-ওয়ালা একটা দাওয়ায় একখানা আসন পাতা, তার সামনে থালায় খাবার সাজানো।

খুকি বললে—আপনাকে মা খেতে বলেচেন—আপনি গাড়িতে যাবেন, কোথাও খাওয়া হবে কি না, খেয়ে নিন।

আমি সত্যই অবাক হয়ে গিয়েচি তখন।

এখান থেকে চার মাইল দূরবর্ত্তী স্টেশনে গিয়ে রেলে চাপবো এবং প্রায় সারা-রাতই ট্রেনে কাটাতে হবে—এ অবস্থায় খাওয়া হবে না তো নিশ্চয়ই, কিন্তু মেয়েরা সেকথা আন্দাজ করলেন কি করে—এই ভেবে আমি আশ্চর্য্য না হয়ে পারলুম না।

খেতে বসে গেলুম অবিশ্যি। আমি ব্রাহ্মণ মানুষ, সূর্য্য ডুববার পূর্ব্বে দু বার ভাত খাবো না—বোধ হয় এই কথা ভেবে মেয়েরা খেতে দিয়েচেন চিঁড়ে খইয়ের লাড়ু, নারকোলের লাড়ু, মুড়কি, দুধ, কলা ইত্যাদি।

আমার মনে আছে ছোটবড় নানা আকারের লাড়ু, কতগুলো খেলার মার্ব্বেলের মতো ছোট।

যতক্ষণ থালার সমস্ত খাবার নিঃশেষ না করলাম, ততক্ষণ মেয়েরা ছাড়লেন না —ছোট মেয়েটিকে দিয়ে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন এটা খেতে ওটা খেতে। তাঁদের আগ্রহে ও আন্তরিকতায় আমার মনে যে ভাব জাগলো—তা হল নিছক বিস্ময়ের ভাব।

কেন আমাকে খাওয়ানোর জন্যে এঁদের এত আগ্রহ? অতিথি বিদায় নিয়ে গেলে

তো ঝামেলা মিটে যায়—সে লোকটা রাত্রে আবার পেট ভরে খেলে না খেলে তার জন্যে মাথাব্যথা করার কার কি গরজ?

জগতে নিঃস্বার্থ স্নেহ ও সেবা খুব বেশি দেখা যায় না বলেই অনেক বৎসর পূর্বের সেই সন্ধ্যায় সেই অজানা গৃহলক্ষ্মীদের স্নেহের স্মৃতি আমার মন থেকে আজও মুছে যায়নি।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর পুল পার হয়ে আবার ট্রেন এসে থামলো ঘোড়াশাল স্টেশনে।

ঘোড়াশাল ঢাকা জেলায়—এখান থেকে কিছুদূরে নরসিংদি গ্রামের হাই-স্কুলে আমার এক বন্ধু হেডমাস্টার, অনেকদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি, বিদেশ-ভ্রমণের সময় পরিচিত বন্ধুজনের দেখাসাক্ষাৎ বড় আনন্দদান করে, সেজন্যে ঠিক করেছিলাম ঢাকা যাবার পথে বন্ধুটির ওখানে একবার যাবো।

নরসিংদি বেশ বড় গ্রাম, তবে স্কুলের জায়গাটি কিছু দূরে, গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্যে স্কুল। আমি যখন গিয়ে সেখানে পৌঁছুলাম—তখন বেলা প্রায় এগারোটা। একটি ছাত্রকে জিজ্ঞেস করতে বললে, হেডমাস্টারবাবু এখন ক্লাসে আছেন।

ছেলেটিকে বললুম, আমি এখানে অপেক্ষা করচি, তুমি হেডমাস্টারবাবুকে গিয়ে বল তাঁর একজন বন্ধু দেখা করতে এসেচে। কিছুক্ষণ পরে দেখি আমার বন্ধু ছেলেটির পিছু পিছু আসচেন। এ ভাবে এই দূর প্রবাসে আমাকে হঠাৎ দেখে তিনি খুব খুশী।

বললেন, তারপর, কোথা থেকে এলে হে?

আমি কি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পড়েচি, তা সব খুলে বললুম। বন্ধু বললেন—বেশ ভালো, ভালো। এখানে যখন এসে পড়েচ, কিছুদিন থাকো। কলকাতা থেকে এসে একেবারে হাঁপিয়ে পড়েচি হে—আজ দু বছর এই 'গড-ফরসেক্‌ন্‌' জায়গায় যে কি কষ্টে আছি তা আর কি বলবো! একটা লোকের মুখ দেখতে পাইনে—

—সুন্দরবনে বাস করচো নাকি? এত লোকের মধ্যে থেকেও লোকের মুখ দেখতে পাও না কি রকম?

অজ পাড়াগাঁয়ের স্কুল। পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম—স্কুলের শিক্ষক যাঁরা সকলেরই বাড়ি এখানে, হেডমাস্টার আর হেডপণ্ডিত এই দুজন মাত্র বিদেশী। আমার বন্ধু ছাত্রজীবনে পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন, খুব স্মার্ট, ভালো ক্রিকেট খেলোয়াড়, চেহারাও খুব সুন্দর।

এহেন স্টাইলবাজ, সুপুরুষ, ইংরেজিতে উঁচু সেকেণ্ড ক্লাস পাওয়া ছেলে মাত্র ষাট টাকা মাইনেতে এই সুদূর ঢাকা জেলার এক পাড়াগাঁয়ে এসে আজ তিন বছর পড়ে আছে!

চাকুরির বাজার এমনি বটে!

এই সব কথা মনে মনে ভাবছিলুম সারা পথ আসবার সময়ে।

কিন্তু এখানে এসে মনে হল বন্ধুটি যে জায়গায় আছে, আর কিছু না হোক, অন্তত প্রাকৃতিক দৃশ্য হিসেবে জায়গাটা ভালো। গ্রামের বাইরে দিগন্ত-বিস্তীর্ণ মাঠ মেঘনার তীর ছুঁয়েচে, তারি মাঝে মাঝে ছোট ছোট বেতঝোপ, মাঝে মাঝে বুনো শটির গাছ। এদিকে একটা ছোট খাল।

স্কুলের বাড়িটি এই ছোট খালের ধারে, বড় বড় ঘাসের বনের আড়ালে। নিকটে

লোকালয় আছে বটে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ মনে হয় অস্ট্রেলিয়ার বা দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে এসে পড়েচি কোন মায়াবলে।

স্কুল-বাড়ির পাশে বোর্ডিং। তিন-চারটি বড় বড় ঘর, সেগুলির মেজে হয়নি এখনও, সুতরাং মাটির সঙ্গে প্রায় সমতল, অত্যন্ত নীচু ভিতের ওপর বাড়িটা গাঁথা। আমার বন্ধুর কথামত একটি ছেলে আমায় সঙ্গে করে এনে বোর্ডিং-এর একটা ঘরে বসিয়ে রেখে গেল।

আমার বন্ধুটি এই ঘরে থাকেন। একটা কাঠের তক্তপোষ, তার ওপর আধময়লা একটা বিছানা, আর তার ওপর খানকতক বই ছড়ানো। অন্যদিকে কতকগুলো চায়ের পেয়ালা, একটা স্টোভ, দুটি টিনের তোরঙ্গ, একজোড়া পুরোনো জুতো ইত্যাদি। হেডমাস্টারের জন্যে বোর্ডিং-এর এই ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হয়েচে বুঝলাম।

স্কুলের ছুটি হয়ে গেল ঘণ্টা-দুই পরেই।

আমার বন্ধু হাসিমুখে এসে ঘরে ঢুকলেন। আর দুটি আধময়লা কাপড় পরা শিক্ষক তাঁর সঙ্গে বোর্ডিং-এর দোর পর্য্যন্ত এসে সম্ভবত হেডমাস্টারকে পেঁছে দিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। আমার বন্ধু তাঁদের বললেন, আপনারা আসবেন কিন্তু এখুনি—বেশি দেরি না হয়, চা খাবার সময় হয়েচে প্রায়।

আমি ভাবলুম আমার বন্ধু বোধ হয় ওই দুটি শিক্ষককে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে। বন্ধুকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে তিনি ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন—ওদের আবার নেমতন্ন করবো কি। ওরা তো দিনরাত এখানে পড়ে থেকে আমায় খোশামোদ করে—আমাদের ড্রইং মাস্টার একজন আর একজন সেকেন্ড পণ্ডিত। ওদের বললাম এসে চা করতে আমাদের জন্যে—ওরা আমার অর্দ্ধেক কাজ করে দেয়।

সেই পুরনো চালবাজ বন্ধু আমার! কিছুই বদলায়নি ওর।

তারপর আমার বন্ধু বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন—সব বাঙাল হে, সব বাঙাল! মুখ দিয়ে ভাষা উচ্চারণই হয় না। আমাদের মতো ইংরিজি বাংলা মুখ দিয়ে বেরুবে কোথা থেকে ওদের? আমার ইংরিজি শুনে ওরা সবাই ভারি আশ্চর্য হয়ে যায়। বলে, এমন উচ্চারণ কখনো শুনিনি। তাই সবাই খুব খাতির করে।—বন্ধু গর্ব্বভরে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

অনেকদিন পরে সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাতে বড় আনন্দ হল। কলেজ জীবনের কথা মনে পড়লো। পটুয়াটোলার একটা মেসের ঘরে বসে বন্ধুটির মুখে এমনি কত চালবাজির কথাই যে শুনেচি!

কিছুক্ষণ পরে সেই দুটি মাস্টার এসে ঘরে ঢুকলেন। আমার বন্ধু মিথ্যা নেহাত বলেনি, ঘরে ঢোকবার মুহূর্ত্ত থেকে আর যতক্ষণ তারা ছিল ততক্ষণ এমন একটা নম্র, লাজুক, নিতান্ত দাসসুলভ ব্যবহার করলে আমার বন্ধুর সামনে যে দেখে আমার নিতান্ত কষ্ট হল।

এদের কথায় খুব বেশি ঢাকা জেলার টান, কিন্তু আমার কানে বেশ লাগতো। ড্রইং মাস্টারটির বয়স একটু বেশি, তিনি ঢোকবার কিছু পরেই আমার বন্ধুর রূপ-গুণ ও বিদ্যার প্রশংসা সেই যে শুরু করলেন, আর হঠাৎ সে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে আসতেই চান না। আমায় বললেন, বাবুর বাড়ি?

—কলকাতায়—

—আপনি আর হেডমাস্টারবাবু পড়েছিলেন একসঙ্গে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—

—আপনিও এম-এ পাস?

—আমি বি-এ পাস করেছিলুম—আর পড়া ঘটেনি।

—কি করেন এখন বাবু?

—একটা চাকরি করি, তাতে বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। সেজন্যেই তো আপনাদের দেশে এসে পড়েচি—

—খুব ভালো হয়েচে এ গরিবদের দেশে এসেচেন। আপনারা কলকাতার কলেজের ভালো ছেলে, আপনাদের মুখের ভাষাই অন্যরকম। বড় ভালো লাগে হেডমাস্টার-বাবুর মুখের বাংলা আর ইংরিজি শুনতে। এ রকম এদেশে কখনও শোনেনি—

এই দুটি শিক্ষক দেখলুম আমার বন্ধুর সমস্ত কাজ করে দেয়। ওরাই চা করে আমাদের খেতে দিলে, আবার তামাক সেজে দিলে, একজন গিয়ে বাজার থেকে পান নিয়ে এল, কারণ পান ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ওরা অনেক রাত পর্য্যন্ত রইল। সন্ধ্যার পরে ওরা আমার বন্ধুকে বললে—মাস্টারবাবু, তাহলে আপনি বসুন, বাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমরা দুজনে খাবারটা তৈরী করে ফেলি।

আমি বললুম, কেন, বোর্ডিং-এর ঠাকুর নেই?

—আছে, তা উনি ঠাকুরের হাতে খান না। নিজেই রাঁধেন, আমরা যোগাড়-যন্ত্র করে দিই—

—বোর্ডিং-এর চাকরে সে সব কাজ করে না?

—চাকর নেই এ বোর্ডিং-এ। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে।

আমি বন্ধুকে বললুম, চলো আমরাও রান্নাঘরে গিয়ে বসি।

রান্নাঘরে আমরা এসে বসলুম বটে, কিন্তু সেখানে আমাদের জন্য ময়দা মাখা, রুটি সেঁকা, তরকারী রাঁধা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করলে শিক্ষক দুটি।

আমার বন্ধু বেশ চুপ করেই বসে রইলেন—ওদের কাজে এতটুকু সাহায্য করলেন না। এমনভাবে ওদের সেবা নিলেন, যেন এ সেবা তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য। ব্যাপার দেখে মনে হল রোজই এই ব্যাপার চলে—শিক্ষক দুটিই প্রতিরাত্রে হেডমাস্টারের রান্না-বান্না করে দিয়ে যায়।

আমাদের পরিবেষণও করলে ওরা।

ড্রইং মাস্টারটি আমায় বললে, আপনি কিছু খাচ্চেন না কেন বাবু? ভালো করে খান।

কত যত্নে ওরা আমায় বসে খাওয়ালে। হেডমাস্টারের বন্ধু, সুতরাং আমিও ওদের খাতিরের ও খোশামোদের পাত্র—অমন যত্ন আমার আপনার জনও বোধ হয় কোনদিন করেনি।

রাত্রে ওরা বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় আমাদের জন্যে পান পর্য্যন্ত সেজে রেখে গেল। আমি কিছুদূর গেলুম ওদের এগিয়ে দিতে।

ড্রইং মাস্টারটিকে দেখে মনে কেমন অনুকম্পা জাগে। যেমন নিরীহ তেমনি দরিদ্র। কাপড়চোপড় বেশি নেই, একটা আধময়লা পিরানের ওপর একটা উড়ুনি, একখানা আধময়লা মোটা ধুতি, এই ওর পরিচ্ছদ।

আমি মাঠের মধ্যে গিয়ে ওকে বললুম—আপনার বাড়ি কোথায়?

—এই কাছেই, শাঁখপাড়া গ্রাম।

—কতদিন স্কুলে আছেন?

—তা প্রায় সাত বছর আছি বাবু।

—কিছু মনে করবেন না—এখানে কত পান?

—পনেরো টাকা—আর হেডমাস্টারবাবু এসে আমায় দিয়ে স্কুলের খাতাপত্র লেখার কাজ কিছু কিছু করিয়ে নিয়ে স্কুল থেকে তিন টাকা মাসে দেওয়ান। বড় উঁচু মন ওঁর।

—বাড়িতে কে কে আছে আপনার?

—বাবা মা, দুই বোন, আর আমার স্ত্রী, আমার একটি ছোট ছেলে।

—মাইনে তো খুব বেশি না। অন্য স্কুলে যান না কেন?

—কে দেবে বাবু? আজকাল চাকরির বাজার যা, বি-এ পাস করে বেকার বসে আছে আর আমি তো মোটে নর্ম্মাল ত্রৈবার্ষিক পাস। আমাদের কি চাকরি হঠাৎ জোটে বাবু।

—জমিজমা আছে বাড়িতে?

—সামান্য ধানজমি আছে, তাতে ছ-মাসের খোরাকী চালটা ঘরে আসে। বাকি ছ-মাস টানাটানি করে সংসার চলে। কি করবো বাবু, যখন এর বেশি রোজগারের ক্ষমতা নেই—এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

নর্ম্মাল পাস করা একজন পণ্ডিত আজ সাত বছর পনেরো টাকায় ঘষচে, কোনো-খানে উন্নতির আশা নেই। শেয়ালদা স্টেশনের একজন কুলিও মাসে অন্তত পনেরো টাকার দেড়গুণ থেকে তিন-চারগুণ রোজগার করে।

এদের দিকে চাইলে কষ্ট হয়, এরা আমাদের ছেলেপুলেকে মানুষ করে দেবার ভার নিয়েচে, পরম নিশ্চিন্তে সে ভার এদের ওপর চাপিয়ে আমরা বসে আছি। একথা কি কখনো ভাবি যে এরা কি খেয়ে আমাদের সন্তানদের মানুষ করে দেবে? হাওয়া খেয়ে তো মানুষ বাঁচে না।

আবার সকাল হতে না হতে এরা ফিরে এসে জুটলো হেডমাস্টারের ঘরে। সকালের চা এরাই করে দিলে, বোঝা গেল এ কাজ ওরা রোজই করে। আসবার সময় এরা আবার একটা কাঁচকলা ও গোটাকতক ডিম এনেছে। ওদের ওপরওয়ালা হেড-মাস্টারকে খুশী রাখবার জন্যে কত না আয়োজন ওদের।

আমার বন্ধুটি আগের মতো পড়াশুনো করেন না। এখানকার এই সব অর্দ্ধ-শিক্ষিত লোকদের ওপর সর্দ্দারি করে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্চেন।

ইনি এক সময় নিজেকে সচল এন্‌সাইক্লোপিডিয়া করবার দুরূহ প্রচেষ্টায় অনেক সময় ব্যয় করেছিলেন, বন্ধুবান্ধব মহলে বাজি রেখে পরের ভুল ধরে ছাত্রাবস্থায় আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

এঁকে জিজ্ঞেস করলুম—কি হে, এখানে পড়াশুনো কি রকম করচো?

—না ভাই, এখানে কিছু বই নেই, নিজেরও অত পয়সা নেই যে বই আনাই।

—তা হলে কষ্টে আছো বলো?

—তা নয়, আমার মত বদলাচ্ছে ক্রমশ।

—কি রকম, শুনি?

—কতকগুলো ইনফরমেশনের বোঝা মাথার মধ্যে চাপিয়ে নিয়ে আগে ভাবতুম খুব বিদ্যে হয়েচে আমার। যাদের মাথার মধ্যে এসব থাকতো না, তাদের ভাবতুম মূর্খ, কিছু জানে না। এখন দেখচি জীবনে সব কিছু জানবার প্রয়োজন নেই—কয়েকটি বিষয় বেছে নিয়ে শুধু তাদের সম্বন্ধে জানলেই সারা জীবন কেটে যেতে পারে। অন্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানবার দরকার হয়—রেফারেন্সের বই খোলো, দেখ। মানুষের মস্তিষ্কের ওপর অনাবশ্যক বোঝা চাপিয়ে লাভ নেই।

—সত্যিই তোমার অনেক বদলেচে দেখচি—

—তার মানে কি জানো, তখন ছিলুম সদ্য কলেজের ছোকরা, রক্ত বেজায় গরম, এখন ক্রমশ অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক বুঝচি। অভিজ্ঞতা না হলে কিছু হয় না জীবনে।

—সে কি হে? জীবনে অভিজ্ঞতা তো হবেই। তাই নিয়েই তো জীবন। এক জায়গায় যদি চুপটি করে বসেও থাকো বেঁচে, তা হলেও অভিজ্ঞতা আটকায় কে। কি বুঝলে অভিজ্ঞতায়?

—বুঝলুম এই, জীবনে যদি কিছু দিতে হয় তবে নির্জ্জনে ভাবার দরকার বড্ড বেশি। পড়ার চেয়েও অনেক বেশি। এখানে এই নির্জ্জন জায়গায় আজ দুবছর একা বাস করে অনেক বদলে গিয়েচি হে—অনেক কিছু বুঝেচি।

—কিন্তু যার মাথায় কিছু নেই—দুনিয়ার কোন খবর রাখে না, তার চিন্তার মূল্য কি দাঁড়াবে?

—অন্তত আমার সম্বন্ধে তুমি একথা বলতে পারো না। আমি এখন যদি চিন্তা করি, তার খানিকটা মূল্য অন্তত আমার কাছেও দাঁড়াবে। আমার নিজের জীবন সম্বন্ধে—পরের কথা আমি ভাবিনে, নিজের জীবনের কথা। অনেক কাজ হয় এতে।

—কোন্ বিষয় ভালো লাগে পড়তে?

—পলিটিক্স্ সম্বন্ধে জানবার বড় ইচ্ছে। আগে এই জিনিসটা ভালো করে পড়িনি—এখন মনে হয়, না পড়ে ভালো করিনি।

—দেশের পলিটিক্স্? না বিদেশের পলিটিক্স্?

—সব দেশেরই—বিশেষ করে নিজের দেশের।

—আমার মত এসব সম্বন্ধে অন্য রকম।

—কি শুনি তোমার মত?

—আমার মতে ইউনিভার্সকে বুঝতে চেষ্টা না করলে মানুষের কিছুই হল না।

—গ্রহ-নক্ষত্র, এই সব?

—শুধু গ্রহনক্ষত্র নয়, সব কিছু। পশুপক্ষী, গাছপালা, পৃথিবী, গ্রহনক্ষত্র, Space—এক কথায় আমাদের জীবনের গোটা পটভূমিই। ইউনিভার্সকে না বুঝলে তার স্রষ্টার সম্বন্ধে কিছুই বোঝা যাবে না। ভগবানের বিরাট ঐশ্বর্য্যরূপটা আগে প্রত্যক্ষ করি—তারপর তাঁর সম্বন্ধে ভাববো।

আমাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল স্কুলের সামনের ফাঁকা মাঠে একটা বেঞ্চির উপর বসে। সময়টা ছিল সন্ধ্যার কিছু পরেই। মাঠভরা জ্যোৎস্না সেদিন, এখানে দু-একটি ক্ষীণ তারা আকাশের গায়ে, জ্যোৎস্না পড়ে সবুজ বেতের ঝোপ চিক চিক করচে।

অনেকদিন এমন ফাঁকা মাঠের মধ্যে বসে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলিনি। দুজনেরই মনে বোধ হয় একথা উঠেছিল, কারণ আমার বন্ধুটি চারিদিকে চেয়ে বললেন—কেমন জায়গাটা, ভালো নয় হে?

—চমৎকার। এখানে এতদূরে ঢাকা জেলায় চাকরি পেলে কি করে?

—খবরের কাগজে দেখে দরখাস্ত করেছিলুম, আমাকে এরা তখুনি অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট দিল।

—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন না অন্য কিছু একটা পাই। কলকাতার কাছে যাবার বড় ইচ্ছে—

—আমি কিন্তু তোমার এই জায়গা বেশ পছন্দ করেচি। এই রকম ফাঁকা জায়গায় বাস করবার খুব ইচ্ছে আমার মনে, যদিও কখনো হয়নি।

—তুমি ভাই যে সব ভাবনার কথা বললে, Space, God absolute, Stars ইত্যাদি—ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। আমি চাই যাতে দেশের আর দশের উপকার হয়, পলিটিক্‌স্‌ ভিন্ন অন্য কিছুর চর্চা ভালো লাগে না। সমাজে বাস করে, মানুষের মধ্যে বাস করে, তাদের কথা ভাবলুম না, তাদের বুঝবার চেষ্টা করলুম না —কিনা কোথাকার নক্ষত্র, কোথাকার Space —এ সব আমায় appeal করে না—

—নানা রকমের মানুষ আছে, নানা রকমের মত আছে। তোমার যা ভালো লাগে তোমার কাছে তাই ভালো। তবে আমি যদি থাকতে পেতুম, তবে অন্য কথা চিন্তা করতুম। পলিটিক্‌সের কথা আমার মনেও উঠতো না।

—তুমি যদি থাকতে এখানে, আমার দলে ভিড়িয়ে নিতুম একমাসে—

—অর্থাৎ পলিটিক্‌সের দলে? আমার মনে হয় না যে তুমি সাফল্যলাভ করতে সে কাজে। আমি তোমার দলে যেতুম না। এমন মুক্ত মাঠের মধ্যে বসে পলিটিক্‌সের কথা যদি মনে উঠতো, তবে মেঘনা নদীর পারে অমন সান-সেট হওয়ার সার্থকতা কি রইল?

—থাকো না কেন এখানে? আমি চেষ্টা করবো স্কুলে?

—না ভাই, এখন একটা চাকরি হাতে রয়েছে, এখন থাক্‌। পরে দরকার হলে জানাবো। কিন্তু তুমিই বা এ অজ পাড়াগাঁয়ে কতকাল পড়ে থাকবে?

—তা তো জানিনে। এখানে থাকলে সব ভুলে যাবো। অল্‌রেডি মনে সন্তোষ এসে গিয়েচে, অর্থাৎ মনে হচ্চে বেশ তো আছি।

—ওই তো Danger signal —পুরুষের পক্ষে নিজের অবস্থায় সন্তোষ বড্ড খারাপ লক্ষণ বলে বিবেচনা করি—

—আমারও ভয় হয়। তবে চাকরির যা বাজার তাতে তো নড়তে পারিনে এখান থেকে। কোথায় যাবো ছেড়ে দিয়ে? অথচ এ যেন মনে হচ্ছে কোথায় পৃথিবীর এক কোণে পড়ে আছি, কোনো কিছু খবর রাখচিনে দুনিয়ার, একেবারে পুরোনো হয়ে গেলুম হে—

—কাণ্টের মতো দার্শনিক একটা ছোট্ট শহরে ছিলেন জার্ম্মানির, এত বড় চিন্তা করবার খোরাক পেয়েছিলেন সেখানে থেকেই। শহরে না থাকলেই লোক পুরোনো হয় বলে মনে কর কেন? নতুন আর পুরোনো অত্যন্ত সাধারণ ধরনের শ্রেণীবিভাগ —নতুন মাত্রেই ভালো নয়, পুরোনো মাত্রেই মূল্যহীন নয়—একথা তোমাকে তো বলবার দরকার করে না।

এই সময় শিক্ষক দুটি এসে পৌঁছুলো। তারা দূর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে এই দিকেই এল। ড্রইং মাস্টার বিনীতভাবে বললে—মাস্টারবাবু, চা করে আনি? আর রাত্তিরে আপনারা কি খাবেন?

আমি তাদের বসালুম বেঞ্চিতে। তারা বসতে চায় না—চা করে এনে না হয় বসবে এখন, দেরি হয়ে যাবে চায়ের—আসলে হেডমাস্টারের সঙ্গে এক বেঞ্চিতে বসতে বোধহয় সঙ্কোচ বোধ করে, আমার অন্তত তাই মনে হল।

আমি বললুম—আচ্ছা, আপনাদের এই গাঁয়ের মাঠ কেমন লাগে আপনাদের কাছে?

ড্রইং মাস্টার বললে—বেশ লাগে, মেঘনার ধারে আরও ভালো। চলুন, যাবেন? জ্যোৎস্নারাত, ভারি চমৎকার দেখতে হয়েচে। মাস্টারবাবু যদি চান—

আমার সেকথা মনেই ছিল না। সিকি মাইল দূরে মেঘনা, জ্যোৎস্নারাত্রে মেঘনার তরঙ্গভঙ্গ দেখবার লোভ সামলাতে পারা গেল না।

বন্ধুকে নিয়ে আমরা গেলুম মেঘনার ধারে। ওপারে কি একটা গ্রাম, এপারে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বাঁশবন, বনঝোপ। নোয়াখালি জেলার মেঘনা যতখানি চওড়া দেখেচি, এখানে নদী তার চেয়ে ছোট। তবুও আমার মনে হল জলরাশির এমন শোভা দেখেছিলুম শুধু কক্সবাজারের ও মংডুর সমুদ্রতীরে। সন্দ্বীপের তালীবন-শ্যাম উপকূল-শোভা সেই এক সন্ধ্যায় স্টীমারের ডেক থেকে প্রত্যক্ষ করে মনে যে আনন্দ পেয়েছিলুম, আজও যেন সেই ধরনের আনন্দই আবার ফিরে এল মনে।

আমার বন্ধুটি মেঘনার ধারে বড় একটা আসেন না, তিনিই বললেন। এই সিকি মাইল পথ তিনি হাঁটতে রাজী নন। বললেন—আমার ওসব ভালো লাগে না, জল দেখে তোমাদের যে কি কবিত্ব উথলে ওঠে তোমরাই বলতে পারো।

ড্রইংমাস্টার লোকটি বেশ প্রকৃতি-রসিক—প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার মতো চোখ আছে ওঁর, একথা মনে মনে আমাকে স্বীকার করতেই হল।

আমার বন্ধু বললেন—আসলে তোমরা এতে দেখ কি বলতে পারো?

—কি করে বোঝাবো? এই নদী, জল, জ্যোৎস্না-ভরা আকাশ—এ বেশ ভালো লাগে, তাই দেখি।

—কোন্ দিক থেকে ভালো লাগে—picture effect of the landscape?

—তাই বটে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি।

—তুমি কি অস্বীকার করতে পারো যে তুমি যাকে একটা মস্ত spiritual আনন্দ বলে মনে করচো, তার সবখানিই sensuous?

—প্রত্যেক ইস্‌থেটিক আনন্দ মাত্রেই sensuous, তবে এ আনন্দ সূক্ষ্মতর শ্রেণীর; spiritual আনন্দের সগোত্র না হলেও নিকটতম আত্মীয় বটে। তবে এর প্রকৃতি চিরে চিরে কেটে কেটে দেখতে বোলো না। আমার মনে হয় কেউই তা করতে পারবে না। শাস্ত্রে চরম আনন্দকে বলেচে, ব্রহ্মকে আস্বাদ করেচে যে বিচার করবে? আনন্দের analysis ওভাবে হয় না।

আমি একটা কবিতা পড়ে এর সমানই আনন্দ পাই যদি বলি?

—এ তর্ক তোমার সঙ্গে করবো না, কারণ আমার ধাত অন্যরকম। আমার মনে হয় বন্ধ ঘরে বসে হাজার কবিতা পড়লেও সে আনন্দ তুমি কিছুতেই পাবে না।

এখানে আমার মনে পড়লো সন্দ্বীপের তালীবন শ্যাম উপকূল, আর আওরঙ্গজেবপুরের নিকটে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সেই বনভূমি।

আমার বন্ধু প্রতিবাদ করে বললেন—এ তোমার গা-জুরি কথা হ'ল।

—শোনো, একটা কথা আছে। দু ধরনের লোকের মধ্যে—যারা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে ভালোবাসে আর যারা ভালোবাসো না—এক দলের চোখ আছে, অন্য দলের নেই। চক্ষুষ্মান্ ও অন্ধ দু দলে তুলনা হয় না, এখানে বিচার হবে চক্ষুষ্মান্ লোক বন্ধ ঘরে কবিতা পড়ে যে আনন্দ পায়, সেই ধরনের আনন্দ সে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থেকে পায় কি না। সুতরাং ভেবে দেখ এ নিয়ে তর্ক হতে পারে কি?

সম্মুখে মেঘনা নদীর বুকে জ্যোৎস্নারাশি এক মায়াপুরীর সৃষ্টি করেচে। আমার মনে হল শুধু এই দৃশ্য প্রতিদিন দেখবার সুযোগ পাবো বলে স্কুলমাস্টারি নিয়ে থেকে যেতে রাজী আছি।

এক বছর ধরে এই দৃশ্য রোজ দেখলে মনের আয়ু বেড়ে যায়।

আমার বন্ধু বললেন—আমার আরও ভালো লাগে না এতদূরে আছি বলে, দেশের মধ্যে হলে বোধহয় ভালো লাগতো।

—আমার মনে হয় এ তোমার ভুল। দূরে থাকা একটা advantage, প্রাকৃতিক

দৃশ্য উপভোগ করবার পক্ষে।

—কি রকম?

—দেশ থেকে দূরে যত যাবে, তত landscape -এর প্রকৃতি তোমার কাছে রোমাণ্টিক হয়ে উঠবে। ভ্রমণকারী ও explorer-রা এটা ভালো বুঝতে পারে। বরফ ইংলণ্ডেও জমে শীতকালে, তবে নর্থ পোলের বরফ মনে অন্য রকম ভাব জাগায়। একই বাঁশবন দেশের খালের ধারে দেখচো অথচ ইরাবতীর পাহাড়ী ধারে সেই একই বাঁশবন দেখো—বুঝতে পারবে কি ভীষণ তফাত। এবারকার ভ্রমণে আমি তা ভালো বুঝতে পেরেচি। কতবার দূরদেশের পাহাড়ের ওপর, সমুদ্রের ওপর, সমুদ্রের ধারে, কিংবা বনের ছায়ায় বসে দেশের কথা ভেবে দেখেচি—অপূর্ব্ব চিন্তা জাগায় মনে। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশের প্রকৃতি কি অপূর্ব্ব রূপই না ধরে চোখের সামনে। এ হল মনের রসায়ন, বোঝাতে পারিনে মুখে। অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে হয়। শুনলে বোঝা যায় না।

আমার বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বললেন—এ যে তুমি esoteric তথ্যের দলে নিয়ে গিয়ে ফেললে দেখচি। তোমাদের মতো লোককে লক্ষ্য করেই রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নিকের পত্রে' লিখেছিলেন 'মাথার ওপর যে আকাশ নীল তাই দেখতে ছুটে যাই এটোয়া কাটোয়া'—ওই ধরনের কিছু। অস্বীকার করতে পারো?

—এ হল অনুভূতির ব্যাপার, সুতরাং স্বীকার করিনে অস্বীকারও করিনে। যাই হোক, তোমার ভালো লাগচে কি না বলো।

—কেন ভালো লাগবে না? তুমি এখানে থেকে যাও, দিই না আমার স্কুলে একটা মাস্টারি জুটিয়ে।

এ কথায় স্কুলের শিক্ষক দুটি খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। খুব ভাল হয় তা হলে, হেডমাস্টারবাবু চেষ্টা করলে এখুনি হয়ে যায়। স্কুলের কমিটি কিছু নয়, সবই হেডমাস্টারবাবুর হাত। আমাকে তারা দুজনে বিশেষ করে অনুরোধ করলে থেকে যাবার জন্যে।

রাত আটটার সময় আমরা সবাই ফিরলুম বোর্ডিং-এ।

ড্রইং মাস্টার বললে—তাই তো, আমার সকাল সকাল উঠে আসা উচিত ছিল। এখন দেখচি খেতে আপনাদের অনেক রাত হয়ে যাবে।

ওরা রুটি করতে বসলো রান্নাঘরে। আমরা কাছে বসে আগে এক পেয়ালা করে চা খেলাম। ওরাই করে দিলে। আমার কতবার মনে হল কি সুন্দর লোক এরা। পরের জন্যে অক্লান্ত সেবা করে যাচ্চে দিনের পর দিন—কোনো দিন এতটুকু বিরক্ত হয় না।

আমার বড় মনে ছিল এই নিরীহ শিক্ষক দুটির কথা। মাটি দিয়ে মানুষ গড়লেও বোধ হয় এত নিরীহ, ভালোমানুষ, এত বিনয়ী হয় না। যেদিন নরসিংদি ছেড়ে চলে আসি, ওদের দুজনকে ছেড়ে আসবার কষ্টই আমার বড় বেশি হয়েছিল।

আমাকে পরদিন স্কুলের অন্যান্য মাস্টার এবং ছাত্রেরা মিলে নিমন্ত্রণ করলে—আমাকে ও হেডমাস্টারকে নিয়ে তারা একসঙ্গে বসে খাবে।

আবার সেইদিনই ড্রইং মাস্টারটি আমাকে চায়ের নিমন্ত্রণ করে তার বাড়ি নিয়ে গেল। আমার বন্ধুকেও বলেছিল, কিন্তু সেই সময়ে স্কুল কমিটির মিটিং ছিল বলে তার যাওয়া হয়নি।

শাটিরপাড়া গ্রামে এই প্রথম ঢুকি। ঢাকা জেলার অজ পল্লীগ্রাম কেমন দেখবার সুযোগ এর আগে কখনো হয়নি। গ্রামের মধ্যে ছোটবড় বেতঝোপ বড্ড বেশি, টিনের

ঘরই বারোআনা—দু-একটা কোঠাবাড়িও চোখে পড়লো।

আমি গ্রামের মধ্যে বেশি দূর যাইনি—গ্রামে ঢুকে ড্রইং মাস্টারের বাড়ি বেশি দূর নয়। একটা টিনের ঘরের দাওয়ায় আমায় নিয়ে গিয়ে বসালে। বেশ ফাঁকা জায়গা বাড়ির চারিদিকে।

তক্তপোশের ওপর শতরঞ্জি পাতা। একটি ছোট মেয়ে এসে আমাদের সামনে সাজা পান রেখে গেল। ড্রইং মাস্টার বললে—আমার ভাইঝি—ওর নাম মঞ্জু—

—মঞ্জু? বেশ সুন্দর নামটি। এসো তো খুকু মা এদিকে—

—এসো, বাবু বলচেন, কথা শুনতে হয়—এসো—হ্যাঁ, ভালো কথা—আমার স্ত্রী আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছিল। সে কলকাতার লোক কখনো দেখেনি—বলেন তো আনি—

—বেশ তো, আনুন না তাঁকে।

চা দেবার পূর্ব্বে ড্রইং মাস্টার বাড়ির মধ্যে গিয়ে কি বলে এল। কিছুক্ষণ পরে আধঘোমটা দিয়ে একটি ছিপছিপে গৌরাঙ্গী সুন্দরী বধূ চা ও খাবার নিয়ে তক্তপোশে আমার সামনে রাখলো।

ড্রইং মাস্টার বললে—প্রণাম করো—ব্রাহ্মণ—

মেয়েটি গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করলে আমি বাধা দেবার পূর্ব্বেই। কিন্তু একে সে ছেলেমানুষ, বয়েস আঠারো-উনিশের বেশি হবে না—তাতে এত লাজুক যে বেচারী আমার দিকে মুখ তুলে ভালো করে চাইতেই পারলে না। আমি তাকে বসতে বললুম তক্তপোশের এক কোণে। তার স্বামীও বসলো। অনেক বলবার পর মেয়েটির মুখ ফুটলো। দু-একটি কথা বলতে শুরু করলে আমার কথার উত্তরে। ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের টান এত বেশি যে ভালো করে বোঝাই যায় না। নিকটেই কি এক গ্রামে বাপের বাড়ি।

আমি বললুম—আপনি কখনো কলকাতায় যাননি?

মেয়েটি কিছু বলবার আগে ড্রইং মাস্টার হেসে বললে—ও কখনো শাটিরপাড়া ছেড়ে কোথাও যায়নি, রেল স্টীমারে চড়েনি। মেয়েটি মুখ নীচু করে হাসলে। বেশ সুন্দর মুখ, যে কেউ সুন্দরী বলবে মেয়েটিকে। চা খাবার সময়ে আমার দিকে কৌতূহলপূর্ণ ডাগর চোখে চেয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটি, যেন কোন অদৃষ্টপূর্ব্ব জীব দেখচে।

বললুম—সময় থাকলে আপনার হাতের রান্না একদিন খেতুম, কিন্তু কালই চলে যাচ্চি। আর সময় নেই।

ড্রইং মাস্টারের বাড়িতে আর কেউ নেই, তার এই স্ত্রী ছাড়া। নিজেই সেকথা বললে।

—দেখুন, স্কুলে সামান্য মাইনে পাই, বাড়িতে একটা ঝি রাখলে ভালো হয় কিন্তু তা পেরে উঠিনে, একা আমার স্ত্রীকে সব কাজকর্ম্ম করতে হয়—ওর আবার শরীর তত ভালো নয়, কি করি, আমার সঙ্গতি নেই বুঝতেই পারচেন।

আমি বললুম—ইনি চমৎকার খাবার-দাবার করতে পারেন তো! এই বয়েসে শিখেচেন অনেক কিছু দেখচি।

মেয়েটি নিজের প্রশংসা শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করলে।

আমি বললুম—এ গ্রামে বেশ শিক্ষিত লোক আছেন?

ড্রইং মাস্টার বললে—আছেন বটে তবে দেশে থাকেন না। একজন বিখ্যাত লোক আছেন, ঢাকার উকিল; আরও একজন কলেজের প্রোফেসার আছেন। তবে তাঁরা

দেশে আসেন খুব কম।

ইতিমধ্যে সেই ছোট মেয়েটি আবার এল—আমি জিজ্ঞেস করলুম, এই মেয়েটি আপনার বাড়ির, না?

—না, এটি আমাদের পাশের বাড়ির। ও এসে আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে সাহায্য করে আমার স্ত্রীর। বড় ভালো মেয়েটি। ওরও কেউ নেই, দিদিমার কাছে মানুষ হচ্চে—দিদিমার অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়, গ্রামের লোকদের দয়ায় একরকম করে চলে।

বাঙালী পরিবারের দুঃখের কাহিনী সব জায়গাতেই অনেকটা এক রকম, কি আমার নিজের জেলায়, কি সুদূর ঢাকা জেলায়। শুনে দুঃখিত হওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার নেই।

ওখান থেকে বিদায় নিয়ে স্কুলে চলে আসবার পথে সন্ধ্যা হয়ে এল। ড্রইং মাস্টার আমার সঙ্গেই ছিল—কি জানি কেন এই নিরীহ গ্রাম্য ইস্কুলমাস্টারের ওপর আমার একটা অদ্ভুত ধরনের মায়া জন্মেচে। যেন মনে হচ্চে ওকে ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হবে। আমার কলেজের সহপাঠী বন্ধুটির চেয়েও এই লোকটি আমার আপনার জন হয়ে উঠেচে এই ক-দিনে।

বললুম—আপনি কলকাতার দিকে আসুন না কেন?

—কি যে বলেন বাবু, খেতেই পাইনে তার কোথা থেকে ভাড়া যোগাড় করে কলকাতায় যাবো। আমার এক মাসের মাইনে। আর কলকাতায় গিয়েই বা আমার মতো নর্ম্মাল পাস পণ্ডিত কত টাকা মাইনে পাবে?

কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল। সুতরাং চুপ করে রইলুম।

আমরা স্কুলের কাছে পেঁাছুতেই কতকগুলি ছেলে আমাদের আলো হাতে এগিয়ে নিতে এল। ওরা আমাদের স্কুলের হলে গেল নিয়ে।

সেখানে গিয়ে দেখি মহাকাণ্ড।

খুব রান্নাবান্না চলচে। বড় ডেকে পোলাও চড়েচে, প্রকাণ্ড দুটো বড় মাছ কোটা হচ্চে, আরও দু ডেক পোলাও রাঁধবার মালমশলা ডালায়। ছেলেদের উৎসাহ ছাপিয়ে উঠেচে মাস্টারদের উৎসাহ—তাঁরা নিজেরাই ছোটাছুটি করে রান্নার তদারক করচেন, কোথায় খাওয়ার পাত পাতা হবে তার ব্যবস্থা করচেন—ইত্যাদি।

আমায় ঘিরে কয়েকজন মাস্টার এসে দাঁড়ালেন।

একজন বৃদ্ধ শিক্ষক বললেন—আপনাকেই খুঁজচি—কোথায় গিয়েছিলেন? ক-দিন এসেচেন, আমাদের মাস্টারবাবুর পরম বন্ধু আপনি, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে—

আমি ড্রয়িং মাস্টারকে দেখিয়ে বললুম—এঁর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—

—আমাদের হরনাথের বাড়ি? বেশ—বেশ—

এই রকম একটি অপরিচিত স্থানে আমি সেদিন যে আন্তরিক আপ্যায়ন, হৃদ্যতা ও সমাদর লাভ করেছিলাম, তা জীবনে কখনো ভুলবার নয়। অথচ আমার সঙ্গে তাঁদের কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই কোনো দিক দিয়েই—আমায় খাতির করে তাঁদের লাভ কি?

আমায় ও আমার বন্ধুটিকে মাঝখানে নিয়ে ওঁরা খেতে বসলেন। কত রকম গল্পগুজব, হাসিখুশি।

একজন শিক্ষক বললেন—আমাদের দেশ কেমন লাগলো আপনার?

—বড় ভালো লেগেচে, পূর্ব্ববঙ্গের লোকের প্রাণ আছে।

—সত্যিই তাই মনে হয়েচে আপনার নাকি?

—মনে হয়েচে তো বটেই—আমি সে কথা শুধু মুখে বলচিনে, একদিন লিখবো।

—আপনার লেখাটেখা আছে?

—ইচ্ছে করে লিখতে, তবে লিখিনি কখনো। আপনাদের এই আদর-আপ্যায়ন কোনোদিন ভুলবো না, একথা আমার মনে রইল—সুবিধা হলে সুযোগ পেলে লিখবোই।

তাঁরা সবাই মিলে আমার বন্ধুর নানারকম সুখ্যাতি করলেন আমার কাছে। হেডমাস্টার বাবুর ইংরিজি প্রায় সাহেবের মতো—এমন ইংরিজি বলবার বা লিখবার লোক তাঁরা কখনো দেখেননি—ইত্যাদি। পরদিন আমি সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওখান থেকে চলে এলুম।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, আমার এই বন্ধুটি তারপর ওখানকার কাজ ছেড়ে দিয়ে বি টি পড়তে আসেন কলকাতায় এবং ভালো করে বি টি পাস করে কি রকম কি যোগাযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিলাভ করে বিলেত যান। বর্ত্তমানে ইনি শিক্ষা-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

বছর দুই পরের কথা।

ভাগলপুরে 'বড় বাসা' বলে খুব বড় একটা বাড়িতে থাকি কার্য্যোপলক্ষ্যে, কেশোরামজীর চাকরি তখন অনেকদিন ছেড়ে দিয়েচি।

'বড় বাসা'তে অন্য কেউ থাকে না—আমি চাকর-বাকর নিয়ে বাস করি, গঙ্গার একেবারে ঠিক ধারেই, ছাদের ওপর থেকে মুঙ্গেরের পাহাড় দেখা যায়। দিনরাত হু-হু খোলা হাওয়া বয়, ওপারে বিশাল মুক্ত চরভূমি—দিনে সূর্য্যালোকে মরুভূমির মতো দেখায়, কারণ এসব দেশের চর বালুময় ও বৃক্ষলতাহীন, আবার রাত্রের জ্যোৎস্নালোকে পরীর দেশের মতো স্বপ্নময় হয়ে ওঠে।

একদিন লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জানলুম কাছে অনেক সব দেখবার জিনিস আছে। আমার বন্ধু সুগায়ক হেমেন্দ্রলাল রায়কে একদিন বললুম, চলো হে, কোথাও একদিন বেড়িয়ে আসা যাক—

হেমেন ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, এখানেই ওদের বাড়ি। আমার সঙ্গে খুব আলাপ হয়ে গিয়েছিল, বড় বাসার ছাদে বসে আমরা দুজনে প্রায়ই আড্ডা দিতাম রাত্রে।

হেমেন যেতে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু কোথায় যাওয়া যায়? আমার শোনা ছিল কাজরা ভ্যালি খুব চমৎকার বেড়াবার ও দেখবার জায়গা, ওখানে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম বলে একটা গ্রানাইট পাহাড়ের গুহায় বৌদ্ধযুগের চিহ্ন পাওয়া যায়।

হেমেন ও আমি দুইজনে বেরিয়ে পড়লুম একদিন সকালের ট্রেনে।

জামালপুরে গিয়ে পুরী ও জিলিপি কিনে নেওয়া গেল, সারাদিন খাবারের জন্য। বনজঙ্গলে চলেচি, খাদ্যসংস্থানের যোগাযোগ আগে দরকার।

কাজরা স্টেশনে নেমে কাজরা ভ্যালি ও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমে যেতে হয়। জামালপুর ছাড়িয়ে আরও ত্রিশ মাইল পরে কাজরা। স্টেশনের চারিদিকেই ছোট ছোট পাহাড় আর প্রস্তরের টিলা।

স্টেশন থেকে বার হয়ে সোজাপথে দূর পাহাড়শ্রেণীর দিকে চলেচি কোথায় দুজনে।

একজন গ্রাম্যলোককে জিজ্ঞেস করলুম, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম কোথায় জানো?

সে বললে, নেহি জানতা বাবুজি।

সুতরাং মনে হল জায়গাটি নিতান্ত কাছে নয়। কাছাকাছি হলে এরা নিশ্চয়ই জানতো তবে সামনের ওই পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে ছাড়া আর গুহা কোথায় থাকতে পারে? নিকটে আর কোথাও তেমন বড় পাহাড় নেই।

স্টেশন থেকে একটা রাস্তা বেরিয়ে দূরের পাহাড়ের দিকে চলেচে, আমরা দুজনে সেই পথেই চললুম। মাঝে মাঝে বিহারী পল্লীগ্রাম, খোলার ঘর, ফণিমনসার ঝোপ, মহিষের দল মাঠে চরচে, দড়ির চারপাই পেতে গ্রাম্য লোকেরা জটলা করচে ঘরের উঠোনে, অত্যন্ত ময়লা ছাপা-শাড়ি পরনে গৃহস্থ-বধূরা ইঁদারা থেকে জল তুলচে।

আবার ফাঁকা মাঠ, জনহীন পথ, মাঝে মাঝে গমের ক্ষেত। পাহাড়শ্রেণীর কাছে আসবার নামও নেই, স্টেশন থেকে যতদূর দেখাচ্ছিল এখনও ঠিক ততদূরেই মনে হচ্ছে।

হেমেন বললে, পাহাড় বোধ হচ্চে অনেক দূরে।

—চলো, যখন বেরিয়েচি, যেতেই হবে।

—সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরতে হবে মনে আছে?

—যদি ট্রেন না ধরতে পারি, কোথাও থাকা যাবে। এই সব গ্রামে জায়গা মিলবেই একটা রাতের জন্যে।

বেলা বেশ চড়েচে। একটা ইঁদারার পাড়ে আমরা দাঁড়ালুম জল খাবার জন্যে। একটি মেয়ে আমাদের হাতে জল ঢেলে দিলে। আমরা তাকে পয়সা দিতে গেলুম, সে নিলে না।

আরও একখানা গ্রাম ছাড়লুম। বিহার অঞ্চলের গ্রামে বা মাঠে কোথাও তেমন গাছপালা নেই। গ্রামের কাছে তালগাছ, দু-একটা আমবাগান আছে বটে কিন্তু তার তলায় কোনো আগাছা নেই, শুকনো পাতা পর্য্যন্ত পড়ে নেই, এদেশে জ্বালানি কাঠের অভাব, মেয়েরা ঝুড়ি ভরে জ্বালানির জন্যে শুক্‌নো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশের শ্যামল বনশোভা এখানে একান্ত দুর্লভ। আছে কেবল বিহারের সেই একঘেয়ে সীসম্‌ গাছের সারি। পথের দুধারে কোথাও ছায়াতরু নেই, খররৌদ্রে পথ হাঁটতে কেবলই তৃষ্ণা পায়। দুজনে ঠিক করলুম বস্তির ইঁদারা থেকে জল পান করা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না, এসব সময়ে বিহারের পল্লীতে কলেরা প্লেগ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে। সাবধান থাকাই ভালো।

এবার পথের পাশে ছোট ছোট গাছপালা দেখা গেল। একটা কথা বলি, বাংলাদেশে যাকে 'ঝোপ' বলা হয়, সে ধরনের বৃক্ষলতার নিবিড় সমাবেশ বিহারে ক্বচিৎ দেখা যায়, দক্ষিণ-বিহারে তো একেবারেই নেই, বরং উত্তর-বিহারের বড় নদীর ধারে বাংলাদেশের মতো ঝোপ অনেক দেখেচি।

বাংলাদেশের ঝোপের একটা নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে, এমনটি আর কোথাও দেখিনি। আমাদের জেলায় আমি জানি এমন অদ্ভুত ধরনের সুন্দর ঝোপ আছে, যার মধ্যকার নিবিড় ছায়ায় গ্রীষ্মের দিন সারাবেলা বসে কাটানো যায় নানা অলস স্বপ্নে।

প্রধানত ঝোপ খুব ভালো হয় কেয়োঝাঁকা ও ষাঁড়া গাছের। কেয়োঝাঁকা মোটা কাঠের গুঁড়িযুক্ত গাছ হলেও লতার মতো এঁকেবেঁকে ওঠে ও বিস্তৃত হয়ে পড়ে, এর পাতাগুলো মখমলের মতো নরম, মসৃণ শাঁসালো এবং অত্যন্ত সবুজ। কেয়োঝাঁকার স্বভাবই ঝোপ সৃষ্টি করা, যেখানে যে অবস্থাতেই থাক্‌ জঙ্গলে—কারণ কেয়োঝাঁকা বনের গাছ, যত্ন করে বাড়িতে কেউ কখনো পোঁতে না—এঁকেবেঁকে উঠে ঝোপ সৃষ্টি করবেই। আর কি সে ঝোপের নিবিড়, শান্ত আশ্রয়! ষাঁড়া গাছও এ রকম ঝোপ তৈরি করে, কিন্তু সে আরও উঁচু ছাদওয়ালা বড় ঝোপের সৃষ্টি করে; ষাঁড়া গাছ

উঁচু হয় অনেকখানি, ডালপালাও কেয়োঝাঁকার চেয়ে অনেক মজবুত। শুধু অবিশ্যি এই গাছগুলি ঝোপ তৈরি করে না, যদি গাছের মাথায় অন্য লতা না ওঠে।

কিন্তু বাংলাদেশের জঙ্গলে বন-কলমী, ঢোল-কলমী, কেলে-কোঁড়া, বন-মরচে, বন-সিম, অপরাজিতা, ছোট গোয়ালে, বড় গোয়ালে প্রভৃতি লতা সর্ব্বদাই আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্চে অন্য গাছের, অবিবাহিতা মেয়েদের মতো। এদের মধ্যে সব লতারই চমৎকার ফুল ফোটে, কোনো কোনো ফুলের মধুর সুবাসও আছে, যেমন কেলে-কোঁড়া ও বন-মরচে লতার ফুল।

পুষ্পপ্রসবের সময়ে এই সব লতা যখন ছোটবড় ঝোপের মাথা নীল, সাদা, ভায়োলেট রঙের ফুলে ছেয়ে রাখে তখন নদী-প্রান্তবর্তী বন বহুদূরের আভাস এনে দেয় মনে। মুগ্ধ নীল আকাশের তলায় এদের পাশে বসে যেন সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়, কত কি স্বপ্ন যে এরা মনে আনে।

বিলেতে আমেরিকায় ঝোপের মূল্য বোঝে, তাই বড় আধুনিক ধরনের বাগানে ঝোপ রচনা করবার মতো গাছপালা পুঁতে দেয়। বাগান আর্টিস্টিক ভাবে তৈরি করবার জন্যে ওদের দেশে একজাতীয় শিল্পী আছেন, তাদের garden architect বলে। এরা মোটা মজুরি নিয়ে অতি চমৎকার ভাবে তোমার আমার বাগান তৈরি করে দেবে। ফলের বাগান নয়, সুদৃশ্য ফুল ও অন্যান্য গাছের বাগান।

এই বাগানে ঝোপের বড় দাম। সাধারণত দু-ধরনের ঝোপ এই সব বাগানে করা হয়, Arbour জাতীয়, Pergola- জাতীয়। শেষোক্ত শ্রেণীকে ঠিক আমাদের পরিচিত ধরনের ঝোপ বলা যায় না, কারণ ওটা হচ্চে লতাপাতা দিয়ে ছাওয়া ভ্রমণপথ, অনেকটা আমাদের পুঁই-মাচার মতো, তলা দিয়ে পাথর বাঁধানো রাস্তা, খুঁটির বদলে অনেক বাগানে (যেমন কালিফোর্নিয়ার বিখ্যাত মিসেস্ নাইটের বাগান, ইতালির অনেকগুলি মধ্যযুগের জমিদার বা ডিউকদের বাগান) মর্ব্বেল পাথরের থাম দেওয়া।

সাধারণত ডন রোজ, হনি-সাক্‌ল প্রভৃতি লতানে গাছ Pergolaর মাচায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। আজকাল পশ্চিম চীন থেকে আমদানি ক্লিম্যাটিস্ অ্যারামাণ্ডি নামক সুগন্ধিপুষ্পযুক্ত লতার খুব আদর। তা ছাড়া যাকে বলে স্যাণ্ডউইচ, আইল্যাণ্ড ক্রীপার, সে জাতীয় পুষ্পিত লতারও খুব চল হয়েচে এই উভয়জাতীয় ঝোপ রচনার কাজে। Beaumontia grandiflora নাম একপ্রকার লতানে গাছও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমি বিখ্যাত উদ্যানশিল্পী সার এডউইন লুটেন্‌সের রচিত একটি ঝোপের ছবি দেখেছিলুম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, তাতে যে শিল্পপ্রতিভা ও সুকুমার সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় ছিল, মন থেকে সে ছবি কখনও মুছে যাবার নয়।

এই সব বাগানের ঝোপ যত পুরনো হবে, ততই তার দাম হয়। লতা আরও নিবিড় হয়ে ওঠে, গ্রীষ্মমণ্ডলের বন থেকে আমদানি কাষ্ঠযুক্ত লায়ানাগুলি খুব মোটা হয়, সুন্দরী তরুণীর মুখের আশেপাশের কুঞ্চিত অগোছালো অলকদামের মতো তাদের নতুন গজানো আগডালগুলি Pergola এর Arbour- মাচা ছাড়িয়ে দুপাশে ঝুলে পড়ে।

অথচ বাংলাদেশে কত নদীতীরের মাঠে, কত বাঁশবনের শ্যামল ছায়ায় অযত্নসম্ভূত অদ্ভুত ধরনের ঝোপরাজি কত যে ছড়ানো, প্রকৃতিই স্বয়ং সেখানে garden architect—কত পুরনো ঝোপও আছে তাদের মধ্যে—আমাদের গ্রামেই আমি এমন সব কেয়োঝাঁকার ঝোপ দেখেচি—যা আমার বাল্য দিনগুলিতে যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে, কিন্তু কে তাদের মূল্য দেয় এদেশে? আদর তো করেই না, বরং গালাগালি দেয়—ওরাই নাকি ম্যালেরিয়া সৃষ্টি করচে।

আমার গ্রামে ইছামতী-তীরের মাঠে এ রকম অনেক ঝোপ আছে, শনি-রবিবারের অবকাশে কতদিন এ ধরনের ঝোপে বসে মাথার ওপরকার নিবিড় শাখাপত্রের অন্তরাল-বর্ত্তী নানাজাতীয় বিহঙ্গের কল-কাকলির মধ্যে আপন মনে বই পড়ে বা লিখে সারাদুপুর কাটিয়েচি, দূরপ্রবাসে সে কথা মনে পড়ে দেশের জন্য মন কেমন করে ওঠে।

হাঁটতে হাঁটতে, এইবার পাহাড় নিকটে এল ক্রমশ।

পাহাড়ের ওপরের বন সবুজের ঢেউ-এর মতো নীচে নেমে এসেচে।

কত রকমের গাছ, প্রধানত শাল ও পড়াশী, আরও অজানা নানা গাছ। মহুয়া গাছ এ অঞ্চলে কোথাও দেখিনি। পাহাড়ের ওপরকার বন বেশ ঘন, বড় বড় পাথরের চাঁই পাহাড়ের পাদদেশে অনেকদূর পর্য্যন্ত ছড়ানো, মাঝে মাঝে নেমে এসেচে পাহাড়ী ঝরনা।

আমরা একটা পাহাড়ে উঠলুম—কাঠ কুড়ুতে যায় গ্রাম্য লোকে যে সরু পথ বেয়ে, সেই পথে দুজনে অতি কষ্টে লতা ধরে ধরে উঠি—আবার হয়তো একটা শিলাখণ্ডে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি—আবার উঠি। এ পাহাড়ের কোথাও জল নেই—দুই জনেরই ভীষণ পিপাসা পেয়েচে, হেমেনের রীতিমত কষ্ট হচ্ছে আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিন্তু কিছুই করবার নেই।

তা ছাড়া বস্তি থেকে অনেক দূরে নির্জ্জন বন-প্রদেশে এসে পড়েচি, লোকজনের মুখ দেখা যায় না, গলার স্বরও শোনা যায় না।

হেমেন বললে—ঠিক পথে যাচ্চি তো?

—তা কি করে বলবো? তবে অন্য পথ যখন নেই—তখন মনে হচ্চে আমরা ঠিকই চলেচি।

—বন যে রকম ঘন, কোনো রকম জানোয়ার থাকা অসম্ভব নয় যে, একটু সাবধানে চলো।

আমরা পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখি আমাদের সামনে দিয়ে পথটা আবার নীচের উপত্যকায় নেমে গিয়েচে। আমরাও নামতে লাগলুম সে পথ ধরে।

একেবারে উপত্যকার মধ্যে নেমে এলুম যখন, তখন চোখে পড়লো ওদিকে আর একটা পাহাড়শ্রেণী, এর সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে চলে গিয়েচে, মধ্যে এই বনাকীর্ণ উপত্যকা—বিস্তৃতিতে প্রায় দু-তিনশো গজ হবে।

শালবনের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী নদী রাঙা বালির ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে—পায়ের পাতা ডোবে না এত অগভীর। হেমেন জল খাবেই, আমি নিষেধ করলুম। বিশ্রাম না করে জলপান করা যুক্তিযুক্ত হবে না। বরং তার আগে স্নান করে নেওয়া যাক।

কিন্তু স্নান করি কোথায়?

অত অগভীর জলে স্নান করা চলে না।

হেমেন বললে—তুমি বোসো, আমি বনের মধ্যে কিছুদূর বেড়িয়ে দেখে আসি, জল কোথাও বেশি আছে কিনা—

বেলা ঠিক একটা, ঝাঁ ঝাঁ করচে খর রোদ, কাঁচা শালপাতা বিছিয়ে বনের ছায়ায় শুয়ে পড়লুম—যেমন ক্ষুধা, তেমনি তৃষ্ণা, দুইই প্রবল হয়ে উঠেচে। অদ্ভুত ধরনের নির্জ্জনতা এ উপত্যকার মধ্যে—এরই নাম কাজরা ভ্যালি বোধ হয়—কেউ বা বলবে এর ওই ইংরাজী নাম কি না? হেমেনকে একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি, কারণ এমন

নির্জ্জন মনুষ্যবসতিশূন্য স্থানে বন্যজন্তুর আকস্মিক আবির্ভাব বিচিত্র কি!

কেউ কোথাও নেই, এই সময় একা বনচ্ছায়ায় শায়িত অবস্থায় এই উপত্যকার সৌন্দর্য্য ও নিবিড় শান্তি ভালো করে আমার মনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেল। এইখানে 'বুদ্ধ নারিকেল' (Starculia Alata) নামে সুবৃহৎ বনস্পতি প্রথম দেখি—তারপর অবিশ্যি মধ্যভারতের অরণ্য-প্রদেশে এই অতি বৃহৎ বৃক্ষ দেখেছি। নাম যদিও 'বুদ্ধ নারিকেল'—এ গাছের চেহারা অনেকটা বিড়িপাতার গাছের মতো—প্রকাণ্ড মোটা গুঁড়ি, ভীষণ উঁচু, সোজা খাড়া ঠেলে উঠেচে আকাশের দিকে, চওড়া বড় বড় অনেকটা তিত্তিরাজ গাছের মতো পাতা—পত্র-সমবেশ অত্যন্ত ঘন। বনস্পতিই বটে, এর পাশে শাল গাছকে মনে হয় বেঁটে বঙ্কু।

অবিশ্যি ও জঙ্গলে কি ভাবে এ গাছের নাম জানলুম তা পরে বলবো।

কিছুক্ষণ পরে হেমেন ফিরে এসে আনন্দের সঙ্গে বললে—খুব ভালো স্নানের জায়গা আবিষ্কার করে এলুম, বেশ একটা গভীর ডোবার মতো—চলো।

আমি জিনিসপত্র নিয়ে যেতে চাইলুম। হেমেন বললে—এইখানে থাক্ না পড়ে, তুমিও যেমন, কে নেবে এই জঙ্গলে?

আমি বললুম—থাক্। তবে খাবারের পুঁটুলিটা নিয়ে যাওয়া যাক্ নেয়ে উঠে সেখানে বসেই খেয়ে নেবো। পরে দেখা গেল এ প্রস্তাব করে কি ভালোই করেছিলাম! ভাগ্যে খাবারের পুঁটুলি রেখে যাইনি।

গিয়ে দেখি বনের মধ্যে আসলে পাহাড়ী ঝরনাটাই একটা খাতের মতো সৃষ্টি করচে। একটা মানুষের গলা পর্য্যন্ত জল ডোবাটাতে। স্নান সেরে শালবনের ছায়ায় বসেই আমরা জামালপুর থেকে কেনা পুরী ও জিলিপি খেলাম, তারপর ঝরনার জল খেয়ে নিয়ে আমরা আগের সেই শালবনের তলায় ফিরে এসে দেখি, হেমেন যে ছোট সুটকেসটি ফেলে গিয়েছিল সেটি নেই।

এই জনহীন বনে সুটকেস চুরি করবে কে? কিন্তু করেচে তো দেখা যাচ্চে। সুতরাং মানুষ নিশ্চয়ই এখানে কোথাও আছে। আমরা সে দলের লোক নই, যে দলের একজন চিড়িয়াখানার জিরাফ দেখে বলেছিল—অসম্ভব! এমন ধরনের জানোয়ার হতেই পারে না! এ আমি বিশ্বাস করিনে।

হেমেন বললে—নতুন সুটকেসটা ভাই, সেদিন কিনে এনেচি কলকাতা থেকে—

—কিন্তু নিলে কে তাই ভাবচি—

—আমার মনে হয় বনের মধ্যে রাখাল কি কাঠকুড়ুনি মাগী ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এসেছিল—বেওয়ারিশ মাল পড়ে আছে দেখে নিয়ে গিয়েচে—

—জিনিসের আশা ছেড়ে দিয়ে চল এখন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রমের খোঁজ করি--

আবার সেই 'বুদ্ধ নারিকেল' পথে পড়লো। এ গাছের দিকে চেয়ে শ্রদ্ধা হয় বটে। এই জাতীয় গাছই বনস্পতি নামের যোগ্য। কলের চিমনির মতো সোজা উঠে গিয়েচে, দেবদারুর মতো কালো মোটা গুঁড়ি—ওপরের দিকে তেমনি নিবিড় শাখা-প্রশাখা; তবে গাছটাতে শাখা-প্রশাখা দূরে ছড়ায় না..অনেকটা ইউক্যালিপটাস গাছের ধরনে ওপরের দিকে তাদের গতি। হেমেন হঠাৎ বললে—দেখ, দেখ—ওগুলি কি হে?

সত্যি ভারি অপূর্ব্ব দৃশ্য বটে। একটা গাছের ডালপালায় কালো কালো কি ফল ঝুলচে, রাশি রাশি ফল, প্রত্যেক ডালে দশটা-পনেরোটা—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে এখান থেকে।

হেমেন বললে—একটা নয় হে, ও রকম গাছ—আরও রয়েচে ওর পাশেই—

এইবার আমি বুঝলাম। দূর থেকে ভালো বোঝা যাচ্ছিল না। বন্ধুকে বললুম—ওগুলো আসলে বাদুড় ঝুলচে গাছের ডালে—দূর থেকে ফলের মতো দেখাচ্চে—

হেমেন তো অবাক। সে এমন ধরনের বাদুড় ঝোলার দৃশ্য এর আগে কখনো দেখেনি বললে। কাজরা ভ্যালির সে গম্ভীর দৃশ্য জীবনে কখনো সত্যি ভোলবার কথা নয়। দুদিকে দুটো পাহাড়শ্রেণী, মাঝখানে এই বনময় উপত্যকা, বিশাল-বনস্পতি-সমাকুল, নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। আমার কানে ঝরনার শব্দ গেল। দুজনে ঝরনার শব্দ ধরে সামনের দিক দিয়ে দূরে পাহাড়শ্রেণীর তলায় বনের মধ্যে একটা মন্দিরের চুড়ো দেখতে পেলুম। ওই নিশ্চয়ই ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম।

হেমেন বললে—আমার সুটকেসটা আশ্রমের বালক-বালিকারা নেয়নি তো হে?

বনের মধ্য দিয়ে আমরা মন্দিরের কাছে পৌঁছে গেলাম। জায়গাটার দৃশ্য বড় সুন্দর। একদিকে মন্দিরের কুড়ি হাত দূরে বাঁ পাশে একটা বড় ঝরনা পাহাড়ের ওপর থেকে পড়চে। আমাদের সামনে একটা গুহা—গুহায় ঢুকবার জায়গাটাতেই মন্দির, পাহাড়ের একেবারে তলায়।

বহু প্রাচীন জায়গাটাতেই মন্দির, দেখলেই বোঝা যায়। নির্জ্জন স্থান, দুদিকে পাহাড়শ্রেণী, মধ্যে এই সুন্দর উপত্যকা—প্রাচীন ভারতের পবিত্র আশ্রমপদের ছবি মনে জাগায় বটে! রোদ তখন পড়ে আসচে, পশ্চিম দিকের পাহাড়শ্রেণীর ছায়া পড়েচে উপত্যকায়—কত কি পাখী ডাকচে চারিদিকের গাছপালায়। হেমেনও বললে—বড় সুন্দর জায়গাটি তো!

আমাদের চোখের সামনে আশ্রমের ছবিকে পূর্ণতা দান করবার জন্যেই যেন এক সন্ন্যাসিনী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা তো অবাক! এই বনের মধ্যে সন্ন্যাসিনী!

সন্ন্যাসিনী আমাদের দেখতে পেয়ে কাছে এলেন।

তেমন সুন্দরীও নন, বিশেষ তরুণীও নন। বয়স ত্রিশের ওপর, তবে দেহের বর্ণ সুন্দর, অনেকটা গঙ্গাজলী গমের মতো। মাথায় একঢাল কালো চুলে কিছু কিছু জট বেঁধেচে। পরনে গৈরিক বসন। আমাদের হিন্দিতে বললে—কোথা থেকে আসচ ছেলেরা?

—ভাগলপুর থেকে মাঈজী।

—কি জাত?

—আমরা দুজনেই ব্রাহ্মণ।

—হেঁটে এলে?

—আজ্ঞে। কাজরা স্টেশনে বেলা নটার সময় নেমে হাঁটচি।

—আজ তোমরা ফিরতে পারবে না। এইখানেই থাকো।

আমি হেমেনের মুখের দিকে চাইলুম। তারপর দুজনে মিলে চারিদিকে চাইলুম—থাকবো কোথায়? ঘরদোর তো কোনোদিকে দেখি না। গাছতলায় নিশ্চয়ই রাত্রিযাপন করার প্রস্তাব করেননি মাতাজী।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাবা, তোমরা থাকো, থাকতেই হবে—সন্ধ্যা হবে সামনের পাহাড় পেরিয়ে যাবার আগেই হয়তো। ত ছাড়া দরকারই বা কি কষ্ট করে যাবার? থাকবার ভালো জায়গা আছে।

কিন্তু কোথায়? চোখে তো পড়ে না কোনোদিকে। হেমেন ও আমি আর একবার চারদিকে চেয়ে দেখলুম।

হেমেন চক্ষুলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে বললে—মাতাজী, আমরা থাকব কোথায়?

সন্ন্যাসিনী হেসে বললেন—মন্দিরে। বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গুহার ভেতরে মন্দির বাদে দুই কামরা। কোনো কষ্ট হবে না।

আমরা একবার দেখতে চাইলুম জায়গাটা। মাতাজী আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। মন্দিরের গায়ে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্ত্তি প্রত্যেক পাথরে খোদাই। বৌদ্ধযুগের চিহ্ন মন্দিরের সর্ব্বাঙ্গে—বৌদ্ধমন্দির কবে হিন্দু তীর্থস্থানে পরিণত হয়েচে তার সঠিক ইতিহাস সন্ন্যাসিনী কিছুই জানেন না বলেই মনে হল। বৌদ্ধধর্ম্ম বলে যে একটি ধর্ম্ম ভারতবর্ষে আছে বা ছিল এসব ঐতিহাসিক তথ্য তাঁর জানা থাকবার কথা নয়।

কামরা দুটি ছোট বটে, কিন্তু বেশ ঠাণ্ডা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটা রাত কাটাবার পক্ষে নিতান্ত মন্দ হবে না।

সন্ন্যাসিনী বললেন—বাঙালীরা ডাল ভাত ভালবাসে—এখানে কিন্তু তা দিতে পারবো না।

আমরা বললুম—তাতে কি। যা দেবেন, তাতেই চলবে।

হেমেন চুপিচুপি আমায় বললে—বিছানা কোথায়, শুকনো পাতালতা পেতে শুয়ে থাকতে হবে নাকি?

কিন্তু শোবার সময়ের এখনও অনেক দেরি—সে ভাবনায় এখুনি দরকার নেই। সন্ধ্যা নেমে আসায় সেই অপূর্ব্ব সুন্দর উপত্যকাটিতে রাঙা রোদ সু-উচ্চ বুদ্ধ নারকেল বৃক্ষের শীর্ষদেশ স্বর্ণাভ করে তুলেছে—চারিদিকে স্বপ্নপুরীর মতো নিস্তব্ধ শান্তি।

সন্ন্যাসিনীকে জিজ্ঞেস করলুম—এই উঁচু গাছটাকে কি বলে?

উনিই বললেন—বুদ্ধ নারিকেল।

আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিদায় নিয়ে উপত্যকার পূর্ব্বদিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ন্যাসিনী বারণ করে দিলেন সন্ধ্যার অন্ধকার হওয়ার সময় আমরা যেন বাইরে না থাকি এবং বনের মধ্যে বেশিদূর না যাই। ভাল্লুকের ভয় তো আছেই, তা ছাড়া বাঘও মাঝে মাঝে যে বার না হয় এমন নয়।

ঝরনা পার হয়ে খানিকদূর গিয়ে অরণ্য নিবিড়তর হয়েচে, বড় বড় পাথরের চাঁই এখানে ওখানে গড়িয়ে পড়েচে পাহাড় থেকে। কত কি পাখীর কলরব গাছপালার ডালে ডালে ; আমরা বেশিদূর না গিয়ে ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর ধারে একখণ্ড পাথরের ওপরে বসে রইলুম।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার পূর্ব্বেই আশ্রমে ফিরে এলুম।

মাতাজী আগুন করে আটার লিট্টি সেঁকচেন, আমাদের কাছে বসতে বললেন। আমাদের বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করলেন, ভাগলপুরে কি করি, কে কে আছে, বিবাহ করেচি কিনা ইত্যাদি মেয়েলি প্রশ্ন করতে লাগলেন।

আমি বললুম, এ মন্দির কতদিনের মাতাজী?

—মন্দির অনেক দিনের, তবে লক্ষ্মীসরাই-এর একজন ধনী মাড়োয়ারী ব্যবসাদার মন্দির নতুন করে সারিয়ে দিয়ে ভেতরের কামরাও করে দিয়েচে।

—আপনি কতদিন আছেন এখানে?

—দশ-বারো বছর—

—ভয় করে না একলা থাকতে?

—ভয় কিসের? পরমাত্মার কৃপায় কোনো বিপদ হয় নি কোনোদিন।

দশ বছর আগে এই সন্ন্যাসিনী তরুণী ছিলেন, সে কথা মনে হল, আর মনে

হল এই নির্জ্জন উপত্যকায় মন্দির-মধ্যে একা রাত্রিযাপনের বিপদ সে অবস্থায়।

হেমেন বললে, মাতাজী, আপনার দেশ কোথায়?

—গৃহস্থ-আশ্রমের নাম বলতে নেই। তবুও বলি, আমার বাড়ি ছিল এই বেগুসরাইয়ের কাছেই। আমি এ দেশেরই মেয়ে। আমার চাচা আগে এ আশ্রমের সেবাইত ছিলেন, তারপর থেকে আমি আছি।

এতক্ষণে অনেকখানি ব্যাপার আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। এই দেশের মেয়ে এবং সম্ভবত বাল্যকাল থেকে ওঁর চাচাজীর সঙ্গে এখানে অনেকবার গিয়েচেন এসেচেন। অনেকেই চেনে এদেশে।

আমি বললুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো মাতাজী, মাপ করবেন, আপনি কি বিবাহ করেন নি?

—আমি বিধবা, তেরো বছর বয়সে স্বামীর মৃত্যু হয়, সেই থেকেই গৈরিক ধারণ করেচি।

তারপর তিনি নিজের জীবনের কথা বলে গেলেন। ওঁর কথার মধ্যে একটি সতেজ সজীব নারীমনের পরিচয় পেয়ে আমি ও আমার বন্ধু দুজনেই এক নূতন জগৎ আবিষ্কারের আনন্দ অনুভব করলুম, ভেবে দেখলুম এই সন্ন্যাসিনীর যদি বয়স আরও কম হত তবে এঁর জীবনের ইতিহাস শুনে আমরা অন্তত মনে মনেও এঁর প্রেমে না পড়ে পারতুম না—সেই বয়সই ছিল আমাদের।

হেমেন বললে, আপনাকে এ বনে খাবার-দাবার কে এনে দেয়?

—কিউল থেকে আমার শিষ্যরা আসে, ওরাই নিয়ে আসে, হপ্তায় দুদিন।

—আপনি সত্যিই অদ্ভুত মেয়ে। এ রকম মেয়ের সাক্ষাৎ বেশি পাওয়া যায় না।

—কিছু না, পরামাত্মা যখন ডাকেন, তাঁর সব কাজ তিনিই করিয়ে নেন। আমি বিধবা হয়ে একমনে তাঁকে ডেকেচি, ঘরের বাইরে আসবার চেষ্টা করেচি যে কত! সংসার আদৌ ভালো লাগতো না, বাইরে বেরুতে ইচ্ছে থাকতো কেবল। জপতপ করবার কত বাধা সংসারে। আমি—আমাদের বেগুসরাইয়ের বাড়ির পিছনে ছোট একটি তেঁতুল গাছ আছে—কাছেই কিউল নদী—

আমি বললুম, বেগুসরাই মহকুমা? সেখানে তো—

—এই লক্ষ্মীসরাইয়ের কাছে বেগুসরাই, ছোট্ট গাঁ—কিউল নদীর ধারে। তারপর শোনো ছেলেরা, কিউল নদীর ধারে সেই তেঁতুল গাছের কাছে বসে বসে কতদিন ভগবানকে ডেকেচি যে, আমার একটা উপায় করে দাও, সংসার আমার বড় খারাপ লাগচে। ভগবানকে ডাকলে তিনি শোনেন।

—কি করে জানলেন?

—আমি প্রত্যক্ষ ফল পেয়েচি—একমনে ডাকলে না শুনে তিনি পারেন না।

আমার একটু আমোদ লাগলো, কারণ সে সময় আমি নিজে ছিলাম ঘোর agnostic, লেস্‌লি স্টিফেনের দার্শনিক-মতে অনুপ্রাণিত, ভগবানকে মানি না যে তা নয়, কিন্তু তাঁর অস্তিত্বের সন্ধান কেউ জানে না, দিতেও পারেন না—এই ছিল আমার মত।

আমি বললুম, ভগবানকে কখনো দেখেচেন মাতাজী?

—না, সেভাবে দেখি নি। কিন্তু মনে মনে কতবার তাঁকে অনুভব করেচি। চোখের দেখার চেয়ে আরও বড়। চোখ ও মন দুইই তো ইন্দ্রিয়, ভগবানকে বুঝবার ইন্দ্রিয় হল মন, চোখ নয়। যদি কেউ বলে ফুলের গন্ধ দেখবো—সে দেখতে পাবে না, কারণ গন্ধ অনুভব করবার ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র—চোখ নয়। এও তেমনি

—তারপর কি করলেন?

—আমার চাচাজীকে বললুম, নিৰ্জ্জনে থাকবো, আমায় আশ্রমে নিয়ে যাও, সাধনভজনের ব্যাঘাত হচ্চে সংসারের গোলমালে। তিনি নিয়ে আসতে চান নি প্রথমে। আমি অনাহারে রইলাম তিনদিন, মুখে কেউ এক ফোঁটা জল দিতে পারে নি এই তিনদিনে। তখন তিনি বাধ্য হয়ে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলাম পাঁচ বছর—তাঁর মৃত্যুর পরে একাই আছি।

—ভালো লাগে এখানে একা একা?

—খুব ভালো লাগে। সংসারের গোলমাল সহ্য করতে পারি নে। এখানটা বড় নিৰ্জ্জন. মনস্থির করে থাকতে পারলে গৃহত্যাগীর পক্ষে এমন স্থান আর নেই।

—কিন্তু আপনি মেয়েমানুষ, আপনার পক্ষে ভয়ও তো আছে—

—সে সব ভয় কখনো করি নি। ভগবানের দয়ায় কোনো বিপদও কখনো হয় নি। সবাই মানে, আশপাশের গ্রামে আমার অনেক শিষ্য আছে, তারা প্রায়ই খোঁজ-খবর নেয়। সকালে দেখো এখন—তারা দুধ দিয়ে যায়, আটা দিয়ে যায়, লক্ষ্মী-সরাইয়ের একজন শেঠজী চাল আটা পাঠিয়ে দেয় মাসে মাসে।

আমাদের রাত্রের খাবার তৈরী হল। চাপাটি আর ডাল মাতাজী কাছে বসে যত্ন করে খাওয়ালেন। রাত্রে শোবার বন্দোবস্তও খুব ভালো না হলেও নিতান্ত খারাপ নয় দেখলুম, একপ্রস্থ বিছানা এখানে অতিথিদের জন্য মজুত থাকে, লক্ষ্মীসরাইয়ের শেঠজী তার ব্যবস্থা করেচেন, আমাদের কোনই অসুবিধে হল না।

হেমেন বললে, ভাই, রাত্রে মন্দির থেকে বেরুনো হবে না, বাঘের ভয় আছে ; মাতাজীকে না হয় ভগবান রক্ষা করে থাকেন অসহায় মেয়েমানুষ বলে, আমাদের বেলা তিনি অত খাতির নাও করতে পারেন তো?

অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা গল্প-গুজব করলুম। বনানীবেষ্টিত উপত্যকার নৈশ সৌন্দর্য্য দেখবার লোভ ছিল, কিন্তু হেমেন এ বিষয়ে উৎসাহ দিলে না। মাতাজীও দেন নি। তবে ঘুমের মধ্যেও আমরা আশ্রমের পার্শ্বস্থিত ঝরনার বারি-পতনের শব্দ শুনেচি সারারাত।

সকালে আমরা বিদায় নিলুম।

ফিরবার পথে আবার সেই বৃদ্ধ নারিকেলের ছায়াস্নিগ্ধ উপত্যকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমরা চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। অপূৰ্ব্ব দৃশ্য বটে। শুনেছিলাম কাজরা ভ্যালিতে শ্লেট পাথরের কারখানা আছে, কিন্তু এখানে কোনোদিকে তার চিহ্ন পাওয়া গেল না।

সামনের পাহাড়টা টপকে এপারে আসতে প্রায় বেলা নটা বাজলো।

স্টেশন যখন আরও পাঁচ-ছ মাইল দূরে, তখন ভাগলপুরের ট্রেন বেরিয়ে গেল।

হেমেন বললে, আর তাড়াতাড়ি করে হেঁটে কি লাভ, এসো কোথাও খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক। ট্রেন আবার সেই সন্ধ্যাবেলা।

সামনে একটা ক্ষুদ্র বস্তি পাওয়া গেল, তার নাম গোকর্ণটোলা, সে যুগের নামের মতো শোনায় যেন।

একজন বৃদ্ধ লোক ইঁদারার পাড়ে স্নান করছে, তাকে আমরা বললুম, এখানে কিছু খাবার কিনতে পাওয়া যায়?

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে বললে—না।

আমরা চলে যাচ্চি দেখে সে আবার আমাদের পিছু ডাকলে। যদি আমরা কিছু মনে না করি, কোথা থেকে আমরা আসচি, সে কি জেজ্ঞেস করতে পারে?

কাজরা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে।

—পুণ্য করে আসচেন বলুন—

—হয়তো।

—বেশ ভালো লাগলো আপনাদের?

—চমৎকার।

—ভাগলপুর থেকে বাংগালি বাবুরা আমার ছেলেবেলায় অনেক আসতেন আশ্রম দেখতে। এখন আর আসেন না। আপনারা আসুন, আমার বাড়িতে এবেলা থাকবেন। বড় খুশী হবো।

কারো বাড়ি গিয়ে ওঠা আমাদের ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু যখন এসব স্থানে দোকান-পসার নেই, অগত্যা রাজী না হয়ে উপায় কি।

বস্তির মধ্যে যাবার আগ্রহ আমাদের কারো ছিল না। বিহারের এই সব গ্রাম্য বস্তি অত্যন্ত নোংরা, গায়ে গায়ে চালে চালে বসত, গ্রামের প্ল্যান নেই—দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে একটুখানি জায়গা নিয়ে কতকগুলো প্রাণী পরস্পরকে জড়াজড়ি করে তাল পাকিয়ে আছে যেন। ফাঁক ফাঁক হয়ে ছড়িয়ে বাস করার বাধা কিছুই ছিল না, এ রকম অবাধ মুক্ত মাঠের মধ্যে জমির দামও বিশেষ আক্রা নয়—কিন্তু ওদের কুশিক্ষা ও সংস্কার তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েচে।

কারো বাড়ির সামনে একটা ছোট বাগান পর্যন্ত নেই—একটা গাছ পর্যন্ত নেই। বিহারের এই গ্রাম্য বস্তিগুলি দেখলে—সত্যিই বোঝা যায় যে, মানুষের সৌন্দর্যজ্ঞানহীনতা কত নিম্নস্তরে নামতে পারে। এক বাড়ির দেওয়ালে পাশের বাড়ি চালা তুলেচে—অর্থাৎ তিনখানা দেওয়ালে দুইটি পৃথক পৃথক গৃহস্থের বাড়ি। কেন যে ওরা এ রকম করে তা কে বলবে? জায়গার কিছু অভাব আছে এই শহর থেকে বহুদূরে, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে, বুনো জায়গায়?

তা নয়। ওরা লেখাপড়া জানে না, স্বাস্থ্য কি করে বজায় রাখতে হয় জানে না—কেউ ওদের বলেও দেয় না। চিরকাল যা করে আসচে ওদের গ্রাম্য অঞ্চলে, ওরাও তাই করে। কল্পনাহীন মনে নতুন ছবিও জাগে না। সেই ঠেসাঠেসি খোলার চালা, ফণিমনসার ঝোপ, রাঙামাটির দেওয়াল, গোরু ও মহিষের অতি অপরিষ্কার ও নোংরা গোয়ালবাড়ির সামনেই—তাল বা শালগাছের কড়িতে খোলার চালের নীচে শুকনো ভুট্টার বীজ ঝুলচে—মেয়েদের পরনে রঙীন ছাপাশাড়ি, যা বোধ হয় তিনমাস জলের মুখ দেখেনি—হাতে রূপোর ভারী ভারী পৈঁছে ও কঙ্কণ, বাহুতে বাজু—পায়ে ততোধিক ভারী কাঁসার মল।

এইসব বস্তি প্লেগ ও কলেরার বিশেষ লীলাভূমি—একবার মহামারী দেখা দিলে সাত-আট দিনের মধ্যে বস্তি সাফ করে দেয়।

আমরা গিয়ে এমনি একটা খোলার ঘরের দাওয়ায় বসলুম একটা দড়ির চার-পাইয়ের ওপর। বস্তির ছোট ছোট ছেলেমেয়ে একরাশ এসে জুটলো সামনে। তাদের চেহারা দেখে মনে হয় আজন্ম ওরা স্নান করেনি, কাপড়ও কাচেনি।

আমরা জিগ্যেস করলুম—গ্রামে পাঠশালা আছে?

বৃদ্ধ বললে—এ টোলায় নেই—সহদেবটোলায় আছে। প্রাইমারী স্কুল।

—ছেলেরা সব যায় সেখানে?

—সবাই যায় না বাবুজি, বড় হয়ে গেলে ছেলেরা গোরু-মহিষ চরায়, ক্ষেত-খামারে কাজ করে—লেখাপড়া করলে কি সকলের চলে বাবুজি!

বৃদ্ধ আমাদের হাতমুখ ধোবার জল নিয়ে এল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল

ইঁদারার জল। তবুও অনেকটা ভালো। বস্তির মাঝখানে যে ছোট্ট পুকুর দেখে এসেচি তার জল হলে আমাদের জল ব্যবহার স্থগিত রাখতে হত।

—আপনারা আটা খাবেন, না ছাতু?

—যা আপনাদের সুবিধে হয়। তবে আটাই বোধ হয়—

—আচ্ছা আচ্ছা, বাবুজি। আপনারা চুপ করে বসে বিশ্রাম করুন—আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি। ওরা আমাদের জন্যে রাঁধবার বন্দোবস্ত করে দিলে। সে এক হিসেবে ভালো বলেই মনে হল আমাদের কাছে। নিজের চোখে জিনিসগুলো দেখে ধুয়ে বেছে তবুও নিতে পারা যাবে।

এদের আতিথ্য অত্যন্ত আন্তরিক ও উদার—এদের সারল্য অন্তরকে স্পর্শ না করে পারে না—কেবল মনে হয়, যদি কেউ এদের স্বাস্থ্যের বিধি-নিষেধগুলো বলে দেওয়ার থাকতো!

আমরা পাশের একটা ছোট চালায় রান্না চড়ালুম। গ্রামের লোকে অনেকে এসে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো আমাদের রান্না। আলু ও লাউ-এর তরকারি আর আটার রুটি। চাটনির জন্যে ছিল চুকো পালং, কিন্তু আমরা চাটনি কি করে রাঁধতে হয় জানিনে। হেমেন বললে—তার অনেক হাঙ্গাম, সুতরাং চাটনি রান্না বন্ধ রইল। দুজনে পরামর্শ করে অতিকষ্টে লাউ-এর তরকারি নামালুম। এদের কাছে ধরা না পড়ি যে, আমরা রান্না জানি না।

কথাবার্ত্তা চললো খাওয়া-দাওয়ার পরে। এই অঞ্চলের পল্লীজীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করা গেল ওদের কাছ থেকে। গ্রামের সব লোকই চাষী—গম ও ভুট্টা এই দুটি প্রধান ফসল। অধিবাসীরা সবাই হিন্দু, তার মধ্যে অধিকাংশ দোশাদ অর্থাৎ মেথর, বাকি সকলে কুর্ম্মি—একঘর রাজপুত। লেখাপড়া বিশেষ কেউ কিছু জানে না, ব্যবসা-বাণিজ্য কেউ করে না, বেশিদূর কেউ যায় নি কখনো গ্রাম ছেড়ে। আমাদের গৃহস্বামী ওদের মধ্যে কিছু এলেমদার—জমিজমা-সংক্রান্ত মামলাতে সে গ্রামসুদ্ধ লোকের পরামর্শদাতা ও দলিললেখক। মামলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে বারকয়েক মুঙ্গের ও পাটনা গিয়েচে।

এদের প্রধান খাদ্য আটার রুটি ও মকাই-এর ছাতু। তরকারির মধ্যে জন্মায় রামতরুই, পটল, বেগুন, কয়েক প্রকারের শাক, সকরকন্দ আলু। গোল আলু ও কপি এ অঞ্চলে জন্মায় না—ওসব দুর্ম্মূল্য শৌখিন তরকারি এরা নাকি তত পছন্দও করে না।

প্লেগ গত দু'তিন বৎসর দেখা দেয় নি—তার বদলে দেখা দিয়েছিল কলেরা। অনেক লোক মরেছিল।

আমরা বললুম—ডাক্তার নেই এখানে?

—না বাবু, কিউল থেকে আনতে হয়—তা অত পয়সা খরচ করে সবাই তো পারে না।

—কলেরার সময় কি করো?

—গতবার গভর্নমেণ্ট থেকে একজন ডাক্তার পাঠিয়েছিল।

এই ধরনের বহু অশিক্ষিত পল্লী নিয়ে বিহার ও বাংলা। শহরে বাস করে জাতির দুঃখদুর্দ্দশা জানা সম্ভব নয়। বাংলা ও বিহারের বহুস্থান এখনও মধ্য-যুগের আবহাওয়ায় নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে—কি শিক্ষায়, কি মতামতে, কি জীবিকা-র্জ্জনের প্রণালীতে। উড়িষ্যার একটি নিভৃত পল্লী-অঞ্চলে একবার দেখবার সুযোগ ঘটেছিল, সেখানেও এইরকমই দেখেচি। তবে আমার মনে হয়েচে বিহারী পল্লী-

বাসীরা বেশি অপরিচ্ছন্ন, উড়িষ্যা-বাসীদের অপেক্ষা। উড়িষ্যা গৃহস্থের বাড়িঘর গোবর-মাটি দিয়ে বেশ লেপামোছা, লোকগুলিও এত অপরিষ্কার নয়। উড়িষ্যার পল্লীগ্রামের কথা পরে বলচি।

আমরা বেলা তিনটের সময় গোকর্ণটোলা থেকে কাজরা স্টেশনের দিকে রওনা হই। বৃদ্ধ গৃহস্বামী গল্প করতে করতে প্রায় এক মাইল রাস্তা আমাদের সঙ্গে এল। আমরা তাকে বার বার বলে এলুম বিদায় নেবার সময়, ভাগলপুরে মামলা করতে আসে যদি কখনো, তবে যেন আমাদের বাসায় এসে ওঠে।

সন্ধ্যার সময় কাজরা থেকে ট্রেন ছাড়লো।

একদিন দুপুরের ট্রেনে আমি ভাগলপুর থেকে গৈবীনাথ দেখতে গেলাম।

সুলতানগঞ্জ স্টেশন থেকে প্রায় আধমাইল কি তার কিছু কম হেঁটে গঙ্গার ধার। সেখানে এসে নৌকো করে গৈবীনাথ যেতে হয়—কারণ গৈবীনাথ একটা ছোট পাহাড়, সোজা গঙ্গাগর্ভ থেকে উঠেছে। পহাড়ের ওপর গৈবীনাথ শিবের মন্দির।

আমি যেদিন গিয়েছিলুম, সেদিন ওখানে লোকের যাতায়াত ছিল কম। রেলের ধারে বলে গৈবীনাথে প্রায়ই শনি বা রবিবার লোকজনের ভিড় একটু বেশিই হয়ে থাকে। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম যত ভালো জায়গায় হোক, অতদূর রাস্তা আর বন-জঙ্গলের মধ্যে বলে সেখানে বড় একটা কেউ যেতে চায় না, যদিও কিউল থেকে জামুই আসবার সময় বাঁ-দিকে যে পাহাড়শ্রেণী ও জঙ্গল দূরে দেখা যায়—ওই হল ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সেই পাহাড়—কিন্তু ই আই রেলওয়ের মেন লাইনের কোনো স্টেশনে নেমে সেখানে যাবার রাস্তা নেই—লুপ লাইনের কাজরা স্টেশন ছাড়া।

মস্ত বড় একটা তীর্থস্থান না হলে, যে কষ্টটা হবে তার অনুপাতে পুণ্য কতখানি অর্জ্জন করে আনতে পারা যাবে সেটা খতিয়ে না বুঝে—শুধুমাত্র প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার লোভে লোকে অত কষ্ট স্বীকার করে না।

ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম অত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান নয়। কে শুনেচে ওর নাম?

কিন্তু গৈবীনাথে যাতায়াতের সুবিধা খুব—স্টেশন থেকে দু পা হাঁটলেই হল। গঙ্গাগর্ভে পাহাড়, তার ওপরে শিবমন্দির—এর কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম-টাশ্রমের তুলনা হয়? বিশেষ করে, যেখানে যেতে হয় জঙ্গলের মধ্যে তেরো মাইল রাস্তা ভেঙে? গৈবীনাথ মন্দিরে আমি আরও দুবার গিয়েচি, একবার আমার ভগ্নী জাহ্নবী ও আমার ভাই নুটু সঙ্গে ছিল—ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল দেবতাবাবুও সেবার ছিলেন আমাদের সঙ্গে।

প্রথম দিন একা গিয়ে যে অনুভূতি ও আনন্দ পেয়েছিলুম—ঠিক সে ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতা অন্য অন্য বার হয় নি।

আমি গিয়ে প্রণাম করে বললুম—বাবাজী, আশীর্ব্বাদ করুন।

সাধু হিন্দীতে বললেন—বেঁচে থাকো বাবা।

—আপনি এখানেই থাকেন?

—না, মাস দুই এসেচি—

—তবে কোথায় থাকেন?

—কন্যা-কুমারিকা থেকে উত্তরে বদরী-বিশাল পর্য্যন্ত সব তীর্থস্থানেই আমার যাতায়াত। তেরো বার বদরী-বিশাল গিয়েচি। আমাদের আসবার কি ঠিক আছে কিছু। এখন এখানেই আছি।

পুরুষমানুষ না হলে সন্ন্যাসী সেজে লাভ? এঁকেই বলি প্রকৃত সাধু। এঁর

কাছে ঋষ্যশৃঙ্গ আশ্রমের সে সন্ন্যাসিনী কিছুই নয়। ঢাকের কাছে টেমটেমি।

ভক্তিতে আমি আপ্লুত হয়ে পড়লুম।

সাধুজী আমায় বললেন—ঘর কোথায়?

—কলকাতায়।

—ব্রাহ্মণ?

—জী হ্যাঁ।

সত্য কথা বলবো, সাধুবাবা আমার কাছে এক পয়সাও চান নি। আমি একটি সিকি তাঁর কাছে রাখলুম। তিনি সেটা হাতে তুলে নিয়ে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মুখের ভাব দেখে মনে হল আমার প্রতি যথেষ্ট প্রসন্ন হয়েছেন।

সাধুজী বেদান্তের ব্যাখা আরম্ভ করে দিলেন—মায়া কি, অধ্যাত্ম কি, ইত্যাদি। আমার সে সব শুনবার আগ্রহের চেয়েও তাঁর মুখে তাঁর ভ্রমণকাহিনী শুনবার আগ্রহই ছিল প্রবলতর। কিন্তু সাধুজীর মনে কষ্ট দিতে পারলুম না—আধঘণ্টা ধরে চুপ করে বসে বেদান্তব্যাখ্যা শুনবার পরে আমি তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে আবার মন্দিরের পিছনে একখানা পাথরের ওপরে এসে বসলুম। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। রক্ত সূর্য্যাস্তের আভা পড়েচে গঙ্গার বুকের বীচিমালায়, গৈবীনাথের মন্দিরচূড়ার ত্রিশূলের গায়ে, এপারের গাছপালা। জামালপুরের মারফ পাহাড় পশ্চিম আকাশের কোলে নীল মেঘের মতো দেখাচ্চে।

গৈবীনাথের মন্দিরের ঠিক নীচে পাহাড়ের গায়ে একটা ছোট গুহা আছে, সেটাও দেখে এসেচি। তার মধ্যে এমন কিছু দেখবার নেই। তবে এই রকম রক্তাভ অপরাহ্নের আকাশতলে পাহাড়ের ওপরে, পা ঝুলিয়ে গঙ্গার এবং গঙ্গার অপর-তীরবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ চরভূমির দিকে চোখ রেখে নিরিবিলি বসে থাকার বিরল সৌভাগ্য ঘটে-ছিল বলেই গৈবীনাথ-তীর্থদর্শন আমার সফল হয়েছিল।

কতক্ষণ বসে থাকবার পরে হঠাৎ কখন জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব উজ্জ্বলতর হয়েচে দেখে চমক ভাঙলো। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে ট্রেন—সেবার যে ট্রেনে কাজরা থেকে এসেছিলাম ভাগলপুরে।

এদিকে মনে প্রবল বাসনা রাত্রিটা এখানে থাকলে ভালো হয়।

অগত্যা সাধুবাবাজীর কাছেই আবার গেলাম। তিনি শুনে বললেন—মন্দিরের মোহান্তজীকে একবার বলে দেখ। আমি তোমাকে বড়জোড় একখানা কম্বল দিতে পারি, অন্য কিছুই নেই আমার।

মোহান্তজীকে গিয়ে ধরলাম। আমার আবেদন শুনে তিনি বোধ হয় একটু বিস্মিত হয়েছিলেন—বললেন—থাকবার অন্য জায়গা নেই—রাতে মন্দির বন্ধ থাকে, পাশের বারান্দায় থাকতে পারো। কিন্তু তোমার সঙ্গে বিছানা আছে?

—কিছু নেই, তবে সাধুজী একখানা কম্বল দেবেন বলেচেন।

—এখানে গঙ্গার বুকে রাত্রে বেশ শীত পড়বে, খোলা বারান্দায় শুয়ে থাকতে পারবে?

—খুব। ও আমার অভ্যেস আছে। আপনি থাকবার অনুমতি দিলেই হয়।

—থাকো, কিন্তু খাবে কি?

—কিছু দরকার নেই।

—তোমার খুশি।

কিন্তু সেখান থেকে জ্যোৎস্নারাত্রে গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গ দেখা আমার অদৃষ্টে ছিল না—সাধুজীর কাছে আবার ফিরে গিয়ে দেখি মুঙ্গেরের এক শেঠজি সেখানে বসে।

আমার প্রস্তাব শুনে শেঠজি আমায় প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনিও স্টেশনে যাবেন, তাঁর এক্কা এসে আছে গঙ্গার ধারে—সেখানে রাত্রে থাকবার জায়গা নয়, ভীষণ শীত করবে, বিশেষ করে সন্ন্যাসীর কম্বল নিলে ওঁর বড় অসুবিধা হবে রাত্রে।

আসল কথা পরে বুঝেছিলাম—সন্ধ্যার পরে গঙ্গার ধার থেকে সুলতানগঞ্জ স্টেশন পর্য্যন্ত পথটি খুব নিরাপদ নয়। বেশি দূর নয় যদিও, তবু দু-একটা রাহাজানি হয়ে গেছে ইতিপূর্ব্বে। শেঠজির কাছে কিছু টাকা ছিল, একজন সঙ্গী খুঁজচেন।

সাধুজীর সামনে শেঠজী কম্বলের কথা প্রথমে বলেন নি—আমায় আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন,—আপনি কম্বল নিলে সাধুজী শীতে জমে যাবেন রাত্রে। উনি বুড়ো মানুষ—নেবেন না ওঁর কম্বল। আপনি চলুন আমার সঙ্গে।

একথা আমার আগে কেন মনে হয় নি ভেবে বেশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম।

তারপর দুজনে এসে নৌকোয় চড়ে তীরে নামলাম। এক্কা দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রেনে আসবার অল্প সময় বাকি, তখন এক্কাওয়ালা আমাদের স্টেশনে পৌঁছে দিল।

গৈবীনাথ আর যে দুবার গিয়েচি, তখন এমন নির্জ্জন ছিল না স্থানটি - এবারকারের মতো আনন্দ পাই নি আর সেখানে।

এই সঙ্গে আরও একটি দেবমন্দিরের কথা বলি। আমার খুব ভাল লাগতো জায়গাটি—যদিও স্থানীয় গ্রাম্য লোক ছাড়া সেখানে অন্য লোক কখনও যায় নি।

থানা বিহিপুর স্টেশন থেকে ছ'সাত মাইল দূরে পর্ব্বতা বলে একটি গ্রাম আছে। আমাকে একবার কি কাজে সেখানে যেতে হয়েছিল—স্থানটি উত্তর-বিহারের অন্তর্গত, সুতরাং বাংলাদেশের মতো অনেকটা শ্যামল প্রকৃতির। এক জায়গায় পথের ধারে এমন নিবিড় বৃক্ষরাজির সমাবেশ যে, সত্যিই বাংলাদেশে আছি বলে ভ্রম হয়। সময় ছিল দুপুরের কিছু পরে। আমি গাছতলায় একটুখানি বিশ্রাম করচি, এমন সময়ে রামশিঙা বেজে উঠলো কোনো দিকে।

আমার সামনে দিয়ে দু-তিনটি গ্রাম্য লোক পেতল ও কাঁসার কানা-উঁচু থালা হাতে বনের ওপারে কোথায় যাচ্চে দেখে তাদের একজনকে বললুম—কোথায় শিঙে বাজচে হে?

একজন আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে—রামজীর মন্দিরে। নদীর ধারে—আমরা সেখানে প্রসাদ আনতে যাচ্ছি—ভোগের সময় শিঙে বাজে রোজ।

আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম। নদীর স্থানীয় নাম বুঢ়ল নদী—আমাদের কাটি-গঙ্গার খালের চেয়ে যদি কিছু বড় হয়। তার ধারে অতি সুন্দর স্থানে আশ্রম ও দেবমন্দিরের কারুকার্য্য সাধারণ গ্রাম্য স্থপতির পরিকল্পিত, এই একই গড়নের মন্দির উত্তর-পূর্ব্ব বিহারের প্রায় অনেক গ্রামেই দেখতে পাওয়া যায়।

ক্ষুদ্র মন্দির, কিন্তু মন্দিরসংলগ্ন জমি আছে অনেকটা। নদীর ধারে সুন্দর ফুলবাগান, সমস্ত স্থানটি ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

একজন বৃদ্ধ মোহান্ত মন্দিরে থাকেন, তিনি আমায় প্রসাদ খেতে আহ্বান করলেন। আমি দ্বিরুক্তি না করে সম্মতি জানালাম। তিনি আমাকে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

আমি বললাম—এ মন্দির কতদিনের?

—অনেক দিনের বাবা, আমিই তো এখানে আছি পঁচিশ বছর।

—কে স্থাপন করেছিল মন্দিরটি?

—দ্বারভাঙার মহারাজ তাঁর জমিদারি বেড়াতে এসে এই জায়গাটি বড় পছন্দ করেন, শুনেচি তিনিই মন্দির করে দিয়েছিলেন। বিগ্রহের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, ওঁদেরই দান।

—আয় কত হবে?

—বছরে তিন-চারশো টাকা, তবে ঠিকমতো আদায় হয় না সব বছর, লোকজনের প্রণামী ও মানত ইত্যাদির আয়েও কিছুটা ব্যয়নির্ব্বাহ হয়।

আমার জন্য খাবার এল সরু আতপ চালের ভাত, অড়রের ডাল ও কি একটা তরকারি; এসব দিকে বাংলাদেশের মতো দু-তিন রকম আনাজ মিশিয়ে ব্যঞ্জন রন্ধনের পদ্ধতি প্রচলিত নেই—আলু তো শুধু আলুরই তরকারি, বেগুন তো শুধু বেগুনেরই তরকারি। সে তরকারি বাঙালীর মুখে ভালো লাগে না—কিন্তু ডাল এত চমৎকার রান্না হয় যে বাংলাদেশে ক্বচিৎ তেমনটি মেলে।

মোহান্তজীর মুখে শুনলাম দুবেলা প্রায় পঞ্চাশজন অতিথি-অভ্যাগত ও দরিদ্র গ্রাম্যলোক ঠাকুরের প্রসাদ পায়। দুটি বৃদ্ধ শিষ্য আছে মোহান্তজীর, তারাই রান্না করে দুবেলা। কোনো মেয়ে, তা সে যে-বয়সেরই হোক, আশ্রমে রাখবার নিয়ম নেই। বিহারের নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তে পর্ব্বতের এই মন্দির মনে একটি উজ্জ্বল নবীনতা ও পরম শান্তির সৃষ্টি করে: এর স্বল্পায়োজনমাধুর্য্য মনকে এমন অভিভূত করে যে অনেক বৃহৎ আয়াস তার ত্রিসীমানায় পেঁছুতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় যখন আশ্রম থেকে চলে আসি, তখন মোহান্তজী আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অনেক দূর এলেন।

তাঁর বিশেষ আগ্রহ দেখলাম মন্দিরের আয় বাড়োনোর দিকে—অবিশ্যি নিজের স্বার্থের জন্যে নয়। গ্রামের অনেক গরিব লোক দুবেলা এখানে প্রসাদ পেয়ে থাকে, আরও কিছু আয় বাড়লে আরও বেশি লোককে খাওয়াতে পারতেন।

মোহান্তজী প্রকৃতই অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং বালকের মতো সরল। তাঁর ধারনা এ ধরনের একটা সৎকাজের কথায় যে কেউ টাকা দিতে রাজী হবে। শুধু মুখের কথা খসাবার অপেক্ষা মাত্র।

তাঁর সরলতা দেখে আমার হাসি পেল। বললুম—মোহান্তজী, আপনি একবার ভাগলপুরে আসুন না, আপনাকে দু-এক জায়গায় পাঠিয়ে দেবো, আপনি নিজেই বুঝবেন কে কেমন দিচ্চে।

চারধারে ফাঁকা মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঢিবির ওপর ক্ষুদ্র বন, দূরে দূরে সীসম্ গাছ—বিহারের সীসম্ গাছ একদিকে একটু হেলে থাকে—অনেকগুলো থাকে এক সারিতে। যাকে শিশু গাছ বলে, সে সম্পূর্ণ আলাদা গাছ, যদিচ সীসম্ গাছের কাঠেও বেশ মজবুত তক্তা হয় শুনেচি।

মোহান্তজী বললেন—বাবু, মনে থাকবে আমার কথা?

—খুব থাকবে, তবে আপনি নিজে না এলে কিছু করতে পারবো না।

হঠাৎ আমায় মোহান্তজী বললেন—আসুন, আপনার সঙ্গে পাঁড়েজীর আলাপ করিয়ে দিই।

মাঠের মধ্যে এক জায়গায় অনেকগুলো চালাঘর দেখা গেল। কাছাকাছি অন্য কোনো বাড়ি নেই। দূরে নিকটে অনেকগুলি সীসম্ গাছের সারি।

আমি একটু ইতস্তত করলাম যেতে, কারণ স্টেশনে গিয়ে আমায় ট্রেন ধরতে হবে। মোহান্তজী আমার কোনো আপত্তি শুনলেন না—পরে অবিশ্যি বুঝলাম তিনি

আমায় পাঁড়েজীর আশ্রমে রাখবার জন্যে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গেও আসছিলেন। মোহান্তজী বাড়ির কাছে গিয়ে ডাক দিতেই একজন লোক বার হয়ে তাঁকে হাসিমুখে প্রণাম করে বললে—আসুন বাবাজী, ইনি কে?

—ইনি ভাগলপুরের বাংগালি বাবু—আশ্রমের অতিথি—

—আসুন বাবুজী, আমার বড় সৌভাগ্য—উঠে এসে বসুন।

বেশ জ্যোৎস্না উঠেছিল। চারিদিকে চেয়ে দেখি বাড়ির উঠানে এবং ঘরের দাওয়ায় বড় বড় জালায় ও হাঁড়িতে কি সব রক্ষিত আছে—কিসের একটা দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে চারিদিকে। বাড়িতে আমরা একেবারে ভেতরের উঠোনেই গিয়ে হাজির হয়েচি—পাঁড়েজী একাই থাকেন বলে মনে হল, বাড়িতে কোনো মেয়েমানুষ নেই। বাড়িটা কিসের একটা কারখানা। কিসের কারখানা ভালো বুঝতে পারছিলুম না সন্ধ্যার অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে।

বাড়ির মধ্যেকার উঠানে আরও অনেক বড় বড় হাঁড়ি-কলসী, সেগুলিতেও কি যেন বোঝাই রয়েচে। সেই এক ধরনের উৎকট গন্ধ। কিসের কারখানা এটা?

হঠাৎ আমার মনে হল বে-আইনী মদের চোলাইখানা নয় তো? কিন্তু মোহান্ত-জীর মতো সাধুপুরুষ কি এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে যোগ রাখবেন?

আমাকে চারিদিকে সন্দেহ ও বিস্ময়ের চোখে চাইতে দেখেই বোধ হয় পাঁড়েজী (ওর নাম শ্রীরাম পাঁড়ে) বললে—কি দেখচেন বাবুজী?

আমি সংকোচের সঙ্গে বললাম—না, ওই কলসীগুলোতে কি তাই দেখচি।

পাঁড়েজী হেসে বললে—কি বলুন তো?

—আমি ঠিক বুঝতে পারচিনে—কিসের একটা গন্ধ বার হচ্চে—

—আচ্ছা, কাছে গিয়ে দেখুন না বাবুজি—

প্রত্যেক কলসীতে সাদা সাদা কি জিনিস, দুধের মতো। কিন্তু এত দুধ কি হবে এখানে, আর সন্ধ্যাবেলার এত দুধ কলসীতেই বা কেন? দুধ কি রাত্রিবেলা খোলা উঠানের মধ্যে ফেলে রাখে?

মোহান্তজীও কৌতুকপূর্ণ হয়ে বললেন—কি বাবাজি, কি দেখলেন?

পাঁড়েজী বললে—বাবু, ও-সব কলসীতে ঘোল, বুঝতে পারলেন না?

এত ঘোলের কলসী একত্র কখনো জীবনে দেখি নি। কি করে বুঝতে পারবো? কিন্তু এত ঘোল এল কোথা থেকে?

ওদের ঘরের দাওয়ায় আমাদের জন্যে জলচৌকি পেতে দিল শ্রীরাম পাঁড়ে। আমরা বসলুম—তারপর মোহান্তজীর মুখে ব্যাপারটা শোনা গেল, এটা মাখনের ও ঘিয়ের কারখানা।

দুধ অত্যন্ত সস্তা এসব অঞ্চলে, টাকায় ষোল সের পর্যন্ত বিক্রী হতে দেখেচি; মহিষের দুধ বরং একটু দরে বিক্রী হয়, কারণ ঘি করবার জন্যে মহিষের দুধ গোয়ালারা কেনে, কিন্তু গোরুর দুধের দাম নেই এখানে—গোরুর দুধের মাখন ও ঘি করবার রেওয়াজ নেই এখানে।

শ্রীরাম পাঁড়ের বাড়ি ছাপরা জেলায়। সে এক মাখন-তোলা কল নিয়ে এসে এই মাঠেরই মধ্যে প্রথম একখানা চালাঘর তুলে বসে—সে আজ এগারো বছর পূর্বের কথা।

এই এগারো বছরের মধ্যে শ্রীরামের ব্যবসা এত বড় হয়ে উঠেছে যে ওকে মাঠের মধ্যে অনেকখানি জমি নিয়ে বড় বড় দুখানা আটচালা ঘর, আর ছোট ছোট চালাঘর

অনেকগুলি করতে হল, মাখন-তোলা কল আরও দুটো এনেছে। তার ব্যবসা খুব জোর চলেচে।

আমার বড় ভালো লাগলো মোহান্তজীর এই গল্প। শ্রীরাম পাঁড়েকে আমি যেন নতুন চোখে দেখলুম। লোকটা খুব নিরীহ ধরনের, মুখে বেশি কথা বলে না—বোধ হয় কথা বলে না বলেই কাজ বেশি করে।

—আপনার এখানে কত দুধ লাগে রোজ?

—তার কিছু ঠিক নেই বাবুজি—পনেরো মণ দুধের মাখন সাধারণত হয়, তবে একদিন হয়তো বিশ-বাইশ মণ দুধ এল। তিনটে কল হিমসিম খেয়ে যায়।

—কলসীতে অত ঘোল কিসের? ওতে কি হবে?

—রোজ পনেরো-বিশ মণ দুধের ঘোল তো সোজা নয় বাবু। এত ঘোল সব আমি রেলে চালান দিই। পূর্ণিয়া অঞ্চলে ওর খুব বিক্রী। পড়তে পায় না বাবু।

—মাসে কত ঘি হয় তোমার কারখানায়?

—আমি ঘি তত করি নি বাবু, মাখন চালানিতে লাভ বেশি। বেশি দুধ হলে খোয়া ক্ষীর করি। তবে চার মণ ঘি মাসে চালান দিই।

—কত লোক খাটে?

দুধ সংগ্রহ করে আনবার জন্যে আট-দশ জন লোক রাখতে হয়েছে। ওরা রোজ ভোরে উঠে গ্রাম থেকে দুধ নিয়ে আসে। গোয়ালারা নিজেরাও দুধ দিয়ে যায়—সব দাদন দেওয়া আছে। তা ছাড়া কারখানায় আরও দশ-বারো জন লোক খাটে। ছাপরা জেলা থেকে এসে এই অজ পাড়াগাঁয়ে বসে লোকটা অত্যন্ত সামান্য মূলধন নিয়ে এই ব্যবসা আরম্ভ করে এখন বেশ উন্নতি করে তুলেছে—ওর কথা ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা গেল। আমি ভাবলুম আমার দেশের বেকার যুবকদের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়ে বার হয়ে সামান্য ত্রিশ-চল্লিশ টাকা মাইনের কেরানীগিরি যোগাড় করতে পারলে আমরা জীবন ধন্য মনে করি—দুঃখের বিষয়, তাও জোটে না। আমাদের মধ্যে দেশবিদেশে গিয়ে নিজেকে অন্যভাবে প্রতিষ্ঠা করার কল্পনাই জাগে না—তাই আমাদের দুঃখ।

শ্রীরাম পাঁড়ে রাত্রে আমায় থাকতে বললে। মোহান্তজীও বললে—বাবুজি আমার ওখানে থাকবার জায়গা নেই ভালো—সেইজন্যে এখানে আনলাম। মন্দিরে আপনাদের দরের অতিথি এলেই পাঁড়েজীর বাড়িতে রাখি। পাঁড়েজী বড় ভালো লোক। রাত্রে কোথায় যাবেন—এখানেই থাকুন।

আমারও এত ভালো লেগেছিল পাঁড়েজীকে, তখুনি রাজী হয়ে গেলাম। এর এই ব্যবসার কথা ভালো করে জেনে গিয়ে বাংলা দেশের বেকার যুবকদের যদি একটা পথ দেখিয়ে দিতে পারি, মন্দ কি?

রাত্রে আমার জন্যে উৎকৃষ্ট ঘিয়ে তৈরি পুরী আর হালুয়া, কি একটা তরকারি আর গরম দুধ এনে হাজির করলে পাঁড়েজীর রাঁধুনী ব্রাহ্মণ। সে ধরনের ঘিয়ে তৈরি খাবার বাংলাদেশে আমি কখনো চোখেও দেখি নি, পশ্চিমেও নয়—কেবল আর দু-একটা জায়গা ছাড়া।

পাঁড়েজীকে বললুম—ভাগলপুরের বাজারেও তো এমন ঘি মেলে না। কি চমৎকার গন্ধ! ভয়সা ঘি কি এমন হয়?

পাঁড়েজী হেসে বললে—কোথায় পাবেন বাবুজি? ঘি যা বাজারে আপনারা পান, তা হল পাইল করা, অর্থাৎ অন্য বাজে ঘি বা চর্বি মেশানো। ভেজাল ভিন্ন ঘি বাজারে নেই জানবেন, যে যত বিজ্ঞাপনই দিক। তবে কোনো ঘিয়ে কম, কোনো

ঘিয়ে বেশি ভেজাল—এই যা তফাত। আর এ হল আমার কারখানায় সদ্য তৈরী খাঁটি ভঁয়সা। এ কোথায় পাবেন বাজারে?

মোহান্তজীও আমার সঙ্গে ভোজনে বসেছিলেন। দেখলুম যদিও তাঁর বয়স হয়েচে—কিন্তু আমার মতো তিনটি লোকের উপযুক্ত পুরী, তরকারি ও হালুয়া অবাধে উদরসাৎ করলেন। মোহান্তজীকে আমার বড় ভালো লাগলো, এমন নিরীহ সজ্জন মানুষ খুব কম দেখা যায়।

এক এক জায়গায় এক এক ধরনের মানুষের ছাঁচ থাকে—অন্যত্র তা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, বাংলার বাইরে আমি নিছক নিরীহ, সরল ও ভালোমানুষ লোকের যে ছাঁচ দেখেচি, বাংলাদেশে তা দেখি নি।

হয়তো ঠিক ব্যাপারটা বোঝাতে পারচিনে—কিন্তু একথা খুব সত্যি, বাংলার অতি অজ পাড়াগাঁয়েও লোকের খানিকটা কুটিল বুদ্ধি, খানিকটা আত্মসম্মান-জ্ঞান, খানিক চালাক-চতুরতা আছে। এসব থাকলেই আর লোক নিছক সরল টাইপের হল না। তা মেয়েদের কথাই বা কি, আর পুরুষদের কথাই বা কি। এর কারণ বাঙালীর মধ্যে অতি নির্ব্বোধ লোক নেই বললেই হয়—ওদের অনেকখানি জন্মগত শিক্ষা-দীক্ষা আছে—তাতে সংসারে অনেক ব্যাপারে ওদের অভিজ্ঞতা আপনা-আপনি হয়—রেলে বা স্টীমারে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যাতায়াতের বেশি সুবিধে বাংলাদেশে। তা থেকেও লোকে অনেক বাইরের জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারে।

বাংলাদেশে আমি খুব নিরীহ লোক ভেবে যার কাছে হয়তো গিয়েচি, দেখেচি সে আসলে অনেক কিছু জানে বা বোঝে—ফলে তার মনের নিছক সারল্য নষ্ট হয়ে গিয়েচে। কিন্তু বাংলার বাইরে আমি আশ্চর্য্য ধরনের সরল ও নিরীহ লোক দেখেচি —তাদের শিশুসুলভ সারল্য কতবার আমাকে মুগ্ধ করেচে। আমি আমার জীবনে এ-ধরনের সরল লোক খুঁজে বেড়িয়েচি—আমার আবাল্য ঝোঁক ছিল এদিকে, মানুষের টাইপ খুঁজে বার করবো। আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখেচি বিহার ও সি-পিতে, ছোটনাগপুরে এই সরল টাইপটা বেশ পাওয়া যায়। এখনও পাওয়া যায়। তবে আজ-কাল নষ্ট হয়ে যেতে বসেচে।

মানুষের মনকে বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিক্ষা একটি কলের ছাঁচে গড়চে। সব এক ছাঁচ, রামও যা ভাবে শ্যামও তাই ভাবে, যদু-মধুও তাই ভাবে। যে আর একজনের মতো না ভাবে--তাকে লোকে মূর্খ বলে, অশিক্ষিতও বলে—সুতরাং সমাজের ভয়ে, লোকনিন্দার ভয়ে, শ্বশুরবাড়িতে শালীশালাদের শ্রদ্ধা হারাবার ভয়ে—লোকে অন্য রকম ভাবতে ভয় পায়। ফলে শিল্পে, সাহিত্যে, সামাজিক রীতিনীতিতে একই ছাঁচের মনের পরিচয় পাওয়া যায় সর্ব্বত্র, অনেক খুঁজেও খাঁটি অরিজিন্যাল টাইপ বার করা যায় না। শহরে তো যায়ই না, শহর থেকে সুদূরে, নিভৃত পল্লী অঞ্চলেও বড় একটা দেখা যায় না। তবে বাংলার বাইরে, যেখানে ইউনিভারসিটি, খবরের কাগজ, রেডিও প্রভৃতির উৎপাত নেই, কিংবা শিক্ষিত লোকের যাতায়াত কম, এমন অরণ্য অঞ্চলে—নিকটে যেখানে রেলস্টেশন বা মোটর বাসের চলাচলের পথ নেই—সেখানে দু-একটা অতি চমৎকার ছাঁচের মানুষ দেখেচি।

এদের আবিষ্কারের আনন্দ আমার কাছে একটা নতুন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সমান। মোহান্তজী অনেকটা সেই ধরনের মানুষ।

তিনি রাত্রে মন্দিরে ফিরে যাবার আগে আমায় বিশেষ অনুরোধ করলেন আমি যেন আমার ভাগলপুরস্থ বন্ধুবান্ধবকে বলে তাঁর মন্দির মেরামতের ও মন্দিরের আয় বাড়াবার একটা ব্যবস্থা করে দিই। অনেকখানি সরল আশা-ভরসা তাঁর চোখেমুখে

—বহু দূরকালের ছায়া তাঁর জীবনে এমন একটি স্নিগ্ধ পরিবেশ রচনা করেছে—তা থেকে হুঁশিয়ার ও হিসাব-দুরস্ত বর্ত্তমানে তিনি কোনোদিনই যেন পৌঁছতে পারবেন না, কোনোদিনই বুঝবেন না এর কুটিলতা আর আত্মস্বার্থবোধ।

আমি বললুম—মোহান্তজী, আপনি চলে আসুন ভাগলপুরে।

—আপনি যেতে বললেই যাবো, টাকা একসঙ্গে জড় হলে নিয়ে আসব গিয়ে।

তারপর আমায় একান্ত চুপিচুপি বললেন—এই পাঁড়েজী আমায় বড় সাহায্য করে—

—কি রকম?

—ভদ্রলোক এলে ওর এখানে রাখি, ও আমাকেও মাঝে মাঝে রাত্রে এখানে খাওয়ায়, বেশ খাওয়ায়—দেখলেন তো? ওর নিজের কারখানার ঘি মাখন—বাইরে কোথায় এমন পাবেন বলুন। রামচন্দ্রজী ওকে আরও দেবেন, বড় সাত্ত্বিক লোক।

যে নিজে সাত্ত্বিক সে সবাইকে এমনি সাত্ত্বিক ভাবে। আমরা নিজেরাও তত সাত্ত্বিক নই বলেই বোধ হয় মানুষের খারাপ দিকটা আগে দেখে বসে থাকি!

শ্রীরাম পাঁড়ে সাত্ত্বিক কিনা জানি না—কিন্তু সে বেশ ব্যবসা-বুদ্ধিওয়ালা লোক বটে। দুধ এখানে সস্তা, অথচ দুধ চালান দেবার সুবিধে নেই। একটা মাখন তোলা কল নিয়ে এই গ্রামকে কেন্দ্র করে বেশ একটা ঘি-মাখনের ব্যবসা গড়ে তুলেছে। এর কারণ আমাদের মতো ওদের চাকরি-প্রবৃত্তি নেই—চোখ ওদের অন্যদিকে বেশ খোলে —আমরা এসব দেখতে পাইনে। আমরা হলে খুঁজতাম দ্বারভাঙ্গার মহারাজের স্টেটে কোনো চাকুরি যোগাড় করা যায় কাকে ধরাধরি করলে।

পরদিন সকালে আমি এদের দুজনের কাছে বিদায় নিয়ে চলে এলুম। এর পরে আর একবার আমাকে বিশেষ কাজে ওদিকে শ্রীরাম পাঁড়ের আতিথ্য গ্রহণ করতে হয়েছিল, তখন সে আরও উন্নতি করেচে—লেখাপড়ার হিসেব ও চিঠিপত্র লেখবার জন্যে একজন গোমস্তা রেখেচে। মোহান্তজীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছিল—মাত্র একটি দিনের জন্যে। তখন সামনে কুম্ভমেলার সময়, তিনি প্রয়াগে কুম্ভমেলায় যাবার তোড়-জোড় করছিলেন, পাঁড়েজীকে নিয়ে যাবেন সঙ্গে বললেন। আমাকেও তিনি অনুরোধ করেছিলেন মেলায় যাবার জন্যে—অবিশ্যি আমার যাওয়া ঘটে নি। তাঁরা গিয়েছিলেন কিনা জানি না—আর তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। এ হল ১৩৩৬ সালের মাঘ মাসের কুম্ভমেলা ; তারপর আর কুম্ভমেলা হয় নি এখনো পর্য্যন্ত।

১৩৩৭ সালের কথা। পূজার ছুটি সেইদিন হল।

ভাগলপুরে বার লাইব্রেরীতে বসে কথাবার্ত্তা চলচে বন্ধুদের সঙ্গে, ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায়। আমি বললুম—পায়ে হেঁটে কোনোদিকে যদি যাওয়া যায়, আমি রাজী আছি।

প্রবীণ উকিল অবিনাশবাবু বললেন—হেঁটে যাওয়ার বেশ চমৎকার রাস্তা আছে, চলে যান না দেওঘর। সিনারী খুব ভালো।

আমি তখনি যেতে রাজী। একজন মাত্র উকিল-বন্ধু অম্বিকা আমার সঙ্গে যেতে চাইলে। পরদিন সকালে আমরা আমার থাকবার জায়গা থেকে রওনা হলুম খুব ভোরে। তিন-চারজন উৎসাহী বন্ধু ভাগলপুর শহর ছাড়িয়ে দেওঘরের পথে প্রথম মাইল পোস্ট পর্য্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

অম্বিকা খুব সুস্থ-সবল, দীর্ঘাকৃতি যুবক। সে ও আমি দুজনেই খুব জোরে হাঁটছি। সাত আটটা মাইল-পোস্ট পর্য্যন্ত বেশ জোরে চলে এলুম দুজনে। বেলা

প্রায় দশটা বাজে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া সোজা রাস্তা। পথের দ্বধারে নতুন ধানক্ষেত, মাঝে মাঝে বৃষ্টির জল বেধে আছে—তাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে—গাছের ছায়া সমস্ত পথেই।

আরও দু'তিন মাইল ছাড়ালুম। দুজনেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা দুই-ই পেয়েচে—সঙ্গে কোনো ব্যবস্থা নেই—হাঁটবার সুবিধে হবে বলে খালি হাতে পথ চলচি।

পথের ধারে মাঝে মাঝে দেহাতী গ্রাম—সেখানে বিশেষ কিছু খাবার পাওয়া যায় না আমরা জানি—সন্ধান করলে হয়তো চিঁড়ে পাওয়া যেতে পারে বড়জোর।

অম্বিকা বললে—চলো, আগে গিয়ে কোথাও রান্না করে খাওয়া যাবে—

—রান্না করবার জিনিসপত্র তো চাই—তাই বা কোথায় পাবে?

—চলো যা হয় ব্যবস্থা হবেই।

ব্যবস্থার কোনো চিহ্ন নেই কোনো দিকে। সুদীর্ঘ সোজা পথ, গ্রাম দু-তিন মাইল অন্তর। পুরেনি বলে একটা গ্রাম রাস্তার ধারেই পড়লো—এখানে একটা ডাক-ঘর আছে, দু-চারখানা দোকান—কিন্তু দোকানের খাবার দেখে কিনতে প্রবৃত্তি হল না আমাদের।

পুরেনি ছাড়িয়ে মাইল-খানেক গিয়েচি, এক জায়গায় পথের ওপর অনেকগুলো কুলি খাটচে—খোয়া ভাঙচে। তাদের কাছে একখানা এক্কা দাঁড়িয়ে। একজন বিহারী ভদ্রলোক কুলিদের তদারক করচেন পায়চারি করতে করতে। আমাদের অদ্ভুত বেশ দেখেই বোধ হয় তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়। দুজনের পরনে খাকীর হাফ্-প্যান্ট, গায়ে সাদা টুইলের হাতকাটা শার্ট, মাথায় সোলার টুপি, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত উলের মোজা ও বুট জুতো। তার ওপর আবার দুজনেরই চোখে চশমা, হাতে হাতঘড়ি।

এ ধরনের সেজেগুজে বিহারের অজ পল্লীপথে চললে লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করে পারে না। পথে দেখে এসেচি প্রত্যেক বস্তির লোক আমাদের দিকে হাঁ করে চেয়ে চেয়ে দেখচে—পুরেনি বাজারে তো লোকে আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে কি বলাবলি করেচে।

আর কিছু না হই, আমরা যে পুলিসের দারোগা এ ধারণা অনেকেরই হয়েচে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোক বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন—আপনারা কোথায় যাবেন?

ওঁর মুখে বাংলা শুনে আমরা একটু আশ্চর্য্য না হয়ে পারলুম না। ওঁর চেহারা অবিকল দেহাতী বিহারী ভদ্রলোকের মতই। ভাগলপুর শহর থেকে বারো মাইল দূরে বাঙালীর সঙ্গে এ ধরনের সাক্ষাৎ বড় একটা আশাও করা যায় না।

—মশায় কি বাঙালী?

—আজ্ঞে, আমার নাম রামচন্দ্র বসু—এই নিকটেই চেরো বলে গ্রাম আছে, ওখানেই আমার বাড়ি।

—এখানে বাড়ি করেচেন? কতদিন হবে?

—আমার বাস এখানে প্রায় পনেরো বছর হল—তার আগে আমরা কহলগাঁও থাকতাম। আপনারা কোথায় যাবেন?

আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা শুনে ভদ্রলোক ভাবলেন আমরা পদব্রজে বৈদ্যনাথ-ধামে তীর্থ করতে যাচ্চি। বললেন, তা বেশ। আপনাদের বয়সে তো ওসব মানেই না। এসব দেখলেও আনন্দ হয়। তা এবেলা আমার এখানে আহার করে তবে

যাবেন।

আমাদের কোনো আপত্তি ছিল না এ প্রস্তাবে। বোধহয় একটু বেশি সহজেই রাজী হয়েছিলুম।

রামবাবুর বাড়ি গিয়ে, তাঁরা যে প্রবাসী বাঙালী, সেটা ভালো করেই বুঝলুম ; ছেলেমেয়েরা ভালো বাংলা বলতে পারে না, কিন্তু দেহাতী হিন্দী বলে বিহারীদের মতই। তাঁদের বাড়িতে যত্ন আদর আমরা পেলুম কতকালের আত্মীয়ের মতো, রাত্রে থাকবার জন্যে কত অনুরোধ করলেন। আমাদের থাকলে চলে না, যেতে হবে অনেক দূর—পায়ে হেঁটে যাবো বলে বেরিয়ে এত আরাম করবার ইচ্ছে ছিল না মোটেই।

একটা জিনিস তাঁদের বাড়ি খেয়েছিলুম, কখনো ভুলতে পারা যাবে না—করমচার অম্বল। রান্নার গুণে নয়, করমচার অম্বল জীবনে তার আগেও কখনো খাইনি, তার-পরেও না, সেই জন্যে।

আমরা আবার যখন পথে উঠলুম, তখন বেলা আড়াইটের কম নয়। শীতের বেলা, ঘণ্টা দুই হাঁটবার পরে রোদ একেবারে পড়ে গেল।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা সোজা তীরের মতো নাকের সামনে বহুদূর পর্য্যন্ত চলে গিয়েচে। দু-ধারে ধু-ধু করচে জনহীন প্রান্তর, ডাইনে অনেক দূরে মারফ পাহাড় নীল মেঘের মতো দেখা যায়। সূর্য্য ক্রমে পাহাড়ের পেছনে অস্ত গেল, সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে, তখনও রাস্তার দুধারে মাঠ আর মাঠ। অম্বিকা এদেশের লোক। তাকে বললুম—কোথায় থাকবো রাত্রে হে? গ্রামের চিহ্ন তো দেখচিনে—

অম্বিকা কিছু জানে না। সে এদিকে কখনো আসেনি—

আরও কিছুদূর গিয়ে আমবাগানের আড়ালে একটা বস্তি দেখা গেল—কতক-গুলো খোলার ঘর এক জায়গায় তাল পাকানো, এদেশের ধরনে। ঘোর অপরিষ্কার। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, বস্তির নাম রজাউন। একজন লোককে বলা গেল এখানে রাত্রে থাকবার কোথাও একটু স্থান হবে কি না ; তারা বললে কাছারি-বাড়িতে দুখানা চারপাই আছে, বিদেশী লোক এলে কাছারি-বাড়িতে থাকে।

কাছারি-বাড়ির অবস্থা দেখে আমরা পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম। ঘোড়ার আস্তাবলও এর তুলনায় স্বর্গ। একটা ভাঙ্গা খোলার ঘর, তার চাল পড়েচে ঝুলে, বাইরের দাওয়ায় দুখানা চারপায়া আছে বটে, কিন্তু তাতে শোওয়া চলে না। কাছারি-ঘরের মধ্যে এত জঞ্জাল যে সেখানে রাত্রিযাপনের চেষ্টা করলে সর্পাঘাত অবশ্যম্ভাবী। আমরা বললাম—আর কোথাও জায়গা নেই?

—না বাবু, নিজেদের তাই থাকবার জায়গা হয় না—গরিব লোকের বস্তি, আপনাদের জায়গা দেবে কোথায়?

পড়ে গেলুম বেজায় মুশকিলে। সন্ধ্যা হয়েচে, সপ্তমীর জ্যোৎস্না মাঠ-ঘাট আলো করেচে, নিকটে আর কোনো বস্তিও দেখা যায় না—এখন কি করি?

একজন আমাদের অবস্থা দেখে বললে—বাবু, আপনারা থানায় যান। বস্তির পশ্চিম দিকে আধ মাইলের মধ্যে একটা বাগান দেখবেন, তার ওপারে থানা। সেখানে থাকবার জায়গা মিলতে পারে।

থানা খুঁজে বার করলুম। থানার দারোগা আরা জেলার লোক, মুসলমান। তাঁর আতিথ্য আমরা কখনো ভুলবো না। আমরা তাঁকে বললুম, আমরা কিছু খাবো না, শুধু একটু আশ্রয় চাই।

তিনি বললেন, তা কখনো হয় না। আমার হেড-কন্‌স্টেবল ব্রাহ্মণ, তাকে দিয়ে রান্না করাবো, আপনাদের কোনো আপত্তির কারণ নেই।

আমরা বললাম—সেজন্যে নয়, আপনার বাসা থেকে রেঁধে পাঠালেও আমাদের কোনো আপত্তি হবে না জানবেন। ভদ্রলোক শুনলেন না। হেড কনস্টেবলকে দিয়ে পুরী-তরকারী আর হালুয়া তৈরী করিয়ে দিলেন—নিজের বাসা থেকে সেরখানেক জাল দেওয়া দুধ পাঠিয়ে দিলেন।

আহারাদির পরে আমাদের জন্যে বিছানা আনিয়ে দিলেন বাসা থেকে। আমাদের সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করলেন—তারপর আমাদের বিশ্রাম করতে বলে বাসায় গেলেন।

আমরা খুব ভোরে উঠে রওনা হবো বলে রাত্রেই তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে রেখে-ছিলুম। সূর্য্য ওঠবার আগেই পথে বেরিয়ে পড়লুম।

মাইল আট-নয় দূরে বাঁকা—ভাগলপুরের একটা মহকুমা। এক জায়গায় দুটো রাস্তার মোড়, কেউ বলে দেওয়ার লোক নেই কোন্ রাস্তা বাঁকায় গিয়েচে। আমরা আন্দাজ করে নিয়ে অনেকখানি পথ চলে এসেচি, তখন একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করলুম ঠিক পথে চলেচি কি না। সে বললে, বড্ড ঘুর-পথে যাচ্চেন বাবুজি, এই মাঠের মধ্যে দিয়ে যান, শীগগির পেঁাছোবেন।

তার কথা শুনে মাঠের রাস্তায় নেবে আমরা আরও ভুল করলাম। পথ ভীষণ খারাপ, চষা-মাটির ওপর দিয়ে আল ডিঙিয়ে, খানা-ডোবা পার হয়ে মাইল তিনেক এসে আমার দুই পায়ে ফোস্কা পড়লো, আমি আর হাঁটতে পারি নে—অথচ এদিকে দিগন্তবিস্তীর্ণ প্রান্তর সামনে, একটা গোটা টাউন তো দূরের কথা, একখানা খোলার ঘরও নেই মাঠের কোনো দিকে।

আমি বললুম—আর হাঁটতে পারচিনে অম্বিকা—

অম্বিকা ভরসা দিলে, আর একটু পরেই আমরা বাঁকা পেঁাছে যাবো এবং সেখানে ওর এক উকিল-বন্ধুর বাড়ি আশ্রয় নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আরও দু-ঘণ্টা হাঁটবার পরে আমি একটা গাছতলায় বসে পড়লুম। আমার চলবার শক্তি লুপ্ত হয়েচে। আমিই হেঁটে দেশ-বিদেশ বেড়াবার বড় উৎসাহ দেখিয়েছিলুম, আমার প্ররোচনাতেই অম্বিকা আমার সঙ্গে হেঁটে বেড়াবার জন্যে বার হয়েচে ; এখন দেখা গেল আমি একেবারে হাঁটতে পারিনে, মুখে যত বলি কাজে তার কিছুই করবার সাধ্য নেই আমার।

অম্বিকা পড়ে গেল বিপদে।

সে এখন আমায় নিয়ে কি করে? বেলা প্রায় একটা বাজে আমায় সে ঘাড়ে করে নিয়ে যেতে পারে না বাঁকা পর্য্যন্ত, অথচ সত্যিই পা ওঠাবার শক্তিটুকুও নেই আমার।

আমি বললুম—অম্বিকা, বাঁকা থেকে একখানা গাড়ি নিয়ে এস গিয়ে, আমি এখানেই থাকি।

অম্বিকা যেতে রাজী নয়। আমায় এ অবস্থায় ফেলে সে কোথাও যাবে না। তার চেয়ে আমি বসে বিশ্রাম করি, যদি এর পরে আমি হাঁটতে পারি—সে আমার সঙ্গে এখানেই থাকবে।

বেলা আড়াইটের সময় আমি কিছু সুস্থ হয়ে পুনরায় হাঁটতে আরম্ভ করলুম। অম্বিকা ঘড়ি দেখে বললে, বেলা ঠিক আড়াইটে—এক ঘণ্টার মধ্যে বাঁকা পেঁাছে যাবো।

আরও দেড় ঘণ্টা চলে গেল, বাঁকার চিহ্ন নেই কোনো দিকে।

আমি বললুম—শর্টকাট্ করতে গিয়ে এই বিপদটি বাধলো। সোজা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়ে গেলে কোন্ কালে বাঁকা পেঁৗছে যেতুম।

বেলা যখন বেশ পড়ে এসেছে, তখন আমরা বাঁকা পেঁৗছে গেলুম। সেখানে জিজ্ঞেস করে জানা গেল মাঠের মধ্যে আমরা ভুল পথ ধরেছিলুম, তাই আমাদের এত বিলম্ব। যে ভদ্রলোকের বাড়ি আমরা গিয়ে উঠলুম, তাঁরাও বাঙালী কিন্তু অনেক-দিন বিহারে বাস করবার ফলে একেবারে বিহারী হয়ে গিয়েছেন। ছেলেমেয়েরা এখন ভালো বাংলা বলতে পারে না। তাঁদের আদর-যত্ন মনে রাখবার জিনিস বটে। রাত্রে আমাদের জন্যে তাঁরা পুরী-তরকারি করে দিলেন, আহারান্তে শয্যা আশ্রয় করে মনে হল তিন দিনের মধ্যে আমি আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবো না।

অম্বিকাকে বললুম—দেওঘর যাওয়া এখানেই ইতি। আমি এক্কা করে কাল সকালে মান্দার হিল যাবো, সেখানে থেকে ট্রেনে ভাগলপুর। পায়ে হেঁটে বেড়ানোর শখ আমার মিটেচে।

অম্বিকা আমায় নানারকমে বোঝাবার চেষ্টা করে। এখন ভাগলপুর ফিরলে লোকে কি বলবে, কত জাঁক করে বেরুনো হয়েচে ভাগলপুর থেকে, তুমিই সকলের চেয়ে জোর গলায় চেঁচিয়েছিলে যে পায়ে হেঁটে ভ্রমণ সব ভ্রমণের সেরা। তোমার এই শোচনীয় পরাভবে—ইত্যাদি।

আমি নাছোড়বান্দা। শরীরের সামর্থ্যে যদি না কুলোয়, আমি কি করবো!

আমার এক পা হাঁটবার ক্ষমতা নেই আর। বন্ধুর বকুনি শেষ হবার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। কিন্তু ভোরে উঠে দেখি যে আমার পায়ের ব্যথা অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে সেরে গিয়েচে। এদিকে আমার বন্ধু চা পান শেষ করে বললেন—তাহলে একখানা এক্কা ডাকি, এইবেলা মান্দার হিলে রওনা হওয়া যাক।

আমি বললুম, আর মান্দার হিলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, হাঁটতে পারবো এখন, চলো রওনা হই।

দুজনে আবার পথে উঠলুম।

সবে সূর্যোদয় হচ্চে—ডানদিকে কাঁকোয়ারা স্টেটের অনুচ্চ শৈলশ্রেণী, মাঝে মাঝে শালবন। প্রভাতে মুক্ত বায়ুতে জীবনের জয়গান ঘোষণা করচে। পথের নেশায় মন-প্রাণ উত্তেজিত হয়ে উঠেচে—কোথায় মান্দার হিল আর কোথায় ভাগলপুর। প্রায় ছ মাইল পথ হাঁটবার পরে একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী পার হতে হল। উপলরাশির উপর দিয়ে ঝির ঝির করে নির্ম্মল জলের ধারা বয়ে চলেচে। নদীর দু পাড়ে ছোট ছোট কি ঝোপে সুন্দর ফুল ফুটেচে।

নদী পার হয়ে আরও মাইল-পাঁচেক পথ হেঁটে এসেচি ; একজন বিহারী ভদ্র-লোক আমাদের পাশ দিয়ে টম টম চড়ে যেতে যেতে আমাদের দেখে গাড়ি থামালেন।

আমার বন্ধুকে নমস্কার করে হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা চলেচেন এ ভাবে ?

অম্বিকা বললে—বেশ ভালো আছেন নদীয়াচাঁদবাবু ? নমস্কার। দেওঘর চলেচি—

—পায়ে হেঁটে ? মান্দার হিল থেকে ?

—সোজা ভাগলপুর থেকে। কাল বাঁকাতে রাত কাটিয়েচি—ইনি আমার বন্ধু অমুক—ইনিও যাচ্চেন—

ভদ্রলোক টমটম থেকে নেমে পড়লেন। আমাদের দুজনকে বিশেষ অনুরোধ করলেন তাঁর টমটমে উঠতে। আমার বন্ধু ও আমি দুজনেই বিনীতভাবে বললুম,

যখন হে'টে চলেচি, শেষ পর্য্যন্ত হে'টেই যাবো। কেউ দেখচে না বলে এখানে খানিকটা গাড়িতে উঠে শেষে ভাগলপুরে ফিরে পায়ে যখন হে'টে যাওয়ার বাহাদুরি নেওয়া আমাদের ধাতে সইবে না।

তিনি বললেন—তীর্থ করতে যাচ্চেন নাকি?

আমরা তাঁকে আশ্বস্ত করলুম। পুণ্য অর্জ্জনের লোভ নেই আমাদের। যাচ্চি এমনিই—শখ।

তিনি বললেন—খাওয়া-দাওয়া করবেন এবেলা আমার ওখানে। জামদহ ডাক-বাংলোতে আমি কাছারি করবো এবেলা। আমি আগে চলে যাই, কিছু মনে করবেন না। আপনাদের পথের ধারেই পড়বে জামদহ বাংলো। সেখানে আপনাদের পে'ছিুতে আরও ঘণ্টা-দুই লাগবে। আমি লোক দাঁড় করিয়ে রাখবো।

ভদ্রলোক টমটমে উঠে গেলেন।

অম্বিকা বললে—উনি বাবু নদীয়াচাঁদ সহায়। লছমীপুর স্টেটের ম্যানেজার। বড় ভাল লোক। আমার সঙ্গে খুব আলাপ আছে। ভালোই হল, দুপুর ঘুরে গেলে আমরা জামদহ পে'ছিব. সেখানে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে এখন।

বেলা প্রায় বারোটার সময়ে আমরা দূর থেকে একটা শালবন দেখতে পেলুম পথের ধারেই। অম্বিকা বললে. ওর মধ্যেই জামদহ ডাকবাংলো—নদীয়াচাঁদবাবু বলেছিলেন। আমাদের জন্যে পথের ওপর লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমাদের বাংলোতে নিয়ে গেল।

নদীয়াচাঁদবাবু অনেক প্রজা নিয়ে কাছারি করচেন। আমাদের যথেষ্ট অভ্যর্থনা করলেন। বনের মধ্যে একটা ই'দারা, তার চারিদিকে সিমেণ্ট বাঁধানো—আমরা সেখানে স্নান করে ভারি তৃপ্তি পেলুম।

আহারাদির পরে নদীয়াবাবু বললেন—এখানে এই বনের মধ্যে আমায় তিন দিন থাকতে হবে। আপনারা যখন এসেচেন, তখন একটা রাত অন্তত আমার এখানে কাটিয়ে যান। আজ আর আপনাদের কিছুতেই ছাড়চিনে।

আমাদের কোনো আপত্তি তিনি শুনলেন না। লোকটি বিশেষ ভদ্র ও শিক্ষিত, তাঁর অনুরোধ এড়ানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

শালবনে নিস্তব্ধতার মধ্যে কি সুন্দর বৈকাল আর জ্যোৎস্নারাত্রি কাটলো! মন একেবারে মুক্ত, পথের নেশায় মাতাল, কতদূর এসে পড়েচি পরিচিতের সীমা ছাড়িয়ে —এমন একটি সুন্দর রাত্রি জীবনে আর হয়তো না-ও মিলতে পারে। নদীয়াবাবু আমাদের কাছে বসে বসে গল্পগুজব করলেন অনেকক্ষণ। কথায় কথায় বললেন—

—আপনারা যদি এসেচেন এ পথে, তবে লছমীপুর দেখে যান একবার। চমৎকার দৃশ্য ওখানকার। আপনারা খুশী হবেন।

—এখান থেকে কতটা হবে?

—প্রায় সাত মাইল—তবে পাকা সড়ক ছেড়ে অন্য রাস্তায় যেতে হবে—জঙ্গল পড়বে খুব।

রাত্রে শুনে আমি বন্ধুকে বললুম—জেলাবোর্ডের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে চলো আমরা আগে লছমীপুর দেখে আসি।

বন্ধু আপত্তি করলে। সে শুনেচে লছমীপুর ছাড়িয়েই দশ-বারো মাইল জঙ্গল, সে পথে হে'টে যাওয়া বড় বিপজ্জনক, আমাদের যাওয়া উচিত হবে না।

আমি তার কাছে আরাকান ইয়োমার জঙ্গলের কথা বললুম। তার চেয়ে বেশি জঙ্গল আর কি হবে। লছমীপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা ভাগলপুরে থাকতে

অনেকের মুখে শুনেচি। এতদূরে যখন এসেচি, লছমীপুর দেখে যাওয়াই ভালো।

অনেক রাত পর্য্যন্ত কথা-কাটাকাটির পরে অম্বিকাকে রাজী করানো গেল। পরদিন খুব ভোরে উঠে নদীয়াচাঁদবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে লছমীপুর রওনা হবার জন্যে বাঁ-দিকের বনপথ ধরলুম।

তখন সবে সূর্য্য উঠেচে। সত্যিই পথটির দৃশ্য চমৎকার। এই প্রথম রাঙা মাটি চোখে পড়ল—উঁচুনীচু জমি, শাল পলাশ ও গাছের সারি, মাঝে মাঝে দু-একটা বটগাছ। নানা জায়গায় বেড়িয়ে আমার মনে হয়েচে, বটগাছ যত বেশি বনে, মাঠে, পাহাড়ের ওপর অযত্নসম্ভূত অবস্থায় দেখা যায়, অশ্বত্থ তেমন নয়। বাংলার বাইরে, বিশেষ করে এই সব বন্য অঞ্চলে, অশ্বত্থ তো আদৌ দেখেচি বলে মনে হয় না—অথচ কত বন-প্রান্তরে, কত পাহাড়ের মাথায়, সঙ্গিহীন সুপ্রাচীন বটবৃক্ষ ও তার মাথায় সাদা সাদা বকের পাল যে দেখেচি, তাদের সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ হবে না।

দক্ষিণ-ভাগলপুরের এই অঞ্চলের জমি গঙ্গা ও কুশীর পলিমাটিতে গড়া উত্তর-ভাগলপুরের জমি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এদিকের ভূমির প্রকৃতি ও উদ্ভিদ্-সমাবেশ সাঁওতাল পরগনার মতো, তেমনি কাঁকরভরা, রাঙা, বন্ধুর—শুধু শাল ও মউল বনে ভরা, ঠিক যেন দেওঘর মধুপুর কি গিরিডি অঞ্চলে আছি বলে মনে হয়। বেলা প্রায় নটার সময় দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়ো দেখা গেল—কিন্তু চূড়োটা যেন পথের সমতলে অবস্থিত। অম্বিকা বললে—ওই লছমীপুর। আমি জানি রাজবাড়ির কালীমন্দির খুব বড়, ওটা তারই চূড়ো।

কিন্তু মন্দিরের চূড়ো পথের সমতলে কি করে থাকে, আমরা দুজনে প্রথমটা বুঝতে পারিনি বুঝলুম যখন আমরা লছমীপুরের আরও নিকটে পৌঁছেচি।

লছমীপুর একটা নিম্ন উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত, চারিদিক থেকে পথগুলো ঝরনার মতো নীচের দিকে নেমে পড়েচে উপত্যকার মধ্যে। আমাদের পথ ক্রমশ নীচে নামচে, দুধারের শাল বন আরও নিবিড় হয়ে উঠেচে, অথচ কোন ঘরবাড়ি চোখে পড়ে না—কেবল সেই মন্দিরের চূড়োটা আরও বড় ও স্পষ্ট দেখাচ্চে।

একটা জায়গায় এসে হঠাৎ নীচের দিকে চাইতেই অনেক ঘরবাড়ি একসঙ্গে চোখে পড়ল।

সত্যিই ভারি সুন্দর দৃশ্য।

বনজঙ্গলে ভরা একটা খুব নাবাল জায়গায় এই ক্ষুদ্র গ্রামটির ঘরবাড়ি যেন ছবির মতো সাজানো। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটা সেকেলে ধরনের পুরনো ইটের বাড়ি ও সেই মন্দিরটা।

অম্বিকা বললে—ওই রাজবাড়ি নিশ্চয়।

নদীয়াচাঁদবাবু স্থানীয় কোনো এক কর্ম্মচারীর নামে একখানা পত্র দিয়েছিলেন আমাদের সম্বন্ধে, যার বলে আমরা রাজবাড়ীর অতিথিশালায় স্থান পেলুম। অতিথি-শালাটি বেশ বড়, খোলার ছাদওয়ালা চারপাঁচটি কামরাযুক্ত বাড়ি। দড়ির চারপাই ছাড়া ঘরগুলিতে অন্য কোনো আসবাব নেই।

এখানে একটি অদ্ভুত বেশভূষাধারী যুবককে দেখে আমরা দুজনেই কৌতূহলী হয়ে পড়লুম তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে। যুবকটির বয়স ত্রিশের মধ্যে, রং মিশ্‌কালো, মাথায় লম্বা লম্বা বাবরি চুলে কেয়ারি করে টেরি কাটা, গায়ে সাদা ফুলদার আদ্দির পাঞ্জাবি, গলায় রঙীন রুমাল বাঁধা—আর সকলের চেয়ে যা আমাদের চোখে বিস্ময়কর ঠেকলো, তা-হচ্ছে এই যে, এই দিন-দুপুরে লোকটার পকেটে একটা পাঁচ ব্যাটারির প্রকাণ্ড টর্চ্চ। বাঙালী নয় যে, তা বুঝতে এতটুকু দেরি হয় না।

অম্বিকা বললে—লোকটাকে কিসের মতো দেখাচ্ছে বলো তো? ঠিক যেন যাত্রা-দলের বড় কেষ্টঠাকুর ; মাথায় চাঁচর চিকুর, মায় বাঁশিটা পর্য্যন্ত হুবহু—না?

—ডেকে নাম জিজ্ঞেস কর না?

কিছু পরেই আমরা অতিথিশালার ম্যানেজারের কাছে যুবকটির পরিচয় পেলুম। সে রাজার শ্যালক, এখানেই সামান্য কিছু কাজ করে রাজ-স্টেটে, বেশ আমুদে লোক—আর নাকি খুব ভালো নাচতে জানে!

আমরা যুবকটির সঙ্গে আলাপ করলুম। আমাদের খুব ভালো লাগলো লোকটিকে। লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু বেশ বুদ্ধিমান যে, তা কথাবার্ত্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

আমি বললুম—আপনার পৈতৃক দেশ কোথায়?

—রাজখার্সাওন—বি এন আর এ—তবে এখানেই আছি আজ দশ বছর।

—এই বনের মধ্যে বেশ ভালো লাগে আপনার?

—খুব শিকার মেলে কিনা! আপনারা থেকে যান, ভালুক শিকার করতে যাবো।

—ভালুক খুব আছে নাকি?

—এই যে বন দেখচেন, ভালুক আর সম্বর হরিণ এত আছে যে অনেক সময় দিনমানেও লছমীপুর গ্রামের মধ্যে ছটকে এসে পড়ে। আপনারা পায়ে হেঁটে যাবেন না বনের মধ্যে দিয়ে—বড় বিপজ্জনক। আমি ঘোড়া দিচ্চি দুজনকে, সঙ্গে শিকারী গাইড দেবো, তবে যাবেন।

আমরা বললুম, হেঁটে যখন যাবো ঠিক করেচি, তখন ঘোড়ায় চড়বো না, সেটা ঠিকও হবে না।

যুবকটি ভেবে বললে—তীর্থ করতে যাবেন বলে কি আর একটু ঘোড়ায় চড়তে নেই? বন কতখানি আপনারা জানেন না—বড় দেরি হয়ে যাবে বন পার হতে, যদি পায়ে হেঁটে যান।

—কত বড় বন আপনার মনে হয়?

—দশ-বারো মাইল খুব হবে, লছমীপুরের জঙ্গল দক্ষিণ ভাগলপুরের বিখ্যাত জঙ্গল। ঘোড়ায় যদি না যান, তবে একজন গাইড সঙ্গে নিয়ে যান।

যুবক উঠে চলে গেলে আমরা দুজনে পরামর্শ করে ঠিক করলুম সঙ্গে লোক নেওয়ারও কোনো দরকার নেই। ওতে আমাদের বাহাদুরি অনেকখানি কমে যাবে।

অতিথিশালার ম্যানেজার বললেন—আপনাদের খাবার-দাবার সব তৈরি। যদি বেরুতেই হয়—তবে আপনারা আর বেশি দেরি করবেন না—কারণ জঙ্গল পার হতে খুব সময় নেবে।

আহারাদির পর অম্বিকা বললে—একবার রাণীমার সঙ্গে দেখা না করে যাবো না হে। একবার আলাপ করে রাখি, পরে কাজ দেবে। তুমিও চল না—আলাপ করা যাক। দরকার অন্য কিছু নয়, উকিল মানুষ, এত বড় স্টেটের কর্ত্রীর সঙ্গে আলাপ রাখলে স্টেটের মামলা মোকদ্দমাগুলো পাবার দিক থেকে অনেক সুবিধে।

লছমীপুর গাড়োয়ালী স্টেট। বার্ষিক আয় খুব বেশি না হলেও নিতান্ত মন্দ নয়। অম্বিকা বলেছিল দু-লাখ টাকা ; অত যদিও না হয়, লাখখানেকের কম নয় নিশ্চয়ই। বন থেকেই এদের আয় বেশি। বনের খানিকটা অংশ লাক্ষা-ব্যবসায়ীদের ইজারা দেওয়া হয়, তা বাদে কাঠ ও সম্বর হরিণের শিং আর ছাল বিক্রী করেও যথেষ্ট আয় হয়।

আমরা কালীবাড়ী দেখতে গেলুম। একটি বৃদ্ধ বাঙালী ব্রাহ্মণ এখানকার

পূজারী, পুত্র পরিবার নিয়ে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর লছমীপুরে বাস করচেন। তাঁর বাড়ি ছিল নদীয়া জেলার মেহেরপুর সবডিভিসনে, এখনও তার জ্ঞাতিবর্গ সেখানেই আছে, পৈতৃক বাড়িও আছে, তবে সেখানে এঁদের যাতায়াত নেই বহুকাল থেকে।

আমরা বললুম—এখানে আর কোনো বাঙালী আছেন?

—পূর্ব্বে দুজন বাঙালী ছিলেন স্টেটের কাছারিতে, এখন আর নেই।

—আপনার কোনো অসুবিধা হয় না থাকতে?

—এখন আর হয় না, আগে আগে খুবই হত। কি করি বলুন, পেটের দায়ে সবই করতে হয়। এখানে বছরে চার-পাঁচশো টাকা পাই—বাড়িভাড়া লাগে না, কিছু জমি-জায়গীরও দেওয়া আছে স্টেট থেকে। মরে গেলে বড় ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়ে যাবো। ওকে সংস্কৃত পড়তে পাঠিয়েচি নবদ্বীপে, ওর মামার বাড়িতে। এক মস্ত অসুবিধে মেয়ের বিয়ে দেওয়া, এখান থেকে হয় না।

—সময় কাটান কি করে এখানে?

—নিজের কাজ করি, একটা টোল খুলেচি, ছাত্র পড়াই। পাঁচ-ছ-জন ছাত্র আছে – তার জন্য স্টেট থেকে বৃত্তি পাই।

অম্বিকার কাছে ইতিমধ্যে রাজবাড়ি থেকে খবর এল, রাণীমা এইবার পূজা সেরে উঠেচেন এখন দেখা হতে পারে।

অম্বিকা দেখা করতে গেল এবং আধঘণ্টার মধ্যেই বেশ হাসিমুখে ফিরে এল। বললে—রাণীমা বড় ভালো লোক, উনি আমাকে স্টেটের কাজ দিতে চেয়েচেন। খুব খাতির করেচেন আমায়।

—এইবার চলো বেরিয়ে পড়া যাক। বেলা দুটো বাজে, অত বড় বন পার হতে হবে তো।

—আমি জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়ে যাবার কথা বলছিলুম—

—নিশ্চয়ই তুমি বনের কথায় ভয় পেয়ে গিয়েচ...না?

—রাণীমা বলছিলেন বনে অনেক রকম বিপদ আছে। তবে তুমি না ছাড়ো, অগত্যা বনের পথেই যেতে হয়।

লছমীপুর ছেড়ে আমরা খানিকটা চড়াই পথে উঠেই একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লুম। জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, প্রধানত কেঁদ, শাল ও পিয়াল গাছ বেশি বনের গাছের মধ্যে। ঝোপ জিনিসটা বিহারে কোথাও দেখিনি এই জঙ্গল ছাড়া।

শরতের শেষ, অনেক রকম বনের ফুল ফুটে আছে, অধিকাংশই অজানা—বাংলা দেশের পরিচিত বনফুল একটাও চোখে পড়লো না কেবল শিউলি ফুল ছাড়া। দু-একটা ছাতিম গাছও দেখা গেল, তবে তাদের সংখ্যা নিতান্ত কম।

বনের মধ্যে পায়ে চলার একটা পথ কিছুদূর পর্য্যন্ত পাওয়া গেল। হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে পথটা তিনটা পথে ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাওয়াতে আমরা প্রমাদ গণলাম। সঙ্গে গাইড নেওয়া যে কেন উচিত ছিল, তখন খুব ভালো বুঝলাম। আমাদের চারিধারে শুধু গাছপালা আর বনঝোপ—শুধু বনস্পতির দল আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—আমাদের মাথার ওপর বনগাছের ফাঁকে ফাঁকে শরতের নীল আকাশ। কোনো লোকালয় নেই, একটা লোক নেই যে তাকে জিজ্ঞেস করি পথের কথা।

মনে একটা অদ্ভুত আনন্দ এল হঠাৎ কোথা থেকে।

ঘরে বসে সে আনন্দ কোনোদিন কখনো পাওয়া যায় না। অম্বিকাও দেখলুম পথের নেশায় মাতাল হয়ে উঠেচে। ও বললে—চলো চোখ বুজে যে পথে হয়, না হয়

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বনের মধ্যে ঘুরবো, রাত হয় গাছের ওপরে উঠে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

আন্দাজ করে একটা পথ বেছে নিয়ে তাই ধরে চললাম। ক্রমশ বন নিবিড়তর হয়ে উঠেচে, আমাদের মনে হচ্ছিল যে, যে কোনো মুহূর্ত্তে আমরা ভালুক কি বাঘের সামনে পড়তে পারি। এ বনে সে ব্যাপারটা এমন কিছু অসম্ভব নয়।

অম্বিকা বললে—এসো একটা রাত বনের মধ্যেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

আমারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল দুজনে সামনের দিকে এগিয়েই চলেচি, দুজনেরই ঝোঁক বন পার হয়ে ফাঁকা জায়গায় পড়বার দিকে। বনের মধ্যে কোনো গাছ নেই যার ফল খাওয়া যায়, একমাত্র আমলকি ছাড়া। সেকালের মুনিঋষিরা শোনা যায় বনের মধ্যে কুটির নির্ম্মাণ করে নাকি বনের ফল খেয়ে জীবন-ধারণ করতেন। কথাটার মধ্যে কতদূর সত্যতা আছে জানি না। আমি অনেক স্থানের বন ঘুরে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেচি, তাতে আমার মনে হয়েচে মানুষের খাদ্যোপযোগী ফলের গাছ পার্ব্বত্য অরণ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়—তাও আম, কলা, বেল, আনারস, লিচু প্রভৃতি ভালো জাতীয় ফল নয়—হয় আমলকি, কেঁদ প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ফল, বড়জোর বুনো রামকলা, বিচি বোঝাই ও মানুষের অখাদ্য। মানুষের খাদ্যোপযোগী বহুপ্রকার ফলবৃক্ষের একত্র সমাবেশ মানুষের হাতে তৈরী ফলের বাগান ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না।

আমি সিংভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যাঞ্চলে দেখেচি শুধু শাল, অর্জ্জুন, বন্য আমলকি, কেঁদ, পলাশ ও আসান গাছ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার গাছ মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ অরণ্যের মধ্যে কোথাও নেই—একমাত্র আমলকি ও কেঁদ ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোনো গাছে মানুষের খাওয়ার উপযুক্ত ফল ফলে না—হিমালয়ের ও আসামের আরণ্য প্রদেশেও খাদ্যোপযোগী ফলবৃক্ষ বেশি নেই। উড়িষ্যার কোনো কোনো বনে বন্য বিষবৃক্ষ দেখা যায় বটে—কিন্তু তার ফলের ভেতরটা আঠা ও বিচিতে ভর্ত্তি, স্বাদ কষা ও ঈষৎ তিক্ত, মানুষের পক্ষে অখাদ্য।

বিশেষ করে আমার বলবার বিষয় এই, সাঁওতাল পরগণা, দক্ষিণ বিহার, সিংভূম ও মধ্যপ্রদেশের অরণ্য প্রদেশ মানুষের প্রতি ভয়ানক নিষ্ঠুর—এখানে বিচিত্র বন্য পুষ্প নেই, খাওয়ার উপযুক্ত বিশেষ কোনো ফল নেই। মুনিঋষিরা আর যে কোনো বনেই বাস করুন, এই সব স্থানের বনে নিশ্চয়ই বাস করতেন না—করলে অনাহারে মারা পড়তেন। অন্য কোনো দেশের অরণ্যে প্রকৃতি মানুষের জন্যে ফলের বাগান সাজিয়ে যদি রেখেই থাকেন—তবে তার সন্ধান আমার জানা নেই।

ফলের কথা বাদ দিয়ে এবার বন্য ফুলের কথা বলি।

বন্য পুষ্পের বিচিত্র শোভার কথা শোনা যায় বটে, কিন্তু সব অঞ্চলের সব অরণ্যের বেলায় সে কথা খাটে না। সাধারণত ধরে নিতে হবে সুখাদ্য ফলের ন্যায় নয়নানন্দ-দায়ক পুষ্পের দর্শনও মানুষের তৈরী উদ্যানেই মেলে—প্রকৃতি-রচিত আরণ্য অঞ্চলে মানুষের সুখ-সুবিধার দিক থেকে দেখতে গেলে বড় কৃপণ।

অতএব যে কোনো বড় অরণ্যে ঢুকলেই যে বন-পুষ্পের শোভায় মন মুগ্ধ করবে এ যিনি ভাবেন, তিনি অরণ্য দেখে নিরাশ হবেন।

বনের ফুল ফোটে বিশেষ বিশেষ ঋতুতে, তাও দু-এক রকম মাত্র ফুল সেই সেই ঋতুতে দেখা যায়—নানা ধরনের ফুল একসঙ্গে কখনোই দেখা যায় না। সে দেখা যায় মানুষের হাতের ফুলের বাগানে। যিনি বহুবিধ রঙীন পুষ্পের বিচিত্র সমাবেশ দেখতে ভালোবাসেন, তাঁকে যেতে হবে আলিপুরের হর্টিকালচারাল সোসাইটির উদ্যানে ; অন্তত আমি এমন কোনো অরণ্য দেখিনি, যেখানকার বিচিত্র বন্যপুষ্পশোভা

তাঁকে অতটা আনন্দ দিতে পারবে।

বসন্তে দেখেচি সিংভূম ও উড়িষ্যার অরণ্যে গোলগোলি ফুলের বড় শোভা। কিন্তু সব বনে এ গাছ দেখা যায় না, কোনো বনে আছে, কোনো বনে আদৌ নেই। এই গাছ দেখতে ঠিক একটি পত্রহীন আমড়া গাছের মতো, কিন্তু কখনোই খুব বড় হয় না। বসন্তে পাতা ঝরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুল ফোটে, ফুলগুলির আকৃতি ও বর্ণ অনেকটা সূর্য্যমুখী ফুলের মতো। বনের সবুজ পাতার মধ্যে এখানে-ওখানে এক একটা শুভ্রকাণ্ড, নিষ্পত্র, আঁকাবাঁকা গোলগোলি গাছ হলদে ফুলে ভরা দাঁড়িয়ে আছে—এ দৃশ্য যিনি একবার দেখেচেন, তিনি কখনো ভুলবেন না।

এ ছবি আরও অপূর্ব্ব হয়, যদি কাছে বড় বড় অনাবৃত শিলাখণ্ড থাকে। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ হুকার তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিমালয় জার্নাল' নামক গ্রন্থে গোলগোলি ফুলের সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট সুখ্যাতি করেচেন—তাঁর বই-এ নিজের হাতে আঁকা ছবিও আছে এই ফুলের।

বসন্তে আরও দু-এক প্রকারের ফুল দেখেচি এই অঞ্চলের বনে, যেমন লোহা-জাঙ্গি ও ঝাঁটি ফুল। এদের ফুল হয় অনেকটা চামেলি ফুলের মতো—তবে গন্ধ-হীন। পলাশ সর্ব্বত্র নেই—যেখানে আছে, যেমন পালামৌ ও রাঁচি অঞ্চলের প্রান্তরে ও বনে, সেখানে রক্ত-পলাশের শোভা বড় অদ্ভুত হয়। কিন্তু প্রান্তর ছাড়া পার্ব্বত্য অরণ্যে পলাশ গাছের ভিড় বড় একটা থাকে না। শাল ফুলের সুগন্ধ আছে—কিন্তু দেখতে বিশেষ কিছু নয়। মহুয়া ফুলের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে।

কোনো কোনো বনে বর্ষা ঋতুতে কুরচি ফুল যথেষ্ট দেখা যায়—বিশেষ করে সিংভূম অঞ্চলে।

শিমুল ফুল বনের মধ্যে ফুটে গাছ আলো করে থাকলে যে কি শোভা হয়, যাঁরা বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের শৈলবনের স্টেশনঘেরা উভয়পার্শ্ববর্ত্তী আরণ্য অঞ্চলে বসন্তে ভ্রমণ করেচেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন। দুঃখের বিষয় সিংভূমের মাত্র এই স্থানটুকু ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা শিমুল গাছ বনে দেখা যায় না। সাধারণত শিমুল গাছের স্থান বনে নয়, মানুষের পল্লীর আশপাশের মাঠে। তাই বলছিলুম বন-প্রকৃতি মানুষের সুখ-সুবিধায় বড়ই উদাসীন।

মুচুকুন্দ কলকাতার রাস্তার দুধারে যথেষ্ট দেখা যায়, বাংলার পাড়াগাঁয়েও আছে, কিন্তু কোনো বনে কখনো এ গাছ দেখিনি।

বাকি রইল বন্য শেফালী ও সপ্তপর্ণ। বন্য শেফালী অজস্র দেখা যায় নাগপুর অঞ্চলে পার্ব্বত্য, অরণ্যে। সিংভূমেও আছে, তবে অত বেশি নয়। সপ্তপর্ণ দক্ষিণ বিহারের বনপ্রদেশে যথেষ্ট আছে—অন্য কোথাও একদম নেই। উড়িষ্যা ও সিংভূমের অরণ্যে সারাদিন খুঁজে বেড়ালেও একটা বন্য সপ্তপর্ণ চোখে পড়বে না—কিন্তু পড়বে যেখানে মানুষের বাসস্থান। কেবলমাত্র বাংলা দেশেই দেখা যায়. পল্লীগ্রামের আশেপাশের বনে অযত্নসম্ভূত বহু সপ্তপর্ণ বৃক্ষ হেমন্তের প্রারম্ভে মধুর পুষ্প-সুবাসে পথিকের মন আনন্দে ভরিয়ে দেয়।

রক্তকরবীর বন দেখেচি চন্দ্রনাথে, কিন্তু সে গেল বাংলা দেশের মধ্যে। খুব বাহারে ও রঙীন কোনো ফুল সাধারণত রুক্ষ পার্ব্বত্য অঞ্চলের অরণ্যে দেখাই যায় না, যদিও থাকলে খুব ভালো হত।

একসময়ে আমরা দূর থেকে কয়েকটি পাহাড়ের চূড়া দেখতে পেলুম। মেঘের মধ্যে নীলরঙের তিনটি চূড়া, কেঁদ আর শালবনের ফাঁকে অনেক দূরের আকাশের পটে যেন আঁকা রয়েচে। অম্বিকা ও আমি ঠিক করে নিলুম ঐ নিশ্চয়ই ত্রিকূট।

অম্বিকা বললে—ও পাহাড় কিন্তু অনেক দূরে।

—মেঘের মধ্যে বলে চোখে ধাঁধাঁ লেগে অমনি হচ্ছে। মেঘ সরে গেলে অত দূর বলে মনে হবে না।

বন একেবারে নিবিড়। শুকনো পাতার রাশি গাছতলায় এত জড়ো হয়েছে যে পায়ে দলে যাবার সময় একটা একটানা মচ মচ শব্দ বহুক্ষণ ধরে শুনেচি।

এদিকে বেলা বেশ পড়ে এসেচে, রোদ রাঙা হয়ে বড় বড় কেঁদ গাছের মগডালে লেগেচে। এ জঙ্গলটাতে আবার বন্য বাঁশ, খয়ের ও বহেড়া গাছ খুব বেশি। সন্ধ্যা তো হয়ে এল, যদি জঙ্গল শেষ না হয় তবে কি করা যাবে সে বিষয়ে আমরা আগে থেকে পরামর্শ করলুম।

অম্বিকা বললে, গাছে উঠে রাত কাটানো যাবে, সেই যে-কথা আগে বলেছিলুম।

—তা যদি উঠতে হয় তবে সন্ধ্যার আগেই আশ্রয় নিতে হবে সেখানে, অন্ধকার হলে এ বনে আর এক পা-ও চলা উচিত হবে না।

অম্বিকারও তাই মত। লছমীপুরের জঙ্গলে ভালুক ও বাঘ যথেষ্ট আছে, ভাগলপুরে থাকতে শুনে এসেচি। বন্দুক ও উপযুক্ত গাইড না নিয়ে বনের মধ্যে যাওয়াই উচিত নয়, একথা আমাদের সবাই বলেছিলেন—এমন কি রাণী-সাহেবা পর্য্যন্ত। আমরা কারো কথা না শুনে যখন এসেচি, তখন এর আনুষঙ্গিক বিপদের জন্যেও আমাদের তৈরী থাকতে হবে বৈকি।

সন্ধ্যা হবার আগে দেখা গেল পথটা উৎরাইয়ের দিকে নামচে। আমরা অনেক দূর নেমে এলুম ক্রমশ, একটা পাহাড়ী ঝরনা আমাদের পথের ওপর কুলুকুলু রবে চলেচে রাশি রাশি নুড়ির বাধা অগ্রাহ্য করে। ঝরনা পার হয়ে আবার একটা চড়াইয়ের পথ, খয়ের ও বহেড়ার জঙ্গলও পূর্ব্ববৎ নিবিড়। সম্বর হরিণ নাকি এই জঙ্গলে খুব বেশি, তারা মানুষ দেখলে তেড়ে এসে শিঙ দিয়ে গুঁতিয়ে মেরে ফেলে দেয়। এ পর্য্যন্ত দু-একটা খেঁকশিয়াল ছাড়া অন্য কোন জানোয়ারের টিকি দেখা যায়নি যদিও ; এবার কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল, এবার সাবধান হয়ে চলাই দরকার।

চড়াই-এর অঞ্চলে অনেকটা চলে এলুম। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ভালো ভাবেই নামলো, আমরা কি করবো ভাবচি এমন সময়ে একটা কি অদ্ভুত ধরনের শব্দ আমাদের কানে গেল দূর থেকে।

দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলুম। বাঘ বা ওই ধরনের কিছু ?

অল্পক্ষণ পরেই বনের নিবিড় অন্তরাল থেকে বার হয়ে এল একটা সাদা কাপড়ের ডুলি। দুজন ডুলি বইচে, পেছনে জন-তিনেক লোক, ওদের সকলের হাতেই লাঠি ও বর্শা।

আমরা ওদের দেখে যতখানি অবাক, ওরাও আমাদের দেখে তার চেয়ে কম অবাক নয়।

আমরা বললুম, কোথায় যাবে তোমরা ?

আমাদের প্যাণ্ট-কোট পরা, হ্যাট-মাথায় মূর্ত্তি দেখে ওরা বেশ ভয় খেয়ে গিয়েচে বোঝা গেল। বিনীতভাবে তারা বললে, তারা লছমীপুরে যাবে।

—ডুলির মধ্যে কি ?

—একটা মেয়ে আছে বাবুজী—

অম্বিকা উকিল মানুষ, সে এগিয়ে গিয়ে বেশ একটু মুরুব্বীয়ানার সুরে বললে, কোথাকার মেয়ে, কি বৃত্তান্ত, আমরা জানতে চাই। কোথা থেকে আনচো ?

একটি নিরীহ গোছের দেহাতী লোক এগিয়ে এসে আমাদের আভূমি নত হয়ে

সেলাম করে বললে, গরিব পরওয়ার, আমার আউরৎ আমার বাড়ি থেকে লছমীপুরে ওর বাপের বাড়ি যাচ্চে, আমি ওর স্বামী, নাম বিঠল ভকৎ হুজুর।

আমরা তো অবাক। বিঠল ভকৎ তার স্ত্রীকে নিয়ে এই প্রকাণ্ড বনের মধ্যে দিয়ে রাত্রিকালে শ্বশুরবাড়ি চলেচে!

আমরা বললুম, বন আর কতটা আছে?

বিঠল ভকৎ বললে, আর এক ক্রোশ, কিন্তু ডানদিক ঘেঁষে যান। বাঁদিকের পথে চললে এখনও দু-তিন ক্রোশ বন পাবেন।

—কোনো ভয়-ভীত্ আছে এ বনে?

—জানোয়ার আছে বৈকি। ভালুকের ভয় এই সময়টা খুব।

—তোমাদের খুব সাহস তো! এই রাত্রিকালে বনের মধ্যে দিয়ে বউ নিয়ে যাচ্চ!

—আমাদের এই জঙ্গলের দেশেই বাড়ি বাবুসাহেব, ভয় করলে চলে না। আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।

ওরা চলে গেল। আমাদের সাহস বিঠল ভকৎ অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে গেল সন্দেহ নেই। আমরা দুজনেই তখন এগিয়ে চলেচি ডানদিক ঘেঁষে। জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্নার আলোছায়ার জাল ক্রমশ খুব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। নিস্তব্ধ বিজন অরণ্যানী আমাদের চারিদিকে বিস্তৃত, নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে কতদূর এসে পড়েচি, কোথায় যেন চলেচি—এ কথা ভাবতে আমার এত আনন্দ হচ্ছিল, নৈশ পাখীর আওয়াজ—আর বনের মধ্যেও কোথাও বনশিউলি ফুটেচে, তার গন্ধ সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয়েচে। মাঝে মাঝে গন্ধটা খুব ঘন, এক এক জায়গায় বড় পাতলা হয়ে যায়, এক এক জায়গায় থাকেই না—কিন্তু একেবারে কখনোই যায় না।

বন ক্রমশ কমে আসচে বোঝা গেল। আর আধঘণ্টা জোর হাঁটবার পরে বন ছাড়িয়ে আমরা ফাঁকা মাঠের মধ্যে পড়লাম। কিন্তু কোনোদিকে একটা বস্তি নেই। মাঠে শুধু শাল আর মউল গাছ দূরে দূরে, জ্যোৎস্নার আলোতে এই দীর্ঘ অজানা প্রান্তর যেন আমাদের কাছে দক্ষিণ আমেরিকার পাম্পাস তৃণভূমি—আকাশের নেশা, পথহীন পথের নেশা, অজানার উদ্দেশে ক্লান্তিহীন যাত্রার নেশা!

অথচ কতটুকুই বা যাবো! আমরা উত্তরমেরু আবিষ্কার করতে যাইনি, যাচ্ছি তো ভাগলপুর থেকে দেওঘর, বড়জোর একশো পঁচিশ কি ত্রিশ মাইল। কিংবা হয়তো তারও কম!

আসল কথা, মনের আনন্দই মানুষের জীবনের অস্তিত্বের সব চেয়ে বড় মাপ-কাঠি। আমি দশ মাইল গিয়ে যে আনন্দ পেলুম, তুমি যদি হাজার মাইল গিয়ে সেই আনন্দ পেয়ে থাকো তবে তুমি-আমি দুজনেই সমান। দশ মাইলে আর হাজার মাইলে পার্থক্য নেই।

তবে ঘরকে একেবারে মন থেকে তাড়াতে হয়। ঘর মনে থাকলে পথ ধরা দেয় না। ঘর দুদিনের বন্ধন, পথ চিরকালের।

জয়পুর ডাক-বাংলোয় পেঁাছে গেলুম আরও প্রায় একঘণ্টা হেঁটে। এখানে চৌকিদারকে ডেকে বললুম—বাপু, রঘুনাথ পাটোয়ারী কোথায় থাকে, তার হাতে এই চিঠিখানা দিয়ে এসো তো।

চিঠিখানা লছমীপুরের দেওয়ান দিয়েছিলেন পাটোয়ারীর কাছে আমাদের সম্বন্ধে। চৌকিদার চলে যাওয়ার কিছু পরেই দেখি চার-পাঁচজন লাঠি-হাতে লোক সঙ্গে করে জনৈক পাগড়িবাঁধা, মেরজাইআঁটা বৃদ্ধ এদিকেই আসচে। কাছে এসে লোকটি একটা লম্বা সেলাম দিয়ে সামনে দাঁড়ালো, তারই নাম রঘুনাথ.—বাবুরা

স্বচ্ছন্দে থাকুন ডাকবাংলোয়, সে এখুনি খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছে। বিশেষ করে ডাকবাংলোতে রাত্রে পাহারার জন্য লোক এনেচে সঙ্গে।

—পাহারার লোক কেন?

—বাবুসাহেব, এই ডাকবাংলো জঙ্গলের ধারে মাঠের মধ্যে। লোকজন নেই কাছে—এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়। এক মারোয়াড়ী শেঠ এখানে ছিল সে-বছর, তাকে মেরে-ধরে টাকাকড়ি নিয়ে যায়। জায়গা ভালো না।

—আমাদের সে ভয় নেই পাটোয়ারীজী—সঙ্গে কিছু নেই যে নেবে। তবে লোক থাকে রেখে দাও। আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা ক'রো না—কেবল একটু চা যদি হত—

সব বন্দোবস্ত করে দিচ্চি এখুনি। আপনারা স্টেটের অতিথি—খাবেন না তা কি কখনো হয়! দেওয়ানজী লিখেচেন আপনাদের আদর-যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আর টাকাকড়ির কথা বলচেন, এ জংলী দেশে চার আনা পয়সার জন্যে অনেক সময় মানুষ খুন হয়। পাহারা রাখতেই হবে।

রাত্রে পুরী ও হালুয়ার ব্যবস্থা করে দিলে রঘুনাথ পাটোয়ারী। একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম, এমন চমৎকার ভঁয়সা ঘি আর কখনো দেখিনি কোথাও—লছমীপুর আর এই জয়পুর ডাকবাংলো ছাড়া। কলকাতার বাজারে আমরা যে জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে কিনে থাকি, তা আর যাই হোক, খাঁটি ভঁয়সা ঘি যে নয়, তা বেশ ভালো ভাবেই বুঝলাম। এই রকম ঘি আর দেখেছিলুম বৈকুণ্ঠ পাঁড়ের বাড়িতে। পাটোয়ারীজীকে ডেকে বললুম—পুরী কি ঘিয়ে ভাজা?

—কেন বাবুসাহেব, ভঁয়সা ঘিয়ে।

—একটু নিয়ে এসে দেখাতে পারো?

একটা বাটিতে খানিকটা ঘি ওরা আমাদের কাছে নিয়ে এল—তার রং কলকাতার বাজারের ঘিয়ের মতো সাদা নয়—কটা, মাছের ডিমের মতো দানাদার। সুগন্ধে ঠিক গাওয়াঘির মতো—বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই।

পাটোয়ারী বললে—বাবুসাহেব, দেহাত থেকে মারোয়াড়ীরা এই ঘি নিয়ে গিয়ে পাইল করে; মানে চর্বি আর অন্য বাজে তেলের সঙ্গে কিংবা খারাপ ঘিয়ের সঙ্গে মেশায়—তারপর টিন-বন্দী করে বাজারে ছাড়ে। শহর-বাজারে সেই জিনিস ভঁয়সা ঘি বলে চলে। খাঁটি ভঁয়সা ঘি কোথা থেকে আপনারা বাজারে পাবেন?

রাত্রে সুনিদ্রা হল, শরীর দুজনেরই ছিল খুব ক্লান্ত। একবার মাঝরাত্রে উঠে বাংলোর বাইরে এসে চেয়ে দেখলুম—দূরে লছমীপুরের জঙ্গলের সীমারেখা আলো-আঁধারে অদ্ভুত দেখাচ্চে। আকাশে বৃহস্পতি ও শনি এক সরলরেখায় অবস্থিত; জ্বলজ্বল করচে বৃহস্পতি, তার নীচে কিছু দূরেই শনি মিটমিট করচে। বিশাল মাঠের সর্বত্র বড় বড় শাল ও মহুয়া ছড়িয়ে আছে দূরে দূরে। অল্পদূরেই ত্রিকূটের দুটি শৃঙ্গ আধো-অন্ধকারে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কি একটা রাতজাগা পাখী প্রান্তরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মাঝে মাঝে কুস্বরে ডাকচে। ডাকবাংলোর বারান্দায় রঘুনাথ পাটোয়ারীর দরওয়ান তিনটি নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্চে। বনপ্রান্তরে যেন কি একটা অব্যক্ত রহস্য থম্ থম্ করচে—যা মনেই শুধু অনুভব করা যায়—কিন্তু মুখে কখনো প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

দুপুর পর্য্যন্ত হেঁটে মহিষারডি বলে একটি গ্রামে এক আহীর গোয়ালার বাড়ি একটু জল চাইলুম।

গ্রামখানি ছোট—প্রায় সবই গোয়ালা অধিবাসী গ্রামে। বাড়ির মালিক বললে—কোথা থেকে আসচেন আপনারা?

—ভাগলপুর থেকে।

—কিসে?

—পায়ে হেঁটে, বৈদ্যনাথজী যাচ্চি।

কথাটা শুনে শ্রদ্ধায় লোকটা অভিভূত হয়ে পড়লো। আমাদের বিশেষ অনুরোধ করলে আমরা যেন সে-বেলা তার আতিথ্য স্বীকার করি। খাওয়া-দাওয়া সেরে ওবেলা রওনা হলে রাত আটটার মধ্যে আমরা ত্রিকূটের পাদদেশে মোহনপুর ডাকবাংলোয় পেঁছে সেখানে রাত কাটাতে পারি।

আমাদের রাজী না হয়ে উপায় ছিল না। অত রৌদ্রে ক্লান্ত শরীর নিয়ে পথ হাঁটা চলবে না এবেলা।

লোকটির নাম হরবংশ গোপ।

সে বাড়ির সবাইকে ডেকে এনে আমাদের দেখিয়ে বললে—দেখ, কলিকালে ধর্ম্ম নেই কে বলে? বাবুজীরা ভাগলপুর থেকে পাঁওদলে আসচেন বৈদ্যনাথজীর মাথায় জল চড়াতে। অথচ বাবুবা ইংরিজি বিদ্যের জাহাজ—মস্ত বড় এলেমদার লোক। দেখে শেখ্।

আমরা দুজনেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়লুম—এ প্রশংসা আমাদের প্রাপ্য নয়। তীর্থ করতে আমরা যাচ্ছি নে এই সওয়া-শো মাইল হেঁটে—এই সরল পল্লীবাসীরা সে কথা বুঝবে না। পুণ্যের আকর্ষণ ভিন্ন আর কিসের আকর্ষণে আমাদের এতখানি পথ টেনে এনেচে, তা এদের বোঝাতে গেলে আমাদের উন্মাদ ঠাওরাবে। অতএব ভক্ত তীর্থযাত্রী সেজে থাকায় জটিলতা নেই ভেবে আমরাও ওদের কথার প্রতিবাদ করে ওদের ভুল ভাঙাবার আগ্রহ দেখলাম না।

ওরা তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে আমরা কি খাবো।

আমরা বললুম—যা হয় খেতে পারি। তার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। আমাদের খাওয়া না হলেও চলবে।

হরবংশ গোপ সে কথা শুনলে না। চাল ডাল বার করে দিলে—আমরা রেঁধে খাবো। ওইখানে পড়ে গেলুম মুশকিলে। পথে বার হয়ে পর্য্যন্ত রান্না করে খেতে হয়নি একদিনও। আমরা ওজর-আপত্তি করলুম—ওরা ব্রাহ্মণকে রেঁধে খাইয়ে জাত মারতে রাজী নয়।

মহিষারডি গ্রামখানার অবস্থান বড় চমৎকার। বামে কিছুদূরে ত্রিকূট শৈল; ডাইনে খানিকটা নাবাল জমি, তাতে শুধু বড় বড় পাথর ছড়ানো আর চারা শালের বন—দূরে একটা বড় বনের শীর্ষদেশ দেখা যায়—খুব ফাঁকা জায়গাটা।

তা ছাড়া অনেক আকর্ষণ আছে। এ ধরনের সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যে ঐশ্বর্যবান গ্রাম রেল স্টেশনের কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সেখানে কলকাতার লোকে বাড়ি না করে ছাড়তো না। গ্রামের যেদিকটা নাবাল জমি, তার বড় ঢালুতে চারা শালের বনে খুব বড় তিন-চারখানা শিলাখণ্ড ঠিক যেন হাতীর মতো উঁচু ও বড়। অন্তত দুখানা এমন শিলার ওপরে দুটি অর্জ্জুন গাছের চারা ঠিক একেবারে পাথর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ও দুটোতে যথেষ্ট ছায়াদান করচে। বেশ ওঠা যায় পাথরে—সকালে বিকালে, রাত্রে ত্রিকূট শৈল ও পেছনদিকের মুক্ত প্রান্তরের দিকে চোখ রেখে অনেকক্ষণ বসে আপন-মনে কাটানো যায়, বই পড়া যায়—বড় সুন্দর নিভৃত শিলাসন। আশেপাশে নিকটে দূরে অনেকগুলো পলাশবৃক্ষ।

রাঙা সিঁদুরের মতো মাটি, কাঁকরের ডাঙা, ছবির মতো একটি ঝরনা ত্রিকূট থেকে বেরিয়ে গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে চলেচে সেই নাবাল জমিটার পশ্চিমপ্রান্ত ঘেঁষে।

ছবিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্যেই যেন গ্রামের মধ্যে কয়েকঝাড় কাঁটা-বাঁশ রাঙামাটির ডাঙার ওপর সাজানো।

অম্বিকাকে বললুম—চেয়ে দেখ গ্রামখানার রূপ। এখানটা বাস করার উপযুক্ত স্থান। আমার যদি কখনো সুবিধে হয়, ঠিক এই মহিষারডি গ্রামে এসে বাস করবো।

অম্বিকাও বললে—সত্যি, এটা একটা বিউটি-স্পট। যদি এত দূর আর এমন বেখাপ্পা জায়গায় না হত—আমিও এখানে বাস করতুম।

আমি ভেবে দেখলুম, রেল থেকে এই দূরত্বই (অন্তত বত্রিশ মাইল) ওকে আরও সৌন্দর্য্য দান করেচে। রেলস্টেশনের কাছে হলে এ গ্রাম যেন সাধারণের উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়তো—এ এখন রূপসী, সরলা বন্যবালা--শুভ্র ও অপাপবিদ্ধ। এই দিশাহীন রাঙামাটির মুক্ত প্রান্তর, অদূরে ওই শৈলচূড়া, হাতীর মতো বড় বড় পাথরের আসনগুলো —নাবাল জমিটার ঝরনাটার সৌন্দর্য্য এ গ্রামকে অদ্ভুত শ্রী দান করেচে—অথচ এখানে কলকাতার কোনো লোক এখনও বাড়ি করেনি—কোনোদিন করবেও না—এ গ্রাম এমনি জনবিরল, নিস্তব্ধ ও শান্ত বনপ্রান্তরের মধ্যে চিরদিন নিজের সৌন্দর্য্য অটুট রেখে চলবে—একথা ভেবেও মনে আনন্দ পেলুম।

এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা গুপ্ত-বাসনা অবিশ্যিই থাকে—যদি কখনো সুবিধে হয় তবে এখানে বাড়ি করবো।

—জমির এখানে কি দাম হরবংশ?

—জমির দাম? কি করবেন বাবুসাহেব?

—ধরো যদি বাস করি?

হরবংশ আনন্দে উৎফুল্ল হবে বললে—বাস করুন না, জমি কিনতে হবে না বাবুজি। ওই মোড়ের ধারে ভালো জমি আমার নিজের আছে—আপনাকে দিচ্চি। আসুন না! যেখানে আপনাদের পছন্দ হবে গাঁয়ের মধ্যে জমি নিন। পনেরো-কুড়ি টাকা বিঘে দরে জমি বিক্রী হয়। ওই রাঙা মাটির বড় ডাঙাটা নিন না! বাসের পক্ষে চমৎকার জায়গা। ওটা বাইশ বিঘের ডাঙা—আমি গ্রামের প্রধানকে বলে সস্তায় করে দেবো। দশ টাকা বিঘে দরে ডাঙাটা আমি আপনাকে করে দিতে পারি। পড়েই তো রয়েচে আমার জন্ম থেকে। দশ টাকা বিঘে পেলে বর্ত্তে যাবে।

মহিষারডি থেকে পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লুম।

যাবার সময় বার বার মনে করলুম, যদি কখনো সুবিধে হয়, আর একবার এই সুন্দর গ্রামখানিতে ফিরে আসবো। অবিশ্যি এখনও পর্য্যন্ত সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়নি--কিন্তু মাঝে মাঝে প্রায়ই মনে হয় গ্রামখানির কথা। গত বৎসর বড়-দিনের পরে কার্য্যোপলক্ষে একবার দেওঘর যেতে হয়েছিল, কতবার ভেবেছিলুম লছমীপুরের পথে গিয়ে একবার মহিষারডি গ্রামে হরবংশ গোপের সঙ্গে দেখা করে আসি, আবার ওদের রাঙামাটির সেই হাতীর মতো বড় পাথরখানার ওপর বসে আসি।

কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছা সব সময় পূর্ণ হয় কই!

মোহনপুর ডাকবাংলোয় আমরা পেঁছে গেলাম বেলা দশটার মধ্যে। এই স্থানটিও খুব সুন্দর—ত্রিকূট-শৈলের পাদদেশে ডাকবাংলোটি অবস্থিত, দেওঘর থেকে বাউসি দিয়ে যে রাস্তা গেছে, তারই ধারে।

আমরা সেখানে বেশিক্ষণ ছিলাম না। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম করে বেলা দুটোর সময়

সেখান থেকে রওনা হবো ঠিক করেচি, কিন্তু অম্বিকা বললে—এতদূর এসে একবার ত্রিকূট পাহাড়ে ওঠা দরকার। পাহাড়ে না উঠে যাবো না।

দুজনে পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করলুম।

প্রথম অনেকদূর পর্য্যন্ত কাঁটা-বাঁশের বন। পাহাড়ে উঠবার পথ বেশ ভালো, বড় বড় পাথরের পাশ বেয়ে ঝরনার জল গড়িয়ে আসচে—কিছুদূর উঠে জন-দুই সাধুর সঙ্গে দেখা হল।

একজন বললেন—বাবুজিরা কোত্থেকে আসচেন?

—ভাগলপুর থেকে, পায়ে হেঁটে দেওঘর যাবো।

—আপনাদের ধর্ম্মে মতি আছে; একালে এমন দেখা যায় না।

সাধু বাবাজিদের কাছে মিথ্যে ভক্ত সেজে কি করব, আমরা খুলেই বললুম সব কথা। আমাদের আসল উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে দেওঘর আসা, বৈদ্যনাথজীর দর্শন নয়, যদিও মন্দিরে নিশ্চয়ই যাবো এবং দেবদর্শনও করবো।

ওঁরা আমাদের ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দিলেন, হালুয়া ও দুটি কলা।

আমরা কিছু প্রণামী দিয়ে সেখান থেকে নেমে এলুম।

বেলা পড়ে এল পথেই—দেওঘর পেঁছুতে প্রায় রাত আটটা বাজলো।

১৯৩২ সালে আমার একটি বন্ধু মধ্যপ্রদেশের রেওয়া স্টেটের দারকেশা বলে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য গ্রাম থেকে আমায় চিঠি লিখলেন, সেখানে একবার যাবার অনুরোধ করে। তাঁর চিঠিতে স্থানটির অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথা পড়ে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। মধ্যপ্রদেশের ঘন বন ও পাহাড়ের মধ্যে গ্রামখানি অবস্থিত। তিনি সেখানে কণ্ট্রাক্টরের কাজ করেন, ইদানীং কাঠের ব্যবসাও আরম্ভ করেছিলেন, দু-তিনটি ভালো ঘোড়াও কিনেচেন অনেক কুলি ও লোকজন তাঁর হাতে, বনে বেড়াতে ইচ্ছে করলে তিনি সেদিকে যথেষ্ট সুবিধে করে দেবেন লিখেচেন।

আমি কখনও মধ্যপ্রদেশে যাইনি তার আগে, বেঙ্গল নাগপুর রেলের গাড়ি চড়ে এমন কি কোনোদিন রামরাজাতলাতেও যাইনি। তিনি লিখলেন, বিলাসপুর থেকে যে লাইন কাটনি গিয়েচে, তারই ধারে কার্গিরোড বলে একটি ছোট স্টেশন আছে, সেখান থেকে বত্রিশ মাইল ঘোড়ায় চেপে যেতে হবে তাঁর ওখানে পেঁছুতে। তিনি স্টেশনে ঘোড়া ও লোক রেখে দেবেন আমার চিঠি পেলে।

আমার সেই বন্ধুটির ছোট ভাই কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তার সঙ্গে গিয়ে একদিন দেখা করলাম। সে-ও আমায় খুব উৎসাহ দিলে। সে ছুটিতে একবার সেখানে গিয়েছিল, চমৎকার জায়গা, গ্রামের ধারেই বিশাল বনভূমি, হরিণের দল চরে বেড়ায়, ময়ূর তো যথেষ্ট, গ্রামের গাছপালার ডালে বনময়ূর এসে বসে—ইত্যাদি।

আমি বললুম—কোন্ সময় যাওয়া ভালো? এখন তো বর্ষাকাল।

—পুজোর সময় রাস্তাঘাট ভালো হয়ে যায়, পাহাড়ী ঝরনার জল শুকিয়ে যায় —সেই সময়েই যান।

ঠিক হল সে-ও পুজোর ছুটিতে আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু মাস-দুই পরে যখন পুজোর অবকাশ এসে পড়লো সে বললে, তাকে একবার তাদের গ্রামে যেতে হবে, এখন যেতে পারবে না।

আমি তাকে বললুম—তোমার দাদাকে চিঠি লিখে দাও আমি ষষ্ঠীর দিন কলকাতা থেকে রওনা হবো, তিনি যেন সব বন্দোবস্ত রাখেন।

সে বললে—ঘোড়া চড়তে পারেন তো? বত্রিশ মাইল ঘোড়ার ওপর যেতে হবে।

রাস্তাও খুব ভালো না। উঁচুনীচু পাহাড়-জঙ্গলের রাস্তা।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম, ঘোড়ায় চড়া আমার যথেষ্ট অভ্যাস আছে। ওর চেয়ে বেশি পথও আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েচি। দিন ঠিক করে দুজনেই পত্র দিলাম তার দাদার কাছে।

নির্দ্দিষ্ট দিনে জিনিসপত্র নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বম্বে মেলে রওনা হলাম। সেবার সারা বর্ষাকাল ধরে খুব বৃষ্টি হয়ে দিন পনেরো-কুড়ি আকাশ বেশ নির্ম্মল হয়ে রৌদ্র ফুটেছিল। যাবার সময় দেখলুম রেলের দুধারে যথেষ্ট ধান হয়েছে, ফসল খুব ভালো হবে। বৈকালের ছায়ায় বহুদূরবিস্তৃত শ্যামল ধানক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কোলাঘাটে পৌঁছে গেলুম। রূপনারায়ণের পুল যখন পার হই তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেচে। বম্বে মেল ঝড়ের বেগে ছুটে চলে গিধনি, ঘাটশিলা, গালুডি পার হয়ে গেল।

রাত হয়েচে বেশ।—আমার মুশকিল হয়েচে খড়্গপুর জংশনে খাবার কিনিনি, ভেবেছিলুম তখনও তত রাত হয়নি—আগের কোনো স্টেশনে কিনবো এখন। বি এন আর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল না—এ লাইনে যে ভালো খাবার পাওয়া যায় না, তখন তা জানতুম না। অপকৃষ্ট ঘি-এ ভাজা পুরী ও কুশ্রী তরকারি দেখে খাবার প্রবৃত্তি কমে গেল।

টাটানগরে গাড়ি প্রায় আসে-আসে, এক সহযাত্রী ভদ্রলোক পাশ থেকে আমায় বললেন—মশাই, যদি কিছু মনে না করেন—আমার বাড়ির খাবার সঙ্গে আছে, আপনাকে কিছু দিতে পারি?

তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আমার দু-চারটি কথাবার্ত্তা হয়েচে। ভদ্রলোক ডাক্তার, রায়পুর যাচ্ছেন তাঁর কোন্ এক আত্মীয়ের বাড়ি—এইটুকু মাত্র তাঁর পরিচয় তিনিই দিয়েছিলেন কথাবার্ত্তার মধ্যে। ভদ্রলোক দেখি খাবার বার করে দুভাগে ভাগ করচেন।

আমি বিনীত ভাবে তাঁকে বললুম, আমার ক্ষিদে নেই, কিছু খাবো না। শরীর ভালো নয়।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—কেন, কি হয়েছে আপনার?

—না, বিশেষ কিছু হয়নি। খাবার ইচ্ছে নেই।

লোকটি অদ্ভুত ধরনের। কতকালের পরিচিতের মতো তিনি আমার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন—বাঃ, খাবেন না বললেই হল? এত খাবার দিয়েচে বাড়ি থেকে, আমি কি একলা খাবো, না খেতে পারি? আপনি তো কিছুই খাননি, সারারাত কাটাবেন কি করে? আর এ লাইনে ভালো খাবার পাবেন না যে কিনে খাবেন এরপর খিদে পেলে। ওকথা শুনবো না—খান, খান, আসুন—বলেই তিনি আমার সামনে খাবারের এক ভাগ এগিয়ে দিলেন।

আমি এমন ধরনের মানুষ কখনো দেখিনি, মানুষকে এত অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মীয় ও অন্তরঙ্গদের মতো ভাবতে পারে যে লোক, তার অনুরোধ উপেক্ষা করা বড় সহজ কথা নয়।

অগত্যা খেতে হল।

ভদ্রলোক নিজে খান, আমার পাত্রের দিকে চেয়ে বলেন—বেশ তরকারিটা, না? আমার মা, বুঝলেন না?

আমি সম্ভ্রমের ভাব মুখে এনে বলি—ও!

—বাহাত্তরের ওপর বয়স।

—বলেন কি?

—নিশ্চয়ই। বাহাত্তরের ওপর বয়স।

এর উত্তরে কি বলা উচিত ঠিক বুঝতে পারিনে। খুব খানিকটা বিস্ময় ও সম্ভ্রমের ভাব মুখের ওপরে এনে ফেলার চেষ্টা করি—যদিও একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার বয়স বাহাত্তর হওয়ার মধ্যে এমন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছুই নেই।

ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে সগর্ব্বে বললেন—মা এখনও সংসারের যাবতীয় রান্না সব নিজের হাতে করে থাকেন। এই যা খাচ্চেন, সব তাঁর নিজের হাতে।

আমি এবার আর নিরুত্তর রইলুম না, উত্তর দেওয়ার পথ খুঁজে পেয়েচি। বললুম—তাই বলুন। এ রকম রান্না কি কখনো একালের মেয়ের হাতে—খেয়েই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এমন রান্না তো অনেকদিন খাইনি—এ না জানি কার হাতের!

ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে আমার দিকে চেয়ে বললেন—পারবে কেউ আজকালের মেয়ে? বলুন!

—আরে রামোঃ! একালের মেয়ে—হেঁ—

আমি অবজ্ঞাসূচক হাসি টেনে আনি মুখে।

মনের গোপন তলায় একটা প্রশ্ন বার বার উঁকি মারছিল—ভদ্রলোক অবিবাহিত না বিপত্নীক? কিংবা স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, এমন নয় তো?

—আর দুখানা পুরী নিন—না না, লজ্জা করবেন না মশাই, লজ্জা করলে ঠকবেন রাত্রে। সেই বিলাসপুরে ভোর, তার আগে কিছু মিলবে না ভালো খাবার—

খাওয়া-দাওয়া শেষ হল দুজনেরই। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব মাতৃভক্ত, তাঁর মাতৃদেবীর গুণকীর্ত্তন শুনতে হল অনেকক্ষণ বসে। শোবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও শয্যা আশ্রয় করতে পারলুম না।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আমার ঠিক মনে নেই, একটা কি স্টেশনে দেখি ভদ্রলোক আমায় ঝাঁকুনি দিয়ে বলচেন—ও মশায়, উঠুন—একটু চা খান—খুব ভালো চা এই স্টেশনের—এই ধরুন কাপটা—

উঁকি মেরে জানলা দিয়ে দেখি স্টেশনের নাম ঝর্সুগুড়া।

বললুম, রাত কত মশাই?

—তিনটে পঁচিশ—

ট্রেন ছাড়লে চেয়ে দেখি রেলের দুধারে শেষরাত্রের অন্ধকারে কেবল বন আর বন। মধ্যপ্রদেশে এসে পড়া গেল নাকি? আরও অনেক স্টেশন চলে গেল। বন আর পাহাড়, পাহাড় আর বন, শেষরাত্রের ঘন অন্ধকারে কেমন অপরূপ মনে হচ্ছে।

কখনো ও লাইনে আসিনি—বনের এমন শোভা যে এ লাইনে আছে তা আমার জানা ছিল না। সেদিক থেকে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ একটি বিশেষ লাইন, যা কিনা চক্ষুষ্মান্ ও প্রকৃতি রসিক যাত্রীর সামনে আদিম ভারতের ছবি ধীরে ধীরে খুলে ধরবে, তার নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলশ্রেণী, কোল, মুণ্ডা, ওঁরাওদের বস্তির সারি, স্থানের অনার্য্য নাম ইত্যাদি মনে করিয়ে দেয় প্রাক্-আর্য্য যুগের ভারতবর্ষের কথা।

জানালা খুলে অন্ধকারে বনশ্রেণীর দিকে চেয়ে বসে রইলুম। ঘুম আমার চোখ থেকে চলে গেল। পয়সা খরচ করে দেশ বেড়াতে এসেচি, ঘুমোবার জন্যে নয়। আমার সহযাত্রী কিছুক্ষণ বসেছিলেন, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন। ট্রেনের কামরার মধ্যে কোনো শব্দ নেই, সবাই ঘুমুচ্চে, আমার নীরব উপভোগের বাধা জন্মায় এমন কোনো বিবাদী সুর কানে আসে না, মনে হল বহুকাল ধরে চেয়ে থাকলেও চোখ আমার কখনো শ্রান্ত হয়ে উঠবে না, মন তার আনন্দকে হারাবে না।

রাতের অন্ধকারে সে বিশাল বনভূমির দৃশ্য যে না দেখেচে, সে পৃথিবীকে

অত্যন্ত মহিমময় একটি রূপে আদৌ প্রত্যক্ষ করেনি, তার শিক্ষা এখানো সম্পূর্ণ হয়নি। বিশালের অনুভূতি মনে জাগায় এমন যে কোনো দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বক্তৃতার চেয়েও অনেক মূল্যবান জিনিস শিক্ষার দিক থেকে। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ এখনও এ বিষয়ে উদাসীন, নতুবা ছুটিতে ছেলেদের নিয়ে দেশ বেড়াবার ব্যবস্থা করতো, পয়সা খরচ করে যদি নাও হয়, পায়ে হেঁটে যতদূর হয় তাও তো করা যেতে পারে।

আমার এই দৃঢ় ধারণা, যে দেশভ্রমণ করেনি, প্রকৃতিকে বিভিন্নরূপে দেখেনি, কোথাও বা মোহন, কোথাও বিরাট, বা কোথাও রুক্ষ ও বর্ব্বর—তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে অনেক বাকি।

আমার সহযাত্রী এই সময় ঘুম থেকে উঠে আমায় বললেন—কোন্ স্টেশন গেল?

আমি স্টেশনের নাম পড়িনি, তা জানালুম। তিনি উঠে বসলেন। বাইরের অরণ্যের চেহারা দেখে বললেন—ও, এবার বিলাসপুরের কাছাকাছি এসে পড়েচি, এ সব সম্বলপুরের ফরেস্ট।

—তাই নাকি! আমি জানতুম না। চমৎকার দেখাচ্ছিল।

—ঘুমোননি বুঝি? বসে বসে দেখছিলেন নাকি?

—না, এই ঝার্সুগুড়া থেকে একটু অমনি—

—আপনি নতুন আসচেন, আমি বহুবার দেখেচি এ সব। সেই টানেই তো আসি।

—আপনারও খুব ভালো লাগে এসব—না?

—খুব। কালাহাণ্ডি ফরেস্টের নাম শুনেচেন? আমার বন্ধুর সঙ্গে সেখানে শিকারে গিয়েচি—বড় ইচ্ছে করে আবার যেতে।

লোকটিকে এতক্ষণ ভালো চিনতে পারিনি। সম্ভ্রমে আমার মন পূর্ণ হয়ে গেল। পিপাসা থাকলেই হল—না দেখলেও ক্ষতি নেই। পিপাসা আত্মার জিনিস—দেখাটা বহিরিন্দ্রিয়ের। মনের বেদীতে হোমের আগুন না নিবে যায়। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের মতো সে আগুন অতি যত্নে যে রক্ষা করে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত চলতে পারে, সে মৃত্যুকেও জয় করবে কারণ তার চোখ ও মন তৈরী হয়ে গিয়েচে। তার আত্মার স্পর্শ লেগেচে বিরাটের, অনন্তের।

আমার সহযাত্রী সোৎসাহে কালাহাণ্ডি ফরেস্টে শিকারের কাহিনী বলে যেতে লাগলেন। শুনতে শুনতে আমার কখন নিদ্রাবেশ হয়েচে জানিনে—হঠাৎ কতক্ষণ পরে যেন আমার কানে গেল কে বলচে—উঠুন, উঠুন, বিলাসপুর আসচে—জিনিস গুছিয়ে নিন—ও মশাই—

তন্দ্রা ভেঙে গেল। ট্রেনের বেগ কমিয়েচে, বন পাহাড় অদৃশ্য, অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়ে বেশ দিনের আলো ফুটেচে। দূরে স্টেশনের ডিস্ট্যান্ট সিগন্যাল দেখা গেল। আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম, কারণ আমায় বিলাসপুরেই নামতে হবে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখি ভয়ানক মেঘ করেচে, মন বড় দমে গেল মেঘ দেখে। আবার যদি বৃষ্টি শুরু হয় তবে এবারকারের বেড়ানোটা মাটি করে দেবে।

হলও তাই।

বিলাসপুর রেলওয়ে রেস্তোরাঁতে বসে চা খাচ্চি—এমন সময় ভীষণ বৃষ্টি নামলো। সে বৃষ্টি থামবার কোনো লক্ষণ দেখলুম না ঘণ্টাখানেকের মধ্যেও, অগত্যা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই গিয়ে কাট্‌নি লাইনের ট্রেনে চড়লুম।

আধঘণ্টা পরে ট্রেন ছেড়ে দিলে।

দু'ধারে শালের বন আর অনুচ্চ পাহাড়। রেলের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি শ্রাবণ মাসের বর্ষাদিনের মতো নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন চেহারাখানা আকাশের -মেঘের জোড় মিলিয়ে দিয়েচে—দুই মেঘের মধ্যে একচুল ফাঁক নেই আকাশের কুত্রাপি।

প্রমাদ গনলাম মনে মনে।

সূর্য্যের আলো না দেখতে পেলে মন আমার কেমন যেন মিইয়ে মুষড়ে পড়ে। বর্ষাকালে বর্ষা ভালো লাগে না এমন কথা বলচিনে—কিন্তু পয়সা খরচ করে এতদূর বেড়াতে এসে যদি এমন অকালবর্ষা নামে, তবে মন খারাপ হওয়া খুব বেশি অস্বাভাবিক নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

কয়েকটি মাত্র স্টেশন পেরিয়ে এসেই কার্গিরোড—ছোট স্টেশনটা, চারিদিক পাহাড় ও বনে ঘেরা।

একরকম ভিজতে-ভিজতেই নামলুম গাড়ি থেকে। জনপ্রাণী নেই কেউ কোনো-দিকে, কোথায় বা বন্ধুর লোক, কোনোদিকে একটা ঘোড়ার টিকিও দেখলুম না। জিনিসপত্র নিয়ে স্টেশনের টিকিটঘরের সামনে একটা বেঞ্চির ওপর বসে রইলুম।

হয়তো এমন হতে পারে, বন্ধুর প্রেরিত লোকটা ঘোড়া নিয়ে আসতে আসতে এই ভীষণ বৃষ্টিতে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে—তাই সম্ভব। সেক্ষেত্রে বৃষ্টিটা থামলেই সে এসে পড়বে।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চললো মুষলধারে, ঘণ্টা দুই কাটলো—বেলা এগারোটা। কাছের একটা পার্ব্বত্য ঝরনা ফুলে ফেঁপে উঠেচে—নালা দিয়ে তোড়ে জল চলেচে—পাহাড় থেকে জলের তোড় নেমে রাস্তার অনেকখানি ডুবিয়ে দিয়েচে।

বেলা এগারোটার পর বৃষ্টি একটু কম জোরে পড়তে লাগলো, একেবারে থামলো না—কিন্তু বন্ধুর প্রেরিত কোনো লোকের চিহ্ন দেখা গেল না রাস্তার ওপর।

আমি ঠায় বসে আছি বেঞ্চিখানার ওপর, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টার একবার আমার দিকে চেয়ে দেখে নিজের বাসায় চলে গেল। স্টেশন জনহীন।

আমি পেছনের অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণীর দিকে চেয়ে রইলুম অনেকক্ষণ। মেঘ যেন পাহাড়ের মাথায় এসে জড়িয়ে আছে—ভারি চমৎকার দেখাচ্চে—ঠিক এমনি দৃশ্য দেখে-ছিলুম—সেও ঠিক এমনিধারা এক বর্ষণমুখর দিনে—ফতেপুর সিক্রির বিখ্যাত বুলন্দ দরওয়াজার উঁচু খিলানের মাথায়, সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক যেন মেঘের মধ্যে ঢুকচে আর বেরুচ্চে। মেঘের রাশি যেন জড়িয়ে জড়িয়ে পাক খাচ্চে বুলন্দ দরওয়াজার খিলানের কার্নিসে। এই বনবেষ্টিত নির্জ্জন স্টেশনটিতে বসে কয়েক বৎসর আগে দেখা সে ছবিটা মনে এল।

মুশকিল হয়েচে, ছাতিটা পর্য্যন্ত আনিনি যে, না হয় জিনিসপত্র স্টেশনঘরে রেখে একটু পাহাড়ের ওপর গিয়ে বেড়িয়ে আসবো!

বেলা দুটো বাজলো স্টেশনের ঘড়িতে, মাদ্রাজী স্টেশন-মাস্টারটি বাসা থেকে ফিরে এল, বোধ হয় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে উঠে এল এবং পূর্ব্ববৎ এক জায়গায় বসে আছি দেখে আমার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে স্টেশনঘরে ঢুকলো। কাটনি থেকে একখানা ডাউনট্রেন কিছু পরেই এল, মিনিট দুই দাঁড়ালো, ছেড়ে বিলাসপুরের দিকে চলে গেল।

চারিদিকে চেয়ে দেখচি। এ বনের মধ্যে কোথাও একটা দোকান-পসার চোখে পড়েনি যে এক পয়সার মুড়ি কিনে খাই। কিছু মেলে না এ বনে, নিকটে একটা

বস্তি পর্য্যন্ত নেই। এমন জানলে বিলাসপুর থেকে কিছু খাবার কিনে আনতাম।

স্টেশন-মাস্টারকে জিজ্ঞেস করবো? কোনো দোকান না থাকলে ওরাই বা খাবার কোথা থেকে আনায়! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে কেমন বাধো-বাধো ঠেকতে লাগলো। ভাবলুম লোকটা মনে করতে পারে হয়তো তার বাড়িতেই আমি খেতে চাইচি। না, এ প্রশ্ন ওকে করা হবে না।

বেলা চারটে। তখন আমি সত্যিই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েচি। যদি লোক না-ই আসে তবেই বা কি করবো? স্টেশনের দেওয়াল-সংলগ্ন টাইমটেবিল দেখে বুঝলুম রাত সাড়ে সাতটায় বিলাসপুরে ফিরে যাবার আর একখানা ডাউনট্রেন আছে—তাতেই ফিরে যাবো বিলাসপুরে এবং সেখানে থেকে কলকাতায়। পয়সা খরচ করে এত দূরে অনর্থকই এলুম। এখানে বসে থেকেও তো আর পারিনে। সেই বেলা নটা থেকে আর বেলা চারটে পর্য্যন্ত না খেয়েদেয়ে ঠায় একখানা বেঞ্চির ওপর বসে আছি, স্টেশনটা মুখস্থ হয়ে গেল; এর কোথায় কি আছে আমি যতকাল বেঁচে থাকবো, ততকাল নিখুঁত ভাবে মনে থাকবে এমন গভীর ভাবে এর ছবি আঁকা হয়ে গিয়েচে আমার মনে। অথচ বৃষ্টি মাঝে মাঝে থামলেও একেবারে নির্দ্দোষ হয়ে থেমে যায়নি।

এই সময় স্টেশন-মাস্টারটি স্টেশন ঘর থেকে বেরিয়ে আবার নিজের বাসায় ফিরে চললো। যাবার সময় পুনরায় আমার দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে গেল; একবার জিজ্ঞাসাও করে না যে আমি কে, কেন এখানে সেই সকাল থেকে বসে আছি দারুব্রহ্মের মতো অচল অবস্থায়—বেশ লোক যাহোক!

স্টেশন আবার জনহীন। একে মেঘান্ধকার দিন, তায় হেমন্তের ছোট বেলা, এরই মধ্যে যেন বেশ বেলা পড়ে আসে-আসে হল, মনে হতে লাগলো সন্ধ্যা হবার আর বেশি দেরি নেই। কি করা যায় এ অবস্থায়? রাত্রি কাটাতে হলে যতদূর বুঝচি, স্টেশন-মাস্টারের স্টেশনের ঘরখানার মধ্যে আমায় জায়গা দেবে না, এই বাইরের বেঞ্চিখানাতেই আমায় শুয়ে থাকতে হবে।

এমন সময়ে দূরে বাজনা-বাদ্যির শব্দ শোনা গেল। চেয়ে দেখি একদল লোক বাজনা বাজিয়ে স্টেশনের দিকে আসচে। কাছে এলে দেখলুম তারা বরযাত্রী, দশ-বারো বছরের একটি বালক বরসাজে ডুলি চেপে এসেচে ওদের সঙ্গে। আশ্বিন মাসে বিবাহ কি রকম? এদেশে বোধহয় হয়ে থাকে।

ওদের মধ্যে তিন-চারজন লোক এসে আমার বেঞ্চিতে বসলো। নিজেদের মধ্যে ওরা খুব গল্প-গুজব হল্লা করচে, একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—কেউ কোনো-রকম ধূমপান করচে না। পরের পয়সায় ধূমপান করবার এমন সুযোগ যখন বরযাত্রী হয়ে এরা ছেড়ে দিচ্চে তখন মনে হল ধূমপানের প্রথা এদেশে কম। পরে জেনেছিলুম, আমার অনুমানের মধ্যে অনেকখানি সত্যতা আছে। কাঁচা শালপাতা জড়ানো পিকা ছাড়া এদেশে বিদেশী চুরুট বা সিগারেটের চলন খুব কম।

একজন আমার দিকে চেয়ে হিন্দিতে বললে, বাবু, কোথায় যাবেন?

বাবা! এতক্ষণ পরে মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচলুম। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল কথা না বলে। বললুম, দারকেশা যাবো—

সে বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে বললে, দারকেশা! আপনি কোন্‌ গাড়িতে নেবেচেন? কোথা থেকে আসচেন?

—সকালের গাড়িতে। কলকাতা থেকে আসচি—

—তবে এতক্ষণ বসে আছেন যে?

সব খুলে বললাম। লোকটির চেহারা ও পরিচ্ছদ দেখে খুব উচ্চবর্ণের বলে মনে হয়নি, এই বরযাত্রীর দলের মধ্যে কেউই উচ্চবর্ণের নয় এই আমার ধারণা, কিন্তু লোকটি ভদ্র ও অমায়িক। সব শুনে সে বললে, আপনার তো বড় কষ্ট হয়েচে দেখচি, সারাদিন বসে এভাবে, খাওয়া-দাওয়া হয়নি বোধহয়! আপনি কি করবেন এখন?

--কি করবো, বুঝতে পারচিনে।

—দারকেশায় যাবেন কেন, সেখানে বড্ড বন, জংলী জায়গা—

শুনে আমার আরও আগ্রহ বাড়লো দারকেশা দেখবার জন্যে। সে জায়গা না দেখে চলে যাবো এত দূরে এসে? ওকে বললাম, কোনো ব্যবস্থা হতে পারে সেখানে যাবার?

সে ওদের দলের দু-তিনজনকে ডেকে গোঁড় বুলি মিশ্রিত হিন্দীতে কি পরামর্শ করলে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, সব ঠিক হয়ে গেল। আমাদের দলে যারা এসেচে, তাদের মধ্যে তিনজন ডুলি নিয়ে ফিরে যাবে। আপনি ডুলি চেপে এখান থেকে ন-মাইল দূরে মান্সার বলে একটা গাঁয়ে যাবেন। সেখানে রাত্রিটা থাকবেন।

কোথায় থাকবো? ডাক-বাংলো আছে?

—সে ব্যবস্থা বলে দিচ্চি ডুলিওয়ালাদের। আপনি ওদের ডুলিভাড়া একটা দিয়ে দেবেন সেখানে গিয়ে। ওরা আপনাকে থাকবার জায়গা করে দেবে।

--তারপর আর বাকি পথ? বত্রিশ মাইলের ন-মাইল হল মোটে।

—আজ রাত তো সেখানে থাকুন। কাল সকালে উঠে একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এই ব্যবস্থাই ভালো। ফিরে যাওয়া বা এখানে স্টেশনের ওজনকলের মতো বসে থাকার চেয়ে এগিয়ে চলাই যুক্তি। ন'মাইল ন'মাইলই সই। লোকটিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমি ডুলি চাপলাম।

উঁচুনীচু পাহাড়ী পথ, তোড়ে জল চলেচে রাস্তার পাশের নালা দিয়ে। শালগাছ সর্ব্বত্র। অভিজ্ঞ পণ্ডিতেরা মধ্যপ্রদেশের এ অংশকে **Deccantrap** -এর অন্তর্ভুক্ত বলে নির্দ্দেশ করেচেন, শালবৃক্ষ এই অঞ্চলে সকলের চেয়ে বেশি জন্মায়।

স্টেশন ছাড়িয়ে প্রথমটা দু ধারে অনেক পাহাড় পড়লো, তারপর রাস্তা অনেকখানি নীচু হয়ে গিয়ে একটা ঝরনা পার হয়েচে, তারপর খানিকটা সমতল প্রান্তর, ইতস্তত ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো।

সেই মাঠের মধ্যে বেলা পড়ে এল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশ ঘন হয়ে নামচে। আমার ডুলির পেছনে পেছনে ওদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিটি আমার জিনিসপত্র মাথায় করে নিয়ে আসছিল। তাকে দেখে আমার মনে হল লোকটি নিতান্ত ক্ষীণজীবী, দুর্ভিক্ষের আসামী। ডুলিবাহকদের একজনকে বললুম, এ বেচারী মোট বইতে পারচে না; তোমরা কেউ জিনিস নিয়ে ওর কাঁধে ডুলি দাও।

তারা হেসে বললে—বাবু, চুপ করে বসুন, ও একজন ভালো শিকারী। গায়ে ওর খুব জোর—কোনো ভাবনা নেই।

--কি শিকার করে?

—হরিণ মারে, ভাল্লুক মারে। সব কিছু মারে—

—কোন্ জঙ্গলে শিকার করে?

—আপনি যেখানে যাবেন বাবু, সেখানে খুব বড় জঙ্গল আছে। সেখানে ও গিয়েচে অনেকবার।

শুনে লোকটার প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা হল। ওর দিকে ভালো করে চেয়ে

দেখলুম, গায়ে চর্ব্বি বোধহয় এক আউন্সও নেই, কিন্তু লোহার তারের মতো শক্ত দড়ি-দড়ি হাত-পা। গলাটা যেন একটু বেশি লম্বা, চক্ষুদুটির দৃষ্টি তীক্ষ্ন, গলার হাড় বেরুনো, চেহারায় দস্তুরমত বিশেষত্ব আছে। বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

পথে বেশ অন্ধকার হল।

আমার একটু ভয় যে হয়নি, একথা বললে মিথ্যে কথা বলা হবে। সঙ্গে তিনজন অপরিচিত লোক, সুটকেসে কিছু টাকা-কড়িও আছে, জামায় সোনার বোতাম আছে, হাতঘড়ি আছে, এই পাহাড়ী জায়গায় এদের বিশ্বাস কি।

জিজ্ঞেস করলুম—মান্‌সার আর কতদূর হে?

—আর বাবু তিন মিল।

ওদের তিন মিল আর শেষ হয় না, তারপর দুঘণ্টা কেটে গেল। ডুলির বাইরে বড় অন্ধকার হয়ে এসেচে, কিছু দেখা যায় না তবে মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে ছোট বড় পাহাড় পড়চে রাস্তার দু-ধারে, ঝরনার জলের শব্দও পাচ্চি।

আজ দেবীপক্ষের সপ্তমী, অথচ মাঠ বন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আরও কিছুক্ষণ পরে দূরে অন্ধকারের মধ্যে দু-একটা আলো দেখা গেল। একটা ছোটমতো খালের হাঁটুজল পেরিয়ে আমরা মান্‌সারে পৌঁছে গেলুম।

ওরা বললে—বাবু, আপনাকে থাকবার জায়গায় দিয়ে আসি। কাল সকালে এসে আবার আমরা দেখা করবো।

একটা বড় চালাঘরে ওরা আমায় নিয়ে গেল। ঘরের সামনেটা একেবারে ফাঁকা, তিনদিকে কিসের বেড়া দেওয়া অন্ধকারে ভালো ঠাওর হল না। একটা আলো পর্য্যন্ত নেই, ভীষণ অন্ধকার। আমি তো অবাক, এ রকম ঘরে জিনিসপত্র নিয়ে রাত কাটাবো কেমন করে?

বললুম, এ কারো বাড়ি, না কি এটা?

আমাদের মণ্ডপ-ঘর। সাধারণের জন্যে সাধারণের চাঁদায় তৈরী। এখানে থাকুন, কোনো ভয় নেই। আমি খুব আশ্বস্ত হলুম না। আর কোনো কিছুর ভয় না থাকলেও সাপের ভয় যে আছে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। মধ্যপ্রদেশের এই সব বনাঞ্চলে শুনেচি নাকি শঙ্খচূড় (King Kobra) সাপের খুব প্রাদুর্ভাব।

ওদের বললুম কথাটা। ওরা আমায় নানাপ্রকারে আশ্বাস দিলে। সাপ কখনো তারা চোখে দেখেনি, সাপ কাকে বলে তারা জানেই না। আমি নির্ভয়ে এ ঘরে রাত্রি-যাপন করতে পারি।

কিন্তু সাপ যদি না-ও থাকে, এ খোলা জায়গায় চোরের ভয়ও কি নেই? নিশ্চয়ই এখনো এদেশে সত্যযুগ চলচে না।

ওরা আমার কথা শুনে হাসলে। চুরি নাকি এদেশে অজ্ঞাত। তাদের জ্ঞানে কখনো মান্‌সারে চুরি হয়নি। বিশেষ করে বিদেশী লোকের জিনিস কেউ ছোঁবেও না।

আমাকেই রান্না করতে হল রাত্রে। যবের রুটি, ঢেঁড়সের তরকারি ও দুধ। এদেশে আটার রুটি খাওয়ার প্রচলন তত নেই—বাজার থেকে আটা ময়দা এরা বড় একটা কেনে না। নিজেদের ক্ষেত্রোৎপন্ন যব, গম ও মকাই-এর রুটিই সারা বছর খায়। গম খুব বেশি হয় না বলেই তার সঙ্গে যব ও মকাই যোগ না করলে বছর কাটে না। অনেক সময় যব, গম ও মকায়ের ছাতু—তিন দ্রব্যের সংমিশ্রণেও রুটি তৈরি করা হয়।

রাত্রে সুনিদ্রা হল। পরদিন সকালে উঠতেই গ্রামের অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাদের মুখে খবর নিয়ে জানা গেল মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ ঘর লোকের বাস ও-গ্রামে। প্রধান উপজীবিকা চাষ ও লাক্ষা সংগ্রহ। লাক্ষাকীট পোষা ও সংগ্রহ

করে মারোয়াড়ী মহাজনদের কাছে বিক্রি করা সারা উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর ও মধ্য-প্রদেশের একটি প্রধান কুটীর বাণিজ্য।

আকাশের দিকে চেয়ে প্রমাদ গনলাম। আবার ভয়ঙ্কর মেঘ জমা হয়েচে, বর্ষা দেখচি নামলো কালকের মত। এই বর্ষার মধ্যে এই আশ্রয় ছেড়ে রওনা হব কিনা ভাবতে ভাবতে বৃষ্টি নামলো সত্যিই।

প্রথমে ফোঁটা ফোঁটা, তারপর মুষলধারায়, সঙ্গে সঙ্গে ঝড়। সেই সময়টা আমার ঘরে কেউ নেই, সবাই গল্প করে উঠে গিয়েচে। একটি বালক ভিজতে ভিজতে এক ঘটি দুধ নিয়ে এল আমার জন্যে।

আমি তাকে বলি—চা পাওয়া যায় না এখানে?

—না বাবু-সাহেব।—এ কথা আমার আদৌ মনে ছিল না যে বন-জঙ্গলের দেশে চা পাওয়া যাবে না হয়তো। মনে পড়ল বিলাসপুর থেকেও তো নিতে পারতুম। অগত্যা গরম দুধ খেয়ে চায়ের পিপাসা দূর করতে হল। ছেলেটি দুধ জ্বাল দিয়ে দিলে। দুধ এক সেরের কম নয়? আমি ওকে বললুম—কত দাম দেবো?

সে বললে, প্রধান বলে দিয়েচে বাবু-সাহেবের কাছে দুধের দাম নিবিনে।

—তোর দুধ?

—হাঁ বাবুজি, আমাদের বাড়ির দুধ। মা দিয়েচে।

—তোর জল-খাবার বলে দিচ্চি—দুধের দাম না হয় না নিবি!

—না বাবু-সাহেব, পয়সা আমি নিতে পারবো না।

—আমি তোকে বকশিশ দিতে পারিনে?

—না বাবু, আমরা বকশিশ নিইনে। আমরা মাহাতো, গোয়ালা—দুধই বেচি।

না, একে দেখচি কিছু বোঝানো যাবে না। ভিজতে ভিজতেই ছোকরা চলে গেল। দুপুরের আগে সে-ই আবার এল কিছু চাল ও ঢেঁড়শ নিয়ে। নুন তেল কাল রাত্রের দরুন কিছু অবশিষ্ট ছিল। ওর সাহায্য নিয়ে ভাত ও ঢেঁড়শ-ভাতে রান্না করলুম—দুধ ছিল আধ সেরের ওপর, সেটা আর একবার গরম করে নিলাম। খাওয়া শেষ হল; ছোকরাকেও খেতে বললুম, সে আপত্তি করলে।

বেলা দুটোর সময় আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে রোদ উঠলো। গ্রামের লোক দেখা করতে এল, ওদের চাল-ডালের দাম দিতে গেলে কিছুতেই নিলে না। মণ্ডপ-ঘরে যারা আশ্রয় নেয়, তারা গ্রামের অতিথি। প্রধানেরা এ সব ব্যবস্থা করে, গ্রাম-ভাটি থেকে এর খরচ হওয়ার প্রথা এদেশে বহু প্রাচীন।

আমি বললুম—বেশ, গ্রাম-ভাটিতে কিছু চাঁদা দিতে কোনো আপত্তি হতে পারে কি?

—না বাবু সাহেব, অতিথির কাছ থেকে কিছু নেওয়া নিয়ম নেই।

সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনতে হলে এ ধরনের গ্রামের, অরণ্যে, পাহাড়-পর্বতে, নানা শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশে পায়ে হেঁটে বেড়াতে হয়। ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাসে বেড়ালে আর যাকেই চেনা যাক, চীরবাসা ভৈরবী ভারত-মাতাকে চেনা যায় না।

বেলা দুটোর পরে একটা ঘোড়া ভাড়া করে দিলে। ঘোড়ার সহিসই আমার জিনিস পত্তর নিয়ে ঘোড়ার সঙ্গে যাবে ঠিক হল। দারকেশা পর্য্যন্ত ঘোড়ার ভাড়া সহিসের মজুরি ধার্য্য হল পাঁচ টাকা।

আমি রওনা হয়ে পথে বেরিয়েচি—মাইল দুই এসে দেখি দুজন লোক আসচে, একটা ছোট টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে একজন, ঘোড়ার পেছনে পেছনে আর একজন।

আমাকে দেখে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আমিও ঘোড়া থামালুম।

—তোমরা কোথায় যাচ্চ?

—কার্গিরোড স্টেশনে। প্রতাপবাবু পাঠিয়েচেন। বাবুজি কি কলকাতা থেকে আসচেন? আপনার নাম?

আমি বললুম—এত দেরি করে এলে কেন? তোমাদের জন্যে স্টেশনে বসে বসে কাল হয়রান হয়েচি।

আসলে এদের চিঠি পেতে দেরি হয়েছিল। এ সব জংলী জায়গায় চিঠি বিলি হতে দু-একদিনের এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়া খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

আমি আমার আগের ঘোড়াকে বিদায় দিয়ে নতুন ঘোড়ায় চড়লুম। নতুন সঙ্গীদের বললুম—বেলা তো এখুনি যাবো-যাবো হল, রাত্রে কোথায় থাকা যাবে?

ওরা বললে—চোরামুখ গালার কারখানায়।

—সে কতদূর?

—এখনও বাবুজি, আট মাইল। রাত সাতটায় সেখানে পোঁছবো।

পথের সৌন্দর্য্য সত্যই বড় চমৎকার। পথের বাঁ-পাশে একটা ছোট নদী এঁকে বেঁকে চলেচে, অভ্রকণা মেশানো বড় বড় শিলা দিয়ে তার দুই পাড় যেন মাঝে মাঝে বাঁধানো। এক একটা গাছের কি আঁকা-বাঁকা ভঙ্গি। পড়শী ও ভেলা গাছ এ অঞ্চলে প্রায় সর্ব্বত্র, কিন্তু কোথাও বেশি বড় বন নেই।

একটা পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার দৃশ্যটা সুন্দর লাগলো। তখন আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে স্থানে স্থানে নীল রং বেরিয়ে পড়েচে। কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার হয়ে এল, তারপরেই অস্পষ্ট জ্যোৎস্না ফুটলো।

দু-তিনটি বস্তি পার হওয়া গেল রাস্তায়। একটা বস্তিতে কি একটা পাঠ হচ্চে। চাঁদোয়ার নীচে বাতি জ্বলচে, অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ পাঠককে ঘিরে দাঁড়িয়ে শুনচে। আমাদের দেশের কথকতার মতো। সন্ধ্যার পর বন আর চোখে পড়ে না, শুধুই একঘেয়ে মোরুম ছড়ানো বড় বড় মাঠ—এ মাঠে যদি ডাকাত পড়ে আমাদের সবাইকে খুন করেও যায়, তাহলেও কেউ দেখবে না। কোনো দিকে লোক নেই, একটা বস্তির আলোও চোখে পড়ে না। আমার মনে হয় পুরো দু ঘণ্টা লাগলো এই বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হতে, অবিশ্যি ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার উপায় ছিল না, আমার—কারণ পথ চিনি না, সঙ্গের দুজন লোক ঘোড়ার পাশে হেঁটে যাচ্চে—তাদের ছাড়িয়ে যাওয়া চলে না।

প্রায় যখন সাড়ে সাতটা, তখন দূরে আলো দেখা গেল।

ওরা বললে—ওই চোরামুখ বস্তির আলো।

বেশ শীত করচে, বোধ হয় বাদলার হাওয়া আর এই একদম খোলা মাঠের জন্যেই। অগ্রহায়ণের প্রথমে যেমন শীত পড়ে বাংলা দেশে, সেই রকম শীতটা। গরম কাপড় সঙ্গে বিশেষ কিছু আনিনি, মনে হল না-এনে বড় ভুল করেচি।

চোরামুখ পোঁছে একটা বড় খোলার কুলি-ধাওড়ার মতো ঘরে আমায় ওঠালে। সঙ্গে কোনো আলো নেই—আমার সঙ্গেও না। জায়গাটা নিতান্ত অন্ধকার। জিনিস-পত্র নামিয়ে বিশ্রাম করচি, এমন সময় আমার নজরে পড়লো ঘরটার সামনের রাস্তা দিয়ে বাঙালী ধরনের ধুতি-কামিজ পরা একজন লোক যাচ্চে—কিন্তু অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় ঠিক চিনতে পারলুম না লোকটি বাঙালী কি না।

আমি ওদের বললুম—এখানে দোকান আছে তো?

—হ্যাঁ বাবু, ছোট একটা বাজার আছে—সব পাওয়া যায়।

ওদের পয়সা দিলুম চাল ইত্যাদি কিনে আনতে। মোমবাতি যদি পাওয়া যায়,

তাও আনতে বলে দিলুম। আমি অন্ধকারে বসে আছি চুপ করে—প্রায় মিনিট কুড়ি পরে দেখি আগের সেই বাঙালী পোশাক-পরা লোকটি সামনের রাস্তা দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে যাচ্চে। দু-একবার ডেকে জিজ্ঞেস করবার ইচ্ছে হলেও শেষ পর্য্যন্ত চুপ করেই রইলুম।

তারপর আমার লোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। ওরা মোমবাতি পায়নি —কিন্তু মহুয়ার তেল ও মাটির প্রদীপ কিনে এনেচে। দড়ি দিয়ে সল্‌তে করে মাটির প্রদীপই জ্বালানো গেল। পাথর কুড়িয়ে এনে উনুন করে ঘরের এক কোণে রান্না চড়িয়েচি ওদের সাহায্যে—ভাত প্রায় নামে-নামে, এমন সময় পেছন থেকে কে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠলো—মশাই কি বাঙালী?

পিছন দিকে চেয়ে দেখি সেই বাঙালী-পোশাক-পরা লোকটি। বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাঙালীই বটে। কলকাতা থেকে আসচি।

ভদ্রলোক মহা খুশী হলেন মনে হল। বললেন—তা এখানে কি করচেন?

আমি সংক্ষেপে সব ব্যাপার খুলে বললুম। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলেন—তাও কি কখনো হয়? আপনি বাঙালী, এখানে এসে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাবেন? আসুন, চলুন। ওসব যা রাঁধচেন, আপনার সঙ্গের লোক খাবে এখন। আপনি চলুন আমার বাড়ি।

—আপনি কি করে জানলেন আমার কথা?

—বাজারে শুনলুম। বললে, এক বাঙালী বাবু কলকাতা থেকে এসেচেন, দারকেশা যাচ্চেন, আপনারই গুদামে আশ্রয় নিয়েচেন। চাল ডাল কিনে এনেচে আপনার লোক তাও জানি।

—এ বুঝি আপনার গুদাম?

—এখানে জংলী গালা রাখা হয়, আমারই ঘরটা বটে।

ভদ্রলোকের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে গেলুম ওঁর সঙ্গে। মিনিট পাঁচ-ছয় সোজা রাস্তায় গিয়ে তারপর একটা সরু পথ গিয়েচে বাঁ-দিকে। সে পথে গিয়ে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে বাঁ দিকের সেই যে পাহাড়ী নদী বা ঝরনা, আমাদের সঙ্গে রাস্তার সমান্তরাল ভাবে অনেকদূর থেকে চলে আসচে, সেইটে পার হওয়া গেল। ঝরনাটা পার হয়ে আবার একটু উঁচুদিকে উঠে মাঠের রাস্তায় আরও মিনিট তিন-চার হাঁটবার পর একখানা খোলার বাংলো ধরনের পাঁচিল-ঘেরা বাড়ির সামনে এসে তিনি বললেন, আসুন, এই হলো গরিবের কুঁড়ে। আসুন এখানে। চা খান তো? বাড়িতে বলে আসি। আপনি বাঙালী, বড় আনন্দ হল, বাঙালীর মুখ কতদিন যে দেখিনি।

সত্যই ভদ্রলোককে মনে হচ্ছিল যেন কতকালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়! বিদেশে না যে কখনো বার হয়েচে, সে বুঝবে না দূরদেশে একজন বাঙালীর দেখা পাওয়া কি আনন্দের ব্যাপার।

...অল্পক্ষণ পরে ভদ্রলোক এসে বসলেন—চা-ও এল।

আমি বললুম—এখানে কতদিন আছেন?

—তা আজ সতেরো বছর, কি তার কিছু বেশি।

—কি উপলক্ষ্যে থাকা হয় এখানে?

—আমার একটা গালার কারখানা আছে, দেখাবো এখন। তাই নিয়ে পড়ে আছি —এই তো চাকরির বাজার।

—না না, বেশ ভালো করেচেন। আপনি বাঙালী, এতদূর এসে গালার কারখানা

খুলেচেন, এ খুব গৌরবের কথা। চলচে বেশ ভালো?

—আজ্ঞে হাঁ, তা একরকম আপনার বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে ; তবে কি জানেন, এতদিন যা হয় হয়েচে, মন আর এখন টেঁকে না।

—আপনার বাড়ির সব এখানেই বোধ হয়। তবে আর মন টেঁকাটেঁকি কি, সব নিয়েই যখন আছেন।

ভদ্রলোক তখনকার মতো চুপ করে গেলেন আমার মতে সায় দিয়ে, দু একবার নিরুৎসাহসূচক ঘাড় নেড়ে। রাত্রে বাড়ির মধ্যে খেতে গিয়ে দেখি বৃদ্ধা মাতা ছাড়া ভদ্রলোকের সংসারে দ্বিতীয় লোক নেই, সম্ভবত আর একটি ছোট ছেলে বা মেয়ে থাকে, সে তখন পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছিল।

ঘরদোরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ও অগোছালো। বাড়ির পেছনে একটা সংকীর্ণ উঠান, তার মধ্যে কিসের একটা মাচা ; উঠানটাতে বেজায় কাদা হয়েচে কদিনের বৃষ্টিতে। মাটির কলসীতে জল রাখা মাচাতলার নীচে। ইতিপূর্ব্বে ভদ্রলোকের নাম জেনেছিলাম, তিনি ব্রাহ্মণ, নদীয়া জেলায় বাড়ি একথাও জেনেচি। তাঁর বৃদ্ধা মাকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলুম।

খাওয়ার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা চালের ভাত, ডাল ও ঢেঁড়শের বড়ি ভাজা। এদেশে কোনো তরি-তরকারি বা মাছ বড় একটা মেলে না— ঢেঁড়শ ও টোমাটো ছাড়া। খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট। এসব কথা শুনলুম ভদ্রলোকের কাছেই।

খাওয়ার পরে যেতে উদ্যত হলুম, ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন—কোথায় যাবেন? সেই খোলা গুদোমে? আপনি বেশ লোক তো! এখানে আপনাকে রাত্রে একটু জায়গা দিতে পারবো না বুঝি?

রাত্রে শোবার আগে ওঁর অনেক কথাই বললেন আমার কাছে। ভদ্রলোকের দু-বার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে—এই বয়সে সংসার শূন্য, একটি মাত্র আট বছরের ছেলে আছে। বৃদ্ধা মায়ের কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না। নিজের বয়স হয়েচে পঁয়ত্রিশ মাত্র।

ভদ্রলোকের মন বুঝে বললুম—আপনার বিবাহ করা উচিত পুনরায়।

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন—তা মশায় হয় কি করে। এখান থেকে কোনো যোগাযোগ করা অসম্ভব।

—কেন?

—সন্ধান পাই কোথা থেকে বলুন। বাঙালীর মুখই দেখিনি। সেই তো হয়েচে মুশকিল।

কিছুক্ষণ একথা-ওকথার পর ভদ্রলোক বললেন—আপনি কতদিন এদেশে থাকবেন?

—কত আর, দিন কুড়ি কি একমাস।

—ফিরে গিয়ে দয়া করে যদি একটি মেয়ের সন্ধান করে দেন তবে বড়ই—এই দেখুন বুড়ো মা একা সংসারের সব খাটুনি খাটেন, তারপর ছেলেটির যত্ন করা, তাও তেমন হয় না, সংসারের কতদিক একা দেখবো বলুন।

—বেশ, বেশ, আমি ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো—

—আমরা ভট্টাচাজ্যি, রাঢ়ী শ্রেণী। আগের বিয়ে কোথায় করেছিলুম সে ঠিকানাও আপনাকে দিচ্চি। যাঁরা মেয়ে দেবেন, তাঁরা সন্ধান নিয়ে দেখতে পারেন, বংশে কোনো খুঁত নেই আমাদের।

সকালে উঠে আমাকে তিনি গালার কারখানায় নিয়ে গিলেন। বড় বড় মাটির গামলায় বোধহয় গালা ভিজানো আছে, চামড়ার কারখানার মতো ভীষণ দুর্গন্ধ, আর ভারি অপিষ্কার সমস্ত জায়গাটা। খুব বড় খোলার ঘর, লম্বা ধরনের। যে গুদামটাতে রাত্রে ছিলাম, ঠিক তেমনি ধরনের কুলি-ধাওড়ার মতো সেই ঘরটা।

বললুম—গালা কোথা থেকে কেনেন?

—জংলা গালা গোঁড় মেয়েরা বিক্রী করতে আসে, তাই কিনি। এখানে আরও দুটো কারখানা আছে মারোয়াড়ীদের।

—কি রকম আয় হয় কারখানা থেকে, যদি কিছু মনে না করেন?

—মনে করবো কেন বলুন। তা মাসে গড়ে শ-দেড়েক টাকা দাঁড়ায়, খরচ-খরচা সব পুষিয়ে। তবে আরও বাড়াতুম, কিন্তু কাজে মন লাগচে না মশাই।

নিতান্ত খারাপ আয় নয়, একজন বাঙালী ভদ্রলোক এতদূরে এসে স্বাধীন ব্যবসা চালাচ্চেন মারোয়াড়ী বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, কেরানীগিরি না করে। এতে আনন্দ হবার কথা বটে। আমি তাঁকে বোঝালুম অনেক, নিরুৎসাহ হওয়ার কারণ নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে, তিনি ব্যবসা যেন না ছাড়েন।

সকালে চা খেয়ে ওঁদের কাছে বিদায় নিলুম।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কিছুদূর পর্য্যন্ত এলেন। দু-তিনবার আমায় জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কলকাতায় ফিরে সব ভুলে যাবো না তো? বিশেষ করে তাঁর বিষয়টা। আরও বললেন—যাবার সময় এই পথেই তো ফিরবেন, আমার সঙ্গে না দেখা করে যেন যাবেন না।

বললুম—নিশ্চয়ই, এ পথে ফিরবার সময় মায়ের হাতের রান্না না খেয়ে কি যাবো ভেবেচেন?

—ও কথাটা তাহলে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমার মনে রইল। বিশেষ চেষ্টা করবো জানবেন।

বন্ধুর পথের বাঁকে আমার ঘোড়া ও লোকজন অদৃশ্য হয়ে যাওয়া পর্য্যন্ত ভদ্রলোক চোরামুখ বস্তির শেষপ্রান্তে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, পিছন ফিরে দু-একবার রুমালও উড়িয়েচি।

ফিরবার সময়ে এপথে ফিরিনি, ভদ্রলোকের সঙ্গে আর দেখাও হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি, দেশে ফিরে ভদ্রলোকের বিবাহের জন্য আমি দু-তিন জায়গায় মেয়ে সন্ধান করেছিলুম—আমার স্বগ্রামস্থ এক প্রতিবেশীর বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল, তাদের কাছেও কথা পেড়েছিলুম। ভদ্রলোকের ঠিকানা দিয়ে পত্র ব্যবহার করবার অনুরোধও করি।

কিন্তু যে কটি পাত্রীর সন্ধান করেছিলুম, তাদের অভিভাবকদের মধ্যে কেউই অত দূর বলে জঙ্গলের দেশে মেয়ের বিবাহ দিতে রাজী হননি।

আমার স্বগ্রামের পাত্রীটির বাপ একরকম রাজী হয়েছিলেন কারণ তাঁর অবস্থা তত ভালো ছিল না, কিন্তু মেয়ের মা ভয়ানক আপত্তি তোলেন।

আমায় ডাকিয়ে বললেন, অমন সীতা-নির্ব্বাসনে কে মেয়ে দেবে বাপু? আমার মেয়ে তো ফেল্‌না নয়, সেখানে গিয়ে কথা বলবার লোক পাবে না, হাঁপিয়ে উঠবে।

যাক্‌ সে কথা। চোরামুখ ছাড়িয়ে বেলা দশটার সময় আমরা পৌঁছে গেলুম সালকোণ্ডা বলে একটা ছোট গাঁয়ে। রাস্তার ধারেই একটা চুনের ভাঁটি আছে, আশে-পাশে অনেকগুলো বড় ছোট চুনের ভাঁটি। এখানে অনেকগুলি গোঁড় কুলি কাজ করে, তাদের জন্য বড় বড় কুলি ধাওড়া খান পাঁচ-ছয় ভাঁটির আশেপাশে ছড়ানো। জায়গাটার

দৃশ্য বেশ ভালো লাগলো আমার কাছে। চারিধারে বড় বড় শাল ও ভেলা গাছ, মাঝে মাঝে ধাতুপ ফুলের ঝোপমতো গাছ—একদিকে তো ধাতুপ ফুলেরই বেড়া। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে একটা পুকুর দেখা যাচ্চে কিছু দূরে। দূর ও নিকটে শৈলশ্রেণী, প্রকৃতপক্ষে স্থানটির চারিধার ঘিরেই শৈলমালা, মধ্যে যেন একটি বড় উপত্যকা।

এই অঞ্চলের সব বন পাহাড় ও গ্রাম 'ছত্তিশগড়ি' পরগনার মধ্যে পড়ে।

পূর্ব্বে এই দিকের সব স্থান মারহাট্টা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখনও অনেক ছত্তিশগড়ি মারহাট্টা পরিবার এই সব গ্রামের অধিবাসী। তবে স্থানীয় আদিম অধিবাসী গোঁড়দের সংমিশ্রণে এদের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, অনেক জায়গায় উভয় জাতির আচার ব্যবহার উভয়ের মধ্যে বিস্তৃতি-লাভ করেচে, বিশেষ করে এই সব দুর্গম বন্য-অঞ্চলে।

চুনের ভাঁটির গদিতে বসে কাজ করচেন জনৈক মারাঠী ভদ্রলোক। তাঁর চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ, মাথার মুরাঠা সবই আমার চোখে অদ্ভুত লাগলো। আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি উঠে এলেন আমার কাছে। হিন্দীতে বললেন—আপনি কোথা থেকে আসচেন? আমি পরিচয় দিতে তিনি যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বললেন—আসুন, আমার গদিতে একটু বসুন।

গিয়ে বসলুম তাঁর সঙ্গে। ভদ্রলোকের চেহারা এমনি যে বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়; সুন্দর বলে ততটা নয়, যতটা কিনা আমার চোখে অপরিচিত সাজপোশাক ও মুখের গড়নের জন্যে।

আমায় বললেন—আজ আমার ওখানে দয়া করে থাকতে হবে। আমার বন্ধু অনেক বাঙালী আছেন, আমি বাঙালীদের বড় ভালবাসি। আমি বিশ্বাস করি ভারত-বর্ষের জাতীয় জাগরণের মূলে রয়েচে বাঙালী। এই সম্পর্কে তিনি সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জনের নাম উল্লেখ করলেন বার বার অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ভাবে। বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে ছত্তিশগড়ির শৈলারণ্যবেষ্টিত ক্ষুদ্র এক গ্রামে এক চুনের ভাঁটিতে বসে আমার মাতৃভূমির দুজন সুসন্তানের নাম উচ্চারিত হতে শুনে গর্ব্বে আনন্দে আমার বুক ভরে উঠলো।

ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন। নাম বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক, রংড়ে ব্রাহ্মণ, বাড়ি খাণ্ডোয়া নাগপুরের ওদিকে। এখানে এই চুনাপাথরের খনি ইজারা নিয়ে ভাঁটিতে চুন পুড়িয়ে মোটর লরি করে এগারো ক্রোশ দূরবর্ত্তী রেলওয়ে স্টেশনে চালান দেন। আমি যে পথে এসেচি, ও পথে বা স্টেশনে নয়, কারণ ওটা মোটর গাড়ি চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা নয়।

বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে ও একটি দশ বৎসরের ছেলে থাকে বাসায়। সকলেই আমার সামনে বার হলেন বটে, মেয়েরা কিন্তু কথা কেউই বললেন না।

গৃহস্বামী জিজ্ঞেস করলেন—আপনি স্নান করুন। জল তুলে দেবে, না পুকুরে যাইবেন?

—পুকুরের জল ভালো?

—খুব ভালো, এমন জল কোথাও দেখবেন না।

সত্যিই শালবনের মধ্যে পুকুরটিতে স্নান করে খুব আরাম হল। আজ মেঘ মোটেই নেই আকাশে, বেশ রৌদ্র চড়েচে, এতখানি ঘোড়ায় চড়ে এসে গরম বোধ হচ্ছিল দস্তুরমত। তা ছাড়া চালবিহীন ঘোড়ায় চড়ার দরুন পেটে খিল ধরে গিয়েচে।

বালকৃষ্ণজী বললেন—আমরা কিন্তু মাছমাংস খাইনে বাবুজী—আপনার বড়

অসুবিধে হবে খেতে।

আমি শশব্যস্ত হয়ে বললুম—কি যে বলেন! তাতে হয়েচে কি? আমি মাছ-মাংসের ভক্ত নই তত।

খাবার জিনিস অতি পরিপাটী। 'তুপ' অর্থাৎ ঘিয়ে ডোবানো মোটা আটার রুটি, কুমড়োর ছোঁকা, পাঁপর, ছোলার ডাল, চাটনি ও মহিষের দুধের দই। বালকৃষ্ণ ত্র্যম্বক একা আহার করলেন আমার মতো সাতজনের সমান। সেই মোটা রুটি আমি চারখানার বেশি ওঁদের অত্যন্ত অনুরোধ সত্ত্বেও খেতে পারলুম না, উনি খেলেন কম্‌সে কম্ ষোলখানি। সেই অনুপাতে ডাল-তরকারি ও দইও টানলেন।

আহারাদির পর তাঁকে বললুম—এদেশে অন্য কি ব্যবসা সুবিধে?

—আপনি যেখানে যাচ্চেন, ওদিকে জঙ্গল বেশি, অনেকে জঙ্গল ইজারা নিয়ে কাঠ বিক্রি করে।

—কোনো বাঙালীকে ব্যবসা করতে দেখেচেন এদিকে?

—একজন আছেন, তাঁর নাম আমি জানিনে, অমর-কণ্টকের কাছে অনেক বন তিনি ইজারা নিয়ে কাঠ চালান দিতেন জানি।

বন কোথাও কেটে ফেলেচে, একথা আমার ভালো লাগে না। অর্থের জন্যে প্রকৃতির হাতে সাজানো অমন সৌন্দর্যভূমি বিনষ্ট করা বর্ব্বরতা ছাড়া আর কিছু না। এমন একদিন আসবে যেদিন লোকে এ ভুল বুঝতে পারবে, কিন্তু অরণ্য-সৌন্দর্য তখন পৃথিবীতে কোথাও অবশিষ্ট থাকবে কিনা কে জানে?

এখান থেকে দারকেশা মাত্র দশ মাইল। সন্ধ্যার মধ্যে সেখানে পেঁছুনো যাবে। আমি আমার সঙ্গীদের বললুম, কার্গিরোড থেকে মোটে বত্রিশ মাইল শুনেছিলাম দারকেশা, এ তো তার অনেক বেশি হয়ে গেল—

ওরা বললে—বাবু, চল্লিশ মাইলের ওপর ছাড়া কম হবে না, তবুও আপনাকে আমরা খানিকটা সোজা পথ দিয়ে এনেচি। আসল পথটা ঘুরানো, কিন্তু এর চেয়ে ভালো।

সালকোণ্ডা চুনের ভাঁটি ছাড়িয়ে জমি ক্রমশ নীচু হয়ে গেল। যখনই এমন হয় তখনই আমি জানি এবার নিশ্চয়ই কোনো নদী আছে সামনে। হলও তাই, একটা খরস্রোতা পাহাড়ী নদী পড়লো সামনে, তার নামও সালকোণ্ডা। নদীর ওপরে কাঠের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে পুল তৈরি করা, তার ওপর দিয়ে ঘোড়া যাবে না, অথচ নদীর বেগ দেখে মনে হল, না জানি গভীরতাই বা কতটা!

ঘোড়া নামিয়ে দিলুম। দেখি ক্রমশ জল বাড়চে, ক্রমে আমার এমন অবস্থা হল রেকাব থেকে পা তুলে পা দুখানা মুড়ে জিনের দুপাশে নিয়ে এলুম, তখনও জল বাড়চে। পার্ব্বত্য নদীতে বৃষ্টি নামলেই আর দেখতে হবে না কোথা থেকে যে জল বাড়বে! জিনে পর্যন্ত জল ঠেকিয়ে তখন ঘোড়া দেখি আর একটু উঁচু জায়গায় পা পেলে। ডাঙায় উঠে এমন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠলো বুনো ঘোড়াটা যে আমায় সুদ্ধ, জিনসুদ্ধ ফেলে দিয়েছিল আর কি। যে ঘোড়ার চাল থাকে না, সে ঘোড়ার আদব-কায়দা কখনই সুমার্জ্জিত ও ভদ্রতাসঙ্গত হয় না এ আমি বহুদিন থেকে দেখে আসচি।

এই দশ মাইলের শোভা কিছুই নেই, তবে এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উঁচুনীচু মরুম-কাঁকরের ডাঙার যদি কারোর কাছে মূল্য থাকে, সে হিসেবে এ অঞ্চলের তুলনা নেই।

শুধু Space যাদের ভালো লাগে, জনহীন মুক্ত Space, তাদের কাছে এমন স্থান হঠাৎ কোথাও মিলবে না। পৃথিবীর মুক্ত-রূপের মহনীয় সৌন্দর্য্যে এ স্থান সত্যিই অতুলনীয়।

তবে অনেকে এর মধ্যে গাছপালা হয়তো দেখতে চায়, হয়তো ভাবে, এতটা ফাঁকা কেন রে বাপু, মাঝে মাঝে দু-দশটা শালঝোপ থাকলে এমন বা কি মন্দ হত!

কিংবা যদি থাকতো মাঝে মাঝে শিমুল গাছ বা রক্তপলাশ, তবে ফাল্গুন মাসের প্রথমে ফুল ফুটলে এই অঞ্চল হয়ে উঠতো মায়াময় পরীরাজ্য।

এই সব ভাবতে ভাবতে বেলা প্রায় পড়ে গেল। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। সেই সময় অপূর্ব্ব দৃশ্য। হঠাৎ আমি ঘোড়া থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

বহু দূরে, পশ্চিম দিক্‌চক্রবালের অনেকটা জুড়ে কালো বনরেখা দেখা দিয়েচে। রেখা ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠলো, তখন বেলা নেই, সন্ধ্যার অন্ধকার নামলো। আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলুম, ওই কি দারকেশা?

ওরা বললে, বন আরও অনেক দূরে, দারকেশা আর বেশি দূর নেই।

একটা ছোট পাহাড়ের আড়ালে অনেকগুলো ঘরবাড়ি দেখা গেল, এতক্ষণ আমি লক্ষ্য করিনি। ওরা বললে—ওই দারকেশা।

দারকেশা একটি ছোট বস্তি।

এর পশ্চিম দিকে চক্রবাল জুড়ে অরণ্যরেখা ও শৈলশ্রেণী। গ্রাম থেকে বনের দূরত্ব দু মাইলের বেশী নয় কিন্তু বন এখানে কোণাকুণি ভাবে বিস্তৃত, উত্তরপশ্চিম কোণ থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে চলে গেল লম্বা টানা বনরেখা ; যে জায়গাটা খুব নিকটে এসে পড়েচে সেইটিই দু মাইল।

বনের মধ্যে ছোট বড় চুনাপাথরের টিলা ও অনুচ্চ শিলাশৃঙ্গ। এই বন তেমন নিবিড় নয়। এক ধরনের শুভ্রকাণ্ড, বনস্পতিজাতীয় বৃক্ষ এই বনে আমি প্রথম দেখি। এর গুঁড়ি ও ডালপালা দেখলে মনে হবে কে যেন গাছের গায়ে শঙ্খের কাজ করেচে, চক্‌চকে সাদা। গুঁড়ির গায়ে হাত দিলে হাতে খড়ির গুঁড়োর মতো এক প্রকার সাদা গুঁড়ো লেগে যায়, মুখে মাখলে পাউডারের কাজ করে। এই গাছের নাম রেখেছিলুম শিব গাছ।

দারকেশা একটা উঁচু পাথুরে-ডাঙার ওপর, তিনদিক থেকে ডাঙাটা নীচু হয়ে সমতল জমির সঙ্গে মিশেচে, ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরনা ডাঙার নীচে বয়ে যাচ্চে ঝিরঝির করে ঝরনার দুধারে ছোট ছোট গাছ ও এক প্রকারের লতার ফুল।

আমার বন্ধুটি এখানে কণ্ট্রাক্‌টারি করেন। দু পয়সা হাতে যে না করেচেন এমন নয়। অনেক দিন পরে একজন বাঙালী বন্ধু পেয়ে তিনি খুব খুশী।

আমি রোজ সকালে উঠে বনের দিকে বেড়াতে যাই, কখনো ফিরি দুপুরে, কোন-দিন সন্ধ্যাবেলা। বন্ধু বললেন—বনে যখন তখন অমন যেও না—বড্ড জন্তু-জানোয়ারের ভয়।

—কি জন্তু?

—ভাল্লুক তো আছেই, বাঘ আছে, বুনো কুকুর আছে।

এখানে ছত্তিশগড়ি রাজপুত অধিবাসীদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী আছে, সে আমার বন্ধুর অধীনে কাঠ যোগানোর কাজ করেছিল অনেকদিন।

লোকটার নাম মাধোলাল। আমি তার সঙ্গে অনেক সময় বসে বসে তাদের দেশ সম্বন্ধে গল্প করতুম।

মাধোলাল একদিন আমায় তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলে। খাওয়ালে মোটা মোটা

যবের আটার রুটি, উচ্ছে ভাজা ও লঙ্কার আচার। এদেশে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে ভালো-মন্দ খাওয়ানো উচিত বলে আদৌ ভাবে না, যা হয় খাওয়ালেই হল।

মাধোলালের বাড়ি খেয়ে আমার পেট ভরলো না। রুটি দিয়ে উচ্ছে ভাজা কখনো খাইনি, সুখাদ্যের তালিকার মধ্যে অন্তত আমি এই অদ্ভুত সংমিশ্রণের নাম করতে পারিনে। শেষকালে এল যে জিনিসটা, তাকে আমি নাম দিয়েচি গমের পায়েস।

কাঁচা গমের ছাতুর সঙ্গে দুধ আর ভেলিগুড় গুলে এই জিনিসটি তৈরী, তার সঙ্গে মেথি বাটা ও হিং মিশানো, বাঙালীর মুখে অখাদ্য!

খাওয়ার পরে মাধোলাল আমার কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করলে।

—বাবুজি, আপনি এদেশে বাস করুন।

—কেন মাধোলালজি?

—আপনাকে বড় ভালো লাগে। এদেশে বিয়ে করুন না?

—বলো কি মাধোলালজি! আমাদের সঙ্গে গোঁড়া ছত্তিশগড়ি সমাজের কে মেয়ের বিয়ে দেবে?

—বাবুসাহেব, বলেন তো যোগাড় করি। কেন দেবে না?

—আছে নাকি সন্ধানে?

—আপনি বললেই সন্ধান করি। আছেও।

—এই গাঁয়েই নাকি?

—হ্যাঁ বাবুজি। ব্রাহ্মণের মেয়ে, দেখতে বেশ সুন্দরী।

—গোঁড় সমাজের?

—না বাবু, গোঁড়দের জন্যে মিশনে পালিতা মেয়ে। ইংরিজি লেখাপড়া, সুচের কাজ, রান্না—সব জানে।

মনে মনে মাধোলালের বুদ্ধির প্রসংশা না করে পারলাম না। মিশনে পালিতা মেয়ে ছত্তিশগড়ি সমাজের কেউ বিয়ে করবে না জেনেশুনে। তবে বাঙালী বাবুদের জাতও নেই, সমাজও নেই, দাও তার ঘাড়ে চাপিয়ে।

আমার বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম মাধোলাল একজন সমাজসংস্কারক। মেয়েটিকে সে এনে নিজের বাড়িতেই রেখে দিয়েচে আজ চার-পাঁচ বছর, তাকে ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়া মাধোলালের একটা সাধ।

মাধোলাল দু-তিন দিন পরে আমায় আর একদিন রাস্তায় পাকড়ালে।

—বাবুজি, আমার সেই কথার কি হল?

—সে হবে না মাধোলালজি।

—কেন বাবুজি, মেয়ে আপনি দেখুন কেমন, তারপর না হয়—

—না মাধোলালজি, মিশনের মেয়ে আমাদের সমাজে চলবে না। আমাদেরও তো সমাজ আছে, না নেই?

—বাবুজি আপনি না করেন, ওর একটি ভালো পাত্র তবে যোগাড় করে দেবেন?

—আমি কথা দিতে পারিনে মাধোলালজি, তবে চেষ্টা করে দেখতে পারি।

দারকেশা থেকে এগারো মাইল দূরবর্ত্তী গভর্নমেণ্ট রিজার্ভ ফরেস্ট একদিন দেখতে গেলুম। সেদিন সঙ্গে কেউই ছিল না—আমি ঘোড়া করে বেলা দশটার সময় বার হয়ে বেলা একটার সময় একেবারে পথহীন বিজন বনের মধ্যে গিয়ে পড়লুম।

বড় বড় গাছ, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি—নীচে কোথায় যেন মাটি নেই, শুধুই সাদাপাথরের নুড়ি ছড়ানো—মাঝে মাঝে ঝরনা। এ বনেও অনেক বুদ্ধ-নারিকেলের

গাছ দেখা গেল। ঝরনার ধারে ঘন জঙ্গল, অন্যত্র বন এত ঘন নয়। এই বনে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া ফুলের (Lantana Camera) ভিড়, বিশেষ করে ঝরনার ধারে। এই সুদৃশ্য ফুল এখানে ফুটেচে খুব বেশি ও নানা রঙের।

বনের মধ্যে এক জায়গায় বাঘ শিকারের মাচান বাঁধা। দেখে মনে হল কিছুদিন আগে এখানে কেউ শিকার করতে এসেছিল। এই বন যে হিংস্রজন্তু-অধ্যুষিত, তা মনে পড়লো এই মাচান দেখে—আরও গভীর অরণ্যে অবেলায় প্রবেশ করা সমীচীন হবে না ভেবে ঘোড়ার মুখ গ্রামের দিকে ফেরালুম।

পথে একজন খাকী পোশাক পরা কালো লোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি গর্ভনমেণ্টের অরণ্যবিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী। আমায় দেখে বললে—আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

আমি বললুম বনে বেড়াতে গিয়েছিলুম।

লোকটি বললে—অন্যায় করেচেন, একা যাওয়া আপনার উচিত হয়নি। বনে বাঘের ভয় আছে, এ সব অঞ্চলের বাঘ বড় খারাপ। একটা মানুষ-খেকো বাঘও বেরিয়েচে বলে জানি।

সামনে আসচে কোজাগরী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাত্রি। আমার প্রবল আগ্রহ ছিল অমন জ্যোৎস্নারাত্রিটি বনের মধ্যে কোথাও যাপন করা। অনেক বক্তৃতা দিয়েও একজন লোককেও যোগাড় করা গেল না যে আমার সঙ্গী হতে পারে, কারণ মানুষ-খেকো বাঘের কথা কানে শুনে সেখানে একা যেতে চাইবো এমন সাহস আমার ছিল না।

অবশেষে দারকেশার পূর্ব্বপ্রান্তে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর সে-রাত্রি খানিকক্ষণ বসে থেকে আমার সাধ খানিকটা মিটলো। আমার সঙ্গে গ্রামের দু-তিন জন লোকের মধ্যে মাধোলালও ছিল।

মাধোলাল এই অরণ্য-অঞ্চল সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানে। আমায় বললে, বাবু-সাহেব, আমার কোথাও যেতে ভালো লাগে না।

--কেন মাধোজি?

--মন হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় সব চাপা।

—বনের মধ্যে গিয়েচ রাত্রে?

—অনেকবার বাবুজি। আমার এক বন্ধু ভালো শিকারী ছিল, সে বনে মাচান বাঁধলে বাঘ শিকার করবার জন্যে। অনেকদিন আগের কথা।

—তারপর?

--আমি বললুম আমায় সঙ্গে নাও। সে প্রথমে কিছুতেই রাজী হয় না, তারপর রাজী হল একটা শর্ত্তে। বললে—মাচানে তোমায় বেঁধে রাখা হবে। আমি তো অবাক, বেঁধে রাখা হবে কেন? সে বললে, যখন বাঘ আসবে, তখন তুমি এমন লাফ-ঝাঁপ মারবে ভয়ে যে মাচান থেকে পড়ে যেতে পারো—হয়তো আমায়ও বিপদগ্রস্ত করতে পারো। আমি রাগ করলুম বটে মনে মনে, কিন্তু রাজী হয়ে গেলুম।

—বেঁধে রাখলে নাকি?

—মাচানের খুঁটি আর গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ি কষে বেঁধে রাখলে। পরে বুঝেছিলুম এই বেঁধে রাখবার জন্যই সেদিন আমার আর আমার বন্ধুর প্রাণরক্ষা হয়েছিল। রাত বেশি হল, মাচার ওপর আমরা মাত্র দুজন। এই যে বন দেখচেন, এই বনেরই ব্যাপার। তবে তখন আরও ঘন ছিল, এখন ইজারাদারেরা কেটে কেটে অনেক সাবাড় করে দিয়েচে। অনেক রাত্রে বাঘ এল—প্রকাণ্ড ম্যান-ঈটার। আমার বন্ধু বললে—গুলি করো। আমি জীবনে তখন বন-মুরগী ছাড়া কোনো বড় জন্তু

মারিনি—আর বুনো বাঘ কখনও দেখিওনি। তার গর্জ্জন শুনে আর চেহারা দেখে আমার হাত পা কাঁপতে লাগলো। বন্দুক হাত থেকে পড়ে যায় আর কি। তারপর সেই বাঘ যখন আমার বন্ধুর গুলি খেয়ে লাফ মেরে ভীষণ হাঁক দিয়ে দিয়ে সামনে উঠতে গেল—আমি মাচানের পেছন দিয়ে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলুম।

আমার তখন জ্ঞান নেই, বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েচে ভয়ে। দু-দুবার বাঘ লাফ মারলে দু সেকেন্ডের মধ্যে দুবার, আমি পেছন থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে পড়বার চেষ্টা করলুম সেই দুই সেকেন্ডের মধ্যে। পারলুম না শুধু গাছের সঙ্গে বাঁধা আছি বলে। তখন বন্ধু বললে, যদি তোমায় না বাঁধতুম, বুঝেছ এখন কি হত?

—বাঘ মারা পড়লো শেষ পর্য্যন্ত?

—নাঃ, সে রাত্রে সেটা পালালো। পরদিন সকালে এক মাইল দূরে এক জায়গায় ঘাসের মধ্যে বসে আছে, তখন আবার গুলি করা হল। বাঘ চার্জ করলে—তখন দুই ভুরুর মাঝখানে আর এক গুলি। ওই হচ্চে আসল জায়গা, যতক্ষণ ওখানে গুলি না লাগচে, ততক্ষণ বাঘ বা কোনো জন্তু কাবু হবে না। অন্য যে কোনো জায়গায় গুলি লাগলে, বাঘ জখম হতে পারে বটে, মরবে না।

আমি জানতুম মাধোলাল বড় শিকারী না হলেও ইদানীং জানোয়ার মেরেচে অনেক। আমার বন্ধুর মুখেই ওর শিকারের অনেক গল্প শুনেচি।

বললুম—আচ্ছা মাধোলালজি অনেক বনে তো বেড়িয়েচ, কখনো কোনও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ার, যার কথা কেউ জানে না—এমন কিছু দেখেচ?

আমার এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য এমন সুন্দর জ্যোৎস্না-রাত্রিতে এই বৃহৎ অরণ্যের প্রান্তে বসে মনে একটু রহস্য ও ভয়ের ভাব নিয়ে আসা। জীবনকে উপভোগ করবার একটা দিক হচ্ছে, যে-সময়ে যে-রসের বা অনুভূতির আবির্ভাব প্রীতিকর—সে সময়ে সেটি মনে আনবার চেষ্টা করতে হবে। দূরে বনরেখা জ্যোৎস্নার আলোয় অস্পষ্ট দেখালেও টানা, সোজা, কোণাকুণি রেখাটি টের্চা ভাবে দূরদিগন্তে যে কোন্ মায়া-লোকের সীমা নির্দ্দেশ করচে, আকাশচ্যুত জ্যোৎস্না-রাত্রির দল যেন ওই বনের অন্তরালে দল পাকিয়ে থাকে—আরও কত অজানা সৌন্দর্য্য, অজানা ভয়, অজানা বিপদের দেশ ওটা।

আমার সামনে বড় একটা শিলাখণ্ড, তার গা ঘেঁষে একটা বাঁকা গাছ। গাছটার বড় বড় পাতা, অনেকটা পেঁপে পাতার মত, পাথরখানার ওপর অনেকগুলো শুকনো পাতা ঝরেও পড়েচে—তার মধ্যে খড় খড় শব্দ করে এদেশী বড় বহুরূপী যাতায়াত করচে।

মাধোলাল আমার কথার উত্তরে বললে—না বাবুজি, তা কখনো দেখিনি।

—দেখ ভেবে। তোমার দেখে আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল, এমন কিছু?

আমি ওকে ছাড়চিনে, ও না বললে কি হবে? এমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে ওর মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের গল্প না শুনলেই চলবে না আমার।

কিন্তু মাধোলাল অনেক আকাশপাতাল ভেবেও কিছু বার করতে পারলে না। অদ্ভুত জানোয়ার কিছু দেখেনি, তবে বাঘ তারপর দু-চারটে মেরেচে, ভালুক, শুয়োরও—আর হরিণের তো কথাই নেই।

বললুম—তবে মাধোলাল, আমার একটা আশ্চর্য্য গল্প শুনবে?

মাধোলাল উৎসাহের সঙ্গে বললে—নিশ্চয়ই, বলুন।

বানিয়ে বানিয়ে ওকে একটা খুব বড় ও অদ্ভুত ধরনের জানোয়ারের গল্প করলুম—আরাকান ইয়োমার জঙ্গলে দেখেছিলুম। মাধোলাল বিশ্বাস করলে।

আমার উদ্দেশ্য খানিকটা ভয় ও রহস্যের সৃষ্টি করা, এই অরণ্য-প্রান্তের এমন অপূর্ব্ব পূর্ণিমা রাত্রিকে আরও নিবিড় ভাবে পাবার জন্যে।

শীত করতে লাগলো। তখন রাত বারোটার কম নয়।

আমি ওকে বললুম—এ বন খুব বড়।

—রেওয়া স্টেট পর্য্যন্ত চলে গিয়েচে—বেশি নয়, মাইল বাইশ-তেইশ এখান থেকে। ওদিকে অমর-কণ্টক পর্য্যন্ত চলেচে। খুব বড় বন।

—বেশ দেখবার জায়গা—না? সিনারি ভালো?

—সিনারি আপনারা কাকে বলেন বুঝি না। তবে এমন সব জায়গা আছে, যেখানে গেলে আর বাড়ি ফিরে আসতে ইচ্ছা করে না, এখানেই থাকি মনে হয়। একটা জায়গার কথা বলি। পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই বনের একটা পাহাড়ের নাম ঘোড়া-ঘাটির পাহাড়। দেখতে চান তো একদিন নিয়ে যাবো। সাদা পাথরের পাহাড়টা, অনেকটা উঁচু, বড্ড কাঁটাগাছের জঙ্গল, আর পাথরের ফাটলে পাহাড়ী মৌমাছির চাক। গ্রামের লোকেরা ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে মধু সংগ্রহ করতে যায় চৈত্র মাসে। সে-সময় একরকম সাদা ফুল ফোটে, খুব বড় বড়, ভারি সুগন্ধ। ঘোড়াঘাটির পাহাড়ে ওই ফুলের গাছ অনেক। বেশ বড় গাছ। আপনি গিয়ে দেখবেন, যাকে আপনারা সিনারি বলেন, তা আছে কি না।

—এখান থেকে কতদূর হবে?

—তা তেরো-চোদ্দ মাইল হবে। ঘোড়াঘাটি পাহাড়ের গায়ে দুটো গুহা আছে, একটার মধ্যে একজন সাধু থাকতেন—আজ প্রায় পনেরো বছর ছিলেন। এখন কোথায় চলে গিয়েচেন। আর একটা গুহায় ঢোকা যায় না, মুখটা কাঁটাজঙ্গলে বুজোনো। যাবেন একদিন?

যাবার যথেষ্ট আগ্রহ সত্ত্বেও আমার সেখানে যাওয়া হয়নি।

এর দুদিন পরে আমি এখান থেকে রওনা হই পদব্রজে। বনের মধ্যে দিয়ে উনিশ মাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে তবে রেওয়া স্টেটের প্রান্তে শালগাড়িসান্তারা ডাক-বাংলো। বনের বিচিত্র শোভা এই উনিশ মাইল হেঁটে না গেলে কিছু বোঝা যেতো না।

আসল ভারতবর্ষের রূপ যেন দেখচি, প্রাচীন ভারতবর্ষ। আর্য্যাবর্ত্তের বিশাল সমতলভূমি নয়, যা নাকি গঙ্গা ও যমুনার পলি-মাটিতে সেদিন তৈরী হল—কালকের কথা।

এ ভারতবর্ষ যখন হয়েচে তখন হিমালয় পর্ব্বত গজায়নি, বহু প্রাচীন যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বের বৃদ্ধতম ভারতবর্ষ এ; এর অরণ্য এক সময় বৈদিক আর্য্যগণের বিস্ময়, রহস্য ও ভীতির বস্তু ছিল; প্রথম ইউরোপীয় পর্য্যটকদের কাছে কঙ্গো ও ইউগান্ডার আগ্নেয় গিরিশ্রেণী ও ঘনারণ্য যেমন ছিল, ঠিক তেমনটি।

বনের অদ্ভুত রূপ দেখতে হয় যদি তবে পদব্রজে এ পথে অমরকণ্টক পর্য্যন্ত যাওয়া উচিত। তবে হিমারণ্যের মতো বিচিত্র বনপুষ্পশোভা এ বনে নেই, মধ্য-প্রদেশের বনভূমির রূপ অন্য ধরনের, একটু বেশি রুক্ষ ও অনাড়ম্বর।

বনপুষ্প ও ফার্ন পাওয়া যায় যেখানে আছে বড় বড় পাহাড়ী ঝরনা, তার ধারে বড় বড় আর্দ্র শিলাখণ্ডের গায়ে কত কি ছোট ছোট লতা ও চারাগাছে রঙীন ফুল ফুটে আছে বটে কিন্তু বাইরের বনে এ সময়ে কোনো ফুল দেখিনি, কেবল বন্য শেফালি ছাড়া।

এ বনে বন্য শেফালি গাছ অজস্র। পথের ধারে যা পড়ে, তাতেই আমার মনে হয়েচে এই গাছের সংখ্যা এ অঞ্চলে যথেষ্ট। তবুও আমি গভীর বনের মধ্যে যাইনি,

আমার সঙ্গে চার-পাঁচজন অমর-কণ্টকের যাত্রী ছিল, তারাও আমাকে পথ ছেড়ে অরণ্যের অভ্যন্তর প্রদেশে ঢুকতে দেয়নি।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম পড়ে। গ্রামে ছোট মুদীর দোকান, সেখানে সিজার সিগারেট পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় আটা, ডাল, ভেলিগুড়, নুন, মোটা চাল। বিভিন্ন মিশন সোসাইটি এইসব বন্য-পল্লীতে স্কুল বসিয়ে গোঁড়দের শিক্ষাদানে যথেষ্ট সাহায্য করচে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা কোনো কোনো গ্রামে নিতান্ত কম নয়।

দুপুরে নিভৃত কোনো ঝরনার ধার খুঁজে নিয়ে গাছের নিবিড় ছায়ায় আমরা রান্না চড়াতুম। আমাদের দলের পাচক ছিল মান্দারু বলে একটি ছোকরা। সে মাধোলালের বাড়িতে প্রতিপালিত হয়েছিল ছেলেবেলায়, এখন কাঠের মিস্ত্রির কাজ করে। যদিও সে একজন দস্তুরমত ভবঘুরে, কোথাও বেশিদিন থাকা তার ধাতে নাকি একেবারেই সয় না।

আমি বলতুম—আজ কি রান্না হবে মান্দারু?

—আটা আর দাল।

—আর কি রাঁধতে জানো?

—আর আলুর চোখা।

দুবেলা এই একই রান্না, নতুনত্ব নেই। আটার হাতে-গড়া রুটি, অড়রের ডাল আর আলুর চোখা। এমন বিচিত্র রান্না জীবনে কখনো খাইনি। এমন ঘোর আনাড়ি ও প্রতিভাবিহীন রাঁধুনীও সহজে খুঁজে মিলবে না। এতদিন হাতে-কলমে রান্নার কাজ করা সত্ত্বেও মান্দারু এতটুকু উন্নতি করতে পারেনি ও কাজে, কোনদিন পারবেও না।

বনের মধ্যে যে-কটি অদ্ভুত দিন কেটেছিল, তার কথা জীবনে কখনো ভুলব না। প্রদেশের এইসব বনে যথেষ্ট হিংস্র জন্তুর বাস বটে—কিন্তু আমরা কোনদিন কিছু দেখিনি। আমার একজন সঙ্গী এক রাত্রে বললে, সে নাকি বাইসন দেখেচে—কিন্তু তার কথা আমার বিশ্বাস হয়নি।

প্রথমে তো, বাইসন মাদ্রাজ অঞ্চলে ছাড়া ভারতের অন্য কোনো বনে দেখা যায় না। মধ্যপ্রদেশে 'গৌর' বা 'গায়ের' বলে যে মহিষজাতীয় জন্তু আছে তাকে অনেকে 'ইণ্ডিয়ান বাইসন' বলেন বটে কিন্তু মধ্যপ্রদেশের বনে 'গৌর' প্রায় নির্ব্বংশ হয়ে এসেচে। শিকারীরা বনবাদাড় ঠেঙিয়েও তার সন্ধান পান খুবই কম। দ্বিতীয় কথা, এই বন্য জন্তু অত্যন্ত হুঁশিয়ার, মানুষের সাড়াশব্দ তারা অনেক দূর থেকে পায় এবং সে জায়গার ত্রিসীমানায় ঘেঁষে না।

তবে শেয়াল প্রায়ই দেখা যেতো—আর দেখতুম ময়ূর; প্রায়ই ময়ূর ডাল থেকে উড়ে বসত পথের ওপর। ময়ূর ছাড়া আরও অনেক পাখী ছিল সে বনে; দুপুরে যখন গাছতলায় একটু বিশ্রাম করতুম, তখন বিহঙ্গ-কাকলী আমাদের পথশ্রান্তি দূর করতো।

এই রকম বেড়াবার একটা নেশা আছে—বড় ভয়ানক নেশা সেটি। তা মানুষকে ঘরছাড়া করে ভবঘুরে বানিয়ে দেয়। আমরা যে কজন বনের পথে চলেচি, সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করছিলুম সেই অদ্ভুত ও তীব্র আনন্দ, শুধু মুক্ত জীবনেই যার দেখা মেলে।

আমরা সাধারণতঃ রাত্রে কোনো একটা গ্রামে আশ্রয় নিতুম, সকাল হলে হাঁটা শুরু করে দুপুরের মধ্যে দশ-বারো মাইল কি পনেরো মাইল পার হয়ে যেতুম। এই

সকালের হাঁটাই হল আসল। বিকেলে বেশিদূর যেতে না যেতে বনের মধ্যে ক্রমশ ঘন ছায়া নেমে অন্ধকার হয়ে আসতো, তখন কোথাও আশ্রয় না নিলে চলতো না।

দুপুরে অনেকখানি পথ হেঁটে একটা সুন্দর জায়গা আমরা বেছে নিতুম যেখানে বড় বড় গাছের ছায়া, ঝরনার জল কাছে, বসবার উপযুক্ত শিলাখণ্ড পাতা, পাখীর কাকলীতে বনভূমি মুখর। তারপর মান্দারু জায়গাটা ডালপালা ভেঙ্গে পরিষ্কার করতো, আমরা কম্বল পেতে ফেলতুম তিন-চারখানা—কখনো বা জোড়া দিয়ে, কখনো আলাদা আলাদা। কত রকমের গল্প হত, চা চড়তো, আমরা চা খেয়ে খুব খানিকটা বিশ্রাম করে ঝরনার জলে নেয়ে আসতুম—এদিকে মান্দারু রান্না চাড়িয়েচে, আরও কিছুক্ষণ বসবার পরে মান্দারু শালপাতায় আমাদের ভোজ্য পরিবেষণ করতো। খেয়ে-দেয়ে ঘণ্টাখানেক সবাই ঘুমিয়ে নিতো, তারপর আবার উদ্যোগ করে তাঁবু উঠিয়ে সবাই মিলে রওনা হওয়া যেতো।

কোনো উদ্বেগ নেই, চিন্তা নেই মনে—দূর কোনো বৃক্ষচূড়ায় ময়ূরের ডাক, বনের ডালপালায় বাতাসের মর্ম্মর শব্দ, ঝরনার কলতান, প্রচুর অবকাশ ও আনন্দ, এ যেন আমরা আবার আমাদের প্রাচীন অরণ্যজীবনে ফিরে গিয়েচি। বিংশ শতাব্দীর কর্ম্ম-বহুল দিনগুলি থেকে পিছু হেঁটে দায়িত্বহীন মুক্তজীবনের আনন্দে আমাদের মন ভরপুর। তা ছাড়া, এই বিরাট বনপ্রকৃতির নিবিড় সাহচর্য্যও আমাদের সকলের মনে কেমন একটা নেশা জাগিয়ে তুলেচে।

· আমাদের মধ্যে একজন বললে, তার কোনো এক বন্ধু আলমোড়া থেকে পায়ে হেঁটে হিমারণ্যের বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে ওই পথে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাবার জন্যে বেরিয়েছিল, সে ফিরে এল না। এখন ওইখানে কোনো জায়গায় থাকে, সাধুসন্ন্যাসীর জীবন যাপন করে। হিমালয়ের নেশা তাকে ঘরছাড়া করেচে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা একটি ক্ষুদ্র গোঁড় বস্তিতে পৌঁছলুম। আমাদের থাকবার উপযুক্ত ঘর নেই সেখানে, ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর, তাদেরই জায়গা কুলোয় না। অবশেষে একটা গোয়াল ঘরে আমাদের জায়গা করে দিলে। কিছুক্ষণ পরে বস্তির লোকজন আমাদের ঘিরে গল্প-গুজব করতে এল।

একজন বললে—তোরা ভাল্লুকের ছানা কিনবি?

আমরা দেখতে চাইলুম! তারা দুটি ছোট লোম-ঝাঁকড়া বিলিতি কুকুরের ছানার মতো জীব নিয়ে এল। মাত্র দু মাস করে তাদের বয়েস, এই বয়সেই বড় কুকুরের মতো গায়ে গক্তি। ওরা বললে, একটা বাঘের বাচ্চাও ছিল, কিছুদিন আগে ডোঙ্গরগড় থেকে এক সাহেব শিকারী এসেছিল, তার কাছে ওরা সেটা বিক্রী করেচে।

আমরা ভালুকের ছানা কিনিনি, বনের মধ্যে কোথায় কি খাওয়াবো, দলের অনেকেই আপত্তি করলে।

বস্তিটাতে ঘর-দশেক লোক বাস করে। আমরা বললুম—তোমরা জিনিসপত্র কেনো কোথা থেকে?

ওরা বললে—এখানে আমরা ভুট্টা আর দেধানার চাষ করি। নুন কিনে আনি শুধু অমর-কণ্টকের বাজার থেকে। তীরধনুক আছে, পাখী আর হরিণ শিকার করি। অমর-কণ্টকের মেলার সময় হরিণের চামড়া, ভালুকের ছানা, পাখীর পালক ইত্যাদি বিক্রী করি যাত্রীদের কাছে। তা থেকে কাপড় কিনে আনি।

বেশ সহজ ও সরল জীবনযাত্রা। তবে এরা বড় অলস। জীবনযাত্রার অনাড়ম্বর সরলতাই এদের অলস ও শ্রমবিমুখ করে তুলেচে। পয়সা দিতে চাইলেও কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এরা সহজে করতে রাজী হয় না। পয়সা রোজগার করবার বিশেষ

ঝোঁক নেই। বিনা আয়াসে যদি আসে তো ভালো, নতুবা কষ্ট করে কে আবার পয়সা উপার্জ্জন করতে যায়! সবগুলি বন্য গ্রামেই এই অবস্থা।

কতবার বলে দেখেচি—একবোঝা কাঠ ভেঙে এনে দে না, পয়সা দেবো।

ওরা সোজা জবাব দিয়ে বসে—আমাদের দিয়ে হবে না বাবু, আমরা পারবো না।

—পয়সা পাবি, দে না।

—কি হবে পয়সা বাবু। পারবো না আমরা।

অথচ পয়সা-কড়ি বিষয়ে এরা যে উদাসীন ও সরল, তা আদৌ নয়। সুবিধা পেলে বিদেশীকে ফাঁকি দিতে বা ঠকিয়ে জিনিস বিক্রী করতে ওস্তাদ। আসল কথা, খেটে পয়সা রোজগার করা ওদের ধাতে সয় না।

বেলা আটটার সময় ঘুম ভেঙে উঠে কানে শালপাতার পিকা বা বিড়ি গুঁজে, নিকটবর্ত্তী কোনো জলাশয়ের ধারে সারাদিন বসে হয়তো মাছ ধরছে। মেয়েরা বাড়ি থেকে খাবার দিয়ে এল, লোকটি চুপ করে ঠায় জলের ধারে অর্জ্জুন গাছের ছায়ায় বসেই আছে। এক জায়গায় এতক্ষণ বসে থাকতেও পারে! দারকেশাতে এ দৃশ্য কতবার দেখেচি।

আর একটা জিনিস, এদের সময়ের জ্ঞান নেই অনেকেরই।

—বয়স কত?

—কি জানি বাবু।

—তবুও আন্দাজ?

—বিশ-পঁচাশ হবে।

হয়তো উত্তরদাতার বয়েস যাট পেরিয়েচে, তবুও তার কাছে বিশও যা পঞ্চাশও তাই। কতদিন আগে একটা ব্যাপার ঘটেছিল তার সঠিক ধারণা এদের একেবারেই থাকে না, অনেককে জিজ্ঞেস করে দেখেচি। সময়ের মাপজোপ, সভ্যসমাজেই প্রয়োজন, সভ্যতার সংস্পর্শে যারা আসেনি তাদের সময়-সমুদ্রের উর্ম্মিমালা গণনার প্রয়োজন কি।

আমরা দামুণ্ডি বলে একটা গ্রামে পেঁছে দুদিন বিশ্রাম করলুম। এখান থেকে রেলওয়ে স্টেশন মাত্র ন-মাইল। অমর-কণ্টকের যাত্রীরা এখান থেকে হেঁটে অমর-কণ্টক চলে যাবে, আমি স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠবো। দামুণ্ডি পেঁছবার পূর্ব্বে আমরা যে গ্রাম থেকে রওনা হই, তার অধিবাসীরা আমাদের বারণ করেছিল—বাবু-সাহেব, ওপথে যাবেন না, বড় বাঘের ভয়, তিন-চারজন মানুষকে বাঘে নিয়েচে, গোরু-বাছুর তো রোজই নেয় বস্তি থেকে।

আমরা খুব সতর্ক হয়ে পথে হাঁটতুম, অথচ এই পথে বন খুব কম, মোরুম ছড়ানো ডাঙ্গাই প্রায় সবটা, মাঝে মাঝে ছোট ছোট বন আর পাহাড়। এই ছোট বনের মধ্যেই নাকি বাঘে মানুষ নিয়েচে!

এই সব বন্যগ্রামে বাঘের উৎপাত খুব বেশি।

একজন বৃদ্ধ বললে—এমন গ্রাম নেই, যেখান থেকে বছরে দু-চারটে গোরু-বাছুর না নেয়, মানুষও নেয় মাঝে মাঝে।

—বাঘ ছাড়া আর কি জানোয়ারের উৎপাত আছে?

—বাঘের পরেই বুনো মহিষের উপদ্রব। ফসল বড় নষ্ট করে দেয় এরা।

—তোমরা কি কর তখন?

—আমরা আগুন জ্বালি, টিন বাজাই—সারা রাত জাগতে হয় ক্ষেতের মধ্যে মাচা বেঁধে।

—বাঘ মারো না?

—বাবু, সবাই শিকারী নয় তো, বাঘ শিকার করা সহজ নয়। যখন বড্ড উৎপাত হয়, তখন অন্য জায়গা থেকে শিকারী ডেকে আনতে হয়।

—তীরধনুক দিয়ে বাঘ শিকার করে?

—চিরকাল তাই হয়ে এসেচে, যখন কিছুতেই না পারা যায়, তখন বন্দুকওয়ালা সাহেব শিকারীকে আনাতে হয়। তাও একবার এমনি হল, সাহেব শিকার করতে গিয়ে বাঘের হাতে জখম হল, শহরের দাওয়াইখানায় নিয়ে যেতে যেতে পথেই মারা পড়লো।

—বড় সাপ দেখেচ কখনো? আছে এ বনে?

—বড় ময়াল সাপ আছে, তবে তাদের বড় একটা দেখা যায় না, পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের খোড়লে লুকিয়ে থাকে। একবার আমি একটা দেখেছিলুম। অনেক-দিন আগের কথা, তখন আমার জোয়ান বয়স, পাহাড়ের ধারে ছাগল চরাতে গিয়েচি এমন সময় একটা ছাগল হঠাৎ ব্যা ব্যা করে ডাকতে লাগলো কোন্ দিক থেকে! অনেক ছাগল এদিকে-ওদিকে মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েচে, প্রথমটা তো বুঝতে পারিনি কোথা থেকে ডাক আসচে—

—তারপর?

—তারপর দেখি এক জায়গায় একটা বাবলা গাছ আছে, তার তলায় সামান্য একটু জায়গায় লম্বা ঘাসের বন, সে বনটার মধ্যে থেকে ছাগলের ডাক আসচে। ব্যাপার কি দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি এক ভীষণ অজগর সাপ ছাগলটার পেছন দিকের দুখানা ঠ্যাং একেবারে গিলে ফেলেচে। বাবলা গাছের গুঁড়িতে সাপটা জড়িয়ে ছিল, একবার একটু একটু করে পাক খুলচে। তখন আমি ছাগলের সামনের পা ধরে টানাটানি আরম্ভ করতেই সাপটা আর পাক না খুলে গাছের গুঁড়ি এমন জড়িয়ে এঁটে ধরলে যে আমি জোর করেও ছাগলকে ছাড়িয়ে নিতে পারিনে। ময়াল সাপের গায়ে ভীষণ জোর। তখন গ্রাম থেকে লোক ডেকে নিয়ে গিয়ে সাপটা মেরে ফেলি।

দামুণ্ডি ছাড়িয়ে মাইল দশেক হেঁটে আমি অমর-কণ্টক রোড স্টেশনে এসে ট্রেন ধরে কলকাতায় ফিরলুম।

১৯৩৩ সালে খবরের কাগজে বার হল যে উড়িষ্যার অন্তর্গত সম্বলপুর জেলার বিক্রমখোল নামক স্থানে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটা পাহাড়ের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েচে। অনেক লোক দেখতে যাচ্চে এবং স্থানীয় পুলিসে লোকজন যাবার অনেক সুবিধে করে দিয়েচে। এ-কথাও কাগজে বেরিয়েছিল, স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর এবং হরিণ, বনমোরগ, সম্বর প্রভৃতি বন্যজন্তু যথেষ্ট পাওয়া যায়। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস তখন 'বঙ্গশ্রী'র সম্পাদক। সজনীবাবু আমাকে 'বঙ্গশ্রী'র তরফ থেকে বিক্রমখোল পাঠাতে সম্মত হলেন—সঙ্গে যাবেন 'বঙ্গশ্রী'র তৎকালীন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণকুমার রায় ও ফটোগ্রাফার হিসাবে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত নীরদরঞ্জন দাসগুপ্তের মধ্যম ভ্রাতা প্রমোদরঞ্জনও আমাদের সহযাত্রী হবেন ঠিক হল।

৩রা মার্চ্চ শুক্রবার আমরা স্টেশন থেকে নাগপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হবো ধার্য্য ছিল। এদিন বেলা তিনটের সময় আমি 'বঙ্গশ্রী' আপিসে গিয়ে কিরণ ও পরিমল-বাবুকে তাগাদা দিলাম। পরিমলবাবু ক্যামেরা ও জিনিসপত্র নিয়ে সেখানে আমার অপেক্ষাতেই বসে ছিলেন। আমি বললুম—আপনারা রওনা হয়ে যাবেন সাতটার সময়ে, হাওড়া স্টেশনে বি, এন, আর-এর ইণ্টার ক্লাস টিকিটঘরের সামনে দাঁড়িয়ে

থাকবেন, যতক্ষণ আমি না যাই।

প্রমোদবাবুকেও ফোন করে সে কথা জানানো হল। বনজঙ্গলের পথে কয় বন্ধুতে মিলে একসঙ্গে যাবো, মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও আনন্দ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখি শুধু কিরণবাবু দাঁড়িয়ে আছেন টিকিটঘরের সামনে। ট্রেন ছাড়তে মিনিট কুড়ি মাত্র বাকি—আমাদের দুজনেরই মন দমে গেল। বন্ধুরা সব একসঙ্গে গেলে যে আনন্দ হবার কথা, দুজনে মাত্র গেলে সে আনন্দ পাওয়া যাবে না। অনেকবার এ-রকম হয়েচে, যারা যারা যাবে বলেচে কোথাও, শেষ পর্য্যন্ত তাদের অধিকাংশই আসেনি।

কিরণবাবু বললেন—টিকিট করে চলুন আমরা আগে গিয়ে জায়গা দখল করি।

নাগপুর প্যাসেঞ্জারে বেজায় ভিড়, আমরা সবাই তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, সুতরাং কথাটার মধ্যে যুক্তি ছিল।

গাড়িতে উঠে আমরা বেপরোয়া ভাবে চারজনের জন্যে চারখানা বেঞ্চিতে বিছানার চাদর, গায়ের কাপড় ইত্যাদি পেতে জায়গা দখল করলুম। তারপর কিরণবাবুকে পাঠিয়ে দিলুম বাকি দুজনের খোঁজে।

গাড়ি ছাড়বার মিনিট দশেক আগে ছুটতে ছুটতে সবাই এসে হাজির। পরিমল-বাবু শেষ মুহূর্ত্তে তার ক্যামেরার জন্যে কি একটা জিনিস কিনতে গিয়েছিলেন—তাই দেরি হল।

একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী বলে গেল—এ গাড়ি সিনি জংশন হয়ে যাবে।

আমরা বললুম—মশাই, বেলপাহাড় যাবে তো?

বেলপাহাড় বহুদূরের স্টেশন। লোকটি খোঁজ রাখে না, নামও শোনেনি। বললে—সে কতদূরে বলুন তো? বিলাসপুরের এদিকে?

—অনেক এদিকে, ঝার্সাগুডার পরে।

—নির্ভাবনায় যান—এ লাইন খারাপ হয়েচে তার অনেক আগে। চক্রধরপুরে গিয়ে আবার মেন লাইনে উঠবেন।

ট্রেন ছাড়লো। আমাদের ঘুম নেই উৎসাহে পড়ে। অনেক রাত পর্য্যন্ত সবাই মিলে বক্‌বক্‌ করচি। রাতে সাড়ে বারোটায় ট্রেন খড়্গপুরে এলে আমরা চা খেলুম। খড়্গপুরের লম্বা প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারি করে বেড়ালুম।

চমৎকার জ্যোৎস্না। শুক্লা ত্রয়োদশী তিথি। সামনে আসচে পূর্ণিমা।

খড়্গপুর ছাড়িয়ে জমির প্রকৃতি একেবারে বদলে গেল। রাঙা মাটি, উঁচুনীচু পাথুরে জমি, বড় বড় প্রান্তর—জ্যোৎস্নারাত্রে সে সব জায়গা দেখাচ্চে যেন ভিন্ন কোনো রহস্যময় জগৎ, আমাদের বহুদিনের পরিচিত পৃথিবী যেন এ নয়। যেন কোন্ অজানা গ্রহলোকে এসে পড়েচি—যেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে নব নব সৌন্দর্য্যের সম্ভার চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবার সম্ভাবনা।

এ পথে আমার সঙ্গীরা কেউ কোনোদিন আসেনি। বিশেষ করে প্রমোদ ও পরিমল দুজনেই প্রকৃতিরসিক, তারা ঘুমোবার নামটি করে না। আমিও এ পথে একবার মাত্র এসেচি, তাও অন্ধকার রাত্রে, পথের বিশেষ কিছুই দেখিনি—সুতরাং আমিও জেগে বসে আছি।

সর্ডিহা ছাড়িয়ে রেললাইনের দুধারে নিবিড় শালবন, বসন্তে শিমুল ফুল ফুটে আছে শালবনের মাঝে মাঝে—যদিও রাত্রে কিছু বোঝা যায় না, গাছটা শিমুল বলে চেনা যায় এই পর্য্যন্ত।

গিডনি ছাড়িয়ে গেলে আমি বললুম—এইবার সব ঘুমিয়ে নাও—রাত একটা

বেজে গিয়েচে—কাল পরশু কোথায় খাবো, কোথায় ঘুমুবো কিছুই ঠিক নেই। পথে বেরুলে শরীরটাকে আগে ঠিক রাখতে হবে।

সারারাত্রি ট্রেন চললো। আমরা সবাই শুয়ে পড়লুম—কখন যে ঘুম এসেচে, আর কিছুই জানি না। ফিরিওয়ালার চীৎকারে ঘুম ভেঙে দেখি ভোর হয়ে গিয়েচে। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে—আর সামনের রাস্তা দিয়ে লম্বা মোটরের সারি ক্রমাগত স্টেশনের দিকে আসচে।

তার আগে কখনো টাটানগর দেখিনি—এ বনজঙ্গলের দেশে এত মোটর গাড়ির ভিড় যখন, এ টাটানগর না হয়ে যায় না। আমার নিদ্রিত সঙ্গীদের ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি হাঁক দিয়ে বললাম—ও প্রমোদবাবু, ও কিরণ—ঘুমুতেই এসেচ কি শুধু পয়সা খরচ করে? উঠে টাটানগর দেখ—টাটানগর এসেচে—

পরিমল উঠে চোখ মুছতে মুছতে বললে—কি স্টেশন এটা?

—টাটানগর।

—চা পাওয়া যাচ্চে তো?

—অভাব কি। ওদের সব ঘুম ভাঙিয়ে দাও—চা ডাকি।

প্রমোদবাবু প্ল্যাটফর্ম্মে নেমে বললে—আরে এ টাটানগর কোথায়! লেখা আছে সিনি জংশন।

আমরা সবাই অবাক, এ কি, এত বড় জায়গা—এত মোটরের ভিড় সিনি জংশনে! কখনও তো নামও শুনিনি।

দু-চারজন লোককে ডেকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এত মোটরের ভিড়ের কারণ, সেরাইকেলার রাজার ছেলের বিয়ে—সিনি জংশন থেকে সেরাইকেলা মাইল পনেরো-কুড়ি পথ—এসব মোটর বরযাত্রী নিয়ে আসচে সেরাইকেলা থেকে।

আমরা চা খেয়ে ট্রেনে উঠে বসলুম। ট্রেন ছেড়ে দিল।

আমার বন্ধুরা সব জানালার কাছে বসেচে। প্রমোদবাবু কেবল চেঁচিয়ে বলেন—ও বিভূতিবাবু, এমন চমৎকার একটা পাহাড় গেল দেখতে পেলেন না।

ওদিকে কিরণ চেঁচিয়ে ওঠে—কি সুন্দর নদী একটা! দেখুন দেখুন—এই জানলায় আসুন—চট্ করে—

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা স্টেশন থেকে মনোহরপুর পর্য্যন্ত দু ধারের অরণ্যপর্ব্বতের দৃশ্য অতুলনীয়। গৈলকেরা স্টেশনে এসে পাহাড় জঙ্গলের দৃশ্য দেখে প্রমোদবাবু তো একেবারে নির্ব্বাক! পরিমলবাবু স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্ম থেকে সামনের পাহাড়ের একটা ফটো তুলে নিলেন। তারপর রেলপথের দুধারেই অপূর্ব্ব দৃশ্য—জানালা থেকে চোখ ফেরাতে পারিনে। গৈলকেরা স্টেশনে বড় বড় পেঁপে গোটাকতক কেনা হয়েছিল—কিরণ সেগুলো ছাড়িয়ে ভালো করে কেটে দিলে।

বসন্ত কাল, বনে বনে রক্তপলাশের সমারোহ, সারেঙ্গ টানেলের মুখে ধাতুপ ফুলের বন, শালবনে কচি সবুজপত্রের সম্ভার, প্রচুর সূর্য্যালোক, বনের মাথার ওপরে নীল আকাশ, মাঝে মাঝে বনের মধ্যে পার্ব্বত্য নদী শীর্ণধারায় সর্পিল গতিতে বয়ে চলেচে, কোথাও একটা বড় নির্জ্জন পথ রেললাইনের দিক থেকে গভীর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কোথাও প্রকাণ্ড কোয়ার্ত্তজ পাথরের পাহাড়টা বনের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, কোথাও একটা অদ্ভুতদর্শন বিশাল শিলাখণ্ড বনের মধ্যে পড়ে আছে—প্রমোদবাবু আর কিরণের খুশি দেখে কে! পরিমল বেচারী তো ফটো নেবার জন্যে ছট্‌ফট্ করচে, আর কেবল মুখে বলচে, ওঃ, এইখানে যদি ট্রেনটা একটু দাঁড়াতো! ওখানে যদি ট্রেনটা একটু দাঁড়াতো!

বেলা দুটোর সময় ঝার্সাগুড়া স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ালো! এখানে আমরা চা খেয়ে নিলুম। প্রমোদবাবু টাইমটেবল দেখে বললেন—বিছানা বেঁধে ফেলুন সবাই, আর দুটো স্টেশন পরেই বেলপাহাড়। ওখানেই নামতে হবে।

ইব বলে একটা ছোট স্টেশন ঘন বনের মধ্যে।

স্থানটার বড় চমৎকার শোভা। স্টেশনের কাছেই একটা নদী, তার দুপারে ঘন বন, বনের মধ্যে রাঙা ধাতুপ ফুলের মেলা।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল নদীর নাম ব্রাহ্মণী বা বামনী।

বেলপাহাড় স্টেশনে নামবার আগে দেখি ছোট্ট স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে অনেকগুলি লোক সারবন্দী হয়ে কাদের অভ্যর্থনা করে নেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যেতেই তারা আমাদের কাছে ছুটে এল—উড়িয়া ভাষায় বললে—বাবুরা কলকাতা থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ। তোমরা কাকে খুঁজচো?

—সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাদের পাঠিয়ে দিয়েচেন। আপনাদের আসবার কথা ছিল, আপনাদের সব বন্দোবস্তের ভার নেবার পরোয়ানা দিয়েচেন আমাদের ওপর।

প্রমোদবাবুর দাদা বন্ধুবর নীরদবাবুর সঙ্গে সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনাপতির আলাপ ছিল, সেই সূত্রে নীরদবাবুকে দিয়ে একখানা চিঠি লিখিয়ে এনেছিলুম, আমি ও প্রমোদবাবু কয়েকদিন পূর্ব্বে। চিঠির মধ্যে অনুরোধ ছিল যেন গ্রাম্য পুলিস আমাদের গন্তব্য স্থানে যাবার একটু ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু সে ব্যবস্থা যে এভাবে অভ্যর্থনায় পরিণত হবে তা আমরা ভাবিনি।

বেলপাহাড় স্টেশন থেকে কিছুদূরে ডাকবাংলোয় তারা নিয়ে গিয়ে তুললে। একটু দূরে একটা বড় পুকুর, আমরা সকলে পুকুরের জলে নেমে স্নান করে সারা-দিন রেলভ্রমণের পরে যেন নতুন জীবন পেলাম। পুকুরের পাড়ে পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের অনুকরণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির।

স্থানটি চতুর্দ্দিকে পাহাড়ে ঘেরা—অবিশ্যি পাহাড়শ্রেণী দূরে দূরে।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ডাকবাংলোয় আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেচে। স্নান করে এসে আমরা আহারে বসে গেলুম, শালপাতায় আলোচালের ভাত আর কাঁচা শাল-পাতার বাটিতে ডাল। পাচক ব্রাহ্মণটি যেন সাত্ত্বিকতার প্রতিমূর্ত্তি, শান্ত নম্রস্বভাব—আমাদের ভয়েই যেন সে জড়সড়। সঙ্কোচের সঙ্গে ভয়ে ভয়ে আমাদের পরিবেশন করছিল—যেন তার এতটুকু ত্রুটি দেখলে আমরা তাকে জেলে পাঠাবো। ডেপুটি কমিশনারের বন্ধু আমরা—বলা তো যায় না। তারপর জিজ্ঞেস করে জানা গেল ব্রাহ্মণ পুকুরপাড়ের সেই মন্দিরের পূজারী।

বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙা মাটির টিলার গায়ে। কি ঘন শালবন, দূরে দূরে নির্জ্জন পর্ব্বতমালা।

ডাকবাংলো থেকে অল্পদূরে একটি গ্রাম্য হাট বসেচে। আমরা হাটে বেড়াতে গেলুম। উড়িয়া মেয়েরা হাট থেকে ঝুড়ি মাথায় বাড়ি ফিরচে। আমরা হাট বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখলুম। পরিমল কয়েকটি ফটো নিলে। বেগুন, রেঁড়ির বীজ, কুচো শুঁটকি চিংড়ি, কুমড়ো প্রভৃতি বিক্রি হচ্চে। এক দোকানে একটি উড়িয়া যুবতী ধান দিয়ে মুড়কি কিনচে।

সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় চেয়ার পেতে বসলুম। পাচক ব্রাহ্মণটি এসে বিনীত ভাবে উড়িয়া ভাষায় জিজ্ঞেস করলে, রাত্রে আমরা কি

খাবো। আমাদের এত আনন্দ হয়েচে যে, কত রাত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নালোকে বসে আমরা গল্প করলুম। রাত দশটার সময় আহারাদি শেষ হয়ে গেল—কিন্তু ঘুম আর আসে না কারো চোখে।

পরদিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হই। আমাদের সংগে রইল গ্রাম্য পাটোয়ারী ও দুজন ফরেস্ট গার্ড—একখানা গোরুর গাড়িতে আমাদের জিনিসপত্র চললো, কিন্তু আমরা পায়ে হেঁটে যাওয়াই পছন্দ করলুম। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলুম বিক্রমখোল এখান থেকে প্রায় তেরো মাইল।

বেলপাহাড় থেকে বিক্রমখোল পর্য্যন্ত এই পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার মনে চিরকালের ছবি এঁকে রেখে দিয়েচে। কতবার অবকাশমুহূর্তে স্বপ্নের মতো মনে হয় সেই নদী-পর্ব্বত-অরণ্য-সমাকুল নির্জ্জন বন্যপথটির স্মৃতি। প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশবনের শোভা ও রাঙা ধাতুপ ফুলের সমারোহ সারাপথে, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদীর খাত বেয়ে ঝিরঝির করে জল চলেচে পাথরের নুড়ির রাশির ওপর দিয়ে।

এক জায়গায় বড় বড় গাছের ছায়া। সামনে একটি পাহাড়ী নদীর কাঠের পুলের ওপর ঘাসের চাপড়া বিছিয়ে দিচ্চে। ঝরনার দুধারে পাহাড়ী করবীর গাছ ফুলের ভারে জলের ওপর নুয়ে আছে। প্রমোদবাবু প্রস্তাব করলেন, এখানে একটু চা সেরে নেওয়া যাক বসে।

কিরণ বললে—চা খাওয়ার উপযুক্ত জায়গা বটে। বসুন সবাই।

আমাদের সংগে ফ্ল্যাস্কে চা ছিল, আর ছিল মার্ম্মালেড আর পাঁউরুটি। মার্ম্মালেডের টিনটা এই প্রথম খোলা হল। প্রমোদ ও পরিমল রুটি কেটে বেশ করে মার্ম্মালেড মাখিয়ে সকলকে দিলে—কিরণ চা দিল সবাইকে টিনের কাপে।

কিছুক্ষণ পরে কিরণ রুটি মুখে দিয়ে বললে—এত তেতো কেন? এঃ--

আমিও রুটি মুখে দিয়ে সেই কথাই বললুম। ব্যাপার কি? শেষে দেখা গেল মার্ম্মালেডটাই তেতো। মার্ম্মালেড নাকি তেতো হয়, পরিমল বললে। কি জানি বাপু, চিরকাল পড়ে এসেচি মার্ম্মালেড মানে মোরব্বা, সে যে আবার তেতো জিনিস —তা কি করে জানা যাবে?

এ নাকি সেভিলের তেতো কমলালেবুর খোসায় তৈরী মার্ম্মালেড, টিনের গায়ে লেখা আছে।

পরিমল এটা কিনে এনেছিল—তার ওপর সবাই খাপ্পা। কেন বাপু কিনতে গেলে সেভিলের তেতো কমলালেবুর মার্ম্মালেড। বাজারে জ্যাম জেলি ছিল না?

হাঁটতে হাঁটতে রৌদ্র চড়ে গেল দিব্যি। বেলা প্রায় এগারোটা — পথের নব নব রূপের মোহে পথ হাঁটার কষ্টটা আর মনে হচ্ছিল না। এ যেন জনহীন অরণ্যভূমির মধ্যে দিয়ে চলেচি—এতটা পথ চলে এলুম, কোথাও একটা চষা ক্ষেত চোখে পড়লো না। শুধু পাহাড় আর বন, বন আর পাহাড়।

এক জায়গায় পাহাড় একেবারে পথের গা ঘেঁষে অনেক দূর চলেচে। পাহাড়ের ছায়া আগাগোড়া পথটাতে। আমাদের বাঁদিকে জমি ক্রমশ ঢালু হয়ে একটা নদীর খাতে গিয়ে মিশলো। সমস্ত ঢালুটায় বন্য-করবী ফুলের বন। পাহাড়ের ওপর বাঁশবন এদেশে এই প্রথম দেখলুম। বন্যবাঁশ আমি চন্দ্রনাথ ও আরাকান-ইয়োমার পাহাড়শ্রেণী ছাড়া ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখিনি। উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের আর্দ্রতা শূন্য আবহাওয়ায় এই বন্যবাঁশ সাধারণত জন্মায় না। বাঁশ যেখানে আছে, তা মানুষের সযত্নরোপিত।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমরা গ্রিণ্ডোলা বলে একটি গ্রামে পৌঁছলুম। এই গ্রাম আমাদের গন্তব্যস্থান থেকে মাত্র দু মাইল এদিকে, এখানেই আমরা দুপুরে খাবো-দাবো।

গ্রামে ঢুকবার আগে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য ; ঢুকবার পথের দুধারে সারবন্দী লোক দাঁড়িয়ে কাদের অপেক্ষা করচে যেন—অনেক দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলুম।

প্রমোদবাবু বললেন—ওখানে অত লোক কিসের হে?

পরিমল বললে—আমি একটা ফটো নেবো।

আমরা কাছে যেতেই তারা আমাদের একযোগে পুলিস প্যারেডের মতো সেলাম করলে। ওদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে বললে—আমার নাম বিম্বাধর, আমি এই গ্রামের গ্রামীণ। ডেপুটি কমিশনার সাহেব পরোয়ানা পাঠিয়েচেন কাল আমার ওপর, আপনাদের বিক্রমখোল দেখবার বন্দোবস্ত করতে। সব করে রেখেচি—আসুন বাবুসাহেবরা।

কিরণ বললে—ব্যাপার কি হে?

পরিমল বললে—রাজশক্তি পেছনে থাকলেই অমনি হয়, এমনি আমরা ট্যাং ট্যাং করে এলে কেউ কি পুঁছত? এ ডেপুটি কমিশনারের পরোয়ানা—

আমি বললুম—টুঁ করবার জো-টি নেই।

গ্রামের মাঝখানে মণ্ডপঘর। সেখানে আমাদের নিয়ে গিয়ে সবাই তুললে। রথ-যাত্রার ভিড় লেগেচে সেখানে, গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে জড় হয়েছে কলকাতা থেকে মহাপ্রতাপশালী বাবুরা আসচেন শুনে। ডেপুটি কমিশনার স্বয়ং যাদের নামে পরোয়ানা পাঠান—তাদের একবার চোখে দেখে আসাই যাক!

বেলপাহাড়ের পাটোয়ারী ইতিমধ্যে জাহির করে দিয়েচে—বাবুরা সাধারণ লোক নয়! গবর্নমেণ্টের খাসদপ্তরের অফিসার সব। ভাইসব, হুঁশিয়ার।

বিম্বাধর আমাদের জন্যে এক ধামা ওকুড়া অর্থাৎ মুড়কি আর এক কড়া ভর্ত্তি গরম দুধ নিয়ে এল। পরামর্শ করে স্থির হল আমরা একটু বিশ্রাম করে নিয়ে এখনি বিক্রমখোল যাবো। সঙ্গে চারজন ফরেস্ট গার্ড এবং বিম্বাধর থাকবে। জঙ্গল বড় ঘন, বাঘ ভালুকের ভয়—বেলাবেলি সেখান থেকে ফিরতে হবে দেখে শুনে। এসে স্নানাহার করা যাবে—নতুবা এখন স্নানাহার করতে গেলে বেলা একেবারে পড়ে যাবে, সে সময় অত বড় জঙ্গলে ঢোকা যুক্তিযুক্ত হবে না।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলুম।

গ্রিণ্ডোলা ছাড়িয়ে মাইল দুই গিয়েই গভীর অরণ্যভূমি—লোকজনের বসতি নেই, শুধু বন্যবাঁশ আর শাল-পলাশের বন। প্রকাণ্ড বড় বড় লতা গাছের ডালে জড়াজড়ি করে আছে—গাছের ছায়ায় সবুজ বনটিয়ার ঝাঁক ; হরীতকী গাছের তলায় ইতস্তত শুকনো হরীতকী ছড়িয়ে পড়ে আছে—কোথাও আমলকি গাছে যথেষ্ট আমলকি ফলে আছে। পূর্ব্বে যে শুভ্রকাণ্ড বৃক্ষকে শিববৃক্ষ বলে উল্লেখ করেচি, এ বনে তার সংখ্যা খুব বেশি। এত শিব-বৃক্ষের ভিড় আমি আর কোথাও দেখিনি।

এই বনে আর একটি পুষ্পবৃক্ষ দেখলুম—পরে অবিশ্যি সিংভূম অঞ্চলের পার্ব্বত্য অরণ্যে এই জাতীয় গাছ আরও দেখেচি। গাছটার ফুল অবিকল কাঞ্চন ফুলের মতো, গাছটাও দেখতে সেই ধরনের। বনের মধ্যে যেখানে সেখানে এই বৃক্ষ অজস্র পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে।

বনের মধ্যে মাইল দুই-তিন হাঁটবার পরে পথ ক্রমে উঁচু দিকে উঠতে লাগলো—এক জায়গায় গিয়ে পথটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। আমরা যেন একটা পাহাড়ের ওপর

থেকে অনেক নীচু উপত্যকার দিকে চেয়ে দেখচি। আমাদের ওই উপত্যকার মধ্যে নামতে হবে সরু পথ বেয়ে, কোনো কোনো জায়গায় পাহাড়ের ফাটল থেকে বেরুনো শেকড় ধরে।

বিম্বাধর আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বললে—পুলিসে জঙ্গল কেটে রাস্তা পরিস্কার করে দিয়েচে। নামতে তত অসুবিধে হবে না বাবু।

সবাই মিলে পাহাড়ের গা ধরে সন্তর্পণে অনেকটা নীচে নামলুম, আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে।

তারপর অপর দিকে চেয়ে দেখা গেল অনাবৃত পর্ব্বতগাত্রে লম্বালম্বি ভাবে খোদাই করা কতগুলি অজ্ঞাত অক্ষর বা ছবি। পরিমল বিভিন্ন দিক থেকে শিলালিপির ফটো নিলে, অক্ষরগুলির অবিকল প্রতিলিপিও এঁকে নিলে। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব্ব। আমাদের আরও নীচে উপত্যকার মেজে। যে পাথরের গায়ে শিলালিপি উৎকীর্ণ, তাকে পাহাড় না বলে একটা মালভূমির অনাবৃত শিলাগাত্র বলাই সঙ্গত। নিম্নের উপত্যকা নানাজাতীয় বন্যবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন, তার মধ্যে কাঞ্চন ফুলগাছের মতো সেই গাছও যথেষ্ট—ফুলে ভর্ত্তি হয়ে সেই নির্জ্জন পর্ব্বতারণ্যের শোভা ও গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করচে।

উপত্যকার ওদিকে আবার মালভূমির দেওয়াল খাড়া প্রাচীরের মতো উঠে গিয়েচে, সেদিকটাতেও ঘন জঙ্গল। এমন একটি জনহীন ঘন অরণ্যভূমির দৃশ্য কল্পনায় বড় একটা আনা যায় না, একবার দেখলে তারপর তার বন্য বাঁশ ঝোপের ছায়ায় বিচরণকারী মৃগযূথের ছবি মানসসচক্ষে দর্শন করা কঠিন হয় না অবিশ্যি।

বেলা পড়ে আসচে। সমগ্র উপত্যকাভূমির অরণ্য ছায়াবৃত হয়ে এসেচে। রৌদ্রতপ্ত বাতাসে শালমঞ্জরীর সুগন্ধ।

বিম্বাধর বললে—এবার চলুন বাবুরা, আর এখানে থাকা ঠিক হবে না। অনেকটা যে ফিরতে হবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আমরা সে স্থান ত্যাগ করবার পূর্ব্বে পরিমল আমাদের দলের একটা ফটো নিলে।

তারপর আবার পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠলুম সবাই। বনের মধ্যে দিয়ে জোর পায়ে হেঁটে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমরা গ্রিণ্ডোলা পৌঁছলুম।

বিম্বাধরের লোকজন আমাদের জন্যে রান্না করে রেখেছিল। ভাত ও পুরী দুই রকমই ছিল, যে যা খায়। আমরা নিকটবর্ত্তী একটা পুকুরে স্নান করে এসে খেতে বসলুম।

গ্রামের লোকের ভিড় পূর্ব্ববৎ। সবাই উঁকি-ঝুঁকি মেরে ভোজন-রত বাঙালী বাবুদের দেখচে। গ্রামের বালক-বৃদ্ধ-যুবা কেউ বোধ হয় বাকি নেই। চারিধারে উড়িয়া বুলি।

খাওয়া শেষ হল। একটি গ্রাম্য নাচের দল নাকি অনেকক্ষণ থেকে আমাদের নাচ দেখাবে বলে অপেক্ষা করচে। এখন যদি আমাদের অনুমতি হয় তো তারা আসে। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিলুম। গ্রামের মণ্ডপঘরের সামনে রাস্তার ওপরে নাচ আরম্ভ হল। ছোট ছোট ছেলেরা মেয়ে সেজে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচলে। প্রায় ঘণ্টাখানেক চললো নাচ।

বেলপাহাড়ের পাটোয়ারী বললে—আর বাবু দেরি করবেন না। বড্ড পাহাড়-জঙ্গলের পথে ফিরতে হবে। এই বেলা রওনা হওয়া উচিত।

সেদিন দশমী তিথি। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো সন্ধ্যার পরই। আমার মনে একটা

মতলব জাগলো। এই সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রে সামনের সেই পাহাড়জঙ্গলের পথে একা যাবো। নতুবা ঠিক উপভোগ করতে পারা যাবে না।

সন্ধ্যার পরেই সবাই রওনা হল। আমি বললুম—হেঁটে আমি এক পা-ও যেতে পারবো না, পায়ে ব্যথা হয়েচে। আমি গোরুর গাড়িতে যাবো।

কিরণ বললে—বুঝতে পেরেচি, মুখেই শুধু বাহাদুরি।

পরিমল বললে—বিভূতিদা'র সব মুখে। আমি ও অনেককাল থেকে জানি।

আমরা এবার রওনা হবো। জনৈক গৃহস্থ আমাদের সামনে এসে বিনীতভাবে জানালে আজ রাত্রে তার মেয়ের বিয়ে—আমরা যদি আজ এখানে থেকে যাই এবং বিবাহ-উৎসবে যোগ দিই—তবে বড় আনন্দের কারণ হবে।

অবিশ্যি থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওদের ভদ্রতা আমাদের মুগ্ধ করলে। আমরা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করে বিবাহ-উৎসবে আমাদের যোগ দেওয়ার অক্ষমতা জ্ঞাপন করলুম। সময়ের অভাব, আজ রাত্রেই আমাদের ফিরতে হবে কলকাতায়।

যাওয়ার সময় বিম্বাধর হঠাৎ হাত জোড় করে বললে—আমার একটা আর্জ্জি আছে বাবুদের কাছে—

--কি ?

—আমাকে একটা বন্দুকের লাইসেন্স করে দিতে হবে। হুজুরদের মেহেরবানি।

গ্রামসুদ্ধ লোক সেখানে উপস্থিত—সবাই আমাদের ঘিরে বিম্বাধরের আর্জ্জির ফলাফল জানবার জন্য আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রমোদবাবু বললে—ব্যাপার কি হে, বন্দুকের লাইসেন্স দেওয়া না দেওয়ায় আমাদের হাত কি তা তো বুঝলাম না। আমাদের ঠাউরেচে কি এরা ?

কিরণ বললে—গবর্নমেণ্টের চিফ সেক্রেটারী আর তার স্টাফ।

বিম্বাধরকে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারলুম না অতগুলো লোকের সামনে যে, আমাদের কোনো হাত নেই এ ব্যাপারে, গবর্নমেণ্টের ওপর আমাদের এতটুকু জোর নেই।

গম্ভীরভাবে বলতে হল—আমরা বিশেষ চেষ্টা করে দেখবো।

বৃদ্ধকে প্রতারণা করতে আমাদের খুবই কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের মানও তো বজায় রাখতে হবে!

প্রমোদ, পরিমল ও কিরণ হেঁটে রওনা হয়ে গেল। আমি একটু পরে গোরুর গাড়িতে রওনা হলুম। বিম্বাধর অনেকখানি রাস্তা আমার গোরুর গাড়ির পাশে পাশে এল। পথের পাশে শালবনে সেই নাচের দল রেঁধে খাচ্চে—শালপাতায় ভাত বেড়ে নিয়েচে, আর একটা অদ্ভুত গড়নের কাঁসার বাটিতে কি তরকারি।

বেশ জায়গায় বসে খাচ্চে ওরা। গ্রাম সেখানে শেষ হয়ে গিয়েচে, ডাইনে বনশ্রেণী, পেছনের শৈলমালা জ্যোৎস্নায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্চে। শালমঞ্জরীর গন্ধে-ভরা সান্ধ্য-বাতাস। ইচ্ছে হয় ওদের নাচের দলে যোগ দিয়ে এই সব জংলী গাঁয়ে ঘুরে বেড়াই।

গ্রাম ছাড়িয়ে চলেচি। বিম্বাধর ও তার দল বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমার দুধারে নির্জ্জন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো প্রান্তর, প্রান্তরের মাঝে মাঝে শালপলাশের বন। পথ কখনো নিচে নামচে কখনো ওপরে উঠচে। গাড়োয়ান নীরবে গাড়ি চালাচ্চে, দু-একবার কি বলেছিল কিন্তু তার দেহাতী উড়িয়া বুলি আমি কিছুই বুঝলুম না। অগত্যা সে চুপ করে আপন মনে গাড়ি চালিয়ে চলেচে।

সুতরাং এই জ্যোৎস্নালোকিত পাহাড়ে, অরণ্যে ও প্রান্তরে আমি যেন একা। জ্যোৎস্না ফুটলে শালবনের রূপ যেন বদলে গেল, পাহাড়শ্রেণী রহস্যময় হয়ে উঠলো। অনেকদিন কলকাতা শহরে বদ্ধ জীবন-যাপনের পরে এই রোদপোড়া মাটির ভরপুর

গন্ধ আমাকে আমার উত্তর-বিহারে যাপিত অরণ্যবাসের দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই রাত্রি, এই জ্যোৎস্নালোককে আরও মধুময় করে তুলেচে।

দুটো তারা উঠেচে বাঁদিকের পাহাড়শ্রেণীর মাথায়। বৃহস্পতি ও শুক্র। পার্ক সার্কাসে টুইশানি করতে যাবার সময় রোজ দেখতুম তারা দুটো বড় বড় বাড়ির মাথার উপর উঠচে। সেদিনও দেখে এসেচি। চোখ বুজে কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম কোথায় পার্ক সার্কাসের সেই তেতলা বাড়িটা, সেই ট্রাম লাইন, আর কোথায় এই মুক্ত প্রান্তর, জ্যোৎস্না-ওঠা-বনভূমি, ঝরনা, বাঁশবন, পাহাড়শ্রেণী! ... কোনো দিক কোনো শব্দ নেই। একা যেন আমি এই সৌন্দর্য্যলোকের অধিবাসী।

মন এ সব স্থানে অন্য রকম হয়ে যায়। প্রত্যেকের উচিত গভীর নির্জ্জন স্থানে মাঝে মাঝে বাস করা। মন অন্যরকম কথা কয় এই সব জায়গায়। মনের গভীরতম দেশে কি কথা লুকোনো আছে, তা বুঝতে হলে নির্জ্জনতার দরকার। ভারতবর্ষের রূপও যেন ভালো করে চেনা গেল আজ। বাংলার সমতলভূমিতে বাস করে আমরা ভারতের ভূমিশ্রীর প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি না। অথচ এই রাস্তা, মাটি, পাহাড় আর শালবন—এখান থেকে আরম্ভ করে সমগ্র মধ্য ভারতের এই রূপ।

খড়্গপুর ছাড়িয়েই আরম্ভ হয়েছে রাঙা মাটি, পাহাড় আর শালবন—এই চারশো মাইল বরাবর চলেচে : শুধু চারশো কেন, আটশো মাইল আরও চলেচে সহ্যাদ্রির অরণ্যানী ও ঘাটশ্রেণী পর্য্যন্ত।

ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি, মালাবার উপকূলে ট্রপিক্যাল অরণ্য। আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি পার হয়েই নগাধিরাজ হিমালয়—ভারতের আসল রূপই এই। বাংলা অন্য ধরনের দেশ—বাংলা শ্যামল, কমনীয়, ছায়াভরা : সেখানে সবই মৃদু, সুকুমার, গাছ-পালা থেকে নারী পর্য্যন্ত। এখানে প্রকৃতি যেন শিবমূর্ত্তি ধরেচে—কমনীয়তা নেই, লাবণ্য নেই—শুধু রুক্ষ, বিরাট, উদার। উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের বনের শিববৃক্ষ যেন এখানকার প্রকৃতির রূপের প্রতীক।

অনেক রাত্রে ডাকবাংলোয় পৌঁছলুম। বন্ধুরা তখনও কেউ আসেনি। একাই অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে দেখে এলুম।

—কে মেরেচে?

—রেলের এক সাহেব। দেখে এসো, প্লাটফর্ম্মে মরা হায়েনাটা এনে রেখেচে।

—তার চেয়ে ঠাকুরকে চা করতে বলা যাক, এসো চা খাওয়া যাক। মরা হায়েনা দেখে কি হবে।

সেই পূজারী ঠাকুর পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের ভাত বেড়ে দিলে।

এত রাত হওয়া সত্ত্বেও গ্রামের অনেকগুলি লোক ডাকবাংলোয় এসেছিল আমাদের বিদায় দিতে।

দূরে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ অস্ত গেল।

আমরা স্টেশনে চলে এলুম, রাত দুটোয় ট্রেন, শীত পড়েচে খুব।

পাটোয়ারী হাত জোড় করে বললে—বাবু, বিম্বাধরের আর্জ্জিটা মনে আছে তো? আমায় বার বার করে বলে দিয়েচে আপনাদের মনে করিয়ে দিতে। আপনারা বড়লোক, একটু বলে দিলেই গরিবের অনেক উপকার হয়।

কথাটা ঠিক, কিন্তু বলি কাকে?

হায় বিম্বাধর!

স্মৃতির রেখা

উৎসর্গ

'বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অমর আত্মার উদ্দেশ'

কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা-চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষরাতের আকাশের পেছনে, এই ফুলফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দর শান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছপালার বংশ তৈরী হ'ল, আবার চলে গেল—ঐ যে পায়রার দল উড়ছে, ঐ যে নারকেল গাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ঐ যে বন-মুলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি—দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ-হতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তার ঠিকানাও মিলবে না—আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলে আসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্না-রাত্রির মাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরোনো উজ্জয়িনীর কেশ-ধূপবাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোন বিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছু কম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতের অনাগত গ্রাম-বধূদের সুখদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে...আবার তারা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।

কিন্তু তুমি ঠিক আছ। হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্ত্তিত, অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব্বে থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী যখন আবার কোন দূর অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতে, যখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তরিত হয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমে ছোটাছুটি করবে, তখনও তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনা যায় না। অথচ মনে হয়, এই যেন বুঝলাম, এই যেন চিনলাম! শেষরাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলায় কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাতদুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ওরায়ন যখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূরে পশ্চিম আকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচণ্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া-গতির বেগে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে তখন মনে হয় তাদের যে সরল প্রাণের প্রাচুর্য্য—তার মধ্যে তুমি আছ।

তাই বলছিলাম যে, কাল শেষরাত্রে তোমাকে হঠাৎ দেখলাম। অন্ধকার প্রহরের শেষরাত্রের চাঁদ—তার পার্শ্ববর্ত্তী শুকতারার পেছনে। তোমায় প্রণাম করি—

আজ কলেজের কালভার্ট বেয়ে উঠছিলাম। বেলা পাঁচটা, ঠিক সন্ধ্যেটা হয়ে এসেছে, ছোট ছোট সেই অজানা রাঙা ফুলগাছগুলোর দিকে চেয়ে কেমন হঠাৎ আনন্দ এসে পৌঁছলো—নাথনগরের আমগাছগুলোর ওপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে, কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে সেদিকের আকাশটা—এই সামান্য জিনিসের আনন্দ, কচিমুখের অকারণ হাসি, রাঙা ফুলগাছটা, নীল আকাশের প্রথম তারা, ঐ যে পাখীটা বাঁকা ডালে বসে আছে, সুবসুদ্ধ মিলে এক এক সময় জীবনের কেমন গভীর আনন্দ এক এক মুহূর্ত্তে আসে।

মানুষ এই আনন্দ জানতে না পেরেই অসুখে, হিংসায়, স্বার্থদ্বন্দ্বে সুখ খুঁজতে

গিয়ে নিজেকে আরও অসুখী করে তোলে...আজ যে মার্টিন লুথারের জীবনী পড়ছিলাম, তাতে মনে হোল এক এক সময় এক-একজন ব্রাত্যমন নিয়ে পৃথিবীতে এসে শুধু যে নিজেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করে চলে যায় তা নয়, জড়মনকেও বন্ধন মুক্ত করে দেবার সাহায্য করে। যেমন সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার এক মুহূর্ত্তের একটা দেশলাইয়ের কাঠির আলোতেই চলে যায়—তেমনি।

কাউকে ঘৃণা করলে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ নীচমনা তাদের আমরা যেন ঘৃণা না করি...শুধু উচ্চ জীবনানন্দ তাদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা ঐ রকম হয়ে আছে। কোন্ মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে?

।।২৭শে অক্টোবর, ১৯২৪, কলিকাতা।।

হঠাৎ পুরোনো দিনগুলো মনে এল। মনে এল কতকগুলি ছায়াভরা বৈকাল কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা, সবগুলিই কেমন গভীর, অনন্ত, রহস্যময়। সময় তাদের দু' পাশ বেয়ে ছুটে চলে তাদের কোন দূরে নিয়ে ফেলেছে যেমন ভবিষ্যৎও মানুষের মনে বড় গভীর ও অনন্ত বলে মনে হয়, অতীতও অল্প-দিনের হলেও তার চেয়েও গভীর বলে মনে হয়, রহস্যময় বলে মনে লাগে, হারিয়ে-যাওয়ার-গভীরতা-মাখানো রহস্য তাদের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো—অনেকদিন হ'ল প্রাচীন অতীতে মিশে গেলেও তাদের গন্ধ, শব্দ, রূপ এখনও আমার মনের মধ্যেই আছে। মনের যেখানে তাদের আশ্রম, একদিনে—কিসে বলা যায় না, হঠাৎ সেই তারে ঘা পড়ে যায়, তখন অতীত মুহূর্ত্তগুলি তাদের অতীত গন্ধে রূপে বর্ণে শব্দে, সুখে দুঃখে, হাসি অশ্রুতে, আশায় নিরাশায়, মঙ্গল অমঙ্গলে, সৌন্দর্য্যে রসে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে মুহূর্ত্তের জন্যে উদয় হয়। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যে, তারপরই আবার চোখের ভ্রমজালের মত পরমুহূর্ত্তেই মিলিয়ে যায়—

।। ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর।।

হঠাৎ যেন মনে হ'ল হাজার বছর আগে যে সব পাখী বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যে সব ছেলেমেয়ে হাজার বছর আগে মা-বাপের কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হ'ল ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলে পিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি—নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে—ঝোপে ঝোপে—ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।

তার ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এল। রায়েদের কাঁঠালতলায়, পুকুরধারে, টুনুদের উঠোনে, নেড়াদের বাড়ীর সামনের বড় গাছটার তলায় অন্ধকার হয়ে এল, খেলাঘরের খুদ্র জগতের চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভান্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি, অস্ত সূর্য্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য...এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অবক্তব্য আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে, সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছয় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না...অনুরূপ শিক্ষা, সাহ-চর্য্য, আদর্শ, যে রূপ-আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে

তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্ত্তা সাধারণের প্রাণে পেঁছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দবার্ত্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে, এই কাজ তাদের করতে হবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা...

।।৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর।।

আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। তাদের কচি কচি মুখ, তাদের হাসি, তাদের পাগলামি, তাদের সরল শিশু চোখের দুষ্টুমির চাউনি, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মনে পড়ছে—ফুলের মত মুখে কচি ফুলের মত হাসি...আমার সেই সব অনাগত শিশু প্রপৌত্র, বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের জন্যে কি রেখে যাব তাই ভাবছি। আগামী হাজার বছরের মধ্যে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে কত শিশুফুল ফুটে উঠছে নির্ম্মল শুভ্র হাসিভরা সুন্দর সৌম্য মেশামেশি গলাগলি করে—তারা সব একসঙ্গে যেন পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে তাদের শিশুমুখগুলি তুলে, অজস্র খইয়ের মত, ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মত—নীল আকাশে অনাদি অনন্ত কালের রঙের খেলার নীচে—চিরযুগব্যাপী অপরাহ্নের শান্ত ছায়াভরা মাঠে বসন্তের হাসি দেখছে...ওদের দেখতে পাচ্ছি বেশ—আসবে, ওরা আসবে।

অনন্ত মেঘভরা আকাশে এখানে ওখানে দু'একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এই সামান্য দুদিনের অতি একঘেয়ে সংকীর্ণ পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে গেলে মনে হয় ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরদোর হবে। হয়ত ওদের অদৃশ্য সাথী তারাগুলো, বড় বড় বিশ্ব, কত সভ্যতা,কত নূতন প্রাণী, নতুন বিবর্ত্তন ওগুলোর মধ্যে। কত স্নেহ ভালবাসা প্রেম জ্ঞান স্মৃতি প্রীতি, কত নতুনতর জীবনযাত্রা, কত অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্রতা ওদের জগতে আছে, কে জানে! এই পার্থিব অস্তিত্বের ওপারে সেই সব নতুনতর জীবন হয়ত আমাদের জন্যে অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছে—এই পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের থেকেও কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ দূরতম প্রান্তের মোহানায় হয়ত আরও কত লক্ষ বিশ্ব আছে। তাদের প্রত্যেকটিতে হয়ত কত নতুন সূর্য্য, নতুন গ্রহ, নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আছে। কত নতুন প্রাণী, কত বিচিত্র জীবনযাত্রার ইতিহাস, কত কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত ভাবের লীলা, সে সব দূর বিশ্বের চিরদিনের সম্পত্তি —কে জানে?

।।২২শে জুন, ১৯২৫, ভাগলপুর।।

এখন থেকে বিশ কি ত্রিশ হাজার বছর পরের কথা। এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরের ওপরে কয়েক শত ফিট পলি জমে গিয়েছে, মনুমেণ্টের চূড়োটারও অনেক উপর পর্য্যন্ত মাটি জমে গিয়েছে, তার উপর দিয়ে এক বিরাট বিশাল মহাসমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে, কত মাছ কত প্রবাল কত ভীষণদর্শন সব সামুদ্রিকপ্রাণী তার কুক্ষির মধ্যে...

অনাগত সেই সুদূর ভবিষ্যতের দুটি মানুষ একটা জাহাজে চড়ে সমুদ্র-যাত্রা করছে, একটি বালক, বয়স দশ এগার বৎসর। অপরটি তার এক আত্মীয়, প্রৌঢ়। নিজের দেশ ছেড়ে তারা বিদেশে চলেছে জীবিকার্জ্জনের আশায়। প্রৌঢ় তার আবাল্য সহচরদের ছেড়ে চলেছে, মনে কত কষ্ট হচ্ছে। বহু পুরাতন পিতৃপিতামহের পুণ্য-পাদপূত জন্মভিটা ছেড়ে যাচ্ছে। কাজেই চিরপরিচিত স্থান আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যাবার দুঃখে সে চুপচাপ উদাসভাবে জাহাজের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে

দূরে ক্রমবিলীয়মান শ্যাম তটভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট ছেলেটি সবে বছর দশেক হল পৃথিবীতে এসেছে। তার মধ্যে বছর পাঁচেক তো তার জ্ঞানই হয়নি। অতএব সবে বছর পাঁচেক হল তার দেখবার শুনবার চোখকান ফুটেছে মাত্র —সে চঞ্চলভাবে এদিকে ওদিকে চাইছে—আঙুল দিয়ে উৎসাহপূর্ণ স্বরে এটা ওটা দেখিয়ে বলছে—"ঐ দ্যাখো কাকাবাবু, কেমন পাহাড়টা, ঐ দ্যাখো, ওটা?—পাহাড়ের ওপর বন? বাঃ বেশ তো? ঐ দ্যাখো কাকাবাবু কেমন একটা পাখী"—প্রৌঢ় বসে বসে ভাবছে অমুকের কাছে যে দেনাটা ছিল সেটা আদায় করে আসবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বড় ভুল হয়ে গেছে তো! অমুকের জমিটার দর আর একটু বেশী দিলে হয়ত দিয়ে দিত—জমিজমা এই সময় না কিনলে-কাটলে ভবিষ্যতে কি করে ছেলে-পিলেদের চলবে? তার প্রপিতামহ কোন্ প্রাচীনকালে যে জমিজমা করে রেখে গেছেন তাতেই এখনও চলছে—সে সব কি আজকের কথা! তখন সত্যযুগ ছিল, অমুকের দর শুনেছি অমুক ছিল। আর এখন! বাপরে, আগুন, ছোঁয়াও যায় না (দীর্ঘ-নিঃশ্বাস)...ছেলেটা এই সময় জিজ্ঞাসা করলে—কাকাবাবু, আমরা যে অমুক শহরে যাচ্ছি সেটা কি খুব বড় জায়গা?

—ওঃ, কত বড় জায়গা তা দেখিস—পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ও-রকম জায়গা কোথায়?

—কাকাবাবু, শহরটা কি খুব পুরানো?

কাকাবাবু (মুরুব্বিয়ানার হাস্যে)—হিঃ হিঃ, বলে কিনা খুব পুরানো ওরে পাগল, আমার প্রপিতামহ অমুক জায়গার দেওয়ান ছিলেন, তখনও ঐ শহর এত বড়ই ছিল...তবে তার চেয়ে এখন অবিশ্যি আরও ঢের উন্নতি হয়েছে। ও-শহর আরও পুরোনো—কত পুরোনো তা বলা যায় না, মোটের ওপর অনেক কালের প্রাচীন জায়গা...

তাদের সমস্ত কথাবার্ত্তার সময় অনাগত ভবিষ্যতের এই দুটি নতুন মানুষ জানতো না তাদের জাহাজ যে সমুদ্র বেয়ে যাচ্ছে তার নীচে, অনেক অনেক নীচে, বালি কাদা খোলা পাথর, উদ্ভিজ্জ-পচা এঁটেল মাটির স্তরের নীচে, ভিন্ন যুগের এক বিশাল নগর, তার মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট প্রাসাদ অট্টালিকা চত্বর বিদ্যালয় গৃহস্থবাটী বাগান আশা-ভরসা সুখ-দুঃখ নিয়ে সবসুদ্ধ একেবারে পুঁতে গিয়ে চাপা পড়ে রয়েছে। হয়ত সেই দশবছরের ছেলেটি তার কোনো দূর জন্মান্তরে সেই শহরের অধিবাসী ছিল, কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, কত সাথী, কত বন্ধু, কত তরুণী—কত প্রেম, কত স্নেহ...সে কি জানে সে পৃথিবীতে নতুন আসেনি? তিনশত ফিট নীচে মহা-সমুদ্রের তলের কয়েক ফিট নীচে, বালি কাদা উদ্ভিজ্জ-পচা-মাটি-স্তূপের নীচে সুদূরে, বহুপ্রাচীন, বিস্মৃত অন্ধকার অতীতের এক বিলুপ্ত জগতে তার একবারের জীবন কেটেছে—এমনি সুখ আশা, সুখ দুঃখেই কেটেছে, যা তার কাছে আজ নতুন লাগছে। তার সেই প্রাচীন, সুদূর অস্তিত্বের মধ্যে আর বর্ত্তমান নতুন জীবনকোরকের কচি দলগুলির এক বিরাট মহাসমুদ্র, কয়েকশত ফিট পচা কাদার স্তর, আর সহস্র সহস্র বৎসরের এক বিরাট যবনিকা পড়ে রয়েছে।

সামনের সাদা ঐ মেঘ-ভরা আকাশ, প্রভাতের নবোদিত সোনার সূর্য্যকিরণ, নীল পাহাড়ের উপরকারের প্রভাতকিরণসমুজ্জ্বল বনশোভা শরতের শান্ত রৌদ্রলীলা যে এক অদ্ভুত আশ্চর্য্য জগতের আভাস দিচ্ছে, এই সব পরিচিত, প্রাচীন, সনাতন এবং অতি-একঘেয়ে বলে মনে হওয়া জগতের পিছনে যে কি বিরাট পরিবর্ত্তনের গতির উদ্দাম নৃত্যের ভাঙাগড়ার খামখেয়ালী লীলা চলেছে, কি অবাধ মুক্ত লীলা-চঞ্চল দৃঢ় জীবনস্রোত বয়ে চলেছে, দুদিনের জীবনে যাকে একঘেয়ে চির-

পুরাতন বলে মনে হচ্ছে, সে যে কি বিরাট চঞ্চল, কি গতিশীল, কি প্রচণ্ড, কি রোমান্স যে তার পিছনে, সে কথা ওই নব-আগন্তুক অপরিপক্কবুদ্ধি শিশু কি বোঝে?

সে শুধু চেয়ে আছে। তার মুগ্ধ, আনন্দদীপ্ত শিশুনয়ন দুটি তুলে সমুদ্রের মধ্যের ছোট পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে, যার চূড়ায় কোন্ এক ধনীর মস্ত একটা সাদারঙের প্রাসাদ, আর নীচে জেলেরা চড়ায় ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরছে।

"পুরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতম্"

প্রাচীন যুগের অধুনাতন লুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকত। তাদের মাথার উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্ত্তন-শীল মেঘস্তূপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীন আদিমযুগের লতাপাতা, জীবজন্তু-সহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতের সূর্য্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগরবেলায় পড়তো। আর প্রভাতসূর্য্যের আলো এমনিই শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনের ঝিনুক শাঁখা কড়ি পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাতো। সবসুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকার অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যে নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণ-চিহ্নের মত।

।। ২৯শে জুলাই, ১৯২৫, কলকাতা ।।

অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলার ধারে বনে বড় বড় তাল-গাছগুলো অল্প-অল্প-বার-হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাপ, গাছপালায় বর্ষণক্ষান্ত ভাদ্র-সন্ধ্যার মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে—এখানে ওখানে জোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারিদিক নীরব, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

দেখে বসে বসে মনে হ'ল যেন সৃষ্টির আদিম যুগের এক জলার ধারে বসে আছি। যে জলার ধারের বনগাছ এখন প্রস্তরীভূত হয়ে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে—সে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ বা কোটি বৎসর আগেকার এক প্রাচীন আদিম পৃথিবীর জলার ধারে চারধারের গাছপালাগুলো আদিম ধরনের সাদাসিদা গাছপালা...Stigmaria, Sigiloria Lepidodenpren, Longifolium...ইত্যাদি। পৃথিবী জনহীন, মনুষ্য বহু বহু পূর্ব্বের পৃথিবী এ। আদিম গহন গভীর অন্ধকার অরণ্যে শুধু আদিম যুগের অতিকায় অধুনালুপ্ত Saurian রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই, সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য্য নেই আকাশে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্য্যাস্ত হচ্ছে। প্রতি রাত্রে রূপোলী চাঁদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষ আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে—সে আসবে তবে তার শিল্পকলা-সংগীত কবিতা চিত্রে ধ্যানে উপাসনায় চিন্তায় প্রেমে আশায় স্নেহে মায়ায় পৃথিবীর জন্য সার্থক হবে। অনাগত সে আদুরে ছেলেটির জন্মে পৃথিবীমায়ের বুকটি তৃষিত হয়ে আছে।

কিন্তু ছেলেটি যখন এলো, তখনই কি দেখলে, না সকলে দেখে? ঐ যে অন্ধকার বনের উপরের মেঘান্ধকার স্তব্ধ আকাশে, ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদটুকু দেখা যাচ্ছে, কে ওর মর্ম্ম বোঝে? তাই মনে হয় ভগবান যেন মাঝে মাঝে

দুঃখ করেন। তাঁর এই বিপুল রহস্যেভরা সৃষ্টির সৌন্দর্য্য ভাল করে বুঝলে বা বুঝতে চেষ্টা করলে এমন লোক খুব কম। তিনি যে যুগ যুগ ধরে তপস্যার পর শান্ত মৃত্যুঞ্জয়, অমৃতরস মন্থন করে তুললেন—এই বিরাট, বিদ্রোহী, জড়-সমুদ্র মন্থন করে...তাঁর অনন্ত যুগের তপস্যার ফল এই অমৃত কেউ পান করলে না, কেউ আগ্রহ দেখালে না পান করবার। কোন্ যে তার বরপুত্রেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে পথ ভুলে এসে পড়ে, তারা এ জগতের তুচ্ছ জিনিসে ভোলে না, তাদের মন পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগলালসার অনেক ঊর্দ্ধে, ঐ অমৃতলোকে, ঐ cosmic সৌন্দর্য্যে ডুবে আছে, অনেক বড় vision তারা দ্যাখে, সকলের জন্যে বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে, গানে কবিতায়, ছবিতে কথায় লিখেও রেখে যায়, কিন্তু তাদের কথা শোনে বোঝে খুব কম লোকেই—তার চেয়ে সুদের হিসেব কষলে ঢের বেশী আনন্দ এরা পায়।

॥ ২১শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটির তীরে। মুখে তাদের প্রাণ-কাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা। কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুকটুকে মুখগুলি—সকলেরই হাতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

চন্দন কাঠের তৈরী চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে বাঁধা মশালগুলি, জ্বললে গন্ধে দিক আমোদ করে।

ওদের দিকে কেউ চাইছে না। বাঁশবনের অন্ধকার ছায়ায় সারাদিন ওদের কাটল, রাত আসছে, কিন্তু ওদের মশালগুলো কে জ্বালবে?

অনেক লোকে জ্বালাতে এল, কেউ জ্বেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, নিবে যে গেল তা পিছন ফিরে চেয়েও দেখলে না। কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালাতে পারলে না, কেউ চেষ্টা করলে না জ্বালবার। কেউ চোখ নীচু করে চেয়েও দেখল না যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নির্ভরপূর্ণ মিনতির চোখে চেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে, কে তাদের মশাল জ্বেলে দেবে? কে সে নিপুণ অথচ প্রেমিক মশালচী?

কত শিশু বুঝতে না পেরে আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদের হাতের মশাল ফেলে দিলে, হয়ত যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত, তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায়। অবোধ শিশুদের বলে দেবার, দেখিয়ে দেবার, মশাল তুলে জ্বেলে দেবার তো কেউ নেই।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে। বাঁশবনের ছায়া স্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে? তার হাতে মস্ত মশাল, শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলো হয়ে গেল এক মুহূর্ত্তে।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে, চিররাত্রির অন্ধকার দূর করতে। ভগবানের বিশ্বের সে এক মশালচী।

আয়রে, আয় আয়, আয়।

হাসি মুখে কোঁকড়ান চুল দুলিয়ে, আলোর জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিশু-পতঙ্গের দল সব ছুটে এল ওদের ছোট্ট ছোট্ট চন্দন-মশলায় বাঁধা মশাল হাতে নিয়ে। চারধার ঘিরে কাড়াকাড়ি, সবাই আগে চায়।

কত ধৈর্য্যের সঙ্গে নতুন মশালচী আলো জ্বালতে লাগল, যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে—কত অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে। সকলেরই জ্বলল।

ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিকে ওদিকে বেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। আর কোথাও কেউ নেই। অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে, অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে জ্বেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হ'ল যে মশালচী।

॥ ২৮শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

পনের বৎসর আগের এক সন্ধ্যা হঠাৎ বড় স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো। বাড়ীর পিছনের বড় কাঁঠালগাছটায় রাঙা শেষ সূর্য্যাস্তের রোদটুকু লেগে আছে, গাছে পাতায়, বাঁশবনে, কাঁঠালগাছের তলায়। পথের ধারের শেওড়াবনে অন্ধকার নেমে আসছে, ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে, পাঁচিলের পুরানো কোন্ কোণে, মাটির ঘরের দাওয়ায়, খড়ের চালের নীচে। সন্ধ্যায় শাঁখ বেজে উঠলো, চারধারে কাক, ছাতারে, ঘুঘু, নীলকণ্ঠ শালিখ পাখীরা ছায়াভরা আকাশ বেয়ে বাসায় ফিরচে—তখনকার সেই দিনটির আশা আনন্দ আকাঙ্ক্ষা আকুল আগ্রহ—

আজকের এই সন্ধ্যায় আকাশটির রং যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে, কোথাও ওই তুঁতের রং এখনই কালো হয়ে উঠছে, কোথাও রোদের সোনার রং ধূসর হয়ে গেল। মেঘের পাহাড় সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্র দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। রক্তের পুকুর চোখের সামনে নীল মাঠ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটাও ঐ রকম মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল—সূর্যাস্তের এই আকাশে যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুরূপীর মত রং বদলাচ্ছে ঠিক ঐ রকমই আকাশ যেন একটা মস্ত দর্পণ—পৃথিবীর এই অহরহ পরিবর্ত্তনশীল রূপ ওতে যেন সব সময় ধরা পড়ছে। তাই সেটাও একটা বিরাট ছায়াবাজীর মত দেখা যায়।

তরল আনন্দ অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী নয়। Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ— Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না—যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশী হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায়—তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।

সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।

।। ২৮শে আগস্ট, ১৯২৫ ।।

এই প্রশ্ন একদিন নিউটনের, কেপ্‌লারের, গ্যালিলিওর মনে উদয় হয়েছিল। সকলেরই মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত। জগতে দুদিনের জন্যে আসা—এই জগতের ফলে, জলে, স্নেহে, দয়ায় মানুষ হয়ে এটা কি উচিত নয় যে জগতের জন্যে কিছু ক'রে যাবো? আমার ছাত্রটি যেমন কচি, সুন্দর, ঐ রকম অবোধ শত শত অনাগত শিশুমনের জন্যে উত্তরকালে আমার কি দেবার থাকবে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, শত শত কি সহস্র বৎসর পরেও এমন কেউ কেউ ওদের মধ্যে থাকবে যে হয়তো শান্ত পর্ব্বতের ছায়ায়, নির্জ্জন সন্ধ্যায় শান্তিপূর্ণ কোনো গ্রাম্য নদীতীরে, অথবা অন্ধকার গহন-রাত্রে শিশিরভেজা ঘাসের উপর, তারার আলোয় শুয়ে ওরা এই-গুলি পড়বে আর মনে আনন্দ, বল, উৎসাহ আলো পাবে—এই তো জনসেবা, পৃথিবীতে এসে এই করেই তো সার্থকতা—একশত বৎসর পরে আমার নাম দশ বৎসর

আগেকার পাতা মাকড়সার জালের মত কোথায় কালসাগরে মিলিয়ে যাবে—তবে কি রেখে যাবো আমার দুঃখের মত দুঃখী ঐ সব অনাগত কচি কচি শিশু মনগুলির খোরাকের জন্যে? কি রেখে যাবো? কি সম্পত্তি, কি heritage তাদের জন্যে দেবো?

শান্ত, আঁধার অপরাহ্ণে বাড়ীর পিছনের বন যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে আসে, পুরোনো নোনাধরা দেওয়ালের কোণে যখন বাদুড়ের দল হুটপাট করতে শুরু করে, নদীর ওপারে শিমুলগাছের মাথা থেকে শেষ বৈকালের ম্লান রোদের ছায়াও যখন মিলিয়ে যায়, তখন বহু দূর ভবিষ্যতের রাশি রাশি ফুলের মত মুখ, শিরীষের পাপড়ির মত নরম এই সব অনাগত বংশধরগণের কথা মনে পড়ে। এই সন্ধ্যার মত অন্ধকারও ওদের মধ্যে কত ছেলের জীবনে আসবে। সন্ধ্যায় এখন আকাশে যেমন জ্বলজ্বলে শুকতারা সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসে আবার সূর্য্যের প্রথম আলোর আগেই মিলিয়ে যায়, ওদের জীবনেও অমনি দুঃখরাত্রের সত্যের উজ্জ্বল শুকতারা যদি না ফোটে তো কে তাদের আশা দেবে? তাই কিছু করে যেতে হবে—জীবনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়। এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে স্ফূর্ত্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না, কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালের শিশু, বৃদ্ধপৌত্র, অতিবৃদ্ধপ্রপৌত্রগণের জন্য কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।

এতে আপন পর কিছু নেই, কি তুমি দেবে এদের? এদের জন্যে কি রাখছো তুমি? জীবনের mission কি তুমি অবহেলা করবে? উপেক্ষা করে ভগবানের পবিত্র মহৎ দানকে পায়ে দলে যাবে?

কোনো কার্য্য 'কর' বললেই করা হয় না, এ জিনিস সহজ নয়। অনেকদিন ধরে ভাবতে হয়, বাইরের কোনো জিনিস থেকে বাধা-বিঘ্ন না আসে। চিন্তা: শুধু গভীর চিন্তা। অনবরত বাধাহীন চিন্তাতে শান্তমনে গভীর সত্যের উদয় হতে পারে, interrupted হলে সারাজীবনেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না, যা কিনা হয়ত এক বৎসরের নিজ্জর্নবাসেই আসতে পারত...

"By keeping it constantly before one's mind...By always thinking and thinking upon it, much is done under these conditions......much might be sacrificed to obtain these conditions.

জনসেবার জন্যে sacrifice করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে এও এক জনসেবা, এর জন্যেও বিরাট স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে। এ সাময়িক হুজুগের জনসেবা নয়। ধীর, শান্ত সমাহিত ভাবে উত্তরকালীন অনাগত জনগণের সেবা।

।। ৯ই অক্টোবর, ১৯২৫ ।।

মানুষের সামান্য সুখদুঃখ, আমবন কাঁঠালবাগানের পাতার আড়াল বেয়ে দিব্যি চলছে। Annytaর মত কত মেয়ে কত দুঃখী...সন্ধ্যার আকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্র—কত জগতের ছড়াছড়ি—বিরাট নাক্ষত্রিক শূন্য—ঠাণ্ডা জনহীন—পৃথিবীর ফুলফল লতাপাতা সামান্য সুখদুঃখ—গ্রহ-নক্ষত্র লাটিমের মত ক্রীড়া-কন্দুকের মত আকাশে ঘুরছে। এই আনন্দলীলায় সব প্রাণীই যোগ দিচ্ছে। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সবই খেলা, দুদিনের। কিছুতেই ব্যথিত হবার কিছুই কারণ নেই। নদী বেয়ে যে শব ভেসে যাচ্ছে কে জানে হয়ত দূর কোন অজানা নক্ষত্রে ওর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে। ওর মৃত্যুযন্ত্রণা সার্থক হয়েছে। এই বিচিত্র বিশ্বলীলার সকলেই যে যাত্রী। ফুল, ফল, গাছ, পাখী, মানুষ সকলেই।

কিন্তু ক'জন জগতের বাইরের এই বিরাট শূন্যের দিকে চেয়ে পৃথিবীর জীবনের সুখদুঃখের ঊর্দ্ধের কথা ভাবে? Crowd mind-এর বাইরে সকলেই নয়—সকলেই গড্ডলিকা। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। জগতের বড় বড় মনীষা-সম্পন্ন চিন্তাবীর কয়জন? উপনিষদের ঋষি পথে-ঘাটে সুলভদর্শন নন। সকলেই শঙ্কর নন, প্লেটো নন, নিউটন ফ্যারাডে গ্যালিলিও কোপারনিকাশ গাউস ইনষ্টিন নন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলিরাশির আবরণ ভেদ করে ক'জনের চোখ বাইরের অনন্ত ঊর্দ্ধে আকাশের ঘূর্ণ্যমান...সাদাচঞ্চল বিরাট বিশ্বজগতের দিকে যাবে?

দুই এক জনের—তারা জনপ্রবাহের কেউ নয়, তার অনেক ঊর্দ্ধে।

।। ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৫ ।।

সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো ছড়ানো আছে। ফুলদানিটাতে chrysanthemum, কলাফুল। এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়ত একান্ন বৎসর পরে আমার কোনও চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা * হয়ত থেকে যাবে। হয়ত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে। হয়ত পাঁচশত বছর পরে—যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে—আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাবো। আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জেলে তেল খরচ করে, আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবুও দেবো, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি। তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আর দেখতে আসবো না। আমার ফুলদানীর এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর chrysanthemum ফুলটা আর বছর এ সময় কোথায় থাকবে? আশি বছর পরে আমি কোথায় থাকবো?

এই তো যুগ-যুগের শিক্ষকতা। যুগ-যুগের জনসেবা সে। এক জন্মের suffering সেখানে সার্থক। উত্তরকালের শত শত অনাগত তরুণমনে যখনই দুঃখ আসবে, তাদের কচি প্রাণে আশা, বল, আনন্দ দেওয়া, জীবনের পথ দেখিয়ে দেওয়া—এক জন্মের জন্য জীবন নয়, দু'দশ বৎসরের সাময়িক উত্তেজনা নয়, যুগ-যুগের জনসেবা। সে দিকে মনে রেখে কাজ করতে হবে। সাময়িক হাততালির দিকে নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃতে কি করেছেন? বুদ্ধদেব কি করেছেন? স্বয়ং চৈতন্য কি করেছেন? তাঁদের এক জন্মের Suffering ব্যাকুলতা, ধ্যান সব ধন্য হয়েছে—কারণ যুগে যুগে তাঁদের কাহিনী পড়ে লক্ষ লক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন মন আলোর সন্ধান পাচ্ছে। suffering, এদিক থেকে মস্ত জিনিস, কেউ যেন সে কথা না ভোলে। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, সে দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। Sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে। পূর্ণ-অন্ধকার অমাবস্যার পরই শুক্ল-পক্ষের চাঁদ ওঠে—দুঃখের রাত্রিতেই তারা খুব উজ্জ্বল হয়।

।। ২০শে নভেম্বর, ১৯২৫ ।।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এই মাত্র দিয়ারা থেকে আসছি। আজ ইসলামপুর থেকে

* 'পথের পাঁচালী' লেখা হচ্ছিল।

ভাগলপুর আসবার সময়ে শুয়েরমারীর খেয়া-ঘাটে এপারে যে নৌকা লেগেছিল, যাতে ছেঁড়াখোঁড়া হলদে রং-এর বই খুলে মাঝিরা পড়ছিল—জনসেবকদের কথা মনে এলে যেন এর কথা মনে আসে—নৌকাতে যে মেয়েটি ময়লা কাপড় পরে বসেছিল ও নদীতে নেমে কাপড় হাঁটু পর্য্যন্ত তুলে চলে গেল, ওর কথাও যেন মনে থাকে। মুরাঠা বেঁধে ওরা নাকি কোন্ কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন' খেতে গেল। আর ওই যে ছেলেটা বললে তার বাড়ী রজীদপুর, ওর কথাও—সাবোর স্টেশনের বাইরে লতাকাটি পাতা কুড়িয়ে আগুন পোয়ানো, গাড়ীতে ওই লোকটাকে বিড়ি খেতে বারণ করা, এই সময়ে আলো জ্বালিয়ে বড় বাসার টেবিলটায় বসে এই সব লেখা অনেককাল মনে থাকবে। শুয়েরমারীতে আজ ঘি খুঁজলেই পাওয়া যেত—মুকুন্দ বলেছিল—কার্ত্তিক খুঁজলে না ভাল করে। এখানে মোটেই শীত নেই। ইস্মাইলপুর কাছারীতে কদিন কি শীতই পেয়েছি। আগুন রোজ সন্ধ্যায় না পোয়ালে রাত কাটতো না। রামচরিত রোজ খড়ের বোঝা নিয়ে এসে আগুন করত। সেদিনকার শিকারটা খুব জোর হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে কাদায় কাদায় বেড়ানো—প্রথম কুণ্ডীটাতে এত হাঁস ছিল একটাও মারতে পারা গেল না। শুধু এদিক ওদিক দৌড়ে দৌড়ে হয়রান—

।। ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর ।।

লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা। যারা সারাদিন ঘরে বসে বসে পড়ে, তাদের শরীর ঘরটার চারধারের দেওয়ালে বদ্ধ থাকলেও মন উড়ে যায় অনেক অনেক দূরে—অসীম শূন্য পার হয়ে কোটি কোটি অজ্ঞান নক্ষত্রলোকের দেশে দেশে। সময়ের কুয়াশা ভেদ করে তাদের মন ফিরে যায় একেবারে পৃথিবীর সে-যুগে যখন মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হয় নি, জলাজঙ্গলে অজ্ঞাত ভীষণ-দর্শন অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত গাছপালায় ভরা আদিম যুগের জঙ্গলে। এই জগতে সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে অজানার আনন্দ—জানা জিনিসে কোনো সুখ নেই।

এই নতুন জিনিসের আনন্দ, অজানার আনন্দে বিশ্বজগৎ ভরা। মানুষের সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির চারপাশ ঘিরে, তার চোখের সামনে, তার কানের সামনে, তার অনুভব ও স্পর্শশক্তির সামনে, তার মনের সামনে অনন্ত অসীম রহস্যময় অজানার মহাসাগর। তার দূর দিক্চক্রবালের ওপারে ঘন আবছায়া কুয়াশার অস্পষ্ট কল্লোলও শোনা যায় না—এত দূর সেদিক। এই অসীম অজানা সাগর মানুষকে অজানার আনন্দ দেবার জন্য যেন তার চারধার ঘিরে আছে। কে আছে যার সাহস, বুদ্ধি, মন এত দৃঢ় যে অজানার দরিয়ায় পাড়ি জমাতে চলে? কূল আঁকড়ে তো সকলেই পড়ে রইল। দিক্দিশাহারা অকূল-রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে—কোথায় সে বীর ব্রাত্য, মুক্ত আত্মা?

সংসারের ধূলায় পড়ে সবাই লুটোপুটি খাচ্ছে—সুদের হিসাবে দিন যাচ্ছে, গাঁজা খেয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করছে, সংসারের সবাই আনন্দকে খুঁজছে। কিন্তু আনন্দের জলধি যে সামনে অক্ষুণ্ণ রইল তার দিকে তো চাইবে না।

সে উচ্চ আনন্দের ভাণ্ডারকে ব্যবহার করবার মত শিক্ষা-দীক্ষা সকলের থাকে না, অধিকার সকলের থাকে না।

এই জন্যই মনে হয় সংসারে কাউকে ঘৃণা করলে হবে না। মানুষ এই উচ্চ ব্রাত্য আনন্দের খবর না জানতে পেরেই অ-সুখে হিংসায় ধূলায় কাদায় পড়ে লুটোপুটি খায়। স্বার্থদ্বন্দ্বে নিজের সুখ খুঁজতে নিজেকে আরও হীন, অসুখী করে তোলে। তাদের দোষ নেই। হতভাগ্য তারা—সকলে আনন্দকেই খুঁজছে। কিন্তু শিক্ষা-

দীক্ষার অভাবে আনন্দের পথ না জেনে ভুল পথ ধরেছে। শুধু অবগুণ্ঠনময় বিশ্ব-জগতের অনন্ত রহস্য-লোকের অজানা জীবনানন্দের পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা এমন হয়েছে। নইলে একবার চোখ ফুটলে তারা সকলেই ঠিক পথই ধরত, কারণ নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। কেউ নেই—কেউ নেই—তাদের মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। কোন্ মুক্তপুরুষ অনন্ত আঁধিকারের বার্ত্তা নবআনন্দের তড়িৎলেখায় তাদের উপেক্ষিত অন্ধ বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পেঁাছে দেবে?

।। ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ।।

হঠাৎ জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম—বাইরে শীত কমে গেছে—জ্যোৎস্নাসিক্ত লম্বা ছায়া পড়েছে—আলো-আঁধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া—মনে হোল এই যে সুন্দর পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না ছায়া, ঐ রহস্যময় চিন্তা পাঁচশো বছর পরে কোথায় থাকবে?

ঐ দূরে যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, এই বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো—আজ যারা সব জীবন্ত স্পষ্ট মূর্ত্তিমান—আজ আমার জীবনের যে দুঃখ সুখ আমার কাছে স্পষ্ট জীবন্ত, তারা সব কোথায় থাকবে? কোথায় মিশে যাবে—কোন্ দূর অতীতে? আবার তাদের জায়গায় নূতন অনুভূতি—এতদিনের অচঞ্চল, গতিহীন জড় সংসার যেন হঠাৎ তার চোখে সচল গতির বেগে জ্বলন্ত হয়ে উঠল, যা এতদিন ছিল বন্ধ, হয়ে উঠলো রহস্যময় জীবন্ত গতিশীল—পথিক বিশ্ব এই অনন্তের মধ্য দিয়েও ঠিক আছে, তার বুকে যুগে যুগে কত বিনষ্ট অবোধ জীবের ব্যথা, কত অতীতের কত বেদনা-ভরা বুক তার, যুগযুগের বিরহ জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ, সৃষ্টির কত ফুল কত রহস্য নিয়ে যে চলে আসছে। হয়ত অনেক দিন পরে সৃষ্টি যখন সুন্দর হয়ে ওঠে আগের চেয়েও, তখন দূর স্বর্গের কোন্ কোণে মস্ত বড় জ্যোতি-র্বাতায়ন খুলে রেখে অতীতদিনের জীবের কাহিনী তার মনে পড়ে যায়—অনন্তের পাষাণ আনন্দ বেয়ে যারা কত কতদিন মিশিয়ে গেছে—বুক হয়ত তার অনন্তের ব্যথায় ভরে ওঠে।

।। ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ ভাগলপুর ।।

অসীম অনন্ত রহস্যভরা আকাশ—স্তব্ধ রাত্রি। পৃথিবী সুপ্তির অন্ধকারভরা। এখানে ওখানে দুই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে মাত্র; মাঝে মাঝে বাতাস লেগে নিমগাছের ডালপালার মধ্যে সির্ সির্ শব্দ হচ্ছে। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার। আকাশে বাতাসে একটা নীরবতা। অন্ধকার আকাশে নিমপাতার ফাঁক দিয়ে একটা তারা যেন অসীম রহস্যের বুকের স্পন্দনের মত ঢিপ ঢিপ করছে। তারাটা ক্রমে নেমে যাচ্ছে—আগে যেখানে ছিল ক্রমে তা থেকে নীচে নামছে। এই অনন্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র লীলা প্রচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে তা ঐ সঞ্চরমাণ তারাটিকে দেখলে বোঝা যায়। অন্ধকারের পিছনে একটা অসীম অনন্ত সৌন্দর্য্য-লোক যেন আবছায়া আবছায়া চোখে পড়ে। ঐ তারার হয়ত একটা স্বাতী নক্ষত্র আছে। তা পার্থিব চোখের বাইরে, হয়ত তাতেও একটা আমাদের মত উন্নত ধরনের জীব থাকত। কি হয়ত আমাদের চেয়েও উন্নততর বিবর্ত্তনের প্রাণীর বাস। কি তাদের সভ্যতা, কি তাদের ইতিহাস, কি তাদের প্রেম স্নেহ, জ্যোৎস্না সৌন্দর্য্য... জানতে ইচ্ছা যায়। এই রহস্যভরা বিশ্বের বুকের স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে হয়—আরও কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য্য, অব্যক্ত,

বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে ছড়ানো। তা লোক-কোলাহলে শোনা যায় না। এই রকম গভীর রাত্রিতে এই রকম নির্জ্জন জানালার ধারে বসে এক মনে আঁধারভরা আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে থাকলে গভীর রাতের দক্ষিণ বাতাস যখন কালো গাছপালার মধ্যে সির্ সির্ বয়ে যায় তখন যেন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট তার বুকের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়।

আনন্দের রহস্যের গভীরতায়, বিপুলতায় মন ভরে ওঠে। জীবনের অর্থ হয়। পৃথিবীর জীবনের পারে যে জীবন, অসীম রহস্যময় অনন্তের পথের মহিমায় যাত্রা-পথের পথিক যে জীবন, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের সাংসারিক কর্ম্মকোলাহলে যে মহিমাময় শাশ্বত জীবনের সন্ধান আমরা পাই না, জগতের সুখ দুঃখের ওপারে যে অনন্ত জীবন সকলেরই জন্যে চঞ্চল প্রতীক্ষায় রয়েছে, অসীম নীল শূন্য বেয়ে যার উদ্দাম রহস্যভরা পথযাত্রা, সে জীবন একটু একটু চোখে পড়ে।

"ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার ভয়ে ব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোন শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁশিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এ অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা আপনিই হবে, কোন ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্না ভালবাস? ফুল, ফল, পাখী ভালবাস? গান ভালবাস? পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে? মন আকুল হয়ে ওঠে? আর্ত্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও? তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী। তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুশি আনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেখে বেড়িও, কত দীন দরিদ্র, আতুর জীব কঠিন সংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্জ্জন নদীর তীরে কেউ হয়ত বসে বসে কাঁদছে—ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা কো'র, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সে-ই তোমার স্বর্গ হবে। চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার না থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য্য, সব সন্তোষ, শান্তি, কেমন মরুভূমির মত ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো—মাঝে মাঝে আর্ত্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তি-ভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে।

"জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেক আগে মরে-যাওয়া ছেলের কথা ভেবো—দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়ে আসছে। পাখীর গানে করুণ গৌরীর উদার মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো—মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে— জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অনন্তের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি জগতে সে অতি দুর্ভাগা। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।"

কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেন একটু থেমেছে? অন্ধকার যেন আরও একটু গভীর হয়েছে। তারাটা আরও নেমে গিয়ে গাছের ডালের আড়ালে পড়েছে—কি রুদ্র প্রচণ্ড তাণ্ডব গতি কি শান্ত নিরীহতার আড়ালেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ঝির-ঝির বাতাসে নিমফুলের গন্ধ আসছে—বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ আসছে।

এখনও আবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাড়াগাঁয়ের বনে বনে ঘেঁটু ফুল ফোটে, বৈঁচিগাছের নতুন কচি পাতা গজায়, দক্ষিণ বাতাস বয়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েল

কোকিল ডাকে। কিন্তু তারা আর নেই, সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে তারা কোথায় কত-দূর চলে গিয়ে কোন দূর অতীতে মিশে গিয়েছে।

।।৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬, ভাগলপুর ।।

ভাবতে ভাবতে মনে হোল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরি নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া-- অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম। যদিও আমি ভাগলপুর আছি, এখন এত বড় একটা মিটিং করে এলুম, কাল সকালে হেমেন আসছে, ইসমাইলপুরে নায়েবের চার্জ্জ বুঝে নিতে যাবে, কিন্তু এই সবের মধ্যে পুরোনো দিনের ছবিগুলো বড় মনে পড়লো, অনেক দূরে এক গ্রাম্য নদীতীরে কেমন নাটা-কাঁটার বন, ধলচিতের খাল, নোনা কাদা, গোল-বেগোল, তারপর সেই পুকুরের ধার, সেই জানালা, সেই বর্ষার দিনে দরমাহাটার মোড়ে পাথুরে চুনা ফেলা, সেই পানচালায় শোয়া, সেই কালী ডাকছে, ওঃ বড্ড কম।

জীবন কি করে অগ্রসর হচ্ছে? সাত বছরের এই পরিবর্ত্তন, পাঁচ হাজার বছর পরে কি হবে? এই বিভূতি, এই নায়েব, এই অম্বিকাবাবু, এই হেমেন, এই আমি কোথায় থাকবো? পাঁচ হাজার বছর আগে যারা ইজিপ্টে থাকতো তারাও হয়ত ঠিক এই রকম ব্যক্তিগত আশা নিয়ে যতীনবাবুর মত অহঙ্কার করতো, বিভূতির মত ফোর্থ ক্লাসে পড়বার স্বপ্ন দেখতো—কিন্তু তাদের আশা অহঙ্কার প্রেম স্নেহ স্বার্থ নিয়ে কোথায় তারা আজ? দু-একটা ভাঙা ছেঁড়া মমি ছাড়া সেই বিশাল সভ্যতার অতীত জনসঙ্ঘের কি চিহ্ন পাওয়া যায়?

ঐ রকম আমাদেরও হবে। আমরাও আমাদের দ্বন্দ্ব, মারামারি, অহঙ্কার, আশা, দাম্ভিকতা, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া নিয়ে বুদ্বুদের মত মহাকাল-সাগরে কোথায় মিলিয়ে যাবো। আমাদের জায়গায় আবার নতুন একদল আসবে। তাদের ঠিক এই রকমই সব হবে। তারাও বলবে—আমরা বড় হবো, আমরা জমি কিনবো, বিষয় কিনবো, সুদে টাকা ধার দিয়ে বড়মানুষ হবো, বই লিখে নাম করবো—তারা বুঝতে পারছে না, তাদেরই পায়ের মাটির তলায় এক নয় কত লক্ষ লক্ষ generation তাদেরই মত ভেবে কেঁদে হেসে আশা করে অহঙ্কার করে সুখী অসুখী হয়ে বগল বাজিয়ে নেচে কুঁদে হামবড়াই করে বর্ত্তমানে ধুলোমাটি হয়ে পৃথিবীমায়ের বুকেই কেঁচোর মাটির মত মিলিয়ে রয়েছে।

এখানে ওখানে, অন্ধকার আকাশে, বহির্শূন্যে—বিশ্বসৃষ্টির উপকরণ, পাথর, ধাতুর পিণ্ডগুলো মাঝে মাঝে পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠে রয়েছে—ঐ একটা—আবার—একটা—আবার ঐ—শূন্যটা একেবারে ধাতুর পাথরের উপকরণে ভরা—

ঐ বিশ্বজগৎ, সংসারের কোলাহল ঊর্দ্ধ্বের বড় জগৎটা ঐ অন্ধকার শূন্যে আত্ম-প্রকাশ করছে।

ঐ যে গতি, ও বিশ্বের গতির প্রতীক। শুধু প্রতীক নয় ও তারই গতি। স্বয়ং সঞ্চরমাণ, ভ্রাম্যমান, ঘূর্ণ্যমান বিশ্ববস্তুর অংশ। আপনা আপনি নিয়মে চলেছে। ওর দিকে চাইলে নিউটনের, কেপলারের, হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের, শঙ্করের, বরাহমিহিরের জগৎ মনে পড়ে—সে জগৎ ডাক্তার শরৎ সরকারের জগৎ নয়, গভর্নমেণ্ট প্লিডার অমুকের জগৎ নয়, অমুক বড়মানুষ পেটো মহাজনের জগৎ নয়, অমুক স্টেটের অমুক ম্যানে-জারের জগৎ নয়। কত পৃথিবীর, বিশ্বের ভাঙ্গা টুকরো ও! কত ইতিহাস ছিল তাতে? কত জীব কত সভ্যতা কত উত্থানপতন কি বিরাট রহস্য ওর আড়ালে প্রচ্ছন্ন

রয়েছে! কি অনন্ত ধ্যানের চিন্তার সৌন্দর্য্যস্বপ্নের ধারণার জ্ঞানের বিষয় ওই পাথরের ধাতুর টুকরোগুলো তা কে ভেবে দ্যাখে?

আবার আকাশে চাও, Serius-এর পাশের, কত গ্রহনক্ষত্রের পাশের অদৃশ্য জগৎগুলোর কথা ভাবো! অন্ধকারে গা লুকিয়ে কোথায় ওরা অনন্ত পথে ঘুরছে? কি জীব-বাস তাতে? তাতে এরকম কত জীবের উত্থান-পতন? কত দিনের ইতিহাস?

তবে এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে, এই তাসের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদদুর্গের মধ্যে আসল জিনিসটা কি? জনসেবা—এ জীবনের নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি ক'রে সত্যকে উপলব্ধি ক'রে শাশ্বত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে, ধ্যানে কল্পনায় ছবিতে তাকে এঁকে যাওয়া। নয়ত এমন কাঁদিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল কাঁদবে, এমন হাসিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল হাসবে, এমন ভাবিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল ভাববে, এমন দেখিয়ে যাওয়া যে তারা চিরদিন দেখবে।

শিক্ষকতা নয়, জনসেবা—দীন নিরহঙ্কার অথচ দৃঢ় পবিত্র হয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।

বৎসরে বৎসরে এরকম বসন্ত কত আসে—কত নতুন মুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম—মাথার উপরে নিঃসীম নীল শূন্য অনন্তের প্রতীক—এই নীল আকাশের তলে বৎসরে বৎসরে এরকম কচি পাতা ওঠা গাছপালা, বেলফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি-ঘাঁড়া-বাঁশবনের আড়ালে যে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিমবনের আম-বনের ছায়ায় ছায়ায় বেয়ে চলছে, তারই কথা লিখতে হবে। ওদের হাসিখুশি ছোট-খাটো সুখদুঃখ, আশা ভরসার যে কাহিনী ওই দিয়ে দিতে হবে—তাদের জীবনের যে দিক আশাহত, ব্যর্থতায়, দীনতায়, চোখের জলে, অপমানে উদাসকরুণ, চাঁদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্ চিক্ করে, ফাল্গুন-দুপুরের অলস গরম হাওয়ায় যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ শান্ত সন্ধ্যা যাদের বনের মত ঝুলি-ঝুলি অন্ধকার ভরা নির্জ্জন—তাকেই আঁকতে হবে—মানুষের এই suffering এতো বড়।

বেড়াতে বেড়াতে চারধারের কাশজঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসছে। চড়ুইপাখী কিচ্‌কিচ করছে। সন্ধ্যার শান্তি ও অন্ধকার—অনেক দূরে এই ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়া বইছে। বনে বনে বাতাবী লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে। এখন শান্ত সন্ধ্যায় মিষ্টি বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ পুকুরের ঘাটের পথে বইছে। রাঙা কাঞ্চনফুলের ছায়া পুকুরের জলের ওপর পড়েছে। ভিজে কাপড়ে বধূটা ঘাট থেকে বাড়ী যাচ্ছে। আর এখানে? এখানে চারিদিক কাশের গন্ধে ভরপুর। মহিষের ধুরুইয়া চিৎকার করছে। হু হু পশ্চিম বাতাসে বালি উড়ে চারধার অন্ধকার করে দিয়েছে। ঝাউয়া খুবড়ী রামজোত, লোধাই, এই বসন্ত, এই নেবুফুল, সৃষ্টির আনন্দ—এই সব তুচ্ছ জিনিসে জীবনের মাদকতাময় আনন্দ— magic of life যুগে যুগে, বিবর্ত্তনে এরকম আসবে—এই আনন্দ, এই উৎসব যুগযুগের মাঝখান দিয়ে অনন্ত কাল ধরে চলেছে—তারই মধ্যে জন্মেছি আমি—এরকম কত যাবো, কত আসবো—কত চড়কে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াবো, কত সরস্বতী পুজোয় গান শোনা, "ফাগুন লেগেছে বনে বনে", কত Abyssinian horseman, কত চাঁপা-পুকুর, কত অন্ধকারময়ী রাত্রি, কত বর্ষাসন্ধ্যায় কত অজানা বঁধুর মিলন গল্প, কত জনের সঙ্গে বাহুতে বাহুতে বাঁধা কত উৎসবের দিন—কত সুকুমার, কত হুগলী ব্রিজ, কত কেওটার সিঙ্গেতার গন্ধ কত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ছায়াভরা বৈকালে বোর্ডিং থেকে বাড়ী যাওয়া, কত ফাল্গুন দিনে প্রতিভা-সুন্দরী পড়া, কত জানালায় ধূপগন্ধ—কত জন্মের মধ্য দিয়ে

বারে বারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নূতন নূতন অজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে আসা যাওয়া, নব নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস-আনন্দ।

হে আনন্দময়, যুগে যুগে তোমার মহারহস্যময় জীবনধারা বিজয়ীবৎ বিমৃত্যু, বিশোক, পথহীন মহাপথ ছেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত সহস্র জন্ম মৃত্যুর মাঝ দিয়ে কোথায় সে ভেসে চলেছে।

নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল

মহাকালের মহাকলেবরের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—

অনন্ত নীল ব্যোম্-সমুদ্রে এখানে ওখানে পার্টকিলে রংয়ের মেঘদ্বীপের দিকে—

।। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭, ভাগলপুর ।।

Life ! Life !

কাল রাত্রে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোদ্দাম অনুভব করলাম—ওরকম অনেকদিন হয়নি। শক্তির, উৎসাহের, কল্পনার, আনন্দের, উদ্দীপনার, সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের কি বিরাট প্রাণ-মন মাতানো, পাগল করা, উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন গতি-বেগ! নদীর কূল-ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া ক্ষেপাজোয়ারের কি দুর্ম্মদ, ফেনিল, প্রণয়লীলা! মনের মধ্যে জীবন যেন বলছে—এই যে গণ্ডী তুমি তোমার চারিদিকে রচনা করে বসে আছো এরা তোমারই ভৃত্য তোমারই দাস। তুমি কেন ভুল করে এদের হাতে ইচ্ছে করে খাঁচার পাখীর মত বন্দী হয়ে আছো? তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। জীবনটা ভালো করে দেখতে হবে। উপভোগ করতে হবে। জীবন উৎসের মূল শুকিয়ে দেয় অলস নিষ্কর্মা জীবনযাত্রায়। শত্রুকে তাড়াতে হবে।

কূল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো! উদ্দাম উন্মত্ত বিজয় বিমৃত্যু গতির বেগে বার হয়ে পড়ো। কি ঘরের কোণে বসে মোকদ্দমার ফাইল আর স্টেটমেণ্ট ঘাঁটছো।—তোমার মাথার ওপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ রহস্যময় অজ্ঞাত, নব নব ঘূর্ণ্যমান গ্রহরাজিকে বুকে নিয়ে চলেছে। ধূমকেতু নীহারকণা নীহারিকা সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আলোকবর্ষ পারের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুন অজানা প্রাণীজগৎ, বিশাল প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম্, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট, এলুমিনিয়াম্,—প্রচণ্ড জাগতিক তেজ X-ray বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জ্বলন্তপুচ্ছ জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতুপিণ্ড, প্রস্তরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত রহস্যভরা ইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটী প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্য-যুগ, অঙ্গারযুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা, কত কূলহীন, দিকহীন গর্জ্জমান মহাসমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে। চুপ করে চোখ বুজে বসে এই গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাযাত্রার উৎসবের কথা ভাবো—কোথায় যাবে তোমার দুদিনের বদ্ধজীবনের দৈন্য, কোথায় যাবে তোমার রুদ্ধ ঘরের অনির্ম্মল দুষ্ট হাওয়ার ভাণ্ডার—প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেরিয়ে পড়ে দ্যাখো জীবন কি মহিমাময়, কি বিরাট, কি ঋদ্ধিশীল! কি অক্ষয় অনাদি অনির্ব্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয়-সঙ্গীত।

ঘুঙুর বাঁধা পায়রা হয়ে ছাদের আলসে আঁকড়ে পড়ে থোকো না, বাজ পাখীর মত ওড়ো, মাথার ওপরে যে অনন্ত অকূল শাশ্বত নীলাকাশ—তার ঘননীলের মধ্যে পাখা ছেড়ে দাও, উড়ে যাও—উড়ে যাও—সুন্দর বৈকালে, আমের বউলের গন্ধ ভেসে

আসছে, পাখী ডাকছে, বনঝোপের পাতা সর্ সর্ করছে—জীবনে এ বৈকাল কতবার আসে কতবার যায়, কিন্তু প্রত্যেক অপরাহ্ণই যেন নিত্য-নূতন মনে হয়, কারণ সামনে যে অজানা রাত্রি আসছে। অজানার আনন্দই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ। অন্ধকারে সূর্য্য ডুবে গেল, কিন্তু আবার সকালে উঠবে। আবার নতুন জীবন নতুন ফুল ফল দূর্ব্বা শিশির পাখীর গানে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। আবার কত হাসি কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, কত জানালায় ধূপগন্ধ—

অশান্ত প্রাণপাখী আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার লোভে ছট্‌ফট করছে—জীর্ণ পিঞ্জরদলে শুধু অধীর অকূল পক্ষবিধূনন! উড়তে চায়—উড়তে চায়—পরিচিত, বহুবার দৃষ্ট, এক-ঘেয়ে, গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যে আর নয়, একেবারে অপরিচয়ের অকূল জলধিতে পাড়ি দিতে চায়, হয়ত দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশসীমা, তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরুপর্ব্বত। আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু সেখানে যাওয়া যায়, অন্যভাবে নয়—সেখানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী বয়ে যায়—দেববধূগণ পীত হরিৎ তারকার আলোকে মৃদুপদবিক্ষেপে জলখেলা করতে নামে।

জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো, খাঁচার পাখীর মতো থেকো না। জগতের চল-চঞ্চল গতি দেখে বেড়াও দেশে দেশে। দিল্লী আগ্রা গিয়ে দ্যাখো মোগল বাদশাহের সিংসন ঐশ্বর্য্য ছায়াবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে ওঠো, কেদার-বদরীর পথে বেড়াও, অবসাদ দূর হবে, মন দৃঢ় হবে।

।। ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭, ভাগলপুর ।।

সকালে হাওড়ায় চেপে কেমন বর্ষাস্নাত মেঘমেদুর ভূমিশ্রীর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ট্রেনে করে এলাম! নিউ কর্ড লাইনের দুধারে কেমন সবুজ বর্ষাসতেজ গাছপালা, ঝোপ-ঝাপ, ধানের মাঠ। বাড়ীতে বাড়ীতে রান্না চাপিয়েছে—ঘরে ঘরে যে সুখ-দুঃখের লীলাদ্বন্দ্ব চলছে, কেমন ঘরের পেছনে খড়ের ঘরের কানাচে ছোট ডোবায় পদ্ম-বনগুলি! বড় বড় পদ্মপাতাগুলো উল্টে রয়েছে, সাদা সাদা পদ্ম ফুটে—কেমন যেন সব ভাই বোন নীল আকাশের দিকে চেয়ে সারাদিন পদ্মের চাকা তুলে তুলে যায়—এই ছবি মনে আসে। মাঠের ধারের বনে দীর্ঘ ছাতিম গাছটা, নীচে আগাছার বন-জঙ্গল। বীরভূমের মাঠে মাঠে ছোট ছোট চাষার চালা ঘর, লাউ-কুমড়োর লতা উঠেছে রাঙামাটির দেওয়াল বেয়ে, মেয়েছেলেরা গাড়ী দেখছে—সেই যে ছোট ঘরখানা থেকে গাড়ীর শব্দ শুনে মা ও মেয়ে ছুটে (বয়স দেখে মনে হলো) বার হয়ে এলো, আমার এসব কথা আজীবন মনে থাকবে।

।। ২রা আগস্ট, ১৯২৭ সাল ।।

বড় বাসার ছাদ ভাসিয়ে কি চমৎকার—যেন ঠিক শরতের রৌদ্র উঠেছে আজ। নীল আকাশের এমন চমৎকার স্বচ্ছ নীল রং অনেকদিন দেখিনি। কি সুন্দর সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘের রাশি হালকা গাড়ীতে উড়ে চলেছে। চেয়ে চেয়ে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই পুরোনো দিনের কথা মনে আসে—সেই আমাদের খড়ের ঘরখানা, অতীতের কত মধুমাখা দিনগুলোর কথা, সকালে বিলবিলের ধারে সেই বর্ষায় মনসা ভাসান শুনতে যাওয়ার উৎসাহ, সেই পেয়ারা খেতে খেতে পুব-মুখো যাওয়া। মা বসে বসে সেলাই করতেন। নীরব দুপুরে বাইরের দাওয়ায় বসে পড়তাম—সেই সব দিনগুলো! সেই বন্ধুদের বাড়ী বিলাতী কার্ডের ছবি দেখে

দেশকে প্রথম চিনেছিলাম, কিন্তু কি চমৎকার লাগে। (আবার চব্বিশ বৎসর আগের একটা এমনি দিন থেকে জীবন আরম্ভ হয় না? আমি অমনি লুফে নেবো।)

বহুদূরের নক্ষত্রে, গ্রহে কেমন সব জীবনধারা? সময়ের মাপকাঠিটা তাদেরও কি আমাদের মত ওই রকম ছোট, না বড়?...সেখান থেকে এসে আবার পাকড়াটোলার পথটায় আসন্ন সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটালাম। কখনো মাঠ, কখনো ঝোপ-ঝাপ, কখনো উলুবন, কখনো শুধু আকাশ, কখনো ভুট্টাক্ষেত—এই রকম থরে থরে নূতন পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে এই উন্মুক্ত গতি বড় ভাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটলে অন্থকারে ধূসর পাহাড়টাও যেন সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকে—দূর আকাশে শুকতারা উঠেছে. কি জানি কোন্ দূরের জগৎ. সেখানে কি ধরনের জীবনযাত্রা!

।। ৬ই আগস্ট, ১৯২৭ সাল ।।

দূরের দিগন্তপ্রসারী মাঠের শ্যামলতা, চারিধারের স্নিগ্ধ শান্তি, পাখীর ডাক, প্রথম শরতের নীল আকাশ এ সবের দিকে চেয়ে মনে হোল কত যুগ-যুগের এমন ধারা স্পন্দন যেন এসে মনে পেঁাছবে। একটা কথা মনে ওঠে—মানুষের অমরত্ব ব্যষ্টি হিসাবে সত্য না সমষ্টি হিসাবে সত্য? হাজার বছর পরে মনুষ্য জাতি কিরকম উন্নততর ধরনের সভ্য হবে, সে প্রশ্ন আমার কাছে যতই কৌতূহলজনক হোক, আমি —এই আমার অত্যন্ত পরিচিত আমিত্বটুকু নিয়ে হাজার বছর পরে কি রকম দাঁড়াবো —এই প্রশ্নটা আরও বেশী কৌতূহলপ্রদ। কে এর উত্তর দেবে?

আজকার এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে হঠাৎ মনে যেন ভাসা ভাসা রকমের এই কথা এল যে, মানুষের এই যে সৌন্দর্য্যানুভূতি, এই গভীর ভাবজীবন—ভগবান কি জানেন না এসব পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে কত সময় নেয়? যিনি সুদীর্ঘ যুগ ধরে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি সময়ের এ উপযোগিতাটুকু নিশ্চয়ই জানেন। তা হোলেই কি দাঁড়ায় না যে মৃত্যুর পরেও ব্যষ্টি-জীবন চলতে থাকবে—থেমে যাবে না।

তাই তো মনে হয়, সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে এই আলো পাখী ফুল আকাশ-বাতাসের মধ্যে দিয়ে কত শত শৈশবের হাসি খেলার মধ্যে দিয়ে কতবার কত আসা যাওয়া।

আজ দুপুরের নরম রোদে বড় বাসায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাকার কত এরকম দুপুরের কথা মনে হোল—সেই সইমা. দিদিদের কুলতলা, সইমার বাড়ী রামায়ণ পড়া. সেই হাটবার—সব দিনগুলো একেবারে সেদিনের লুপ্ত স্মৃতি নিয়েই যেন আম্বার এল—

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বড় বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে— আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐরকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব-অনটনের মধ্যে. পল্লীর স্বচ্ছতোয়া গ্রাম্যনদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—

যে জীবনে এ্যাডভেঞ্চার নেই, উত্থান-পতন নেই—সে কি আবার জীবন? সেই পুতুপুতু ধরনের মেয়েলি একঘেয়ে জীবন থেকে ভগবান তুমি আমায় রক্ষা করো।

।। ৯ই আগস্ট, ১৯২৭ সাল ।।

পূর্ব্বদিকের জানালাটা দিয়ে আজ বেশ ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে—একটু মুখ তুলে জানালার ওপর গরাদের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়টা দেখা যায়। খাটের পাশে টাটকা তাজা বেল ফুলের ঝাড়টা টবে বসানো, একরাশ ফোটা-ফুল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে এমার্সন পড়তে পড়তে মনে হোল ১৯১৮ সালের

এমনি রাত—সেও ১৪ই ভাদ্র। অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এর একটা এঁদো ঘরের গুমট গরমে প্রথম সিট নিয়ে এই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম। কত আনন্দে, কত উৎসাহে—কি অপূর্ব্ব মোহ, সেদিনের রাত্রির ঘুমঘোরে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—তার পরদিন সকালটিতে আমার সেই নতুন জামাটি গায়ে দিয়ে কত যত্নে কামিয়ে গাড়ী ধরতে ছুটেছিলাম। সে সব দিনের ইতিহাস আর কোথাও লেখা থাকবে না—নেইও। শুধু এক তরুণ-মনে তা আঁকা আছে—আর পঞ্চাশ বছর পরে, কি আর পাঁচশো বছর পরে —সেসব দিনের অপূর্ব্ব পুলকের কাহিনী শতাব্দী-পূর্ব্বের প্রথম বসন্তের পুষ্প-স্তবকের ন্যায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তবু যেন মনে থাকে একদিন সে অমৃতধারা বাস্তব জগতের ছিল।

তাই যখন মিউজিয়মে মমি দেখি তখন সেসব চূর্ণায়মান সাদা হাড়টির বুকে, এই পৃথিবীর নীল আকাশ, রাগরক্ত সন্ধ্যা, বাতাস, আলো, কোনো সুশ্রী শিশুর মুখটি, তরুণীর চোখের দীপ্তি, কোন্ নিভৃত অপরাজেয় অজানা ফুলের সুবাস—এই সব একদিন যে আনন্দের বাণ ছুটিয়েছিল—তিন হাজার বছর অতীতের যে লুপ্ত হাসিগান, মনের শান্তি,—বহুদিন লুপ্ত যেসব জ্যোৎস্নারাত্রি, প্রাসাদশিখরে পদচারণশীল সম্রাট থটমোমিনের চক্ষুকে মুগ্ধ করেছিল—মরুভূমির দূরপ্রান্তনীল সে সব সান্ধ্যসূর্য্যরক্তচ্ছটা, সে ঊর্দ্ধমুখ উষ্ট্রশ্রেণী, খর্জ্জুর কুঞ্জের শ্যামলতা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখনও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, ঐ জানলার ছোট্ট ছায়াভরা ঝোপে খঞ্জন পাখী এমনি নাচত—সে মাধবী রাত্রি, সে নাচ আজকালকার কালে কারুর জানা না থাকলেও একদিন তারা সত্য সত্যই বজায় ছিল।

এমনি আমরাও চলে যাবো। কত হাজার বছর পরে আমাদের হাড় মাটির তলা থেকে হয়তো প্রস্তরীভূত অবস্থায় বেরুবে। তখনকার সে হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ যেন না ভাবে এগুলো বুঝি চিরকাল এইরকম দাঁত-বার-করা সাদা হাড়ই ছিল—তারা যেন ভুলে না যায়, এককালে সেগুলোও তাদের মতই এই বিশ্বের আলো জ্যোৎস্নার সকাল-সন্ধ্যার অংশীদার ছিল। তাদের বীণায় যে সুরপুঞ্জ বেজে বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে তাদের বুকে অদৃশ্য কালমুহূর্ত্তগুলিতে তার লিখন আছে। হে আমাদের স্নেহ-ভাজন উত্তরপুরুষগণ, সে কথা মনে রেখো।

কাল এমনি কেটে যায়, বৎসরে বৎসরে ঝোপেঝাপে ফুলদল এমনি ফোটে আবার ঝরে পড়ে, একদল পাখী গান শেষ ক'রে মরে হেজে যায়। তাদের ছানারা মানুষ হয়ে আবার গান ধরে—গান বন্ধ হয় না তা বলে, ফুলফোটা বন্ধ থাকে না তা বলে।

শুধু আমাদের পৃথিবীতে নয়, অনন্ত আকাশের অসীম গ্রহতারার মধ্যে হয়ত কত লুকানো অদৃশ্য জগৎ আছে। তাদের মধ্যের জীবেদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। উচ্চস্তর বিবর্ত্তনের প্রাণী হলেও জন্মমৃত্যু আছেই আছে। এত বড় নাক্ষত্রিক বিশ্বের যখন আরম্ভ ও শেষ আছে তখন প্রাণীর কথা তুচ্ছ।

অনন্তকালের মুহূর্ত্তগুলি এই রকম শত শত দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বের কত শত প্রাণীর বুকের কথায় ভরা, কত হাসি ব্যথার গানে সুরময়।

অনন্ত দেবের বাঁশির তান অনন্ত যুগমুহূর্ত্ত ছেয়ে ভেসে আসছে—কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে। শুধু আনন্দ দেওয়াই তার লক্ষ্য। এক পলকে জীবনকে চিনে নাও—দুঃখের পথ বেয়ে যেতে হবে কিন্তু সামনে আনন্দধাম—দুঃখনদীর ওপারে

উঃ! কি সত্যি কথাই বেরিয়েছে উপনিষদের ঋষির মুখ দিয়ে—

আনন্দদ্ধেব খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে...

কিন্তু এই সকল আবোল-তাবোল ভাবনার মধ্যে এটুকু ভুলে গেলে চলবে না যে ১৯১৮ সালে এতক্ষণ অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এর আলুভাতে ভাত খেয়ে মির্জ্জাপুরের বেনের দোকানটা থেকে এক পয়সায় চক-খড়ি কিনে কাগজে মুড়ে পকেটে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে শেয়ালদায় গাড়ী চেপেছি—হয়তো গাড়ী ছেড়েছেও।

তারপর সারাদিন আর একথা মনে ছিল না—বিকেলের দিকে খুব ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ষাস্নাত আকাশের তলে মাঠে মাঠে বেড়ালাম, তখনও মনে হয় নি। এই এখন আবার রাত আটটার পর জানালার ধারে বসে লিখতে লিখতে টবের গাছটার ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধে সে কথা মনে পড়ল।

এখন সেই বাঁশবনে ঘেরা বাড়ীতে অন্ধকার রাত্রি, হয়ত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মাঝে আনন্দের কাহিনী দেখব। কতকাল হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলাম আজ যদি যাই? সেই জামাটা প'রে? অন্ধকার রাত্রে ভাঙা দরজার ইটগুলো পেরিয়ে পোড়ো ভিটাতে বর্ষাসতেজ সেওড়া ভাঁটবন। বনচাল্‌তা গাছ—বড় চারাটা। বাঁশঝাড় নুয়ে পড়েছে—ঘন বনে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পিছনের গভীর বাঁশবনে শিয়াল ডাকছে। নয় বছর আগেকার সে রাতটার আনন্দের ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? ঐ পোড়ো ভিটার অন্ধকারে, ঘুপসি বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দে, গভীর রাত্রিতে গভীর বনের দিকে হুতুম পেঁচার ডাকে।

এ সব রাতে একমনে ভাবতে ভাবতে শুধু এর অসীম রহস্যভরা জীবন বড় চোখে পড়ে—এ কোথায় এসেছি? কোথায় চলেছি? সংসারের কল-কোলাহলে যা কখনো মনেও ওঠে না, এ সব নীরব অন্ধকার রাত্রিতে জানালার ধারে বসে গুনগুন করে কোন গানের একটা লাইন গাইতে গাইতে একদণ্ডে সেটা বড় ধরা দেয়। তাই সকল জ্ঞানের পুঁথিতেই নির্জ্জনতার, পরিপূর্ণ অবসরভরা নির্জ্জনতার বড় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দূরের ঐ তারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় এ রকম হাসি-আশাভরা জীবনস্রোত হয়তো ওখানেও চলেছে—কে জানে? বিশাল **Globular Cluster-** এর দেশ, বড় বড়, Star Clouds, ছায়াপথ, কি অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। **Sagittarius** অঞ্চলের নক্ষত্রঠাসা আকাশটার কথা মনে হলেই মন শিউরে ওঠে—পুলকে অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

তাই এই নির্জ্জন রাত্রিতে মনে হয় সুখ আছে এক জিনিসে। কি সে? মনকে প্রসারিত ক'রে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক ক'রে দেবার চেষ্টা করো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরত্তি পৃথিবীটার মত শত শত লক্ষ লক্ষ অজানা জগৎ—তার মধ্যের অজানা প্রাণীদের সে সব কত অজানা অদৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা, কত সুখদুঃখ, কত আনন্দ। সে সব কি অজানা উচ্ছ্বাস—তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃতের জোয়ারে।

মনকে সে ভাবে যে তৈরী করেছে, জগৎ তার প্রিয় সাথী—চিরদিনের বন্ধু।

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন"

কিন্তু ক'জন চিনতে চায় জীবনকে এ ভাবে? সকলেই যে চোখ বুজেই থাকে—খোলে না।

অনন্ত যে তোমার চারধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙ্গিনায় পাখীর ডাকে, সন্ধ্যায় ঝিঁঝি'র সুরে, নৈশপাখীর পাখার আওয়াজে—কিন্তু আমি শুনবো না, আমি

দেখবো না, আমি চোখ বুজে আছি—কার এত স্পর্দ্ধা আমার চোখ খোলে?

।। ২৮শে আগস্ট, ১৯২৭, আজমাবাদ কাছারী ।।

আজ আমি ও রাসবিহারী ঘোড়া করে একটুখানি যেতেই ভারী বৃষ্টি এল। রাসবিহারী সিং বললে নিকটে এক রাজপুতের বাংলো আছে চলুন।—ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে সেই বাড়ী গিয়ে উঠলাম। তার নাম সহদেব সিং। বাড়ী মজঃফরপুর জেলা। রাশি রাশি ফসল ঘরটার মধ্যে গাদা করা, অড়র ভুট্টা ঝুলছে। বললে, বীজ রেখে দিয়েছে। বৃষ্টি থামলে দুজনে ফিরে চলে এলাম।

।। ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ।।

আজ সকালে মধু মন্ডলের ডিহির প্রাচীন বকাইন গাছটার ছায়ায় ঘোড়া দাঁড় করিয়ে জমি মাপলাম। বৈকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাসটোলার নীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে—ঘোড়ার একবুক জল হ'ল পার হবার সময়। ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব্ব নীল রং দেখাচ্ছে! ডান দিকে লাল রংয়ের অস্ত-আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, নীল পাহাড়, ঢালু দুর্ব্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরা ফুলের উলুখড়ের ঝোপ, বড় পাকুড় গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে—বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেল।

দূর প্রান্তে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম বহুদূরের আমাদের বনজঙ্গলে-ভরা অন্ধকার ভিটা, বাঁশবনের কথা। এই সুন্দর অপরূপ শরৎ সন্ধ্যায় গ্রামের লতাপাতা থেকে ওঠা ভরপুর কটুতিক্ত গন্ধটার কথা, সেই বাঁশঝাড়ে শালিখ-ডাকা বাংলাদেশের মায়া-সন্ধ্যার কথা, তরুণীরা মাটির প্রদীপ হাতে গৃহ-আঙ্গিনায় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেখাচ্ছে, ঘরে ঘরে রাত্রির আবাহন—মঙ্গলশঙ্খের রব।

এসময়ে চাঁপাপুকুরের পুকুরঘাটে, তাদের তেতলার ঘরটায়, চট্টগ্রামের দূর প্রান্তের সেই ঘরটাতে, বারিদপুরের বাড়ীটায়, ঝালকাটীর মণির বাড়ীতে না জানি কি হচ্ছে!

মণি বড় হয়েছে—বোধ হয় বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার—যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগান্তের পর্ব্বত-শিখরে নীরব চিন্তামগ্ন। কত শত জন্মের স্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনী, নির্জ্জন গ্রহের নির্জ্জন পর্ব্বতে, যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে—ধীর, নির্জ্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেম কাহিনীর জালে জালে জড়ানো তরুণ সুন্দর মূর্ত্তি তার। নিস্তব্ধ অন্ধরাতে বসে বসে শুধু সে একমনে অপরূপ জীবন-রহস্য ভাবে—ভাবে—

চারধারে বিশ্বের আঁধার ঘিরে আসে, মাথার ওপরে তারা ওঠে, কোন্ সুদূর লোকের পার থেকে অনন্ত অজানার সুর যেন কানে বাজে—একটা ছবি মনে আসে সেটা নীচে আঁকলাম, ছবিটা আমার মনে আছে, কিন্তু আঁকাটা এখানে হবে না, কারণ আঁকতে আমি জানিনে, তবুও এইটা দেখে মনের ছবিটা মনে ফিরে আসবে।

।। ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ।।

সকালে আজ কিরকম করে বৃষ্টিটা এল! কাটারিয়ার দিক থেকে ভয়ানক মেঘ

করে এল। ঘন কালো মেঘের রাশ ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের মুখে হু হু উড়ে আসতে লাগলো। মাটিতে জল কি মিশ-কালো ছায়াটা ফেললে! বড় অশ্বত্থ গাছের ধারের বন্যার জলটা যেন কালো সোনার রং হয়ে উঠল। বকের দল ভয়ে ভয়ে ওপর থেকে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মুখে উড়ে উড়ে এপারে আসতে লাগল। কাকের দল কা কা করে ডাকতে ডাকতে দিশাহারা ভাবে উড়ে আসতে লাগল। তারপর এল ভীষণ ঝড়। শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ বেগে গাছপালা লুটিয়ে নুইয়ে ফেলে মেঘগুলোকে ঘুরতে ঘুরতে বটেশ্বরের পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলল। কোথায় কোন সমুদ্রের জলের রাশি কি কৌশলে মাথার উপর দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন! তারপর এল বৃষ্টি।

বৈকালে ঘোড়ায় করে বার হয়ে সহদেবটোলার পথটা ধরলাম। দুধারে কেমন বাংলাদেশের মত কাঁটার ঝোপ, তেলাকুচা লতার গায়ে পাকা তুলতুলে সিঁদুরের-মত-রং তেলাকুচা ফল ঝুলছে। পড়কলমীর নোলক ফুটে আছে, বনসিদ্ধির জঙ্গল, আলোকলতার জঙ্গল, মটরলতা, স্নিগ্ধ বনদৃশ্যকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্য আস্তে আস্তে ঘোড়া চলতে লাগল। তার পরে সুখটিয়ার জন্য কুলের জঙ্গল দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে দেখি সামনে কালোয়ার চকহাট। সেখান থেকে জঙ্গল বেয়ে একহাঁটু জলকাদা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে একেবারে গেলাম কলবলিয়ার ধারে। কাশ-বনটার কাছে থেকেই দেখলাম ফিকে হলুদ রংয়ের গোল সূর্য্যটা মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কলবলিয়ার ওপরে তিরাশি সেকেণ্ড যেন অপেক্ষা করলো, তার পরেই সে তার তপ্ত মুখখানা লুকিয়ে ফেলতে আর দেরি করলো না।

আবার অন্ধকারে ঘোড়া ছাড়লাম। কুলের জঙ্গল দিয়ে কাশবনের ভেতর দিয়ে, জলকাদা ভেঙে ঘোড়া এসে উঠল গ্রাণ্ট সাহেবের জমির অশ্বত্থ গাছটার কাছে। সেখানে পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। একে মেঘান্ধকার, তাতে কৃষ্ণাপঞ্চমী—ঘোড়াও পথ দেখে না, আমিও না। পথে এক জায়গায় অনেকটা জল পার হতে হোল ঘোড়াটাকে। অন্ধকারে অন্ধকারে গোমলা ঘাসের ক্ষেতের মধ্যেকার সুঁড়িপথ দিয়ে চলে আসতে লাগল। চারধারে লোক নেই, জন নেই, আকাশে একটা তারা নেই। সামনে পড়লো আবার জল, সেই জলটায় আবার কুমীরের উপদ্রব আছে। যাই হোক, ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে জল পার করিয়ে মকাই ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে একপ্রহর রাত্রে কাছারীতে পৌঁছলাম।

।। ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ।।

বিকালের দিকে অনেক দিন পরে বেড়াতে গিয়ে যতীনবাবুর দোকানে কথা বলছি —হেমন্তবাবু টেনে নিয়ে গেলো ম্যাচ্ দেখতে, সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হোল। হেমন্তবাবু উকীল, যতীশবাবু ইত্যাদি। ওখান থেকে ফিরে দুজনে গেলাম হেমেনের কাছে। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর ক্লাবে গেলাম। বাসায় ফিরে অনেক রাত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নাভরা ছাদে বসে রইলাম একা। শুতে যেতে আর ইচ্ছা করে না। ইচ্ছে করে শুধুই বসে বসে এই দীর্ঘ নিৰ্জ্জন রাত্রি ভাবতে আর নানা রকম কল্পনা করে কাটাতে।

'আনমনে রচি বসি তন্দ্রাদীর্ঘ দিবসের অলস স্বপন'—ভাটপাড়ার সেই বধূ দুটি, যাঁরা বিজয়ার দিনে আমাকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রহ করে ডেকে জলখাবার খাইয়েছিলেন—আজ হঠাৎ তাঁদের কথা মনে পড়ল। সত্যকারের স্নেহ কি ভালবাসার ঘটনা বিফলে যায় না—তাঁদের সে অনাবিল স্নেহের ফল এই হয়েছে যে তাঁরা আমার মনে একদিনের জীবনপুলকের সঙ্গিনীরূপে স্থায়ী আসন পেয়েছেন।

আর এই প্রায় তিন বৎসর পরে এই দূর দেশে যখনই ভাবলাম তাঁদের কথা, তখনই আনন্দ পেলাম।

মোপাসাঁর সেই পলাতক লক্ষ্মীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল—সেই জাহাজের ডেকে সেই ছোট ছেলেটি যখন তার হতভাগ্য নির্ব্বাসিত খুড়োকে দেখলে তখন তার বালকহৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত অথচ গোপন সহানুভূতিটুকু!

তাই মনে হোল সাহিত্যে এই ভাবজীবন প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাবজীবন খুব গভীর নয়—ব মন এমন ভাবে তৈরী যা কিনা কোন বিষয়েই গভীরত্বের দিকে যাবার উপযোগী নয়। অথচ এই গভীরত্বের অভাবে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এ দৈন্য অর্থে পূরণ হয় না, ঐশ্বর্য্যে নয়। সাংসারিক বা বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সব অপূর্ব্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে, উপযুক্ত গড়ে ওঠা মনের সঙ্গে।

এই মোপাসাঁর মত লোকেরা আসেন আমাদের এই বড় অভাবটা পূর্ণ করতে। তাঁদের ভাগ্যের লিখন এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। নিজের গভীর ভাবজীবনের গোপন অনুভূতির কাহিনী তাঁরা লিখে রেখে যান উত্তরকালের বংশধরদের জন্যে। হতভাগ্য দীনহীন খুড়োর দৈন্যের করুণ দিকটা একদিন কোন নিভৃত তুষারবর্ষী রাত্রে আগুনের কুণ্ডের আরাম-কেদারায় বসে কথাটা মনে হয়ে মোপাসাঁর তাঁর চোখে জল এনেছিল, আজ সর্ব্বদেশের নরনারীর চোখে জল আনছে—আজ কতকাল পরে সেই কল্পনাদৃষ্ট বৃদ্ধ ও তার দীন বাজিকরের ছিন্ন বেশ, কয়লা কালিঝুলি-মাখা হাত-পা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তারা জন্মেছে, তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্ত্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অন্তরের এক মুহূর্ত্তের কথা, তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকে যাবে। এই যুগের শেক্সপীয়র হোমার বাল্মীকি দ্রনাথ তাজমহল, Great War এই কলকারখানা, সামাজিক বিপ্লব, এই বিভূতি, শূন্য, ভারতে স্বরাজ নিয়ে মহাদ্বন্দ্ব, বাদলায় এই ম্যালেরিয়া, বার্ণার্ডশ' বা ওয়েল্‌স, ইবানেজ, মেটারলিঙ্কের প্রতিভা, আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীদের এই পৃথিবীময় ছড়িয়ে যাওয়া, জাপানের ভূকম্পন—এই সবসুদ্ধ জড়িয়ে এই যুগটার নানা দিকের কাহিনী, ইতিহাসে লেখা হবে। প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ- ছেলেমেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামা লেখকই কেন হোক না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনো কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না—প'ড়বেই সেটাকে সকলে। সকলেই খেলার তাঁবুর বাহিরদুয়ারে অপেক্ষা করছে—রহস্যভরা খেলাটা সকলের ভাল লাগে, কিন্তু ভাল বুঝতে পারে না—তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ও তুলনা হয়—'মশাই কিরকম দেখলেন?' প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে—প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে, তবে শূন্য ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে তেমনি হ্যামলেটের পিছনে শেক্সপীয়ার গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।

তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবো। আমি জগৎকে কি রকম দেখলাম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সাথীকে আমি আনন্দ-মুহূর্ত্তে দেখলাম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃতরসে স্নিগ্ধ করলে। গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে যাবো—সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আসবো না, হয়তো আবার যুগযুগান্ত পরে ফিরে আসবো—কে জানে? বহুকাল পৃথিবীর সন্তানগণের মনে এ লেখা ঐ ইতিহাস কৌতূহল জাগাবে—তাজমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন মাহেঞ্জোদরোর খদ, গভীর মাটির রাশির মধ্যে যাকে খুঁড়ে বার করতে হবে—Great War-এর কথা মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধের কাহিনীর মত প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে—কলকাতা শহরটা বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে—সেই সুদূর অতীতের নতুন যুগের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ এ সব কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। বলবে—আরে দেখ, সেই সে কালেও লোকে এমনি ভাবে বিয়ে করতে যেতো! এই রকম জমি নিয়ে মারামারি করত, মেয়ের বিদায়ের সময় কাঁদতো! ভারী আশ্চর্য্য হয়ে যাবে তারা।

যুগযুগান্তের শ্মশানে জীবনদেবতা বসে বসে শুধু হাসবেন।

।। ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ।।

আজ অনেকদিন পরে পরিচিত সেই বনটার ধারে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। পশ্চিম আকাশে অপূর্ব্ব রাঙা মেঘের পাহাড়, সমুদ্র, কত বিচিত্র মহাদেশের আবছায়া। সামনের তালবনগুলো অন্ধকারে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! চারধারে একটা গভীরতা, অপরূপ শান্তি, একটা দূরবিসর্পিত ইঙ্গিত।

এই স্থানটা কি জানি আমার কেন এত ভাল লাগে! যখনই আমি এখানে সারাদিন পরে আসি তখনই আমার মনে হয় আমি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গিয়েছি। এই গাছপালা, মটরলতা, পাখীর গান, সন্ধ্যাকাশে বর্ণের ইন্দ্রজাল—এ অন্য জগৎ—আমি সেই জগতে ডুবে থাকতে চাই—সেটা আমারই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া!

নীচের জলাটা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলা—সেখানে অধুনালুপ্ত হিংস্র অতিকায় সরীসৃপ বেড়াতো—সামনের অন্ধকার বনগুলা কয়লার যুগের আদিম অরণ্যানী—আমি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দেখি কত রহস্য, কত অপরূপ পরিবর্ত্তনের কাহিনী, কবেকার ইতিহাস ওতে আঁকা, কত যুগযুগের প্রাণধারার সঙ্গীত।

বড় বাসার ছাদে বসে বসে ছেলেবেলার দুই একটা বড় ঘটনার কথা ভাবতে চেষ্টা করেছিলাম। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তো সকলেরই হয়—ওতে ভাববার কি আছে! এ আর নতুন কথা কি? তা নয়। এই ভেবে দেখাটাই আসল। না ভাবলে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে। নইলে আকাশের ইথারে তো চব্বিশ ঘণ্টা নানা ভাবের স্পন্দন চলছে, কিন্তু যে বিশিষ্ট ধরনের স্পন্দনের ঢেউ-এর নাম সঙ্গীত তা এত আনন্দদায়ক হ'ল কেন? দিনের পর দিন সূর্য্য অস্ত যায়, পাখী গান করে, খোকাখুকিরা হাসে—যদি কেউ না দেখতো, না শুনতো—তবে মানুষের দৈনন্দিন বা মানসিক জীবনে তাদের সার্থকতা কিসের থাকতো? কিন্তু মানুষের মনের সঙ্গে যখন এদের যোগ হয় তখনই

এদেরও সার্থকতা, মনেরও সার্থকতা। মনের সার্থকতা এই যে বিপুল সৃষ্টির আনন্দকে সে ভোগ করে নিজেও বড় হয়ে উঠল, আত্মাকে আর এক ধাপ উঠিয়ে দিলে —এদের সার্থকতা এই যে এরা সে উন্নতির আনন্দের কারণ হোল।

তাই আমাদের শাস্ত্রেও যোগকে অত বড় করে গিয়েছে। এই বিশ্বের অনন্ত আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগই মানবজীবনের লক্ষ্য। সে কি রকম? মানুষ সাধারণত ছোট হয়ে থাকে—হিংসাদ্বেষ, অর্থচিন্তা তার কারণ। অনন্ত অধিকারের বাণী সে শোনেনি বলেই সে নিজেকে মনে করে ছোট—বাইরের আলো পায় না বলেই এই দুর্দশা। এই ভূপতিত, ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে উঁচুতে ওঠাতে পারে তার মন। মন মুদিখানার দোকান থেকে বার হয়ে পোদ্দারী আড্ডা খোলে এসে। বাইরের অনন্ত নক্ষত্র-জগতের দিকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চোখ চেয়ে থাকুক—কান পেতে নদীর মর্ম্মর, পাখীর সুর, রন্ধ্র থেকে উপচীয়মান সঙ্গীত শুনুক—এই হোল যোগ। সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিক অনন্তের দিকে—এই হোল যোগ। আর সে ছোট থাকবে না—বড় হয়ে যাবে। ঐ অনন্ত শূন্যের উত্তরাধিকারী সে যে নিজে একথা বুঝবে—কি অনন্ত আনন্দ তার জন্যে অপেক্ষা করছে তা বুঝবে—অনন্তের দিকে বিসর্পিত তার আত্মাই তখন তাকে বড় করে তুলবে।

এই অবস্থা ঘটেছিল এক সুদূর অতীতে সেই চিন্তাশীল কবির—যিনি জোর গলায় জ্ঞানের চিন্তার স্পর্দ্ধায় বলেছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—তিনি বুঝেছিলেন, ত্বমেব বিদিত্বাদিমৃত্যুমেতি—নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মৃত্যুকে জয় করে বড় হতে গেলে এই অন্ধকারের পরপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ যাঁকে মহর্ষি নিজে বুঝেছেন এবং এটুকুও বুঝেছেন যে তাঁকে না বুঝলে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে ওঠার আর পথ নাই—তাঁকেই জানতে হবে।

যে অমৃত-প্রভাতে আদিম ভারতের কোন্ তপোবনে এ মহাবাণীর জন্ম হয়েছিল, সে তপোবনের, সে প্রভাতের বন্দনা করি।

সত্যই তো। অনন্ত বিশ্বকে মানলেই তো মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে, তার ওপর এই বিশ্বজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার ওপারে তার কর্ত্তব্যজ্ঞান যে লাভ করেছে সে অতিমানব —এ বিষয়ে ভুল নেই।

অতিমানব সে-ই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে।

মনোরাজ্যে মানুষের অতি অমূল্য অধিকার। একে খুব কম লোকেই জানে, খুব কমই এর সঙ্গে পরিচিত। ভাববার সময় মানুষে পায় না। অথচ এই মনই মানুষের অন্ধকারে পরপারের জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত জীবনের বেলাভূমিতে যাবার একমাত্র অদৃশ্য পুষ্পক রথ।

তোমাকে যে দেশের জঙ্গল কাটতে হবে সেটা ঠিকই, বুভুক্ষিতকে অন্ন দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, চিন্তার দ্বারা তুমি মানবজাতিকে যে আনন্দের স্তরে ওঠাতে পারো, সাময়িক একমুঠো অন্নদানে সে সাহায্য হবে না। নিজে বড় হও তারপর সেই আনন্দের বার্ত্তা পরকে শোনাও—আশার বাণীতে তাদের জরামরণ ঘুচে যাবে।

ভগবান তাঁর অনন্ত জীবনের আনন্দ সকলকে বিলিয়ে দিতে চান এই জন্যেই যে তাঁর মত উচ্চ জীবনের কল্পনা, ধ্যান, বুদ্ধি সকলের হয় এই তিনি চান। তার উপায়ও তিনি করেছেন, তবুও যদি ছোট হয়ে থাকা যায় তবে কে কি করবে?

সংসারে কলকোলাহলের ঊর্দ্ধে নিত্যকালের মশালচীদের যাবার পথ, তোমার ব্যাকুলতা দেখে তোমার মশাল তাঁরা জ্বেলে দেবেন, নয়তো অনেকের মত তোমার মশাল এমনিই থেকে যাবে।

"Let us not fag in paltry works which serve one not and lag alone. Let us not lie and steal. No God will help. We shall find all their terms going the other way—Charle's Wain, Great Bear, Orion, Leo, Hercules, every God will leave us. Work rather for these interests which the divinities honour and promote—justice, love, freedom, knowledge, utility."

।। ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ।।

ভবঘুরের রক্ত পেয়ে বসেছিল, তাই আজ বেরিয়ে পড়লাম আমি ও অম্বিকা। সকালে হেমন্তবাবু এসে প্রথম মাইল পোস্ট পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। চারধারে সবুজ ধানক্ষেত, জলাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে, দূরে তালগাছের সারি ও নীল পাহাড়শ্রেণীর সীমারেখা। বারো মাইল চলে এসে রামবাবুর বাড়ী রয়ে গেলাম। সেখানকার অভ্যর্থনা, পান, করঞ্চার সিরাপ দিয়ে চাটনি কখনো ভুলবো না। রামবাবুর বাগানটিতে ছায়াভরা পেঁপেগাছ ফুলগাছ বড় ভাল লাগল। সেখান থেকে বার হয়ে বৈকালের দিকে কি সুন্দর দৃশ্য! খড়কপুর পাহাড়ের ওপর সূর্য্য অস্ত গেল। পাহাড়ের কি নীল রং, ধানের রং কি সবুজ! সন্ধ্যার সময় এসে রজৌল থানায় পেঁছে মুসলমান দারোগাটির আতিথ্য গ্রহণ করলাম। বেশ ভাল লোক—আজকাল এই হিন্দু-মুসলমানে বিবাদের দিনে এরূপ আতিথ্য দেখলে বড় আনন্দ হয়—মানুষের আত্মা সব সময়ে যেন বাইরের কুয়াশাতে দিশাহারা হয়ে থাকে না—বরং যখন আপনি-আপনি থাকে তখনই সে মুক্ত, অনন্ত সুখী থাকে—এর আমি অনেক প্রমাণ আগে পেয়েছি, এখানেও পেলাম।

এই থানা, সামনের মৃণাল-ফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কি সুন্দর হাওয়া—সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না বসানো টেবিলটার ধারে বসে লিখছি—এ সব যেন কোথায় এসে পড়েছি!—সেই—সেই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মত যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেই মার তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশভ্রমণের বাতিক—সেই বড়দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো—কত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুব নিয়ে চলেছ—সেই কিশোরীবাবুর বাড়ী, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।

।। ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রজৌল থানা ।।

কাল রজৌল থানা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত খারাপ রাস্তায় মাঠের বাঁকা আলপথে এসে পেঁছুনো গেল। চানন নদীর কূল থেকে কি সুন্দর দৃশ্যটা! গুপিবাবুর বাড়ীতে সেদিনটা থেকে আজ ভোর পাঁচটাতে জামদহের পথে রওনা হলাম। চাননের বাঁধ থেকে দূরে পূর্বাদিকে তালের সারির আড়াল দিয়ে সিঁদুর রং-এর অরুণ আলো দেখা দিচ্ছে—আরও দূরে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়—এধারে কাকোয়ারা ওধারে বৌংশীর পাহাড়। পথে কেবলই দূরে দূরে পাহাড়, উঁচু নীচু ঢেউ-খেলানো লাল কাঁকরের পথ—চাননের জল স্থানে স্থানে জমে আছে—দূরে দূরে তালের সারি, শাল গাছের বন—রাঙা বালির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় নদী বয়ে যাচ্ছে—সাঁওতাল পরগণার ছায়াময়ী

অতি পরিচিত অথচ প্রতিবারেই-নতুন-মনে হওয়া ভূমিশ্রী।

সন্ধ্যা সাতটা। ডাকবাংলোর টেবিলে নির্জ্জনে বসে লিখছি। নীচের চানন নদী ওপরের পাহাড় অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না—সামনের আমবনের মাথার ওপর তারা উঠেছে—লছমীপুরের ম্যানেজার নদীয়াবাবু ও-অংশে কাছারী করছেন—প্রজারা কথাবার্ত্তা বলছে—এই সুন্দর অপরিচয়ের মধ্যে বসে মনে হোল কতদিন আগেকার গানটা—'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার'—ঠিক এই সময়—কলকাতার বোর্ডিংটা। আজ দ্বিতীয়া—সামনেই পূজো আসছে, ষোলই আশ্বিন। সেবার পূজো ছিল চব্বিশে। সেই সময়কার দূর-কালের সে জীবনটার সংগে আজকার নির্জ্জন জীবনের মধ্যকার এই শালবন-বেষ্টিত পাহাড়, নদীতীরের ডাকবাংলা, এই নিভৃত সন্ধ্যা, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবনটা মনে পড়ে। আমি এই রকম অতীতের ও বর্ত্তমানের এই রকম বিভিন্ন জীবনযাত্রার কথা ভাবতে বড় ভালবাসি। বড় ভাল লাগে, কোথায় যেন একেবারে ডুবে যাই। আজ সকালে মহিয়ারডি, লড়কী কয়লা প্রভৃতি অদ্ভুত রকমের গ্রামগুলো ও অপূর্ব্ব পথের দৃশ্য, অম্বিকাবাবুর ললিত ডেপুটিকে প্রশংসার কথা অনেক দিন মনে থাকবে। কাল সকালে লছমীপুর যাবার প্রস্তাব হয়েছে—দেখা যাক। ভগবান আশীর্ব্বাদ করুন, দেওঘরে অবশ্যই পৌঁছে যাবো। ডাকবাংলায় জলের বড় অভাব—পূরণ ছুটোছুটি করছে। নাগেশ্বর প্রসাদ, লছমী মুন্সী দেওয়ান শ্রীধরবাবুর নামে পত্র নিয়ে আজ সন্ধ্যার আগে ঘোড়ায় করে লছমীপুর চলে গেল। পায়ে এমন বড় ফোস্কা হয়েছে যে ওপথে বড় চড়াই-উৎরাই শুনে একটু ভাবছি। জয়পুর পর্য্যন্ত মিশিরজী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হোল।

আমি এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবসুদ্ধ দিনটাকে ও তার আবহাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।

॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, জামদহ ডাকবাংলা ॥

জামদহ ডাকবাংলা থেকে বেরিয়ে লছমীপুরের পথে কি সুন্দর দৃশ্যটা দেখলাম—চাননের ওপারে পাহাড়ের মাথার ওপর প্রভাতের অরুণ-আভা, উঁচুনীচু পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষীণস্রোতা নদী—শালবন, বড় বড় পাথরের টিলা। গভীর উপত্যকার মধ্যে শালবনবেষ্টিত লছমীপুর গড়ে এসে পৌঁছানো গেল বেলা আটটাতে। দেওয়ান শ্রীধরবাবুকে কালিবাড়িতে খবর দেওয়া গেল। লছমীপুর প্রাসাদে পৌঁছে দেওয়ানখানায় বসে রইলাম। তার আগেই কালীপদ চক্রবর্ত্তী গুরুঠাকুরের ওখানে চা খাওযা গেল। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দুর্গম জঙ্গলের পথে হরপুর রওনা হলাম। উচ্চ মালভূমির উপর গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ। দুধারে খদির, হরিতকী, বয়েড়া, বাঁশ, আবলুশ, আমলকী, কৎবেল, বেলের জঙ্গল। প্রথম জঙ্গল পার হয়ে দ্বিতীয় জঙ্গলটা শুধু ঘন আবলুশ ও কেঁদ জঙ্গল। এত বড় বড় পাথর যে জুতা ছিঁড়ে বুঝি পাথর পায়ে ফোটে। অম্বিকাবাবু, ভারী বিরক্ত হোল—এত গভীর বন দিয়ে কেন আসা? বনে ভালুক, বাঘ ও হরিণ প্রচুর। জঙ্গল শেষ করে রাঙা মাটির উঁচু-নীচু পথ। শালের ও মহুয়ার বন পার হয়ে হয়ে অবশেষে জয়পুরের ডাকবাংলায় পৌঁছানো গেল। ওঝাজি লছমীপুরের কাছারী থেকে নিয়ে এসে আহার ও রন্ধনের আয়োজন করলে।

বেশ কাটল আজ সারাদিনটা। বনোয়ারীবাবুর কথা যেন মনে থাকে বহুদিন। রাণীসাহেবার এক ভাই এলেন। বাবরীচুলের গোছা, স্প্রিং-এর মত কপালে ও মুখের দুপাশে পড়েছে। পকেটে একটা বড় টর্চ্চ যেন একটা পিতলের বাঁশী, হাতে সোনার

হাতঘড়ি। রং কালো, আবলুশ কাঠ হার মেনেছে। পথে সাহেবের বাংলা থেকে অম্বিকাবাবু কি সুন্দর ফুল তুলে নিলে। আমি আমলকী, হরীতকী, বয়েড়া তুলে পকেট বোঝাই করলাম।

এত বড় বন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সারাদিন লছমীপুরের আমলাদের উপর অম্বিকাবাবু ও আমি খুব হুকুমটা চালালাম যাহোক্।

॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, জয়পুর ডাকবাংলা ॥

কাল সকালে উঠে গেলাম পূজো দেখতে আমলাকুণ্ডু কাছারী। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে চা খেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে ঘোড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। আসবার সময় নৌকায় উন্মুক্ত গঙ্গার উপর জ্যোৎস্না কি অমল, উদার...

এই সব জ্যোৎস্নায় যেন কার মুখ মনে পড়ে! এই মৃদু হাওয়ায় তার স্পর্শ আছে...ছেলেবেলাকার সেই নবীন শিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো। সেই পাকাটির গন্ধ, নূতন গ্রামে এসেছি, একটু একটু ভারী ম্যালেরিয়া ভরা যেন হাওয়াটা, উঠানে শিউলিফুল ফুটেছে, সম্মুখে বিস্তৃত অজানা জীবন মহাসাগর। সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখ দুটি ও শিবাজীর হাতের কম্পায়মান উন্নত বর্শা মনে পড়ে।

নবীন তাজা প্রভাতে পূজার ঢাক বাজছিল গ্রামান্তরে ছাব্বিশ বছর আগে---ছাব্বিশ বছর আগের পাখীর দল, ফুলের গুচ্ছ আমার গ্রামের পথে পথে বনে বনে অমর হয়ে আছে।

এই যে আজ পূজোতে কহলগাঁতে ঢাক বাজে, পঁচিশ বছর আগে কি বেজেছিল ঠিক এই রকম! এই রকম হাসিভরা ছেলেমেয়ের দল...তারা কোথায় সব চলে গিয়েছে! আড়াই শত বছর পরে যারা আসবে তারা অনাগত ভবিষ্যতের সম্পদ, তাদের ভেবে মন কেমন মুগ্ধ হয়।

কয়দিন সুরেনবাবুর ওখানে রামচন্দ্রপুরে কাটিয়ে আজ হেঁটে ফিরে এলাম। কয়দিন বেলিবনে বসে বসে কি আড্ডা! কাল বৈকালে চক্রতোর নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে কত কথা গল্প হোল। আমি, সুরেনবাবু ও মুরলীধর নদীর ধারে ঘাসে বসে অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চেয়ে বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না উঠলে রওনা হলাম। সকালে আটটার মধ্যে ভাগলপুর এসে দেখি মেজ মামা এসেছেন।

॥ ৯ঠা অক্টোবর, ভাগলপুর, ॥

সুরেনবাবুর ওখান থেকে গেলাম C. M. S. School এ। সেখান থেকে এসে নির্জ্জনে বহুক্ষণ অন্ধকারে বসে রইলাম।

মানুষ কি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে জন্মেছে? তার অদৃষ্ট কি তাকে শস্যক্ষেত্রে ফসলের আঁটি বাঁধতে চিরকাল চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়? তামাকের দোকানে পোদ্দারের নিক্তির সাহায্যে, মণিকারের কষ্টিপাথরের সঙ্গে সুপরিচয়ের বন্ধনে?

যে মানুষের চারধারে গহন অসীম বিস্তৃত, মাথার ওপরে শূন্যে এখানে ওখানে ক্ষণে ক্ষণে মিনিটে চার-পাঁচটা করে কত না-জানা প্রাচীন জগতের ভাঙা টুকরোর তারাবাজি ধুমভস্ম পরিণত হচ্ছে, যে শান্ত সন্ধ্যায় পাখীর গানে নদীর মর্ম্মরে রক্ত-সূর্য্যের অস্ত-আভায় অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে—যে মানুষ পাথরে কাপড়ে ক্যান্

ভাসে বড় সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, নব ধর্ম্ম প্রচার করেছে, কত লোককে কাঁদিয়েছে, নক্ষত্রজগৎকে চিনিয়েছে, ভগবানের সত্তাকে আন্দাজ করেছে—তার অদৃষ্ট কি পৃথিবীর ধূলার সঙ্গে সত্য সত্যই জড়িত থাকবে?

বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কত দূর দিনে ঐ সমস্ত বিশাল নাক্ষত্রিক শূন্যের সে হবে উত্তরাধিকারী। অসীম ব্যোমপথে নব নব গ্রহতারার অজানা সৌন্দর্য্যের দেশে তার সে অভিযান এখন সে মনে ভাবতেও সংকুচিত হয়, তখন তা হবে নিত্য নূতন আনন্দের পুষ্পবীথি। মানুষের ভবিষ্যৎ অদ্ভুত, উজ্জ্বল, রহস্যময়, রাত্রির অন্ধকারে —এই নির্জ্জনে বসে স্পষ্ট তখন দেখতে পেলাম।

সত্যিই আর ভয় করি না, নিরানন্দ বোধ করি না। মানস-সরোবরের শতদল পদ্মের মত এই অনন্তের বোধ আমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে যেন। যখন নীল আকাশের দিকে চাইলেই মনে হয় আমার এ দুর্দ্দিনের প্রবাস অনন্তের খেয়ার এপারের ঘাট-পারানির ছোট কুঁড়েখানা। ঐ তো কানে আসছে উন্মত্ত গহন গভীর সাগরের ক্ষুব্ধ উদাত্ত সঙ্গীত। কুঁড়ের চাল ভুলে যাই। পুঁইমাচার কথা মনে থাকে না। লাউশাকগুলো গরুতে খেয়ে ফেললে কিনা দেখবার কার মাথাব্যথা পড়েছে?

শতজন্মের পারে তাঁকে যেন আবার পাবো। কোন্ দেবতা আছেন যেন জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা। তিনি সব দেখেন শোনেন।

কতদিন আগে এই সময়ের সেই গানটা মনে পড়লঃ

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই।'

॥ ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

আজ সকালে মাহেন্দ্রু ঘাট থেকে স্টীমারে হরিহরছত্র মেলা দেখতে গিয়ে কত কি দেখলাম! ভেটারিনারী হাসপাতালে জিনিসপত্র রেখে টমটমে বেরুলাম। কি ভিড়, ধুলো। সেই যে মেয়েটি ধূলায় ধূসরিত কেশ নিয়ে বসে আছে, ভারী সুন্দর দেখতে। হাতী বাজার, উট বাজার, চিড়িয়া বাজার—কত সাহেব-মেম ধূলি-ধূসরিত হয়ে মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। হাজিপুর থেকে, মজঃফরপুর থেকে ট্রেন সব আসছে, লোক ঝুলতে ঝুলতে আসছে বাইরে। একটা ঘোড়া কেমন নাচতে নাচতে এল। টম্‌টম্‌ওয়ালারা চীৎকার করছে—'ধাক্কা বাঁচাও।' একটি মেয়ে কাঁদছে, তার স্বামী কোথায় গিয়েছে—পাত্তা পাচ্ছে না। সাবন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবু পড়েছে।

॥ সন্ধ্যা ৭টা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, রেলওয়ে কম্পার্টমেণ্ট, সোনপুর ॥

জ্যোৎস্নাভরা রাতে পুঁটুলি হাতে এইমাত্র এসে পাটনায় পোঁছানো গেল। বৈকুণ্ঠবাবুর সাজানো অফিসঘরে টেবিলটাতে বসে লিখছি। গঙ্গায় খুব বড় একটা স্টীমার, নাম মজঃফরপুর—তাতেই পার হওয়া গেল। এপারে ওপারে কি ভয়ানক ভিড়! গঙ্গার ধারে দীঘা ঘাটে ও প্যালেজা ঘাটেই এক এক মেলা বসে গিয়েছে। জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে হু হু হাওয়ার মধ্যে যখন জাহাজ ছাড়ল তখন কল্পনা করলাম ইজিপ্ট থেকে যেন জাহাজ যাচ্ছে—ওপারে সুন্দরী ইটালীতে। মাঝের ভূমধ্য-সাগরের চলোর্ম্মি-চঞ্চল নীল বারিরাশিতে কতকাল আগেকার কত নীলনয়না কনক-কেশিনী সুন্দরীর ছবি যেন দেখলাম, কত ক্লিওপেট্রা, কত হাস্যমুখী তরুণী, ইটালীর মেয়ে, গ্রীসের মেয়ে, রোমের মেয়েরা। লোকের ভিড়ে স্টীমারের ঘাটে নামা যায় না, মালগাড়ীর মধ্যে ওয়েটিং-রুম, টিকিট দেওয়ার ঘর—যেন যুদ্ধের সময়ের বন্দোবস্ত। আসবার সময় কেবলই মনে হতে লাগল—এই বিদেহ, মিথিলা। এটা ছাপরা জেলা

হলেও কালকাসুন্দে গাছের একটা ছায়াভরা ঝোপ দেখে বাংলাদেশের কথা একবার একটু মনে হোল—অবশ্য ঐ পর্য্যন্তই মিল। এদেশের শ্যামলতাশূন্য ভূমিশ্রীর মধ্যে কি আর মরকতশ্যামশ্রীর তুলনা হয়? সেই মাকাললতা-দোলা বৈকালের-ছায়া-পড়া ঝোপঝাপ, নদীতীর, পাখীর ডাক, ঘন বন, লতাপাতার কটুতিক্ত সুগন্ধ বনফুলের সৌরভ। দীঘাঘাট থেকে গাড়ী ছেড়ে আসবার সময় মনে পড়ল—গিরীনদাদার মুখে শুনতাম দীঘাঘাটের ওপারে প্যালেজা ঘাট। কখনো দেখিনি। এতকাল পরে সে সাধ মিটলো। আরও মনে পড়ল, গিরীনদাদা তার পরিবারবর্গ নিয়ে বহুকাল আগে—আজ একুশ বছর আগে—এই পথে প্রথম বারাকপুর গিয়ে বাড়ী তৈরী করেন। তারপর আমাদের যে মুগ্ধ শৈশব কেটেছে, কৈশোর কেটেছে—প্রথম যৌবন, বনগ্রামের বোর্ডিং, গর্দ্দভ উপাধি, বেচু চাটুয্যের স্ট্রীট, মনোমোহন সেনের লেন, পানিতর, কত কাণ্ড ঘটে গিয়েছে। এখন তিনি কি করছেন? গঙ্গায় আসতে আসতে স্টীমারে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম বহুদূরে চাঁপাপুরের ঘাটটার কথা। সেই পুকুরঘাটের বাঁধা পৈঠায় এই জ্যোৎস্নালোকে এখন কি হচ্ছে? সময়ের গতি আগে থেকে কত সামনে চলে এসেছে যে! আজ এক্ষুনি আবার সেখানে যাই? সেই বাড়ী আছে, সেই পুকুরঘাট আছে, সেই ঘরদোর আছে কিন্তু সে মানুষ কৈ? পাটনা যেন হয়ে গিয়েছে বাড়ী। পাটনায় এসে বড় স্টেশনে গিয়ে বক্তিয়ারপুরের গাড়ীর সময় জিজ্ঞাসা করে নিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু ও তাঁর চাপরাসী প্লাটফর্ম্মে পাঞ্জাব মেল ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর পুঁটুলি হাতে জ্যোৎস্নাভরা রাজপথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে মনে হোল, কি ভবঘুরেই হয়ে পড়েছি! কোথায় বাড়ীঘর আর কোথায় সারণ জেলা, পাটনা জেলা, গয়া জেলা ক'রে কত দিন কাটলো! সেই আদিনাথ পাহাড়, আগরতলা, কুমিল্লা, উজীরপুর, সেই রাত্রে খালে বেড়ানো, ইসলামকাটি, সেই জয়পুর ডাকবাংলা—চানন নদী, শালবন। পাটনা ল প্রেসের কাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

—ও মা—মা?

দোর খুলে গেল।—'কে, বিভূতি?'

মণি এল, জাহ্নবী এল, নুটু এল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কালী বাড়ী আছে?'

ওধারে নেড়ার বাবা কাশছে, বাড়ী—বাড়ী, কতদিন পরে নিজের পুরানো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি!

কিছুই না অবিশ্যি। ছাতিমফুলের ঘন গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা মোটর আসবে, সরে দাঁড়ানো গেল। একটা লোক আমাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, আপ কাঁহা যাইয়েগা? ভাবলে বুঝি পথ হারিয়ে গেছি। বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ী এসে সারাদিনের মেলার ধুলো বেশ করে ধুয়ে আরাম করে অফিসঘরের টেবিলে বসে লিখছি, কিন্তু কি বিকট মশার উৎপাত!

॥ রাত ৯টা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, পাটনা ॥

একজন পুরোনো আমলের বিদ্যার্থীর পাথর-বাঁধানো শোবার জায়গায় বসে লিখছি। কোন্ বিদ্যার্থীর সুখে-দুঃখে মণ্ডিত ছিল হাজার বছর আগেকার এই প্রাচীন দিনের কোঠাটি—এই বিদ্যার্থীর আমলটি কে জানে? কোন্ দেশ থেকে শেষ বিদ্যার্থী এসেছিল? কি ছিল তার ইতিহাস? কে তার বাপ-মা? তার আর কোন্ আনন্দভরা শৈশব-কাহিনী? কোন্ দেশে কোন্ নদীর ধারের শ্যামল বন তার কৈশোরকে স্বপ্নমণ্ডিত করেছিল? কত শুভ অবসরে তার বাপমায়ের কথা ভাবতো

—হয়তো তাদের তরুণী নববিবাহিতা বধূরা শতদ্রু, গঙ্গা—অজানা কোন গ্রাম্যনদীর তীরে তাদের প্রতীক্ষায় বিরহাকুল হৃদয়ে দিন গুনে গুনে দেওয়ালে আঁচড় কেটে রাখতো—হাজার বছরের দুয়ার দিয়ে কতকাল আগে—সে সব ছাত্র, সে সব অধ্যাপক, তাদের বাপ-মা কোথায় স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছে! অদূরের রাজগৃহের প্রাচীন কোন্ রাজার কোষাগার আজ অন্ধকার রুদ্ধবায়ু ভূগর্ভের কুক্ষিতে গুপ্ত,—ইট, মাটি, কাঠের স্তূপের আড়ালে সে সব দিনের কথা বসন্তের ফুলের মত ঝরে গিয়েছে। এদেরও সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহের বাঁশিও আজ হাজার বছর ধরে এই নির্জ্জন প্রান্তরের হাওয়ায় নিঃসীম শূন্যে কানে কানে তাদের রহস্য-কাহিনী গান করে এসেছে!

॥ ১১ই নভেম্বর, ১৯২৭, নালন্দা ॥

একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গর্ব্বদৃপ্ত রাজধানীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দুটো রাজগির মাটির তলে অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। কেবলই মনে হয়, এত প্রাচীন দিনের রথ, সৈন্য, কোলাহলভরা জয়দৃপ্ত পথ, চৈত্য, স্তূপ, কত রাজনৈতিক, কবি সেনানায়ক, মন্ত্রী, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, শ্রেষ্ঠী, পুরোহিত যেন মাটির তলে কোথায় চাপা রয়েছে! তাদের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। মহাভারতের যুগের কথা, তার ছবি—কতকাল আগে ভীম বলে যদি কেউ—কোনকালে থেকে থাকেন, তবে তিনি এসেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার দিনের জানালায় বসে দুপুর রোদে এই জরাসন্ধের কারাগারের কত ছবিই যে দেখেছি!

আমি বেশ মনে ভাবছি—পুরোনো সে যুগের এক তরুণ সেনানায়ক মগধের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছিল, তার বাড়ী ফিরে আসা, তার বিরহী মনটার তৃষ্ণা—আবার মা, বাপ, ভাই, বোন ও নববধূর সঙ্গে মিশবার যে আকাঙ্ক্ষা—হাজার হাজার বছর পরে যেন আমার মনে এসে বাজছে। ছায়ার মত, স্বপ্নের মত, তারা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কতকাল আগে!

পাহাড়ে পাহাড়ে জংলীবাঁশের বনে শেষ মধ্যাহ্নের ম্লান রোদ্দুর মধ্যে, বুনো পাখীর কাকলীর তানে, কতকাল আগেকার মিলিয়ে যাওয়া আশা, দুঃখ, সুখ, হর্ষ-প্রেম ও স্নেহের তান করুণ হয়ে ওঠে।

এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ঘন জঙ্গলে বসে আছি ময়না-কাঁটা, বুনো বাঁশ, সেয়াকুল, কত কি বুনো গাছপালা। কি নির্জ্জন স্থান—এই পর্ব্বত-বেষ্টিত স্থানে বোধ হয় প্রাচীন রাজগৃহ ছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাব ও চিন্তাদৈন্য দেখলে মনে বড় কষ্ট হয়। এত নিকটে এমন স্থান আছে—প্রাচীন বেবি-লনের মত গৌরবশালী ধ্বংসস্তূপ যার—তার কেউ একটা ভালরকম সন্ধানও দিতে পারলে না বক্তিয়ারপুর থেকে!

অনেক কাল পরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোল। College days-এ তার মধ্যে gifts ছিল। কিন্তু interests বড় limited হয়ে গিয়েছে। তার পরে সংসারে পড়ে অর্থোপার্জ্জন ও তুচ্ছ যশাকাঙ্ক্ষায় তার সব মন, বুদ্ধি, শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। পঁচিশ বছর পূর্ব্বের সে দীপ্তমুখ বালককে এই অকাল-বৃদ্ধ অপ্রসন্ন-মুখ নিস্তেজ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

মনে বড় কষ্ট হোল। এই রকম করেই জগতে অনেক লোকের জীবন ছাইচাপা পড়ে যায়। প্রথম কারণ—কল্পনার অভাব, দ্বিতীয়—তারা দিক্‌চক্রবালের দূরসীমার প্রান্তের সবুজ বনরেখার সন্ধান পায় না, মাথার ওপরকার ছাদের কড়িবরগায় তাদের

অনন্ত আকাশের ছায়াপথকে আড়াল করে রেখেছে। জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান ভিন্ন সন্ধানই মেলে না। হৈ-হাই বাজারের মেছোহাটার কলরবে ধ্যানকে কখনো আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে সুযোগ দেয়নি এরা। সে বেচারী সুযোগ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে তারপর কম্বল গুটিয়ে অসাফল্যের পথ বেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। তারপরেই আসছে সাহেবকে প্রসন্ন করে মাইনে বাড়াবার চেষ্টা। কোন ফন্দিতে বেশী ব্রিফ্ যোগাড় করতে পারা যাবে সেই ভাবনা। এর ওপর মেয়ের বিয়ে তো অবিশ্যি আছেই।

কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে খবর রাখে মগধের! আর কে খবর রাখে এই ভূমি পবিত্র হয়েছিল সে প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেবের পূত চরণরেণু স্পর্শে? তারা শুধু তাড়াতাড়ি ব্রহ্মকুণ্ডে একটা ডুব দিয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির পায়ে একটি ফুল ফেলে দিয়ে আহার যোগাড় করবার জন্য ছোটে। এই বিশাল পাহাড়শ্রেণী, এই নির্জ্জন স্নিগ্ধ বনভূমি, এই ভূগর্ভস্থ প্রাচীন দিনের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী তাদের মনে খোরাক যোগাতে পারে—তারা তার উপযুক্ত নয়।

॥ ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৭, রাজগির ॥

কালীর সঙ্গে ৫-৬ দিন বেশ কাটল। সময়ে সময়ে পুরোনো দিনের ছেলেবেলাকার গল্পসল্প করা যেত। রাজগৃহ বেড়াতে গেলাম, নালন্দা গেলাম—যেমন বাল্যকালে আমরা দুজনে কুঠির মাঠে, মরাগাঙের ধারে বেড়াতে যেতুম, তেমনি। বাবার মুখের গান পুরোনো সুরে বহুদিন পরে তার মুখে শুনতাম। আবার সেই সব শৈশবের আনন্দ ফিরে এসেছিল।

কাল সকালে পাটনা গিয়েই বৈকুণ্ঠবাবুর মুখে শুনলাম যে এখনই ভাগলপুর যেতে হবে। তখনই লুপ্ Express-এ রওনা হলাম। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে ওদের মশারি ও গায়ের বোতাম ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আজ সকালে ইন্সিওরেন্স-এর এজেণ্ট ভদ্রলোক বলছিলেন কাল নাকি অমরবাবুর বাসা থেকে সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গিয়েছিল। অসম্ভব নয়, কালকার দিনটা ছিল খুব ভাল। আমি কাজরা স্টেশনের বাঁকটায় এসে ট্রেন থেকে ঠিক বেলা চারটার সময় পূর্ব-উত্তর কোণে দিক্‌চক্রবালে মিছরির পাহাড়ের মত শুভ্র, ঈষৎ সোনালী রং-এর একটা পর্ব্বতশ্রেণীর মত লক্ষ্য করছিলাম বটে। হয়ত সেটা মেঘ, কিন্তু হতেও পারে হয়ত বৈকালের নির্ম্মুক্ত আকাশে দূর থেকে হিমালয়ের তুষারশিখরই চোখে পড়ছিল।

Hugh Walpole-এর কথাটা বড় মনে লেগেছিল সেদিনকার Englishman-এ:

"The establishment of a contemplative order. Anyone above 50, should retire to a quite valley, free from motors and radios and spend some time in silence and contemplation—amidst green woods and quietness of chirping of wild birds beneath a blue sky—if possible by the side of a running brook."

চমৎকার কথা! জগতে এখানে ওখানে সত্যিকার মানুষেরা সব আছে, যাদের মুখে মাঝে মাঝে ভারী খাঁটি কথা সব শুনতে পাওয়া যায়।

॥ ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

অমরবাবুর ওখান থেকে গল্প করে ফিরে কেদারবাবুর বাড়ীতে রামায়ণ গান

শুনে বাসায় ফিরছিলাম।

পথে আসতে আসতে অনেক কালের একটা গল্প মনে পড়ল। আমার পলিসির অধ্যবসায়ের ঘটনাস্থল ছিল নবীন চক্কোত্তির বাড়ীর এদিকের এড়ো ঘরটা, এই গল্পটার ঘটনাস্থলও ছিল তাই। কোন এক ভগ্নপোতে মহাসমুদ্রের কোন্ অংশে জানি না অন্য সব যাত্রী, মাঝি-মাল্লাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশিষ্ট একটামাত্র লাইফবেল্ট পরতে যাচ্ছেন—এমন সময় তাঁর চোখে পড়লো জাহাজের এক কোণে এক ক্ষুদ্র অপরিচিত বালক শীতে ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। সে একজন stowaway—লুকিয়ে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল—এতদিন খায়নি, ভয়ে, ও অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। মহানুভব পোতাধ্যক্ষ তাকে তাঁর জীবনরক্ষার শেষ উপায়টা দিয়ে মৃত্যুর জন্য নিজে প্রস্তুত হলেন এবং অল্পক্ষণেই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের গর্ভে পোতসহ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

সেই কাপ্তেনের ছবিটা বেশ দেখতে পেলাম। পর্তুগালের কি স্পেনের কোন দ্রাক্ষালতার বনের ধারে বসে নীলনয়ন-বালক আপন নির্জ্জনে দূর দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো—আটলাণ্টিক্ পার হয়ে অজানা দেশের ধনভাণ্ডার লুট করে তার দেশের নাবিকেরা প্রাচীন কালে দেশকে ধনশালী করে ক্ষমতাশালী করে রেখে গিয়েছে—তারও মনে মনে ইচ্ছা যে সেও একদিন সেইরকম হবে। কর্টেজ কি পিজারোর মত রাজ্যস্থাপয়িতা দিগ্বিজয়ী বীর নাবিক। তারপর তার দরিদ্র পিতামাতার কুটীরে পোড়া রুটি খেয়ে শুয়ে রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে দূরের স্বপ্নে আকুল হয়ে উঠতো। পিতামাতার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে, কেউ ভাল খেতে পায় না। শিক্ষার সুযোগই বা কে দেয়? একদিন স্বপ্নের সৌন্দর্য্যে আকুল হয়ে বালক বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে গেল। তার কেউ খোঁজখবর করলে না। ক্রমে সকলে ভুলে গেল তাকে।

কেবল তার মা তাকে মনে রাখলে। ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার সময় সঙ্গীহীন, সেই নীলনয়ন পলাতক ছেলেটি তার ছিল নিত্যসঙ্গী। কত নির্জ্জন রাত্রের চোখের জলে, রোগশয্যায় বিকারের ঘোরে তার কিশোর মূর্ত্তি চোখে পড়েছে। মা যখন মারা গেল, ছেলে তখন স্বপ্নকে সার্থকতার মধ্যে পেয়েছে।

কত কাল চলে গিয়েছে...কত দেশের কত অদ্ভুত জীবন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সে বালক এখন প্রৌঢ় পোতাধ্যক্ষ। বিবাহ সে করেনি—বিশাল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সঙ্গীত তার জীবনের বীণাকে চিরকাল রুদ্রতালে বাজিয়ে এসেছে। সংসারের কোন বাঁধন নেই তার। অচিনের অনন্ত পথ ছেলেবেলাকার মতই তার সামনে তবুও বিস্তৃত।

ভীত, জড়সড়, ক্ষুদ্র বালককে দেখে সে মরণের রাত্রে তার নিজের দূর শৈশবের কথা মনে পড়ল। এই রকম অবোধ, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালক ছিল সে, যখন প্রথম অজানার টানে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বালকও আজ সেরকম বেরিয়েছে, কিন্তু হতভাগ্য প্রথম বারেই জীবনকে বিপন্ন করে বসেছে। বালকের জীবনের বিস্তৃততর সুখ আনন্দকে প্রসারলাভ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সে নিজের লাইফ-বেল্ট তখনি খুলে তাকে পরিয়ে দিয়ে বললে—'বন্ধু, তোমারই মত বয়সে আমিও বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে—তুমি বাঁচো, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।'

আজ এই রাত্রে পড়াশুনার একটা অদম্য পিপাসা মনের মধ্যে অনুভব করছি। এক লাইব্রেরী বই পাই, সব বিষয়ে খুব বসে পড়ি। বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস—দেশবিদেশের কবিদের ও ঔপন্যাসিকদের বই পড়তে বড় ইচ্ছে করছে। জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। অন্য ব্যাপারে নষ্ট করে কি করবো? শুধু পিপাসা—আমার এ পড়াশুনার পিপাসা

দেখছি বিকারের তৃষ্ণার মত। যত জল খাই, আরও জল, আরও জল। ততই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

এইমাত্র থিয়েটার দেখতে যাবো। টিকিট কিনেছি। বড় বাসার নির্জ্জন শীত-সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকের শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে দূর ইছামতীর বুকের একটা অন্ধকার-ঘন তীরের কথা মনে পড়ল। ঠিক এই সময়ে—"যতবার আলো জ্বালাতে যাই—নিভে যায় বারে বারে"—সেই শীতের বিষণ্ণ প্রভাতে গানটির কথা মনে আসে। সেই সন্ধ্যা—সেই দোকান।

যাক সে কথা। আকাশের দিকে এখানে ওখানে দু'একটা নক্ষত্র জ্বলছে। দেখে মনে হোল এই পৃথিবীটুকুই কেবল জানা—তার ওপারে অনন্ত অজানা মহাসমুদ্র। কোথায় Sirius, Vega, Spiral Nebula বর্হিষদ পিতৃলোক! মরণলোকের যাত্রীদের যাতায়াতের বীথিপথ। অনন্ত, অজানা সেই ছেলেবেলার রাজু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়তে যাবার সময় চারিধারের বাঁশবনে যেমন অজানা দেশ লুকিয়ে থাকতো—গুপ্তধনের দেশ, তেমনি ঠিক।

ক্লাব থেকে আভাসবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলাম। অমরবাবুকে দেখলাম—কথাবার্ত্তা হোল। "ষোড়শী" বইখানা শুনেছিলাম খুব ভালো। কিন্তু একটু সন্দেহ নিয়েই গিয়েছিলাম মনে মনে। শেষ পর্য্যন্ত দেখলাম যে সন্দেহ করে আমি শরৎবাবুর প্রতিভার প্রতি অবিচার করেছি। বই বেশ ভাল লাগল। ওরকম নূতন ধরনের কথাবার্ত্তা বাংলা স্টেজে বোধ হয় বেশী নেই।

পরদিন বড়-বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভাল জিনিস পেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেই জন্মেছিলাম! এই তো আরা জেলা, ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন ঝোপঝাপ! বড় ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি। কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওড়া ঝোপ, সোঁদালীফুল ছাতিমফুল বাবলা বনকে। সে ছায়া, সে স্নিগ্ধস্নেহ, আমার গ্রামের সে সব অপরাহ্ন—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।...তারাই যে আমার ঐশ্বর্য্য। অন্য ঐশ্বর্য্যকে তাদের কাছে যে তৃণের মত গণ্য করি।

এই শীতের অপরাহ্ন, রাঙা রোদ যখন বাবলা বনে লেগে থাকে তখন শৈশবে কতদিন শ্যামছায়া ঘনিয়ে আসা ইছামতীর তীরে নির্জ্জনে বসে বর্ষার ভাঙ্গনে শিমুলতলার দিকে চেয়ে জীবনের মরণের পারের এক রহস্যময় অজানা অনন্তলোকের স্বপ্ন আবছায়া ভাবে মনে আসতো—কতদিন চেয়ে থাকতাম শিমুলতলার নীচে, লক্ষ্মণ জেলের শাশুড়ি, ক্ষুদে গোয়ালা যখন মারা গেল, তাদের পোড়ানোর জায়গার দিকে—কেমন যেন উদাস ভাব, দিগন্তবিস্তৃত মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে কে যেন হাতছানি দিত।

তারপর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিসই পেলাম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায়-কপালে ঠেকানোর কথা মনে হয়ে পুলক হয়।

তারপর চাটগাঁয়ের সুন্দর দিনগুলো—মণি! ফরিদপুরের সত্যবাবুদের বাড়ী!

তারপর সুন্দর জীবনের Period চললো। সেই নয় বৎসরের ক্ষুদ্র বালককে কি ভালই বাসি! তার সেই মামা জুতো মেরেছে বলে কান্না, সেই মক্কামদিনায় যাওয়া বালিশ, সেই "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি"!

এ সব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে। আরও কত—কত আসবে এও ঠিক, একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন স্নিগ্ধ 'অপরাহ্ণে, বাবলা বনের ছায়ায়, ইছামতীর তীরের বনঝোপের বিহঙ্গতানের মধ্যে নীরব শান্তির কোলে এ জীবনের দেওয়া-নেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূর ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্ত লোকে, অনন্ত কালের পথিক যাত্রী সে—তার যাওয়াআসা কি ফুরোবে হঠাৎ?

আমি এই যাওয়া-আসা স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তারপর, তাও আমি জানি। হয়ত একবার এসেছিলাম দূর কোন ঐতিহাসিক যুগে—হয়ত রোমের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জের আড়ালে ভূমধ্যসাগরের নীলজলের তীরের কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর প্রাসাদে। হয়ত প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের দিনে গ্রীকবীর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে ঢাল তলোয়ার ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছি—নয়তো কোন পাহাড়ের ছায়ায় বসে এই রকম স্বপ্ন দেখতাম—নয়তো ইংলণ্ডে কি ফ্রান্সে কোন অবজ্ঞাত গ্রামে কৃষকবালক হয়ে জন্মেছিলাম—এল্‌ম কি ওক গাছের নীচে বসে বসে ভেড়া চরাতাম—কে জানে?

আবার বহুদূরের জন্মান্তরে হয়ত ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশু নয়ন দুটি মেলবো। পাঁচশো বছর পরের পাখীর গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না আবার আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবে। কোন অজানা দেশের অজানা পর্ণকুটীরে কোন অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটাব—অনাগত মা-বাপের স্নেহসুধায় মানুষ হব। পাঁচশো বছর পরের অনাগত কত বালকবালিকা তরুণ-তরুণী, কত সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা. লোকের সঙ্গে সে কত পুলকভরা পরিচয়!

কেবলই মনে হয় সৃষ্টির যিনি দেবতা, এত দয়া তাঁর কেন? এই অনন্তের সুধা-উৎস মানুষের জন্যে তিনি কতকাল থেকে খুলেছেন? এই অন্ধকারে তবু হাত জোড় করে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

॥ ১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধবিগ্রহের ঝঞ্ঝনায়, সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁকজমকে—দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আমগাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশুচোখে চেয়েছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ বইয়েছিল। দু হাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই—থাকলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট মেণ্টু-হোটেপ, জুলিয়াস সীজর, থিয়োডোসিয়াস এবং তাবৎ সম্রাট্ পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরা শৈশব থেকে মুখস্থ করে এসেছি। কিন্তু গ্রীসের ও রোমের যব ও আমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ্ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই।

হোমার ভার্জ্জিলের কবিতা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথায় আমি জানি না, কিন্তু উত্তরপুরুষদের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হোত তারা একথা ঠিক।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে পড়ে যায়, সারিবাঁধা বর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ী নজরে আসে, অজ্ঞাত কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূল-লাগা একটুকরা পাত্র, প্রাচীন ইজিপ্টের কোন কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন করবার কথা বলেছিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরো ভাঙা ফাটা মাটির-তলায়-চাপা-পড়া মৃন্ময় পাত্রের মত পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে। তারপর কল্পনা—আর কল্পনা!

প্রস্ফুট সর্ষেক্ষেতের সুগন্ধের মধ্যে বসে প্রভাতের নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার সেই দূরকালের পূর্ব্বপুরুষদের কথা ভাবি।

বর্ত্তমানে একদল লেখক উঠেছেন, যাঁরা ইতিহাসের এই ফাঁক পূর্ণ করবেন। তাঁরা ছোট-গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, জীবন-চরিত লেখকের মধ্যে যাঁরা খুব সূক্ষ্ম দ্রষ্টা তাঁরা—দিনলিপি-লেখক—এঁদের দল। চেবাঙ, এইচ. জি. ওয়েলস্, গর্কি, ব্রেট হার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ মিত্র—এঁদের লেখা ভবিষ্যৎ যুগের পুস্তকাগারে দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের তালিকার মধ্যে স্থান পাবে—খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং অত্যন্ত পাকা দলিল হিসাবে এদের মূল্য হবে। রোমান্স লেখকগণও সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবেন না—তাঁদের কল্পনার উল্লাসে, আবেগে অনেক সময় জীবনের সূক্ষ্ম দর্পণকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন বটে, কিন্তু তবুও স্কটের লেখা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের সম্বন্ধে যা জানতে পারি, কোন্ ঐতিহাসিক অতটা আলো সে সময়কার সমাজ, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, জীবন-যাত্রা প্রণালীর উপর ফেলতে পেরেছেন?

কিন্তু আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটী কোটী মানুষ প্রলয়স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।

এই যুগ-যুগ-ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীব-জগৎ—কোন্ মহাঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস! অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলান্টিস্ জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা, তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্যশৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগশিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হোল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে—ওর কথাও।

কিন্তু এ উপন্যাস মানুষের পাঠের জন্যে নয়। মানুষ শুধু মাটি-পাথর খুঁড়ে, ওতে তাতে জোড়াতালি দিয়ে, দস্যুবৃত্তি করে লুকিয়ে-চুরিয়ে এর এক-আধ অধ্যায় চাবি-আঁটা পেঁটরা থেকে দিনের আলোয় এনে পড়ছে—সব বুঝতেও পাচ্ছে না।

॥ ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৭, ইসমাইলপুর ॥

সন্ধ্যার আগে লাখপতি মণ্ডলের টোলার পিছনের কুণ্ডীটা পার হয়ে ঘোড়া

কাশজঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব ছুটিয়ে রামজোতের পুরনো বাগান দিয়ে নীচের কুন্ডী-টাতে গেলাম। লাখপতিদের টোলার মাথার উপরে রাঙা টকটকে লাল সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যায় কাশজঙ্গলের ধারে ধারে কেমন সোঁদা সোঁদা ঠাণ্ডা গন্ধ। কুন্ডীটার ধার দিয়ে খুব জোর করে ঘোড়া ছুটিয়ে কুন্ডী পার হয়ে সামনের যে কুন্ডীটা, যেটার ধারে সেদিন লাল হাঁস বসেছিল—আমি যেতে যেতেই উড়ে গেল,—মারতে পারিনি—সেই কুন্ডীটার ধারে গেলাম। পাখী কোথাও কিছু নেই। দূর-প্রসারী ঈষৎ অন্ধকার কাশজঙ্গলের মাথার উপর তাকিয়ে ভাবছিলাম—নয় বছর আগে ঠিক এমনি দিনগুলোতে বারাকপুরের বাড়ীতে সেই হরি রায়ের বাড়ীতে বসা—হরিপদদা—সেই শোকের দিনগুলো আজ কোথায় কি হয়ে গিয়েছে!

জঙ্গলের পাশ দিয়ে দেখলাম দুটি হাঁস জলে সাঁতার দিচ্ছে কিন্তু বন্দুকটা আনিনি। কতকগুলি Snipe-ও ছিল, এদেশে বলে চাহা—বন্দুক থাকলে সুবিধা হোত।

তারপর খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম।

আজকাল ঠিক দুপুরে সন্ধ্যার আগে একবার করে বসি কাছারীর পেছনের কাশজঙ্গলের ধারে সর্ষেক্ষেতের পাশে। প্রস্ফুট সর্ষেক্ষেতের গন্ধে সেই ছেলেবেলার বড়দিনের বন্ধে বনগাঁ থেকে বাড়ী আসার কথা মনে পড়ে। বড় আনন্দ হয় এই মাটি, এই আধশুকনো, আধ-সবুজ কাশবনের স্নিগ্ধ ছায়া, তারই ধারে এই হলুদ রং-এর গন্ধে ভরপুর সর্ষেক্ষেত, এই নির্জ্জনতা—একেবারে মাটির মায়ের কোলে বসে থাকা। এই আকাশ—আমার জানলা দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় দেখতে পাওয়া, দূর পূব আকাশের orion-এর pointer-টা বড় মুগ্ধ করে দেয় আমাকে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে নির্জ্জন কাশবনের রহস্য আমার প্রাণে এসে লাগে। জীবনটা কী? কি গহন গভীর গোপনতা—কি যাওয়া-আসার গতিচ্ছন্দ!

কাল সন্ধ্যায় টেবিলটায় বসে লিখতে লিখতে দূর পূব আকাশের একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে ভাবলাম—ঐ সব নক্ষত্রের বা তার পাশের গ্রহের অজানা জীবনযাত্রা, আমাদের কাছে একেবারে গোপনতায় ঢাকা। কে জানে ওর মধ্যে কি প্রাণীদল, কি জীবনের গতি! এই আমি যে অত্যন্ত বাস্তব জীব এই টেবিলে বসে লিখছি—আর ঐ জ্বল-জ্বলে তারাটার মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যের ব্যবধান—কোনকালেই এ ব্যবধান পৃথিবীর জীব ঘোচাতে পারবে না বোধ হয়। কে জানে ওদের জগতে কিরকম জীবনযাত্রা? গভীর রাত্রে রামচরিত যখন আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বাইরে উঠে নির্জ্জন বন-মাঠের ওপরকার নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। বহু দূরপারের গভীর কোন গহন রহস্য ধীরে ধীরে আমার মনে নেমে আসে—সে বলা যায় না, লেখা যায় না। জীবনের গভীর মুহূর্ত্ত সে সব—কেবল তা মনে এই সত্য আনে যে জীবন ঐ দূর ছায়াপথের মত দূরবিসর্পিত। এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—সুদূর কোথা থেকে এসে সুদূরের কোন্ পারের দিকে তার ডিঙ্গার মুখ ফিরানো।

প্রাণের মধ্যে এই অনুভূতিটুকু যেন সকলের সত্য হয়ে ওঠে।

॥ ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

গভীর রাত্রে নির্জ্জন কাশবনের মধ্যের কাছারী ঘরে শুয়ে শুয়ে গিবন পড়ছিলাম। কত রাজা রাণী সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি, কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতন, কত অত্যাচার-উৎপীড়ন, হত্যা, পরের জন্যে কত প্রাণ দেওয়া—অতীতের ছায়ামূর্ত্তিরা আবার গিবনের

পাতায় ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়না নিষ্কলঙ্কা তরুণী, কত আশাভরা বুকে নিয়ে কত মা-বাপ কোথায় সব চলে গিয়েছে! অনন্ত কাল-মহাসমুদ্রে কোন অতীতকালে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—কবে—কোথায়! এই গভীর রাত্রে তারা ফিরে এল।

পড়ছিলাম গিল্‌ডো, রুফাইলাস, খোজা ইউট্রোপিয়াসের অর্থলিপ্সার কথা, অর্থের জন্য তারা কি না করেছিল! বিশ্বস্ত বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করেনি, নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার?

এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের সে মূর্খতা দেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশ করবার জন্যেই কি রুফাইলাস কাউণ্ট জনকে অত করে নির্দ্দয়ভাবে উৎপীড়ন করেছিল! সে করুণা কাউণ্ট জনের জন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইলাস ও তার ধনলিপ্সার জন্যে। কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্য লিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখেছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি—তৃণের মত স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

দু হাজার বছর আগের সে সব মানুষের মত—তাদের ইতিহাস-লেখকও ছায়া হয়ে গিয়েছেন। ইংলণ্ডের কোন্ প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জীর্ণ তার সমাধি দীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জানি না। আর একশত বছর পরে এই আমিও স্বপ্ন হয়ে যাবো।

সন্ধ্যায় শান্ত বাঁশবনে, দেবদারু পাতার মাথায় রাঙা রোদে, বৈকালের ম্লান আলোয়, মাঠের ধারের কাশবনে, নদীর ধারে আমি কতদিন এই গতিচ্ছন্দের সত্যকে মনে মনে চিনেছি। এর স্বপ্ন আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

হাজার যুগ আগের এই ঐতিহাসিক ছায়ামূর্ত্তিদের মত সব মিলিয়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে। যা কিছু বর্ত্তমান, সব। এই অপূর্ব্ব গতিভঙ্গি, মহাকালের এই তাণ্ডব নৃত্য-ছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা, মহারাজা, সাম্রাজ্য—এ কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন্ বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস, গিল্‌ডো, রুফাইলাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটুলি ফেনার ফুলের মত মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি, মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিরাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাস ভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে...অনাহত শব্দের মত তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।

সে ধ্বনি সম্রাজ্ঞী ইউডক্সিয়া শোনেননি। শুনেছিলেন সাধু জন্ ক্রাইসোটিস্। তাই তুচ্ছ বিষয়লিপ্সা ফেলে দিয়ে দূর সিরিয় মরুভূমির নির্জ্জন পাহাড়ের মধ্যে লোকক্ষুর অন্তরালে তিনি ধ্যানজীবন যাপন করতেন। সান্ধ্য সূর্য্যচ্ছটায় সিরিয় মরুভূমির বালুরাশিতে সাধু জন্ এই গতিলীলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই।

।। রাত্রি বারোটা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৭, ইসমাইলপুর ।।

সন্ধ্যার পর আমার নিজের ঘোড়াটায় চড়লাম। প্রথমে ঘোড়াটায় চড়ে বেরুতেই সেটা বড় বদমায়েশী শুরু করে দিল। রামজোতের বাসায় চালের কাছে নিয়ে গিয়ে গায় ঠেসে ধরেছিল আর কি! বেগতিক বুঝে অন্য কোনদিকে না গিয়ে বাঙ্গালী টাপের দিকে গেলাম। সেখানে কারা মাছ ধরছে। অনেক পাখী বসে আছে, কিন্তু

কয়দিনই উপরি উপরি পাখী মারতে গিয়ে অকৃতকার্য্য হওয়ার দরুণ শিকারে আর স্পৃহা নেই। বাংলা ধাপের ওপারের জঙ্গলের মাথায় সূর্য্য অস্ত গেল—দিয়ারায় সূর্য্য-অস্ত একটা দেখবার জিনিস—কি রাঙা টক্‌টকে আগুন রং-এর সোনা! সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দিলবরের টোলায় বাসবিরিদের বাসা পার হয়ে চললাম। বন্সা মণ্ডলের টোলা যেতে যেতে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। লোধাইটোলায় যখন গিয়েছি, তখন তারা আগুন পোয়াতে বসেছে। তারপরই নির্জ্জন জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢোকালাম। ঘন জঙ্গলে ভাল করে জ্যোৎস্না ঢোকেনি, খাটো খাটো বনঝাউ গাছগুলো শিশিরে ভিজে গিয়েছে। জঙ্গল ক্রমে ঘনতর হোল, পথ শেষ হয়ে এল। আগে আর বছর যেখানে রাঁইচি-খামার লুট হয়েছিল, সেইদিকে ঘোড়া নিয়ে চলা গেল। অবশ্য একটু একটু ভয় হয়েছিল। বনে শূয়র বাঘের ভয় খুব। কাল অনেক রাত্রে ফেউ ডাকছিল। ভয়কে জয় করবার জন্যে জিদ্‌ করেই আরও ঘন নির্জ্জন বনে ঘোড়া ঢুকিয়ে দিলাম। পরে অনেকটা গিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলাম। দূরে পূর্ব্বদিকে চেয়ে মনে হোল আমাদের বাড়ীর নির্জ্জন ভিটায় বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে—এই শীতকালে কবে দোলাই গায়ে দিয়ে শৈশবে পাটালি চালভাজা খাবার লোভে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছি। তারপর লোধাইটোলা ছেড়ে সোজা পথটায় ঘোড়া ছুটলো। চতুর্দ্দশীর মাঠভরা ধপধপে জ্যোৎস্না, নির্জ্জন মেঠো পথ—হু-হু করে ঘোড়া ছেড়ে একেবারে বন্সা মণ্ডলের টোলার কাছটায় এসে পড়লাম। মনে পড়লো ১৯১৮ সালের এই সময় এই দিনগুলোতে হরিপদদার সঙ্গে দাবা খেলে সকাল বিকাল কি করেই কাটাতাম। পাশের মাঠটায় অনেক লাল হাঁস (চক্রবাক্‌) কাল সন্ধ্যায় বসেছিল। রামচরিতের সঙ্গে মারতে এসেছিলাম, কিন্তু গুলি করতেই সব পালিয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে শুধুই ঘোরা হোল। ইউনিভার্সিটির সিল্কের চাদর ওড়ানো মেয়েলী কলকাতার ছেলের সঙ্গে ও এই ইংরাজ explorer যুবকদের কি তফাৎ!

ঐ রকম হওয়া চাই—দুর্দ্ধর্ষ, দুঃসাহসিক ঘোড়সওয়ার। বনেজঙ্গলে মেরু-প্রদেশের তুষারভূমিতে কাটিয়ে এসেছে—কতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে—ভয় নেই। অথচ স্রষ্টা—out of chaos he has created something, ভগবানের তেজ, যৌবন-দীপ্তি, জ্ঞান। অথচ কলকাতায় যখন ক্লাবে গিয়ে বসবে তখন শৌখীন খুব। সেও সিল্কের চাদর ওড়াবে, বেয়ারার হাতে কোকো বা কফি খাবে।

আজ সতীশের পত্র পেয়েছি বহুদিন পরে। সে দরজীর কাজ শিখতে কোন্‌ স্কুলে পড়ছে—কিছু সাহায্য চায়। কতকালের কথা—সেই জাঙ্গিপাড়া—সেই ঠিক এই সময়ে জাঙ্গিপাড়া রেলস্টেশনের মধ্যে রাখালবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করা, সেই ত্রিপুরাবাবু, বুড়ো চক্রবর্ত্তী মশায় চাল-কড়াই ভেজে আনতেন—সতীশ দুধ জ্বাল দিয়ে নিয়ে আসতো, আর রুটি করে নিয়ে আসতো। সেই একদিনের ছুটিতে কোথাও না গিয়ে জাঙ্গিপাড়াতেই কাটানো গেল। লাইনের ধারে চেয়ারে বসে তেল মাখলাম—সে এক জীবন কেটেছে।

মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত-পড়ার মত দৈবাৎ কোন পুরোনো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটা বড় পরিচিত সুরে বেজে ওঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে। এই রকম এল কাল—হঠাৎ অনেক-কাল আগে রংপুর থেকে ফিরে আসার পথে রাণাঘাট এসে অমৃতকাকার সঙ্গে যে রাণাঘাট Exhibition দেখতে গিয়েছিলাম, খামোকা সেই দিনটার কথাই মনে পড়ে

গেল। সেই "সাজাহান" থিয়েটার হবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে তার বিজ্ঞাপন—সেই চানাচুর ভাজা কিনে খাওয়া—সেই বাবার পাতানো মায়ের বাড়ী যাওয়া—স্পষ্ট ভাবে সব কথা মনে এল।

আজ আর একটা আজগুবী কথা মনে এল। হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে প্রসন্নদের বাড়ীটা কি মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ীর সামনে সেই শৈশবের মাঠগুদামটা ভাড়া নিয়ে বাস করা যায়? করবো নাকি? পঁচিশ বছর পরে আবার যদি সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলো ফিরে আসে তবে তো!

॥ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

কাল রাত্রে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমি গোষ্ঠবাবু দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখলাম। খুব যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন গিয়ে শুয়ে পড়ি। আজ সকালে উঠে প্রথমে জিনিসপত্র রওনা করে দিলাম। পরে খাওয়ার পরে ঘোড়া করে রওনা হলাম, মিত্র সঙ্গে সঙ্গে এল। লোধা মণ্ডলের টোলা ছাড়িয়ে এসে কাদা ততটা নেই, সেদিন অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন যতটা ছিল—পরে এসে পরশুরামপুর ঘাটে পেঁছুনো গেল। কাছারীটা চিনতাম না—অড়হরের ক্ষেত বেয়ে বেয়ে এসে কাছারী পেঁছানো গেল। গত বৎসর মোহিনীবাবু ধামশ্রেণী গিয়েছিলেন—সেই ধামশ্রেণী। শৈশবের কত স্মৃতি মাখানো! জিজ্ঞাসা করলাম, রাণী সত্যবতীর ঠাকুরবাড়ীতে আজকাল রাত্রে সে রকম ভোগ হয় কিনা—সেই মজাপুকুরটা আছে কিনা! সেখান থেকে ঘোড়া ছেড়ে কারু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আসতে কলবলিয়ার ধারের পথ বেয়ে দেখি বনোয়ারী পাটোয়ারী আজমাবাদ চলেছে। তারই হাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বড় খামখানা দিয়ে দিলাম। কলবলিয়ার পথ বেয়ে বেয়ে কখনো জোরে কখনো আস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ভগবানদাস-টোলার মধ্যে এলাম। পাছে পথ ভুলে যাই, এইজন্য সব সময়ে ডান দিকে বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার দিকে নজর রাখছিলাম। সে টোলা ছাড়িয়ে সোজা কলবলিয়ার ধারে ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কলাই ক্ষেতে ক্ষেতে তিনটাঙার প্রজারা কলাই তুলছে। একটা বাবলা বন পেরিয়ে একটা সুন্দর পথে এলাম। বামদিকে পথের ছায়াঝোপ, কি সব ফুল ফুটে আছে, বেশ ছায়া পড়েছে—সেইদিকটা কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ঘোড়া করে এলাম, পরেই আবার একটা উলুখড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে দিয়ে সামনে দেখি কুতরুটোলা। তারপরই পরিচিত সহদেব সিং-এর বাসা দিয়ে লছমন মণ্ডলের টোলার অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে এলাম কাছারী। পথে পথে উৎসব-বেশে সজ্জিতা নরনারী চন্দ্রগ্রহণের মেলা দেখে গল্প-গুজব করতে করতে কোশকীপুর অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছে। এ যেন বহু দূর থেকে অজানা পথ বেয়ে মোটরে কি এরোপ্লেনে করে নিজে পথ চিনে চিনে কখনো ধীরে কখনো জোরে এঞ্জিন চালিয়ে চলে এলাম—পথে পাহাড়, নদী, অজানা বনজঙ্গল, বেশ লাগল আজকার দিনটায়।

সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটায় ঠেস্ দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরী হয়েছে—ভ্রমণ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুর বাড়ীর দেউড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়ে নামলাম—সেই ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম—পরদিন থেকে যাত্রা শুরু হোল। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ৪৫ মীর্জাপুর স্ট্রীট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ী, গোয়ালন্দর স্টীমারে মাদারিপুর, বরিশালে অনাদিবাবুর বাড়ী, চাটগাঁয়ের স্টীমার, কক্সবাজারের স্টীমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নরসিংদিতে, জোতির্ম্ময়ের ওখানে ঢাকায়—আবার ৪৫, মীর্জাপুর

স্ট্রীটে। বড় বাসায়, ইসমাইলপুরে,—কত জায়গায়। এই তো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, জয়পুরের ডাকবাংলায় শালবনের মধ্যে নির্জ্জন রাত্রি যাপন করে গেলাম দেওঘর। তারপর গেলাম রামচন্দ্রপুরে, বেণুবনে, বক্রতোয়ার ধারে ধারে, লক্ গেটে সূর্য্যাস্তের সময় কত বেড়ালাম। এই তো গেলাম পাটনা—শোণপুরে মেলা দেখলাম। জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্যালেজা ঘাটে স্টীমারে বসে চা খেতে খেতে গঙ্গা পার হয়ে পাটনায় বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানে ফিরে এলাম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়ীটা উঠছে তারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর সেই কালীর সঙ্গে নালন্দা, সেই রাজগীর যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোনভাণ্ডার, সেই চেনো, হরনৌৎ, শো—অদ্ভুত নামের স্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলায় জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে সাড়ে আটটার গাড়ীতে রাজপুর ফেরা, সেই জাঙ্গিপাড়াকে ভাবতাম কতদূরের দেশটা! কতদিন পরে আজ মনে হোল সেই তারামোহনের পুরানো বাড়ীটার কাছ দিয়ে পথ বেয়ে কাদের বাড়ী গিয়েছিলাম—সেই কলকাতায় হাওড়ার পুলের কাছে অন্ধ ভিখারিণীকে রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করা—

এই অনবরত ভ্রাম্যমাণ জীবন। ঘুরতে হবেই যে—পথে যে নেমেছি—এই যে এখন তহশীলদার খবর দিলে রংবার লোক লালকিষণ সিংকে মেরেছে—এদেশের এই এখন খুনকার—আমাদের গ্রামেও হয়ত এইরকম খুনকার আছে—হানিডাঙ্গায় কি বর্দ্ধন-বেড়েতে ডাকাতি হয়েছে—যাই হোক আমি পথে নেমেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই, অথচ সবের মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়েছে। আমি আজন্ম পথিক—পথে বেরিয়েছি সত্যবাবুর বাড়ীতে যে দিন থেকে সেই—অনেক কাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মানিকের গান হোল —পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিং-এ এলাম—কি ক্ষণে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম জানি না—সেই বিদেশবাস শুরু হোল। পরে আর বারাকপুরকে বারো-মাসের জন্য একবারও পাইনি—হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসছি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পূজায়—শনিবার পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায় —এখনও অন্য ভাবে পাই।

এখনও তো শৈশবের স্বপ্ন দেখা সে সব দেশ দেখতে বাকী আছে, পথে যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন সত্যই কি সে সব বাদ থেকে যাবে?

॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

আজ ও কালকার ঘোড়া চড়াটা ভাল লাগল। আজ একটু বেলা গেলেই বেরুলাম। লালকিষণ সিং-এর বাসার পথটা দিয়ে, কালোয়ার চক হাটের পথ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সূর্য্য ডুবু-ডুবু। যেতে হবে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপার। খুব জোরে সুখটিয়া কুলবনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। ঘোড়ার এই চলাটা আজকাল বড় আরামের মনে হয়। সহদেব সিং-এর টোলার কাছাকাছি সেই বনঝোপভরা পথটায় অন্যদিন থামি, কিন্তু আজ বেলা যাওয়াতে আর না থেমে সোজা বেরিয়ে গেলাম। কুতরুটোলার মধ্যে মেয়েরা ইঁদারায় জল নিতে আসছে, সেই জন্যে আস্তে আস্তে চালিয়ে বাইরের মাঠটায় পড়ে আবার জোরে ছুটলাম। ঝল্লুটোলার সামনে দিয়ে কলাইক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে এসে একটা উঁচু আল পার হলাম—সে জায়গাটি বড় নির্জ্জন, একটা ছোট অশ্বত্থ গাছ, বনঝোপ, সন্ধ্যার ঘন ছায়া ও নির্জ্জনতা বড় ভাল লাগল। পরেই এসে গঙ্গার ধারে প্রায়ান্ধকার পাহাড়টার দিকে চোখ রেখে দূরে দিক্‌চক্রবালের ধূসর সান্ধ্য মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘোড়ার ওপর বসে রইলাম। সেই

দিনটার কথা মনে পড়ে—সেই জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে কুঠীর মাঠে গিয়ে ফিরে এসে ভেবেছিলাম কত দূর না গেছি! সেই দিনটি থেকে আজ কত দূরে কোথায় চলে এসেছি! মায়ের কথা মনে হোল—ঠিক এই সময় মা বলতেন, আমায় শীগ্গির যেতে হবে, ছেলের আবার বিয়ে দোব।

কি অপূর্ব্ব এই জীবন! এই দুঃখের, আনন্দের, শোকের, স্নেহের, আশার, পুলকের, ভালবাসার স্মৃতি জড়ানো—এই অপূর্ব্ব গতিশীল সুখদুঃখের মধুর এই সুন্দর জীবন-দোলা! ধূসর পাহাড়টার ওপরকার সন্ধ্যায় অন্ধকার-ঘেরা বনরাজির মাথার দিকে চেয়ে এক অপূর্ব্বতা অনুভব করে গা যেন শিউরে উঠল—চোখে জল এল। তারপর কতক্ষণ আপন মনে ঘোড়ার উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যা যখন বেশ হয়ে গিয়েছে তখন আবার ঝল্লুদালু টোলা দিয়েই অন্ধকার মাঠের বনঝোপের পথ বেয়ে অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এসে লছমন মণ্ডলের টোলায় পেঁছানো গেল।

তাই এইমাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথটায় বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে ভাবছিলাম, ভগবান, আমি তোমার অন্য স্বর্গ চাই না—তোমার দৈবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক —তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুল-ফল, এই শোক-দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়া-জগতের মধ্যে, দিয়ে বার বার যেন আসা-যাওয়ার পথ তোমার আশীর্ব্বাদে অক্ষয় হয়। এই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতার বোঝাই বইতে পারি না—এর চেয়ে আর কোন্ বড় দান চাইবার সাহস করবো? বড় ভাল-বাসি এই মাটির জীবনকে—এরই মাধুর্য্য যে লোভী বালকের মত বার বার আস্বাদ করে সাধ মিটাতে পারি না, একে এত সহজে ছেড়ে দিতে পারি কি করে?

॥ ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনটা। কত কথাই মনে হয়, দেখতে দেখতে হু-হু করে অগ্রসর হচ্ছে—এই সেদিন ১৯২৩ সালের এসময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম —দেখতে দেখতে সে আজ পাঁচ বছর।

কাল সকালে ইসমাইলপুর থেকে খুব ভোরে বেরিয়ে হাতীর ওপর করে নবীন-বাবু ও অমরবাবুর বাড়ি হয়ে ভাগলপুর গেলাম। সন্ধ্যার ট্রেনে অমরবাবুকে রওনা করে এসেই উদয়বাবু ও বেচুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুরেনের ওখানে গান শুনতে গেলাম। বড় ভাল লাগে সুরেনবাবুর গান আমার কাছে—এমন শুদ্ধ প্রাচীন সুর আমি কোথাও শুনিনি—যে সব পর্দ্দায় সাধারণের কণ্ঠ নামে না, তাঁদের ওপর সুরেন-বাবুর অপূর্ব্ব দখল—সুরলক্ষ্মীর সকল রকম মান-অভিমানের খোঁজ তিনি রাখেন।

আজ সকালে উদয়বাবু স্টেশনে উঠিয়ে দিয়ে গেল। সত্যবাবুর ছেলে ভাদুর সঙ্গে এক সঙ্গে এলাম—ভারী সুন্দর দেখতে, বাবার মত একটু বাজে বকে, একটু হামবড়া ভাব।

কদিন বড় হৈ-চৈ গেছে—আমি ভালবাসি না। জগতের পেছনের যে নির্জ্জন জগৎটা আছে, তা শুধু শান্ত সন্ধ্যায়, স্নিগ্ধ বনের লতাপাতার সুরভিতে আমার কাছে ধরা দেয়—গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় আসে। এটর্নি অফিসের ব্রিফসঙ্কুল কল-কোলাহল কর্ম্মমুখর জীবন আমার বিষের মত ঠেকে। তাই আজ শান্ত বৈকালে যখন কলবলিয়া নদীতে নৌকা পার হচ্ছিলাম, তখন বড় ভাল লাগল। এই আকাশ, এই বৈকাল, এই শ্যামল শান্তি, এই অপূর্ব্ব উদার জগৎ—সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না আমার জীবনে এরাই অক্ষয় হয়ে থাকুক। চাই না তোমাদের দশ হাজার টাকার চেক্, মিনার্ভা

মটরগাড়ী, পেলিটীর বাড়ীর খানা, অমুক এটর্নির অত আয়ের বিষয় সম্পত্তি! তোমাদের মর্টগেজ ট্রান্সফার প্রপার্টিজ এ্যাক্ট, কোবালা, ওআর বণ্ড তোমাদের থাকুক —এই নিঃসীম নীল শূন্য, ওই তারকারাজি, শেষরাত্রির জ্যোৎস্নায় নাগকেশর ফুলের সুরভি, কতদিন-হারা ছেলেমেয়েদের অস্পষ্টপ্রায় মুখগুলো আমার আপনার হয়ে থাকুক।

বেশ মনে আছে, বহুকাল আগের শৈশবে, সেই শিউলিফুলের তলায় ওদিককার ঘাসবনে যখন চড়াই পাখী বসতো, এই শীতের দিনে প্রথম প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে পিঠ পেতে বসে মায়ের হাতের পিঠে খেতে যে অপূর্ব্ব কল্পনা জগতের স্বপ্ন দেখেছি—আমার বাঁশবনের ভিটার প্রতি ধূলিকণায় তার লিখন আছে—কোন্ এটর্নি অফিসের মর্টগেজ দলিল দস্তাবেজের মধ্যে তার জুড়ি খুঁজে মিলবে? সেই "নন্দসুত নীল নলিনাও" গান, সেই বালক কীর্ত্তন, সেই বকুলতলা, নট্‌কান গাছ, বিল্‌বিলে, পূব-মুখো যাওয়া, ভরত—সেই অদ্ভুত শৈশব স্বপ্ন—আমার সে-সবই চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকুক।

আর সম্পদ হয়ে থাকুক, এমার্স‍ন শেলি শেকভ রবীন্দ্রনাথ, আমার ঐ ছেঁড়া কালিদাসখানা, রামায়ণ বার্নার্ড শ—এঁদেরই আমি চাই, এঁরাই আমার ঐশ্বর্য্য।

আজ আবার শান্ত গ্রাম্যজীবনের মধ্যে এসে পড়েছি। আবার প্রশান্ত জীবন, সুন্দর নাক্ষত্রিক শূন্য, সন্ধ্যার বিচিত্র কর্ণকদম্ব, বলোয়া এসে গল্প করছে, বলছে—ম্যানেজারবাবু, তুমি যখন আসছিলে তখন আমি কুলোকুমারের কলাইক্ষেতে বসে-ছিলাম, তার পর ভাই কড়ুরিয়া এসেছে, আনন্দিয়া এসেছে—এই সব গল্প করছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটা যেমন শান্তিতে কাটল—সারা বছরটা এই রকম কাটুক।

॥ ১লা জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আবার সে শান্ত জীবন আরম্ভ হয়েছে। কাল ও আজ আবার আজমাবাদের কুলবন দিয়ে পাকা কুল খেতে খেতে ঘোড়া ছুটিয়ে, সহদেব টোলার সেই তেলাকুচো ঝোপবনের ভেতর দিয়ে অস্তসূর্য্যের আলোয় ধীরে ধীরে কুতরুতোলা দিয়ে গঙ্গার ধারের দূরের পাহাড়গুলোর ধূসর দৃশ্য দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে গিয়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানটাতে ঘোড়া দাঁড় করালাম। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নদীজল, পাহাড়, বহু-দূরের দিক্‌চক্রবাল কোন মায়াজগতের ইন্দ্রজালময় স্বপ্নছবির মত অপরূপ দেখাচ্ছে। আবার সেই মাথার উপরে প্রায়ান্ধকার আকাশের প্রথম নক্ষত্রটি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের জগতের অজানা কুহক নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—শৈশবের বাঁশবনের গভীর রাত্রে লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের মত গভীর রহস্যভরা জীবনকে আবার ফিরে পেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাব্‌লা গাছের পাশের সরু খালের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিই, ক্ষেতে ক্ষেতে লোক গান গাচ্ছে, কলাই-এর বোঝা মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরছে—ভীমদাস টোলার ঘরের উঠানে কলাই-এর ভূষায় আগুন করে গোল হয়ে লোকে বসে আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে, ঝল্লুটোলার ইঁদারায় মেয়েরা জল তুলছে—দেখতে দেখতে বাইরের মাঠে পড়ি, একটু একটু জ্যোৎস্না ওঠে, হু-হু পশ্চিমে বাতাসে কন্‌কনে শীত করে, বাঁধটার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ডান-দিকের অস্পষ্ট দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেশের কথা ভাবি—ঠাকুরমা, পিসীমা, বড় চারা আমগাছতলায়, নদীর ঘাটে কি করে আনন্দ ভোগ করে গিয়েছেন গত

পুরুষে, সে কথা ভাবি—জ্যোৎস্নায় পথের পাশের আকন্দগাছ চক চক করে, ধুতুরার ফুল সুন্দর দেখায়—কাছারী এসে পৌঁছাই।

॥ ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

একটু বেশী বেলা থাকতে আজ বেরিয়ে সুখটিয়ার কুলবনে এগাছে ওগাছে কুল খেতে খেতে বনঝোপ, অস্তমান সূর্য্য, আকাশে চতুর্দ্দশীর চাঁদ, ঘুঘু-মিথুন, সবুজ গমক্ষেত দেখতে দেখতে গিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম। চতুর্দ্দশীর চাঁদের আলো গঙ্গার জলে অল্প অল্প পড়ে চিক্ চিক্ করছে—ওপারের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরভূমি দেখে হঠাৎ মনে হল—আমি সুনীল ভূমধ্যসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দূরের কোন দ্বীপের দিকে চেয়ে আছি—হাজার দু হাজার বছর আগেকার জীবনযাত্রা আবার যেন চোখে পড়ে—কত সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রির দল—থ্রেস্‌দেশীয় সামান্য গৃহস্থঘরের শান্ত সহজ জীবনযাত্রা, কত এল্‌ম, ওক্, মার্টল গাছের ছায়া, বন্য আঙুরলতার ঝোপঝাপ, জুনিপার গাছের বন—হাজার বছর আগের যে লোকদল, তাদের সভ্যতা গর্ব্ব, সোনা রূপার রথ নিয়ে ঐ অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন দূর তীরভূমির মতই ছায়া হয়ে হাজার বছর আগে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। অনন্ত জীবন কেবল এই নীল জলধিরাশির মতো অনন্ত পানে বেয়ে চলেছে একটানা—বড় বড় সাম্রাজ্যের কঙ্কাল, তীরস্থ শেওলা, জলজ উদ্ভিদের মত একপাশে হেলায় ফেলে রেখে দিয়ে উদাসীর মত চলেছে। আবার এখন থেকে হাজার বছর কেটে যাবে...সে দূর ভবিষ্যতের নবোদিত প্রভাতে সে যুগের তরুণ বংশধরদের কাছে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মোটর এরোপ্লেন, বেতার-যন্ত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নিতান্ত আদিম যুগের পণ্য বলে বিঘোষিত হবে। প্রাচীন রোমান-দের স্বর্ণরৌপ্যে জাঁকজমকওয়ালা স্প্রিংবিহীন গাড়ীর মত।

মানুষকে শুধু চলতে হবে। চলাই তার ধর্ম্ম—পথের নেশা তোমাকে আশ্রয় করুক। যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে--নব নব প্রভাতে নব নব ফুলফল, হাসিমুখ তরুণ, শৈশব-স্নেহ প্রেম আশা হাসি জ্যোৎস্না—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে, আবার পেছনে ফেলে চলে যাবে—আবার পাবে।

চরণ বৈ মধু বিন্দতি। চরণ স্বাদুসুদ্ভূ স্বয়ম্—এই চলার বেগের অমৃত তোমার আপনার জীবনে সত্য হোক।

জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে, নতুবা আত্মার দৈন্য ঘোচাতে পারবে না। গতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন-পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে প'ড়ো না।

॥ ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ পূর্ণিমার দিনটা পূর্ণচন্দ্রকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্যই একটু দেরি করে বেড়াতে বেরুলাম। সুখটিয়া কুলবনেই বেলা গেল। সহদেবটোলায় তেলাকুচা ঝোপে ভরা সেই পথটায় যখন গেলাম তখন সূর্য্যের রাঙা রোদ ঝোপে-ঝাপের গায়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আসছিলাম, প্রতি আকন্দ গাছ, তেলাকুচা লতা, নাটাকাঁটার ঝোপ, ছায়াশ্যামল তৃণভূমি উপভোগ করতে করতে মুখে দোদুল্যমান আলোকলতার স্পর্শ মেখে, পিছনের মাঠে অস্তসূর্য্যের রক্তগোলকটা পিঠের ওপর দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে কুতরুটোলায় এসে পৌঁছলাম। তার-পর পাখীর কাকলী শুনতে শুনতে ডাইনের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, একটু দূরেই সন্ধ্যার

কুয়াশায় অস্পষ্ট গঙ্গা ওপারের পাহাড়টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এলাম। পূর্ণ-চন্দ্র ততক্ষণ উঠে গিয়েছে—গঙ্গার জলে দীর্ঘ রশ্মি পড়ে কাঁপছে। দিয়ারা থেকে মাথায় করে লোকে কলাই-এর বোঝা নিয়ে ফিরছে—মাঠে খুপড়ী থেকে কলাই-এর ভূষার সাঁজাল দিয়েছে—তারই ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনটা কি অপূর্ব্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে। সেই কতদিন আগে—মনে পড়ল, এমন দিনটিতে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে। সেই ছোট ঘরটাতে থাকতাম, মোহন্ত ভোরবেলা উঠে কি স্তোত্রপাঠ করত, আর পিতলের লোটায় ঝোল রেঁধে আমাদের খেতে দিত। সেই তেঁতুলতলার দিকে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওপরের ছাদে বসে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল পড়া স্বপ্নের মত মনে আসে। এই আজকার পূর্ণিমায় সেই আড়ংঘাটার ছাদটা কি রকম দেখাচ্ছে? বাবার করুণ স্মৃতিমাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো? ওপারের ধূসর পাহাড় শ্রেণী, কুয়াশাচ্ছন্ন উদাস গঙ্গাবক্ষ, সুদূর পূর্ব্ব দিকচক্রবাল ...এদের সামনে রেখে কেবলই মনে পড়ে আমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোৎস্না আজ উঠেছে—চাঁপা পুকুরের পুকুরঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইছামতীর ধারে, চাটগাঁয়ের মণিদের বাড়ী পুরোনো স্মৃতির সব জায়গাগুলোতে। কুটির মাঠের কথা হঠাৎ মনে পড়ে—দেশের জন্যে মন কেমন করে। তারপর পূর্ণচন্দ্রকে পেছনে রেখে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। চারধারের মাঠ কুয়াশায় ঘিরে নিয়েছে, সারাদিনের পশ্চিমে বাতাসের পর এত ঠাণ্ডা পড়েছে যে হাতে দস্তানা পরেও আঙ্গুল কন্‌কন্‌ করছে—ভীমদাসটোলায় ঘরে ঘরে লোকে কলাই ভূষার 'ঘুর' লাগিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে—ইন্দারায় মেয়েরা জল তুলছে। গত বর্ষাকালে যে খালটা দিয়ে নৌকা বেয়ে ভগু সিং-এর বাড়ীর পিছনের ঘাট দিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম সে খালটার জল এখন শুকিয়ে গিয়েছে। বালির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এলাম। বাঁধের ওপরে উঠে আবার আড়ংঘাটার কথা মনে এল। বাঁধ ছাড়িয়েই এক দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিং-এর টোলার অশথ গাছটার কাছ পর্য্যন্ত। এত জোরে এলাম যে পরমেশ্বরী কুমারের যে খুপড়ীতে লোকজন আগুন তাপছিল—তারা হাঁ করে চেয়ে রইল।

॥ ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ নতুন পথে গেলাম। সীমানায় চলে গিয়ে অযোধ্যা সিং-এর বাড়ীর কাছের পথ ধরে মহারাজির জঙ্গলের পাশের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। আজকার মত একদৌড়ে অতটা পথ কোনো দিন ঘোড়া যায় নি। ফাঁকা মাঠ, দুপাশে ঘন কাশের ও নলখাগড়ার বন পার হয়ে বড় বাবলা বনটার পাশ দিয়ে সোজা উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘোড়া ছাড়লাম। বটেশপুর দিয়ারা দিয়ে রাস্তা। মাঠ জঙ্গলের ধার দিয়ে গিয়ে সোজা পৌঁছানো গেল কলবলিয়ার কিনারায়। কাটারিয়ার এপারে কলবলিয়া যেখানে গিয়ে কুশীর সঙ্গে মিশেছে তার একটু এদিকে জল কম। বটেশপুর দিয়ারা থেকে কলাই-এর বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েরা হেঁটে নদী পার হচ্ছে—সেই পথে ঘোড়াসুদ্ধ পার হয়ে গিয়ে কাটারিয়ার সমনে নতুন রেলপথের ধরে এক বাবলা-বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বেশ সুন্দর ছায়া, পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু-নীচু ভূমি—দুটি মেয়েতে কাঠ ভাঙছিল। তারা বললে, এ রাস্তা নয় পুলে যাবার—সামনে দিয়ে পথ। সেখান থেকে নেমে নতুন বাঁধের নীচে যেতে হবে। কাটিহারের ট্রেনখানা বেরিয়ে গেল। একটা জলাতে দুটো বড় বড় জাঙ্গিঘল পাখী বসেছিল। বটেশপুর দিয়া-

রাতে এক ঝাঁক ঘুঘু পথের পাশ দিয়ে উড়ে গেল—বন্দুকটার জন্যে হাত নিসপিস করে।

তারপর খাড়া উঁচুপথে বাঁধটার ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে পুলটার কাছে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে ঘন বাবলা বন ও তেলাকুচা ও অন্য অন্য লতাপাতার ঝোপ—সন্ধ্যার ছায়ায় শ্যামল শীতল। কাটারিয়ার স্টেশনের ওপারে লাল টকটকে সূর্য্যটা অস্ত গেল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে আবার ঢালু দিয়ে তেলাকুচাঘেরা বাবলা বনটার মধ্যে নামলাম। জেলে দুটো যেখানে রেলবাঁধের নীচে খুপড়ী বেঁধে আছে, সেখান দিয়ে নেমে এলাম। তারপর বাবলা বনের পাশ দিয়ে এসে কলবলিয়া পার হয়ে জোরে ঘোড়া ছাড়লাম। খুব বেলা গেলে আজ বেরিয়েছিলাম কিন্তু এতটা পথ গিয়ে আবার ফিরে এসে ভাল করে অন্ধকর হবার আগেই আজমাবাদ সীমানা ছাড়িয়ে জনকধারী সিং-এর বাসার কাছে এসে পেঁছে গেলাম।

॥ ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ দুপুরের পর বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। অন্য অন্য বার যে পথ দিয়ে যাই আজ সে পথ দিয়ে যাই নি। গুহাটার সামনে দিয়ে একটা পথ গভীর বনের দিকে চলে গিয়েছে, সেদিকে গেলাম। কত কি বনের গাছ—একটা পাথরের ওপর বসে বসে দূর পাহাড়ের ওপরকার বাঁশবনের শোভা দেখলাম। পাহাড়ের ওপর অনেক কাঞ্চনফুল গাছে ফুটে আছে। সেখান থেকে তলা দিয়ে গিয়ে গিয়ে গভীর একটা বনের কাছে পেঁছিলাম। কল্পনা করছিলাম—চাবুকটা যেন আমার ধনুক—বটগাছের যে ডালটা ভেঙে নিয়েছিলাম সেটা যেন আমার বাণ। সভ্য জগৎ থেকে দূরে এক বন্য আদিম মানুষের জীবন যাপন করতে আমার বড় ভাল লাগে। তাই গাছ যেখানে বড় ঘন, ঝোপ খুব নিবিড়—তারই নীচে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করতে করতে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম পাহাড়ের ওপর বন্য বেতের গাছ হয়েছে—এর আগে বটেশ্বর পাহাড়ে বন্য বেতের গাছ কখনও দেখি নি। অনেকক্ষণ পাথরটার ওপর বসে বসে ভাবছিলাম—শৈশব শুধু পিসিমা, হরি রায় এরাই আমার সঙ্গী ছিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা, ভীষ্ম, সাত্যকি, অশ্বত্থামা এই সব পৌরাণিক চরিত্রও আমার কাছে জীবন্ত ছিল। আমাদের গ্রামে আশে-পাশে বনেবাদাড়ে তাদেরও স্মৃতি শৈশবের সঙ্গে জড়ানো আছে যে। রোদ রাঙা হয়ে এলে পাহাড় থেকে নেমে নৌকায় উঠলাম। একটা স্টীমার সকাল থেকে চড়ায় আটকে আছে। একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পার হচ্ছিল, তার বাপের সঙ্গে নতুন শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছে। ঘোমটা খুলে কৌতূহলী চোখে স্টীমারটা দেখতে লাগল। নিজে হাল ধরে নৌকা ঠিক ঘাটে লাগিয়ে দিলাম। রাম সাধোকে বললাম, তুমি ঝল্লুটোলা হয়ে চলে যাও। তারপর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের অভ্যস্ত স্থানটিতে এসে দাঁড়ালাম। কত কথা মনে হয়—সেই আড়ংঘাটায় বাবার সঙ্গে যাওয়া, সেই চাঁপাপুকুর, কত কি! জীবনটা কি বিচিত্র, তাই শুধু ভাবি। সত্যবাবুদের বাড়ী থেকেও এর বিচিত্রতা যেমন দেখলাম—বাংলাদেশ থেকে বহুদূরে এই বিদেশে পাহাড় নদী বন গঙ্গা অস্তগামী রক্তসূর্য্যে বিচিত্রতার মধ্যেও তেমনি দেখছি।

খুব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ-ভরা তারার নীচে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে ভীমদাসটোলা দিয়ে বাঁধের উপর দিয়ে কাছারি ফিরলাম। পথ দেখতে পাই না—ঘোড়া শুধু আপনার ঝোঁকে কদমে চলে। শুধু আমি আর নির্জ্জন মাঠ, একরাশ অন্ধকার, নতুন জিনটার মস মস শব্দ ও মাথার ওপরে জ্বলজ্বলে বৃহস্পতি,

দীর্ঘ ছায়াপথ।

কাল সকালে এখান থেকে ভাগলপুর যাবো।

॥ ৯ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ কাঞ্চনগড়ে গাড়ী করে গিয়ে বিভাসবাবুর সঙ্গে সব কথাবার্ত্তা কইলাম। তারপর ফিরে এসে ক্লাবে চণ্ডীবাবু ও অমূল্যবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্য-চর্চ্চা করা গেল। কাল সকালে এক বোতল জ্যাম কিনে নিয়ে ইসমাইলপুর যাবো।

ক্লাবে মর্ডাণ রিভিউ পড়ছিলাম। সিসিলিয়া মরলের লেখা বড় ভাল লাগল। প্রাচীন দর্শন, উপনিষদের এই তত্ত্ব বিদেশিনীর এত ভাল লেগেছে—বড় আনন্দ হ'ল। জীবনে জ্ঞানপিপাসু, উন্নতিপিপাসু আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্যে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত্ত আত্মা খুব কম। দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হ'লে বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

এই কৌতূহল, এই ব্যগ্রতা, একটা কিছু হবো, আরও উন্নতি করবো...এইটাই আঁকবার। টমাস হেনরী রাদারফোর্ডের মত শত শত সুন্দর তরুণ যুবক প্রাচীন দিনের রাইনের প্রাসাদে প্রাসাদে—তাদের জীবন, দুঃখ, অদৃষ্ট মনে বড় লাগে। যে মেয়েটি কর্ণেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে তার কথা জেনে মনে একটা বড় উৎসাহ হয়। এই জ্ঞান-সুধা যে জাতির মধ্যে আছে তারা যদি বড় না হয় তবে বড় হবে কে?

শৈশবের সে স্বপ্নের দিন আর নেই। উত্তর জীবনে এই আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, এই কৌতূহল, এই স্বপ্ন, এই জীবনকে realise করবার মত ক্ষুধা—এইটাই আঁকবার।

॥ ১২ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

পৌষ সংক্রান্তি। সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা করা গেল। তারপরে বেলা হ'লে আমরা চার-পাঁচজনে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। রোদ বড় প্রখর লাগতে লাগল। ছোট জলাটা পার হয়ে আমি ও নায়েববাবু ওপারের চড়ার পারে বড় গঙ্গায় নাইতে গেলাম। আমি আসবার সময় গল্প করছিলাম, সেদিন বটেশ্বরনাথের পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নেমে আসবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণায় সেই বৈকালের ছায়াভরা পাথরের ঘাটটিতে পাণ্ডাঠাকুরের গেলাসে করে সেই নির্ম্মল শীতল গঙ্গার জল যে খেয়েছিলাম—তার কথা। ফিরে এসে নতুন ঘরের নিকানোপোঁছানো দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসে ভাবছিলাম, বাংলাদেশে বসন্তদিন আসছে—সেই প্রথম গা-নাচানো মন-মাতানো দখিন হাওয়া, সেই পাতা-সাজানো বৈঁচিগাছ, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ, কোকিলের ডাক, সেই দিনগুলো। জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করাই জীবনের সার্থকতা : উদার-ভাবে প্রসারিত মনে ভোগ বা বেঁচে থাকবার আর্ট। এটুকুও শিখতে হয়।

॥ ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৮ , ইসমাইলপুর ॥

বৈকালে ঘোড়া করে বেড়াতে বেরুলাম। লোধাইটোলার ওদিকে জলার ধারের রাঁইচীক্ষেতের দিকে আকাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—এত রাঁইচীফুল ফুটে আছে—দূরে সন্ধ্যার ধূসর আকাশের নীচে উন্মুক্ত দূরপ্রসারী হলুদ রং-এর রাঁইচীক্ষেত কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! এই শুকনো কাশবনে সোঁদা সোঁদা ছায়াভরা গন্ধ, এই উদার নীল আকাশ, এই ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্র, এই নির্ম্মল বাতাস, চখাচখির সারি, দূরের ধূসর পাহাড়রাজি, এই গতির বেগ—সবসুদ্ধ মিলে জীবনকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমি না ভেবে পারিনে যে এই উন্মুক্ত উদার গতিশীল যাত্রাপথের পথিক যারা নয়, জীবনসম্পদে তারা দীন।

বসিরহাট থেকে পত্র এসেছে বহুদিন পরে পাটালি পাঠানোর জন্যে। বহুদিনের কথা মনে পড়ে। ৬০, মির্জ্জাপুরের কলেজ হোস্টেলে এই শীতের দিনের যে অপূর্ব্ব দিনগুলো—সেই প্রথম যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, মায়াজগতের স্বপ্ন, শিশিরবাবুর অভিনয় 'ইন্‌স্টিটিউটে' দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে যে মেতে থাকা! তারও আগে এই প্রথম বসন্তের দিনে রমাপ্রসন্নের জন্যে ফাল্গুনী দেখতে যাওয়া—সেই 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—সেই ভূতনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার সঙ্গে Landor পড়ার দিনগুলো! সেই গ্রামের বসন্ত দেখেছি ১৯১৭ সালে এই দশ বৎসরের মধ্যে তা আর হয়নি।

॥ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে না এলে কি স্টীমার ধরতে পারতাম? জঙ্গল থেকে বার হয়েই দেখি স্টীমার এপারে। ভাগ্যিস ছিল ছোট ঘোড়াটা—বালির চর বেয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়া উড়িয়ে তবে এসে স্টীমার ছাড়বার ঘণ্টা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম ঘাটে।

দেবীবাবুর ধর্ম্মশালায় উঠেছি আজ। একবার সরাইখানার অভিজ্ঞতাটা হোক না? দুনিয়াটা তো একটা বৃহৎ ধর্ম্মশালা—বড়র মধ্যে যে জিনিসটা ছোট অথচ বড়রই প্রতীক সেটাকে চিনে নিই।

পাশের ঘরে কে একজন গান গাচ্ছে আর বেহালা বাজাচ্ছে—বাঙ্গালী মনে হচ্ছে। 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গান ধরেছে।

একটা জিনিস নতুন ঠেকছে। কয়দিন হাতে অনেক কাজ, দেখি কি করি!

আজ ছিল বৃহস্পতিবার—আমাদের দেশের হাটবার। স্টীমারের ডেকে ব'সে ব'সে কেবল মনে ভেবেছি আমাদের বাঁশবনে ঘেরা ভিটাটিতে দূর শৈশবের একদিনে সামনের পুরানো পাঁচিলটা দেখতে দেখতে হাটে বেরুচ্ছি। খানসামা চা দিয়ে গেল, চুমুক দিতে দিতে বার বার সেই কথাই মনে আসতে লাগল। উপরের ডেক আজ ছিল বড় নির্জ্জন, ব'সে ভাববার বড় সুবিধা।

মানসিক ঘুম ব'লে একটা জিনিস আছে...শারীরিক ঘুমের চেয়েও তাতে মানুষকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে ফেলে। দেহে সজাগ থাকা কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু মনে সজাগ থাকা কঠোর সাধনার ওপর নির্ভর করে। সেটা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি।

॥ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

এই দিনটাতে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম সাজকীর টিলায়। দুপুরের পর আজ হেঁটে সাজকী চ'লে গেলাম। উঁচু টিলাটার ওপর তেঁতুলগাছটার তলায় চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে চারদিকের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে শ্যামল তালশীর্ষগুলোর দিকে চেয়ে রইলাম। কত বছর আগেকার সে শৈশব সুরটা যেন বাজে—এক পুরোনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর। কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, কত মধ্যাহ্ন আবার যেন ফিরে আসে পঁচিশ বছর পরে।

এই শান্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই মনে পড়ে জীবনটা কি—তা ভেবে দেখতে হবে। এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের এবারকার মত জীবনে কি সারাজীবন ফুরিয়ে গেল? এই দুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা

ও খোলার আহ্বান, তেলাকুচালতার দুলুনি—এ সব যে বড় ভাল লাগে।

কে জানে হয়ত যদি আসতেই হয় তবে হাজার বছর পরে। কারণ পার্থিব জীবন ছাড়া আরও একটা অপার্থিব জীবনধারা কল্পনা করতে পারা যায় যাতে আনন্দ বা সৌন্দর্য্য আরও ক্রমপরিস্ফুট হবে—সৌন্দর্য্যের সত্যের উপভোগই জীবনের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নাই।

তা যদি হয় তাতে সময় নেবে। হাজার বছর না হয় পাঁচশো বছরও হ'তে পারে। এসব বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নাই। চিন্তার গোঁড়ামি আমি বড় অপছন্দ করি, স্থিতিস্থাপক মন না হ'লে সত্যদর্শী হওয়া বড় শক্ত। কাজেই যদি ধ'রে নেওয়া যায় ওপরের কথাটাই সত্য তো এই পৃথিবীর আলো হাওয়া জল মাটির কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে? তাই নীরব রহস্যভরা মধ্যাহ্নে সেই বিদায়-বেদনার সুর বড় বাজে।

অমরবাবু, উপেনবাবুর সঙ্গে রণজিৎবাবুর বাড়ী যাওয়া গেল। ফিরে আসতে আসতে কথা হ'ল, আমরা বেদের দল, তাঁবু ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছি। রাখালবাবু চলেন কলেজে—উপেনবাবু তল্পি নিয়েই মঙ্গলবারে কলকাতা। ভাগলপুর শূন্য হয়ে পড়েছে। কাল আবার সঙ্গীতসমাজে Recitation-এ বিচারকের আসন গ্রহণ করতে হবে।

॥ ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সঙ্গীতসমাজে আবৃত্তির প্রতিযোগিতার বিচারকর্গিরি করতে গেলাম বেলা তিনটার সময়। সেখানে একটা ছেলে বড় সুন্দর আবৃত্তি করলে। সেখানে থেকে চণ্ডীবাবু অম্বিকাবাবু ও আমি গেলাম ক্লাবে। সেখানে থেকে চা-এর নিমন্ত্রণে গেলাম। সারাদিন Engagement-এর ভিতর দিয়ে দিনটি বেশ গেল।

একদিকে যেমন সরল সহজ জীবন দরকার, অন্যদিক থেকে আলো শিল্প সৌন্দর্য্য সঙ্গীতও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এটা ভুলে গেলেও তো চলবে না।

কা'ল যেমন সারাদিনটি বাদলা গিয়েছে, ঘোরাও গিয়েছে সারাদিন খুব। বেলা চারটার সময় বেরিয়ে ভিজতে ভিজতে উপেনবাবুর বাড়ী, সেখান থেকে স্টেশনে উপেনবাবুর টিকিট বিক্রী করতে। সেখান থেকে ধর্ম্মশালায় খেয়েই বেরুনো হ'ল চণ্ডীবাবুর বাড়ী। সেখান থেকে অমরবাবুর বাড়ী হয়ে উপেনবাবুর বাড়ী গিয়ে রাত কাটানো গেল। সকালে উঠে চা খেয়ে সেখান থেকে এলাম সুরেনবাবুর বাড়ী। তারপর ধর্ম্মতলায় ব'সেই ইসমাইলপুর রওনা হওয়া গেল। খুব মেঘ মাথায়, ঘোড়াটা জোরে ছুটিয়ে ভিজে কাশের গন্ধ উপভোগ করতে করতে এলাম কাছারীতে।

পরদিন বৈকালে বর্ষণসিক্ত সবুজ কচি গমের ক্ষেত ও হলুদ রং-এর ফুলে ভরা রাইক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দূরের পাহাড়গুলোয় আবার পরিষ্কার নীল রং ধরেছে—বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের তলে সবুজ গমক্ষেত ও হলুদ রং-এর সমুদ্রের মত ফুলে ভরা রাইক্ষেত আমার চোখে কি মোহ-অঞ্জন যে পরিয়ে দিল! ঈশ্বর ঝা লোধাইটোলা থেকে বেরিয়ে দুঃখের কথা বলতে বলতে আমার ঘোড়ার পিছু পিছু কুণ্ডীর কাছাকাছি গেল। সেখান থেকে সে পথে গঙ্গা দেখে ফিরলাম। বালা মণ্ডলের টোলা আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটা যা ছুটল! শুয়োর যেসব ক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে তার মধ্য দিয়ে খুব জোরে ঘোড়া ছুটল।

॥ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯২৮॥

এ জীবনে প্রথম দেখলাম সরস্বতী পূজোর দিন এভাবের বাদল হয়। দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার ক'রে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এখন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে আলো জ্বলছে, আমার বাংলো ঘরটায় ব'সে আপন মনে লিখছি—চারধার অন্ধকার ক'রে বেশ জোরে বিষ্টি পড়ছে—ঠিক যেন ছেলেবেলার এক শ্রাবণ মাসের বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা। অথচ এটা বসন্তকালের প্রথম দিনটা—যে সময় কলকাতায় গান করতাম 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। আজ অনেক লোক খাবে, ব'লে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু দই আসেনি বলে ঘোড়া নিয়ে মুকুন্দী চ'লে গেল বাসনাকুণ্ডু। বায়না ক'রে সরস্বতী পূজোর আয়োজন হ'ল ঠিক আর বছরের মত। ঈশ্বর ঝা পূজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম। নায়েব মশায়ের বাসা থেকে আলপনা দিয়ে পিঁড়ি নিয়ে আসা হ'ল। বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরীটা ও রামায়ণখানা বার ক'রে দিলাম ঠাকুরের পিঁড়িতে। বাবার খাতাখানা নিজের হাতে চন্দন মাখিয়ে ও ফুল সজিয়ে বড় অনন্দ পেলাম। তিনি কি জানতেন তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পরে প্রথম যৌবনে তাঁর লেখা ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাখানা বিহারের এক নির্জ্জন কাশবনের চরের মধ্যে ফুলচন্দন দিয়ে অর্চ্চিত হবে?

ঈশ্বর ঝা ও তার ভাইকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালাম। ওরা রসগোল্লা এদের দিতে চায় না—হুকুম দিয়ে আনালাম, এদের দিলাম। রামচন্দ্র সিং আমীনকে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ে প্রসাদ খাওয়ালাম। তারপর গাঙ্গোতারা বাইরে বৃষ্টি মাথায় খেতে বসলো। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ালাম। প্যাঁড়া মহুয়া দই ও একটু একটু ক'রে গুড় পেয়ে সেই টিপ টিপ বাদলের দিনে ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় বর্ষণমুখর আকাশের নীচে অনাবৃত মাঠে বসে খেতে খেতে তাদের উৎসাহ লোভ আনন্দ দেখে চোখে জল এল।

করুয়া চামার ছেলেপিলে নিয়ে অন্ধকারে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ময়লা গামছা পেতে চিঁড়ে খাচ্ছে ও চেঁচাচ্ছে—শুখা ছে মালিক, হে মালিক থোড়া গুড়! সিকলা পরিবেশন করছে, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিচ্ছে না। ওরা যখন ভিজছে তখন আমার ঘরে ব'সে আরাম করবার কোন অধিকার নেই ভেবে আমিও ভিজতে ভিজতে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম ও হুকুম দিয়ে তাকে ও তাদের ছেলেদের আরও দই-গুড় আনিয়ে দিলাম।

অন্ধকার বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াকার ধূ ধূ মাঠের দিকে চেয়ে মনে পড়ল, কতকালের সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সরস্বতীপূজোতে কুঠির নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়া।

কতকাল—কতকাল—আগে—

জীবন কি অদ্ভুত, তাই মনে মনে ভাবি—

সেদিন সাজকীর সেই অপূর্ব্ব দুপুরটা মনে পড়ছে। সেই রৌদ্রদীপ্ত তাল-বৃক্ষশ্রেণী, সেই অপূর্ব্ব শৈশব স্মৃতিটা—সার্থক ছিল সে যাত্রা আমার। শুভক্ষণে ধর্ম্মশালা থেকে বেরিয়েছিলাম।

বড়লোকের বাড়ীর অভিজ্ঞতাটুকু লিখছি।

রামচন্দ্র সিং আমীনকে আমার বড় ভাল লাগে। একা জঙ্গলের ধারে থাকে। আমোদ-উৎসবে ওকে কেউ ডাকে না। বড় শুদ্ধ-সত্ত্ব লোক। তাই আজ ওকে ডেকেছি। প্রসাদ পেয়ে স্ফূর্ত্তিতে কাছারী ঘরে বসে গান করছে—

তেরা গতি লখি না পারিয়া—
হরিচন্দর রাজা...পিয়ে ডোম ঘরে শনি—দয়া হোইজী...

আরবারের মত। সেই আমার ভয়ানক Home-sickness, পশ্চিমে হাওয়া—

হীরেনবাবু, কাল্লীঘরে লিখবার টেবিল...ঘুর পোয়ানো...জঙ্গলের মাথায় চাঁদ ওঠা।
খুব হাসছে. আর গাইছেঃ

এক লাখ পুত সওয়া লাখ নাতি—
সকরি কোই নাম আয়ী—
দয়া হোইজী...

'কোই নাম আয়ী' অংশটা বার বার জোর দিয়ে গাইছে। গোষ্ঠবাবুও মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করছে। রামচরিত ভিজতে ভিজতে নওগাছিয়া ডাকঘর থেকে এসে বললে, চিঠিপত্তর কিছু নেই।

॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৮৭ ॥

আজ সবুজ গম রাঁইচীক্ষেতে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলাম। ফিরে এলে গোষ্ঠ-বাবু ঘরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। ছটু সিং-এর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল।
অস্পষ্ট মনে এল। নতুন বোষ্টমীর আখড়ার পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে একদিন
সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে দেশের কুঠীর মাঠের একটা দিনের ঘটনার ছবি সকালে কুঠীর মাঠের দিকে যাওয়া। আটির নীচের ক্ষেতে কে নতুন চষেছে—জ্যাঠামশায় না কে সঙ্গে আছেন—ফিরে এলাম।

সে কি প্রথম দিনটা কুঠী যাওয়া? ভাল মনে হয় না।

সেই সময়ের মনের ভাবগুলো বেশ ধরা যায়। ঐ দিনটা স্পষ্ট মনে এলে ঐ দিনের—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার শৈশবের এক হারানো দিনের ভাবনাটাও স্পষ্ট মনে পড়ে। দুটো এক ফটোগ্রাফের প্লেটে তোলা ছবি একত্রে মস্তিষ্কের কোথায় যেন আছে—এতদিন কত অন্য প্লেটের তলে চাপা পড়ে ছিল—আজ হঠাৎ হাত পড়েছে।

॥ ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি! এরকম রাত্রি দিয়ারা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না—আর দেখা যায় বড় বাসার ছাদে। চারধার নিস্তব্ধ, সামনের কাশবনের মাথায় দুগ্ধ-শুভ্র জ্যেৎস্নাধৌত আকাশে রহস্যময় তারার দল। শুধুই মনে পড়ে, জীবনটা কি বিচিত্র রহস্য—এ শুধু একটা বিচিত্র অনন্ত রহস্য, এর সব দিকেই অসীমতা—যে-দিকে যাওয়া যায়। চাঁপাপুকুরের সেই যে বাড়ীটাতে নিমন্ত্রণ করেছিল, আমাদের গ্রামের সেই দশ-বিঘা দানের বাঁশবন, বড় চারা আমতলায়, জাঙ্গিপাড়ার স্কুলের সামনের মাঠে—এরকম জ্যোৎস্না পড়েছে আজ—যখন এই সব বিভিন্ন স্থান ও তৎ-সংশ্লিষ্ট স্মৃতির কথা মনে ভাবি তখনই হঠাৎ জীবনের বিচিত্রতা প্রগাঢ় রহস্য আলোকে অভিভূত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়ে অনন্ত আকাশের নক্ষত্ররাজির উপর—কে জানে ওর চারপাশের অন্ধকার গ্রহদলের মধ্যে মধ্যে কি বিচিত্র-জীবন-ধারা-প্রবাহ চলেছে! কোন্ দেববালকের মায়াময় শৈশব-স্বপ্ন দেশের গাছপালা ভূমিশ্রীর মধ্যে কাটছে যুগে যুগে—অপূর্ব্ব দেবতার লীলা-ভূমি কত সৌন্দর্য্য ভরা নব নব জগৎ—কত উচ্চস্তরের জীবকুল!

হাজার হাজার বর্ষ স্থায়ী বিচিত্র প্রেম তাদের, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন-মৃত্যু বিরহমিলনের ভিতরে অক্ষুণ্ণ, চির সজীব ধারায় বয়ে চলে—কত সভ্যতার উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে, কত পৃথিবীর ধ্বংসসৃষ্টির তালে তালে। প্রাচীন ইজিপ্টের সে রাজকন্যার আত্মার কথা মনে পড়ে। এক বত্রিশ বৎসরের জীবনে

যদি এই আনন্দের এই প্রাচুর্য্য, অনন্ত জীবনপথের পথিকদের হাজার হাজার বৎসর স্মৃতির মধ্যে কি অমৃত সঞ্চিত আছে—যদি অমৃতের পুত্রেরা তাদের সত্যকার অধিকার না হারিয়ে ফেলে? জন্মে জন্মে যুগে যুগে হারানো প্রেম ফিরে পাওয়া স্বপ্ন কল্পনা, না বাস্তব?

মৃত্যুর ওপারেও কি কল্পনা ধ্যান চলবে? সেখানে তো লেখা নাই—আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ নাই, তবে কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষের কর্ম্মপ্রবাহ? হয়ত সেখানে তার উত্তর মিলবে।

আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রি, এই নির্জ্জন মুক্ত জীবন ভালবাসি। প্রাণভরে ভালবাসি। বাংলার বারান্দায় ডেকচেয়ার পেতে বহুদূরের জ্যোৎস্নাভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলাম—কালীঘরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তার মাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশের রহস্যবার্ত্তার মত একটা বড় নক্ষত্র, নির্জ্জন ঝাউঝাড়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে—হুহু পশ্চিমে হাওয়া বইছে—কি এক অপূর্ব্ব রহস্য মনে যে নিয়ে আসে! কি সব চিন্তা আনে! কি মাধুর্য্য...মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! কেবল বহুদূরের কথা মনে পড়ে। আজ কাছারীর সামনে কাশজঙ্গলে সূর্য্যাস্তের সময় বেড়াতে গেলাম। গভীর নির্জ্জনতা শুকনো কাশের ভরপুর গন্ধ—বাঁকাডাল বড় ঝাউএর ঝোপ—শুকনো খটখটে মাটির গন্ধ—সোঁদা সোঁদা—অনেকদূরে ভাগলপুরে গঙ্গার ওপর রাঙা সূর্য্যটা হেলে পড়ছে।

এই অপূর্ব্ব সূর্য্যাস্ত এদেশের নিজস্ব সম্পত্তি। এর সঙ্গে পরিচয় এদেশে এসে—বিহারের এই দিগন্তব্যাপী মাঠ, চরের মধ্যেই দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটরক্তসিন্দুর-বিন্দুর মত অপূর্ব্ব অস্তসূর্য্য সবুজের সমুদ্রের মত শস্যক্ষেতের ওপর যখন ঢলে পড়ে তখনই মনে হয় অনন্ত অন্তরতম অন্তরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে—আমার উদ্দাম মুক্তিকামী স্বাধীনতাপ্রিয় মন এই প্রসারতা এই নির্জ্জন বন্য সৌন্দর্য্যের কর্কশ প্রাচুর্য্যে মুগ্ধ হ'ল, সার্থক হ'ল।

তাই আজ ভাবছিলাম জীবনে কেউ শত্রু নয়—অল্পদিনের ব্যবধানে যাকে মনে হয় অমিত্র, দূরের ব্যবধানে তাকে দেখা যায় সে জীবনে পরম মিত্রের কাজ করছে। রাজকুমারবাবু, খুকী—এ দু'জনের মত মিত্র কে?

আমার প্রসারতাপ্রিয় নির্জ্জনতাকামী মনকে ধ্যানের অবসর এরাই না যুগিয়েছে? ভগবান এঁদের আত্মাকে আজকালের জ্যোৎস্নাধারার মত শুভ্র করুন।

কাল সকালে উঠে জোয়ান ক্ষেত দেখতে দেখতে মুক্তিনাথের স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে বাসনাপুর যাবো। সকালে রামগিরিতে রামের ঘোড়াটা যাবে ঠিক হ'ল আর রামধনিয়া চাকর ব্যাগ নিয়ে যাবে। ভার্টলি গোটা দেখে আমি ঘোড়া নিয়ে ঐ পথে অমনি চ'লে যাবো জোয়ান ক্ষেতে, সেখানে গণপৎ তহশীলদার ও মোহিনীবাবু আমীন উপস্থিত থাকবেন। পরে কাছারীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আহারাদির পর বৈকালে ফিরবো।

বড় ভাল লাগে এই উন্মুক্ত জীবন, বড় ভাল লাগে এই দিয়ারা, এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, এই বন, কাশঝোপ, দূরের নীল পাহাড় দুটি, এই ঘোড়ায় চড়া, এই শর্ষেফুলের গন্ধ, সকলের চেয়ে মনকে চারপাশে ছড়িয়ে দেবার এই অপূর্ব্ব অবকাশ।

বাঙ্গালী মণ্ডল আজ এক ঝুড়ি কুল নিয়ে আজমাবাদ থেকে এসেছে। ওদের বখশিশের কম্বল নিয়ে যাবে।

সকালে বার হয়ে ঘোড়া ক'রে রাই ক্ষেত দেখে পরশু রামপুর চ'লে গেলাম।

সেখানে বহুদিন পরে কলবলিয়ায় অবগাহন স্নান করা গেল। দূরে কহল-গাঁয়ের নীল পাহাড়টা বড় ভাল লাগছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করার পরেই গোষ্ঠবাবু ও আমি হে'টে বার হলাম। সত্যি, হাঁটার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা ঘোড়ায় চ'ড়ে পাওয়া যায় না! নাঢ়াবইহারের কাছে দূরপ্রসারী ঘন শ্যামল যব-গমের ক্ষেত, আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার সারি বড় ভাল লাগছিল—বহুকাল পরে অনেক দূর পায়ে হে'টে যাওয়ার সুখ অনুভব করলাম। পথের পাশেই নীল ফুলে ভরা খে'সারীর ক্ষেত, চন্দন রং-এর ফুলে ভরা মটর ক্ষেত, কোথাও আধশুকনো দূর্ব্বা ঘাসের ক্ষেত। গোষ্ঠবাবু আসতে আসতে আবার কল্লর চৌধুরীর ক্ষেতের কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেললে। আধশুকনো দূর্ব্বা ঘাসের বন কাশবনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ বেয়ে অনেক দূরে এলাম—আর বছরে সেই তেলির ক্ষেতে (যেখানে নীল গাই দেখেছিলাম) যাবার সময় যে রকম সুঁড়ি পথ দিয়ে যেতাম সেরকম। তার-পরে কেবলই সবুজ সমুদ্রের মত শস্যক্ষেত্র—দিগ্‌দিগন্তহীন দূর, দূর সুদূর-প্রসারী আকাশ। অপূর্ব্ব এ দিয়ারার দৃশ্য! এরকম নীল আকাশ, এরকম পাহাড়, এরকম দূরপ্রসারী শ্যামলতার সমুদ্র আর কোথায়? মাঝে মাঝে বন্য শুয়োরে শস্য-ক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নির্জ্জন ফসলের ক্ষেত। এই গভীর বনের ধারে একটা কাশের তৈরী কুঁড়ে—তাতেই চাষী রাত্রে শুয়ে এই ভীষণ হিম-বর্ষী রাত্রে ফসল চৌকি দেয়। ওরা পথ হারিয়ে গেল—মালী ঘোড়া নিয়ে আসছিল। সে বললে, এ কোথায় এলাম? গোষ্ঠবাবুও দিশাহারা হয়ে গেল। আমিও প্রথমটা ঠাহর করতে পেরে উঠলাম না। পরে সিধা পথ পেয়ে খানিকটা আসতে আসতে দূরে কতকগুলো কাশের ঘর দেখে আমি বললাম, এই বালা মণ্ডলের টোলা। গোষ্ঠবাবু বললেন, না। আমি কিন্তু আর খানিকটা এসে বাঁ-ধারে যে পথে লোধাইটোলা, ঘোড়া ক'রে গিয়ে সে পথটা দেখতে পেলাম। তারপর হে'টে খানিকটা পার হয়ে হুকুম-চাঁদের বাসার কাছ দিয়ে মানুষসমান উ'চু রেড়ীক্ষেত দিয়ে এলাম। মুকুন্দী ও জহুরী আজই বৈদ্যনাথ থেকে ফিরে এসেছে। প্রসাদ দিয়ে গেল। মুকুন্দীকে বল-লাম, তুমি আমার কাছে আজ রাত্রিতে গল্প করবে। বড় আনন্দের দিনগুলো এসব।

অভিজ্ঞতায় একটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হ'তে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইলপুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্তভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জ্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।

আজ এমার্সনের "Immortality" প্রবন্ধটা প'ড়ে মনে হ'ল আমার মনের কথা অবিকল তাতে লেখা আছে। কতদিন ব'সে ব'সে ভেবেছি, অন্য জগতের জীবনেও নিশ্চয় চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকবার প্রচুর অবকাশ আছে। হাজার বছর কেটে যেতে পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কারণ কি? ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃতিভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবেশন করে তবে অনন্ত জীবনপথে দুশো-তিনশো বছরের স্মৃতির ঐশ্বর্য্য কি, তা ভাবলেও পুলকে শিউরে উঠতে হয়—হাজার বছরের? দুই হাজার বছরের? বিশ হাজার কি লক্ষ বছরের?

॥ নবমী, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯১৮ ॥

কাল রাত্তির থেকে খুব বৃষ্টি চলছিল। ভাবলাম বুঝি সকালে বটেশ্বরনাথ

মেলা দেখতে যাওয়া হবে না। সকালে উঠে হু-হু পশ্চিমে বাতাস দিচ্ছে। ভাগলপুরে রুদ্দুর উঠছে, মেঘ উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে পূর্ব্ব-উত্তর কোণে। কণ্টু মিশ্র যাবার জন্য তৈরী হ'ল—অনেক লোক বটেশ্বরনাথ স্নান করতে চলেছে। আমিও স্নান ক'রে নিয়ে ঘোড়ায় উঠবো।

ঘোড়া নিয়ে বালাটোলার মাঠে খুব যব খাওয়ালাম। সেখান থেকে খানিকটা যেতে ঘোড়ার পেটি আলগা হয়ে গেল কিন্তু একটা লোককে ডাকিয়ে সেটা ঠিক করে নিয়ে আবার ঘোড়া ছাড়লাম। কলবলিয়ার মাহতাম্ সহিস দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দিয়ে পেটি কষিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। তিনটাঙার পথটা বেশ ভাল—গাছপালা, আলোকলতার জঙ্গল, ছায়া—খানিকদূর যেতে যেতে মেলায় লোক সারবন্দী হয়ে যাচ্ছে দেখলাম—রাঙা কাপড় পরা মেয়ের দল, গরুরগাড়ীর সারি। মেলায় পৌঁছে এদিকে ওদিকে খুব বেড়ানো গেল। পরে ঘোড়া ছেড়ে লোকপূর্ণ পথ দিয়ে রওনা হলাম। একস্থানে অতি নিরীহ গোবেচারী ভীতু প্রকৃতির একজনকে দেখলাম। ব্রহ্মমণ্ডলের তাঁবুতে সে টাকাপয়সা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লে মড়াকান্না কাঁদে—এ আগে কখনো দেখি নি। যখন কুড়ারী তিনটাঙার ওধারের পথে আছি, তখনই সূর্য্য হেলে পড়েছে—খুব ঝাঁড়া গাছের ছায়া, পাশেই সবুজ গমক্ষেত সুগন্ধভরা। ঘুঘু পাখী বনের ছায়ায় ডাকছে—মনে হ'ল কেমন সেই গত পঞ্চমীতে দেশের কুঠীর মাঠ থেকে কুল খেয়ে এসে আজ পঁচিশ বছর পরে বাড়ীর পিছনে বাঁশবনে ব'সেছিলাম। সে স্থানটিতে এরকম বাঁকা রুদ্দুর প'ড়েছে—রবিবার আজ যে, দেশে পঞ্চাননতলার কাছ দিয়ে হাট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, বেগুনের কত দর আজ হাটে। ঝুরি দোলানো পথ দিয়ে মাধবপুর নতিডাঙ্গার হাট ক'রে ফিরছে।...আরও খানিকটা এসে একজন বললে, বড় রাস্তার খানিকটা গিয়ে পশ্চিম দিকে বাসনাপুকুর রাস্তা পাওয়া যাবে। সে পথে আসতে আসতে জয়পাল কুমারের বাড়ী। কাছের জঙ্গলে দুটো বন্যশূয়োর একেবারে সামনে পড়ল। তারপরই সোজা পশ্চিমমুখে পথ—ঘন ছায়াভরা। ওধার থেকে অস্তসূর্য্যের রাঙা ম্লান আলো বাঁকা হয়ে মুখে প'ড়েছে। সেই ঘুঘুর ডাক বড় ভাল লাগছিল। পথ ঠিক আছে কিনা জানতে সামনের একদল মেলাফেরতা যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে তারা বললে, বাসনাপুকুর যাবে। একেবারে পড়লাম কলবলিয়ার ধারে। বাসনাপুকুর আসতে রাঙা সূর্য্যটা বহুদূরে দিয়ারার পেছনে অস্ত গেল। ওদিকে পূর্ণিমার চাঁদটা পিছনে চেয়ে দেখলাম বটেশ্বরনাথের পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। কল্‌বলিয়া পার হবার সময় পূর্ব্বদিকে পাহাড়ের ধূসর ছবি, ওপরে উঠা পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বাড়ীর ভিটের কথা ভাবছিলাম—সেই ভাঙা কলসী হাঁড়ি পড়ে আছে—কোন্ কালের এই সজিনা ফুলভরা বসন্ত দিনের বার্ত্তা। পিসীমার কাছে কাটানো সেই সব দূরের দিনগুলো। ছোট্ট এক নোনাগাছের ধারের ওপরের ঘরে কত পূর্ণিমার রাত চলে যাওয়া। সামনে দিয়ারার মধ্যে এখান থেকে এখনও ছ'মাইল এই রাত্রে যেতে হবে। ঘোড়া ছেড়ে চ'লে এসে যখন নাঢ়া বইহারে পড়েছি তখন খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে—বাঁয়ে বালিয়াড়ীর ওপরে কাশবন একটা। আশেপাশে কাশের ঝাড়। নির্জ্জন.. ধূ ধূ করছে মাঠ আর কাশবন—কোন দিকে মানুষের সাড়াশব্দ নেই। পরে আন্দাজে ঘোড়া চালিয়ে এসে দেখি সামনে সেই পাড়-দেওয়া জলাটা পড়েছে। ঘোড়া টপকে পার হ'ল—প্রতি মুহূর্ত্তেই ভয় হচ্ছিল, বুঝি পথ হারাবো। পরে জঙ্গলটা পার হয়ে লোধাইটোলার নীচের তলাটার ধারে এসে গমক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ জ্যোৎস্না-ভরা জলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। চাঁপাপুকুরের

পুকুরঘাটে যাবার ইমাদি-ওয়ালা জমিটুকুতে ওই রকম জ্যোৎস্না পড়েছে। দীর্ঘ শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছাড়লাম—যবের শীষে পা লেগে সির্‌সির্‌ শব্দ হচ্ছিল। লোধাইটোলা ছেড়ে ঘোড়া খুব দৌড় করালাম—Ranchman's Ride-এর মত, খুব। গম-যবের ক্ষেত দিয়ে এঁকেবেঁকে খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কাছারী পেঁছালাম সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পরে।

অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার রাত্রি। দাওয়ায় চেয়ার পেতে ব'সে আছি। সামনের কাশ-বনে জ্যোৎস্না এসে প'ড়ে অপূর্ব্ব দেখাচ্ছে। কাছারীর অনেকে বটেশ্বরনাথে গঙ্গা-স্নান করতে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। কত কি পাখী ডাকছে! বিহারের দিক-দিশাহারা মাঠ, তার নির্জ্জনতা, দু'একটা সাথীছাড়া রব, কাশবন, বালিয়াড়ী, অস্ত-সূর্য্যের রাঙা-আলো, অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না,—এই সবের মোহ ক্রমে ক্রমে মাথায় পেয়ে ব'সেছে। বড় আনন্দে দিন আজ কাটল। যাতায়াতে চব্বিশ মাইল ঘোড়া-চড়া হ'ল আজ।

আজ জয়পালটোলার নির্জ্জন ছায়াপথটা দিয়ে আসতে আসতে কেবলই মনে হচ্ছিল,—দূরে সেই হাটবার, পুবমুখো যাওয়া থেকে বহুদূর জীবনপথে চলেছি। সেই কুলক্ষেতে যাওয়ার দিন, সেই বাঁশবন পোড়ার দিনগুলো—কত কত পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে! এই উদাস ঘুঘুর ডাক, রাঙা অস্ত-সূর্য্যের রোদ, এই গতির বেগ—এ এক সঙ্গীত। অপূর্ব্ব জীবনসঙ্গীতের নব মূর্চ্ছনার মত মাদকতাময়।

॥ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কয়দিন ধরে ক্রমাগত জঙ্গলের পথে ঘোড়া নিয়ে বেরুই। উপরি উপরি দু'দিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেদিন বড় কুণ্ডীটার কাছে গিয়ে পথ হারানোতে রাদু মিশ্র পথ দেখিয়ে আনে। আর একদিন লোধাইটোলার রাস্তা না খুঁজে পেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কালামণ্ডলের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছিলাম—সে পথ দেখিয়ে আনে।

আজ রামজোতকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণপুরে দামড়ীকুণ্ডীর ফসল দেখতে যাই। লছমীপুর ঘাট পর্য্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে মানুষসমান উঁচু কাশজঙ্গলের মধ্যে সুঁড়িপথ বেয়ে কুণ্ডীর ধারে যখন এলাম, তখন নির্জ্জন জঙ্গলের মাথায় পুব-দিকে একটিমাত্র সন্ধ্যাতারা। উঠেছে। ওঃ, কি ঘন নির্জ্জন জঙ্গলটা! শুধু উঁচু বালি-য়াড়ি ও কাশের বন। ফিরে আসতে আসতে বেশ লাগল। দু'ধারে মানুষের গতি-বিহীন নির্জ্জন কাশ-ঝাউ-এর বন। শুকনো কাশ-জঙ্গলের গন্ধে ভরপুর, সোঁদা সোঁদা, বেশ লাগে। মাথার ওপরে তারা এখানে ওখানে—এখানে ওখানে উঁচু-নীচু ঢিবি, বালিয়াড়ি—অন্ধকার। বিশাল নির্জ্জনতা, যেন চারপাশের জঙ্গলে আকাশের নক্ষত্র-জগৎ তার রাজত্ব বিস্তার করেছে—Vast wilderness!...তার মধ্যে ঘোড়ায় আমরা দু'টি প্রাণী—ঘোড়াটা পথ দেখতে না পেয়ে টক্কর খাচ্ছে। গভীর জঙ্গলের দিকে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই—কোনো কোনো জয়গায় জঙ্গল খুব ঘন নয়; চক্‌চকে বালি, এখানে ওখানে বন-ঝাউ-এর ঝোপ—উঁচু-নীচু, পিছনে কাশ-জঙ্গলের মাথায় তারাভরা পূবদিকের আকাশ, সোঁদা সোঁদা কাশবনের গন্ধ।

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্য্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জ্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জ্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুবড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জ্জনতা ভেদ ক'রে যে সুঁড়িপথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে

গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা, এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে-ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এই সব।

দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত পড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ, সজনেফুল প'ড়ে আছে, আমের বউল, কচিপাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণা হাওয়া বইছে —কোকিল ডাকতে শুরু ক'রেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্তচোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাদীপ...জানালায় ধূপগন্ধ...দেবতার মন্দিরে আরতি।

॥ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

প্রায় এক মাস পরে দিয়ারায় একঘেয়ে কাশ ও বন-ঝাউয়ের বনের নির্ব্বাসন থেকে, বালি, সবুজ গমযবের ক্ষেত, ঘোড়ায় চড়া লোধাইটোলার খুবড়ী—এসব থেকে আজ ভাগলপুরে এলাম। অনেকদিন পরে ভারি চমৎকার লাগছিল। সব যেন নতুন নতুন। কাল এসেই চন্ডীবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বার হ'লাম—ক্লাব থেকে মাঠে বেড়াতে গেলাম। কমিশনারের বাড়ীর কাছটাতে যখন এসেছি তখন চন্ডীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হ'ল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনের বনগ্রাম স্কুল থেকে Homesick হয়ে বাড়ী ফিরতাম। ভরতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মত লাগত। কালীর সঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হোত, কতদিন পরে আবার এসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি! নভেলে এই-সব শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হয়ে পড়বে।

আজ বৈকালে কলেজের ঘাসবনের পথ দিয়ে বেড়াতে গিয়ে প্রথম ফাল্গুনের গাঢ় আম্রবউলের সৌরভে, বাতাবী লেবুফুলের গন্ধে, অপরাহ্নের ছায়ায় কত কথাই মনে আসতে লাগল। কি অপূর্ব্ব জীবনপুলক! বহুকাল পরে দিয়ারার কাশবন থেকে এসে এ-কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন! চারধারে ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, ঝোপে ঝোপে ছায়া নেমে এসেছে—আম্র-বউলের গন্ধে, পাপিয়ার ডাকে বাতাস অবশ। নেবু-ফুলের গন্ধে, মনে পড়ে কতকাল আগে কোন কৈশোরের দিনে, স্নিগ্ধ ছায়াভরা বৈকালে যেন গোপলা গয়লার বাড়ীর সামনের চড়কতলার পথটা দিয়ে যাচ্ছি।

যাক, তারপর লাইনের ওপরকার সাঁকোর ওপর গিয়ে বসলাম, মনে হ'ল এই অপূর্ব্ব শিল্প যাঁর হাতের—এই পৃথিবী-পারের নক্ষত্রজগতে হয়তো কত উন্নত বিবর্ত্তনের জীবজগৎ আছে। তিনি তার অপূর্ব্ব শিল্পপ্রতিভা সে সব উন্নততর জগতে না-জানি কত অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন! অনন্ত সৌন্দর্য্যভূমি এই নক্ষত্র-জগৎ—কত এ ধরণের উন্নত বসন্ত, আরও কত অজানা ঋতুবিলাস তার ধূলায় ধূলায়। যুগে যুগে যে সব শিল্পী, কবি এই সৌন্দর্যসৃষ্টির গান ক'রে গিয়েছেন —গ্রীকযুগ, রোমকযুগ, রামায়ণ, কালিদাস, শেলি, শেক্সপিয়র, কীট্স, রবীন্দ্রনাথ —এইসব দ্রষ্টাদের কথা ভাবি। ভগবানের সৃষ্টিকে এরা আরও কত মধুময় করেছে। ঐসব জগতে কত উন্নত ধরণের কবি, দ্রষ্টা, ভাবুক আছেন—কে জানে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, নির্জ্জন জ্যোৎস্নাময়ী, অজানা গ্রহ-জগতে তাঁদের কল্পনার সে

অপূর্ব্ব বিলাস।

॥ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এখানকার এক-একটা দিন এক-একটা সম্পদ হয়ে উঠছে—কলকাতায় এরকম দিন কটা আসে? আমারই বা এর আগে কটা এসেছিল? স্কুল-কলেজের রুটিন-বাঁধা কাজ বা স্কুল-মাস্টারীর রুটিনবাঁধা কাজের সময় এসেছিল বটে দিনকতক, League-এর কাজের সময়ে। কিন্তু সেও বড় ভ্রমণশীল, বেদুইনের মত জীবন ছিল বলে সেও ততটা ভাল লাগেনি।

আজকালকার প্রত্যেক দিনটি এক-একটা উৎসব দিনের মত সুন্দর। এত সুপ্রচুর অবসর, এত বৈচিত্র্য আর কখনো কি জীবনে পাব?

আজ তিনটার সময় চন্ডীবাবু এল, তার সঙ্গে বার হয়ে গেলাম—অস্ফুট আম্র-মুকুলের গন্ধভরা বৈকালের বাতাসের মধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জাটাতে ঢুকলাম। দুধারে বৈকালের ছায়ায় সুন্দর গাছগুলো। আমরুল, কামিনীফুল, আমগাছ, দু'চারটা বিলাতী ফুলের গাছ, চিনি না। গঙ্গার ধারে কেমন সুন্দর বাঁশঝাড়, গোলাপের বাগান; Priest-এর সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। রোমান ক্যাথলিক পবিত্র Beautitude সম্বন্ধে আমাকে যা বোঝালেন তা অন্যভাবে আমি নিজের চিন্তার মধ্যে পেয়েছি। মানুষের মধ্যে একটা শক্তি বেড়ে যাবে, যাতে করে সে ভগবানের বিরাট সত্তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম ক'রে বিরাটের আনন্দ পাবে। বললেন Inquisition সম্বন্ধে বিশ্বাস করো না—ওটা আমাদের শত্রুদের লেখা, অনেক সত্য আছে বটে কিন্তু অতিরঞ্জনও খুব। বললেন, আমরা Truth সম্বন্ধে controversy করি না—দুটো-একটা doctrine যারা বাদ দিয়েছে তাদেরও বাদ দিয়েছি। রাজা বিয়ে করতে চাইলেন (Henry VIII)—সেই জন্যে আমরা ইংলন্ডের মত দেশকে ছেঁটে বাদ দিলাম! Dr. Lewis বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, এতদূর এসেছেন, বললেন, আমরা আর দেশে ফিরবো না, মৃত্যু হয় তো এখানেই হবে।

সেখানে থেকে বেরিয়ে কলেজের পথে অন্ধকার ঘন আমবনটা দিয়ে রেল লাইনে এসে উঠলাম। জ্যোৎস্না উঠেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে—এই পাশের তালতলায় গত ভাদ্র মাসে কল্পনা করেছিলাম দুর্গার তাল কুড়ানো, শৈশবে তাল প'ড়ে থাকলে গাছতলায় কি আনন্দ হোত। কি অপূর্ব্ব আম্র-বউলের গন্ধ মাখা জ্যোৎস্না রাত্রিটা! সাঁকোটার উপর অনেকক্ষণ ব'সে স্টেশনে এলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা—তিনি সংকীর্ত্তন করতে যাচ্ছেন স্টেশনের বাসায়। বাজারে একটা শার্ট কিনে গ্রামোফোনের দোকানে রবি ঠাকুরের আবৃত্তি শুনলাম—আজি হ'তে শতবর্ষ পরে। বৃদ্ধ কবিবরের গম্ভীর গলায় উদাত্ত সুর বড় ভাল লাগল। তারপরে চন্ডীবাবু চ'লে গেল তার বাড়ী, আমি আসতে আসতে পথে ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। ভোলাবাবু দীপুবাবুর বাড়ী যাচ্ছেন Electric fitings-এর canvass করতে। তাঁকে বললাম, দীপুবাবু এখন ব্রীজ খেলতে ব্যস্ত, সকালে না গেলে কি দেখা হবে!

দিনটা বেশ কাটল।

॥ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সকালে নায়েবের সঙ্গে গেলাম কমলাকুন্ডু। বেশ ঘোড়া ছুটিয়ে সকালের

হাওয়ায় রণচুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়ে গেলাম। কয়েকদিনের জড়তাটা কেটে গেল। ক্ষেতে ক্ষেতে যব পেকেছে। পাকা ফসলের সুগন্ধ চারধার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কখনো আমি ঘোড়া ছোটাই কখনো নায়েব মহাশয় ঘোড়া ছোটান। ফুল-কিয়ার সীমানা ছাড়িয়েই জঙ্গল থেকে একটা বুনো মহিষ বার হ'ল। সেটার মূর্ত্তি দেখেই আমি বললাম, এটা মারতে পারে, ঘোড়া ঘোরান মশাই। খুর দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেটা শিং নেড়ে লাল চোখে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। যদি তেড়ে মারতে আসে—দু'জনে ঘোড়া ফিরিয়ে চালিয়ে খানিকটা এসে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম —ততক্ষণ মহিষটা চলে গিয়েছে। তারপর আমরা ঘোড়া ফিরিয়ে কমলাকুণ্ডু পেঁাছ-লাম। খুব রোদ চ'ড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে গেলাম। ঠাণ্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূধূ বালিয়াড়ী পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভ'রে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম, কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙশালিকের বাসা, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচ-শত বৎসর ধ'রে কত ফুল ঝ'রে প'ড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধ'রে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হ'ল ঐ ঠাণ্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিমবন।

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।

সন্ধ্যার পর কমলাকুণ্ডু থেকে বেরুলাম। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে। বালুর উপর চক্‌চকে জ্যোৎস্না! জয়পালের নৌকাতে পার হ'তে হ'তে বড় ভাল লাগছিল আর ভাবছিলাম—আজ বৃহস্পতিবার, এই জ্যোৎস্নায় আমাদের দেশে দারিঘাটের পুলের কাছ দিয়ে এসময় হাট ক'রে কেউ হয়তো ফিরছে। রাত্তিরে কারা মাছ ধ'রছে—রাজু সিং জালসমেত ধ'রে নিয়ে এল, ছেড়ে দিলাম। তারপর ফিনিকফোটা জ্যোৎস্না রাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েব পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানে ওবেলা মহিষ দেখেছিলাম ওখানে এলাম। মনে হ'ল দূরে আমার বাড়ী। এই জ্যোৎস্না-ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়িকলসীগুলো প'ড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্ত্তি হয়ে উঠছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘরকুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্ব্বত ঘোড়ায় স্টীমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর। মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্য্যন্ত এসে অল্প জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকান্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না, মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলার শান্ত জীবনযাত্রা, সঙ্কীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো

জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা, হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার—আমার সংসার নয়।

মাথার উপরের নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে দেখলাম, এই জীবন ঐ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কত এরকম জ্যোৎস্না রাত্রি, কত এরকম যাওয়া আসা, কত জীবনানন্দ।

যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস বলে নয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব-আনন্দভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন ক'রবো—পৃথিবী-মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসবো!

সে যাক, দুর্ব্বল-দৃষ্টি লোকে ভাবে আমি হয়েছি Theosophist.

জীবন ভোগ করতে হলে হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিলে ভোগ হয় না—চাই চিন্তা, ধীর চিন্তা। গভীর চিন্তাতে জীবনরহস্যের গভীর অনুভূতি হয়। সেই ছেলেবেলার এই ফাল্গুনে বেল কুড়ানো, চড়কগাছ খেলা, সেই মা, জেঠীমা, নেড়া, ভরত—সে জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই চাঁপাপুকুরের ধার, সেই যে কাদের বাড়ী বেড়াতে গেলাম, সেখানেও আজকার মত জ্যোৎস্না উঠেছে—সে জীবনও শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর। তা'হলে ভারী চমৎকার জীবনের উপভোগ হবে। জ্যোৎস্না রাত্রি ফুজিসান পর্ব্বতে, কি প্যারিসের কোনো বুলভার-এর ধারে, কি সমুদ্রের উপর জাহাজে, কি ইজিপ্টের লুক্সর, কি করনাকের মন্দিরের মধ্যে, নুবিয়া মরুভূমির উপরে—এইসব ভাবি।

॥ ১লা মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

কাল সন্ধ্যার পর ভাবলাম, দোলপূর্ণিমার রাত্রে ঘোড়ায় বেড়াতে হবে। খুব বেলা গেলে বেরিয়ে রামজোতের বাগানের কাছে যেতেই জ্যোৎস্না উঠে গেল। রামচন্দ্র সিং-এর সঙ্গে কথা ক'য়ে বড় কুন্ডীটার ধার দিয়ে নির্জ্জন কাশ-জঙ্গলের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেছে। নির্জ্জন। বহুদূর পর্য্যন্ত কেউ কোথাও নেই। শুধু কাশ-জঙ্গল, আর জলের ধার। লোধাইটোলার জঙ্গল পেরিয়ে জলাটার ওপর বড় সুন্দর জ্যোৎস্না প'ড়েছে—খনিকক্ষণ ঘোড়া ইচ্ছামত ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। তারপর খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। সারাদিন ভীষণ পশ্চিমা বাতাস ব'য়েছে—এখনও সমানে বইছে। ধূলো-বালিতে চারধার ভরপুর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, বালি-ধূলোর পর্দ্দায় ম্লান করে দিয়েছে—ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না। সামনের ধূ ধূ কাশবনগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে, হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়েছে—বহুদূর জঙ্গলে আগুন লেগেছে, সেদিকের আকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে। আর মাঝে মাঝে দাউ দাউ ক'রে লকলকে আগুনের শিখা খুব উঁচু হয়ে আকাশটাকে লেহন করতে ছুটছে।

বাংলাদেশের শান্ত দৃশ্যের কাছে এই নির্জ্জন বাত্যাক্ষুব্ধ ধূ ধূ জ্যোৎস্নাভরা মাঠ জঙ্গলের দৃশ্য, ঐ বনের আগুন, এই ধূলোভরা আকাশ কি অদ্ভুত মনে হয়!

॥ ৬ই মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

রামবাবুর ঘোড়াটা চ'ড়ে বড় আরাম পাওয়া গেল। কাল বৈকালে, পরশু বামপুরের মাঠে একেবারে সোজা কদমচালে চ'লে গেল—আজ তৌলির সাক্ষী দিতে নও-

গাছিয়া হয়ে এলাম—কি সুন্দর, লছমীপুরের ধাপটার কাছে এসে দেখি রূপলাল সবে ধাপটা পার হচ্ছে, লোকারা চামার মোট নিয়ে পিছনে। ঘোড়াটা হু হু করে উঁচু পাড়টার ওপর উঠে গেল—কি সুন্দর কদমই ধরলে! এরকম ঘোড়া চড়া কখনো হয়নি, এ কয়দিন বেশ হ'ল। নওগাছিয়া ইঁদারার কাছে ঘোড়া জল খেলে—তারপর একেবারে রামবাবুদের গোলা। তারপর ভাগলপুরে এসেই চণ্ডীবাবুদের বাড়ী এলাম। অনাদিবাবুর সঙ্গে গল্প করলাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মনে হ'ল সেই পাশের পথটা—পিসিমা জল নিয়ে প্রথম এল—আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে সেই প্রথম এলাম—দেখতে দেখতে কতকাল হ'ল!

Goethe-এর কথাটা ভাল লাগে—Those who cannot hope about a future life are already dead in this life. সন্ধ্যাবেলা অনিলবাবু উকিলের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শোনা গেল।

॥ ১৪ই মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

আজ ভণ্ড সিং-এর জাহাজে বিকালের দিকে ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এলাম মহাদেবপুর ঘাট। মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—মুকুন্দ, মাগব, পূরণ, ছটু সিং এবং সিপজী ও রূপলাল—এই কয়জন সঙ্গে। অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে আসতে সাহস না পেয়ে আস্তে আস্তে এলাম। বালির চরে আসতে না আসতে অন্ধকার হয়ে গেল—বাঁ-ধারে পর্ব্বতের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। গঙ্গার ঘড়িয়ালগুলো আমাদের পায়ের শব্দে হুড়ুম হুড়ুম ক'রে জলে নেমে গেল। আমি নেমে হেঁটে চললাম। মুকুন্দকে বললাম, গল্প বল—সে গল্প আরম্ভ করে দিলে। খানিকটা এসে দিকভ্রম লাগল বালির চরের ওপরে। এত ঘন অন্ধকার যে, দু'হাত তফাতের মানুষ দেখা যায় না—আমার বড় লণ্ঠনটা জ্বেলে নিয়ে তবু অনেকটা সুবিধে হ'ল। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে—এদেশে আলেয়াকে রাক্ষসের আলো বলে। কত ভূতের গল্প হ'ল!

'দেবতার ব্যথা'য় এইরকম লিখতে হবে যে, কোন উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম-শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে—পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জ্জয় সাহসী Pioneers!

॥ ১৫ই মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

আজ বিকালে ঘোড়া ক'রে পরশুরামপুর কাছারী এলাম। কুলিরা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। মুনেশ্বর ধ'রে-বেঁধে একজন কুলিকে শেষে যোগাড় ক'রে তাকে দিয়ে টেবিল চেয়ার পাঠালে। আমি একটু বেলা গেলেই রওনা হলাম। কাল Imperial Library থেকে Conrad-এর বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে—আজ সেইটা পড়ছিলাম। আজকাল ইসমাইলপুর কাছারীটা বড় সুন্দর লাগে। দুধলীঘাসের ফুল, কণ্টিকারীর বেগুনী ফুল, বনমূলোর ফুল, আকন্দের ফুল। বৈকালে আজ বেড়াতে গেলাম, ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা শস্যের গন্ধ, কাট্‌নি মজুরেরা ফসল কাটছে। কাছারীর ওপর দিয়ে দুবেলা মেয়েমানুষেরা যাচ্ছে—সকালটা বেশ লাগে। কি অদ্ভুত দুপুরটা —দুপুর রোদে ঝাউ ও কাশবন যেন কোন রহস্যের গভীর মায়া-যবনিকার ঢাকা থাকে। কত অসম্ভব আর আজগুবী চিন্তা মনে নিয়ে এসে ফেলে। বিহারের ঐ সুদূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরের রৌদ্রে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট নীল পাহাড় দুটো—পীরপৈঁতির পাহাড়শ্রেণী, দিলবরের খুবড়ীর পিছন দিয়ে, রামবাবুদের বাসার পিছন

দিয়ে একেবারে এতমাদপুরের কাছারীর দিকে বিস্তৃত থাকে। বড় মৌন, রহস্যময় মনে হয় এই খররৌদ্র-প্লাবিত চৈত্র-দুপুর।

আসতে আসতে রণপাল মণ্ডলের ক্ষেতের কাছে জঙ্গলটার সামনেই দেখলাম জমাদার আসছে পরশুরামপুর থেকে—বললে, কুলীরা সব পৌঁছে গিয়েছে। জঙ্গলটার কি সোঁদা সোঁদা গন্ধ! বার হয়েই লোধাইটোলার ধাপটার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর, দূরের পাহাড়, হু হু উন্মুক্ত হাওয়া, আবার সেই পাকা ফসলের গন্ধ—আঃ, এই জীবন! ভাবছিলাম সেই কত দিন আগে পিসিমা এল, ঠাকুরমাদের পাশের পথটা দিয়ে—আমি ও বাবা এসেছি মামার বাড়ী থেকে, পিসিমা কণ্ঠিঘাটে—সেই সব দিনগুলো। নেড়ার বাবা এখনও কলিডাঙ্গা লাভবড়পুর ক'রে বেড়াচ্ছে—আর আমাদের বাংলার গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। কচিপাতা গজিয়েছে, কোকিল ডাকছে, কাঞ্চনফুল গাছ আলো ক'রেছে...অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় ঝোপে ঝোপে সুমিষ্ট বনফুলের মাতানো সুর, রামনবমী।

বাস—বেলের পাতা—চড়কের ঢাক—গোষ্ঠবিহার—কোকিলের কুহু, পাপিয়ার মন-

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে বালিতে পড়লাম—রাজু সিং এপারেই দাঁড়িয়ে ছিল—জল পার ক'রে ঘোড়া নিয়ে গেল। দুবে এসে অনেক দুঃখ করতে লাগল যে, সে তার মেয়ের বিয়ে জমাদারের সঙ্গে দেবে না, তবুও কেন নায়েব তার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে।

॥ ২০শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

পরশুরামপুর কাছারিতে অনেকদিন পরে বাস করছি। সেই প্রথম ভাগলপুরে এসে হেমন্তবাবুর আমলে কিছুদিন ছিলাম বটে, তারপর সেই একবার এসে বস্তির মধ্যে ঘরটায় ছিলাম। অনেকদিন পরে এখানে কিছুদিনের জন্যে বাস করতে এসে বড় ভাল লাগছে। আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বড় মন-খারাপ হয়ে গেল--কিন্তু একটু বেলা হলেই মেঘটুকু কেটে খুব কড়া রোদ উঠল। গরমও। গৈফুর তহশীলদারের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ গভীর শীতল অবগাহন স্নান ক'রে বড় আরাম পেলাম বহুদিন পরে। স্নান করতে করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের গাঁয়ের ইছামতীর ঘাট থেকে এই সুন্দর স্নিগ্ধ চৈত্র-দুপুরে কচিপাতা ওঠা বন-ঝোপের পাশ কাটিয়ে বাঁশবনের ছায়ায় কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে ফিরে আসা। বালি তেতে বড় গরম হয়েছে--পা পুড়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু মারা গিয়েছেন শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তাঁর বাড়ী তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম। জয়পাল সাধুর বাড়ীর কাছে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তারবাবুর বাড়ী কোথায়? সে কথা বললে না। তারপর একটা লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে রাস্তা বলে দিলে। এর ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা বাড়ীর কাছে এলে, একটা ফর্সামত ছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কেউ নেই। সেখানে দেখি, মটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই মটুকনাথ—যে তৌজির দিন কাছারী গিয়ে কানের পোকা বার করবার যোগাড় করেছিল। ফিরলাম যখন বেলা প'ড়ে গিয়েছে। বহুদিন দিয়ারায় থাকবার সময় চোখে যখন হঠাৎ এই বড় বট অশ্বত্থগাছ দেখি তখন একঘেয়ে কাশ-ঝাউবনের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনায় মনে হয়, যেন কোন অঙ্গারযুগের পৃথিবী থেকে হঠাৎ উচ্চে বিবর্ত্তনের জগতে এসে পৌঁছেছি।

স্নিগ্ধ বৈকাল। ঝোপে ঝোপে পাখী কিচ্ কিচ্ করছে, আলোকলতা দুলছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে এসে পথের ধারে একটা রোদপোড়া ঘাসেভরা মাঠ

পেলাম—বড় ভাল লাগল। মাঠের একটা বড় অশ্বত্থ গাছে নতুন কচি রক্তাভ পাতা গজিয়েছে। অনেক শকুনির বাসা—মাঠে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। এই স্নিগ্ধ বৈকালে আমাদের ইছামতীর ঘাটের পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা সব গা ধুয়ে আসছে। যারা ছিল বিশ বছর পূর্ব্বে নব-বধূ তারা আজ প্রৌঢ়া, জীবনের কত সুখ-দুঃখের ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সেই কুলগাছ দেখে এসে বাঁশতলায় বসা—পিসিমার সেই কঞ্চিকাটা বাঁশবন, মার হাতের হাঁড়ি কলসী পোড়ো ভিটায় পড়া—মার হাতের পোঁতা সজনে গাছ—এই স্নিগ্ধ বৈকালে কচিপাতা ওঠা অদ্ভুত ধরনের আঁকাবাঁকা গাছটার সীমারেখার দিকে চেয়ে মন-মতানো কোকিল, পাপিয়ার উদাস ডাক শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল জীবনটা কি অপূর্ব্ব করুণ সংগীত! সন্ধ্যার পূরবী গৌরী রাগিণীর মত নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার, অথচ চারু-শিল্পের চরম দান। বিহারের এই ধূ-ধূ উদাস মাঠ প্রান্তর, দূরপ্রসারী দিক্‌চক্রবাল, দু'একটি পুরোনো শিমুলগাছ—রক্ত সূর্য্যাস্ত বড় ভাল লাগে। দূরের নীল পাহাড়টা—যেন এক মায়া-রাজ্যের সীমা এঁকেছে সন্ধ্যাধূসর পূর্ব্ব আকাশপটে। সারাদিনের খররৌদ্রদগ্ধ মাটির সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া গন্ধ, তারপরেই কলবলিয়ার ঠাণ্ডা জলের গন্ধ—বড় আনন্দ পেলাম আজ।

এখানকার জলের গুণ বড় ভাল দেখছি।

দুপুরবেলা কমলাকুণ্ডুর কাছারীতে বসে বসে লিখি—খর-প্রচণ্ড চৈত্র-রৌদ্র—পাশের ঘর যেন আগুনের মত দাউ দাউ জ্বলে—হু-হু পশ্চিমে হাওয়া বয়, আমার খোলা দরজার ঠিক সামনে দূরের ঐ কচিপাতা ওঠা শিশুগাছটির দিকে ও তার পেছনকার উটের পিঠের কুঁজের মত ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কেবল মনে পড়ে, এই মধ্যাহ্নে বাংলাদেশের কত অজানা মাঠ—ঘেটুফুলে ভরা, উলু-খড়ে ভরা, কত মোটা মোটা গুলঞ্চলতা-দুলানো, রাঙাফুলে ভরা শিমুলগাছ। এ গাছের ও গাছের তলায় যেন বসলাম। অজানা গ্রাম্যপথে মাঠের ধারের বনে গাছ-তলায় স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সতে ব'সতে পথ হাঁটা, রেলপথ থেকে বহু-বহুদূরে সব গ্রাম—কত দরিদ্র পল্লীতে শান্ত নিভৃত জীবনযাত্রা। কত ঘরে কত সুখ-দুঃখ—কত বধূ কত কন্যার শান্ত চোখ।

॥ ২১শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

আজকার বেড়ানোটা সবচেয়ে অপূর্ব্ব। কলবলিয়া পার হয়ে মুকুন্দপুরের পথে বেড়াতে গেলাম। বেলা একেবারে গিয়েছে। বাঁ ধারে কলবলিয়ার ওপারে সিম্যান-পুরের দিয়ারাতে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। কমলাকুণ্ডু পার হয়েই পথের ধারে বড় বড় শিমুল পাকুড়গাছ, ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ—বাঁশঝাড়, কোকিলের ডাক, গ্রাম-সীমার গাছপালার মধ্যে পাপিয়া ডাকছে। বসন্তের দিনে বেশ লাগল। অজানা-পথে আকন্দফুল কচি ওড়াফুলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যেতে এমন লাগছিল! যেতে যেতে একটা গ্রাম প'ড়লো—লবটুলিয়া, পরে বোচাহি। পথে কীর্ত্তনীয়া বৃন্দাবন হেঁটে আসছে—বললে, নাগরা গিয়েছিল কীর্ত্তন করতে। আমি বললাম—রামবাবুর ওখানে? তারপর সে চ'লে গেল। ক্রমে ডিমুহী পেলাম। তারপর চৌধুরীটোলা। সেইখানটা গিয়ে পথের ডানধারে একটা সরু মাটির পথ—দু'ধারে ঘন শিশুগাছের শ্রেণী—ছায়াভরা মাটির গন্ধ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়ো ভিটামত—ঘেঁটুফুলের একেবারে জঙ্গল। ঘেঁটু-ফুলের গন্ধে একেবারে ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটা পাড়া। সেই-

স্থানটা গিয়ে মনে প'ড়ল অনেকদিন আগে সেই যে গিয়েছিলাম বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ী গিয়ে, ওদিকে কোদ্‌লার ধারে একটা পুরোনো ভিটেতে—সেই কথা মনে পড়ল। ঠিক যেন সেই স্থানটা—এ স্থানটা ঠিক যেন বাংলাদেশ! বিহারে এত-দিন পরে বাংলার সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—কোন্ বিদেশে আছি—আজ আমার দেশে বৃহস্পতিবারের হাট, পঞ্চাননতলা দিয়ে মনো শ্যামাচরণ দাদা ফণীকাকা হাট ক'রে ফিরছে—কেউ জিজ্ঞাসা করছে—আজ বেগুনের সের কত? তুমি বুঝি এখন হাট থেকে এলে? আমার মায়ের হাতে পোঁতা সজনেগাছ—ভাঙা কলসী—হরি রায়ের বিষয়—

সে সব থেকে কতদূরে বিদেশে ঘোড়া করে বেড়াচ্ছি—অজানা গ্রামের পথে পথে, অজানা ঘেঁটুফুলের ঝোপের ধারে ধারে—আমার কি সাজে কলকাতার অফিসে ব'সে বন্ধ হাওয়ায় কাজ? আমার জন্যে এই আকাশ ওই সূর্য্যাস্ত ওই নদী ওই মুক্ত-হাওয়া, স্বাধীনতা—অপূর্ব্ব অপরাহ্ণ! ডেস্কে ব'সে শুধু লেখবার কাজ আমার নয়!

॥ ২২শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

কাল বৈকালে পরশুরামপুরে দিয়ারায় লবটুলিয়ার এপারে খুব দাঙ্গা হয়ে গেল। দাঙ্গার হৈ হৈ শব্দ কাছারী থেকে শোনা যাচ্ছিল। নারায়ণকে ঘোড়া দিয়ে পাঠানো হ'ল। খুব ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে খবর দিলে—আজ সকালে আমি ও নুটু ঘোড়া ক'রে জঙ্গলের পথে ইসমাইলপুর চ'লে এলাম। পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে চেয়ার নিয়ে বারান্দাটাতে বসলাম। দূরে নীল পাহাড়টার দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সুন্দর ইছামতী—আমাদের গ্রাম—এই বৈশাখের সুগন্ধভরা প্রভাত, অপরাহ্ণ, সেই আম-জাম-তলা, মাঠ, নদী- ঠাকুরমাদের বেলতলাটা বেলফুলের গন্ধ—কতদিনের কত আনন্দ!

খুব জ্যোৎস্না—বড় সুন্দর লাগল।

॥ ২৮শে মার্চ্চ, ১৯২৮ ॥

পরশু গেল রামনবমী। বসে বসে ভাবছিলাম এই দুপুরে এতক্ষণ পা ছড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে সব খেতে চলেছে কারা? রাখাল রায়, হরিশ বাঁড়ুয্যে, বাবা এঁরা নন। তাঁদের পৌত্রের দলেরাই বেশী। সন্ধ্যার সময় বাঁদা ময়রার দোকান খুলবে—এই জ্যোৎস্নায়। জীবনটা একটা অবান্তর রূপকথার কাহিনীর মত মধুর ও রহস্য-ময় ঠেকে।

তারাভরা আকাশের দিকে চাইলে সেই চাঁপাপুকুরের নিমন্ত্রণ খাওয়ার বাড়ী, আড়ংঘাটার ঠকুরবাড়ীর ছাদ মনে হয়। সমুদয় আকাশ, তারাগুলো অপূর্ব্ব রহস্য-ঘেরা মনে হয়। কাল গেল '১লা এপ্রিল'। সেই "১লা এপ্রিলের শান্তোজ্জ্বল ঊষালোকে" ছেলেবেলাকার কথা। কাল নুটু চ'লে গেল এখান থেকে। বড় পশ্চিমে বাতাসটা দিয়েছে কাল।

॥ ২রা এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ গুডফ্রাইডে। অনেককাল আগে মনে পড়ে এইদিন বনগাঁ স্কুল থেকে সন্ধ্যাবেলা আমি আর ভরত বাড়ী চ'লে এসেছিলাম। সেইটাতেই যেন ভরত মারা গেল। কতকালের কথা সে সব, তবু মনে হয় সেদিন। তারপর কত গুডফ্রাইডে কেটে গেল। কালের চক্রটা ভয়ানক বেগে ঘুরে চলেছে।

এইমাত্র হঠাৎ বড় ঝড় এল। আমি আর গোষ্ঠবাবু আমার ঘরের সামনে বসে আছি—এমন সময় দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘের পাড়। হাওয়াটা যেন একটু জোর—এমন কি আমরা বলছিলাম বেশ হাওয়া তো! দেখতে দেখতে মেঘের পাড়টা গুমরে উঠলো—তার পরই হু হু ক'রে ঝড়টা এল—সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ও দিয়ারায় বালির চরের সমস্ত বালি উড়ে আসতে লাগল—কমে না—এক এক দমকায় আমার ঘরখানা তো কাঁপতে লাগল।

॥ ৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ খুব বর্ষা ঘনিয়ে এল ভাগলপুরের দিক থেকে বিকেলটাতে। ছেলেবেলাকার মত কালবৈশাখী যেন। ঘন-কালো মেঘটা ঘুরে গঙ্গার দিক থেকে পৈতির পাহাড়ের দিকে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগল, কালকের সকালে যে চারধারে পরিষ্কার বাদামে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল—বৌংশী, জামালপুর—সব ঢেকে দিলে।

ঘনান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল, এই তো জীবনের সম্পদ—হয়তো তিন হাজার বছর পরে আবার পৃথিবীর বুকে আসবো—তিন হাজার বছর আগের ষাট বৎসরের প্রতিদিন কি অবদানে, সুষমায়, স্মৃতিতে মণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল—কত কালবৈশাখীর মেঘে, কত চোখের হাসিতে, চাঁপাফুলের গন্ধে, কত দুঃখে, কত গানে —সে সব তখন কি মনে থাকবে? এই একটা একটা দিন জীবনের মণিহারে গাঁথা অপূর্ব্ব সম্পদ—প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ বন্ধতা—সব। দূরে হয়তো মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছে এতদিনে বনের মধ্যে ডাঁটা ধরে আছে—কে জানে? হয়তো কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে—নয়তো নয়। গতির অপূর্ব্ব বিচিত্রতা আমি লক্ষ্য করছি —সে আমার চোখে প'ড়েছে।

বসে আছি—কিন্তু কি বিশালবেগে চলেছি।

॥ ৯ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

কাল থেকে কি একরকম অজানা খুশিতে মন থেকে থেকে ভরে উঠছে ওই দূরের নীল পাহাড়টার পাশের দিকে চেয়ে থাকলেই সে আনন্দটা পাই। কাল তাই ভাবছিলাম, হে বিশ্বদেব, কি অপূর্ব্ব কাণ্ড সৃষ্টিই করেছ এই মানুষের জীবনে, এই বিশ্বে!

আজ সকালে উঠে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে কালীঘরে কলসী উৎসর্গ ক'রে ভারী তৃপ্তি পাওয়া গেল। শুয়োরমারী থেকে সিদ্ধেশ্বর নাপিতকে রামচরিত ডেকে আনলে, কারণ মোহনের অসুখ ক'রেছে। তারপর খাওয়ার পর একটু ঘুমোনো গেল। বড় গরমটা প'ড়ে গিয়েছে।

দুপুরে রেড়িক্ষেতের কাছটা থেকে ফিরে আসতে হঠাৎ মনে হ'ল, আজ চড়ক, তিরিশে চৈত্র। অমনি সারা গাটা যেন শিউরে উঠল—শত-স্মৃতির দ্বার এক ঝাপ্‌টা হাওয়ায় খুলে গেল। দুপুরের খররৌদ্রভরা আকাশের তলায় হলুদরং-এর বনমুলোর ফুল, আকন্দফুল, বেগুনী-কণ্টিকারী ফুল পোড়ো জমিটাতে অজস্র ফুটে অনন্তের সন্ধান এনেছে—আমার খড়ের বাংলাঘরের পিছনে। ঐখানটায় দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়গুলোর দিকে চেয়ে মনে প'ড়ল, এতক্ষণ আমাদের চড়কতলায় হয়তো দোকান-পসার ব'সে গিয়েছে—হয়তো সেই গাছটায় ছেলেবেলার মত কাঁটা ভাঙছে—কাল গিয়েছে নীলের দিন। হয়তো গাঁয়ে যাত্রা হবে—হয়তো কত আনন্দ হচ্ছে—পুরোনো দলের কেউ কাঁটা ভাঙছে না। নতুন দলের ছেলেপিলেরা, শ'ত জেলে এখনও বেঁচে

আছে।

আমাদের বাড়ীর ভিটেটাতে নতুন পোঁতা প'ড়ে আছে, কতকাল আগের এক নব-বর্ষের জলদানের চিহ্ন—দাতা হয়তো বেঁচে নেই। কত যত্নে তোলা ছিল—সেই সজনে গাছটার মত, কত যত্নে সঞ্চয় করা। সামনে বাঁশতলার ভিটেটাতে যে-সব খোলা-খাপরা প'ড়ে আছে, কতকাল আগেকার কোন বিস্মৃত নব-বর্ষের ঘটদানের ভাঙা কলসীর খোলা-খাপরা সে-সব? ভাবতেও—এতকালের অনন্ত-প্রবাহের চিন্তা করেই গা কেমন শিউরে ওঠে।

সূর্য্য আছে, চন্দ্র আছে, অসীম বস্তুপিণ্ডগুলো আছে—কিন্তু মানুষ যদি না থাকতো, তবে কিছু না। মানুষ আছে ব'লেই এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, সুখের-দুঃখের আনন্দ-উৎস। অজানা গ্রহে-নক্ষত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয় সে-সব স্থান মরুভূমি নয়—তরুণ-মুখের হাসিকান্নায়, সে-সব অজানা দূরের জগৎও জাগ্রত প্রাণ-স্পন্দনে ভরা, সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকাশে বিচিত্র বন-পর্ব্বতের নির্জ্জনতায় বিরহী একা বসে প্রিয়ার কথা ভাবে, মা হারানো-ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল ফেলেন, দেশকর্ত্তারা বড় বড় কাজ করেন, বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ হয়।

এই পৃথিবীতে এই মানুষের মনের সুখ-দুঃখ নিয়েই ভগবানের অপূর্ব্ব কাব্য। এর সঙ্গে জীব-জন্তুর, গাছপালার দুঃখ তাঁর মনে আসে যদি, তবে তাঁর আনন্দের তুলনা কোথায়?

॥ ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥ ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৪ ॥

নব-বর্ষের দিনটা।

অনেককাল আগের শৈশবের সেই-সব কালবৈশাখীর দিনের কথা মনে পড়ে। সেই বৃষ্টির গন্ধ, মেঘান্ধকার! আকাশের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘরের কোণে বসা, কাঁথা পাতা, শিল-পড়ার আশায় আগ্রহে আকাশের দিকে ঘন-ঘন চাওয়া, ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে মেঘান্ধকার আকাশের দূর পূর্ব্বপ্রান্তে চেয়ে বিদ্যুৎ-চমক, বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ করতে করতে মনে পড়ল, কত কথা। অনেক দূরে আজ আমার গ্রামে হয়তো চড়কের গোষ্ঠবিহার, ছেলেবেলার মত মেলা হচ্ছে, কত হাসিমুখ ছেলেমেয়ে, পাড়াগাঁয়ের কত মাটির ঘর থেকে এসেছে—এতক্ষণ লাঠিখেলা চলেছে—পঁচিশ বৎসর আগের মত হয়তো। পঁচিশ বৎসর আগের সে বালকের কথা মনে হয়, যার মনে কালবৈশাখী অপূর্ব্ব বার্ত্তা আনতো!

ত্রিশ পঞ্চাশ একশো হাজার তিন হাজার বছর কেটে যাবে। তিন হাজার বছর পরেকার যে বাংলার ছবি আমি এই মেঘান্ধকার নির্জ্জন সন্ধ্যাটিতে বাংলা থেকে দূরের দেশে এক জঙ্গল-পাহাড়ের ধারে ঘরটিতে ব'সে মনে আনতে চেষ্টা করি। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা, যার বিষয় আমরা কল্পনা করতেও সাহস পাই না, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা তখন জগতে এসেছে। হয়তো ইংরেজ-জাতির কথা, প্রাচীন গ্রীক রোমানদের মত ইতিহাসের গল্পের বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেল স্টীমার এরোপ্লেন টেলিগ্রাফ তখন প্রাচীন যুগের মানব সভ্যতার কৌতূহলপ্রদ নিদর্শন-স্বরূপ—সে ভবিষ্যৎযুগের মানবের চিত্রশালিকায় রক্ষিত হচ্ছে। বর্ত্তমান বাংলাভাষা, তখন আর কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো এ ভাষা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়ে এর স্থানে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের ভাষা প্রচলিত হবে। বহুদূর ভবিষ্যতের ছবি!

তখনও এই রকম কালবৈশাখী নামবে, এই রকম মেঘান্ধকার আকাশ নিয়ে, ভিজে

মাটির গন্ধ নিয়ে, ঝড় নিয়ে, বৃষ্টির শীকরসিক্ত ঠাণ্ডা জলো হাওয়া নিয়ে, তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎচমক নিয়ে—তিন হাজার বছর পরের বৈশাখ-অপরাহ্ণের উপর।

তখন কি কেউ ভাববে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কালবৈশাখীর সন্ধ্যায় এক বিস্মৃত গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব্ব আনন্দে দুলে উঠতো? এই মেঘান্ধকার আকাশের বিদ্যুৎচমক—সকলের চেয়ে এই বৃষ্টির ভিজে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা কি আশা, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, দূর দেশের, দূরের উত্তাল মহাসমুদ্রের, ঘটনাবহুল অস্থির জীবনযাত্রার কি মায়া-ছবি তার শৈশবমনে ফুটিয়ে তুলতো?

কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্ণটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্ণের নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মন-মাতানো ডাক—গ্রাম্যনদীটির ধারে শ্যাম তৃণদলের উপর ব'সে ব'সে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ কল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদু সুগন্ধ যা তার নববিবাহিতা তরুণী পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল? কোথায় লেখা থাকবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দকাহিনী?

দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এই কালবৈশাখীর নব আনন্দের বার্ত্তা আনবে, কোন্ পথে তারা আসবে?

এই সন্ধ্যায় ব'সে গভীর-ভাবে এ কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কোন্ গভীরের মধ্যে ডুবে গেলাম! মেঘভরা নির্জ্জন সন্ধ্যা—বিদ্যুৎচমক—ঝড়ের শব্দ—হঠাৎ এই জলের গন্ধে এক অপূর্ব্ব বার্ত্তার আনন্দে মন শিউরে উঠলো।

এই ঘন মেঘের পরপারে কোথায় যেন আছে অনন্ত প্রাণধারার উৎস, দিকে দিকে যুগে যুগে প্রবহমাণ জীবনের উৎসব, নিত্য শাশ্বত আনন্দলীলা ও অনন্তের গভীর রহস্য, বিশালতা...আর যা আছে, তাদের বর্ণনা মানুষের ভাষায় নেই—কোনো ভাষার ব্যাকরণে তার প্রতিশব্দ গ'ড়তে পারেনি। 'অনন্ত' 'শাশ্বত' 'নিত্য' 'বিরাট' প্রভৃতি মামুলী একঘেয়ে কথায় তার বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না, বোঝানো যায় না প্রকৃত রূপ —যে শুধু এই কালবৈশাখীর বৃষ্টির গন্ধ মিশানো দূর হাওয়ায়, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎচমকে, ঘনান্ধকার আকাশের রহস্যে মনে আসে—অনন্তের সে বেণুগীত।

মানুষের চিন্তা বড় পঙ্গু, তার শক্তি নেই সেখানে পৌঁছয়। নক্ষত্রলোকে যদি কোনো দুঃসাহসিক মানুষ যেতে চায় তবে রেল কি মোটর বাহন নির্দ্দিষ্ট করলে তাকে চলবে না। তাকে যোগাড় করতে হবে আলোকের রথ—একমাত্র আলোকের গতি তাকে আশ্রয় করতে হবে সেখানে পৌঁছাতে হলে। এমন একটা জিনিস আছে, যা মনোজগতে আলোর রথের কাজ করে। মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিসটা Logic-সঙ্গত। শান্ত, সুষ্ঠু ক্রমবন্ধ, হুঁশিয়ার চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বনে সেখানে পৌঁছতে তুমি লীলাসম্বরণ ক'রে ফেলবে তবুও হয়তো পৌঁছতে পারবে না।

সে জিনিসটা কি তা বোঝানো মুশ্‌কিল, শুধু অনুভব ক'রে আস্বাদ করবার জিনিস সেটা Bergson তাকেই Intuition ব'লছেন বোধ হয়—আমি ঠিক জানি না।

আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতনই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধে শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত-জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যু স্পষ্ট না হয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে, তা তোমার আমার সকলের। যুগে যুগে চিরদিন এই

জ্ঞানটাই শুধু মানুষের দরকার—আর কিছু না। দেশে আজ অন্ন নাই, জল নাই—যাঁরা সে সব দেবার ভার নেবেন বা নিয়েছেন, অত্যন্ত মহৎ তাঁদের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। তাঁরা তা দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দান হবে এই জ্ঞানটা—শুধু এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের প্রাণে পেঁৗছিয়ে দেওয়া। দেহের খাদ্য অনেকেই যোগাতে পারে—আত্মার খাদ্য ক'জন যোগায়?

শুধু এই জ্ঞানটা মানুষ মনে যখন বরণ ক'রে নেবে, তার দৈন্য দূর হবে, হীনতা কেটে যাবে, সংকীর্ণতা ধুয়ে মুছে পবিত্র হবে।

কালবৈশাখীর শীকরসিংস্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদের মত এই অনন্ত অধিকারের বার্ত্তা মানুষের বুভুক্ষু, অজ্ঞানতাদগ্ধ মনে অমৃতের বর্ষণ করুক। দূর অজানা স্বপন-জগতের কোণ থেকে বয়ে আনুক।

মনোজগৎ মানুষের অপূর্ব্ব সম্পদ। একে অবহেলা না ক'রে দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের উৎসাহ নিয়ে এক অজানা দেশসমূহে যদি অভিযান করতে বার হওয়া যায়, বিশ্বে বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেকদূরের আমার গ্রামের চড়কতলার মেলা থেকে হাসিমুখে ছেলে-মেয়েরা মেলা দেখে ফিরে যাচ্ছে—কারুর হাতে বাঁশের বাঁশী, কারুর হাতে মাটির রংকরা ছোবা, মাটির পাল্কি।

একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল নতিডাঙ্গার মাঠের পথ বেয়ে ঘেঁটু ও নোনাবনের ধার দিয়ে ছাতিম বনের ছায়ায় ছায়ায় ধুলজুড়ি মাধবপুরের খেয়া ঘাটে যাচ্ছে—পার হয়ে ওপারের চাষা-গাঁয়ে যাবে। পঁচিশ বৎসর আগে যারা ছোট ছিল, এই রকম মেলা দেখে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে তেলেভাজা জিলিপি খেতে খেতে ফিরে গিয়েছিল—তারা এখন মানুষ হয়ে অনেক দিন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, কেউ কেউ মারা গিয়েছে, কারুর জীবন ব্যর্থতার দীনতায় ভ'রে গিয়ে বেঁচে থেকেও নেই—আজকার এই নিষ্পাপ, অবোধ, দায়িত্বহীন জীবনকোরকগুলোর পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি কল্পনা করতে বড় ভাল লাগে। দিদি দুর্গা যেন রুক্ষ চুলে হাসিমুখে আঁচলে কদমা বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দ-চাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়ী ফিরছে—

—অপু—ও অপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি দ্যাখ রে,—ও অপু।

পঁচিশ বৎসর-এর পার থেকে ডাক আসে।

॥ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল ॥

আজকাল দিনটি সত্যই মনে ক'রে রাখবার মত—সেই সকালে আটটার সময় ঘোড়া ক'রে বার হওয়া গেল। কমলাকুণ্ডু গ্রামের বাড়ী বাড়ী রুগী দেখে বেড়ালাম। কৈসুর মেয়ে, বেহারীদের বাড়ী—বেলা প্রায় বারোটার সময় ফিরে এসে গণপৎদের গাঁয়ে গেলাম। সেখানে যাবার সময় বস্তির এদিকে কাশের মাঠটা থেকে পাহাড় বেশ দেখাচ্ছিল! ভাবলাম সব লোকে আমাদের গাঁয়ে নীলপুজোর দিন দুপুরে কাদামাটি দেখতে গিয়েছে—ছড়ানো ধানগুলো এখনও কাদার ওপরে, ভাল ক'রে গাছ বার হয়নি। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর—গণপৎদের বাড়ী গিয়ে ওদের বাড়ীর মধ্যে সব ঘুরে ঘুরে দেখা গেল—তারপর দই-এর শরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হলাম। এপারে যুগল শিশি হাতে ক'রে ঔষধ নিতে এল—সব কাজ মিটিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে দিয়ারা কাছারীতে। সেখানে তরমুজের শরবৎ ও লুচি ইত্যাদি ললিত-বাবু খাওয়ালেন—কিছুতেই ছাড়লেন না। সাড়ে তিনটার সময় সেখান থেকে

বেরুলাম—পথে ললিতবাবুর সঙ্গে Einstein সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'ল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর—আমরা গেলাম কমলাকুণ্ডু, সেই বস্তীটার কাছে তিন সীমানার মীমাংসা করতে। সেখানে হরিবাবুর তহশীলদারও এল। সেখান থেকে বার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম—বেলা প'ড়ে গেল—পাহাড়টার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম—গাছটায় দু'একদিন হ'ল চড়কের কাঁটা ভাঙা হয়েছে। আজ যদি হঠাৎ যাই তবে সে সব দেখে মনে হবে আবার ছোট হয়ে বনগাঁয়েই পড়ি। ক্রমে বেশ রৌদ্র গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। নাঢ়াবইহারের দিকে সূর্য্যটা লাল হয়ে ডুবে যেতে লাগলো। ঘোড়াটা কি চমৎকার ছোটে! কি আরাম! মুক্তমাঠের মধ্যে হাওয়ায় ওরকম ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কি আনন্দের! পথে গণপৎ ঝা ও সহদেব ভকতের সঙ্গে দেখা। ইসমাইলপুর জঙ্গলে একজন কে আগুন দিয়েছে—নাম বললে হংসরাজ—আসরফি আমিন জমি মেপে দিয়েছে বললে। দিয়ারায় যব গম সব কাটা হয়ে গিয়েছে—তার পর এসে সেই যে জায়গাটা আমি রোজ ঘোড়া নিয়ে পাহাড় দেখি, সেখানে এলাম। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম—বড় ভাল লাগল—মুক্ত উদার মাঠ, হু হু নির্ম্মল হাওয়া—দূরবিসর্পিত দিক্‌চক্রবাল—জঙ্গলের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। তারই পাশ দিয়ে এসে লোধাইটোলার ঐ পথটা দিয়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো! ফিরে এসে স্নান করলাম। দিনটা ভাল লাগল—এগার ঘণ্টা ঘোড়ার ওপর কেটেছে আজ। এত ক্লান্ত কোন দিন হইনি।

॥ ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ বৈকালের দিকে ছোট ঘোড়াটা ক'রে ললিতবাবুর দিয়ারা কাছারী গেলাম। বেশ লাগল—বাইরে টেবিল পেতে ললিতবাবু ও মোহিনীবাবু বসে—হু হু করে পুবে হাওয়া আসছে। সারাদিন গরমের পরে বেশ লাগল। টেলিস্কোপে নক্ষত্রটা দেখে নিলাম। Nion Nebula-টাও দেখলাম। তাঁরা Observation-এর জন্য টেলিস্কোপটা খাটিয়ে রেখে দিয়েছেন। এখন মনে পড়লো ছেলেবেলায় কলকাতা থাকতে দেখেছিলাম, চীৎপুর রেলের ধারে একটা লোক এই রকম টেলিস্কোপ দিয়ে মাপ করছেন—বাবা বললেন, দূরবীন। না জানি সে লোকটা এখন বেঁচে আছে কি-না। তারপর গল্পগুজব করবার পর রাত্রি সাড়ে-ন'টার সময় সেখান থেকে বেরুলাম। লোধাইটোলা পর্য্যন্ত একজন আলো দিয়ে পেঁছে দিয়ে গেল। ভগনি ভগৎ খাতির ক'রে সুপারি ও সিগারেট দিলে। তারপরই অন্ধকার—পথ দেখা যায় না—মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ—নক্ষত্রের আলোয় একটু একটু পথ দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া বেশ ছুটল। এক জায়গায় এমন Romantic লাগছিল—বালা মণ্ডলের টোলার ওদিকের ঘেরাক্ষেত থেকে একটা বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে চলে গেল। বামা বৈরিজের বাসাটা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে প'ড়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো—একেবারে জঙ্গল—মাথার ওপরে নক্ষত্রভরা আকাশ। কাছারীতে এসে দেখলাম ললিতবাবু Traverse টেবিলের জন্যে Draft-টা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানী ভাগলপুর থেকে এসেছে। টেবিলের ওপর গ্লাসের জলে তিনটে বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া সাজানো।

॥ ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

বৈকালের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে গেলাম। এক দৌড়ে এতটা পথ কোনো ঘোড়াকে আমি যেতে দেখিনি। লোধাইটোলার ওপারের মাঠে অনেক খেড়ীর গাছ গত বৎসরের বীজ থেকে বেরিয়েছে। সেখানে ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট

ধরালাম। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ও কুন্ডলীকৃত ধোঁয়াটা নাকের সামনের বাতাসে ক্রমে ক্রমে মিশে যাচ্ছে দেখতে দেখতে—ধীর, শান্তভাবে ঘোড়া চালিয়ে লোধাইটোলার খামার দিয়ে নিয়ে এলাম। আজ খুব হাওয়াটা।

॥ ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজও খেড়ীক্ষেত গিয়ে ঘোড়া ছেড়ে পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছে—আস্‌রফিকে কাল বড় রেগে গিয়ে চাবুক নিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে ক্ষেত দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে।

আজকাল এই অপরাহ্নগুলো যে কি সুন্দর লাগে! প্রতিদিন লেখার কাজ সেরে এই পাহাড়ের এপারে লোধাইটোলায় খেড়ীক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াই। আজ অপূর্ব্ব ভাব মনে এল। সেই বোর্ডিং থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে সোঁদালি ফুল-ভরা ঝোপের তলা দিয়ে সকালবেলা মাঠে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওধারের মাঠটা-স্নিগ্ধ নদী জলের গন্ধ—উমা পদ্মফুল দিয়ে শিবপুজো করতো—সেই গ্রামের হাওয়ায়, মাঠের রূপে, নদীজলের স্নিগ্ধতায়, ফুলেফলে আত্মা গড়ে উঠেছিল—কি অপূর্ব্ব আনন্দই এরা জীবনে এনে দিয়েছিল একদিন! আজও সে সব আছে—কিন্তু তাদের যেন ছেড়ে দিয়েছে, আর তারা আমার নয়। শৈশবের সে গ্রাম এখন আমার কাছ থেকে বহুদূর চলে গিয়েছে—সে সব পুরোনা পাখীর ডাক, ফুলফলের সুগন্ধ, স্নেহময় মুখের হাসি স্বপ্ন হয়ে দূর অতীতে মিশিয়ে গিয়েছে। দশ বৎসর আগে এমন দিনে সকালে উঠে শিয়ালদহে ট্রেনে চড়ে ৬০, মির্জাপুরের কাছে শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বিদায় নিয়ে ভোরের বাতাসে কচিপাতা ওঠা বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সেই প্রথম বৃষ্টির সোঁদা সোঁদা ভিজা মাটির গন্ধ—তারও আগে সেই P. C. Roy-এর ওখানে নেমন্তন্ন, বৃন্দাবন চাকর—দেশে ফিরে Scott-এর বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে—জীবনের প্রথম-যাত্রা—বড় মধুর স্বপ্নমাখা সে দিনগুলো—

আমি জানি আমার কাছে যা মধুর বলে মনে হবে অপরের কাছে তার মাধুর্য্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—তবু ভবিষ্যতে এই ছত্র কয়টি যদি কেউ পড়ে তবে সে যেন ভুলে না যায় যে জীবনের আনন্দ অতি রহস্যময়—কারো কোনো দিনের স্মৃতি তুচ্ছ নয়। তারা যেন মনে রাখে ঐ সব দিনগুলো এক গ্রাম্য বালককে যে সুখ একদিন দিয়েছিল, দুনিয়ার রাজৈশ্বর্য্য তার কাছে তুচ্ছ।

সন্ধ্যা হয়েছে। বনঝাউ গাছের বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম। বনঝাউ গাছের মাথায় চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে। অল্প অল্প মেটে জ্যোৎস্না এখনও ফোটেনি—নির্জ্জন কাশজঙ্গল—বনঝাউ গাছ—মাথার ওপরে চাঁদ—দ্রুতগামী ঘোড়া—বেশ লাগে।

॥ ২৪শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঘোড়া করে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে গেলাম। খুব বন—খুব বন—এত বনের পথ আমার জানা ছিল না। সেই বনঝাউয়ের বনের সুন্দর জ্যোৎস্না যখন উঠেছে, তখন ঘোড়া নিয়ে ধীরে ধীরে সোঁদা সোঁদা গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে ঘোড়া চালিয়ে দিয়ে এলাম। সুন্দর—অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় মনে ভাবছিলাম ভরতদের ঘরে বসতো

যে বালকটি, কঞ্চি নিয়ে খেলা করত সে—এসব Egotism ছেড়ে এলাম। তবুও এই ঘোড়া চড়ে জ্যোৎস্না ওঠা জঙ্গলের মৃদু সুঘ্রাণ উপভোগ করতে করতে ঐ কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে!

॥ ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

পরিশিষ্ট ॥ সাহিত্যের কথা

সাহিত্য যদিও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিল যোগসূত্রস্বরূপ এবং যদিও চারিপাশের মানু- বাদ দিয়ে এখানে কোন সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক, প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রসসৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দ-লোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবি-মানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দ্দেশ্য-ভাবাবেগ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, এর জন্যে আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মাল-মশলা,—কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্ম-প্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্ত্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যাবেন। চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান,—তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্ত-ভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য্য এবং প্রয়োজনীয়ও। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথা-যথ আঁকতে হ'লে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের কী মূল্য। ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প, নিবিড় রেশময় একটি 'লিরিক', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, সেখানে ব্যস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে,—আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দ্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার,—অত্যন্ত বেশী দরকার আরো এই জন্যে যে, এইসব প্রশ্ন এখনো

আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লক্ড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি—দু-পাশের এই দুই রকম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যংগ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতিঅভ্যাসে বন্ধ ঝিমিয়ে-আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্ব্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকশিত করে। জীবনের এই অতি-বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্ত্তে আপনাকে বড় করে যায়। দৈনন্দিন জীবনে পারিপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে—মানুষ খানিকক্ষণের জন্য অন্ততঃ খণ্ড কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ম্ময় চেতনাস্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসম্ভার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে—যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যেও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভব-বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়, এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশন, যে মূল লীলার অনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি,—সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেম-কীর্ত্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবং ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দসত্তা জীবনের সংগে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন তার মর্ম্ম এই যে, আমাদের ধরণী ভারী সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝানো হল, আমাদের এই দৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামোটাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে রিয়ালিটি বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না, তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসংগক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়ার কোন মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুর বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা হ'লে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্ব্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কম্‌তি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয় তবে সাহিত্যের সর্ব্বনাশ করা

হবে, যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব—তাদেরও শেষ পর্য্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রসসাহিত্যের উপ-ভোগ-সামর্থ্যের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন' মাকা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতি-গত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্ম্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অধিকার মানতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্য্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জয় অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তখন অনুশীলনবৃত্তির চর্চা-ভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানতঃ 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা একটুকু ক্ষুণ্ণ হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দুদিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্ত্তমানের দাবীকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নামওয়ালা কথাসাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়া পাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু'দশজন সাহিত্য-রসিক, দু'পাঁচজন বৈদগ্ধ্যগবী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইজোট কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিল্টন এঁদের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এঁদের পাতা ওল্টায় না --সকলে তো কাব্য-প্রিয় নয়—কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজাক, তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকে শখ করে পড়ে? স্কট, হেনরি জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলি ভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গাল-ভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেণ্টেন্স্ রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি।

যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস-সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের রসে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, উর্দ্ধবাহু, মৌনী যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্ব্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে রস হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছু থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র

সম্ভাব্যতাকে রূপ নেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী ; মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে : তাদের সুখ-দুঃখকে বুঝতে হবে। যে বাড়ীর পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এঁকেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে ; শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্য্য-মণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'এমা বোভারি'র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্য্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্ব্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দুই একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোন সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুই প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোন প্রচারবিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফ্লেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোন উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও। তার-পর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি, দুর্নীতি, শ্লীলতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানস চেতনায় পাই। এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখন তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। তখন তা শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণ-বুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রসস্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্য-

বুদ্ধি যুক্ত না হ'লে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্ম্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তদৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হ'লে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে ; এবং যদিচ মানুষের জীবনও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্ব্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড় সেখানে তার রূপ কেবল এই-ই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন সমাজের মূলসত্তার সঙ্গে জড়িত ; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি!

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। "আমাদের দেশে কি আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়"—একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায়—এসব কথা মাত্র আংশিক ভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বাতাস, ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথের ধারে যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে —তাদের কথাই বলতে হবে, তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।

* "সাহিত্যের কথা" স্মৃতির রেখা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল না। ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ প্রকাশিত পরবর্ত্তী সংস্করণে উহা সংযোজন করা হয়। উহা বিভূতিভূষণ প্রদত্ত অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ। নিবন্ধটি গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইবার পূর্ব্বে আনন্দবাজার পত্রিকায় "সাহিত্যের খবর" নামক বিভাগে প্রকাশিত হয়। ১৩৬৮ সালের ২৮ ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মদিনে প্রকাশিত "আমার লেখা" গ্রন্থেও "সাহিত্যের কথা" অন্তর্ভুক্ত হয়।

তৃণাঙ্কুর

(১৯ জুন, ১৯২৯—জানুয়ারী ১৯৩৯)

উৎসর্গ

'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের করকমলে'

বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তনে মনের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে, আমার এই দৈনন্দিন লিপিতে তাহাই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে মাত্র। কখনো অন্ধকারে, কখনো জ্যোৎস্না-স্নাত রজনীতে, কখনো সুখে, কখনো দুঃখে, গহন পর্ব্বতারণ্যে বা জনকোলাহলমুখর নগরীতে, বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে বা শান্ত নিঃসঙ্গতার মধ্যে—মন যেখানে নিজেকেই লইয়া ব্যস্ত ছিল—এই সব রচনার সৃষ্টি সেখানে। পুস্তকে বা পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে প্রকাশের জন্য এগুলি লিখিত হয় নাই। সেই জন্য বহুস্থলে এই রচনাগুলির মধ্যে এমন জিনিস দেখা দিয়াছে যাহা নিতান্তই ব্যক্তিগত। লিপিকৌশলের ইচ্ছাও ইহাদের মূলে ছিল না—হয়তো দ্রুত ধাবমান রেলের গাড়িতে, কিংবা পথচারী পথিকের স্বল্প অবসরে, পথিপার্শ্বের কোনো বৃক্ষতলে বা শিলাসনে যে সব রচনার উদ্ভব—লেখকমনের কারিকুরি প্রকাশের অবকাশ সেখানে কোথায়? যে অবস্থায় যেটি ছিল, অপরিবর্ত্তিত ভাবেই সেগুলি ছাপা হইয়াছে। আমার জীবনে ব্যক্তিগত অনুভূতির অতীত ইতিহাসের দিক হইতে ইহার মূল্য আমার নিজের কাছে যথেষ্ট বেশি। বহু হারানো দিনের মনের ভাব ও বিস্মৃত অনুভূতিরাজি আবার স্পষ্ট হইয়া ওঠে। যে সব অবস্থার মধ্যে আর কখনো পড়িব না, ক্ষণকালের জন্য তাহার মধ্যে আবার ডুবিয়া যাই এগুলি পড়িতে পড়িতে, —ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখকে বাণীমূর্ত্তি দেওয়ার ইহা একটি বড় সার্থকতা বলিয়া মনে করি। আমার জীবনের ও জগতের বহির্দ্দেশে যাঁহারা অবস্থিত—তাঁহারা এগুলি হইতে কি রস পাইবেন আমি জানি না, তবে একথা অনস্বীকার্য্য যে কৌতুক বা কৌতূহলের মধ্য দিয়া একটি নৈর্ব্ব্যক্তিক আনন্দের অনুভূতি জীবনের সকল দর্শকের পক্ষেই স্বাভাবিক—কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে মানব-মনের মূলগত ঐক্য।

লেখক

এক মাস পরে আজ আবার কলকাতায় ফিরেচি। এই এক মাস দেশে কাটিয়েচি অনেককাল পরে। মা মারা যাওয়ার পরে আর এত দীর্ঘদিন একসঙ্গে দেশে কখনো থাকিনি। এই এক মাস আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব আনন্দের অধ্যায়। Dean Inge যাকে ঠিক Joy of Life বলেচেন, তা আমি এই গত মাসটিতে প্রাণে প্রাণে অনুভব করেচি। সেরকম নিভৃত, শান্ত, শ্যামল মাঠ ও কালো-জল নদীতীর না হোলে মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টি কেমন করে হবে? শহরের কর্ম্মকোলাহলে ও লোকের ভিড়ে তার সন্ধান কোথায় মিলবে? তাই যখন জটাখালির ভাঙ্গা কাঠের পুলটাতে দুধারের মজা গাঙ ও বাঁওড় এবং মাথার উপর অনন্ত নীলিমা, নীচে ঘনসবুজ গাছপালা, ধানক্ষেত, বিল, গ্রামসীমার বাঁশবন, মাটির পথের ধারে পুষ্পভারনত বাব্‌লা গাছের সারি, দূরের বটের ডালে 'বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক—এসবের মধ্যে প্রতি বৈকালে গিয়ে বসতাম, তখন মনে হত আর শহরে ফিরে যাবার আবশ্যক নেই। জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জ্জনে নয়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, লোকের মুখে সাধুবাদে নয়, ভোগে নয়—সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে, বিশ্বের রহস্যকে বুঝতে চেষ্টা করবার আনন্দের মধ্যে, এই সব শান্ত সন্ধ্যায় বসে এই অসীম সৌন্দর্য্যকে উপভোগ করায়। সেকথা বুঝেছিলাম সেদিন, তাই সন্ধ্যার কিছু আগে জীবনের এই অনন্ত গতি-পথের কথা ভাবতে ভাবতে অপূর্ব্ব জীবনের আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকার গ্রাহ্য না করেই কুঠির মাঠের অন্ধকার, ঘন নির্জ্জন ও শ্বাপদসঙ্কুল পথটা দিয়ে একা বাড়ি ফিরলাম। আর নদীর ধারে অপূর্ব্ব আকাশের রঙ লক্ষ্য করে তার পরদিনও ঠিক সেই মনের ভাব আবার অনুভব করেছিলাম।

এরকম এক একটা সময় আসে, যখন বিদ্যুৎচমকে অনেকখানি অন্ধকার রাস্তা একবারে দেখতে পাওয়ার মত সারা জীবনের উদ্দেশ্য ও গভীরতা যেন এক মুহূর্ত্তে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। শুধু সৌন্দর্য্যই এই বিদ্যুৎ-আলোর কাজ করে মানসিক জীবনে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য বড় আপেক্ষিক বস্তু। একে সকলে চিনতে পারে না, ধরতে পারে না। কানকে, চোখকে, মনকে তৈরী করতে হয়, সঙ্গীতের কানের মত সৌন্দর্য্যের জ্ঞান বলে একটা জিনিসের অস্তিত্ব আছে। শিমুলগাছের মাথাটার উপরকার আকাশটার দিকে চেয়ে দেখে নিয়ে বামে নতি-ডাঙ্গার দিকে চোখ ফিরিয়ে নিতেই রক্ত-মেঘস্তূপ যেন যুগান্তের পর্ব্বতশিখরের মত আকাশের নীল স্বপ্নপটে—তার ওপারে যেন জীবন-পারের বেলাভূমি! আনন্দ আবছায়ার মত সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকারে একটু একটু চোখে পড়ে।

রোজ আমাদের বাড়ির পাশের বাঁশতলার পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাল্যের শত ঘটনা, কল্পনা আশা, দুঃখসুখের স্মৃতি মনে জেগে উঠত—এই সব বনের প্রতি গাছপালায়, পথের প্রতি ধূলিকণায় যে পঁচিশ বৎসর আগের এক গ্রাম্য বালকের সহস্র সুখদুঃখ জড়ানো আছে, কেউ তা জানবে না। আর এক শত বৎসর পরে তার ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? কোথায় লেখা থাকবে এক মুগ্ধমতি আট বৎসরের বালক জীবনে প্রথম গ্রামের উত্তরমাঠে তার জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে বেড়িয়ে এসে কি আনন্দ পেয়েছিল? কোথায় লেখা থাকবে তার মায়ের-হাতে-ভাজা তালের পিঠে খাওয়ার সে আনন্দের কাহিনী? সেদিন সন্ধ্যার সময় আমাদের ঘাটে স্নান করতে নেমে নতুন-ওঠা চতুর্থীর চাঁদের দিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে এইসব কথা বেশী

করে মনে জাগছিল। গোপালনগরের বারোয়ারীর যাত্রা দেখতে গিয়ে তাই সে ছেলেটার কথা মনে পড়লো যে আজ পঁচিশ বছর আগে কৃষ্ণঘোষের তামাকের দোকানের বারান্দাতে বসে তার বাবার সঙ্গে যাত্রা দেখতে দেখতে দময়ন্তীর দুঃখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতো।

সে-সব কথা যাক। অদ্ভুত এই জীবন, অপূর্ব্ব এই সৃষ্টির আনন্দ। নির্জ্জনে বসে ভেবে দেখো, মানুষ হয়ে উঠবে।

অনেককাল পরে গরীবপুরে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে খিনু ও তার বোন রাণীর সঙ্গে দেখা হোল। আজ প্রায় ষোল বছর আগে ওদের বাসাতে বাড়ির ছেলের মত থাকতুম। তখন আমিও বালক, ওরা নিতান্ত শিশু। সেই খিনুকে যেন আর চিনতে পারা যায় না। এত বড় হয়ে উঠেচে, এত দেখতে সুন্দর হয়েচে। রাণীও তাই। কতক্ষণ তারা আমাকে কাছে বসিয়ে পুরানো দিনের গল্প করতে লাগলো আপনার বোনেদের মত, ছাড়তে আর কিছুতে চায় না। শেষকালে রাণী তার শ্বশুর-বাড়ির ঠিকানা দিয়ে কলকাতায় গেলেই যেন সে ঠিকানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি, এ অনুরোধ বার বার করলে।

এবার আরও সকলের চেয়ে ভাল লেগেচে যেদিন রামপদর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে মোল্লাহাটি ছাড়িয়ে পাঁচপোতার বাঁওড়ের মুখে গিয়েছিলুম। এক তালীবনশ্যাম গ্রামরাজি। আকাশের কি নীল রঙ, ইছামতীর কি কালো জল! নৌকোতে আসবার সময় জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জ্জন কাশবনের ও জলের ধারের বন্যেবুড়ো গাছের ও মাথার উপরকার নক্ষত্রবিরল আকাশের কি অসীম সম্ভাব্যতার ইঙ্গিত।

এই আনন্দ-দিনের ইতিহাস পাছে ভুলে যাই, তাই লিখে রেখে দিলুম। অনেক-কাল পরে খাতাখানা খুলে দেখতে দেখতে এইসব আনন্দের কাহিনী মনে পড়বে—তাই।

একটা কথা আজকাল নির্জ্জনে বসে ভাবলেই বড় মনে পড়ে। এই পৃথিবীর একটা spiritual nature আছে, আমরা এর গাছপালা, ফুলফল, আলোছায়া আকাশ-বাতাসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেচি বলে, শৈশব থেকে এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের বন্ধনে আবদ্ধ বলে, এর প্রকৃত রূপটি ধরা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এই অপূর্ব্ব সৃষ্টি যে আমাদের দর্শন ও শ্রবণ-গ্রাহ্য বস্তুসমূহ দ্বারা গঠিত হয়েও আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও ঘোর রহস্যময়, এর প্রতি অণু যে অসীম সম্ভাব্যতায় ভরা, মানুষের বুদ্ধি ও কল্পনার অতীত এক জটিলতায় আচ্ছন্ন, তা হঠাৎ ধরা পড়ে না। হঠাৎ বোঝা যায় না, কিন্তু কতকগুলি প্রাথমিক জ্ঞানকে ভিত্তি করে অগ্রসর হোলে আপনা-আপনি গভীর চিন্তার মুখে ধরা দেয়। এক্ষেত্রে একটা ভুল গোড়া থেকে অনেকে করেন। সেটা এই যে, পূর্ব্বের জ্ঞান মনের মধ্যে এসে পেঁছিলে অনেকে জ্ঞানের চোখে পৃথিবীর দিকে চেয়ে বলেন জগৎ মিথ্যা ও মায়াময়।

বেদান্তের পারিভাষিক 'মায়া' ছাড়াও আর একটা লৌকিক বিশ্বাসের 'মায়া' আছে, যেটাকে ইংরেজীতে illusion বলে অনুবাদ করা চলবে। বেদান্তের মায়া illusion নয়, সে একটা দার্শনিক পরিভাষা মাত্র, তার অর্থ স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁরা লৌকিক অর্থে 'মায়া' শব্দটা গ্রহণ করেন ও অর্থগত তত্ত্বটি মনে মনে বিশ্বাস করে হৃষ্ট হয়ে ওঠেন, তাঁরা ভুলে যান মানুষও তো এই অসীম রহস্যভরা সৃষ্টির অন্তর্গত। তাঁর নিজের মধ্যে যে আরও অনেক বেশী সম্ভাব্যতা, অনেক বেশী আধ্যাত্মিকতা, অনেক বেশী জটিলতা, আরও বেশী রহস্য। নিজেকে দীন বলে 'মায়া' কর্তৃক প্রতারিত

দুর্ব্বল জীব মনে করার মধ্যে যে কোনো সত্য নেই, এটা সাহস করে এ'রা মেনে নিতে পারেন না।

নীরদদের বাড়ি কাল সন্ধ্যার সময় বসে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলুম একখানা ইংরেজী পত্রিকাতে। এই কথাই শুধু মনে হোল আমরা জীবনে একটা এমন জিনিস পেয়েচি, যা আমাদের এক মুহূর্ত্তে সাংসারিক শান্তিদ্বন্দ্বের ওপর এক শাশ্বত আনন্দ-জীবনের স্তরে উঠিয়ে দিতে পারে—অনন্তমুখী চিন্তার ধারা প্রবাহিত করে দেয়, এক মুহূর্ত্তে সংসারের রঙ বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। যখনই জগতের প্রকৃত রূপটির যে অংশটুকু আমরা চোখে দেখতে দেখতে যাই তা সমগ্রতার দিক থেকে আমরা দেখতে পাই, পরিপূর্ণভাবে জীবনকে আস্বাদ করবার চেষ্টা করি—ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, আকাশ, নীহারিকা, নক্ষত্র, অমরত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য্য, পদার্থতত্ত্ব, ফুলফল, গাছপালা, অপরাহ্ণ, জ্যোৎস্না, ছোট ছেলেমেয়ে, প্রেম—তখনই বুঝি এই বিশ্বের সকল সৃষ্ট পদার্থের সঙ্গে একত্ব অনুভব করা ও চারিধারে আত্মাকে প্রসারিত করে দেওয়াই জীবনের বড় আনন্দ। 'আনন্দ' উপনিষদের পারিভাষিক শব্দ, লঘু অর্থে সংসারে চলে এসেচে কিন্তু আনন্দ কথার প্রকৃত অর্থ উচ্চ জীবনানন্দ। "আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে" এখানে আনন্দের কোনো বর্ত্তমান প্রচলিত সাধারণ অর্থ নেই।

আজ খুব বেড়ানো হোল। প্রথমে গেলুম বন্ধুর ওখানে। তার মোটরে সে প্রবাসী অফিসে আমায় নামিয়ে দিয়ে গেল। সেখান থেকে গেলুম সায়েন্স কলেজে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর ডাঃ রায় এলেন। তিনি সিণ্ডিকেটের মিটিংএ গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে খানিকটা কথাবার্ত্তার পর দুজনে বেরিয়ে পড়া গেল, একেবারে সোজা সারকুলার রোড দিয়ে মোটর হাঁকিয়ে প্রিন্সেপ্ ঘাট। বেশ আকাশের রঙটা, ক'দিন বৃষ্টির জ্বালায় অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল, আজ আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, গঙ্গার ওপারে রামকৃষ্ণপুর ময়দাকলগুলোর ওপরকার আকাশটা তুঁতে রঙের, পশ্চিম আকাশে কিন্তু অস্তসূর্য্যের রঙ ফোটেনি—কেন তা জানি না। ডাঃ রায়ের সঙ্গে বর্ত্তমান কালের তরুণ সাহিত্য সম্বন্ধে বহুক্ষণ আলোচনা হোল—তাঁর মত ভারী পাকা ও যুক্তিপূর্ণ। সকাল সকাল ফিরলাম, তিনি আবার বৌবাজারের দোকানটা থেকে খাবার কিনলেন। আমায় বললেন, মাঝে মাঝে দেখা করবার জন্যে।

জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করি, তবে সে এই ডাঃ পি. সি. রায়কে। সত্যিকার মহাপুরুষ। বহু সৌভাগ্যে তবে দর্শনলাভ ঘটে, একথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কইবার পরে মনে হয় যে সত্যিই কিছু নিয়ে ফিরচি।

আজ প্রবাসীতে গিয়ে বইটার* প্রথম ফর্ম্মাটা ছাপা হয়েচে দেখে এলুম। সে হিসাবে আমার সাহিত্য-জীবনের আজ একটা স্মরণীয় দিন। ওটা ওদের ওখানে কাল শনিবারে পড়া হবে। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু কাল থাকবেন বলেচেন।

সেখান থেকে গেলুম দক্ষিণাবাবুর গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণে কালীঘাটে। সুরেশানন্দের ছোট একবছরের খোকাটি কি সুন্দর হয়েচে! ওকে কোলে নিয়ে চাঁদ

* পথের পাঁচালী।

দেখালুম—ভারী তৃপ্তি হোল তাতে। এরা সব কোথা থেকে আসে? কোন্ মহান্ আর্টিস্টের সৃষ্টি এরা? অনন্ত আকাশে কালপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় অনল জ্বলতে দেখেচি, পূর্ব্ব দিক্‌পালের আগুন-অক্ষরে সঙ্কেত দেখেচি, কিন্তু সে রুদ্র বিরাটতার পিছনে এই সব সুকুমার শিল্প কোথায় লুকানো থাকে? কি হাসি দেখলুম ওর মুখে! কি তুলতুলে গাল!...

একটা উপমা মনে আসচে। আমাদের দেশের বারোয়ারীর আসরে কে যেন রবিবাবুর মুক্তধারা থেকে 'নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র' ওই গানটি আবৃত্তি করচেন। ওর ধ্বনির সঙ্গে ভাবের অপূর্ব্ব যোগ, ওর মধ্যে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ও চাতুর্য্য প্রকাশ পেয়েচে, তা কে বুঝচে? কি হয়তো এক কোণে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বসে আছেন—আসর-ভরা দোকানদার দলের মধ্যে তিনিই একমাত্র নীরব রসগ্রাহী, কবির ক্ষমতা বুঝচেন তিনি। চোখ তাঁর জলে ভাসচে, বুক দুলে উঠচে।

বিশ্ব-সৃষ্টির এই অসীম চাতুর্য্য, এই বিরাট শিল্প-কৌশল এই ইন্দ্রিয়াতীত সৌন্দর্য্য—ক'জন বুঝবে? দোকানদার দলের মত হাততালি দিচ্চে হয়তো সবাই। কিন্তু কে মন দিয়েচে ওদিকে—কে ভাবচে এই অপূর্ব্ব, অবাচ্য, অভাবনীয়, অদ্ভুত সৃষ্টির কথা...মানুষের অভিধানে যাকে বর্ণনা করবার শব্দ নেই।

এক-আধজন এখানে ওখানে। Sir Oliver Lodge, Flammarion, Jeans, Swinburne, রবীন্দ্রনাথ, এঁদের নাম করা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় "এদের ফাৎনাতে ঠোক্‌রাচ্চে"।

আনন্দ! আনন্দ!

"আনন্দাদ্ধেব খলু ইমানি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"

কাল প্রবাসীতে 'পথের পাঁচালী'র কয়েকটি অধ্যায় পড়া হলো। ডাঃ কালিদাস নাগ ও সুনীতিবাবু উপস্থিত ছিলেন, আরও অনেকে ছিলেন। সকলেই ভারী উপভোগ করলেন, এইটাই আমার পক্ষে আনন্দের বিষয়। এ বইখানার আর্ট অনেকেই ঠিক বুঝতে না পেরে ভুল করেন, দেখে ভারী আনন্দ হোল সজনীবাবু কাল কিন্তু ঠিক আর্টের ধারাটা আমার বুঝে ফেলেচে।

আর্টকে বুদ্ধির চেয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে বোঝা যায় বেশী।

এবার বাড়ি গিয়ে গত শনিবারে অনেকদিন পরে কি আনন্দই পেলুম। মটর লতা, কাঠবেড়ালী, নাটাফুল—বর্ষাসরস লতাপাতার ভরা সুগন্ধ। কাল প্রবাসী থেকে গিরীনবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিন্ সাহেবের কাছে অনেকদিন পরে। বেশ দিনটি কাটলো। বিভূতির সঙ্গেও দেখা।

আজ সকালে উঠে অনেকদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই কীর্ত্তনের গানটা মনে পড়ল..."যাত রহি" শেষ দুটো কথা ছাড়া আর আমার কিছু মনে নেই, অথচ গানের ভাবটা আমি জানি। ভারী আনন্দ হোল আজ মনে। শুধুই মনে হচ্ছিল জীবনটাকে আমরা ঠিক চোখে অনেক সময় দেখতে শিখিনে বলেই যত গোল বাধে। জীবন আত্মার একটা বিচিত্র, অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা। এর আস্বাদ শুধু এর অনুভূতিতে। সেই অনুভূতি যতই বিচিত্র হবে, জীবন সেখানে ততই সম্পূর্ণ, ততই সার্থক।

সেইদিক থেকে দেখলে দুঃখ জীবনের বড় সম্পদ ; দৈন্য বড় সম্পদ ; শোক, দারিদ্র্য, ব্যর্থতা বড় সম্পদ, মহৎ সম্পদ। যে জীবন শুধু ধনে মানে সার্থকতায়, সাফল্যে, সুখে-সম্পদে ভরা, শুধুই যেখানে না চাইতে পাওয়া, শুধুই চারিধারে প্রাচুর্য্যের, বিলাসের মেলা—যে জীবন অশ্রুকে জানে না, অপমানকে জানে না, আশাহত ব্যর্থতাকে জানে না, যে জীবনে শেষ-রাত্রের জ্যোৎস্নায় বহুদিন-হারা মেয়ের মুখ ভাববার সৌভাগ্য নেই, শিশুপুত্র দুধ খেতে চাইলে পিটুলি গোলা খাইয়ে প্রবঞ্চনা করতে হয়নি, সে জীবন মরুভূমি। সে সুখসম্পদ-ধনসম্পদ-ভরা ভয়ানক জীবনকে আমরা যেন ভয় করতে শিখি।

এক-এক সময় মনটা এমন একটা স্তরে নেমে আসে, যখন জীবনের আসল দিকটা বড় চোখে পড়ে যায় : আজ অনেকদিন পরে একটা সেই ধরনের শুভদিন। কলকাতার শহরে এ দিন আসে না।

আজ একটি স্মরণীয় দিন, এই হিসাবে যে আমার বইখানার আজ শেষ ফর্ম্মাটি ছাপা হোল। আজ মাসখানেক ধরে বইখানা নিয়ে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেচি—কত ভাবনা, কত রাতজাগা, সংশোধনের ও পরিবর্ত্তনের ও প্রুফ দেখার যে ব্যগ্র আগ্রহ, সবারই আজ পরিসমাপ্তি। এইমাত্র প্রবাসী অফিসে বসে শেষ প্যারাটার প্রুফ দেখে দিয়ে এলুম। ঠিক দুমাস লাগলো ছাপতে।

ঘনবর্ষার দিনটি আজ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দূরে চেয়ে কত কথা মনে পড়ে। কিন্তু সে-সব কথা এখানে আর তুলবো না।

শুধুই মনে হয় সেই ভাগলপুরে নিমগাছের দিকের ঘরটাতে বসে বনাতমোড়া সেই টেবিলটাতে সেই সব লেখা—সেই কার্ত্তিক, সাবোর স্টেশনে গাছের তলায় শীতকালে পাতা-জ্বালিয়ে আগুন-পোহানো, গঙ্গার ধারের বাড়িটার ছাদে কত স্তব্ধ অন্ধকার রজনীর চিন্তা-শ্রম, সেই কাশবনে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সে-সব ছবি —সবারই আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

উঃ, গত ছ'মাস কি খাটুনিটাই গিয়েচে! জীবনে কখনও বোধ হয় আমি এ-রকম পরিশ্রম করিনি—কখনও না। ভোর ছ'টা থেকে এক কলমে এক টেবিলে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত কাটিয়েচি। মাথা ঘুরে উঠেচে, তখন একটু ট্রামে হয়তো বেড়াতে বেরিয়েচি, ইডেন গার্ডেনে কেয়াঝোপে বসে ও একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেনে লালফুল-ফোটা ঝিলটার ধারে বসে কত সংশোধনের ভাবনাই ভেবেচি। তার ওপর কাল গিয়েচে সকলের চেয়ে খাটুনি। সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যান্ত বই-এর শেষ ফর্ম্মার প্রুফ ও কাটাকুটি, শেষে রাত্রে পাথুরেঘাটার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাওয়া ও তদারক করে লোক খাইয়ে বেড়ানো। কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি, গা-হাত-পা যেন কামড়াচ্ছে।

যাক্। বই বেরুবে বুধবারে। ভগবান বলতে পারবেন না যে ফাঁকি দিয়েচি ; তা যে দিইনি, তিনি অন্ততঃ সেটা জানেন। লোকের ভাল লাগবে কিনা জানি না, আমার কাজ আমি করেচি। (ওপরের সব কথাগুলো লিখলুম আমার পুরনো কলমটা দিয়ে,—যেটা দিয়ে বইখানার শুরু হতে লেখা। শেষদিকটাতে পার্কার ফাউন্টেন পেন কিনে নতুনের মোহে একে অনাদর করেছিলুম, ওর অভিমান আজ আর থাকতে দিলুম না।)

আজ বই বেরুল। এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম আজ তাদের সাফল্যকে লাভ

করেচে দেখে আমি আনন্দিত। প্রবাসী অফিসে বসে এই কথাই কেবল মনে উঠছিল যে আজ মহালয়া, পিতৃতর্পণের দিনটা, কিন্তু আমি তিলতুলসী তর্পণে বিশ্বাসবান্ নই—বাবা রেখে গিয়েছিলেন তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করবার জন্যে, তাই যদি করতে পারি, তার চেয়ে সত্যতর কোনো তর্পণের খবর আমার জানা নেই।

আজ এই নির্জ্জন, নীরব রাত্রিতে বহু দূরবর্ত্তী আমার সেই পোড়ো ভিটার দিকে চেয়ে এই কথা মনে হোল যে তার প্রতি সন্ধ্যা, প্রতি বৈকাল, প্রতি জ্যোৎস্না-মাখা রাত্রি, তার ফুল, ফল, আলো, ছায়া, বন, নদী—বিশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতীত জীবনের কত হাসি কান্না ব্যথা বেদনা, কত অপূর্ব্ব জীবনোল্লাসের স্মৃতি আমার মনকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল। আমার সমস্ত সাহিত্য-সৃষ্টির প্রচেষ্টার মূলে তাদেরই প্রেরণা, তাদেরই সুর।

আজ বিশ বৎসরের দূরজীবনের পার হতে আমি আমার সে পাখী-ডাকা, তেলাকুচা-ফুল ফোটা, ছায়াভরা মাটির ভিটাকে অভিনন্দন করে এই কথাটি শুধু জানাতে চাই—

ভুলিনি। ভুলিনি। যেখানেই থাকি ভুলিনি...তোমারই কথা লিখে রেখে যাবো—সুদীর্ঘ অনাগত দিনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সুরসংযোগের মধ্যে তোমার মেঠো একতারার উদার, অনাহত ঝঙ্কারটুকু যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।

আরও অভিনন্দন পাঠাই সেই সব লোকদের—যাদের বেদনার রঙে আমার বই রঙীন হয়েচে—কত স্থানে, কত অবস্থার মধ্যে তাদের সঙ্গে পরিচয়। কেউ বেঁচে আছে, কেউ বা হয়তো আজ নেই—এদের সকলের দুঃখ, সকলের ব্যর্থতা, বেদনা আমাকে প্রেরণা দিয়েচে—কারুর সঙ্গে দেখা দিনে, কারুর সঙ্গে রাত্রে,—মাঠে বা নদীর ধারে, সুখে কিংবা দুঃখে। এরা আজ কোথায় আছে জানিনে। কোথায় পাবো ঝালকাটির সেই ভিখারীকে, কোথায় পাবো আজ হিরুকাকাকে, কোথায় পাবো কামিনী বুড়ীকে—কিন্তু এই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার-ভরা শান্তির মধ্য দিয়ে আমি সকলকেই আমার অভিনন্দন পাঠিয়ে দিচ্চি।

যারা হয়তো আমার ছাপা-বই দেখলে খুশী হোত, তারাও অনেকে আজ বেঁচে নেই—তাতে দুঃখিত নই, কারণ গতিকে বন্ধ করার মূলে কোনো সার্থকতা নেই তা জানি—তাদের গমনপথ মঙ্গলময় হোক, তাদের কথাও আমার মন থেকে মুছে যায়নি আজ রাত্রে।

আজই সকালে দেশ থেকে এলুম। কাল বৈকালে গিয়েছিলুম বারাকপুরে। সইমার বড় অসুখ। ষষ্ঠীর হাট বাজার, জেলি গোপালনগর থেকে নিয়ে এল ঘি, ময়দা। নগেন খুড়ো সপরিবারে ওখানেই।

কি সুন্দর বৈকাল দেখলুম! সে আনন্দের কথা আর জানাতে পারি নে—ঝোপে ঝোপে নীল অপরাজিতা, সুগন্ধ নাটাকাঁটার ফুল, লেজ-ঝোলা হলুদডানা পাখীটা—অস্তসূর্য্যের রাঙা আভা, নীল আকাশ, মুক্তির আনন্দ, কল্পনা, খুশি।

আজ এখন সুটকেশ গোছাচ্চি। এই মাত্র আমি ও উপেনবাবু টিকিট করে এলুম, আজ রাত্রের ট্রেনে যাবো দেওঘর। কাল আবার সপ্তমী। ওখান থেকে হাজারিবাগ যাবার ইচ্ছে আছে, দেখি কি হয়।

সেই "রাতের ঘুম ফেলনু মুছে" গানটা মনে পড়ে। এই অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এ, ১৯১৮ সালে। আজ শ্যামাচরণদাদাদের "মাধবী কঙ্কণ" বইখানা এনেচি। সেই কতকাল আগেকার সৌন্দর্য্য, সেই পুজোর পর বাবার সঙ্গে ম্যালেরিয়া নিয়ে

প্রথম বাড়ি যাওয়া,,—সেই দিদিমা।

সে সব অপূর্ব্ব স্বপ্ন-ভরা দিনগুলি! জীবনটা যে কী অদ্ভূত, অপূর্ব্ব—তা যারা না ভেবে দেখে তারা কি করে বুঝবে?...কি করে তারা বুঝবে কি মহৎ দান এটা ভগবানের!

সকালে আমরা মোটরে করে বা'র হলুম—আমি, উপেনবাবু, অমরবাবু, করুণা-বাবু। ঝরনার কি সুমিষ্ট জল।...একটু একটু বৃষ্টি হোল। কিন্তু পথের দুধারে কি অপূর্ব্ব গাছপালা, লতাপাতা, শালচারা, ঝরনা, বাঁশবন—দুধারের ঘন জঙ্গলে জংলা মেয়েরা কাঠ কাটচে—কি সুন্দর মেঘের ছায়া—ত্রিকূটের দু-এক স্থান থেকে নীচের দৃশ্য বড় মনোরম। একস্থানে বাঁশের ছায়ায় বসে ডায়েরী রাখলুম। বড় সুন্দর দৃশ্য!

অর্দ্ধেকটা উঠে বড় পরিশ্রম হোল বলে—সকলে উপরে উঠতে চাইলেন না। "অয়ি কুহকিনী লীলে—কে তোমারে আবরিল।" দিব্য শালবনের ছায়ায় বসে—ডায়েরী রাখলুম। আবার মনে পড়ে—বাড়ির কথা।

আজ বিজয়া দশমী। আকাশও বেশ পরিষ্কার। সকালের দিকে আমরা সকলে মোটরে বা'র হয়ে প্রথমে গেলুম পূর্ণবাবুর বাড়ি। সেখানে আজ ওবেলা কীর্ত্তন হবে, পূর্ণবাবু আসবার নিমন্ত্রণ করলেন। সেখান থেকে বিমানবাবুর বাড়ি। আমি ও করুণাবাবু মোটরে বসে রইলুম—অমরবাবু ও উপেনবাবু নেমে গেলেন। সেখান থেকে কর্ণীবাগে ফকিরবাবুর ওখানে যাওয়া গেল। একটু দূরে মাটির মধ্যে তপোবনের পাহাড়টা চোখে পড়ল। কালকার বালানন্দ স্বামীর আশ্রমটাও পাশেই পড়লো দেখলুম। আজ কিন্তু সেখানে লোকের ভিড় ছিল না—কতকগুলি এদেশী স্ত্রীলোক রঙীন কাপড় পরে দাঁড়িয়েছিল দেখলুম। সেখান থেকে করুণাবাবুর বাড়ি হয়ে এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে অমরবাবুর কি কাজ ছিল তা সেরে যাওয়া গেল দুর্গামণ্ডপে ঠাকুর দেখতে। দুর্গাপ্রতিমা ভারী সুন্দর করেচে—অমন সুন্দর প্রতিমার মুখ অনেকদিন দেখি নি। তারপরে বাঙ্গালীদের পূজামণ্ডপে এসে খানিকক্ষণ থাকতেই তারা খেতে বললে। কিন্তু আমি তখন স্নান করি নি। কাজেই আমার হোল না।

বৈকালে নন্দন পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। এত সুন্দর স্থান আমি খুব বেশী দেখি নি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে। পাহাড়ের উপর গাছপালা বেশী নেই, বন্য আতাগাছই বেশী। কিন্তু পিছনে ধূসর ত্রিকূট পাহাড়ের দৃশ্য ও সম্মুখে অস্তরাগ-রক্ত আকাশের তলে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের শান্ত মূর্তি বাস্তবিকই মনে এক অদ্ভুত ভাব আনে। দূরে দূরে শাল মহুয়া বন, শুধু উঁচু-নীচু ভূমি ও বড় বড় পাথর এখানে ওখানে পড়ে আছে। অনেকে পাহাড়ের ওপর বেড়াতে এসেচেন। এত সুন্দর হাওয়া!—একথায় মনে হোল বাল্যকালে মডেল ভগিনী বইয়ে এই নন্দন পাহাড়ের হাওয়ার কথা পড়েছিলুম—চারিধারে বনতুলসীর জঙ্গলের মধ্যে বসে ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের আড়ালে অস্তমান সূর্য্যের দিকে চোখ রেখে কত কথাই মনে আসছিল! উপেনবাবুর ও দ্বিজেনবাবুর অবিশ্রান্ত বকুনির দিকে আমার লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ মনে হোল আজ আমাদের গ্রামেও বিজয়া দশমী। সারা বাংলাতে আজ এসময়টিতে কত নদীতে কত বাচ্ খেলার উৎসব , কত হাসিমুখ। আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারেও এতক্ষণ বিজয়ার আড়ং চল্‌চে—এতক্ষণ বাদা ময়রা তেলেভাজা জিলিপি বিক্রী করচে—সবাই নতুন কাপড় পড়ে সেজে এসে বাঁওড়ের ধারে দাঁড়িয়ে

আছে ঠাকুর দেখবার জন্যে। ছেলেবেলার মত বাঁওড়ে বাচ্ হচ্চে। মনে পড়ে অত্যন্ত শৈশবের সেই শালুক-ফুল তোলা, তারপরে বড় হয়ে একদিনের সেই বন্ধুর কাছে চার পয়সা ও মুড়কির কাহিনীটা।

ফিরে আসতে আসতে মনে হলো এতক্ষণ আমাদের দেশে পথে পথে নদীর ধারে প্রিয় পাড়াগাঁয়ের সুপরিচিত ভাঁট্-শেওড়ার বনে অপরাহ্ণের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, সেই কটুতিক্ত অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ উঠচে—সেই পাখীর ডাক—এখানকার মত দূরপ্রসারী উচ্চাবচ পাথুরে জমি ও শাল্ মহুয়া পলাশের বন সেখানে নেই, এরকম পাহাড় নেই স্বীকার করি, কিন্তু সে-সব অপূর্ব্ব মধুর আরামই বা এখানে কোথায়? মনে পড়ে বহুকাল পূর্ব্বে এই সময়েই শৈশবের সেই "মাধবী কঙ্কণ" ও "জীবন প্রভাত"—সেই পাকাটির আঁটি ও ছিরে-পুকুর। বইখানা সেদিন শ্যামাচরণদাদার কাছে চেয়ে নিয়ে এলুম। সে-সব দিনের অপূর্ব্ব মধুর স্মৃতি—সারাজীবন অদৃশ্য ধূপবাসের মত ঘিরেই রইল। এই নিয়েই তো জীবন—এই চিন্তাতে, এই স্মৃতিতে, এই যোগে। এই মনন ও ধ্যান ভিন্ন উচ্চ জীবনানন্দ লাভ করবার কোনো উপায় নেই। এ আমার জীবনের পরীক্ষিত সত্য।

নন্দন পাহাড় থেকে ফিরে এসে দেখলুম অমরবাবুর বাংলোতে ঁবিজয়া-সম্মিলনী বসেচে। গোল চাতালটাতে জ্যোৎস্নার আলোতে চেয়ার পেতে বিমানবাবু, রবিবাবু, অমরবাবু, করুণাবাবু সবাই বসে আছেন। ঁবিজয়ার আলিঙ্গন ও কুশলাদির আদান-প্রদানের পরে চা ও খাবার খাওয়া হোল। একটু পরে ফকিরবাবু এলেন। অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যিক আলোচনা চলল। আমি ও বিমানবাবুর জামাতা রবিবাবু অনেকক্ষণ ধরে টলষ্টয় ও রুশীয় সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। রবিবাবু আমার 'পথের পাঁচালী'র প্রশংসা করছিলেন। বললেন, অনেকে বলচেন, 'পথের পাঁচালী' শেষ হোলে বিচিত্রা ছেড়ে দেবো। আমি ও করুণাবাবু ঘরের মধ্যে এসে বসে সিগারেট খেলুম ও ফকিরবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের ঝাল ঝাড়তে শুরু করলুম। তারপরে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে সেটা একটু কমে গেল—বিমানবাবু ও রবিবাবু চলে গেলেন—আমরাও পূর্ণবাবুর বাড়িতে কীর্ত্তন শুনতে গেলুম। দক্ষিণা ঘোষ বলে একজন ভদ্রলোক সেখানে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বলছিলেন—আমার বেশ লাগলো। খুব জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে জোরে মোটর হাঁকিয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফেরা গেল। বেশ লাগছিল।

কাল সকালে সম্ভবতঃ গিরিডি হয়ে ঐ পথে মোটর-বাসে হাজারিবাগ ও সেখান থেকে রাঁচী হয়ে কলকাতায় ফিরবো। দেখি কি হয়। আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও যাবো না।

অমরবাবুর দৌহিত্র অমিতের কথাগুলি ভারী মিষ্টি। তিন বৎসরের শিশু। বেশ লাগে ওকে।

এইমাত্র সন্ধ্যা ছ'টার দিল্লী এক্সপ্রেসে দেওঘর থেকে ফিরে এলুম। সারা দিনটা কাটল বেশ। বড় রোদ ছিল। করুণাবাবু সারা পথ কেবল গানের বই বা'র করেন আর আমাকে এটা ওটা গাইতে বলেন—করুণাবাবু সম্পূর্ণ বেসুরে গাইতে থাকেন। মধুপুরে আমার নেমে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু উপেনবাবু নামলেন না বলে আমিও আর নামলুম না। তাতে আমার মন খারাপ ছিল, সেটা দূর করে দেওয়ার জন্যে আমার মুখের সামনে একটা সিগারেট ধরলেন।

তারপর আবার চললো তাঁর সেই বেসুরে গজল গাওয়া। শিশিরকুমার ঘোষের

বড় ছেলেও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছিলেন—বেশ লোক। হুগলী ব্রিজ থেকে সবাই ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলো—আমার মনে হোল সেই এক ফাল্গুন দিনে চুঁচুড়ায় শখের থিয়েটার ও গোলাপ ফুলের কথা। সেই দুপুরের ঝম্-ঝম্ রোদে ফাল্গুনের অলস অবশ হাওয়ায় এই স্টেশনের সে প্ল্যাট্ফর্ম্মে পায়চারির কথা কি কখনো ভুলবো!

মধ্যে আবার খুব বৃষ্টি এল। কলকাতায় কিন্তু বৃষ্টি একটু একটু মাত্র। উপেনবাবু বললেন, আমার অনুচরগণ হেরে গিয়েচে।

এইমাত্র মেসের বারান্দাতে নির্জ্জনে জ্যোৎস্নার আলোতে বসে আছি। বেশ লাগচে। মন মুক্ত, কারণ সম্মুখে প্রচুর অবসর।

এরই মধ্যে দেওঘর যেন দূর হয়ে পড়েচে। আজই সকালে উঠে যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমি দেওঘরের পথে পথে বেড়িয়ে বেড়িয়েচি, তা কি স্বপ্ন? আজই তো ভোরে পশ্চিম আকাশে ধূসর ডিগ্রিয়া পাহাড়ের রহস্য-ভরা মূর্ত্তি ও ত্রিকূটের পিছনের আকাশের অরুণচ্ছটারক্ত সৌন্দর্য্য দেখেচি, তা যেন মনের সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে না।

করুণাবাবুকে বড় ভাল লাগলো। কি শান্ত, সরল হাস্যপ্রিয়, সরস স্বভাবের যুবক!...গান গলায় নেই, তবু অনবরত গান গাইতে গাইতে জোরে চেঁচাতে চেঁচাতে এলেন—সকলে মুচকি হাসচে—গোপনে চোখ ইশারা করচে পরস্পরে, তাঁর দৃক্পাতও নেই। তিনি তা বুঝতেও পারচেন না। আপন মনে গান গেয়েই চলেচেন আর আমাকে ডেকে ডেকে বলচেন—আসুন বিভূতিবাবু, এইটে ধরা যাক্ আসুন—আমার সুরও তাঁর গলার বেসুরাতে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর দৃকপাতও নেই, সুর-বেসুর সম্বন্ধে জ্ঞানও নেই। শিশুর মত সরল ভদ্রলোক।

'Men such as these are the salt of the Earth.'

পরশু থেকে কি বিশ্রী বাদলা যে চলচে! কাল গেল কোজাগরী পূর্ণিমার লক্ষ্মীপূজার দিনটা—কিন্তু সারাদিন কি ভয়ানক বর্ষা আর নিরানন্দের মধ্যে দিয়েই কাটলো! আজও সকাল থেকে শুরু হয়েচে—কাল সারারাতের মধ্যে তো একদণ্ড বিরাম ছিল না বৃষ্টির। কার্ত্তিক মাসে এরকম বাদলা জীবনে এই প্রথম দেখলাম। এসব সময়ের সঙ্গে তা বাদলার association মনে নেই—তাই অদ্ভুত মনে হয়। অন্ধকার হয়ে এসেচে—টেবিলে বসে কিছু দেখতে পাচ্চি নে, মনে হচ্চে আলো জ্বালতে হবে। কাল যখন গিরিজাবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিলুম তখন কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্যে একটু ধরেছিল। রেঙ্গুন যাওয়ার কথা উমেশবাবু যা লিখে রেখে গিয়েচেন, তা এ বৃষ্টিতে কি করে হয়? আকাশ পরিষ্কার না থাকলে কোথাও গিয়ে সুখ নেই।

কাল রাত্রে গিয়েছিলুম শিমুলতলা। সেখানে থেকে আজ সকালের ট্রেনে বা'র হয়ে এখানে এসে সন্ধ্যায় পৌঁছান গেল। ঠিক সন্ধ্যায় গঙ্গার পুলটি পার হবার সময় এই শান্ত হেমন্ত-সন্ধ্যার সঙ্গে কত কথা জড়ানো আছে, যেন মনে পড়ে। সেই হুগলী ঘোলঘাট স্টেশন, সেই কেওটা, সেই হালিসহর, সেই হুগলী—বহুদূরের বাড়ির সে শান্ত অপরাহ্ণ। যেখানে পথের ধারে শ্যামাচরণদাদারা কাঠ কাটিয়েচে, শৈশবের মত সেই কাঠের গুঁড়িগুলো এখনও পথের ধারে যেন রয়েচে—এসব ভাবলে সে এক অপূর্ব্ব, বিচিত্র আনন্দে মন পরিপূর্ণ হয়। জীবনের সেই মধুর-প্রভাত-দিনগুলোর কথা মনে হয়। কাল দিদিমা গল্প করছিল, কবে নাকি সেই জাহ্নবী

স্নানে কেওটা গিয়েছিলেন ; বাবা সকালে মুখ ধুচ্ছিলেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলুম। বুড়ি ঠিক মনে করে রেখেচে। সেই দিনটি থেকে জীবন আরম্ভ হয় না ?...

এসেই ওদের বাড়ি গেলুম জগদ্ধাত্রী পূজার নিমন্ত্রণে। বিভূতি, ঘণ্টু খুব খেলা করলে। সেখান থেকে এই ফিরচি।

ভারী ঘটনাবহুল দিনটি। ভোরে উঠে প্রথমে গেলুম হেঁটে ইডেন্ গার্ডেনে। শিশিরসিক্ত ঘাসের ধারে ধারে বেড়াতে বেড়াতে খালের জলের রক্ত-মৃণালগুলি দেখছিলুম। দুটি রাঙা ফ্রকপরা ফিরিঙ্গি বালিকা ফুল তুলে বেড়াচ্ছিল। কেয়াঝোপে খানিকটা বসে বসে "আলোক-সারথি"র* ছক্ কাটলুম। পরে দু'খানা বায়োস্কোপের টিকিট কিনে বাড়ি ফিরবার পথে রমাপ্রসন্নের ওখান হয়ে এলুম।

বৈকালে প্রথম গেলুম প্রবাসী অফিসে। কেদারবাবু মোটরে ঢুকচেন, গেটের কাছে নমস্কার বিনিময় হোল। সজনীর ঘরে গিয়ে দেখি ডাঃ সুশীল দে বসে আছেন। একটু পরে নীহারবাবুও এলেন। খুব খানিক গল্প-গুজবের পর তিনজনে গেলুম সজনীর বাড়ি। ঊষাদেবী চলে গিয়েচেন। আমার বইখানি গিয়েচেন নিয়ে।

সেখানে "বাঁশি বাজে ফুল বনে" গানটা শুনলাম না বটে, একটা জৌনপুরী টোড়ী রেকর্ড শুনলাম। চা পানের পরে ডাঃ দে বাড়ি চলে গেলেন ; আমরা তিনজনে গেলুম বায়োস্কোপে। পথে বার বার চেয়ে দেখছিলুম—আজ পূর্ণিমা, মানিকতলা স্পারের পিছন থেকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে। বহুদূরের আমাদের বাড়িটাতে নারিকেল গাছটার পিছন থেকে চাঁদটা ওই রকম উঠচে হয়ত। সে সময়টা—সেই "আমার অপূর্ব্ব ভ্রমণ", "রাজপুত জীবন সন্ধ্যা"—সে কি অপূর্ব্ব শৈশবের আনন্দ উৎসাহ, —কি অপূর্ব্ব বিচিত্র জীবনটা তাই শুধু ভাবি।

Sunrise filmটা মন্দ নয়। হিন্দুস্থান রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা, নমস্কার বিনিময় ও আলাপ হোল।—বাবু B. P. C. C. থেকে returned হয়েচেন শুনলুম, মনটা একটু দমে গেল। বায়োস্কোপ দেখে ফেরবার পথে দীনেশ দাশের সঙ্গে দেখা। প্রবাসী অফিসে মানিকবাবু জানালেন, কেদারবাবু মঙ্গলবারে লেখা চান। আবার প্রবাসীতে যাবার আগে বিচিত্রা অফিসে উপেনবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তিনিও খুব শীঘ্র লেখা চান। Sub Editor-এর declarationটা শীঘ্র দিতে হবে তিনি জানালেন।

তারপর বায়োস্কোপ থেকে গেলুম বিভূতিদের বাড়ি। নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে দেখি বৈঠকখানাতে বায়োস্কোপ হচ্চে। বিভূতি বসতে বললে। তারপর দেবেন ও হীরুদের সঙ্গে খেতে বসা গেল। অনেকদিন পরে আজ আবার সেই রাস-পূর্ণিমা।

বেরিয়ে অনেকদিন আগের মত একখানা রিক্‌শা করে জ্যোৎস্নায় ছাতিম ফুলের গন্ধের মধ্যে দিয়ে বাসায় ফিরলুম। সেই ১৯২৩ সাল ও এই। এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্ত্তন।

কে জানত উপরের ডায়েরীটা লিখবার সময় যে এই দিনটাতেই রাসপূর্ণিমার বায়োস্কোপের আসরেই ওদের বাড়ির সিদ্ধেশ্বরবাবুর সঙ্গে আমার শেষ দেখা!

বাসায় এসে বারান্দায় রেলিং ধরে জ্যোৎস্না-ভরা আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল—যেন এক গ্রহদেব এই অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে হু-হু করে উড়ে

* পরে 'অপরাজিত' নামে প্রকাশিত।

চলেচেন ওপরে—ওপরে—সজোরে—সবেগে—পায়ের নীচে পুরাতন পরিচিত পৃথিবীটি রইল পড়ে—।

বহুদূরে আকাশে যেখানে পরমাণু তৈরী হচ্চে, উল্কারা ছুটচে, ছায়াপথ ছড়িয়ে আছে, নক্ষত্র ছুটচে—সেখানে।

বন্ধুর জ্বর হয়েচে—আজ দাদাকে পত্র দিয়েচি। দাদা যেতে বলেচেন, তা কি করে হয়। সেদিন বন্ধুর অত্যাচারের কথা কত শুনলুম। তার স্ত্রী, বোন ও শাশুড়ীঠাকরুন বললেন। শুনে দুঃখ হয়, কিন্তু উপায় কি!

জ্যোৎস্নারাত্রে আমাদের বাড়িটা বহুদূরে কেমন দাঁড়িয়ে আছে. কাঠ কাটা হয়েচে, আমাদের বাড়ির সামনে ছেলেবেলাকার মত পথের ওপর তার দাগ রয়েছে। শ্যামাচরণদাদাদের কাঠ।

সে এক জীবন!

কি বিচিত্র, কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব এই জীবন-ধারা! একে ভোগ করতে হবে।

এই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় ইসমাইলপুরের জন্যে মন উদাস হয়ে যায়। যেন তার বিশাল চরভূমি ,কালো জঙ্গল, নির্জ্জন বালিয়াড়ি—আমায় ডাক দিচ্চে।

কাল স্কুলে ছ'টায় ম্যানেজিং কমিটির মিটিং, এদিকে আবার তিনটার সময় ডাঃ দের ওখানে চা-পানের নিমন্ত্রণ।

আজ দুপুরে মনে পড়ছিল বোর্ডিং-এ থাকতে Traveller's return গল্পটা কি অপূর্ব্ব emotion নিয়ে পড়তুম। বাল্যের সে সব অপূর্ব্ব emotion মনে পড়লেই মনে হয় কি অপূর্ব্ব এবং বিচিত্র এ জীবনধারা! সেদিনের সন্ধ্যায় নন্দরাম সেনের গলিতে যাওয়া, সেই চাউলের গুদাম—সেই শুভঙ্করী পাঠশালার সামনে আমার সহপাঠীর বাড়ি মনে পড়ে।

কি সুন্দর! .

এসবের জন্যে কাকে ধন্যবাদ দেবো?—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?

আজ মনের মধ্যে যে তীব্র creative আনন্দ অনুভব করলুম, কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত এক বছরের মধ্যে তা হয়নি কোন দিন।

আজ সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ কি হলো আমার, অকারণ আনন্দে মনের পাত্র উপচে পড়চে, একে যেন ধরে রাখা যাচ্ছে না।

মন যেন কি বলে বুঝতে পারি নে। কত কথা মনে হোল...সারা জীবনের আনন্দ ও সৌন্দর্য্য আজ আমার মনে ভিড় করেছে...স্মরণীয় দিন, অতি স্মরণীয় দিন, এরকম কিন্তু খুব বেশী দিন আসে না...

ইন্‌স্টিটুটে সেই মহিলা পর্য্যটকের কথা পড়ছিলুম—তুষারবর্ষী শীতের রাত্রে উত্তরমেরু প্রদেশের বরফ জমা নদী ও অন্ধকার অরণ্যভূমির মধ্যে তিনি তাঁবু ফেলে রাত্রে বিশ্রাম করতেন, দূরে মেরুপ্রদেশীয় Northern Light জ্বলে, একা তিনি তাঁবুতে—"amidst a waste of forzen river, and dark forests"—সেখানকার নৈশ নীরবতা...নির্জ্জনতা...গভীর শান্তি, মাথার উপর হলুদ রং-এর চাঁদ, অবাস্তব, অন্য গ্রহের জ্যোতিষ্কের মত দেখায়...নৈশ আকাশে অগণ্য নক্ষত্র...আশেপাশে শুভ্র-তুষারাবৃত পাইন অরণ্যের আড়ালে লোলুপ নেকড়ের দল—আর ভাবতে পারা যায় না, মনকে বড় মুগ্ধ, অভিভূত করে।

সন্ধ্যাবেলা এসে চেয়ারটাতে বসে চুপ করে ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল এই সব শীতের রাত্রের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির পেছনের ঘন বনে শিয়াল ডাকতো গভীর রাত্রে...সেই বিপদের ভয়, অজানার মোহ, গ্রাম্য জীবনের সৌন্দর্য্য...অদ্ভুত

অপূর্ব্ব...

আরও মনে পড়লো ইসমাইলপুরের জ্যোৎস্না রাত্রির সে অপার্থিব, weird beauty...সেই এক পূর্ণিমা-রাত্রির শুভ্র জ্যোৎস্নার ঢেউয়ের নীচে আকন্দ-গাছ ...স্বপ্নে যেন দেখি...

সেই কুমোরদের বাড়ি চাক ঘোরাচ্ছে দাসু...পঞ্চাননতলায় কালীপুজো...

ভগবান, কি অসীম বিচিত্রতা দিয়ে এই জীবন, আমার শুধু নয়, সকলের জীবন গড়ে তুলচো— তা কে দেখে? কে বোঝে?

ধন্যবাদ, অগণিত ধন্যবাদ...হে সৌন্দর্য্যস্রষ্টা মহাশিল্পী, তোমাকে অন্তরের প্রেম কি বলে জানাবো, ভাষা খুঁজে পাই না...

এ তো শুধু পৃথিবীর সুখদুঃখের কথা লিখচি—তবুও তো আজ নাক্ষত্রিক শূন্যের কথা ভাবি নি, অন্য অন্য জগতের কথা তুলি নি। অন্য গ্রহ-উপগ্রহের কথা ওঠাই নি...দূর-দূরান্তের কথা তুলি নি...

নতুন বৎসরের প্রথম দিনটাতে এবার মোটরে করে শ্রীনগর গেলুম। চালকী থেকে খুকীকে তুলে নিলুম, পরে গোপালনগরের বাজারে বঙ্কুর ড্রাইভার গৌরকে হরিবোলা ঠিক করে দিলে। ড্রাইভারটা প্রথমটাতে মেঠো পথে যেতে চায় না। অবশেষে অনেক করে রাজী করানো গেল। সিমলাতে গিয়ে কালীকে ডাকতে পাঠানো গেল, সে নাকি ভাত রাঁধচে। একটি ছোট মেয়ে জল নিয়ে এল বালতিতে করে। খাবার খেয়ে নিয়ে আমরা আবার হলুম রওনা। শ্রীনগরের বনের মাথায় মটর ফুলের মত একরকম ফুল অজস্র ফুটে আছে, এত চমৎকার লাগছিল। আসবার সময় ডাইনে পশ্চিম আকাশে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল—আকাশের কি চমৎকার রঙটা যে!

রাত আটটার সময় পৌঁছে গেলুম কলকাতা, ঠিক চারটার সময় সিমলা থেকে ছেড়ে। এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগে। Sense of space মানুষের ক্রমেই কেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে যাচ্ছে।...এক শত বৎসর পূর্ব্বে যা কিনা পাকা তিন দিনের পথ, গরুর গাড়িতে চার দিনের পথ ছিল।...কে জানে আমাদের পৌত্র বা প্রপৌত্রদের Sense of space আরও কত পরিবর্ত্তিত হবে!—

আজ অনেকক্ষণ কার্জ্জন পার্কে একা একা বেড়ালুম। পশ্চিম আকাশে সূর্য্যটা অস্ত যাচ্ছিল,—আমার শুধু মনে যুগ যুগের কল্পনা জাগে। ঐ নক্ষত্রটা যে ওই-খানে উঠেছে, ওতেও কত অপূর্ব্ব জীবনলীলা...। মৃত্যু, বিরহ এসব যদি জীবনে না থাকতো তবে জীবনটা একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়তো—হারাবার শঙ্কা না থাকলে প্রেম, স্নেহও হয়তো গভীর ও মধুর হতে পেত না। তাই যেন মনে হয় কোন সুনিপুণ শিল্প-স্রষ্টা এর এমন সুন্দর ব্যবস্থা করেচেন যেন অতি তুচ্ছ, দরিদ্র লোকেরও জীবনের এ গভীর অনুভূতির দিকটা বাদ না যায়। এ জীবনের অবদানকে খুব কম লোকই বুঝলে—কেউ এ সম্বন্ধে চিন্তা করে না—সকলেই দৈনন্দিন আহার-চিন্তায় ব্যস্ত। কে ভাবে জন্ম নিয়ে, মৃত্যু নিয়ে? অবকাশ, ঈশ্বর, প্রেম, অনুভূতি —এসব নিয়ে কার মাথাব্যথা পড়েচে?

নুটু ও নায়েব ও সন্তোষবাবুর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম।—Lief Ericsson was spacehungry : So am I·

জানি না কেন আজ ক'দিন থেকে মনটা কেবলই মুক্তির জন্য ছটফট করচে। কি ভাবের মুক্তি! আমাকে কি কেউ শিকলে বেঁধে রেখেচে?...তা নয়। কিন্তু কলকাতার

এই নিতান্ত মিনমিনে, একঘেয়ে, ঘরোয়া জীবনযাত্রা, আজ পনেরো বৎসর ধরে যে জীবনের সঙ্গে আমি সুপরিচিত,—সেই বহুবার দৃষ্ট গতানুগতিক, একরঙা ছবির মত বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রা আর আমার ভাল লাগে না।

আজ দুপুরবেলা স্কুলের অবসর-ঘণ্টায় চুপি চুপি এসে বাইরের ছাদটাতে বসেছিলুম। আকাশ ঘন নীল, কোথাও এতটুকু মেঘ নেই কোনোদিকে—কেবল একটা চিল বহুদূরে একটা কৃষ্ণ-বিন্দুর মত আকাশের গা বেয়ে উড়ে যাচ্ছে—সেদিকে চোখ রেখে ভাবতে ভাবতে আমার মন কোথায় যে উড়ে গেল, কি অপূর্ব্ব প্রসারিত করে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা যে মনে জাগল—সে-সব কথা কি লিখে বলা যায়? মনের সে উচ্চ আনন্দের বর্ণনা দেওয়ার উপযুক্ত ভাষা এখনও তৈরি হয় নি। কিন্তু কেন সে আনন্দটা এল, তাও বুঝতে পারি—সেটা এল শুধু জগতের বড় বড় মরু, বিশাল অরণ্যভূমি, দিক্‌দিশাহীন সমুদ্র, মাঠ ও বনঝোপ, মুক্ত প্রকৃতির অপূর্ব্ব মুক্ত রূপের কল্পনায়।

বুঝতে পারি এরই জন্যে মনটা হাঁপাচ্চে। প্রকাণ্ড কোনো মাঠের ধারে বন, বনের প্রান্তে একটি বাংলো—কিংবা জঙ্গলে ঘেরা অভ্রের খনি, বালু-মিশ্রিত পাথুরে মাটির গায়ে অভ্রকণা চিক-চিক করচে, নয়তো উচ্চাবচ পাহাড়ে জমি, যেদিকে চোখ যায় শুধুই বন—এই রকম স্থানেই যেতে চাই—থাকতে চাই। এতটুকু স্থান চায় না মন। চায় আরও অনেক বড় জায়গা—অনেকখানি বড়—অচেনা, অজানা, রুক্ষ, কর্কশ ভূমিশ্রী হলেও তা-ই চাইবো, এ একঘেয়ে পোষমানা শৌখীনতার চেয়ে।

সন্ধ্যাবেলা যে ছবিটা দেখতে গেলুম গ্লোবে, সেটাও আমার আজকের মনের ভাবের সঙ্গে এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গেল,—'Lief the viking' গ্রীনল্যাণ্ড ছেড়ে আরও দূরে, অচেনা দেশ খুঁজে বার করতে অজানা পশ্চিম মহাসমুদ্রের বুকে পাড়ি জমিয়ে চলে গেল—নিস্তব্ধ রাত্রে জ্যোৎস্না-ঝরা আকাশ-তলায় সদ্য-ফোটা মরসুমী ফুলগুলোর দিকে চোখ রেখে এইমাত্র গোলদীঘির ধারে বসে সেই কথাই আমি ভাবছিলুম।...

ভাবতে ভাবতে মনে হল আমি যেন এই জগতের কেউ নই—আমি যেন বহুদূর কোন নাক্ষত্রিক শূন্যপারের অজানা জগৎ থেকে কয়েক দণ্ডের কৌতূহলী অতিথির মত পৃথিবীর বুকে এসেচি--ও মরসুমী ফুল আমি চিনেও চিনি না, প্রতিবেশী মানুষদের দেখেও যেন দেখি নি, এ গ্রহের বৈচিত্র্যের সবটাই নিয়েচি কিন্তু এর এক-ঘেয়েমিটা আমার মনে বসতে পারে নি এখনও। তার কারণ আমার গতি—স্বর্গীয় গতির পবিত্রতা।

মনে হল এইমাত্র যেন ইচ্ছামত পৃথিবীটা ছেড়ে উড়ে আলোকের পাখায় চলে যাবো ওই বহুদূরে ব্যোমের গভীর বুকে, যেখানে চিররাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একটা নিৰ্জ্জন সাথীহীন নক্ষত্র মিট্‌-মিট্‌ করে জ্বলচে—ওর চারপাশে হয়তো আমাদের মত কোন এক জগতে অপর কোন রূপ বিবর্ত্তনের প্রাণী বাস করে—আমি সেখানে গিয়ে খানিকটা কাটিয়ে আবার হয়তো চলে যাবো কোন্‌ সুদূর নীহারিকা পার হয়ে আরও কোন্‌ দূরতর জগতের শ্যামকুঞ্জবীথিতে!

এই সময়ে মৃত্যুর অপূর্ব্ব রহস্য যা সাধারণ চক্ষুর অন্তরালে থেকে গোপন আছে—তার কথা ভেবে মন আবার অবাক হয়ে গেল—সারা দেহ মন কেমন অবশ হয়ে গেল।...

কোন্‌ বিরাট শিল্প-স্রষ্টার পুণ্য অবদান এ জীবন?...কি অতলস্পর্শী, মহিমা-ময় রহস্য!...রোমাঞ্চ হয়। মন উদাস হয়ে যায়—যখন বাসায় ফিরলুম, তখন যেন

কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব।...

জীবনকে যে চিনতে পেরেছে—এ জগতে তার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নেই—যার কল্পনার পঙ্গুতা ও ভাব-দৈন্য দৈনন্দিন ভোগবিলাসের ঊর্দ্ধে তাকে উঠতে প্রাণপণে বাধাদান করেচে, সে শাশ্বত-ভিখারীর দৈন্য কে দূর করবে?...

আজ অনেককাল পরে—প্রায় বারো বৎসর পরে—শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখে এইমাত্র ফিরচি। সেই ছাত্রজীবনে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে দেখবার পরে এই আজ দেখা। অভিনয় খুব ভালই হল, কিন্তু আমি, কি জানি কেন, মনের মধ্যে প্রথম যৌবনের সে অপূর্ব্ব উন্মাদনা, নবীন, টাটকা, তাজা মনের সে গাঢ় আনন্দানুভূতিটুকু পেলাম না। দেখে দেখে যেন মনের সে নবীনতাটুকু হারিয়ে ফেলিছি।

আজকাল অন্যদিক দিয়ে মনের মধ্যে সব সময়ই একটা অপূর্ব্ব উৎসাহ পাই—একটা অন্য ধরনের উদ্দীপনা। সেটা এত বেশী যে, তা নিয়ে ভাবতেও পারি না—ভাবলে মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

মনে হয় এই যে কলকাতার একঘেয়েমি যাকে বলচি—এ-ও চলে যাবে। সে যাত্রার বাঁশি যেন বেজেছে মনে হচ্চে। বহুদূরে যাত্রা। সমুদ্রের পারে—প্রশান্ত মহাসাগরের পারে।

নানা দার্শনিক চিন্তা মনে আসচে, কিন্তু রাত হয়েচে অনেক—আর কিছু লিখবো না।

ক'দিন বেশ কাটচে। অনেক দিন পরে ক'দিনের মধ্যে ভোম্বলবাবু, ননী, নানু, প্রসাদ—এরা সব এসেছিল। সেদিন অনেকদিন পরে রাজপুরে গেলুম। খুকীর সঙ্গে দেখা হল, ভারী যত্ন-আদর করলে। তারপর একদিন গড়িয়ায় জলের ধারের মাঠে, আমি ও ভোম্বল বেড়াতেও গেলুম। কত কি গল্প আবার পুরনো দিনের মতই হল। একদিন আমি অবশ্য একা গিয়েছিলুম,—পূর্ণিমার দিন।

আজ বসে বসে সেই দিনগুলোর কথা ভাবছিলুম। যাত্রাদলের ছেলে ফণি বাড়িতে খেতে এল—বাবা বর্দ্ধমান থেকে এলেন—তারও অনেক আগে যখন বকুলতলায় প্রথম বারোয়ারীর বেহালা বাজানো শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—সে-সব টাটকা—তাজা, আনকোরা আনন্দ এখনও কিন্তু যেন ভাবলে কিছু কিছু পাই। যেদিন সেই প্রথম বেহালা বেজেছিল, যেদিনটা বাবার সঙ্গে নৈহাটী হয়ে সিঙ্গাড়ার আলু খেয়ে কেওটা থেকে বাড়ি আসছিলুম—যেদিন চড়ক তৈরি করলুম—ঠাকুরমাদের বেলতলায় আমি নিজে; ঠাকুরমাদের পড়ো ঘরে পাঠশালা-করা, কড়ি খেলার আমোদ, পুবমুখো যাওয়া, মরাগাঙে মাছ ধরতে যাওয়া—শনিবারে ছুটিতে বাড়ি আসার আনন্দ—কত লিখবো। কে জীবনের এসব মহনীয় আনন্দ-পরম্পরার কথা লিখতে পারে? আর মনে হয় আমি ছাড়া এসবের আসল মানে আর কেই বা বুঝবে? তা তো সম্ভব নয়—অন্য সকলের কাছে এগুলো নিতান্ত মামুলী কথা মনে হবে। এদের পিছনে যে রসভাণ্ডার লুকানো আছে আমি ছাড়া আর কে তা জানবে?...

অনেকদিন পরে দেশে এসে বেশ আনন্দে দিন কাটচে। রোজ সকালে উঠে ইছামতীর ধারের মাঠটাতে বেড়াতে যাই, ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকে, এত পাখী ডাকে!...চোখ গেল, বৌ-কথা-ক', কোকিল—কত কি!...বেড়িয়ে এসে ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নামি। ওপারের চরের শিমুলগাছটার মাথায় তরুণ সূর্য্য ওঠে,

দু'পারে কত শ্যামল গাছপালা। সোঁদালি ফুলের ঝাড় মাঝে মাঝে দুলতে দেখলেই আমার মনে কেমন অপূর্ব্ব আনন্দ ভরে ওঠে! প্রভাতে পাখীরা যে কত সুরে ডাকে, জলের মধ্যে মাছের ঝাঁক খেলা করে।—জীবনের প্রাচুর্য্যে, সরসতায়, সৃষ্টির মহিমায় অভিভূত হয়ে যাই। কতদূরের সব জীবনধারার কথা, জগতের কথা মনে হয়—আবার স্নান করতে করতে চেয়ে দেখি নদীর ধারে গোছা গোছা ঘাস হেলাগোছা ভাবে জলের মধ্যে মাথা দোলাচ্ছে, একটা হয়তো খেজুর গাছ গাজিতলার বাঁকে অন্য সব গাছপালার থেকে মাথা উঠিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অপূর্ব্ব, সুন্দর, হে স্রষ্টা, হে মহিমময়, নমস্কার, নমস্কার। অন্য সব জগৎও যে দেখতে ইচ্ছে যায়, দেখিও।

রোজ বৈকালে কালবৈশাখীর ঝড় ওঠে ; মেঘ হয়, রোজ, রোজ। ঠিক তিনটা বেলা বাজতে না বাজতে মেঘ উঠবে, ঝড়ও উঠবে। আর সমস্ত আমবাগানের তলা-গুলো ধাবমান, কৌতুকপর, চিৎকাররত বালক-বালিকাতে ভরে যায়—সল্‌তে-খাগীতলা,* তেঁতুলতলা, শ্যামাচরণদাদাদের বাগানটা, নেকো, পটুলে, বাঁশতলী—সমস্ত বাগানে যাতায়াতের ধুম পড়ে গিয়েচে—।

সেদিন ঘন মেঘের ছায়ায় জেলেপাড়ার সবাই—স্ত্রী-পুরুষ-বৃদ্ধ-বালকেরা ধামা হাতে আম কুড়ুচ্চে দেখে আমার চোখে জল এল। জীবনে ও-ই এদের কত আনন্দের, কত সার্থকতার জিনিস।...একটা ছেলে বলচে—ভাই—ওই দোম্‌কাটায় মুই যদি না আসতাম, তবে এত আম পেতাম না!...

কাল সাতবেড়ে মেয়ে দেখতে যাবো।...

সারা গ্রামটাতে বিল্বগাছের ফুলের কি ঘন সুগন্ধ!...অশ্বত্থতলায়, যেখানে সেখানে এত বেলের গাছও আমাদের এখানে আছে!

কাল সাতবেড়ে গ্রামে গিয়ে একটু বেড়িয়ে এলাম। শশী বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের বাড়ি খুব আহার হল। গ্রামখানিতে সবই চাষা লোকের বাস, ভদ্রলোকের বাস তত নেই, তবে সকলেরই অবস্থা সচ্ছল। মাটির ঘরগুলো সেকেলে ধরনের, কোনো নতুন আলো এখনও ঢোকে নি বলে সেখানের অকৃত্রিম আবহাওয়াটা এখনও আছে। ফণি কাকা ও আমি দুজনে দক্ষিণ মাঠের দায়েমের পুকুরের ধার দিয়ে বেশ ছায়ায় ছায়ায় বৈকালের দিকে চলে এলাম। নফর কামারের কলাবাগানে কামারবুড়ি কি ফলমূল ও কাঁকুড় নিয়ে আসচে দেখলাম। হরিপদ দাদার স্ত্রী বাগানে আম পাড়াচ্চেন।

আজকাল রোজ বৈকালে মেঘ ও ঝড়বৃষ্টি হওয়ার দরুন কুঠির মাঠে একদিনও বেড়াতে যাওয়া হয় না। রোজই কালবৈশাখী লেগে আছে। সুন্দর বৈকাল একদিনও পেলাম না। তিনটা বাজতে না বাজতেই রোজ জল আর ঝড়।

আজও সকালে নদীতে স্নান করে এলুম। কি সুন্দর যে মনে হয় সকালে স্নানটা করা, স্নিগ্ধ নদীজল, পাখীর কলকাকলী, মাছের খেলা, নতশীর্ষ গাছপালা, নবোদিত সূর্য্যদেব।

আজ বেড়াতে গেলুম বৈকালের দিকে কাঁচিকাটার পুলটাতে। সকালে অনেক-ক্ষণ চেয়ার পেতে ওদের বেলতলাটায় বসেছিলুম, সেখানে কেবল আড্ডাই হল। বেলা যখন বেশ পড়ে এসেচে তখন গেলাম ঠাকুরমাদের বেলতলায়, ফিরচি, একজন লোক

* 'পথের পাঁচালী'তে এই আমগাছটির উল্লেখ আছে—সম্পাদক।

জটেমারীর কুঠি খ্‌ুঁজচে, আমাদের বাড়ির পাঁচিলের কাছে। তারপর নিজে গেলাম বেলেডাঙার পুলটায়। একখানা যেন ছবি, যখন প্রথম অশ্বত্থতলার পথটা থেকে ওপারের দৃশ্যটা দেখলাম—এ রকম অপূর্ব্ব গ্রাম্যদৃশ্য ক্কচিৎ চোখে পড়ে। বেলেডাঙা গ্রামের বাঁশবনের সারি নদীর হাওয়ায় মাথা দোলাচ্চে, কৃষক-বধূরা জল নিতে নামচে বাঁওড়ের ঘাটে। দুপারে সবুজ আউসের ক্ষেত, মজুরেরা টোকা মাথায় ক্ষেতে ক্ষেতে ছাঁটার কাজ করচে, ছোট ডোঙা চেপে কেউ বা মাছ ধরতে বেরিয়েচে—যেন ওস্তাদ শিল্পীর আঁকা এক অপূর্ব্ব ভূমিশ্রীর ছবি।

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় মোট নিয়ে পাঁচপোঁতা থেকে ফিরচে—গোঁসাইবাড়ির কাছে বাসা করেচে, বললে—নাম বঙ্কুবিহারী চট্টোপাধ্যায়। দেখে ভারী কষ্ট হল—একা ভাগ্যহীন, অসহায় মানুষ। বললে, শীতলা ঠাকুর নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেড়াই—যে যা দেয়, তাতেই চলে। বাড়িতে এক ছোট ছেলে আছে, ও দুটি মেয়ে।

বসে বসে অনেকক্ষণ হাওয়া খেলুম, সঙ্গে সঙ্গে কত দেশের জীবনধারার কথা, বিশেষ করে যারা দুঃখ পেয়েছে তাদের কথাগুলো বড় বেশী মনে হল। ভরতের মা দিন-রাত দুঃখ করচেন, তাঁর দুঃখ শুনে সত্যি মনে কষ্ট হয়। কষ্ট হয় এই ভেবে জগতের এত আনন্দ-ধারার এক কণাও এরা পাচ্চে না—হয়তো শুধু দেখবার চোখ নেই বলেই।

ফিরবার পথটি আজ এত ভাল লাগল, ওরকম কোন দিন লাগে না—ডাঁশা খেজুর ও নোনা ডালে ডালে দুলচে—এত পাখীর গানও এদেশে আছে!...কুঠির মাঠটা যে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে—ইতস্ততঃ প্রবর্দ্ধমান গাছপালা বনঝোপের সৌন্দর্য্যে বিশেষ করে যেখানে সেখানে, যেদিকে চোখ যায়—ফুলে-ভরা সোঁদালি দোলায়িত। আকাশের রঙটা হয়েচে অদ্ভুত—অপূর্ব্ব নির্জ্জনতা শুধু পাখীদের কল-কাকলীতে ভগ্ন হচ্চে—কেউ কোনো দিকে নেই—ধূসর আকাশতলে গভীর শান্ত ও ছায়ার মধ্যে কেবল আমি ও মুক্ত উদার প্রকৃতি।

কি অপূর্ব্ব আনন্দেই মন ভরে যায়, কত কথাই মনে ওঠে, সাধ্য কি কলকাতায় থাকলে এ সব কথা মনে উঠতে পারে!...

তারপর ওপাড়ার ঘাটটিতে স্নিগ্ধ জলে স্নান করতে নেমে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। শ্যামল, ধূসর বৃক্ষশ্রেণী, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, স্বচ্ছ নদীজল—মাথার ওপরে সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি উঠেচে, সেদিকে চেয়ে কত শত নক্ষত্রমণ্ডলী, বিভিন্নমুখী নক্ষত্রস্রোত, অন্য অন্য নীহারিকাদের জগতের কথা মনে হল। বৃহৎ এণ্ড্রোমিডা নীহারিকাদের জগৎ। এই সামান্য, ক্ষুদ্র গ্রহটাতে যদি অস্তিত্বের এত বৈচিত্র্য, এত সরসতা, এত সৌন্দর্য্য—তবে না জানি সে-সব বিশ্বে কি অপরূপ আনন্দস্রোত!...

সব দুঃখের একটা সুস্পষ্ট অর্থ হয়। জীবনের একটা মহান্, বিরাট অর্থ, একটা সুস্পষ্ট রূপ মনের চোখে ফুটে ওঠে। নির্জ্জন স্থান ভিন্ন, পারিপার্শ্বিকের পরিবর্ত্তন ভিন্ন,—এ আনন্দ কি সম্ভব?...

...সন্ধ্যার পরে আমি, সইমা, নদি অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। আজকার রাতটা কালকার মত গরম নয়, শেষ রাত্রে মেঘ করার দরুন বেশ ঠাণ্ডা। সারারাত লণ্ঠন ধরে ধরে লোকেরা ও ছেলেদের দল আমাদের বাড়ির পিছনের ঘন জঙ্গলের ওপারের বাগানগুলিতে আম কুড়িয়েচে, সারা রাতটি।

কি সুন্দর বৈকালটি কাল কাটলো যে! কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসে! পরে নদীজলে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্নান করতে নামা গেল। এত অপূর্ব্ব ভাব এল মনে,

ঠান্ঠা নদীজল, ছিপি-শেওলার পাতার ধারে দাঁড়িয়ে, ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশ ও শ্যামল গাছগুলোর দিকে চোখ রেখে শুধু এদের পিছনে যে বিরাট অবর্ণনীয় শক্তি জাগ্রত আছে, তার কথাই বার বার মনে আসছিল। স্বচ্ছ জলের ভেতরে মাছের দল খেলা করচে—একটা ছোট মাছ তিড়িং করে লাফিয়ে শেওলার দামের গায়ে পড়ল। নদী-জলের আর্দ্র সুগন্ধ উঠচে—ওপারে মাধবপুরের পটোলের ক্ষেতে তখনও চাষারা নিড়েন দিচ্চে—বাদাম গাছের মাথায় একটা নক্ষত্র উঠেছে। সারাদিনের গুমটের পর শরীর কি স্নিগ্ধই হল!...

শেষ রাত্রে বেজায় গুমট গরমে আইঢাই করচি এমন সময় হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি এল। নদি, জেলি, বুড়ি-পিসিমা, জেলে পাড়ার ছেলেরা অমনি আম কুড়তে ছুটল। ঘন অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠন জেবলে সব ছুটল চাটুয্যে বাগানের দিকে। জেলির মা চেঁচিয়ে পিছু ডাকাতে জেলি আবার ফিরে এল।...

সকালটার সিঁদুরে মেঘে অপরূপ শোভা হয়েছিল। পরশু বৈকালটিতে এই রকমই সিঁদুরে মেঘ করেছিল—আমি সেটা উপভোগ করতে পারি নি, গোপাল-নগরের হাটে গিয়েছিলাম।

আজ প্রায় বাইশ বছর পরে ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম। কিন্তু কাল সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বেলেডাঙার মাঠে যে অদ্ভুত মনের রূপ ও প্রকৃতির রূপ দেখেছিলাম, অমন কখনো দেখি নি। কাঁচিকাটার পুল থেকে ফিরবার পথে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুড়োর পত্রটা পকেট থেকে পড়চি—প্রমীলা মারা গিয়েচে লিখচে। সামনে অপূর্ব্ব রঙের আকাশটা ঘন হীরাকসের সমুদ্রের মত গাঢ় ময়ূরকণ্ঠী রঙের, পিছনে বর্ণ-সমুদ্র, কোথাও জনমানব নেই—গাছে গাছে পাখীর ডাক, দূরে গ্রামসীমায় পাপিয়া সুর উঠিয়েচে,—জীবনের অপূর্ব্বতা কি চমৎকার ভাবেই...সন্ধ্যার ছায়াচ্ছন্ন আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল!...

কাল বৈকালের দিকে বেলেডাঙার বট-অশ্বত্থের পথটা বেয়ে বেড়াবো বলে, কুঠির মাঠের পথটা দিয়ে চললুম সেদিকে—মাঠে পড়েই অবাক হয়ে পশ্চিম আকাশে চেয়ে রইলুম—মুগ্ধ আত্মহারা হয়ে গেলুম। সারা বেলেডাঙার বনশ্রেণীর ওপর ঘন কালো কালবৈশাখীর ঝোড়ো মেঘ জমেচে—অনেকটা আকাশ জুড়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকার মেঘচ্ছটা—আর তার ছায়ায় চারিধারের বাঁশবন, ঘন সবুজ শিমুল ও বটগাছগুলো, নীচের আউশের ক্ষেত, বাঁওড়—সবটা জড়িয়ে সে এক অপরূপ মূর্ত্তি ধরেচে। বিশেষ করে ছবি দেখতে মারাত্মক রকমের সুন্দর হয়েচে এক শিমুল ডালের—তার সোজা মগ-ডালটা মেঘের ছায়ায় ও উড়নশীল ঘন কালো মেঘে ঢাকা আকাশের পটভূমিতে কোনো দেবশিল্পীর আঁকা মহনীয় ছবির মত অপূর্ব্ব। সেইটি দেখে চোখ আর আমার ফেরে না—কেমন যেন পা আটকে গেল মাটির সঙ্গে, অবশ হয়ে গেলুম, দিশাহারা হয়ে পড়লুম—ওঃ!—সে দৃশ্যটার অদ্ভুত সৌন্দর্য্যের কথা মনে এলে এখনও সারা গা কেমন করে ওঠে।

তারপরই সাঁ-সাঁ রবে ওপরের দিক থেকে বিরাট ঝড় উঠলো—দৌড়, দৌড়, দৌড়,—হাঁপাতে হাঁপাতে যখন গেঁয়োখালী আমতলাটায় পৌঁছিয়েছি—আমাদের গ্রামের কোলে—তখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করেচে—জেলি আর প্রিয়-জেলের ছেলে আম কুড়ুচ্চে—একটি দরিদ্র যুবককে আগ্রহ সহকারে আম কুড়ুতে দেখে চোখে জল এল। কি দিয়েচে জীবন এদের? অথচ এরা মহৎ, এদের দারিদ্র্যে এরা মহৎ হয়েচে। অতিরিক্ত ভোগ ও সাচ্ছল্যে জীবনের সরল ও বন্ধুর পথটাকে হারায় নি।—

স্নান সেরে এসে বকুলতলার ছায়ায় বসে ওপরের কথাগুলো লিখলাম। মাথার ওপর কেমন পাখীরা ডাকচে—ফিঙে, দোয়েল, চোখ-গেল—আর একটা কি পাখী—পিড়িং পিড়িং করে ডাকচে, কত কি অস্ফুট কলকাকলী—কি ভালই লাগে এদের বুলি!...

আজ বৈকালে হাট থেকে এসে কুঠির মাঠে অনেকক্ষণ বসলুম। শিমুল-গাছের এত অপরূপ শোভা তা তো জানতাম না। ঝোপের মাথায় মাথায় কি নতুন কচি লতা সাপের মত খাড়া হয়ে আছে। মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল সৌন্দর্য্যের ভারে—চারিধারে চেয়ে—এই প্রকৃতির সঙ্গে, পাখীর গানের সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের যোগ আছে বলেই এত ভাল লাগে। গ্রাম-প্রান্তরে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন বেণুবনশীর্ষের দিকে চেয়ে মনে হল ওদের সঙ্গে কতদিনের কত স্মৃতি যে জড়িত—সেই বর্ষার রাতে দিদির কথা, মায়ের কত দুঃখ, আতুরী ডাইনীর ব্যর্থতা, পিসিমা ইন্দির ঠাকরুণের,—কত সমুদ্রে যাওয়ার স্মৃতি—সেই পিটুলিগোলা-পানকারী দরিদ্র বালকের, পল্লীবালা জোয়ানের, কতকাল আগের সে-সব ইংরাজ বালক-বালিকার, গাং-চিল পাখীর ডিম সংগ্রহ করতে গিয়ে যারা বিপন্ন হয়েছিল—Cape Wan-এর ওদিকে গিয়ে যারা আর ফেরেনি—কত কি, কত কি।

নদীজলও আজ লাগল অদ্ভুত—শান্ত সন্ধ্যা—কেউ নেই ঘাটে, ওপারের গাছপালায় ধূসর সন্ধ্যা নেমেচে—একটি নক্ষত্র উঠেচে মাথার ওপর—কোনো অনন্ত দেশের বাণীর মত এই শত দৈন্যসংকীর্ণতাময় সংসারের ঊর্দ্ধে জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বলচে।

এখানকার বৈকালগুলো কি অপূর্ব্ব! এত জায়গায় তো বেড়িয়েচি, ইসমাইলপুর, ভাগলপুর, আজমাবাদ—কিন্তু এখানকার মত বৈকাল আমি কোথাও দেখেচি বলে মনে হয় না—বিশেষ করে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মেঘহীন বৈকালগুলি—যেদিন সূর্য্য অস্ত যাবার পথে মেঘাবৃত না হয়, শেষ রাঙা আলোকটুকু পর্য্যন্ত বড় গাছের মগ্‌ডালে হালকা সিঁদুরের পোঁচের মত দেখা যায়—সেদিনের বৈকাল। গাছের ও বাঁশবনের ঘন ছায়ায় চাপা আলো, ডাঁশা খেজুর ও বিল্বপুষ্পের অপূর্ব্ব সুরভি মাখানো, নানা ধরনের পাখী-ডাকা, মিষ্ট সে বৈকালগুলিতে এমন সব অদ্ভুত ভাব মনে এনে দেয়, দু-একটা পাখী ধাপে ধাপে সুর উঠিয়ে কোথায় নিয়ে তোলে—কি উদাস, করুণ হয়ে ওঠে তখন চারিদিকের ছবিটা, বিশেষ করে আমি যখন আমাদের ভিটে ও ঠাকুমাদের বেলতলাটায় গিয়ে খানিকক্ষণ বসেছিলাম, তখন—তার আর বর্ণনা দেওয়া যায় না! আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ, কিন্তু এখনও বিল্বপুষ্পের গন্ধ সর্ব্বত্র, পাখীর ডাকের তো কথাই নেই—সোঁদালিফুল এখনও আছে, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা যেন কিছু কম। আমাদের বাগানে এখনও আম আছে, আজ সকালে নদী থেকে আসবার পথে লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনও লোক তলায় তলায় আম কুড়ুচ্চে।

এ সৌন্দর্য্য ছেড়ে কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম, যত স্থানে বেড়িয়েচি, আনন্দ সব চেয়ে বেশী গাঢ় ও উদাস ভাবে আমি পাচ্চি শুধু এই এখানে—কোনো Cosmic thoughts আটকায় না, বরং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়—খুব ভাল করে ফোটে। তবে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মধ্যে দিনরাত ডুবে থাকা যায় বলেই এখানে কোনো শ্রমজনক কাজ করা সম্ভব হয় না দেখলুম। বিকেল হতে না হতে কেবল মন আন্‌চান্ করে—রাত্রিতে কাজে মন বসে না—এ যেন Land of Lotus-eaters. কোনো শ্রমসাধ্য কাজ এখানে সম্ভবপর নয়, সেই জন্যই কলকাতা ফিরতে চাচ্চি দু-একদিনের মধ্যে। আজকাল দিনগুলো একেবারে মেঘমুক্ত, রাত্রি জ্যোৎস্নায়

ভরা, সকালগুলি স্নিগ্ধ, পাখীর ডাকে ভরপুর আর বৈকাল তো ওইরকম স্বর্গীয়, এ পৃথিবীর নয় যেন—তবে আর লিখি কখন?

মনে মনে তুলনা করে দেখলুম এ ধরনের বৈকাল সত্যিই কোথাও দেখি নি—এই তো পাশেই চালকী, ওখানে এরকম বৈকাল হয় না। এত পাখী সেখানে সেই, এ ধরনের এত বেলগাছ নেই, সোঁদালি ফুল নেই, বনজঙ্গল বড় বেশী, কাজেই অন্ধকার—এমন চাপা আলোটা হয় না—এ একটা অপূর্ব্ব সৃষ্টি. এতদিন তত লক্ষ্য করি নি, কাল লক্ষ্য করে দেখে মনে হল সত্যিই তো এ জিনিস আর কোথাও দেখি নি তো! দেখবোও না—কেবলমাত্র সেখানে দেখা যাবে যেখানকার অবস্থাগুলি এর পক্ষে অনুকূল। ইসমাইলপুর, আজমাবাদ লাগে না এর কাছে—সে অন্য ধরনের প্রাচুর্য্য, বৈচিত্র্য ও কারুকার্য্য কম—বিপুলতা বেশী, প্রখরতা বেশী।

ভাগলপুর তো লাগেই না। কতকগুলো বিশেষ ধরনের পাখী, বিশেষ ধরনের বন-বিন্যাস, বিশেষ ধরনের গাছপালা থাকাতে এ অঞ্চলেই মাত্র ঠিক এই ধরনের বৈকাল সম্ভব হয়েচে। সোঁদালি ফুল তার মধ্যে একটা বড় সম্পদ, মাঠে, বনে ওর ঝাড় যখন ফুটে থাকে তখন বনের চেহারা একেবারে বদলে যায়—বনদেবীর সাজির একটা অযত্নচয়িত বনফুলের গুচ্ছের মত নিঃসঙ্গ মনে হয়—এই নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য ওকে যে শ্রী ও মহিমা দান করেচে—তা আর কোনো ফুলে দেখলাম না।

এই সুন্দর দেশে বাস করেও যারা মানসিক কষ্ট পাচ্ছে, আমার সইমার মত—তাদের সে কষ্ট সম্ভব হচ্চে শুধু অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের জন্য। মনের সাহস এদেশটা হারাতে বসেচে—কল্পনার উদারতা নেই, সুদৃঢ় বিস্তীর্ণতা নেই—দৃষ্টি সেকেলে ও একপেশে, তার ওপর মনের মধ্যে জ্বলে নি জ্ঞানের বাতি। এত করে সইমাকে বোঝাই, সে শিক্ষা সইমা নেয় না, নিতে পারবেও না—কতকগুলো মিথ্যা সংস্কার ও কাশীরাম দাস এবং কৃত্তিবাস ওঝার প্রচলিত কতকগুলো False Philosophy এদেশের অশিক্ষিতা মেয়েদের মনের সর্ব্বনাশ করেচে। জীবনের সহজ দর্শন এদের নেই, বুড়ো বয়সেও ভাল করে এখনও চোখ ফোটেনি—কি করা যায় এদের জন্যে, সর্ব্বদাই সে কথা ভাবি। শিক্ষা দ্বারা মানুষ নিজেকে নিজে পায়, এইটাই জীবনের বড় লাভ। ভগবানকে পাবার আগে নিজেকে লাভ করা যে আবশ্যক তা এরা ভুলে গিয়ে শুধু ভগবান, ভগবান বলে নাকে কাঁদতে থাকে, নিতান্ত দুর্ব্বল জড়মতির মত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য" এ কথা এরা শোনেও নি কোনোদিন।

সারা পল্লী-অঞ্চলগুলো এমন হয়ে আছে, এদের দুঃখ দূর করতে গেলে তো জঙ্গল কাটালে হবে না, মশা তাড়ালেও হবে না (সেটা যে অনাবশ্যক, তা আমি বলচি না) মাসিক কিছু অর্থ সাহায্যের বন্দোবস্ত করলেও হবে না—এর জন্যে চাই জ্ঞানের আলো—উদার, বিপুল, দীপ্ত জ্ঞানের সার্চ্চ-লাইট।

আজ অনেকক্ষণ দাসী পিসিমার সঙ্গে গল্প করলুম। সেকালের অনেক কথা হল। ওই সবই আমার জানবার বড় ইচ্ছে। ঠাকুমাদের চণ্ডীমণ্ডপের ভিটাতে দুর্গোৎসব হত, বড় উঠোন ছিল—আন্নাপিসি দুবেলা গোবর দিতেন, খুব লোকজন খেত—নারকেল গাছের পাশে ওই যে সুঁড়ি গলিটা ছিল খিড়কির দোর—মেটে পাঁচিল ছিল ওদিকটা। গোলক চাটুয্যে ছিল বাবার মামাতো ভাই—পিসিমার মা ছিলেন ব্রত চাটুয্যের পিসি। রাখালী পিসিমা ছিলেন চন্দ্র চাটুজ্যের মেয়ে। প্রসঙ্গত বলা যাক যে আজই রাখালী পিসিমার মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেল। যাবো যাবো করে আর ঘটে উঠল না। পিসিমার শ্বশুরবাড়ি ছিল চৌবেড়ে। নিবারণ রাখালী পিসিমার ভাই, ভারি সুন্দর দেখতে ছিল—কলেরাতে মারা যায় আঠারো বছর বয়সে। সইমাদের

বাড়িতে আসার সময় ওই পথটাতে প্রকাণ্ড এক বকুল গাছ নাকি ছিল—তার তলায় অনেক লোক বসতো। হরি ঠাকুরদাদা তাঁর মাকে খেতে দিতেন না, মায়ের সঙ্গে ভিন্ন ছিলেন, তাঁর দেওর গোসাঁই-বাড়ি ঠাকুরপুজো করে দু-পাঁচ টাকা যা জমাতো, তাই দিয়ে দরিদ্র বৃদ্ধাকে ধান কিনে দিয়ে যেতো।

বৈকালে নলে জেলের নৌকোতে বেড়াতে গেলুম মোল্লাহাটির দিকে। ছ'টার সময় আমাদের ঘাট থেকে নৌকোখানা ছাড়া হল। নদীর দুধারে অপরূপ শোভা, কোথাও বাবলা গাছ ফুলের ভারে নত হয়ে নদীর ধারে ঝুঁকে আছে, দুধারে ঘাস-ভরা নির্জ্জন মাঠ, ঝোপেঝাড়ে ফুল ফুটে আছে, গাঙ্ শালিকের দল কিচ্-কিচ্ করচে, বাঁ ধারে ক্রমাগত জলের ধারে ধারে নলবন, ওক্ড়া ও বন্যেবুড়োর গাছ--মাঝে মাঝে চাষীদের পটোল ক্ষেত, বেলডাঙার ঘোষেরা যে নতুন ক্ষেতটাতে পটোল করেচে, তাতে টোকা মাথায় উত্তুরের মজুরেরা নিড়েন দিচ্চে, ওদিকে কুমড়োর ক্ষেত—ঢালু সবুজ ঘাসের জমি জলের কিনারা ছুঁয়ে আছে, গরু চরছে, বাঁকের মোড়ে দূরে খাব্‌রাপোতা গ্রামের বাঁশবন, সুবৃহৎ lyre পক্ষীর পুচ্ছদেশের মত নতুন বাঁশের আগা—একটু একটু রোদ মাখা। নদীজলের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা গন্ধ বেরুচ্চে, মাথার ওপরকার আকাশ ঘন নীল, কিন্তু পশ্চিম দিগন্তে গ্রামসীমায় শিমুল, কদম গাছের মাথায় মাথায় অপরূপ মেঘস্তূপ, মেঘের পর্ব্বত—মেঘের গিরিবর্ত্মের ফাঁকটা দিয়ে অস্তসূর্য্যের ওপারের দেশের খানিকটা যেন দেখা যায়।

খানিকটা গিয়ে একধারের পাড় খুব উঁচু, বন্য নিমগাছের সারি, পাড়ের ধারে গাঙ্ শালিকের গর্ত্ত, নীল মাছরাঙা পাখী শেওলার ধারে ধারে মাছ খুঁজতে খুঁজতে একবার ওঠে, একবার বসে—খেজুরগাছ, গাবভেরাণ্ডা, বৈঁচি, ফুলে ভর্ত্তি সাঁই বাবলা, আকন্দের ঝোপ, জলের ধারের নলবন, কাশ, যাঁড়া নোনা, গুলঞ্চলতা-দোলানো শিমুল গাছ, শালিক পাখী, খেঁকশিয়ালী, বাঁশঝাড়, উইঢিবি, বনমুলোর ঝাড়, বকের দল, উঁচু ডালে চিলের বাস, উলুঘাস, টোপাপানার দাম। সামনেই কাঁচিকাটার খেয়াঘাট, দুখানা ছোট চালাঘর, জনকতক লোক পারের অপেক্ষায় বসে—ডানধারের আকাশটায় অপূর্ব্ব হীরাকসের রঙ ধরেচে—গাঢ় নীল।

আবার দুপাড় নির্জ্জন, এক এক স্থানে নৌকা তীরের এত নিকট দিয়ে যাচ্ছে যে কেলেকোঁড়া ফুলের গন্ধ পাওয়া যায়। বেলা আরও পড়ে এল, চারিদিকে শোভা অপরূপ, লিখে তা প্রকাশ করা যাবে না, ডাইনে ঘন সবুজ ঘাসের মাঠ, বামে আবার উঁচু পাড়, আবার বাবলা গাছ, শিমুল গাছ, যাঁড়া গাছ, পাখীর দল শেষ-বেলায় ঝোপে ঝোপে কলরব করচে—দূরে গ্রামের মাথায় মেঘস্তূপ পেছনে পড়েচে—এক এক স্থানে নদীজল ঘোর কালো, নিথর কলার পাতার মত পড়ে আছে—দেখাচ্চে যেন গহন, গভীর অতলস্পর্শ। বাঁকটা ঘুরেই অনেকখানি আকাশ এক সঙ্গে দেখা যাচ্চে, পশ্চিম আকাশের কোলে যেন আগুন লেগেচে—অনেকখানি দূর পর্য্যন্ত মেঘে, আকাশে, গাছের মাথায় মাথায় যেন সে আগুনের আভা, খাব্‌রাপোতার ঘাটের পাশে কোন দরিদ্র কৃষক-বধূ জলের ধারের কাঁচড়াদাম শাক কোঁচড় ভরে তুলচে আর মাঝে মাঝে সলজ্জ-ভাবে আমাদের নৌকোর দিকে চাইচে।

আরও খানিকদূর গেলাম, আবার সেই নির্জ্জনতা, কোথাও লোক নেই, জন নেই, ঘরবাড়ি নেই, শুধু মাথার ওপর সন্ধ্যার ধূসর ছায়াচ্ছন্ন আকাশ আর নীচে সেই মাঠ ও গাছপালা দুধারে। বুড়ো ছকু মাঝি ছেলে সঙ্গে নিয়ে দুখানা ডিঙি দোয়াড়ি বোঝাই দিয়ে চূর্ণি নদীতে মাছ ধরতে যাচ্চে, তিন দিনে সেখানে পৌঁছুবে

বললে। একদিকে ঘন সবুজ কাঁচা কষাড়ের বন, নীচু পাড়, জলের খানিকটা পর্যন্ত দাম-ঘাসে বোঝাই, কলমী শাক অজস্র, আর কলমীর দামে জলপিপি ও পানকৌড়ী বসে আছে। মাথার ওপরকার আকাশটা বেয়ে সবাইপুরের মাঠটার দিক থেকে খুব বড় এক ঝাঁক শাম্‌কুট পাখী বাসায় ফিরচে, বোধ হয় জটেমারির বিল থেকে ফিরলো, পাঁচপোতার বাঁওড়ে যাবে। সেইখানটাতে আবার নলে মাঝি কাস্তে হাতে ঘাস কাটতে নামলো—কি অপরূপ শোভা, সামনে খাব্‌রাপোতার ঘাটটা—একটা শিমুল গাছের পিছনে আকাশে পাটকিলে রঙের মেঘদ্বীপ, চারিধারে এক অপূর্ব্ব শ্যামলতা, কি শ্রী, কি শান্তি, কি স্নিগ্ধতা, কি অপূর্ব্ব আনন্দেই মন ভরিয়ে তোলে—নলে কাস্তে হাতে ঘাস কাটচে—কাঁচা কষাড়ের মিষ্ট, সরস জোলো গন্ধ বার হচ্চে, আমি শুধু হেলান দিয়ে বসে দূরের আকাশটা ও গাছপালার দিকে চেয়ে আছি।

জীবনটাকে উপভোগ করতে জানতে হয়। মাত্র আট আনা খরচ হল—তাই কি? তার বদলে আজ বৈকালে যে অপূর্ব্ব সম্পদ পেলাম, তার দাম দেয় কে? আমাদের গ্রামের কেউ আসতো পয়সা খরচ করে খামোকা নৌকায় বেড়াতে? কেউ গ্রাহ্য করে এই অপরূপ বনশোভা, এই অস্তদিগন্তের ইন্দ্রজাল, এই পাখীর দল, এই মোহিনী সন্ধ্যা?...কেউ না। এই যে সৌন্দর্য্যে দিশেহারা হয়ে পড়চি, মুগ্ধ, বিস্মিত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠচি—এই সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে থেকেও এরা কেউ চোখ খুলে চায়?...আমি এসব করি বলে হয়তো আমাকে পাগল ভাবে।...

যে জাতির মধ্যে সৌন্দর্য্য-বোধ দিন দিন এত কমে যাচ্চে, সে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব সন্দেহ হয়। শহর-বাজারের কথা বাদ দিলাম, এই সব পাড়াগাঁয়ে যেখানে আসল জাতিটা বাস করে, সেখানকার এই কুশ্রী জীবনযাত্রার প্রণালী, দৃষ্টির এই সংকীর্ণতা, এই শিল্পবোধের অভাব মনকে বড় পীড়া দেয়।

এবার জ্যোৎস্না উঠলো—আজ শুক্লা একাদশী, নলবন বাতাসে দুলচে, জ্যোৎস্না পড়ে দুপাশের নদীজল চিক্‌-চিক্‌ করচে। ঘাসের আঁটি বেঁধে নিয়ে নলে মাঝি নৌকা ছেড়ে দিল।

এত পাখী, গাছপালা, নীল আকাশ, এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য এ সব যেন আমারই জন্যে সৃষ্ট হয়েচে। এদেশেই তো এসব ছিল এতদিন, কেউ তো দেখে নি, কেউ তো ভোগ করে নি—কতকাল পরে আমি এদের বুঝলাম, এদের থেকে গভীর আনন্দ পেলাম, এদের রসধারা পান করে তৃপ্ত হলাম—এই জ্যোৎস্না, এই আকাশ, এই অপূর্ব্ব ইছামতী নদী আমারই জন্য তৈরী হয়েচে!

অনেক দিন পরে আমাদের ঘাটে দুপুরে স্নান করতে গিয়েছিলুম। স্নান সেরে এই রৌদ্রদীপ্ত নদী, দূরের ঘুঘু-ডাকা বনানী, উষ্ণমণ্ডলের এই অপূর্ব্ব বন-সম্পদ, স্বচ্ছ জলের মধ্যে সন্তরণশীল মৎস্যরাজি, নির্ম্মেঘ নীল আকাশ—আমার শিরায় শিরায় কেমন একপ্রকার মাদকতার সৃষ্টি করল।

একটি ছেলের ছবি মনে এল—সে এমনি Tropics-এর শ্যামল সৌন্দর্য্য, রৌদ্র-করোজ্জ্বলা পৃথ্বী, নীল দিক্‌চক্রবালের উদার প্রখরতার মধ্যে এই জলধারা পান ক'রে, দিনরাত গায়ক পাখীদের কাকলী শুনে শৈশবে মানুষ হয়েছিল—গ্রামের কত দুঃখ-দারিদ্র্য, কত বেদনা, কত আনন্দ, কত আশা, কত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে। সে মানুষ হয়ে উঠে এদের গান গেয়ে গেল—এই গাছপালা, লতা, পাখী, ফুলফল, সূর্য্য—এদের—এরাই তাকে কবি করেছিল।

বৈকালে হাট থেকে এসে বইখানা নিয়ে নিজের ভিটেতে গিয়ে খানিকটা পড়ে

এলন্ম—তারপর গেলন্ম জটেমারির প্নলটাতে। ঝির্‌ঝিরে বাতাসে শরীর জন্ড়িয়ে গেল। তারপর এক বড় অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল, এমন এক অপ্‌ব্বর্ব আনন্দে মন ভরে উঠল, সারা গা এমন শিউরে উঠল—সে প্নলকের, সে উল্লাসের তুলনা হয় না—গত কয়েক মাসের কেন, সারা বৎসরের মধ্যে ওরকম আনন্দ পাই নি।

আজ চলে যাবো, তাই বিদায় নিলন্ম—বিদায় জ্যাঠামশায়ের পোড়ো ভিটে, বিদায় আমার গ্রাম, বিদায় ইছামতী, আবার তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে জানি না, আর দেখা হবে কিনা তাও জানি না, কিন্তু তোমার ফলে জলে প্নষ্ট হয়েচি, তোমার অপর্‌প সৌন্দর্য্যে এমন স্বপ্ন-অঞ্জন মাখিয়ে দিয়েছিলে দশ বৎসরের বালকের চোখে, তোমার গাছপালার ছায়াতলে, তোমার পাখীর কল-কাকলীতে জীবন-নাট্যের অংক শন্র্‌, বিদায়, বিদায়—যেখানে থাকি তোমাদের কথা কি কখনো ভুলবো?...

মনে হয় যন্গে যন্গে এই জন্মমৃত্যুচক্র কোনো এক বড় দেব-শিল্পীর হাতে আবর্ত্তিত হচ্চে, হয়তো দন্ হাজার বছর আগে জন্মেছিলাম ঈজিপ্টে, যেখানে নল-খাগ্‌ড়ার বনে, শ্যামল নীল (Nile) নদের রৌদ্রদীপ্ত তটে কোন দরিদ্র ঘরের মা, বোন, বাপ, ভাই, বন্ধন্বান্ধবদের দলে এক অপ্‌ব্বর্ব শৈশব কেটেচে, তারপর এতকাল পরে আবার ষাটটি বছরের জন্যে এসেচি—এখানে আবার অন্য মা, অন্য বাপ, অন্য ভাই-বোন, অন্য বন্ধন্জন। পাঁচ হাজার বছর পরে আবার কোথায় চলে যাবো কে জানে? এই Cycle of Birth and Death যিনি নিয়ন্ত্রিত করচেন আমি তাঁকে কল্পনা করে নিয়েচি—তিনি এক বড় শিল্পী। এই সকল জন্মের সন্খ-দন্ঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা হয়তো কোন দ্‌র জীবনের উন্নততর, বৃহত্তর, বিস্তৃততর অবস্থায় সব মনে পড়বে—সে এক মহনীয়, বিপন্ল, অতি কর্‌ণ অভিজ্ঞতা।

কে জানে যে আবার এ পৃথিবীতেই জন্মাবো। ওই যে নক্ষত্রটা বটগাছের সারির মাথায় সবে উঠেচে—ওর চারি পাশে একটা অদৃশ্য গ্রহ হয়তো ঘন্রচে, তার জগতে যেতে পারি—বহন্ বছরের Globular cluster-দের জগতে যেতে পারি—কে বলবে এসব শন্ধন্ই কল্পনা-বিলাস? এ যে হয় না তা কে জানে? হয়তো নিছক কল্পনা নয় এসব—বৃহত্তর জীবন-চক্র যন্গে যন্গে কোন অদৃশ্য দেবতার হাতে এ ভাবেই আবর্ত্তিত হচ্চে।

শত শত জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে যাঁর চলাচলের পথ—জয় হউক সে দেবতার, তাঁর গতির তেজে সম্মন্খের ও পশ্চাতের অমন্ক্তির অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় হউক, নিত্যসৃষ্টি জীয়মান হউক—তাঁর প্রাণ-চক্রের নিত্য আবর্ত্তনশীল বিশাল পরিধিতে।

গন্ন্‌ গন্ন্‌ করে বানিয়ে বানিয়ে গাইলন্ম, আপনিই মন্খে এসে গেলঃ—

'গভীর আনন্দর্‌পে দিলে দেখা এ জীবনে
হে অজানা অনন্ত—'

নিজেকে দিয়ে বন্ঝেচি তুমি কত বড় শিল্পী, নিজের দৃষ্টি দিয়ে বন্ঝেচি তুমি কত বড় দ্রষ্টা, নিজের সৃষ্টিকে দিয়ে বন্ঝেচি তুমি কত বড় স্রষ্টা।

হঠাৎ সারা দেহ এক অপ্‌ব্বর্ব আনন্দে ভরে উঠল—ওপারে মাধবপন্রের বটগাছের সারি, বেলেডাঙ্গার গ্রামের বেণন্বনশীর্ষ সান্ধ্য বাতাসে দন্লচে, আউশধানের ক্ষেতের আইল-পথ বেয়ে কৃষক-বধ্‌ মাটির কলসী নিয়ে জল ভরতে আসচে, আইনদ্দি মোড়লের বাড়ির মাথায় শন্ক্রতারা উঠেচে—মনে হল আমি দীন নয়, দন্ঃখী নয়, ক্ষন্দ্র নয়, মোহগ্রস্ত জড় মানব নয়, আমি জন্মজন্মান্তরের পথিক-আত্মা। দ্‌র থেকে কোন সন্দ্‌রের নিত্য ন্‌তন পথহীন পথে আমার গতি—এই বিশাল বিশ্ব, এই বিপন্ল

নীল আকাশ, অগণ্য জ্যোতির্লোক, এই সহস্র সহস্র শতাব্দী—আমার পায়ে চলার পথ. নিঃসীম শূন্য বেয়ে সে গতি আমার ও সারা মানবের যুগে যুগে বাধাহীন হোক।

মনে হল আর এক আজন্ম পথিক-দেবতার কথা, তাঁর কথা আমার এক খাতায় লিখেচি। আমার সে কল্পনা সত্য কি মিথ্যা সে বিচারের কোনো প্রয়োজন নেই, আমার দৃষ্টিতে আমি তা দেখেচি, আমার কাছে সেটা মহাসত্য—revelation, চিন্তা ও কল্পনার আলোকে যা দেখা যায়—তাকে আমি মিথ্যা বলে ভাবতে পারি না।

বিদায়, বিদায়—আর কখনো অজয়ের সঙ্গে দেখা হল না, গুরুজীর সঙ্গে দেখা হল না, কথক ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হল না, দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হল না—অনেকদিন পরে অজয়ের সেই শৈশবে-শোনা গানটা যেন কোথায় বসে গাচ্চে মনে পড়ে।

'চরণ বৈ মধু বিন্দতি'—চলা-দ্বারাই অমৃত লাভ হয়, অতএব চলো।

দেশে থেকে এসে আজ একেবারেই ভাল লাগচে না। বৈকালগুলির জন্যে মন কেমন করচে, কুঠীর মাঠের জন্যে, খুকীর জন্যে, ইছামতীর জন্যে, ফণিকাকার জন্যে—সকলের জন্যেই মন কেমন হয়েচে। ছেলেবেলায় দেশ থেকে বোর্ডিং-এ ফিরলে এমনটি হত, অনেক কাল পরে মানস ইতিহাসে তার পুনরাবৃত্তি দেখা গেল।

কাল কলকাতাটা যেন নতুন নতুন লাগছিল—যেন এ কোন্ শহর—এর কর্ম্মব্যস্ত চেহারাতে আমিই কেমন অবাক হয়ে গেলাম, আনন্দবাজার পত্রিকার ওই গলিটি, কলেজ স্ট্রীট, ওয়েলিংটন স্ট্রীট সব তাতেই লোকে একটা কিছু করচে—ব্যস্ত, ক্ষিপ্র, ছুটচে, বাস্ থেকে নামচে—দেশের মানুষদের সে মৃতের মত জড়তা, অলস ও কর্ম্মকুণ্ঠতার পরে এসব যেন নতুন লাগল।

দিনটি কাটল বেশ ভালোই। সকালে উঠে সজনীর সঙ্গে গেলুম কাঁচরাপাড়া, সেখান থেকে বড়-জাগুলে হয়ে মরিচা। এত ঘন বন যে কলকাতার এত কাছে থাকতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করবার প্রবৃত্তি হয় না। সেখানে গিয়ে ঔষধ সংগ্রহ করে কাঁচরাপাড়ায় এলাম। বাস রিজার্ভ করে যাওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে আসা গেল কাঁচরাপাড়া মাঠের মধ্য দিয়ে মোহিত মজুমদারের কাছে। মোহিতবাবু শোনা গেল শা'গঞ্জ গিয়েছেন। কাঁচরাপাড়া বাজারে একটা দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে বাসে করে এলুম হালিসহর খেয়াঘাটে। এই ঘাটে অনেকদিন আগে দিদিমা থাকতে একবার সর্ব্বপ্রথম এসেছিলুম, কেওটা-হালিসহরে থাকতে।

মোহিতবাবুর ওখানে খাওয়া-দাওয়া হল ; অনেকক্ষণ সাহিত্য সম্বন্ধে, বিশেষ করে বর্ত্তমান তরুণ-সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হল। ভদ্রলোক প্রকৃত কবি, সাহিত্যই দেখলুম ওঁর প্রাণ, কবিতা পড়তে বসে যখন ছেলেমেয়েরা তাঁর কোল থেকে টানাটানি করে রসগোল্লা খেতে লাগল—তখন সে কি দৃশ্যই হল!

বেরিয়ে আমি আর মোহিতবাবু কেওটায় প্রসন্ন গুরুমশায়ের পাঠশালায় খুঁজতে খুঁজতে গেলুম। সে জায়গাটা এখন একটা পোড়ো ভিটে ও জঙ্গল—কোণের সে জামরুল গাছটা এখনও আছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জামরুল গাছটা চেনা যাচ্ছিল না—মোহিতবাবু কাছে গিয়ে বললেন—হ্যাঁ, এটা জামরুল গাছই বটে। জামরুল পেকে আছে।

তারপর রাখাল চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করলুম। পুলিন তাঁর ছেলে। ছেলেবেলায় আমরা এক সঙ্গে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় পড়েচি—এখন ও হট্‌পা লম্বা, কালো গোঁপ-দাড়িওয়ালা মানুষ। ওর সঙ্গে কথা বললুম প্রায় ত্রিশ বছর পরে। শেষ

কবে ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম কে জানে?...

রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতরের রোয়াক দিয়ে ওদের রান্নাঘরের রোয়াকে বসে মাসিমার সঙ্গে কথা বললুম। শেষ কবে কথা বলেছিলাম, কবে ওদের রোয়াকে পা দিয়েছিলাম, হয়তো তখন আমরা কেওটাতে ছিলাম—তারপর হয়তো শীতলের মায়ের গল্প বলা, কি আতুরীর কাছে ধামা-কুলো বেচার ঘটনাটা—যা আমার কেওটা সম্পর্কে মনে আছে, ঘটেছিল। তারপরে এক বিরাট আনন্দ, আলাপ, রহস্য, উল্লাস, দুঃখ, হর্ষ, শোক, আলোক-পূর্ণ—বিরাট জীবন কেটেচে—পটপটি তলার মেলায়, বকুলতলার দিনগুলোতে, পুব-মুখো যাওয়ায়, ইছামতীর ধারের সে অপূর্ব্ব শৈশবের আনন্দময় দিনগুলি—সেই কতদিন স্কুল থেকে সপ্তাহ পরে ফিরে এসে মায়ের হাতে চৈত্র মাসের দিনে বেলের পানা খাওয়া, তারপর স্কুল কলেজ, বাইরের জীবনে যা কিছু ঘটেচে সবই ওর পরে। কালকার দিনটিতে আবার এতকাল পরে পা দিলাম, রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতরকার রোয়াকে বা পুলিনের সঙ্গে কথা কইলাম।

জীবনের অপূর্ব্বত্ব এই সব মুহূর্ত্তে কি অদ্ভুত, অপরূপ ভাবেই ধরা পড়ে যায়।

করুণা মামার বাবা যোগীনবাবু জানলা খুলে কথা কইলেন। তিনি আমাকে খুব চেনেন দেখলাম।

রাত আটটার বাসে হুগলী ঘাট এলাম। খুব পরিষ্কার আকাশ, খুব নক্ষত্র উঠেচে। রাত এগারোটায় কলকাতা ফেরা গেল।

সেই সকাল ছ'টায় বেরিয়ে কোথায় বড়-জাগুলে, মরিচা, দুধারের ঘন জঙ্গল, কাঁচরাপাড়া বাজার, বাঁশের পুল, হালিসহরের খেয়াঘাট, কেওটা, হুগলী ঘাট, নৈহাটী —সব বেড়িয়ে ঘুরে আবার কলকাতা ফিরলাম সাড়ে এগারোটা রাত্রে। মোটর বাস্ ছিল বলেই একদিনে এত ঘোরাঘুরি, এমন সব অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা সম্ভব হল।

রাখাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ির পৈটায় বসে মোহিতবাবু 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। কেওটায় সেই অশ্বত্থ্ গাছটার কাছে রাত আটটার সময় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ সাহিত্যমণ্ডলী গঠনের ও 'শনিবারের চিঠি' অন্যভাবে বার করার জন্য খানিকটা পরামর্শ করা হল। কাজে কতদূর হয় বলা যায় না।

কাল মোহিতবাবু কলকাতায় এসেচেন, সজনীবাবু লিখে পাঠালেন। বৈকালে গেলাম প্রবাসী আপিসে। সেখান থেকে বার হয়ে সকলে মিলে প্রথমে যাওয়া গেল ডঃ সুশীল দে-র বাড়ি। সেখানে ঢাকার বর্ত্তমান হাঙ্গামা ও ইউনিভার্সিটির গোলযোগ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল। সজনীবাবুর ব্যক্তিগত কথাও অনেক উঠল —অনেকক্ষণ বসে সেখানে হাসি-গল্প হল, বেশ উপভোগ করা গেল—ডঃ দে আমার ঠিকানা চাইলে বিপদে পড়লাম—এ বাসাটা যদি না বদলাই তবে, বদলে ফেললে এ ঠিকানাটা দিয়েই বা লাভ কি?

সেখান থেকে বার হয়ে সবাই গেলাম কবি যতীন বাগচীর বাড়ি। মনোহরপুকুর রোড তো প্রথমে খুঁজেই বার করা দায়। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বালিগঞ্জ এ্যাভিনিউ বেয়ে আমরা রাত ন'টার সময় একবার এদিক, একবার ওদিক—সে মহামুশ্কিল। অনেক কষ্টে রাত দশটার সময় বাড়ি বেরুল। যতীনবাবু আমাদের দেখে খুব খুশী হলেন। মোহিতবাবু আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন : বললেন, 'অল্পদিনের মধ্যেই ইনি যশস্বী হয়ে উঠেচেন একখানা বই লিখে, luck আছে বলতে হবে।' আমি মনে মনে খুব খুশী হয়ে উঠলাম, যা-ই বলি। তারপর জল-টল খাওয়ার পরে সেখান থেকে অনেক রাত্রে বাসায় ফেরা গেল।

আজও আবার তাই। প্রথমে কেদারবাবুর সঙ্গে এশিয়াটিকদের অকর্ম্মণ্যতা নিয়ে খানিক তর্ক-বিতর্ক হল। উনি বললেন, 'কেন, জঙ্গিস্ খাঁ কি বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নি?' আমি বললুম--সেটা one man show মাত্র, কোনো স্থায়ী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা তিনি করেছিলেন কি?...প্রবাসী আপিস থেকে আমরা গেলুম অমল হোমের বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্প-গুজব ও কবিতা আবৃত্তি হল। অমল হোমের স্ত্রী বললেন, 'একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, আপনার 'অপরাজিত' পড়ে—আমি তাঁকে ডাকি,—পাশের ঘরেই আছেন।'

মেয়রের নির্ব্বাচন সম্পর্কে অনেকগুলো নতুন কথা শুনলাম অমল হোমের মুখে—যতীন সেনগুপ্ত এবার মেয়র না হলে অনেকে দুঃখিত হবে বটে, কিন্তু মেয়র হলে লোকে তাঁর চেয়েও দুঃখিত হবে। বাইরে চেয়ে দেখলাম আকাশে মেঘ করেচে—অনেকটা দূরের আকাশও দেখা যায়—দূরের কথা, দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। এঁরা বেশ শিক্ষিতা মেয়ে, ধরণ-ধারণ এত মার্জ্জিত ও মধুর যে এঁদের সঙ্গে গ্রামের মেয়েদের—সইমা কি বুড়ি পিসিমা--এদের তুলনা করে হতাশ হতে হয়। একটা ভাঙা কড়া এক জায়গায় বসানো ছিল, বেরুবার সময় পায়ে এমন লাগল!...

সেখান থেকে এলাম সুরেশবাবুর বাড়ি। সেখানে হেম বাগচী ও সুবল বসে আছে। সুরেশবাবুর স্ত্রী চায়ের উদ্যোগ করতে আমরা নিবৃত্ত করলাম—কেননা এই-মাত্র অমল হোমের বাড়ি থেকে আমরা চা, পাঁপর ভাজা, বাদাম ভাজা ও রসগোল্লা খেয়ে আসচি। ফরাসী কবি বোদ্‌লেয়ার সম্বন্ধে খানিকটা কথাবার্ত্তা হল, মোহিত-বাবু একটা লেখা পড়লেন—তারপর আমরা সবাই এলাম চলে। মোহিতবাবুর আবৃত্তি কি সুন্দর!

কি সুন্দর সন্ধ্যাটা কাটল!

আজ সকালে ধূর্জ্জটিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে ও সুরেশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে গল্পগুজবের পর আসাম মেলে রাণাঘাট এলাম ও সেখান থেকে সাড়ে তিনটার ট্রেনে দেশে এলাম। হাজারির মোটরটা দাঁড়িয়ে ছিল, সহজেই বাজার পর্য্যন্ত আসা গেল।

এসেই কাপড়-চোপড় ছেড়ে গামছা নিয়ে নদীতে গা ধোবার জন্য গেলাম। ভারি সুন্দর বৈকাল, আকাশের রঙ এমন সুন্দর শুধু বর্ষাকালেই হয়। গাছপালার রঙ কি সবুজ—রোদ্রের রঙটা কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের, কুঠীর মাঠে গেলাম—সেই শিমুলগাছটার গায়ে কি সুন্দর রৌদ্রই পড়েচে- চারি ধারে আকাশের রঙে বড় মুগ্ধ করলে।

আমাদের ভিটার পাশে যে গাছটা আছে, তার গায়ে খানিকটা হলদে রঙের রোদ লেগে দেখতে হয়েচে অদ্ভুত।

মাঠের চারিধারে সবুজ গাছপালা, আউশ ধানের সবুজ ক্ষেত, সুনীল আকাশ, এখনও বৌ কথা-ক' ডাকচে-খুব ডাকচে। সোঁদালি ফুল এখনও কিছু কিছু আছে।

কাল বৈকালে প্রথম গেলাম সুবলবাবুদের বাড়ি বাগবাজারে, সেখানে খানিকক্ষণ গল্প-গুজবের পরে বিভূতিদের ওখানে গেলাম। বাগবাজার ট্রামে আসবার সময়ে মনে ভাবছিলাম সাতাশ বছর আগে এই বর্ষাকালে, তবে বোধ হয় এর আরও কিছু পরে—এই জায়গাটি দিয়ে ট্রামে করে যেতুম বাবার সঙ্গে। তখন আমি নিতান্ত বালক,

আর আজ কেবলই মনে হচ্চে এই সময়ের পরে কলকাতা ছেড়ে দেশে গিয়ে সে কি অপূর্ব্ব জীবন-যাত্রা। কি বৈচিত্র্য! সে শুধু অনুভূতিতে ভরা—নানা ধরনের বিচিত্র বাল্য অনুভূতি!...আসল জীবনটাই তো হল এই অনুভূতি নিয়ে, পুলক নিয়ে, উচ্ছ্বাস নিয়ে। আজও সেই গ্রাম আছে, নদী আছে, কিন্তু সে অপূর্ব্ব অনুভূতি আর নেই।

বিভূতিদের বাড়ি থেকে যখন আসি তখনও কেমন একটা শূন্যতার ভাব, যেন এদের বাড়ির সকলেই আছে—অথচ কি যেন নেই। সবাই কাছে এল, বসলে, গল্প-গুজব করলে—কিন্তু কোথায় সেই ভাদ্রমাসের বৈঠকখানা ঘরের দিনগুলা, সেই মক্কা-মদিনা যাত্রী তাকিয়া-বালিশ, সে আনন্দের ঢেউ? Where is that child?... সিধুবাবুও নেই—কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা।

পথে একটা মারামারি হচ্ছিল, পিকেটিং-কারী এক বালককে নাকি পুলিসে খুব মেরেচে, তাই নিয়ে। বাসে করে বায়স্কোপ দেখতে গেলাম ও সেখান থেকে অনেক রাত্রে এলাম ফিরে।

আজ রবিবাসরের অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম, সেখানে রাজশেখর-বাবুর সঙ্গে আলাপ হল, 'অপরাজিত' তাঁর খুব ভাল লেগেচে বলছিলেন।

আজ ক'দিন থেকে মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ধরনের আনন্দ পাচ্ছি তা বলবার নয়, লিখে প্রকাশ করবার নয়—সে শুধু বুঝতে পারি—বোঝাতে পারি নে।

এইমাত্র জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বারান্দাটাতে একা বসে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের দু'-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে এই অপূর্ব্ব ভাবটাই মনে আসছিল...আনন্দ মানুষকে এত উচ্চেও ওঠাতে পারে! অমৃত বলে মনে হচ্চিল নিজেকে, সত্য বলে মনে হচ্চিল, বিরাট ও শাশ্বত বলে মনে হচ্চিল...এক উন্মাদনাময়ী প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি!...মুগ্ধ হয়ে গেলাম...

দু-একটা চরণ গান তৈরি করে গুন্‌গুন্‌ করে গাইলামঃ

মনে আবার রঙ ধরেচে আবার সুরের আসা-যাওয়া,—

আজ ক'দিন থেকেই এরকমটা হচ্চে।

দিনগুলো যে ভয়ানক নিরানন্দ হয়ে উঠেচে এ কথায় কোনো ভুল নেই। এ শুধু হয়েচে সকাল থেকে রাত দশটা পর্য্যন্ত খাটুনির জন্যে। অনবরত পরের খাটুনি, নিজের জন্য এতটুকু ভাববার অবকাশ নেই, অবসর নেই, সকাল দশটা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা। মনের অবকাশ মানুষের জীবনের যে কত দরকারী জিনিস তা এই কর্ম্মব্যস্ত, যন্ত্রযুগের অত্যন্ত কর্ম্মঠ, হিসাবী ও সময়জ্ঞান-সম্পন্ন মানুষেরা কিছু বুঝবে কি? এতে মানুষকে টাকা রোজগার করায়, ভাল খাওয়ায়, ভাল পরায়, ভাল গাড়ি-ঘোড়া চড়ায়—অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে আরও জাগিয়ে নাচিয়ে তোলে—শক্ত করে বাঁচিয়ে রাখে, বেশ সুষ্ঠুভাবে ও কৃতীর সুনামে বাঁচিয়ে রাখে—কিন্তু ভারবাহী চোখে-ঠুলি বলদের থেকে কোনো পার্থক্যের গণ্ডী টেনে দেয় না—জীবনকে মরুভূমি করে রেখে দেয়,—টাকার গাছের আবাদ। প্রকৃতির শ্যামল বন্য সম্ভার, নীল আকাশ, পাখীর কুজন, নদীর কল মর্ম্মর অস্ত-দিগন্তের সান্ধ্যমায়া—এ সব থেকে বহুদূরে, এক জনহীন, জলহীন বৃক্ষলতাহীন মরু। এদের দেশ-ভ্রমণেও যেতে দেখেচি ফার্স্টক্লাস কামরায় চেপে, দশদিনের ভ্রমণে দুই হাজার টাকা ব্যয় করে, মোটরে করে যাবতীয় স্থান এক নিঃশ্বাসে বেড়িয়ে, বিলাতী হোটেলে খানা

খেয়ে, হুইস্কি টেনে—সেও ঐ ভেড়ার দলের মত বেড়ানো।

আজ বসে বসে শুধু মনে হচ্ছিল অনেকদিন আগে বাল্যের নবীন মধুর বর্ষার বৈকালগুলি—কি ছায়া পড়তো, কি পত্রপুষ্পের সুগন্ধ বেরুতো, কি পাখীর গান হতো—জীবনের সম্পদ হল সে সব—এক মুহূর্ত্তে জীবনকে বাড়িয়ে তোলে, বৃদ্ধিশীল করে—আত্মার পুষ্টি ওখানে। ধ্যান অর্থাৎ contemplation চাই, আনন্দের অবকাশ চাই—তবে হল আত্মার পুষ্টি—টাকা রোজগারের ব্যস্ততায় দিনরাত কাটিয়ে দেওয়ায় নয়।

মানুষের জীবনে প্রকৃতি একটি মহাসম্পদ, এর সঙ্গে অসহযোগ করলে জীবনটায় প্রসারতা কমে যায়, রোমান্স কমে যায়, common place হয়ে পড়ে নিতান্ত।

আমি নিজেই বুঝতে পারি, এই ভাদ্র মাসের ঠিক এই সময়কার ১৯২৭ সালের ডায়েরীগুলো যদি পড়া যায় তবেই দুই জীবনের আকাশ-পাতাল তফাতটা ভালো করে বোঝা যাবে।

১৯২৫ সালে এই সময়ে বিভূতিকে পড়াতুম মনে আছে, সে এখন কত বড় হয়ে গিয়েছে—এখন আবার অন্য ছেলেদের পড়াই ঠিক এই সময়টিতে, সে-কথা হল আজ। এদের এখানে প্যাক-বাক্সের গন্ধ, ছেলেগুলোও দুষ্টু।

জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা ভাবছিলুম। একদিন উপেনবাবুকে বলেছিলুম, বাল্যের অমুক দিনটা থেকে যদি জীবন আবার আরম্ভ হত...? আজও তাই ভাবি—জীবনের experience আমাদের খুব বেশী না, সমৃদ্ধ খুব, একথা বলতে পারি না, অন্য অনেকের জীবনের তুলনায়। সামান্য একটু ভাগলপুর যাওয়া, সামান্য এক আবেষ্টনী, নতুন ধরণের জীবনের স্পর্শ, বড়লোকের বাড়ি—এই সব। কিন্তু এতেই আনন্দ এত বেশী দিয়েচে যে এ থেকে এই কথাটাই বার বার মনে হয়, যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের আনন্দ প্রত্যেকের মনেই ভগবান দিয়েচেন, যে কোন জিনিসকে উপলক্ষ্য করে হোক সেটা ব্যয়িত হবেই হবে।

অনন্ত জীবনে আরও কত অভিজ্ঞতা হবে, সেই কথাই ভাবি। আরও কত উন্নত ধরণের জীবনযাত্রা, কত অপূর্ব্ব আনন্দের বার্ত্তা!

এ রবিবার দিনটাও একটা ট্রামের সারাদিনের টিকিট বন্ধুর ছেলে তরুকে দিয়ে কিনিয়ে আনলুম শিয়ালদহ থেকে। এদিন বেরোলুম সকাল সাড়ে ছ'টার সময়ে। প্রথমে উপেনবাবুর বাসা। সেখান থেকে গেলাম ভবানীপুর সোমনাথবাবুর বাড়িতে। খানিকটা গল্প-গুজব করার পরে গেলাম প্রমথ চৌধুরীর বাড়ি বালিগঞ্জে। তিনি আমার বইখানা পড়ে খুব খুশী হয়ে আমার সঙ্গে পরিচিত হবার ঔৎসুক্য জানিয়েছিলেন, এ কথা সোমনাথবাবু আমাকে লেখেন—তাই এ যাওয়া। তিনি নাকি বলেচেন—In Europe, he could have been a celebrity ; কিন্তু এখানে কে খাতির করবে ?... তারপর আমার বইখানা সম্বন্ধে প্রমথবাবু নানা কথা বললেন—দেখলাম বইখানি খুব ভাল করে পড়েচেন। দুর্গার সিন্দুর-কৌটা চুরি ও সেটা কলসী থেকে বেরুনোর উল্লেখটা বার বার করলেন।

সোমনাথবাবু আমাকে এসে পার্ক সার্কাসে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলেন—বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে একটা ভারি লাভ হল বলে মনে করচি।'

ওখান থেকে এসে গেলাম রেবতীবাবুদের মেসে—খানিকটা গল্পগুজব করার পরে গেলাম নন্দরাম সেনের গলি ও বাগবাজারে। তারপর হরি ঘোষের স্ট্রীটে

কালোদের বাসাতে। দুপুর তখন দুটো, বাইরের ঘরে বুড়ো ছিল, খিনুও এখানে আছে দেখলাম—খিনু কাছে এসে বসলো, অনেক গল্পগুজব করলে। কালোর ছেলে এনে দেখালে। ঠিক যেন মায়ের পেটের বোনের মতো সরল ব্যবহার করলে। ভারি আনন্দ হলো দেখে। ওরা সবাই এল—শরবত করে আনলে খিনু—ভারি ভাল লাগল।

ওখান থেকে তিনটের সময় বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ি, সেখানে অনেকক্ষণ গল্প-গুজবের পর জলযোগ হল। চা-পানের পর সেখান থেকে বার হয়ে নিকটেই মহিম হালদার স্ট্রীটে রবিবাসরের অধিবেশনে যোগ দিলাম—সেখানে বেলা পাঁচটা থেকে রাত নটা। অনেক রাত্রে ট্রামে বাসায় ফিরলাম।

আজকাল সেই মধুর দিনগুলি হারিয়ে গেছে—বহুদিন দেশে যাই নি—আজ বিকেলে স্কুলবাড়ির ছাদ থেকে বহুদূরের দিকে চেয়ে কতকাল আগের কথা মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল অনেককাল আগের সেই মাকাল ফল, পটুটির গাছের সময়টা এই—কত নতুন লতাপাতা গজিয়েচে—ভাদ্র দুপুরের খররৌদ্রে জানালার ধারে বসে সে-সব মধুর জীবন-যাত্রার দিনগুলি—কত সুখদুঃখ-ভরা শৈশবের সে জগৎটা।... কোথায় কতদূরে যে চলে গিয়েচে! আজকাল সময় পাই না, স্কুলের পরই পর পর দুটো ছেলে পড়ানো—একটুখানি ভাববার সময় পাই নে, দেখবার সময় পাই নে, তবু যতটুকু সময় পাই—দুর্ভিক্ষের ক্ষুধায় হাঁ করে যেন আকাশটার দিকে চেয়ে একটু-খানি অপরাহ্নকে স্কুলের তেতলার ছাদ থেকে দেখি—আবার সেই 'জীবন-সন্ধ্যা' ও 'মাধবী কঙ্কণে'র দিনগুলি আগতপ্রায়। এখন দেশে পাটের আঁটি কাচবে, খুব পাঁকাটি পড়ে থাকবে। সেই জেলেখা, রঙমহাল শিসমহাল, শিবাজীর দিনগুলি আরম্ভ হবে। এই যে অভাব, না দেখতে পাওয়া,—আমাদের মনে হয় এই ভাল। এতে মনের তেজ খুব বাড়ে, দৃষ্টির intensity আরও বেশী হয় এটা বেশ বুঝি।

একটা কথা এই মাত্র ভাবছিলাম, রামায়ণ মহাভারতের যুগের পূর্ব্বে ভারতের বালকেরা বৃদ্ধেরা কি ভাবতো—তখন জীবনের ভাব-সম্পদ ছিল দীন—সীতার অশ্রু-জল তখন ছিল লোকের অজ্ঞাত, ভীষ্মের সত্যনিষ্ঠা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা, এ সব তো জানতো না। বুদ্ধের কথা বাদ দিলাম, অশোক, চৈতন্য, মোগল বাদশাহ্‌গণ—এই সমস্ত Tragic possibility, ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল লীন—তবে তখনকার লোকে কি ভাবতো,—কবিদের, ভাবুকের গায়কের চিত্রকরের উপজীব্য ছিল কী?

আর পাঁচশত বছরের সম্ভাব্যতার কথা মনে উঠচে। আর কত Tragedyর বিষয়, ভাবুকতার ইতিহাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে এর মধ্যে। সেটা এখনই গড়ে উঠচে, কিন্তু আমরা তার সমস্তটা এক সঙ্গে দেখতে পাচ্চি নে। এই ইংরাজ চলে যাবে একদিন—এই সব স্বাধীনতা সংগ্রাম, এই গান্ধী, নেহরু, চিত্তরঞ্জন, এই নারী-জাগরণ, কাঁথির এই অশ্রুতীর্থ—ইতিহাসে এসব কথা নব নব ভাবের জন্মদাত্রী হবে। এসব ঘটনা জাতির মনের মহাফেজখানায় অক্ষয় আসনের প্রতিষ্ঠা করবে।

কাল সারা দিনটা বড় ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো—প্রবাসী আপিসে একটা কাজ ছিল। ঠিক বেলা বারোটার সময় সেখান থেকে বার হয়ে গেলাম প্রেসিডেন্সী কলেজে রবীন্দ্র-পরিষদে। নীহারবাবু বললেন, 'পথের পাঁচালীকে আমি তরুণ সাহিত্যের মধ্যে উচ্চ আসন দিই।' প্রমথবাবু আমার বইখানির কথা অনেক ছাত্রদের বলছিলেন। প্রতুল গুপ্ত বলে ছেলেটি বঙ্গ-সাহিত্যের বিজয়ী সেনাপতি বলে অভ্যর্থনা করলে। সোমনাথবাবু বললেন, 'আপনি বর্ত্তমান আধুনিকতম সাহিত্যের বড় ঔপন্যাসিক—

আপনাকেও কিছু বলতে হবে।' খুব আনন্দে কাটল।

ওখান থেকে বার হয়ে যাবার কথা ছিল সাহিত্য-সেবক সমিতির অধিবেশনে, কিন্তু তা আর যাওয়া সম্ভব হল না। প্রমথবাবুর সঙ্গে গল্প করতেই বেজে গেল নটা। অতুল গুপ্ত উপস্থিত ছিলেন—তিনি আমার বইখানার খুব প্রশংসা করলেন। তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন ল' কলেজে। তাঁকে বললুম সে-কথা।

আজ একবার দুপুরে কাজে গিয়েছিলাম অক্ষয়বাবুদের বাড়িতে। শীতল একখানা হাতের লেখা মাসিক পত্র বার করচে, তাতে লেখা দিতে বলচে। কাল সে আসবে বেলা তিনটের সময়।

সেখান থেকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে ফিরলুম—বৈকাল ছটা। পূর্ব্বদিকের আকাশ অন্ধকার হয়ে আসচে। শিয়ালদহের কাছটায় ট্রামটা এলেই আজকাল পূর্ব্বদিকে চাই। অন্যদিনও চাই, এমন হয় না—আজ যে কী অপূর্ব্ব মনে হল।... মাকাল ফল, পিসিমা, পুরনো বঙ্গবাসী, দুপুরের রৌদ্র, মাকাল গাছ, ঘুঘু পাখী, বাঁশবন—কত কথা যে এক মুহূর্ত্তে মনে এল! আমি এরকম আনন্দ একদিন মাত্র পেয়েছিলাম,—যেদিনটা স্কুলের ছাদ থেকে বহুদূরের আকাশটার দিকে চেয়েছিলাম এই সন্ধ্যা ছটার সময়ে।

তার পরে সুরি লেনের কাছে নেমে গেলাম রাজকৃষ্ণদের বাড়ি যাব বলে।

আমি শুধু প্রার্থনা করি, আমাকে আগে নিয়ে চল হে ভগবান—যাতে সর্ব্বদা মন গতিশীল থাকে। কিসে মন বর্দ্ধিত হয়, আনন্দ বর্দ্ধিত হয়, তার সন্ধান তোমার জানা আছে, আমাদের নেই—তা ছাড়া আমার শিল্পী মন কি করে আরও পরিপূর্ণ হবে তার সন্ধান তুমিই জানো।

তোমার যে দিকে ইচ্ছা সে দিকেই নিয়ে যেও।

অবশেষে ঘুরিয়া যাওয়াই ঠিক করে কালকার বম্বে মেলে বার হয়ে পড়া গেল। দিনটা ছিল খুব ভাল—বৈকালের দিকে ট্রেনটা ছাড়ল—বর্ষাশেষে বাংলার এ অংশটায় শ্যামল-শ্রী দেখে বুঝতে পারলাম, বাংলা বাংলা করি বটে, কিন্তু দেশের সমগ্র পরিপূর্ণতাকে কখনো উপভোগ করি নি—কী অপূর্ব্ব অস্ত-আকাশের রঙীন মেঘস্তূপ. কী অপরূপ সন্ধ্যার শ্যামছায়া!...কোলাঘাটের যে এমন রূপ, তা এর আগে কে ভেবেছিল?—পিছন থেকে চেয়ে চেয়ে দেখলাম, দেশের ভিটা সেদিন দেখে এসেচি, তারই কথা মন হল—সেই ঝিক্‌রে গাছগুলো সন্ধ্যার ছায়ায় বাল্যের আনন্দ-ভরা এক অপরাহ্নের ছায়াপাতে মধুর হয়ে উঠেচে এতক্ষণ—এই তো পূজার সময়, বাবা এতদিন বাড়ি এসেচেন, আমাদের পূজার কাপড় কেনা হয়ে গিয়েচে এতদিন—কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রির উৎসবের সে সব আনন্দ—কি জানি কেন এই সব সময়েই তা বেশী করে মনে আসে।

সব সময় এই দেশের ভিটার ছবিটাই মনে উৎসাহ. আনন্দ ও প্রেরণা দেয়—এ অতি অদ্ভুত ইতিহাস।

বিলাসপুর নেমে ঝড় বৃষ্টি। এখন একটু রৌদ্র উঠেচে—গাড়ির মধ্যে বসে বসে লিখচি—কিন্তু মেঘের ঘোর এখনও কাটে নি।

পরশু বৈকালটি সজনীবাবু, সুবলবাবু ও গোপালবাবুর সঙ্গে বেশ কেটেচে। প্রথমে রেস্টুরেণ্টে কিছু খেয়ে মোটরে করে গেলাম লেকে—সেখান থেকে আউট্রাম ঘাট—সেখানে চা-পানের পর বাসা। ডঃ সুশীল দে-র ওখানেও ঘণ্টা তিন-চার গল্প করে ভারি আনন্দ হল।

কারগী রোডে পেঁছে দেখলাম কিছুই আসে নি, অতি বর্ষণের ফলে বন্যা হওয়াতে রাস্তা ভেঙে গিয়েচে—গন্তব্য স্থানে পেঁছতে দুই-তিন দিন লাগবে—আরও একটি সাহেব আমারই মত বিপন্ন হয়ে পড়েচেন—সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনই যুক্তি-যুক্ত মনে হল। একজন বাঙালী ওভারসিয়ার ছিলেন, তাঁর নাম সত্যরঞ্জন ভট্টাচার্য্য—তিনি সঙ্গে করে তাঁর বাসায় নিয়ে গেলেন—বেশ লোক।—ঝিঙে ও ঢেঁড়স ভাজা, ডাল ও ভাত।

ওধারকার রাঙা মাটির দেওয়াল, বেশ দেখতে। মনে হল ওরকম বাড়িতে আমি তো একেবারেই টিকতে পারবো না। সঙ্গে করে দেখালেন, পাশেই জমি কিনেচেন—সেখানে তরকারীর বাগান। একটি গালার কারখানায় নিয়ে গেলেন, গালা চোলাই হচ্চে—একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। সেখান থেকে এসে খাওয়া-দাওয়ার পরে সামনের পাহাড়টাতে ওঠা গেল। ওপরে আর একটা পাহাড়—মধ্যে ঘন শাল পলাশের বন—মহিষের গলায় একটানা ঘণ্টার ধ্বনি শোনা যাচ্চে। ওখানকার একজন খৃষ্টান ডাক্তার জানপান্নার বিবাহ গেল সেদিন, বিবাহ উপলক্ষে অনেকগুলি সাহেব, মেম ও বাঙালী খৃষ্টান মেয়ে এসেছিলেন—এই ট্রেনে যাচ্চেন।

বিলাসপুরে গাড়ি পেয়ে গেলাম ঠিক মত—ভিড় খুব বেশী ছিল না। বিলাস-পুরের ও রায়গড়ের মধ্যেকার আরণ্য ভূভাগের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব—কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে নামবার পরেই অধিকতর অপরূপ এমন আর এক বনভূমির ভিতর দিয়ে ট্রেন যেতে লাগল, যার তুলনায় পূর্ব্বে যতগুলো দেখেচি সব ছোট হয়ে গেল, তুচ্ছ হয়ে গেল—সেটা হচ্ছে রায়গড় ও ঝারসাগুদার মধ্যে—সে অপরূপ আরণ্যভূমির বর্ণনা চলে না। দিবাশেষের ঘন ছায়ায় অনতিস্পষ্ট সে দৃশ্যের মত গভীর অন্য কোনো দৃশ্য জীবনে দেখি নি কখনও—চন্দ্রনাথের পাহাড়েও নয়। কি প্রকাণ্ড পাহাড়টাই বরাবর সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত এলো!... ..মাঝে মাঝে সাদা মেঘগুলো পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে, যেন কুমোরেরা পণ পুড়ুচ্চে নীল মেঘের মত পাহাড়টার শোভাই বা কি! লোকে ভেবে দেখে না, মনের সতর্কতা কম, তাই সেদিন সেই লোকটা বললে, 'মশাই এ অঞ্চলে সবই barren'...barren কোথায়? তারা কি চক্রধরপুরের পরের এই গম্ভীর-দৃশ্য বনানী দেখে নি?...

আমি মনে মনে বুঝে নিলাম পিছনের ওই নীল পাহাড়টা, মেঘরাজি যার কোলে—সন্ধ্যাবেলাতে দুষ্টু ছেলের মত ঘুমিয়ে পড়েচে—ওটা আর রেলের পিছনে মাঠ-গুলো নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ত্রিভুজ তৈরি হয়েচে—দেড়শত দুইশত বর্গ মাইল পরিমাণের এই ত্রিভুজটার সবটাই বসতিবিরল, স্থানে স্থানে একেবারে জনহীন অরণ্য, পিছনে বরাবর ওই পাহাড়টা। এই অরণ্যভূমির ও শৈলমালার মধ্য দিয়ে রেলপথটা চলে গিয়েচে। সহসা একটা পাহাড়ের মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা শিখরদেশের কি অদৃষ্ট-পূর্ব্ব শোভা! গাড়ির সবাই বললে—দ্যাখো দ্যাখো—আমার তো হৃদয় বিস্ফারিত হল, চারিধারে এই অপূর্ব্ব বনভূমির শোভা দেখে অন্ধকার পর্ব্বত-সানুস্থিত অরণ্যের মধ্যে কোথা থেকে সদ্য ফোটা শেফালি ফুলের সুবাস পেলাম—ট্রেনটাও Rock cutting-টা ভেদ করে ঝড়ের বেগে ছুটেচে—চারিধারে রহস্যাবৃত অন্ধকারে ঢাকা সেই শৈলপ্রস্থ ও অরণ্য-ভূভাগ—জীবনে এ ধরনের দৃশ্য ক'টাই বা দেখেচি!...রাত আটটায় এসে বম্বে মেল ঝারসাগুদাতে দাঁড়াল। এখানে চা ও খাবার খেয়ে নিলাম। সেদিনকার মত উদার-হৃদয় সহচর তো আজ সঙ্গে নেই যে খাবার খাওয়াবেন।

ঝারসাগুদা থেকে সম্বলপুরে এক লাইন গিয়েচে। রাত্রে ট্রেনে বেশ ঘুম হল, সকালে এসে কলকাতায় উঠলুম—দুপুরটা ঘুম হল খুব।

আজ বিজয়া দশমী। কোথায় যাব—ভাবচি—বিভূতিদের ওখানেই যাওয়া যাবে এখন।

আজ সারাদিনটা হৈ হৈ করে কাটল। সকালে উঠেই সজনীবাবুদের বাড়ি—সেখানে খানিকক্ষণ গল্পগুজবের পর সকলে মিলে হিতেনবাবুদের বেলগেছিয়ার বাগানবাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে হল পিক্‌নিক্—মাংস সিদ্ধ হতে বাজল তিনটে। Living age কাগজখানাতে মেটারলিঙ্ক-এর নতুন বই 'Life of the Ants' সম্বন্ধে একটি ভারি উপাদেয় প্রবন্ধ পড়ছিলাম—সামনের পাইকপাড়া রাজাদের বাগানবাটিতে অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ ছায়া বর্ষাশেষের সরস, সবুজ গাছপালার উপর নেমে আসচে, ওধারের তালগাছগুলো মেঘশূন্য নীলাকাশের পটভূমিতে ওস্তাদ পটুয়ার হাতে আঁকা ল্যান্ডস্কেপের ছবির মত মনোহর হয়ে উঠেচে—কিন্তু আমি এই বৈকালটিকে আমার মনের সঙ্গে কি জানি আজ মোটেই খাপ খাওয়াতে পারচি নে—আমার মনের সুসম্বন্ধ, সুনির্দ্দিষ্ট অপরাহ্ণের মালায় আজকার বেলগেছিয়া বাগানের এই সুন্দর অপরাহ্ণটি বিস্তৃত শত অপরাহ্ণ-মুক্তাবলীর পাশে কেন যে স্থান দিতে পারলাম না, তা জানি না। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম শাঁখারিটোলায় রাধাকান্তদের বাড়ি, তারপর দক্ষিণাবাবুদের বাড়ি। দক্ষিণাবাবু বাড়ি নেই। জ্যোৎস্না আদর-অভ্যর্থনা করলে, কাছে বসে খাওয়ালে। রাত এগারোটার পরে এলেন দক্ষিণাবাবু। গল্পে-গুজবে হল রাত আড়াইটা—আজ আবার চন্দ্রগ্রহণ, কিন্তু মেঘের জন্যে কিছু দেখা গেল না। সারারাতের মধ্যে চোখের পাতা বুজানো গেল না মশায় ও গরমে—অনেক-রাত্রে দেখি একটু একটু বৃষ্টি পড়চে।

এবার কালী পূজাতে দেশে গিয়ে সত্যই বড় আনন্দ পেলাম—এত সুন্দর গন্ধ বন-ঝোপ থেকে ওঠে হেমন্তের প্রথমে, এবার খুঁজে খুঁজে দেখলাম গন্ধটা প্রধানতঃ ওঠে বনমরিচার ফোটা ফুল থেকে ও কেলেকোঁড়ার ফুল থেকে। এবার আনন্দটা সত্যই অপূর্ব্ব ধরনের হল যা অনেকদিন কলকাতায় থেকে অনুভব করি নি। নৌকার ওপর বসে বসে যেন জীবনটা আর একটা dimension-এ বেড়ে উঠল—ঘন লতাপাতার সুগন্ধে বহু অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে—খুকী দ্বিতীয়ার দিন আমার সঙ্গে আবার গেল বারাকপুরে—সেদিন আবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। জাহ্নবী আমাকে ফোঁটা দিলে—খুকী দিলে খোকাকে। পরে আমরা দুজনে পাকা রাস্তার ওপরে বেড়াবো বলে বেরুলাম—কিন্তু যাওয়া হয়ে গেল একেবারে বারাকপুরে—গাছপালা, প্রকৃতির সঙ্গে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করে যে জীবন—তাই হয় সুখের, পরিপূর্ণ আনন্দের। এ আমি ভাল করে বুঝলাম সেদিন।

কয়দিন এখানে এসেও বেশ আনন্দেই কাটল—ঊষা দেবী এখানে এসেচেন ঢাকা থেকে, তাঁর ওখানে মধ্যে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলুম—বেশ মেয়েটি বেশ শিক্ষা আছে, সাহিত্য বিষয়ে সমঝদারও খুব সুন্দর। সুনীতি-বাবুর বাড়িতে একদিন আমি ও সজনীবাবু গিয়ে—অনেকগুলো গ্রীক্ ও শক মুদ্রা, অনেক ছবি, আবুরাজ্যের প্রাচীরগাত্রে উৎকীর্ণ কতকগুলো মূর্ত্তির ফটো—এই সব দেখে এলাম—প্রবাসী আপিসে আড্ডা যা চলচে ক'দিন, তাও খুব।

কাল জগদ্ধাত্রী পূজা—আমাদের চারদিন ছুটি আছে, রাত্রে গেলাম বিভূতিদের বাড়ি, অন্য অন্য বছরের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—আজ কোথাও কিছু নেই—রাত

ন'টার সময় অক্ষয়বাবু ছোট বৈঠকখানায় রেডিও শুনচেন—অন্য বছর যে সময় আগন্তুক ও নিমন্ত্রিতের ভিড়ে সিঁড়ি দিয়া ওঠা সম্ভব হত না, কোথায় সে উৎসব গেল বাড়ির—যেন দীনহীন, মলিন সব ঘরগুলো, সিঁড়িটা, দালানটা। আমাকে অবশ্য খাওয়ার বিশেষ অনুরোধ করা ছিল—অক্ষয়বাবু ও খগেনবাবু বাইরে নিমন্ত্রণে গেল মেজ খোকাবাবুর বাড়ি। অনেক রাত্রে আমি, শীতল, বিভূতি একসঙ্গে বসে নিরামিষ ভোজ খেলাম। রাত বারোটাতে বাসায় ফিরলাম। শুয়েচি—চারিধার নিস্তব্ধ, নিৰ্জ্জন। চাঁদটা পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ হয়ে ঢলে পড়েচে—নক্ষত্রগুলো পরিষ্কার ও উজ্জ্বল হয়েচে, 'অপরাজিত'র অপুর বন্য-জীবনের গোড়াটা লিখচি—তাই বসে বসে ভেবে এই বিচিত্র জীবনধারার কথা মনে হল—ভারি আনন্দ পেলাম।

আজ জগদ্ধাত্রী পুজোর সকালবেলাটি ; মনে পড়ে অনেক বছর আগে এই ঘরেই বসে বসে হার্ডির ছোট গল্প পড়তুম এইখানে। আজও সেই ঘরটি তেমনি নিস্তব্ধ, নিশ্চল। কিন্তু পরিবর্ত্তনও কি কম হয়েচে! তখনকার বিভূতি কত বড় হয়ে গিয়েচে—তখনকার সবাই কে কোথায় চলে গিয়েচে।

আগামী রবিবারে সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, আমি ও সজনীবাবু—চারজনে মোটরে 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে যাওয়ার কথা আছে বৈকালের দিকে। দেখি কি হয়।

এইমাত্র মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তাঁর নব প্রকাশিত 'কিশলয়' বইখানা পাঠিয়েচেন, দেখলাম। খুব ভাল লাগল বইটি।

আজকার দিনটি বেশ ভাল কাটল। সকালের দিকে খুব মেঘ ছিল, কিন্তু দুপুরের পরে খুব রৌদ্র উঠল—তখন বেরিয়ে পড়া গেল—প্রবাসী আপিসে গিয়ে দেখি অশোকবাবু ও সজনী দাস বসে। চা পানের পরই সজনীবাবু গিয়ে গাড়ি করে সুনীতিবাবুকে উঠিয়ে নিয়ে এল—পরে আমরা রওনা হলাম আমাদের গ্রামে। সজনীবাবু, অশোকবাবু, সুনীতিবাবু আর আমি। যশোর রোডে এসে ব্যাটারির তারটা জ্বলে উঠে একটা অগ্নিকাণ্ড হত, কিন্তু সুনীতিবাবুর কুঁজোর জল দিয়ে সেটাকে থামানো গেল।

তারপরই খুব জোরে মোটর ছুটল—পথে মাঝে মাঝে রোদ, মাঝে মাঝে ছায়া—রোদই বেশি। আজ রবিবার, সাহেবরা কলকাতা থেকে বেড়াতে বেরিয়ে এক এক গাছতলায় মোটর রেখে ছায়ায় শুয়ে আছে।

তারপর পৌঁছে গেলাম জোড়া-বটতলায়। ওইখানে মোটরখানা রইল, কারণ দিনকয়েক আগে আমাদের গ্রামের দিকে খুব বৃষ্টি হয়েছিল, পথে এখনও একটু একটু কাদা। নেমে কাঁচাপথটা বেয়ে বরাবর চললুম ; সুনীতিবাবু কাঁচা কোসো কুল ও সেঁয়াকুল খেতে খেতে চললেন, অশোকবাবু ছড়ি কাটবার কথা বলতেই সজনীবাবু চটি ফেলে ছুটল গাড়িতে ছুরি আনতে। গ্রামে ঢুকবার আগে এ-ফুলের ও-ফুলের নাম সব বলে দিলাম—কাঁঠালতলায় হেলা গুঁড়িতে গিয়ে সবাই বসল। তারপরে সইমার বাড়ি গিয়ে কিছু মুড়ির ব্যবস্থা করে একটা আসন পেতে সবাইকে বসালাম। সেখানে খাওয়া ও গলপগুজবের পরে আমাদের পোড়ো ভিটেটা দেখে রান্নাঘরের পোতা দিয়ে সবাই নেমে ঘন ছায়ায় ছায়ায় এলাম সলতেখাগী আমগাছের তলায়—সেই ময়না-কাঁটা গাছ থেকে ছড়ি কেটে নিলে অশোকবাবু ও সজনীবাবু—পরে তেঁতুলতলীর তলায় বনের মধ্যে দেখা গেল একটা খুব বড় ও ভাল ময়না-কাঁটা গাছ—সেখান থেকে আর একটা ছড়ি কাটা হল। তারপর প্রায় বেলা গেল দেখে আমি

খুব তাড়াতাড়ি করলাম—ওদের বন থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেলুম কুঠিটায়। ছেলেবেলায় গ্রামের জামাইদের ডেকে নিয়ে কুঠি দেখাতুম। তারপর সে কাজটা অনেকদিন বন্ধ ছিল—বহুকাল বন্ধ ছিল। শেষ কাকে নিয়ে গিয়েছিলাম, তা তো মনে হয় না—বহুকাল পরে বাল্যের সে কুঠি দেখানোর পুনরাবৃত্তিটা করলুম। তখন কুঠিটা আমার কাছে খুব গর্ব্ব ও বিস্ময়ের বস্তু ছিল—তাই যে কেউ নতুন লোক আসতো, তাকেই নিয়ে ছুটতাম কুঠি দেখাতে। আজ বহুদিন পরে সজনীবাবু, সুনীতিবাবু ও অশোকবাবুকে নিয়ে গেলাম সেখানে। কুঠিতে কিছু নেই। আজকাল এত জঙ্গল হয়ে পড়েচে যে আমি নিজেই প্রথমটা ঠিক করতে পারলুম না কুঠিটা কোন জায়গায়।

তারপর মাঠ দিয়ে খানিকটা ছুটতে ছুটতে গেলাম। রাস্তায় পড়ে কাঁচিকাটার পুলে—এই কার্ত্তিকমাসেও একটা গাছে একগাছ সোঁদালি ফুল দেখে বিস্মিত হলাম। সেইখানে ঝোপটি কি অন্ধকারই হয়েচে। সুনীতিবাবু চেয়ে চেয়ে দেখলেন—সবাইকে ডেকে দেখালেন—আমার কেন মনে হচ্ছিল আমার পরিচিত সলতেখাগী তলায় যেখানে আমিই আজকাল কম যাই সেখানে—আমাদের ভিটেতে—সম্পূর্ণ কলকাতার মানুষ সুনীতিবাবু, অশোকবাবু, এ যেন কেমন অদ্ভুত লাগছিল। আমাদের কুঠির মাঠে, আমাদের সইমার বাড়ির রোয়াকে!

সন্ধ্যা হলে তেঁতুলতলার পথটা দিয়ে সবাই মিলে আবার ফিরলাম—ময়না-কাঁটার ডালগুলো ওখান থেকে আবার নিলাম উঠিয়ে—সইমার বাড়ি এসে দেখি হরেন এসে বসে আছে। সইমার সঙ্গে সুনীতিবাবুর খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল—পরে আমরা বার হয়ে গিরিশদার বাড়ি এসে গেলাম—তখনই ওদের রান্নাঘরের পৈঠাতে জ্যোৎস্না উঠে গিয়েচে।

তারপরে গাজিতলার পথ দিয়ে হেঁটে মোটর ধরলুম—গোপালনগরের হাট-ফেরতা লোক বসে আছে মোটর দেখবার জন্যে। খানকতক স্যাণ্ড্‌উইচ্‌ ও ডালমুট কিছু খেয়ে নেওয়া গেল—কুঁজোর জল খেয়ে-টেয়ে গাড়ি স্টার্ট দেওয়া হল।

বঙ্কুর বাসায় এসে দেখি তরু বেচারীর চৌদ্দ-পনের দিন জ্বর—বিছানায় শুয়ে আছে, বঙ্কু ফোড়ায় শয্যাগত—বঙ্কুর বৌ এসেচে, কিন্তু সে বেচারীর দুর্দ্দশার সীমা নেই। সেখানে কিছু চা ও খাবার খাওয়ার পরে আমরা সুন্দর জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে মাঠের ভিতর দিয়ে রাস্তায় সজোরে গাড়ি চালিয়ে রাত্রি সাড়ে ন'টাতে কলকাতার বাসায় এসে পেঁছিলাম। তখনও বাসায় খাওয়া আরম্ভ হয় নি—ঠাকুর তখনও রুটি গড়চে। আমি এসে টেবিল পেতে লিখতে বসে গেলাম, আর ভাবছিলাম এই খানিক আগে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হল তখন ছিলুম আমাদের বাড়ির পিছনকার গাবতলার পথে—এরই মধ্যে কলকাতার বাসায় ফিরে এত সকাল-রাত্রে বারান্দার আলো জেবলে বসে লিখচি, এ কেমন হল?...

যদি মোটর না থাকতো তবে কখন পেঁছাতাম?...সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে সন্ধ্যার গাড়ি ধরে, বা বনগ্রাম থেকে ট্রেন ধরে, রাত্রি বারোটাতে কলকাতা পেঁছতাম।

আমি সত্যই আজ একটা আনন্দ পেলুম। একটা অদ্ভুত—ও সুন্দর ধরনের আনন্দ পেলুম। ওঁরা গিয়েছিলেন 'পথের পাঁচালী'র দেশ দেখতে—আমি আমার পরিচিত ও প্রিয় স্থানগুলিতে কলকাতার এই প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে বেড়িয়ে আজ সত্যই একটা নতুন ধরনের আনন্দ পেলুম যা আর কোনো trip-এ পাই নি।

ইচ্ছা আছে বৈশাখ মাসের দিকে একবার এদিকে এসে ওঁদের নিয়ে ইছামতীতে নৌকা ভ্রমণ ও কোনো একটা বনের ধারে বনভোজন করা হবে। সুনীতিবাবুও সে

প্রস্তাব করলেন, সবাই তাতে রাজী।

কাল দুপুরে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ঠাকুরবাড়িতে ছিল নিমন্ত্রণ, সেখানে সকলের সঙ্গে গল্পগুজবে বেলা হল তিনটা, সেখান থেকে গেলুম 'গৈরিক পতাকা' দেখতে মনোমোহনে।

এ গেল কালকার কথা, কিন্তু আজ এমন অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েচি বৈকালের দিকে যে, মনে হচ্চে জীবনে ক—ত দিন এ রকম অদ্ভুত ধরনের বিষাদের ও উত্তেজনার আনন্দ হয় নি আমার।

কিসে থেকে তা এল? অতি সামান্য কারণ থেকে। ক্লাসে দেববৃত নাকি ছোট একটা খড়ি নিয়ে পকেটে রেখেছে, ক্লাসে মনিটার তার হাত মুচড়ে সেটা নিয়েচে কেড়ে। দেববৃত এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেললে, বললে, দেখুন স্যার, ওরা এত বড় বড় খড়ি নিয়ে যায় বাড়িতে আর আমি এইটুকু নিলাম। আমার হাত মুচড়ে ও কেড়ে নিলে?—হাতে এমন লেগেচে।

ছোট ছেলের এ কান্না মনে বাজল। তখনি অবশ্যি মনিটারকে বকে খড়িটুকু দেববৃতকে ফেরত দেওয়ালাম, কিন্তু দুঃখটা আমার মনে রয়েই গেল।

সে কি অননুভূত দুঃখ ও বেদনা বোধ!...দুপুরের রোদে ছাদে বেড়াতে বেড়াতে মনে হল ভগবান আমাকে এক অপূর্ব্ব ভাব-জীবনের উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে চান বুঝি। তিনিই হাত ধরে আমাকে নিয়ে চলেছেন কোথায়, তাঁর কোন্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, তিনিই জানেন। অনন্ত জীবনের কতটুকু আমাদের শান্ত-দৃষ্টির নাগালে ধরা দেয়? মনে হল বহুকাল আগে শৈশবে হরি ঠাকুরদাদা সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ির দরজা থেকে চাল চেয়ে না পেয়ে মলিন মুখে ফিরে গিয়েচেন—সেইদিনটিতেই আমার এই ভাব-জীবনের বোধহয় আরম্ভ। তারও আগে মনে আছে—মা যেদিন অতি শৈশবে ছোলা ও মুড়ি খেতে দিয়ে দিদিমার কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলেন—তাঁর গুরু এসেছিলেন, তিনি যে আমাদের জন্যে গুরুর পাতের মাছের ঝোল ও রুটি তুলে রেখে দিয়েছিলেন, মা তার খবর না জেনেই আমায় দিয়েছিলেন মুড়ি ও ছোলা ভাজা।—সেই ঘটনা থেকে মায়ের উপর এক অদ্ভুত স্নেহ ও বেদনা-বোধ—তার পরে জাহ্নবীর আমজরানো, পিসিমার শত দুঃখ, কামিনী পিসির কষ্ট, সেই যাত্রার দলের গান শেষ হওয়ার দিনগুলো—কত কি—কত কি; তারপর বিভূতির কত কষ্ট! আজ আবার দেববৃতের কষ্ট—আমার সমগ্র ভাব-জীবনের সমষ্টি এই সব দুঃখ ও বেদনা, অবশ্য হয়তো অনেক দুঃখ বাস্তব, অনেকটা কাল্পনিক—কিন্তু আমার মনে তাদের জন্য বেদনানুভূতি আদৌ কাল্পনিক নয়—তাদের সার্থকতা সেখানেই।

যাক। তারপর স্কুলে এক অদ্ভুত ব্যাপার হল। সন্ধ্যা হয়ে গেল, আমি ছাদে নীরব সান্ধ্য আকাশের তলে প্রতিদিনের মত পায়চারি করতে লাগলাম—মনে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দবোধ, সে আনন্দের তুলনা হয় না—ভেবে দেখলাম এই আনন্দেই জীবনের সার্থকতা। কিসে থেকে তা আসে, সে কথা বিচারে কোনো সার্থকতা নেই আদৌ,—আনন্দ যে এসেচে, সেইটাই বড় কথা ও পরম সত্য। অনেক দিন পরে এ লেখা পড়ে আমারই মনের নিরানন্দ ও ভাবশূন্য মুহূর্ত্তে আমার মনে হতে পারে যে, এ দিনের আনন্দ একেবারেই অবাস্তব ও মনকে চোখ-ঠারা গোছের হয়তো—নিরানন্দের দিনে এ কথা মনে হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বটে, কিন্তু এই খাতায় কালির আঁচড়ে তা জানিয়ে দিতে চাই যে তা নয়, তা নয়। এ আনন্দ অপূর্ব্ব অননুভূত অতীন্দ্রিয়, মহনীয়!—এ ধরনের গভীর বেদনামিশ্রিত ভাবোপলব্ধি জীবনে খুব কম করেচি।

করেচি হয়তো সে-দিন মালিপাড়ায় মাজু খাতুনের উপর পুলিসের অত্যাচার করার কথাটা খবরের কাগজে পড়বার দিনটা—তারপর অনেকদিন হয় নি।

সন্ধ্যার নিস্তব্ধ ও ধূসর আকাশের বহুদূর প্রান্তের আমাদের ভিটাটার কথা মনে হল একবার...বেশ দেখতে পেলাম সেখানে ঘন ছায়া পড়ে এসেচে—বনে সুগন্ধ উঠচে হেমন্তের দিনে—সেই ভিটা থেকে একদিন পথে, ঘাটে, বৈকালের ছায়ায়, দুপুরের রোদে যে আনন্দ-জীবনের শুরু, আমি এই ভাবে মুগ্ধ হই, তা এখনও অটুট, অক্ষুণ্ণ রয়েচে—আরও পরিপূর্ণভাবে দেশে বিদেশে তার গতি নিত্য নবতর পথে।

আকাশের দিকে চাইলাম—মাথার উপর ধূসর আকাশে একটি নক্ষত্র মিট-মিট করচে। সঙ্গে সঙ্গে কালকার থিয়েটারে শোনা গানটা গাইলাম, 'জনতার মাঝে জনগণ প্রীতি, বক্ষের মাঝে দৃপ্ত মন'। দেবব্রতের মত ক্ষুদ্র ও সুদর্শন এক দেবশিশুর ছবি মনে উঠল, ঐ ছবি বিশ্বের অজানা-অচেনা পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে সে বালক তার অপূর্ব্ব শৈশব যাপন করচে আনন্দে সহাস্য কলরবে, দায়িত্বহীন কৌতুকের উচ্ছ্বাসে। তারপরে তার জীবনের সে সব বহুবর্ষব্যাপী বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ, সে গভীর বেদনাপূর্ণ ট্রাজেডি—কত যুগব্যাপী দুঃখ-সুখের শুরু—পৃথিবীর মানুষেরা যা কোনো দিন ধারণাই করতে পারে না। উঃ, সে কি অদ্ভুত অনুভূতিই হল যখন এ ছবি আমার মনে উঠল।

আজ বুঝলাম এই অনুভূতিই আসল জীবন। আমি নিরানন্দ দিনগুলিতে দেখেচি মন কিছুতেই আনন্দ পেতে চায় না—টেনেটুনে কত করে, কত নক্ষত্র জগৎ, এ, ও, নানা ব্যাপারের মধ্য দিয়ে জোর করে আনন্দ আনতে হয়, তা যাও বা একটু আধটু আনে—তাতেই তখন মনে হয়, না জানি কত বড় অনুভূতিই বা হল। কিন্তু আসল ও সত্যিকার আনন্দের মুহূর্ত্তে বোঝা যায় সে অনুভূতি ছিল অগভীর, মেকি, টেনে-বুনে আনা। আসল আনন্দকে জোর করে, মনকে বুঝিয়ে, তর্ক করে আনতে হয় না তা আজ বুঝেচি—সে সহজ—অর্থাৎ spontaneous.

আর ও অনুভূতি যার জীবনে না হয়েচে—অর্থের মানে, যশের প্রাচুর্য্যে তার দীনতা ঘোচাতে পারে না।

'অপরাজিত' উপন্যাসের বন-ভ্রমণ লিখচি আজ।

কাল স্কুল কমিটির মিটিং-এ ওরা সুবোধবাবুকে নোটিস দিলে—আমি আগে জানলে হতে দিতাম না—আমায় আগে ওরা জানায়ও নি, যদিও সাহেবের কোনো দোষ ছিল না, সাহেব আমাকে জানাবার কথা বলেছিল সুরেশবাবুকে। শেষকালে চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না—বেচারীকে যেতেই হল। এই বেকার-সমস্যার দিনে একজন Young man-এর চাকরি এভাবে নেওয়া বড় খারাপ কাজ, মনে বড় কষ্ট হল...সুবোধবাবু মুখটি চুন করে বসলো কাল রাত্রে, কি করি আমার তো আর কোনো হাতই নেই।

আশ্চর্য্যের বিষয় আজ পয়লা অগ্রহায়ণ, কিন্তু এত গরম যে সকালে কার্ত্তিক পুজোর ছুটির দিনটা বলে রামপ্রসন্নর ওখানে বেড়াতে গেলাম। সেখানে সুরেশ-বাবুর আগ্রা ভ্রমণের গল্প শুনে ফিরে এসে, বেলা আটটার সময় এত গরম বোধ করতে লাগলাম যে, তাড়াতাড়ি নাইতে গেলাম—এবং মনে খুব আনন্দ হল, আরাম পেলুম বালতির পর বালতি ঠান্ডা জল মাথায় দিতে লাগলাম—এত গরম।

এ সময়ে এত গরম আর কখনো কলকাতায় দেখেচি বলে তো মনে হয় না।

অনেকদিন লিখিনি—বাজে জিনিস না লেখাই ভাল, অন্ততঃ এ-খাতায়। আজ দুপুরটাতে কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, কবিশেখর কালিদাস রায় ও দক্ষিণা-বাবুর বাড়ি—সেখান থেকে এসে বারান্দাতে বসেছিলাম, হঠাৎ মনে হল একবার নিউ মার্কেটে গিয়ে Wide World Magazine দেখে আসি।

শাঁখারীটোলায় ভীমেদের বাড়িতে গেলাম, ওরা আজ নতুন খাতা করতে বেরিয়েচে। মোড়ের মাথায় টাটি একটা মুদীর দোকানে দাঁড়িয়ে হালখাতা করচে—তাকে ডেকে আদর করে ভারি আনন্দ পেলাম—তারপর নিউ মার্কেট ঘুরে এই মাত্র ফিরে আসচি। বেজায় গরম পড়েচে আজ কলকাতায়।

জীবনের সৌন্দর্য্যের কথাই শুধু আজ ক'দিন ধরে ভাবচি। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়চে ছেলেবেলায় যে টক এঁচড়ের চচ্চড়ি ও টক কলাইয়ের ডাল দিয়ে ভাত খেতুম রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে—সেই কথা। সেই মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধের কথা। জীবনটার কথা ভাবলেই আনন্দে মুগ্ধ হতে হয়। এত বিচিত্র অনুভূতি, এত পরিবর্ত্তন, এত রস, এত যাওয়া-আসা—ভেবে অবাক হয়ে যাই।

সঙ্গে সঙ্গে এইমাত্র ক্যাম্বেল স্কুলটার সামনে দিয়ে যেতে যেতে মনে হল, মানুষ অনন্তের সন্তান—একথা মিথ্যা নয়, কে বলে মিথ্যা!...সমগ্র নক্ষত্র জগতের জীবন—জরাহীন, মৃত্যুহীন, অপরাজেয় জীবন-ধারা তার নিজস্ব। সকল নক্ষত্রের পাশের দেশে—ওই যে নক্ষত্রটা আমার বারান্দার ওপর মিটিমিটি জ্বলচে—ওদের চারিপাশে আমাদের মত গ্রহরাজি আছে হয়তো—তাতেও জীব আছে, অন্য বিবর্ত্তনের প্রাণী হলেও তাদের সুখ-দুঃখ, শিল্প, অনুভূতি, মৃত্যু, প্রেম সবই আছে—দূরের নীহারিকা, Golbular Cluster-দের জগৎ, সে সব তো আলাদা বিশ্ব, তাতে তো অপূর্ব্ব অজ্ঞাত সব জীবনধারা—আমার জীবনও তো, কত দূর পথ চেয়ে কত অনন্ত সৌন্দর্য্যস্তম্ভের মধ্যে দিয়ে কাটবে তা কে জানে?...

এই বড় জীবনটা আমার...

মানুষের মনে এই জ্ঞানটা শুধু পেঁৗছে দিতে হবে যে. সে ছোট নয়, সে বড়, সে অনন্ত। যদি যুগে যুগে আসি যাই তা হলেও তো ওরকম কত কালবৈশাখী, কত মুচুকুন্দ চাঁপার গন্ধ. কত টক কলাইয়ের ডাল আমার হবে।

কিন্তু প্রকৃতির নিরাবরণ মুক্ত রূপের স্পর্শে এই অনুভূতি খোলে। সুপ্ত আত্মা জাগ্রত হয় চৈত্র-দুপুরের অলস নিমফুলের গন্ধে, জ্যোৎস্না-ভরা মাঠে, আকন্দ-ফুলের বনে, পাখীর বেলাযাওয়া উদাস গানে, মাঠের দূর পারে সূর্য্যাস্তের ছবিতে, ঝরা পাতার রাশির সোঁদা সোঁদা শুকনো শুকনো সুবাসে। প্রকৃতি তাই আমার বড় বিশল্য-করণী—মৃত, মূর্চ্ছিত চেতনাকে জাগ্রত করতে অত বড় ঔষধ আর নাই।

আইনস্টাইন্ বলেচেন—বিস্মিত হবার ক্ষমতা একটা বড় ক্ষমতা; যে কোনো কিছু দেখে বিস্মিত হয় না, মুগ্ধ হয় না, সে মৃত, সে বেঁচে নেই। আমাদের দেশের কেউ এ কথা বুঝবেন কি?

এই জন্যেই অল্প বয়সে আমাদের দেশে জীবনের ব্যবসায় দেউলে হয়ে পড়ে—নতুন বিস্ময় নতুন অনুভূতি হয় না, নবতর জীবনের পথ চিরগুপ্ত রয়ে যায় তাদের কাছে—মানুষ দমে যায় জানি—কিছুকাল তার মনে সব শক্তি হয়তো ক্ষীণতর হতে পারে মানি—কিন্তু জীবন্ত যে মানুষ, সে আবার জেগে উঠবে, সে আবার নবতর বংশীধ্বনি শুনবে—নব জীবনের সন্ধান পাবে। অপরাজিত প্রাণ-ধারার কোন্ অদৃশ উৎসমুখ তার আবার খুলে যাবে, বি-জর ও বি-মৃত্যু-আনন্দ তার চিরশ্যামল মনে

আবার আসন পাতবে। বিহার অঞ্চলে দেখেচি শীতের শেষে বনে আগুন দেয়, সব ঘাস একেবারে পুড়িয়ে ফেলে—কি জন্যে? যেই জ্যৈষ্ঠের রৌদ্র পড়বে—ওই দগ্ধ ঝোপ-ঝাড়ের গোড়া থেকে আবার নবীন, শ্যামল, সুকুমার তৃণরাজি উচ্ছ্বসিত প্রাণ-প্রাচুর্যে বেড়ে উঠতে থাকবে—হু-হু করে বাড়ে, পনেরো দিনের মধ্যে সারা কালো গোটা ঘাসের বন ঘন শ্যামশ্রী ধরে—এই তো জীবন, এই তো অমরতা।

তাই ভাবি, মাস বছর ধরে মানুষের বয়স ঠিক করা কত ভুল। ১৩৩৮ সাল পড়ে গেল আজ, আমার বয়স এক বৎসর বেড়ে গেল বটে হিসেব মত—কিন্তু আমি কি দশ বৎসর কিংবা পনেরো বছর আগেকার সেই বালক নেই অল্পবিস্তর?...

সেদিন গেছলাম রাজপুরে অনেক কাল পরে। খিনুর সঙ্গে দেখা হল। আবার পুরনো পুকুরের পথটা ধরে হাঁটলাম—বাঁশগুলো নীচু হয়ে পড়ে আছে—চড়কের সন্ন্যাসীর দল বাড়ি বাড়ি বেড়িয়ে বেড়াচ্চে। দুটোর ট্রেনে ফিরে সাড়ে পাঁচটায় স্কুলের মিটিং করলুম। রসিদকে আজ তাড়ানো হল।

পথে কোন্ জায়গায় ফুটন্ত মালতীলতার ফুলের গন্ধ, জারমলীন আপিসের কাছে—গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের স্মৃতিটা হঠাৎ মনে পড়ল।

সেদিন বঙ্কু বলছিল—বাঁকি-করিমালি। পরিচিত নাম, বাবার মুখে ছেলেবেলায় শুনেছিলাম কবে—ভুলে গেছলাম, যুগান্ত পরে যেন কথাটা আবার শুনলাম বলে মনে হল।

অনেকদিন পরে আজ রবিবারটি বেশ কাটলো। শীঘ্রই গরমের ছুটি হবে, কাল রাত্রে বাইরের বারান্দায় বৃষ্টি পড়াতে বিছানা টানাটানি করে ভাল ঘুম হয় নি, উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। হাতমুখ ধুয়ে কলেজ স্কোয়ারের দোকানটাতে খাবার খেতে গেলুম--ওরা বেশ হালুয়া করে। তারপর গোলদীঘির মধ্যে বসে কামাতে লাগলুম একটা নাপিতের কাছে। ওদিকে অনেকগুলি গাছ, একটা গাছে সোঁদালি ফুল ফুটেছে—এমন একটা অপরূপ আনন্দ ও উত্তেজনা এল মনে ফুটন্ত ফুলেভরা গাছটা দেখে—মনে হল আর বেশী দেরি নেই, এক সপ্তাহ পরে ঐ রকম ফুলেভরা বন-মাঠে গিয়ে 'অপরাজিত'-র শেষ অধ্যায়টা লিখবো—সত্যি, জীবনে দেখেচি ভবিষ্যতের ভাবনায় সব সময়ই এত আনন্দ পাই! ফিরে এসে অনেকক্ষণ বই লিখলুম। দুপুরে একটু ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল—ঘুম আদৌ হল না। বেলা আড়াইটার সময় দরজায় শব্দ শুনে খুলে দেখি নীরদবাবু। তাঁর গাড়ি নীচেই দাঁড়িয়েছিল—দুজনে উঠে একেবারে দমদমায় সুশীলবাবুর বাগানে। সত্যি, ওদের সাহচর্য্য এত সুন্দর লাগে আমার—সত্যিকার প্রাণবন্ত সজীব মন ওদের। সেখানে বাইরের মাঠে চেয়ার পেতে বসে নানা বিষয়ের আলোচনা হল—চা-পান সমাপন হল। শান্তিনিকেতন থেকে অমিয় চক্রবর্ত্তী 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে লিখেচেন, 'বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়'—আর লিখেচেন, 'শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানা কি রকম দেখবো!'

ছটার সময় নীরদবাবুর গাড়ি করে ফিরলুম—কারণ রবিবাসর ছিল প্রেমোৎপল-বাবুর বাড়িতে। আজ খুব মেঘ করেছে, দমদমা থেকে আসতে মেঘান্ধকার পূব-আকাশের দিকে চেয়ে আমার পুরনো ভিটা ও বাঁশবনের কথা, মায়ের কড়াখানার কথা ভাবছিলুম—কি অদ্ভুত প্রেরণাই দিয়েচে এরা জীবনে—সত্যি!...নীরদবাবুও গাড়িতে বললেন, কড়াখানার দৃশ্য তাঁকে সেদিন একটা অদ্ভুত উত্তেজনা ও অনুভূতি এনে দিয়েছিল মনে—গত রবিবারে সেদিন যখন ওঁরা ওখানে গিয়েছিলেন। তারপর এলুম

রবিবাসরে, ওখানে তখন প্রবন্ধ পাঠ শেষ হয়ে গিয়েচে—তরমুজের আইস্-ক্রিম ও খাবার খুব খাওয়া গেল। অতুলবাবুর কাছে একটা Spiritual Circle-এর ঠিকানা নিলুম। নীরদ আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্য্যন্ত এল—অশোকবাবু ও সজনীবাবুদের সম্বন্ধে নানা কথা। সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হল, তিনি যাচ্চেন সুবোধবাবুর পিতৃ-শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে। বাড়ি চলে এলুম।

আজ ভাবচি, গ্রাম সম্বন্ধে একটা সত্যকার ভালবাসা ও টান ছিল শৈশব থেকে আমার মনে। কি চোখেই দেখেছিলুম বারাকপুরটাকে—যখন প্রথম মামার বাড়ি থেকে অনেককাল পরে দেশে ফিরি, পিসিমা ওই দিকের বাঁশবাগান দিয়ে আসেন। কাল তাই যখন শাঁখারীটোলার দখল-করা বাড়িটার সামনে পুরনো জমিদারী কাগজের মধ্যে ১৩১০ সালের একখানা পুরনো চিঠি কুড়িয়ে পেলাম, তখনি মনে হল,—আচ্ছা এমনি দিনে দশ বৎসরের ক্ষুদ্র বালক আমি কি করছিলাম! মনে একটা thrill হল, একটু নেশা-মত যেন!...কোনো সত্যিকার জিনিস মিথ্যে হয় না—সেই বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের মধ্যে দিয়ে আজ দুপুরে নীরদবাবুর গাড়ি করে গেলাম, যে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটের বাড়িতে একদিন কত কষ্টে কালযাপন করেচি!...ওখানেই কষ্ট পেয়েচি, ওখানেই ভগবান সুখ দিলেন। সত্যিকার অনুভূতি অমর, তা বৃথা যায় না—আমার শৈশব-মনের সে জীবন্ত, প্রাণবান্ ভালবাসা, গ্রামের প্রতিটি বাঁশের-খোলা ও গাবগাছটিকে অতি নিকটে আপনার জন বলে ভাববার অনুভূতি ছিল সত্যিকার জিনিস—তাই আজ বহু সমঝদার মনে, সে অনুভূতিটুকু সঞ্চার করতে কৃতকার্য্য হয়েচি। সাহিত্য-সৃষ্টি মেকী জিনিস নয়, তার পিছনে যখন সত্যকার প্রেরণা না থাকে, একটা বড় অনুভূতি বা দৃষ্টি বা ভালবাসা না থাকে—সেটা কখনোই বড় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে না—খুব কলাকৌশল হয়তো দেখানো চলতে পারে, খুব cleverness-এর পায়তারা ভাঁজা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু তা সত্যিকার বড় জিনিস হয়ে উঠতে পারে না কোনো কালেও।

চারিধারে মেঘান্ধকার আকাশের কি শোভাটা আজ রাত্রে।...ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্চে—আমার বহু বাল্যদিনের অনুভূতি মনে আসচে—I am re-living my childhood days—কোন্ দিকটার কথা মনে আসচে আজ?...যেদিন বাবার সঙ্গে তম্‌রেজ ও আমি দক্ষিণ মাঠের চাটুয্যেদের জমি মাপতে যাই, প্রথম দক্ষিণ মাঠ দেখলাম—কত কুশবন, খোলা মাঠ, আকন্দ গাছ, সেই একদিন আর যেদিন আতরালি কালীদের গরুর লেজ কেটে দিয়েছিল, চণ্ডীমণ্ডপে তার বিচার হল—এই দুই দিন।

আজ দুপুরে হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা এসেছিল। একখানা বই দিলাম, নিয়ে গেল।

এইমাত্র ভয়ানক দু-ঘণ্টাব্যাপী ঝড়বৃষ্টি হয়ে গেল—এ বছরে এই প্রথম বৃষ্টি—সামনের রাস্তায় এক হাঁটু জল জমেচে—একটা পাগল কি চীৎকার করে বলতে বলতে যাচ্ছে।

এখনও একটু একটু বৃষ্টি হচ্চে—আর জোর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মোটরগুলো জল ভেঙে যাচ্চে—কি শব্দটা! রবিবাসরে যে বেলফুলের মালাটা দিয়েচে—তার সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। রাত এগারটা।

আজ রাত্রে ঘুমুতে ইচ্ছে হচ্ছে না—একটা উত্তেজনা, একটা অপূর্ব্ব অনুভূতির আনন্দ। অনেকদিন পরে মনে পড়ে একটা কথা। বাবা আড়ংঘাটা থেকে ঘোর জ্বরে অভিভূত হয়ে বাড়ি ফিরে দাওয়ায় উঠেই প্রথম কথা বলেছিলেন—খোকা কৈ, খোকা—? অথচ তিনি জানেন আমি বোর্ডিং-এ আছি। সেই অসুখ থেকে আর তিনি ওঠেন

নি। জীবনে সেই প্রথম শোক। সে কি অপূর্ব্ব অনুভূতির দিনগুলো—তার কি তুলনা আছে? হাজার বছর বাঁচলেও কি সে সব দিনের কথা ভুলবো কখনও!...

এই দীর্ঘ ষোল বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়েই কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েচি!

বাইরের অন্ধকার আকাশটার দিকে চেয়ে ফিরে দাঁড়ালাম। কি অদ্ভুত যে মনে হচ্চিল! ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, কোন্ মহাশক্তির বিরাট কন্দুকক্রীড়া যেন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার প্রাণীদলের উত্থান-পতনে—যুগ-যুগান্তর ধরে প্রাণীদল তাদের অতি সত্যকার হাসি-অশ্রু সুখ-দুঃখ ধরে, কোথায় ভেসে চলে গিয়েচে—ওপরে সব সময় লক্ষ বৎসর ধরে এই মহাশক্তিটি তার বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, জানা অজানা কত শক্তি নিয়ে কোন্ কাজ করেছেন তা বুঝতেও পারচি নে আমরা। মোটে তো পঁয়ত্রিশ বছর এই ব্যাপার দেখচি—তাও না জ্ঞান হয়েচে আজ ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। লক্ষ বৎসরের তুলনায় সাতাশ বৎসর কতটুকু?...সত্যিই এমন সব জীব আছেন, যাঁদের তুলনায় এই পঁয়ত্রিশ বছরের আমি—আমার সৃষ্ট বালক অপুর মতই অবোধ, অসহায়, কৃপা ও করুণার পাত্র—নিতান্ত শিশু! কি জানি, কি বুঝি?...কত আবোল তাবোল ভাবি, কোনোটাই হয়তো সত্যি নয় তার।

সত্যি কি অপূর্ব্ব বৈকাল!...আজ অনেকদিন পরে দেশে ফিরেচি। এই দশ-বারো দিন বৃষ্টির জন্যে আর সুবিধা করতে পারি নি। আজ একেবারে মেঘনির্ম্মুক্ত, অদ্ভুত বৈকালটি। কাল খিনুর বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে পদ্ম-ফোটা লওদার বিলের ধার দিয়ে বাড়ি ফিরি--ফিরতে দেরি হয়ে গেল। আজ তাই দুপুরে খুব ঘুমিয়েচি। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। সত্যি, এ অপূর্ব্ব দেশ...এ ধরনের অনুভূতি, গহন-গভীর, উদাস, বিষাদ-মাখা, আমি কোথাও কখনো দেখেচি মনে হয় না -এ সত্যিই Land of Lotus-Eaters. এত ছায়া, এত পাখীর গান, এত ডাঁসা খেঁজুরের সুগন্ধ, এত অতীত স্মৃতি--বেদনা-মধুর ও করুণ, আর কোথায় পেয়েচি কবে?...শরীর অবশ হয়ে যায়, মন অবশ হয়ে যায় অনুভূতির গভীরতায়, প্রাচুর্য্যে।

এইমাত্র আমাদের ভিটাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—এক টুকরো রেশমী সবুজ চুড়ির টুকরো চোখে পড়ল—কার? হয়তো মনির। মনে হল মায়ের স্মৃতি ভিটার সঙ্গে যেন মাখা। মা এই বৈকালে ঘাট থেকে গা ধুয়ে ফর্সা কাপড় পরে এসে আমাদের খাবার দিচ্চেন---এই ছবিই বার বার মনে আসে। আজ সব জঙ্গল, নিবিড় বনভূমি হয়ে পড়ে আছে! মায়ের সেই সজনে গাছটা আছে, সেই কড়াটা আশ্চর্য্য, পাঁচিলের সেই কুলুঙ্গি দুটো চমৎকার আছে, এখনও নতুন।

ভেবেছিলাম এখনি কুঠির মাঠে যাবো। গিয়ে কি করবো? অনুভূতি কি এখানেই কিছু কম যে, আবার সেখানে যাবো? একদিনে কত সঞ্চয় করি, মনে স্থান দিই কোথায়!...

বকুলগাছ পাখী ডাকচে—বৌ-কথা-ক', বৌ-কথা-ক',—অমূল্য জামগাছে উঠে জাম পাড়ছিল—বুড়ি পিসিমা বললে, সে চারটি জাম দিয়ে গেল, তাই এখন খাবো। আজ আবার গোপালনগরের দলের যাত্রা হবে, এখন স্নান করে এসে যাত্রা শুনতে যাবো।

বেলা খুব পড়ে গিয়েছে—ছায়া ধূসর হয়ে এসেচে। এমন বিকাল কোথাও দেখি নি। আজ আবার ত্রয়োদশী তিথি—মেঘশূন্য সুনীল আকাশে খুব জ্যোৎস্না উঠবে।

আদাড়ি বিল্‌বিলে থেকে জল নিয়ে বাড়ি ফিরচে হরিকাকাদের বাড়ির ওদিকের

সুঁড়ি পথটায়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে, বাল্যে কিসের শব্দটা বেরুতো, সেই শব্দটা বেরুচ্চে। মায়ের কথাই আবার মনে হয়।

অনেক রাত্রে বায়োস্কোপ দেখে ফিরলাম—ঝম্ঝম্ বৃষ্টি, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, মেঘান্ধকার আকাশ, রাস্তায় জল জমে গিয়েচে—তার মধ্যে বাসখানা কেমন চলে এল! যেন এরোপ্লেনে উড়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাচ্ছি।

বাইরের বারান্দাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—একটা Vision দেখলাম—এক দেবতা যেন এইরকম অন্ধকার আকাশপথে, তুষারবর্ষী-হিমশূন্যে এক হাজার আলোক-বর্ষে চলেচেন অনবরত—দূর থেকে সুদূরে তাঁর গতি। কোথায় যাবেন স্থিরতা নেই—চলেচেন, চলেচেন, অনবরত চলেচেন, হাজার বছর কেটে গেল। বিরাম বিশ্রাম নাই—Greatness of space, Undaunted travels of গ্রহদেব।

সেদিন পাঁচুগোপালের সঙ্গে ভগবতীপ্রসন্ন সেনের বাড়ি গিয়েছিলাম। ছেলেবেলাকার সে স্থানটি হয়তো আর কখনও দেখতুম না—কিন্তু আবার সেই 'পরশুরামের মাতৃহত্যা' যাত্রাটি হয়েছিল, সেটি আবার দেখলাম—যে ঘরে বসে বাবার সঙ্গে নিমন্ত্রণ খেয়েছিলাম—ভগবতীবাবু যে রোগীকে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছিলেন কতকাল আগে আমার নয় বছরের শৈশবে—লেখো 'রত্নগর্ভ' বলে, সেই কথাটি মনে পড়ল এতকাল পরে।

সত্যিই জীবনটা অপূর্ব্ব শিল্প—কি বলে প্রকাশ করি এর গভীর অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্য, এর নবীনত্ব, এর চারু কমনীয়তা—আবার সেই পথটি দিয়ে ফিরে এলাম, যে পথে বাবার সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যেতুম।...বিজয়রত্ন সেনের সেই বাড়িটা আজ আটাশ বছর পরে আবার দেখলাম।

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে রামরাজাতলা গিয়েছিলুম ননীর সঙ্গে দেখা করতে। স্নানটা আমার ভাল লাগে নি আদৌ। পল্লীর শ্রী-সৌন্দর্য্য নেই, অথচ শহরের মহনীয়তাও নেই—শহরের মধ্যে দীনতা নেই, কুশ্রীতা কম, যেদিকে চাই, বড় বড় সৌধ, বিশাল আকাশ—আর ওখানে পল্লীর অপূর্ব্ব বনসন্নিবেশ নেই, Space নেই–আছে খোলা ড্রেন, দরিদ্র মিউনিসিপ্যালিটির তেলের আলো আর ওলকচুর বর্ষা প্রবৃদ্ধ ঘেঁষা-ঘেঁষি। ননীর সঙ্গে অনেক কথা হল। ছেলেটির মধ্যে সত্যিই কিছু ছিল, কিন্তু গেঁয়ো হয়ে খুলতে পারছে না। ওকে কলকাতায় এনে ভাল সমাজে পরিচিত করে দেব।

বিকেলে বাসায় ফিরলাম। কি সুন্দর আকাশ!...বৃষ্টি নেই অনেকদিন, অথচ মেঘের পাহাড় নানা স্থানে আকাশে। কেমন যে মনে হচ্চিল, তা কি করে বলি।... বেলা পাঁচটাতে রবিবাসর ছিল প্রবাসী আপিসে। হেমেনের গানের কথা ছিল, প্রথমে অনেকক্ষণ সে এল না। আমি, সজনী, অজিত সকলেই ব্যগ্রভাবে তার প্রতীক্ষায় ছিলাম। রবিবাসরে যাবার পথে রাধাকান্তদের মাস্টার সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা।

সুশীলবাবু বিভূতির কথা উল্লেখ করে অনেক দুঃখ করলেন। সত্যিই ছেলেটি খারাপ হয়ে যাচ্চে সবাই বলে। অক্ষয়বাবুর নাকি মধ্যে একদিন ফিট হয়েছিল গাড়িতে—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফল। ওদের সম্পত্তিটা অভিশপ্ত—সংযম ও উদারতার অভাবে এবং কতকটা কুশিক্ষা ও দাম্ভিকতার ফলেও ওদের সব নষ্ট হয়ে যেতে

বসেচে।

এই সব ভাবচি এমন সময় হেমেন এল, গান আরম্ভ হল। শৈলজা বলছিল তাকে কে কে blackmail করেচে। সাহিত্যক্ষেত্রে এমন দলাদলি সত্যিই দুঃখের বিষয়। নীহারবাবু বললে, ওর কে একজন দাদা 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে বলেচেন, অমন বই আর হবে না। সজনী 'অপরাজিত' নিতে চাইলে। খুব খাওয়া-দাওয়া ও আড্ডা হল। হেমেন সত্যিই বললে বাঙ্গালীর নিষ্ঠা ও সাধনার অভাব—সস্তা হাততালি ও নাম কিনবার প্রলোভনে আমরা যেতে বসেচি।

হেমেন ও আমি নানা পুরনো কথা বলতে বলতে শেয়ালদা পর্য্যন্ত এলাম—ওকে পার্ক সার্কাসের ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে বললুম, পুজোর ছুটিতে লক্ষ্ণৌতে আবার দেখা হবে।

সত্যিই বড় ভালবাসি হেমেনকে।

চাঁদ ওঠে নি, কিন্তু আকাশে খুব মেঘ নেই। খুব হাওয়া।

রাত দশটা—বাসার বারান্দায় বসে লিখচি। দূরের সেই মাকাল-লতা দোলানো ভিটের কথা মনে পড়চে—বর্ষাকালে খুব জঙ্গল বেড়েচে। আজ বৈকালটি কি অপূর্ব্ব হয়েছিল সেখানে...কেবল সেই কথা ভাবি। সেখান থেকে প্রথম জীবন শুরু করেছিলাম- কত পথে চলেচি, কত আলাপী বন্ধুর হাত ধরে—কিন্তু সে জঙ্গলে-ভরা ভিটেটা ভুলেচি!...

ননীকে একদিন সত্যিকার বাংলার রূপ দেখাব।

তারপর সারা রাত আর ঘুম হল না। এত অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাও কলকাতায় আর কখনো দেখি নি যেন—বর্ষাধৌত নির্ম্মল আকাশে সে কি পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না খেলা! সারারাতের মধ্যে আমি ঘুমুতে পারলাম না—গুন্‌গুন্‌ করে গাচ্ছিলাম—

"প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে"

- কেমন একটা আনন্দ ও উত্তেজনা এল—সারারাতের মধ্যে চোখ বুজল না মোটে।

সেদিন নীরদবাবু ও সুশীলবাবুর সঙ্গে মোটরে বহুকাল পরে যশোর গিয়েছিলাম- আবার স্কুলটা দেখলাম, আবার চাঁচড়া দেখলাম। শীতের সন্ধ্যায় চাঁচড়া দশমহাবিদ্যার মন্দির দেখতে দেখতে কি অদ্ভুত ভাব যে মনে জাগছিল—চারিধারের ঘন সবুজ বেত ঝোপ, পুরনো মজা দীঘি—মহলের পর মহল নির্জ্জন, সঙ্গীহীন, ধূসর সান্ধ্য ছায়ায় শ্রীহীন অথচ গভীর রহস্যময় পাথরপুরীর মত দেখাচ্ছিল। পেছনের ঘাট-বাঁধানো প্রকাণ্ড দীঘিটাই বা কি অদ্ভুত!...রাজা রামচন্দ্র খাঁয়ের চাল ধোয়া পুকুরই বা দেখলাম কতকাল পরে! একটা সুন্দর প্লট মাথায় এসেচে।...এই ভাঙা পুরী, বনেদী ঘরের দারিদ্র্য, জীবনের দুঃখ-কষ্ট—Back ground-এ সব সময়ই পুরাতন দিনের আড়ম্বর ও ঐশ্বর্য্য—tradition—এই সব নিয়ে।

সাধনার কথা বলছিলাম কাল কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে। সাধনা চাই। আমি টুইশানি ছেড়ে দেব। অপরাজিত তো শেষ হয়েচে- এইবার ছাপা আরম্ভ হবে—কিন্ত এই সময় সাধনা চাই।

(১) ভাল ভাল উপন্যাসকার ও ছোটগল্প-লেখকদের পুস্তক পাঠ।

(১) ইতিহাস, Biology ও Astronomy সম্বন্ধে আরও বই পড়া।

(৩) Philosophy সম্বন্ধে আধুনিক চিন্তাবিদদের বই পড়া।

(৪) Sir Thomas Browne ও Anatole France-এর বই আরও ভালো করে পড়া।

(৫) চিন্তা, ভ্রমণ, গল্প ও আড্ডা—ভাল সম্প্রদায়ে।

(৬) পল্লীতে যাওয়া ও quaint ধরনের লোকের সংগে আলাপ।

সাধনা ভিন্ন উচ্চ Outlook কি করে develop করে? খানিকটা মাত্র আমার করেচে—আরও চাই—আরও অনেক চাই।

১৯২৫ সালের, কি ১৯৩২ সালের আমি, আর বর্ত্তমান আমি কি এক? অনেক বেড়েচি—সেটা বেশ বুঝতে পারি—এই দুঃখ, খাটুনি, কম মাইনে, ছেলে-পড়ানোর মধ্যে দিয়েও বেড়ে উঠেচি। মানুষ কখন কি ভাবে কোন্ অবস্থার মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠে—তা কেউ জানে না।

ক'টা দিন বেশ কাটল। সেদিন হাওড়ার রায় সাহেব সুরেশ সেনের ওখানে একটা পার্টি ছিল। সুশীলবাবু আমাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে গেলেন—রমেশ-বাবু, নীরদবাবু সবাই সেখানে। তারপর জ্যোৎস্না-রাত্রে গংগার উপর দিয়ে ফেরা গেল। শনিবারে সকালে সকালে কাজ মিটতো, সাহেব এক গোলমাল পাকিয়ে দিলে—বললে, তোমার নাম সিনেট থেকে যায় নি। সিণ্ডিকেটের সেদিনই মিটিং—ছুটির পরে ফণিবাবু ও আমি দুজনে মিলে সুনীতিবাবুর কাছে গেলাম। বাড়িতে দেখা না পেয়ে ইউনির্ভাসির্টি—সেখানে দেখা হল। তারপর আমরা কলেজ স্কোয়ারে অনেক-ক্ষণ বসে গল্প করলুম। সেখান থেকে ইন্‌স্টিটুট্যটে রাগিণী দেবীর নৃত্যকলা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে গেলাম। ফণিবাবু আমাকে Y. M. C. A-এর সামনে ট্রামে উঠিয়ে দিয়ে গেল। আমি X. Libraryতে যাবো। সেখানে সজনীবাবুর সংগে দেখা হওয়ার প্রয়োজন। যাওয়ার সময় তাঁকে সেখানে না দেখে সোজা 'শনিবারের চিঠি' আপিসে চলে গেলাম। সেখানে নেই, আবার এলাম ফিরে, আজ নাকি হরতাল কেউ আসে নি। ওখান থেকে বাস্-এ চেপে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে ভবানীপুরে। শ্যামা-প্রসাদবাবুর সংগে দেখা করেই মুরলীবাবুর বাড়ি। তারপর অনেক রাত্রে ট্রামে বাসা।

পরদিন ছুটির পরে সুনীতিবাবুর সংগে engagement, সকালে সজনীর ওখানে গেলাম। লুচি ও চা সজনীর স্ত্রী যত্ন করে খাওয়ালেন। সেখান থেকে দুজনে 'শনিবারের চিঠি'র আপিস—আমি খানিকক্ষণ প্রুফ দেখে স্কুলে এলাম ও ছুটির পরে ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। প্রথমে এসিস্ট্যাণ্ট কন্ট্রোলারের আপিসে। কেউ নেই—পরে দেখি সাহেব রেজিস্ট্রারের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলুম একটু পরেই সাহেব বেরিয়ে এল। অনেকক্ষণ দুজনে গল্প করা গেল। তারপর হেরম্ববাবু, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব, মিঃ বটম্‌লি, একে একে সবাই এলেন। পাঁচটার পরে আমি ওখান থেকে ফিরে সোজা 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। গোপাল হালদারের সংগে Spiritualism নিয়ে সেখানে ঘোর তর্ক। সুনীতিবাবু এলেন—গল্পগুজবের পরে আমি, সুনীতিবাবু ও প্রমথবাবু তিনজনে গল্প করতে করতে বেরুনো গেল।

সুনীতিবাবু 'পথের পাঁচালী' ইংরাজীতে অনুবাদ করবেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। প্রমথবাবু ইটালিয়ানের প্রোফেসর ইউনিভার্সিটিতে, তিনি আমার সংগে আমার বাড়ি এলেন। আমার বইখানা ইটালিয়ানে অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

ইটালিতে আমায় পাঠানো সম্বন্ধে বললেন। তিনজন ভদ্রলোক এসে দেখি বাসায় বসে আছেন—তাঁরা কালকের একটা পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতে এসেচেন।

সকালে উঠে স্কুলে গেলাম ও শনিবার সকালে ছুটির পরেই বাসায় এলাম। অনেকক্ষণ ঘুমুবার চেষ্টা করা গেল। আন্দাজ চারটার সময় উঠে হ্যারিসন রোড দিয়ে যাচ্ছি—শীতল পেছন থেকে ডাকলে ও একখানা পত্র দিলে। একটা সভা আছে ওদের বাড়ি—আমি সভাপতি। প্রথমে গেলাম হেঁটে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে—সেখানে Copy দিয়ে সোজা হাঁটতে হাঁটতে (খুকীকে যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেছলাম সেই পথটা ধরে) বিডন স্কোয়ার। সেখানে একটা বেঞ্চির উপর বসে কত কথা ভাবলাম! মায়ের পোঁতা সেই সজনে গাছটার কথা এত যে মনে হয় কেন? মনে হল, যে জীবনটায় আর কখনো ফিরবো না—যা শেষ হয়ে গিয়েচে, ওই সজনে গাছটা এখনও কার ফিরবার আসায় সেই দিনগুলির মত পাতা ছাড়চে, ফুল ফোটাচ্চে—ডাঁটা ফলাচ্চে—কে এসে ভোগ করবে? সন্ধ্যার ধূসর আকাশ—দু-চারটে তারা—'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটাও আবার মনে এল—আকাশের তারাদের দিকে চাইলেই ওই অপূর্ব্ব ভাবটা হয়।

তারপর উঠে ওদের বাড়ি গেলাম। মন্মথদের বাড়ি সভা হল। আমায় করলে সেক্রেটারী। সভা ভঙ্গের পর বিভূতি গলা জড়িয়ে ধরে বললে, এখানে রাত্রে খেয়ে যাবেন। তারপরে লাল ঘরে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। পড়বার ঘরে তারপরে বিভূতি কাছে বসে খাওয়ালে। পুরানো দিনের গল্প হল, সব চেয়ে কথা উঠল—'পুত্তলিকা', 'পুত্তলিকা' সে কথা হোল। তারপর রিক্সা করে মাঘী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-রাত্রে পুরনো দিনের মত বাসায় ফিরলাম—সেই প্রতাপ ঘোষের বাড়ির সামনে দিয়ে, থানাটার পাশ দিয়ে। একটা কথা লিখতে ভুলে গিয়েচি, আজ বিকালে প্রবাসী অফিসে Sir P. C. Roy-এর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম।

রবিবারে প্রসাদ এল। বেশ মাথায় বড় হয়েচে—সেই ছোট্ট প্রসাদ আর নেই। তাকে দেখে এমন স্নেহ একটা হল! আমার নাম উঠলেই এখনও সকলে কাঁদে—চাঁপাপুকুরের বড় মাসিমা কাঁদেন, এই সব কথাও বলেন। একটা চাকরির কথা বললে। তারপর আমার নাম এখন প্রায়ই সকলে করেন, সে কথাও বললে। তারপর সে চলে গেল।

আমি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েচি, নীরদবাবু এসে ডাকচেন। দুজনে দমদমা গেলাম—সুশীলবাবু শান্তিকে পড়াচ্ছিলেন—দুজনেই বাইরে এলেন। গল্পগুজব হল—মাঠে বসে চা খাওয়া গেল। আমরা পাঁচটার সময়ে বেরিয়ে শরদিন্দুবাবু ও করুণাবাবুর পার্টিতে এলাম। নরেন দেব, অচিন্ত্য, প্রবোধ সান্যাল, রমেশ বসু—সবাই এল। খুব খাওয়া-দাওয়া হল। প্রচুর খাওয়া! নরেন দেব সন্দেশ খেতে খেতে মুখ লাল করে ফেলে অবশেষে যখন আরও খেতে অনুরুদ্ধ হলেন—মরীয়া হয়ে বললেন, সন্দেশটা ভালো নয়। আমরা বেরিয়ে শেয়ালদা স্টেশনে এসে সুশীলবাবুকে তুলে নিয়ে নীরদবাবুর গাড়ীতে নিউ মার্কেটে গেলাম। কথা রইল বৃহস্পতিবারে 'অপরাজিত' পড়া হবে দমদমার বাগান-বাড়িতে। Wide World কিনে রাতে বাসায় ফিরলাম।

কিন্তু আজই মনটা কেমন উড়ু-উড়ু, মায়ের সেই সজনে গাছটা,—ভাঙা হাঁড়ি-

কুড়ির কথা আজ সারাটা দিন মনে হয়েছে—বিশেষ করে এই জ্যোৎস্না রাত্রে।

এবার সরস্বতী পূজা একটু দেরিতে। কিন্তু ছুটি পাওয়া গেল বেশী। সপ্তাহব্যাপী ছুটি। 'অপরাজিত' প্রায় শেষ হয়ে আসচে—ভাবলাম একবার কেওটা যাবো এসময়ে। নীরদবাবুও রাজী। গত মঙ্গলবার আমি ও নীরদবাবু মোটরে গেলাম দমদমা। সুশীলবাবু যেতে পারবেন না, অতএব আমরা সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে দক্ষিণেশ্বর যাবো বলে বেরিয়ে পড়ি। সুশীলবাবুর স্ত্রীও 'অপরাজিত' শুনবেন বলে দক্ষিণেশ্বর যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। সবাই বেরিয়ে পড়া গেল কিন্তু দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হল না। যশোর রোডের ওপরে একটা নিভৃত বাঁশবনের ছায়ায় বিছানা পেতে বসে আমরা 'অপরাজিত' পড়লাম—তারপর ফিরে এসে চা খেয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে রমেশবাবুর ওখানে নেমন্তন্ন ছিল—সেখানে প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে দেখা।

বুধবার দিনটি কাজ করলাম। বৃহস্পতিবার সকালে বনগ্রামের ট্রেনে চাপলাম—বঙ্কুদের বাসায় পেঁাছে দেখি তরু নেই। হেডপণ্ডিতকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে অঞ্জলি দিলাম। দেবেনের বাসায় গেলাম, তারপর ফিরে এসে তরুর সঙ্গে গল্পগুজব করে চালকী রওনা।

কি অদ্ভুত আমের বউলের সৌরভ, কি শিমুলফুলের শোভা! বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ। কাল পয়লা ফাল্গুন, এমন বসন্তশোভা আমাদের দেশে অনেক-কাল দেখি নি। চালকী পেঁাছে খাবার খেয়ে খুকী, ভোঁদা সবসুদ্ধ উত্তরমাঠে বেড়াতে গেলাম—রস খাওয়া গেল—অনেকটা বেড়ালাম। তারপর ওদের বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আমি আবার গেলাম উত্তর মাঠে—তখন চারিধার নির্জ্জন।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুরে গেলাম। সারাপথে কেমন দক্ষিণা হাওয়া—কি অপূর্ব্ব আমের বউলের গন্ধ! খুকীও সঙ্গে গেল। সকাল সকাল ফিরে স্নান করলাম। তারপর বৈকালে বেরুতে যাবো, বৃষ্টি এল—একটু বসলাম। আবার যাবো—রামপদ এল। তাকে একটু জল খাইয়ে দুজনে একসঙ্গে বার হওয়া গেল। কি অপূর্ব্ব শান্তির মধ্যে দিয়ে এসে পেঁাছলাম। আমি পটপটিতলায় ঘাটের এপারে এসে দাঁড়ালাম—ওপারের রাঙা-রোদভরা মাঠের দৃশ্যটা কি যে অপরূপ! তারপর মাঠের পথ বেয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের পথে আসচি, বেলা পড়ে এসেচে—কি বাঁশের শুকনো খোসা ও ঝরা বাঁশপাতার সুঘ্রাণ!...কতকাল আগের শৈশবের কথা মনে করিয়ে দেয় যে।

রামপদর কাছে বসে একটু তামাক খেয়ে ও গল্পগুজব করে শ্যামাচরণদাদার বাড়ি এলাম। সেখানে অপেক্ষা করলাম। জ্যোৎস্না উঠলে চালকী চলে এলাম। ছেলেপিলেরা এল গল্প শুনবে বলে। বঙ্কু অনেকক্ষণ ছিল।

আজ সকালে উঠে চলে এলুম।

কাল বিকালে সুশীলবাবুদের বাড়ি গেলাম। কি সুন্দর বসন্ত এবার এখানে! বৃষ্টি নেই। দেশে গিয়েছিলাম—সর্ব্বত্র আমের বউলের গন্ধ। আজ সকালে সজনীর বাড়ি গেলাম—স্নান সেরে। বেজায় কুয়াসা! সজনীর স্ত্রী চা ও লুচি খাওয়ালেন। বড় ভালো মেয়েটি।

'অপরাজিত'র শেষ লেখাটা আজ প্রেসে দিয়ে এসেচি। কিছু করবার নেই। হাত ও মন একেবারে খালি। স্কুল থেকে ফিরে নিউ মার্কেটে গিয়ে **'Wide World'** খুঁজে পেলাম না। হাঁটতে হাঁটতে কলেজ স্ট্রীটে এসে কাপড় কিনে এই ফিরচি।

'অপরাজিত'র শেষটা ভাল করে লেখবার জন্যে তিনদিন ছুটি নিয়েছিলাম। একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম—ছুটি ভাল লাগে না। স্কুলটাই ভাল লাগে। বেশ ছেলে-পুলে নিয়ে থাকা—অমিয়, দেবব্রত, বিমলেন্দু, সত্যব্রত এদের সঙ্গ বেশ লাগে। ওরা সবাই শিশু—নীচু ক্লাসের ছেলে। আমাকে মাস্টার বলে ভয় তত করে না, যতটা আপনার লোকের মত ভালবাসে। সব বিষয়ে সাহায্য চায়, troubles খুলে বলে, বেশ লাগে। ওদের নিয়ে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরই পাই না। নিষ্ক্রিয়, Death-in-life ধরণের existence-এর চেয়ে এরকম স্কুল-মাস্টারীও শতগুণে শ্রেয়।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকালে উঠে সজনী দাসের বাড়িতে চলে গেলাম, না খেয়েই—সে এ কয়দিনই অবশ্য যাচ্ছি। কিন্তু আজ গেলাম 'অপরাজিত'র শেষ ফর্ম্মার প্রুফ দেখবার জন্যে। ওখান থেকে স্কুলে। সেখানে দেবব্রতর পরীক্ষা নিলাম। তারপর ইউনিভার্সিটির সামনে সুধীরদার সঙ্গে দেখা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে দেখা হল—সমীর বললে ভালো লিখেচে। শৈলেনবাবুর সঙ্গেও দেখা হল। তারপর এক কাপ চা খেয়ে আবার গেলাম সজনী দাসের ওখানে। প্রমথবাবু ও সজনী বসে। শেষ ফর্ম্মাটা প্রেসে ছাপতে দিয়েচি। তারপরে কি করে 'পথের পাঁচালী' প্রথম মাথায় এল, সে গল্প করলাম।

আজ তাই মনে হচ্ছে, সত্যিই স্মরণীয় দিনটা। ১৯২৪ সালের পূজার সময়টা থেকে এ পর্য্যন্ত প্রায় সব সময়ই এই বই-এর কথাই ভেবেচি। ১৯২৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৩২-এর ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত এমন একটা দিনও যায় নি, যখন আমি এ বইখানির কথা না ভেবেচি—বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন মনোভাব নোট করেচি, মনে রেখেচি—কত কি করেচি! ইসমাইলপুরের জঙ্গলে এমন কত শীতের গভীর অন্ধকার রাত্রি, ভাগলপুরে বড় বাসায় এমন কত আমের বউলের গন্ধ-ভরা ফাল্গুন-দুপুর, কত চৈত্র-বৈশাখের নিমফুলের গন্ধ-মেশানো অলস অপরাহ্ন, বড়বাসার ছাদে কত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাত্রি—অপু, দুর্গা, পটু, সর্ব্বজয়া, হরিহর, রাণুদি এদের চিন্তায় কাটিয়েচি। এরা সকলেই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গে বুঝি বই দুখানির খুব যোগ আছে—চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গে, এ বিষয়ে ভুল নেই—কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়—ভাসা-ভাসা ধরণের। চরিত্র-গুলি সবই কাল্পনিক। সর্ব্বজয়ার একটা অস্পষ্ট ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যাঁরা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্ব্বজয়ার সবখানি আমার মা নন।

আজ রাত অনেক হল। এদের স্কুলের উদ্দেশে বইখানি উৎসৃষ্ট করলাম। যদি সাহিত্যের বাজারে আন্তরিকতার কোনো মূল্য থাকে, তবে আমার ইসমাইলপুরে, ভাগলপুরে বড়বাসার ছাদে আমার বহু বিনিদ্র রজনীযাপনের ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, বই দুখানি লিখতে আন্তরিকতার অভাব আমার ছিল না বা চিন্তার আলস্য আমি দেখাই নি।

আজ সত্যিই কষ্ট হচ্চে। অপু, কাজল, দুর্গা, লীলা—এরা এই সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে আমার আপনার লোক হয়ে পড়েছিল। আজ ওবেলাও প্রুফ দেখেচি, অদল-বদল করেচি—কিন্তু এবেলা থেকে তাদের সকলকেই সত্যসত্যই বিদায় দিলাম। আজ রাত্রে যে কতখানি নিঃসঙ্গ ও একাকী বোধ করচি, তার সন্ধান তিনিই জানেন, যিনি কখনো এমনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে গুটিকতক চরিত্র সম্বন্ধে সর্ব্বদা ভেবেচেন—

তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুরুদুরু বক্ষে চিন্তা করেচেন।

অপুকে জন্ম থেকে ৩৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি কলমের ডগায় সৃষ্টি করেচি। তাকে ছাড়তে সত্যিকার বেদনা অনুভব করচি—তবে সে ছিল অনেকখানিই আমার নিজের সঙ্গে জড়ানো, সেইজন্যে বেশী কষ্ট হচ্চে বিদায় দিতে কাজলকে, লীলাকে, দুর্গাকে, রাণুদিকে—এরা সত্যসত্যই কল্পনাসৃষ্ট প্রাণী। কোনোদিকে এদের কোনো ভিত্তি নেই এক আমার কল্পনা ছাড়া।

যদি দু-পাঁচজনেরও এতটুকু ভাল লাগে বই দুখানা—তবে আমার পাঁচ বৎসরের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো।

সত্যিই মনে পড়ে ইসমাইলপুর থেকে সাবোরে আসচি ঘোড়ায় ভাবতে ভাবতে —নোট করতে করতে। কার্ত্তিক আগুন জ্বাললে সাবোর স্টেশনে। সে জিনিস আজ শেষ হল! যখন 'পথের পাঁচালী' ছাপা হয়েছিল, তখনও 'অপরাজিত' ছিল—বেশীটাই বাকী ছিল—কিন্তু আজ আর কিছু নেই।

রাত্রির অন্ধকার। চাঁদ ডুবে গিয়েচে। শহরের গোলমাল থেমেচে। আমি লিখতে লিখতে বহু দূরের অন্ধকার আকাশের জ্বলজ্বলে নক্ষত্রদের দিকে চেয়ে দেখচি—জীবনদেবতার কি ইঙ্গিত, যেন আগুনের আখরে আকাশের অন্ধকারপটে লেখা।

বিদায়, বন্ধুদল—বিদায়।

আজ সকালে মহিমবাবু এসে অনেকক্ষণ বসেছিল। তারপর স্কুল থেকে গেলাম ইউনিভার্সিটিতে Examiners' Meeting-এ। বেরিয়ে আমি ও সুনীতিবাবু দুজনে গেলাম লিবার্টি অফিসে। টমসন সাহেব সেদিন এলবার্ট হলের বক্তৃতায় 'পথের পাঁচালী'র উল্লেখ করেছেন—নীহার রায়ের মুখে শুনে একখানা কাগজ আনিয়ে নিলাম। তারপর বাসে উঠে সজনীর বাড়ী। সেখান থেকে ফিরে Sample কাগজখানা দেখা এইমাত্র শেষ করলাম। স্কুলে দেবব্রত খাতা দেখাতে কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ওবেলা—তাকে বললাম, তুই আমার ছেলে তো?

সে বললে একটু সলজ্জ হেসে—হ্যাঁ। ও কখনো একথা বলে নি এর আগে। তাই আজ আনন্দে মনটা পূর্ণ আছে সারাদিন।

আজ রাত্রে 'অপরাজিত' বই-এর দ্বিতীয় খণ্ডটা সজনীর কাছ থেকে আনলাম। আজ সকালেই বই বার হয়েছে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থেকে চা খেয়ে ও গ- গুজব করে চলে এলাম।

দ্বিজরাজ জানা মারা গিয়েচে বলে সকালে ছুটি হল। বেরিয়ে আমি যতীনবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ও নিউ মার্কেটে বেড়ালাম। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি গেলাম কাগজের খোঁজে। কাগজ পেলাম না। বীরেনবাবুও ছিল। বেরিয়ে বাসায় এসে একটু ঘুমনো গেল।

এখন রাত। সিঁদুরে মেঘ হয়েচে। মনটা কেমন একটা বিষাদে পরিপূর্ণ—মনটা শূন্য হয়ে গিয়েচে—অপু, দুর্গা, সর্ব্বজয়া, কাজল, লীলা, পটু, বিনি—এরা সব আজ মনের বাইরে চলে গিয়েচে, কতকালের সহচর-সহচরী সব—সেই ইসমাইলপুরে এমন সব চৈত্র অপরাহ্নে Wide World-পড়া দিনগুলো থেকে ওরা আমার

মনের মধ্যে ছিল—কাল একেবারে চলে গিয়েচে।
ওদের বিরহ অতি দুঃসহ হয়ে উঠেচে।

এর আগে ক'দিন মনটা ছিল নিরানন্দ। কেবল গৌরীপুরের মাঠে যেদিন Picnic করতে যাই আমরা—সেদিনটাতে আনন্দ পেয়েছিলাম। সেই আধ-জ্যোৎস্না আধ-আঁধার রাত্রে তালবনের ধারে পুকুরপাড়ে বসে কত কি গল্প—কতকাল ওসব কথা মনে থাকবে!

কাল রাত্রে সাহিত্য-সেবক-সমিতিতে সভাপতি ছিলাম। অচিন্ত্য একটা গল্প পড়লে—গল্পটা মন্দ হয় নি—সেখান থেকে বেরিয়ে অনাথ ভাণ্ডারের থিয়েটার দেখতে যাবো কথা ছিল, কিন্তু অবনীবাবু, সুকুমার ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে জমে গিয়ে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত হৃষিকেশ লাহাদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে আড্ডা দিলাম। সেখান থেকে বা'র হয়ে বাসায় ফিরলাম অনেক রাতে।

আজ বেলা চারটার ট্রেনে শ্রীরামপুরে গেলাম। সেখানে 'আনন্দ পরিষদের' অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে হবে। ছেলেরা ওখান থেকে এসেছিল। অবনীবাবুকে সঙ্গে নেব বলে ডাকতে গেলাম, পেলাম না। ঝন-ঝন করচে দুপুরের রোদ। কিন্তু একটু পরে বেশ মেঘ করে এল। শ্রীরামপুরে শ্রীলীলারানী গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে নিয়ে গেল। লীলারানী দেবী লেখিকা, 'কল্লোল' ও 'উপাসনায় লেখেন। ওপরের বারান্দাতে তিনি বরফ দিয়ে শরবত তৈরী করে খাওয়ালেন ও জলখাবার দিলেন। তাঁর সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এঁদের বাড়ির কাছেই খুকীর শ্বশুরবাড়ি। একবার সাক্ষাৎ করবার ইচ্ছা ছিল। লোকও পাঠালাম --কিন্তু লোক ফিরে এসে বললে কারুর সঙ্গে দেখা হল না।

সভায় যখন আসচি—ওদের বাড়িটা দেখলাম—ভাঙা দোতলা বাড়ি—একটা কয়লার গোলার পাশ দিয়ে পথ। সভার কার্য্য শেষে আবার ভুরিভোজনের ব্যবস্থা। সমবেত ভদ্রলোকেরা আমাকে একটা বড়লোকের বাড়ির দোতলার হলে নিয়ে গেলেন—সেখানেই একটা বড় শ্বেতপাথরের টেবিলে নানারকম ফলমূল, মিষ্টান্ন, শরবৎ সাজানো। এত খাই কি করে? এই শ্রীমতী লীলারানী দেবীর ওখান থেকে খেয়ে আসচি। কে সে কথা শোনে? আনাতোল ফ্রাঁসের Procurator of Judea গল্পটি খেতে খেতে ওঁদের কাছে করলুম—রসের বৈচিত্র্য ও quaintness হিসেবে।

ওরা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। ট্রেনে একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল—বাড়ি জিরেটবলাগড়, বিড়ি খাওয়ালে, অনেক গল্প-গুজব করলে। হাওড়া স্টেশন থেকে হেঁটে বাসায় এলাম। পথে পানিতরের বামনদাস দত্তের সঙ্গে দেখা। আজ পয়লা মে। একটা স্মরণীয় দিন। আজকার সভার জন্যে বা এসব আদরের জন্যে নয়—আজ ১৩ বৎসর হতে সেই ১লা মে-তে—কিন্তু সেকথা আমিই জানি, আর কেউ জানে না। জানবার কথাও নয়। বোলবও না কাউকেও।

বেশ হাওয়া, বাসায় এসে বারান্দায় বিছানা পেতে শুয়ে রইলাম।

আজ মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ পেলাম—অনেক কাল পরে। মনে পড়ে গেল বাল্যে দুপুরে আহার সেরে এই সব দিনে বাড়ির পেছনে বাঁশবনে মুখ ধুয়ে আসতাম। বাঁশবনে গিয়ে আঁচালে তবে মনে একটা আনন্দ আসত—কত তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু একদিন ও থেকে কি গভীর আনন্দই পেয়েছি!...সেই ভিটে, সেই গ্রাম আজও তেমনি আছে—আমিই কেবল বদলে গিয়েচি। আজ রবিবার ফণিকাকারা তাড়াতাড়ি করচে এত রাত্রে হরি রায়ের বাড়িতে তাস খেলতে যাবে বলে—আনন্দ করচে ঝিট্‌কী-

পোতার বাঁওড়ে বড় রুই মাছের বাচ হচ্চে বলে—হাটে আজ মাছ সস্তা হয়েছে বলে—আমিও যদি গ্রামে থাকতুম—আমিও ও থেকে আনন্দ পেতুম ওদেরই মতন—কিন্তু আমি বদলে গিয়েছি একেবারেই। Sophisticated হয়ে পড়েচি, hampered হচ্চি। দৃষ্টির স্বচ্ছতা নষ্ট হয় নি বলে এখনও এসব বুঝতে পারি।

আকাশের অগণ্য তারায় তারায় কত দেবলোক, কত পৃথিবী, কত জগৎ—কত অগণিত প্রাণীকুল, কত দেবশিশু—আনন্দের কি মহান, অসীম ভাণ্ডার! দুঃখও যত বৃহৎ তাদের—আনন্দও তত বৃহৎ। এই ভেবেই, চৈতন্যের এ প্রসারতা শুধু আমার আজ রাত্রে।

আজ সকালে উঠতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ কাল অনেক রাত্রে দম্‌দম্‌ থেকে ফিরেচি। সেখানেই রাত্রে খেলাম, আগামী রবিবারে Outing-এর নক্সা করলাম, তারপর আমি আর নীরদবাবু মোটরে ফিরেছি। আজ এইমাত্র সাহেবের ওখান থেকে আসছি। সাহেব একটু দমে গিয়েচে—আমি ফণিবাবুর সঙ্গে ওটা মিটিয়ে ফেলতে বললুম।

কন্‌ভেন্ট রোডটা অন্ধকার, এখানে-ওখানে যুঁই ও মালতীর সুগন্ধ, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার, নক্ষত্রে ভরা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলুম সাহেবের হাঙ্গামাটা যেন মিটে যায়।

একটা কথা মনে হচ্চে। মানুষের মনের ব্যাপকতা যত বাড়বে ততই সে পূর্ণ মনুষ্যত্বকে লাভ করবে। এমন সব মানুষ জীবনে কতই দেখলাম, তাদের মনের সতর্কতা, চৈতন্যের ব্যাপকতা বড়ই কম। এত কম যে আহার-বিহার ও অর্থো-পার্জ্জনের বাইরে যে আর কিছু আছে তা তারা ভাবতে পারে না। জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, আর্ট বল, সাহিত্য বল—এ সবের কোন মূল্য নেই তাদের কাছে। এমন কি স্নেহ, প্রেম, কল্পনা, বন্ধুত্ব, এ সবও তাদের অজ্ঞাত—loyalty-কে তারা ভীরুতা ভাবে, স্নেহকে দুর্ব্বলতা ভাবে। ফণিবাবু একজন এই ধরনের মানুষ। এ সব লোকের নির্বুদ্ধিতা আমি বরদাস্ত করতে পারি নে একেবারেই। মূর্খতারও একটা সীমা আছে, এদের তাও নেই।

সে যাক। এই চৈতন্যের ব্যাপকতার কথা বলছিলাম। এই মুক্ত প্রকৃতি, সবুজ ঘাসেমোড়া ঢালু নদীতীর, কাশবন, শিমুলবন, পাখীর ডাক—নীল পর্ব্বতমালা, অকূল সমুদ্র, অজানা মহাদেশ—এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, সুন্দরী তরুণী, স্নেহ-ময়ী পত্নী, উদার বন্ধু, অসহায় দরিদ্রদল,—এই বিরাট মানবজাতির অদ্ভুত ইতিহাস, উত্থানপতন, রাজনীতির ও সমাজনীতির বিবর্ত্তন, এই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, গ্রহ, উপ-গ্রহ, নীহারিকা, ধূমকেতু, উল্কা—জানা-অজানা জাগতিক শক্তি,—এই X-ray, বিদ্যুৎ, invisible rays, high, penetrating radiation,—ওই মৃত্যুপারের দেশ, মৃত্যু-পারের বিরাট জীবন—এই রহস্যে স্পন্দমান, অসীম, অদ্ভুত জীবনরহস্য—এই সৌন্দর্য্য, এই বিরাটতা, এই কল্পনার মহনীয়তা,—এসবে যারা মুগ্ধ না হয়, গরু-মহিষের মত ঘাস-দানা পেলেই সন্তুষ্ট থাকে, যারা এই রহস্যময় অসীমতার সম্বন্ধে অজ্ঞ, নিদ্রিত ও উদাসীন রইল—সে হতভাগ্যগণ শাশ্বত ভিখারী—তাদের দৈন্য কে দূর করতে পারবে?

মানুষের মন যত উদার হবে, যত সে নিজের চৈতন্যকে বিশ্বের সর্বদিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে, অণুর চেয়ে অণু, মহানের চেয়েও মহান, বিশ্ববস্তুর প্রতি আত্মবুদ্ধিকে যত জাগ্রত করে তুলতে পারবে—সে শুধু নিজের উপকার করবে না,

নিজের মধ্য দিয়ে সে শতাব্দীর সঞ্চিত অন্ধকারজাল ও জড়তাকে প্রতিভার ও দিব্য-দৃষ্টির আলোকে প্রসারিত করে দিয়ে যাবে। সেই সত্য—সত্য নিত্যকালের মশাল্‌চি।

সেদিন চারু বিশ্বাসের বাড়িতে অনেক রাত পর্য্যন্ত মিটিং হল। রাত দশটার পরে সেখান থেকে রওনা হয়ে আসতে গিয়ে লাউডন স্ট্রীটের মোড়ে একটা টায়ার গেল ফেটে। মৌলালীর মোড়ে আবার মহরমের বেজায় ভিড়। অনেক কষ্টে রাত্রে বাড়ি পৌঁছলাম। ভোরে স্নান সেরে বসে আছি, নীরদবাবু গাড়ী নিয়ে এলেন। চা পান করে দম্‌দম্‌ থেকে বেরুনো গেল। বনগাঁর পথে এ গাড়িরও একখানা টায়ার গেল। বনগাঁয়ে পৌঁছে বাজার করে বেলেডাঙ্গা পৌঁছুতে বেলা নয়টা। বটতলায় গিয়ে কাঠ কুড়িয়ে সবাই মিলে রেঁধে খেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের বাড়ি এলাম—সেখান থেকে নৌকা করে নকু-দুলের ঘাট পর্য্যন্ত বেড়ালুম—সবাইপুরের ঘাটে স্নান করলুম। তারপরে সেদিন রাত্রে দম্‌দমাতে ফিরে খেয়ে আবার এলুম বাসাতে।

এবার বাড়ি গিয়ে বড় গোলমাল। ক'দিন বেশ কেটেছিল, শ্যামাচরণদাদার স্ত্রীর স্নেহ বড় উপভোগ করেচি—বৌদি বড় ভাল মেয়ে—আমার শ্রদ্ধা হয়েচে। বর্ষা-বাদলের দিনে পুঁটিদিদির বাড়ি গরু-বাছুরের সঙ্গে একঘরে বাস করে মনটা খিঁচড়ে ।। ওখানে এবার তুফন্‌ ঠাকরুন মারা গেলেন। আসবার আগের দিন তাঁর শ্রাদ্ধ হল। রোজ বিকেলে বকুলতলায় বসতুম। জগা ছড়া বলত—

"অশন বসন রণে সদা মানি পরাজয়,
দুনয়নে বারিধারা গঙ্গা যমুনা বয়—
কথায় কথায় তুমি যেতে বল যমালয়,"—ইত্যাদি

ছেলেমানুষের মুখে বেশ লাগত।

কিছুদিন কলকাতা গিয়ে রইলাম—একদিন নীহার রায়ের ওখানে গেলাম, সেখানে তার অনেক বন্ধুবান্ধব বসে আছে, 'অপরাজিত' সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হল। নীহার বললে—'অপরাজিত' একটা Great Book, আমি এঁদের সেই কথাই বলছিলাম, আপনি আসবার আগে। ধূর্জ্জটিবাবুর বাড়িতে একদিন 'অপরাজিত' নিয়ে আলোচনা হল আমার সঙ্গে। ভদ্রলোক অনেক জায়গা দাগ দিয়ে পড়েচেন, মার্জ্জিনে নোট লিখে। তারপর নীরদের বাড়িতে চা-পার্টি উপলক্ষ্যে সুনীতিবাবু ও রঙীন্‌ হালদারের সঙ্গে সে সম্বন্ধে অনেক কথা হল।

রবিবারে গেছলাম, আবার পরের রবিবারে ফিরি। সেদিন রাণাঘাটে নেমে কি ভয়ানক বর্ষা। গোপালনগরে নামলাম, অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। অতি কষ্টে গাড়ি যোগাড় করে ফিরলাম। হাটবার, সুশীলবাবু একটা মোট পাঠিয়েছিলেন শ্যামাচরণদাদাদের জন্যে—সেটা তাঁদের দিলাম।

কাল খুব গুমট হয়েছিল। বৈকালে জেলি, সরলা এরা পড়তে এল—বকুল-তলায় চেয়ার পেতে বসে খুকুর সঙ্গে খুব গল্প করলুম। রিমঝিম বর্ষার মধ্যে মেঘ-ভরা আকাশের তলা দিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ওপরে বর্ষাস্রোত বয়, গাছ-পালা, সবুজ তৃণভূমি—বৃষ্টিতে চারিধারে ধোঁয়া-ধোঁয়া—তারপর গেলাম ওপাড়ার ঘাটে। জল গরম—নেমে স্নান করতে করতে চারিদিকে চেয়ে সে কি আনন্দ পেলাম—মাথার উপর উড়ন্ত সজল মেঘরাশি, জলের রং কাকের চোখের মত, কি সুন্দর কদম গাছটার রূপ—মনে হল ভাগলপুরের সেই অপূর্ব্ব সবুজ কাশবনের চর—সুদূর-প্রসারী প্রান্তরের সেই সুন্দর প্রাণ-মাতানো স্মৃতিটা—সেও এমনি বর্ষা-সন্ধ্যা, এমনি মেঘেভরা আকাশ—হাতীর পিঠে চড়ে আমীনের সঙ্গে সেই বেড়ানোটা। আমি জলে সাঁতার দিলাম। মনে হল যেন আমি পৃথিবীর কেউ নই—আমি দেবতা—এই মুহূর্ত্তে

পাখা ছেড়ে এই মেঘ-ভরা আকাশ চিরে ওপারে বহু দূরে কোথায় উড়ে যাবো!

এমন আনন্দ সত্যিই অনেকদিন পাই নি।

এখনও সোঁদালিফুল আছে—কিন্তু এবার অতিরিক্ত বর্ষায় অনেক অনিষ্ট করেচে—অনেক ফুলই ঝরে পড়ে গিয়েচে। সোঁদালিফুল এত ভালবাসি যে ঘাটে নাইবার সময় ঘাটের ধারে যে গাছগুলো আছে, সেদিকের ফুলের ঝাড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকি—নইলে যেন প্রাণের আনন্দ সম্পূর্ণ হয় না। দু-এক ঝাড় যা আছে, তাদেরও চেহারা বড় শ্রীহীন। কি করি, ওদের নিয়েই যা একটু আনন্দ পাই!...

আগের দিন জগন্নাথকে সঙ্গে নিয়ে বেলেডাঙার মাঠে গিয়েছিলাম। এ দিন বৃষ্টি ছিল না, সুন্দর মাঠ তৃণাবৃত, সোঁদালিফুল এখনও গাছে গাছে খুব। দুটি রাখার ছেলের সঙ্গে কতক্ষণ বসে গল্প করলাম, মাঠে ছুটোছুটি করে বেড়ালাম, নদী-জলে সন্ধ্যায় নাইতে নেমে সাঁতার দিলাম খুব। মোড়টা ফিরতে কুঠীর পথে একটা ঝোপের মধ্যে একটা ডালে কি ফুল ফুটে আছে—বাল্যজীবনের কথা মনে করিয়ে দেয়—এক সময়ে এরাই ছিল সহচর, এদের সব চিনি।...

রোজ খেয়ে উঠে মুখ ধোবার সময় খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশতলার দিকে যাই। ঐ সময়টা বহু পুরাতন দিনের কথা মনে পড়ে যেন—পুরাতন বাল্য-দিনগুলি প্রতিদিন ঐ সময়টাতে ফিরে আসে।

এখনও গ্রীষ্মের ছুটি এবার শেষ হয় নি। পরশু পর্য্যন্ত আছে। কিন্তু খুল-বার সময় হয়েচে। মনটা বড় খারাপ হয়ে আসচে। কত কথা যে মনে আসচে—কত গ্রীষ্মের ছুটি এ রকম করে কাটল। অথচ দেশে তো আমার কেউ নেই—যখন ছিল সে ছিল আলাদা কথা।...

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসটা বড় বর্ষা। যখন বাঁশতলী গাছে আম পেকে টুকটুক্ করছে, যখন যুগল কাকাদের চারা বাগানে আম পাকচে—তখন বর্ষার আকাশ এমন ঘন মেঘাচ্ছন্ন, যেন শ্রাবণ মাস কি আষাঢ় মাস। যে সময়ে কলেজে পড়বার সময়ে আমি বেলেডাঙার পথের বটতলার শান্ত আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার নিরাশ্রয়তার মধ্যে চলে আসতুম, খুব কষ্ট হত। এবারে কিন্তু কত দিন পর্য্যন্ত আমি রইলাম! কি সুন্দর বর্ষাদৃশ্য এবার দেখলাম ইছামতীর চরে, ইছামতীর কালো জলের ওপরে! কি বড় বড় মেঘের ছায়া!...ঘাটের পথে খেজুর গাছটায় খেজুর এখনও বোধ হয় খুঁজলে দু-একটা পাওয়া যাবে।

ওদের নিয়ে রোজ পাঠশালা করতুম, খুকু sentence লিখত, জগা ছড়া বলতো ঃ—

'এঁতল বেঁতল তামা তেঁতল
ধর তো বেঁতল ধরো না'—

কি মানে এর, ও-ই জানে—অথচ কি উৎসাহেই আবৃত্তি করত! শিবু ও সুরো ধনুকবাণ নিয়ে যাত্রা করতে আসত, খুকু কত রাত পর্য্যন্ত বসে আমার কাছে গল্প শুনত,—জ্যোৎস্না উঠে যেত তবুও সে বাড়ি যেতে চাইত না। এক-একদিন আবার দুপুরে এসে বলত, গল্প বলুন। আসবার দিন বকুলতলায় বসে ওকে খাতা বেঁধে দিলাম, sentence করতে দিয়ে বলে এলাম, এসে আবার দেখব।

"মায়ের ভাঙা কড়াখানা উল্টে পড়ে গিয়েছে, ভিটেটাতে বড় বেশী জঙ্গল হয়েচে —অপু" যেমন বইতে লিখেচি।

কুঠীর মাঠে গিয়ে এক-একদিন গামছা পেতে শুয়ে থাকতুম—খুব হাওয়া, বড় চমৎকার লাগত। কিন্তু যখন ইছামতীর জলে নাইতে নামতুম সকালে ও বিকেলে—সেই সময়ই সকলের চেয়ে লাগত ভালো। ও পাড়ার ঘাটের সামনে সবুজ ঢালু ঘাস-

ভরা মাঠ ও আঁকাবাঁকা শিমুলগাছটা যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে তুলত চোখের সম্মুখে তা কাকে বলি, কে-ই বা বুঝবে? যখন আসি তখনও বৌ-কথা ক' ছিল, তখনও পাপিয়া, কোকিল ডাকত, অথচ তখন তো আষাঢ় মাস পড়েই গিয়েছিল।

এবার এ-বাড়ি ও-বাড়ি এত নিমন্ত্রণ সবাই করে খাইয়েছে—কেন জানি না, অন্য-বার এত নিমন্ত্রণ তো করে না।

দেবব্রতকে কত কাল দেখি নি—তার মুখ ভুলেই গিয়েছি—এতকাল পরে এইবার দেখব।

সেদিন বনগাঁয়ে গেছলাম—সকালে খুকীর সঙ্গে পাকা রাস্তায় সাঁকোতে কত খেলা করলুম। খুকী কত ফল তুললে, পাতা তুললে, আমিও কত ফল পেড়ে নিয়ে এসেছিলাম ; খুকী রাঁধলে। খুকীর সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলা খেলে ভারী আনন্দ পাই।* খুকী কিন্তু পড়াশুনো করে না, এই ওর দোষ। খুকু এর মত নয়, খুকু খুব বুদ্ধিমতী, পড়াশুনোয় খুব ঝোঁক।

বনগাঁয়ে সেদিন বোটের পুলে বিশ্বনাথ, দেবেন, সরোজ সবাই বসে গল্প করছিল, আমি যেতে অনেকক্ষণ বসে গল্প হল, বিশ্বনাথ নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে খুব খাওয়ালে। রাত্রে এই দিন বঙ্কুর বাসায় খাওয়ার পরে জ্যোৎস্নায় বেড়াতে বেড়াতে বনগাঁ স্কুলের ফটকে ঠেস দেওয়ানো বেঞ্চিটার ওপর গিয়ে বসলাম। কত কথা মনে আসে ! চব্বিশ বছর আগে একজন বারো বছরের ক্ষুদ্র বালক একা বাড়ি থেকে ভর্ত্তি হতে এসে ওই জায়গাটাতে লাজুক ভাবে চুপ করে বসে ছিল—কতকাল আগে! সেদিন আর আজকার মধ্যে কত তফাত তাই ভাবি। হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের সামনে বেড়িয়ে এলাম—বোর্ডিং-এর সব ঘরের সামনে বেড়ালাম। কিন্তু পর পর সেদিনের কথাটা মনে আসছিল—একটি ছোট ছেলে বর্ষায় জলা ও আষাঢ়-শ্রাবণের আউশ ধানের ক্ষেত ভেঙে এক-গা কাদা মেখে চাদর গায়ে, মায়ের কাছ থেকে ভর্ত্তি হওয়ার সামান্য টাকা ও দুটি পয়সা জলখাবারের জন্যে বেঁধে এনে লাজুক মুখে চুপ করে ওই স্কুলের পৈঠার উপর বসে আছে—এমন মুখচোরা যে, কাউকে বলতে পারচে না ভর্ত্তি কোন্ ঘরে হয়, বা কাকে বলতে হবে?

সেই ছোট ছেলেটি চব্বিশ বছর আগেকার আমি...কিন্তু সে এত দূরের ছবি, যে আজ যেন তার ওপর অলক্ষিতে স্নেহ আসে।

ওঃ, এবার যেন ছুটিটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্চে। সেই কবেকার কথা, সুশীলবাবুর স্ত্রী বটতলায় ভাত রেঁধে আমাদের পরিবেশন করে খাইয়েছিলেন, আমরা কাঠ কুড়িয়েছিলাম, যুগল এসে দাঁড়িয়ে কথা কয়েছিল—সে কত দিনের কথা। তারপর গোপালনগরের বারোয়ারী, তুফন্ ঠাকুরুণের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, সে সবও কতকালের কথা। বড় চারার আম কেনা, মাঠের চারার আম কেনা, সে সবও আজকার কথা নয়। আঁচানোর সময়ে খুড়িমাদের বাড়ির পিছনে গাছপালা ও বাঁশবনের দৃশ্যটা এত অদ্ভুত যেন একেবারে শৈশবে নিয়ে যায় এক মুহূর্তে।

জীবনের রূপ ও সৌন্দর্য্যে ডুবে গেলাম। হে ভগবান্! এর তুলনা দিতে পারি নে।

পঞ্চানন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল, ইউনিভার্সিটির একটি brilliant ছেলে, রেবতীবাবুর বন্ধু। পথে আসতে আসতে অবনী ও শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা। তারা মনোজের বাড়ি কাঁঠাল-খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে চলেচে। বৃষ্টি আসচে দেখে

* খুকু এবং খুকী এক নয়,—খুকু থাকে বারাকপুরে আর খুকী বনগাঁয়ে।

আমি দৌড় দিলাম।

বাসায় এসে ঠিক করলুম এই ঘরটা আমি একলা নেব। এ বৎসরটা খুব পড়ব, লিখব, চিন্তা করব। Prescott's Peru, Shackleton's Voyages ও Historiography-র ভালো বই এবার পড়তে হবে—যদিও Prescott আমার পড়া আছে, তবু আর একবার পড়ব। চিন্তায় যে নির্জ্জনতা চাই, তা ঘরে একা না থাকলে হবে না। Crystallography সম্বন্ধে কিছু পড়তে হবে।

এ কয় মাস এই খাতাখানা হারিয়ে গেছল। তাই মাস পাঁচেক ধরে এতে কিছু লেখা হয় নি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খাতাখানা ছিল আমার বাক্সটাতে, সে বাক্সটা কতবার খুঁজেচি খাতাখানার জন্যে, তবু সন্ধান পাই নি। আজ পালিতদের তারাপদবাবু এলেন সন্ধ্যার সময়ে। তাঁদের সেই ঠিকুজী-কুষ্ঠীখানা আমার কাছে অনেক দিন পড়ে আছে, তাই ফিরিয়ে নিতে এলেন। বাক্স খুলে ঠিকুজীখানা খুঁজতে খুঁজতে এ খাতাখানাও বার হয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে—এই পাঁচ মাসের মধ্যে—আমার জীবনের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সব দিক থেকে পরিবর্ত্তন। জানু মারা গিয়েচে, ওর সংসার পড়েচে আমার ঘাড়ে, জীবন ছিল দায়িত্বহীন, অবাধ—এখন আমি পুরোদস্তুর ছা-পোষা গেরস্ত মানুষ। বনগাঁয়ে বাসা করে ওদের সব সেখানে এনে রেখেচি। সেটা যখন আমার কর্ত্তব্য, তখন তা আমায় করতেই হবে, স্বার্থপর হতে পারব না কোনদিন।

আরও পরিবর্ত্তন হয়েচে। ক্লারিজ সাহেব চলে গিয়েচে, দেবব্রত চলে গিয়েচে। কোথায় গিয়েচে, বা দেবব্রতের কি হয়েচে তা আমি লিখব না। কিন্তু আমার মনে যে ব্যথা লেগেচে এতে—ভেবে দেখবারও অবকাশ পাই নে সব সময়। এক-একবার গভীর রাত্রে মনে পড়ে, ঘুম আসে না চুপ করে থাকি—অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করি—সে ব্যথা বড় সাংঘাতিক—যাক্ ও-কথা আর লিখে কি হবে!

সেদিন শিবরাত্রি গেল। এই শিবরাত্রির সঙ্গে আমি সেদিন বসে বসে হিসেব করে দেখছিলাম যে, জীবনের কত সুখ-দুঃখের কাহিনীই না জড়িত রয়েচে! মধ্যে একদিন এসেছিল বনগাঁয়ের হরবিলাস—নৃপেন রায়ের নতুন কাগজের জন্যে, (তার নাম আমি আজই করে এসেছি 'উদয়ন')—তাকে বললুম—তোমাদের বাসাটা আমায় দেবে? আমি গভীর রাত্রে বসে-বসে ভাবছিলাম, তা যদি হয়, ওরা যদি বাসাটা ছেড়ে দেয়—তা হলে সেখানে কি করে বাস করব? কত কথাই না মনে পড়বে! মনে পড়বে আমি যখন বালক, কিছুই বুঝি নে—বনগাঁয়ে হেডমাস্টার মহাশয়ের বেতের বিভীষিকায় দিনরাত কাঁটা হয়ে থাকি—সেই সব দিনের কথা। সেই এক শিবরাত্রি—কিন্তু না তার আগেও শিবরাত্রির কথা আমার মনের মধ্যে জাগ্রত আছে। ছেলেবেলায় হালিসহর থেকে সেই যে এসেছিলাম—ছোট মামা প্রভাতী গান করত বৈষ্ণবদের সুরে—আমি শীতে কাঁপতে কাঁপতে নদী থেকে নেয়ে আসতুম—জীবনের সেই প্রথম শিবরাত্রি যার কথা মনে আছে। তারপর অবিশ্যি বনগাঁয়ের ঐ শিবরাত্রি। ওঁরা এসে বাইরের ঘর থেকে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন মন্ত্র পড়াতে—বেশ মনে আছে। তাই ভেবেছিলাম এতকাল পরে—জীবনের এত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের পরে আবার হরবিলাসদের বাসায় থাকব কেমন করে?

ছোট খুকী সম্প্রতি মারা গেছে। ও কেন এসেছিল তাই জানি না। আট মাস বেঁচে ছিল—কিন্তু এত দুঃখ পেয়ে গেল এই অল্পদিনের মধ্যে তা আর কাকে বলি? ও আপন মনে হাসত—কিন্তু সবাই বলত "আহা কি হাসেন, আর হাসতে হবে না, কে তোমার হাসি দেখচে?" ওর অপরাধ—ও জন্মাবার পর ওর বাবা মারা গেল!

সত্যিই ওর হাসি কেউ চাইত না। ওর বাবা তো মারা গেল ; ওর মারও সঙ্কটাপন্ন অসুখ হল—ওকে কেউ দেখত না—ওর খুড়িমা বললে—টাকা পাই তো ওকে মাইয়ের দুধ দি। ওকে নারকোলতলায় চট পেতে শুইয়ে রাখত উঠানে—আমার কষ্ট হ'ত—কিন্তু আমি কি করব? আমি তো আর স্তন্যদুগ্ধ দিতে পারি নে? ওর রিকেট্‌স্‌ হল। দিন দিন শীর্ণ হয়ে গেল—তবুও মাঝে মাঝে বনগাঁয়ের বাসায় বাইরের দালানে শুয়ে সেই অকারণ অর্থহীন হাসি হাসত—সেদিনও তেমনি হাসতে দেখে এসেছি ...ও-শনিবারে যখন বাড়ি থেকে আসি। Unwanted smile! কিন্তু সে হাসি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে গত মঙ্গলবার থেকে—খয়রামারির মাঠে ওর বালিশটা পড়ে আছে সেদিন দেখেচি—এ ছাড়া আর কোন চিহ্ন কোথাও রেখে যায় নি ও। Poor little mite! কিন্তু আমি বলি ও হাসি শাশ্বত,—এই বসন্তে বনে বনে ঘেঁটুফুলের দলে ফুটেচে, ফুলে ফুলে কত কাল ধরে ফুটে আসচে—কালের মধ্যে দিয়ে ওর জীবনধারা অপ্রতিহত, প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও নিত্য—খুকীর হাসিও তেমনি।

পার্ক সার্কাস থেকে ট্রামে আসতে আসতে তারা-ভরা নৈশ আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে এ সত্য জেগেচে—এই ঘূর্ণ্যমান, বিশাল নাক্ষত্রিক জগৎ, এই সৃষ্টিমুখী নীহারিকায় প্রজ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের রাশি—এই অনাদ্যন্ত মহাকাল—এরা যেমন নিত্য, যতটুকু নিত্য, যে অর্থে নিত্য, তার চেয়ে কোন অংশে কম নিত্য নয় আমার অবোধ, অসহায়, রোগশীর্ণ খুকীর দন্তহীন কচিমুখের অনাদৃত, অপ্রার্থিত, অর্থহীন, অকারণ হাসিটুকু। বরং আমি বলচি তা আরও বড়—এই বিশ্বের কোথাও যেন এমন একটা বিপুল ও সুপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম নীতি আছে, উদীয়-মান সবিতার রক্তরাগের মত তা অন্ধকারের মধ্যে আলোর সঞ্চার করে, জড়ের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন জাগায়, সকল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে—এইজন্য অর্থযুক্ত করে যে, যে গৌরবে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য রূপ পেয়েচে, মহিমময় হয়েছে—সেই বর্ণ সবিতার দান, আদিম অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা বসুন্ধরার মুখের আবরণ অপসারিত করেছেন সবিতা তাঁর আলোর অঙ্গুলির স্পর্শে—তাকে সার্থক করেচেন, জাগ্রত করেচেন, মাটির মূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা তাঁরই তেজোময় মন্ত্রে।

খুকীর হাসি সবিতার ওই অমৃতজ্যোতির মত, তা মৃত্যুঞ্জয়ী, তা বিশ্বের জড়-পিণ্ডে প্রাণের সঞ্চার করে, বিপুল সৃষ্টিকে অর্থযুক্ত করে, গৌরবময় করে।

তা মিথ্যা নয়, অনিত্য নয়,—তা শাশ্বত, তা অমৃত। এবং তা সম্ভব হয়েচে সৃষ্টির ওই অধ্যাত্মনীতির আইনে—ও নীতি অমোঘ—ওর শক্তি ও ওর সত্য, অস্তিত্ব অন্তরতম অন্তরে অনুভব করতে পারি—কিন্তু ভাষায় বোঝানো যায় না।

* বেলা পড়ে এসেচে। রাঙা রোদ দূরের পাহাড়ের মাথায়, শালবনে, রাঙা-মাটির টিলার গায়ে। চারিধার কত নিঃশব্দ—আকাশ কেমন নীল—অনেকদিন এমন মনের আনন্দ পাই নি—কলকাতার মুমূর্ষু নিস্তেজ মন কাল সারারাত ও আজ সারাদিনের মাঝে বন্য-সৌন্দর্য্য দেখে, প্রথম বসন্তে ফুটন্ত পলাশ বনের ও ধাতুপ ফুলের প্রাণবন্ত রূপ দেখে—ইব্‌ স্টেশনের অরণ্য-নদী-পর্ব্বত সমাচ্ছন্ন বিরাট পটভূমির দৃশ্যে একমুহূর্ত্তে তাজা হয়ে উঠল—কি ঘন শাল-পলাশের বন—কি সুন্দর জনহীন প্রান্তর, দূরে দূরে নির্জ্জন পর্ব্বতমালা—মন অভিভূত হয়ে পড়ে কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরে মাথা সতেজ হয়ে ওঠে। রোদ কি অপূর্ব্ব রাঙা হয়ে এসেচে—স্টেশনের পাশের পথটা দিয়ে সোমড়ার হাট থেকে সাঁওতালী মেয়েরা হাট করে ঝুড়ি

* সম্বলপুর

মাথায় নিয়ে যাচ্চে। হাটটায় এইমাত্র আমি, প্রমোদবাবু ও কিরণবাবু বেড়াতে গিয়েছিলাম—বেগুন, রেড়ির বীজ্, কচি ইঁচড়, চিংড়ি, কুমড়ো, খই, মুড়ি বিক্রি করচে। এক জায়গায় একটি সাঁওতালী যুবতী ধান দিয়ে মুড়কী নিচ্চে। এই হাটের সামনে একটা প্রাকৃতিক জলাশয়ে আমরা স্নান করলুম। ভারী আনন্দ পেয়েচি আজ—ভাগলপুর ছেড়ে আসবার পরে এত আনন্দ সত্যই অনেককাল পাই নি।

রোদের রাঙা রং অতি অপূর্ব্ব!

ডাকবাংলো থেকে লোক জিজ্ঞেস করতে এসেচে আমরা রাত্রে কি খাব।

† সকালে আমরা রওনা হলাম। পথে কি সুন্দর একটা পাহাড়ী ঝরনা। সির-সির করে পাহাড়ী নদী বয়ে চলেচে। কতকগুলি লোক একটা কাঠের পুলের ওপর খড় বিছিয়ে দিচ্চে। তারা বললে, পাটোয়ারীর ছেলে এ-পথে চলে গিয়েচে। পাহাড়ী করবীর দল জলের ধারে ফুটে রয়েচে। শান্ত শাল-পলাশের বনের ছায়া। এখানেই সবাই উড়িয়া বুলি বলচে। এমন ভাল লাগে!

নীল আকাশের তলে অফুরন্ত বাঁশের জঙ্গল। শাল-পলাশের বনে রোদ ক্রমে হলদে হয়ে আসচে। প্রিণ্ডোলা থেকে গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে ৭।৮ মাইল পথ হেঁটে দুপুরে বিক্রমখোলে পেঁছিলাম। বিক্রমখোলের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথরে উৎকীর্ণ লিপি আবিষ্কৃত হয়েচে—তাই দেখবার জন্য আমরা এখানে এসেচি। লেখাটা ভারী চমৎকার জায়গায়—একটা Limestone-crag-এর নীচে ছায়াভরা জায়গায় প্রাকৃতিক ছোট একটা গুহা মত—তারই গায়ে লেখাটা। চারিধারে বন যেমন গভীর তেমনি সুন্দর—পথের মধ্যে জঙ্গলে কত ধরনের গাছ। আমলকী ও হরিতকীর বন—আমরা আমলকী ফল কুড়িয়ে খেতে খেতে এলাম। প্রিণ্ডোলা গাঁয়ের পাটোয়ারী আমাদের জন্যে মুড়কী ও দুধ নিয়ে এল। উড়িষ্যার এই গভীর জঙ্গলে সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিলালিপি ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেচে।

জায়গাটা অতীব গভীর অরণ্যময়—কি অপূর্ব্ব নীল আকাশ অরণ্যের মাথায়—কি অপূর্ব্ব নিস্তব্ধতা...পাহাড়ের crag, তার ছায়ায় আমরা কতক্ষণ বসে রইলাম—ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে করে না—ইচ্ছা হয় না যে আর বেলপাহাড়ে ফিরি। আবার গাড়িতে উঠি। আবার কলকাতায় যাই।

প্রিণ্ডোলা নামে একটা গাঁ পাহাড়ের পাদদেশে—এইখান দিয়ে বিক্রমখোল যেতে হয়। আমরা বেলা দশটার সময় এখানে পেঁছিলাম। একটু পরেই পাটোয়ারী গাড়ি করে এল। গাঁয়ের 'গাঁউঠিয়া' অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের নাম বিম্বাধর—সে তাড়াতাড়ি আমাদের জন্যে দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল খাবার জন্যে। একটু বিশ্রাম করে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম—দেখাশুনো করে ফিরে আবার গাঁয়েই এলাম। ওবেলাকার নাচের দল নাচ দেখালে। আমরা একটা ফটো নিলাম। আমাদের কোন অদৃষ্ট-পূর্ব্বক জীব ভেবে এখানকার লোকেরা ঝুঁকে পড়েচে—দলে দলে এসে আমাদের চারিপাশে দাঁড়িয়েচে। প্রমোদবাবু মুখে সাবান মেখে দাড়ি কামাচ্ছে—এরা অবাক হয়ে চেয়ে আছে—এ দৃশ্য আর কখনো দেখে নি বোধ হয়। ফটোগ্রাফ নেবার সুবিধার জন্য নাচ হল পথের ওপর—ঝন্-ঝন্ করচে রোদ—নাচওয়ালীদের মুখের ওপর বড় রোদ্দুর পড়েচে দেখে আমি পরিমলবাবুকে তাড়াতাড়ি snapটা সেরে

---

† বিক্রমখোলের পথে

নিতে বললুম।

নাচ গান শেষ হল। প্রমোদবাবু, পরিমলবাবু ও কিরণ হেঁটে রওনা হলেন বেলপাহাড়ে। আমার পায়ে ফোস্কা পড়েচে বলে হাঁটতে পারা গেল না। গরুর গাড়িতে ওঁদের জিনিসপত্র নিয়ে আমি ঘণ্টাখানেক পরে রওনা হলাম। দেখলাম—আর্য্যাবর্ত্তের সমতলভূমি বাদে ভারতের সবটাই এই ধরনের ভূমি। B. N. R,-ই দেখ না কেন—সেই খড়্গপুর থেকে আরম্ভ হয়েচে রাঙামাটি, পাহাড় ও শালবন—আর বরাবর চলেচে এই চারশ মাইল—এর পরও চলেচে আরও চারশ মাইল—চারশ মাইল কেন, আরও আটশ মাইল বম্বে পর্য্যন্ত। অরণ্যের দৃশ্য সেখানে যেতে আরও গম্ভীর—সহ্যাদ্রির মহিমময় ঘাটশ্রেণীর অপরূপ দৃশ্যের তুলনা কোথায়। ওদিকে মহীশূর, নীলগিরি—মালাবার উপকূলের ট্রপিক্যাল ফরেস্ট—আর্য্যাবর্ত্তের সমতল-ভূমি পার হয়েই অতুলনীয় হিমালয়, Alpine meadows, ভারতের প্রকৃতরূপই এই—এই রাঙামাটি, পাহাড়, শালবন—এই আসল ভারতবর্ষের রূপ। বাংলার সমতল-ভূমিতে সারা জীবন কাটিয়ে আমরা ভারতের প্রকৃত রূপটি ধরতে পারি নে। অবশ্য বাংলার রূপ অন্য রকম, বাংলা কমনীয়, শ্যামল, ছায়াভরা। সেখানে সবই যেন মৃদু ও সুকুমার—গাছপালা থেকে নারী পর্য্যন্ত। এ সব দেশের মত রুক্ষ ভাব ওখানে তো নেই!

মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। কি জ্বলজ্বলে নক্ষত্রগুলো—যেন হীরের টুকরোর মত জ্বলচে!...বিরাট—বিরাট প্রকৃতি এখানে শিবমূর্ত্তি ধরেচে। কমনীয় নয়, সুষ্ঠু নয়, কিন্তু উদার মহিমময় বিরাট। বিরাট is the term for it.

হঠাৎ খুকীটার কথা মনে পড়ে গেল। ওর সেই অবোধ, অনাদৃত হাসিটুকুর কথা মনে পড়ল। এই বিরাট প্রকৃতি, ওই নক্ষত্রজগৎ, বিশাল উদার Space-এর মধ্যে ওর স্থান কোথায়? মরে সে কোথায় গেল? তার ক্ষুদ্র জীবনীশক্তি নিয়ে ও কি এদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত! Poor mite, what chance had she—a helpless thing?

কিন্তু বনের এই হলদে তিলের ফুলের থোকা—প্রথম বসন্তে যা থোকা থোকা ফুটেচে—তা দেখলে মনে আশা জাগে। আমি বলতে পারি—এই বিরাটতার সঙ্গে মঙ্গল মিশে আছে, এই মহিমময় সন্ধ্যায় আত্মার সত্যদৃষ্টি খুলে যায়। বুদ্ধি দিয়ে সে জিনিস বোঝা যায় না, তর্কযুক্তির পথে তা ধরা দেয় না—তা প্রাণের মধ্যে আপনা-আপনি ফুটে ওঠে, নির্জ্জন ধ্যানের মধ্যে দিয়ে—অপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যে দিয়ে। মুখে বলে সে সব বোঝানো কি যায়?

ফিরে দেখি ডাকবাংলোতে ওরা আসে নি। আমি একাই অনেকক্ষণ বসে রইলাম। সামনে চাঁদ উঠেচে নক্ষত্র জ্বলচে। অনেকক্ষণ পরে ওরা এল। বললে, স্টেশনের কাছে একটা হায়েনা মেরেচে। আমি একটা শালপাতার পিকা আনিয়ে খেলাম।

সারারাত্রি আমরা গল্প করে জাগলাম। শেষ রাত্রে আমি কয়েকবার উঠে এসে এসে বাইরে দাঁড়ালাম—চাঁদ দূরে পাহাড়ের মাথায় অস্ত গেল। রাঙা হয়ে গেল চাঁদটা—অদ্ভুত দেখতে হয়েচে!...

অনেক রাত্রে আমরা স্টেশনে এলাম। বেজায় শীত। ভোরবেলার দিকে ট্রেনটা এল। রাতে কি কষ্ট—মালের বস্তার ওপর বসে বসে ঢুলছিলাম—পরিমলবাবুকে জায়গাটা ছেড়ে দিলাম।

ভোর হল কুলুঙ্গা স্টেশনে। কি অপূর্ব্ব পর্ব্বতের ও জঙ্গলের দৃশ্য! এমন

wilderness আমি খুব কমই দেখেচি। যে স্টেশনে আসি—সেইটাই মনে হয় আগেকার চেয়ে ভাল। নোটবুকে বসে বসে নোট করি, কি কি সেখানে আছে। গোইলকেরা স্টেশনটি বড় সুন্দর লাগল। শাল জঙ্গল, পাহাড়, স্থানটাও অতি নির্জ্জন। বাংলাদেশের কাছে যত আসি ততই সমতল প্রান্তর বেশী। খড়্গপুরের ওদিকে কলাইকুণ্ডা জায়গাটি এ হিসাবে বেশ ভাল।

বাংলাদেশে গাড়ি ঢুকল। তখন বেলা একেবারে চলে গেছে। এ আর এক রূপ, অতি কমনীয়, শান্ত শ্যামল। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন শান্ত হয় কিন্তু এর মধ্যে বিরাটত্ব নেই, majesty নেই—হৃদয় মন বিস্ফারিত হয় না, কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠে অসীমতার দিকে ছুটে চলে না। এতে মনে তৃপ্তি আসে—ছোট-খাটো ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা ভাবায়, নানা পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—মানুষ যা নিয়ে ঘরকন্না করতে চায় তার সব উপকরণে যোগায়। হাসি অশ্রু মাখানো লজ্জাবনতা পল্লীবধূটি যেন—তার সবই মিষ্টি, কমনীয়। কিন্তু মানুষের মন এ ছাড়া আরও কিছু চায়, আরও উদ্দাম, অশান্ত, রুক্ষ, রুদ্র ভাব চায়। বাংলাদেশে তা যেন ঠিক মেলে না। হিমালয়ের কথা বাদ দি—সেটা বাংলার নিজস্ব একচেটে জিনিস নয়—আর তার সঙ্গে সত্যিকার বাংলার সম্বন্ধই বা কি? পদ্মা?...সেও অপূর্ব্ব, সন্দেহ নেই—কিন্তু সে আদরে পালিতা ধনীবধূ, একগুঁয়ে, তেজস্বিনী, শক্তিশালিনী, যা খুশি করে, কেউ আটকাতে পারে না—সবাই ভয় করে চলে—খামখেয়ালী—রূপবতী—তবে মিষ্টি নয়—high-bred রূপ ও চাল-চলন। ঘর-কন্না পাতিয়ে নিয়ে থাকবার পক্ষে তত উপযোগী নয়।

কলকাতা ফিরে পরদিনই নীরদবাবুর বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল সন্ধ্যায়। আমার আবার একটু দেরি হয়ে গেল। সুশীলবাবু মাঝের দিন আমার বাসায় এসেছিলেন—বঙ্গশ্রী অফিসে আমায় Phone করেছিলেন—যাবার সময় পার্ক সার্কাস থেকে ওঁর বাসা হয়ে গেলাম। সতীশের সঙ্গে একটা আফিমের দোকানে আজ আবার দেখা হল। কদিন ধরেই উড়িষ্যা ও মানভূমের সেই স্বপ্নরাজ্য মনে পড়েচে—বিশেষ করে মনে পড়চে আসানবনী ও টাটানগরের মধ্যবর্ত্তী সেই বনটা—যেখানে বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মধ্যে শালের জঙ্গল—পত্রহীন দীর্ঘ গাছগুলিতে হলদে কি ফুল ফুটে আছে—কেবলই ভাবচি ওইখানে যদি একটা বাংলো বেঁধে বাস করা যায়—ওই নির্জ্জন মাঠ বন, অরণ্যানীর মধ্যে!

অপরাহ্নে ও জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে তাদের রূপ ভাবলেও মন অবশ হয়ে যায়।

সকালে উঠে দীনেশ সেনের বাড়িতে এক বোঝা পরীক্ষার কাগজ পেশ করে এলুম। সারা পথে মুচুকুন্দ চাঁপার এক অদ্ভুত গন্ধ! বিজয় মল্লিকের বাগানে একটা গাছে কেমন থোকা থোকা কাঁচা সোনার রঙের ফুল ধরেচে। বড় লোভ হল—ট্রাম থেকে নেমে বাগানের ফটকের কাছে গিয়ে দারোয়ানকে বললাম—ঐ গাছতলাটায় একবার যেতে পারি? সে বললে—নেহি। সংক্ষেপে বললে, আমায় সে মানুষ বলেই মনে করলে না। আবার বললুম—দু একটা ফুল নিয়ে আসতে পারি নে? তলায় তো কত পড়ে আছে। সে এবার অত্যন্ত contemptuous ভাবে আমার দিকে চেয়ে পুনরায় সংক্ষেপে বললে—নেহি।

ভাল, নেহি তো নেহি—গড়ের মাঠে খিদিরপুর রোডের ধারে অনেক মুচুকুন্দ ফুলের গাছ আছে, ট্রামে আসবার সময় দেখে এসেচি, সেখান থেকে কুড়িয়ে নেব এখন।

তারপর এলাম নীরদবাবুর বাড়ি। সেখানে খানিকটা গল্পগুজব করে গেলাম

শ্যামাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি। পাশের বৈঠকখানায় রমাপ্রসাদবাবু আছেন দেখলাম—শ্যামাপ্রসাদবাবুও তাঁর লাইব্রেরী ঘরে কি কাজ করছিলেন। সেখানে খানিকটা থাকার পরে বাসায় ফিরলাম।

বৈকাল বেলা। আজ রামনবমী। কতদিনের কথা মনে পড়ে। বৈকালে বসে বসে তাই ভাবছিলাম—বেলা পড়ে এসেচে—কত পাপিয়ার ডাকভরা এই সময়ের সেই পুরাতন দুপুরগুলো।...বাঁশের শুকনো পাতার কথা কেন এত মনে হয় তা বুঝতে পারি নে। সুভদ্রাকে কাল যখন পত্র লিখলুম—তখনও বাঁশবনের কথা ও শুকনো পাতার রাশির কথাই মনে এল। পাপিয়ার গানের কথা বিশেষ করে মনে আছে। এই সব দিনের অতীত দুপুরগুলোর সঙ্গে পাপিয়ার গান জড়ানো আছে, আর জড়ানো আছে অদ্ভুত ধরনের wild আনন্দ!...

বেলা পড়ে এসেচে। গোসাঁই-পাড়ার নারকোলতলায় আজও তেমনি মেলা বসচে, অতীত দিনের মত। বাদা ময়রা মুড়কি ও কদ্‌মা বিক্রী করচে. গোপালনগর থেকে হয়তো যুগল ও হাজরা ময়রা তাদের তেলে-ভাজা জিবে-গজা ও জিলিপীর দোকান নিয়ে এসেচে।

বাবার সেই শ্লোকটা—অনেক কালের সেই আমবনের ছায়ায় উচ্চারিত শ্লোকটা আজও আমার মনে আছে। পুরনো খাতাখানা আজও আছে. নষ্ট হয় নি।

সকালবেলা। নেড়াদের ছাদে বসে লিখচি ; গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে এসেচি।

বাস্তবিকই গ্রামের লোকের সংকীর্ণতা এত বেশী—মনকে বড় পীড়া দেয়। এদের মন চারিধার থেকে শৃঙ্খলিত—খুলবার অবকাশ নেই। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার এই দশা দেখচি. এদের আচার শুষ্ক ও সৌন্দর্য্যবর্জ্জিত - স্বাস্থ্যনীতির সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

কাল বিকেলে নদীর ধারে গিয়ে অনেকক্ষণ একলা বসে ছিলাম। বাংলা দেশের, বিশেষ করে আমাদের অঞ্চলের প্রকৃতির এই যে সৌন্দর্য্য—এ অন্য ধরনের। কিছু-দিন আগে আমি উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানকার বন পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের কথা যা লিখেছিলাম—এখানে বসে মনে মনে বিচার করে দেখে আমি বুঝলাম তার অনেক কথা আমি ভুল লিখেছিলাম। বাংলার সৌন্দর্য্য more tropical এখানে অল্প একটু স্থানের মধ্যে যত বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালা ও লতা আছে—ওসব দিকে তা নেই। এখানে বৈচিত্র্য বেশী। নীল আকাশ ওখানেও খোলে—মনে অন্যরকম ভাব আনে, তা মহনীয়, বিরাট—এ কথা ঠিকই। কিন্তু বাংলার আকাশ—বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কি গ্রাম্য নদীর উপরকার যে আকাশ—তার সৌন্দর্য্য মনে অপূর্ব্ব শিল্প-রসের সৃষ্টি করে—মনে বৈচিত্র্য আনে। হয়তো বিরাটতা নেই. ঠিকই—কিন্তু Poetry of Life এতে যেন বেশী। বাঁশগাছে ও শিমুলগাছে এ দেশের, বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের, সৌন্দর্য্যকে এক অভিনব রূপ দিয়েচে। জ্যৈষ্ঠ মাসে এর সঙ্গে গ্রামে জোটে কচি উলুবন ও আউশ ধানের ক্ষেত। এত সবুজের সমাবেশ আর কোথাও দেখি নি—a feast of green—তবে গ্রামের মধ্যে মুক্ত আকাশ বড় একটা দেখা যায় না,—ওই একটা দোষ। বড় চাপা। কিন্তু মাঠে, নদীর ধারে—মুক্তরূপা প্রকৃতি যেমনি লীলাময়ী তেমনি রূপসী। উদার প্রান্তর, উদার আকাশ—নানা বর্ণের মেঘের মেলা অস্তদিগন্তে, সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে মেঘ-চাপা গোধূলির আলোয়, গাছপালায়, শিমুলগাছের মাথায়, নদীজলে, উলুখড়ের মাঠে কি যে শোভা!...

একথা জোর করে বলতে পারি বিক্রমখোলের পাহাড় ও বনের ওপারে যে আকাশ দেখেছিলাম—মাধবপুরের চরের ওপারের বৈকালের আকাশ তার চেয়ে মনে অনেক বেশী বিচিত্র ভাবের সৃষ্টি করে।

এইমাত্র নাগপুর শহরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী মালভূমিতে মোটরে বেড়িয়ে ফিরে এলাম। একথা ঠিকই যে বাংলার রূপ যতই সুন্দর হোক, বিরাটতায় ও গম্ভীর মহিমায় এসব দেশের কাছে তা লাগে না। উড়িষ্যার বন-পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের চেয়েও এর সৌন্দর্য্য বিরাট ও majestic। বাংলা দেশের রূপ নিতান্তই নিরীহ পল্লীবধূর মত লাবণ্যময়ী, লাজুক টিপ-পরা ছোট্ট মুখটি। কিন্তু এদেশের highland-এর রূপ গর্ব্বদৃপ্ত সুন্দরী রাজরানীর মত।

"Pure Logical thinking can give us no knowledge whatever of the world of experience. The knowledge of reality begins with experience and terminates with it. Reason gives the structure to the system and the data of experience and their mental theory."
relations are to correspond exactly with the consequences in the

Einstein,
Herbert Spencer Lecture, Oxford, 1933

Lucian's Satires,

Celsac (178 A. D.) writes :—

"Christians are like a council of frogs in a marsh. Their Teachers are mainly weavers and cobblers, who have no power over men of education and taste. The qualification for conversion are ignorance, and childish timidity. Like all quacks they gather a crowd of slaves, children, women and idlers."

Senecca—Economy.

"He is born to serve but few, who thinks only the people of his own age. Many thousands of years, many generations of men are yet to come : look to these, though from some cause silence has been imposed on all of your own day; then will come those who may judge without offence and without favour."

[আমি 'অপরাজিত'-র এক স্থানে অবিকল এই ভাবই ব্যক্ত করেচি। অনেক পূর্ব্বেই করেচি—তখন তো আমি সেনেকার এ উক্তিগুলি পড়ি নি—কিন্তু কি চমৎকার মিল আছে!]

অনেকদিন লিখি নি, মনে ছিল না। হঠাৎ আজ মনে হল তাই সামান্য এক-টুকু লিখে রাখলাম। আজকার তারিখটা অন্ততঃ খাতায় থাকুক।

আজ বৈকালে নাগপুর এসে পৌঁছেচি। এবার পুজোয় এখানেই আসবো ঠিক করে রেখেছিলাম। আজ সারাদিন গাড়ির ঝাঁকুনিতে বড় কষ্ট হয়েচে। গত মাসকয়েক আগে যে বেলপাহাড়ে এসেছিলাম সে স্টেশনটা আজ রাতে...শেষ রাতে বেরিয়ে

চলে গেছে, দেখতে পাই নি। বিলাসপুর পর্য্যন্ত তো বেশ এলাম। বিলাসপুর স্টেশনে আমরা চা খেলাম। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুর পর্য্যন্ত প্রায় একই এক-ঘেয়ে দৃশ্য—সীমাহীন সমতলভূমি এক চক্রবালরেখা থেকে অন্য চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দৃশ্য বড় একঘেয়ে, প্রায়ই ধানের ক্ষেত ও জলাভূমি—মাঝে মাঝে ছোট ছোট শালবন। রাঙামাটিও সব জায়গায় নেই। বেলপাহাড়ের মত পাহাড় ও জঙ্গল এ পথে কোথাও নেই—এক ডোঙ্গরগড় ছাড়া। ডোঙ্গরগড় ছাড়িয়ে তিন-চারটা স্টেশন পর্য্যন্ত দৃশ্য ঠিক আমি যা চাই তাই। উভয় পাশে ঘন অরণ্য, শাল, খয়ের ও বন্যবাঁশ, মাঝে মাঝে পাহাড়ী নদী, পর্বতমালা। উড়িষ্যার বনের চেয়েও এ বন অধিকতর গভীর কিন্তু এইটুকু যা, তারপর আবার সেই একঘেয়ে সমতলভূমি—নাগপুর পর্য্যন্ত। বাংলাদেশে এত অনন্তপ্রসারী দিক্‌চক্রবাল দেশের কল্পনাও করতে পারা যায় না।

এই সব স্থানে জ্যোৎস্না রাত্রে ও অল্প রাত্রে যে অদ্ভুত দেখতে হবে তা বুঝতে পারলাম—তবু মনে হল বনভূমির বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য যা বাংলাদেশে আছে, তা এসব অঞ্চলে নেই। বাংলার সে কমনীয় আপন-ভুলানো রূপ এদের কৈ? এখানকার যা রূপ তা বড় বেশী রুক্ষ। অবশ্য ডোঙ্গরগড় স্টেশন ছাড়িয়েই যে পাহাড় পড়ে—এমন অনাবৃত শিলাস্তূপ, এত গম্ভীর-দর্শন উন্নতভূমি বাংলার কোথাও নেই একথা ঠিক—কিন্তু বাংলায় যা আছে, এখানকার লোকে তা কল্পনাও করতে পারবে না।

বৈকালে নাগপুরে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোয় এসে উঠলাম। তারপর চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটা বড় পাহাড় আছে, শালবনে আবৃত, নীচে দিয়ে মোটরের পথ আছে। দুজনে সেখানে একটা শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলাম। হাওয়া কি সুন্দর! দুজন ভদ্রলোক পথে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁদের চেহারা দেখে আমার মারহাট্টি সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের কথা মনে পড়ল।

সন্ধ্যাতারা উঠেচে। পাহাড়ের বনভূমি অন্ধকার হয়ে এল। দূরে বনের মাথার দিকে চেয়ে দেখলাম—ওদিকে সাতশ মাইল প্রান্তর, অরণ্য, নদী পার হয়ে তবে ব্যারাকপুর। হাটবার, আজ রবিবার, সন্ধ্যা হয়েচে, কাঁচিকাটার পুল দিয়ে গণেশ মুচি হাট করে ফিরচে, আর বলতে বলতে যাচ্চে—হাটে বেগুন আজ খুব সস্তা।

—এত জায়গা থাকতে ও জায়গার কথা আমার এত মনে হয় কেন?

আর মনে পড়ে আমাদের পোড়ো ভিটের পশ্চিম ধারের সেই কি অজানা গাছ-গুলো, যার সঙ্গে বাল্য থেকে আমার কত পরিচয়—ওগুলোর কথা মনে কল্পনা করলেই আবার আমার বারো বছরের মুগ্ধ শৈশব যেন ফিরে আসে।

কাল বৈকালে এখানকার মহারাজবাগ ও মিউজিয়াম দেখলাম। মিউজিয়ামে অনেক পুরনো শিলাখণ্ড আছে—কয়েকটি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর। বিলাস-পুর জেলায় একটা ডাকাতের কাছে পাওয়া কতকগুলো তীর দেখলাম, ভারী কৌতূহলপ্রদ জিনিস বটে। একটি জীবন্ত অজগর সাপ দেখা গেল। মহারাজবাগে একটা বড় সিংহ আছে, কিন্তু সে-সব যতই ভাল লাগুক, সে-সব নিয়ে আজ লিখব না। আজ যা নিয়ে লিখতে বসেচি, তা হচ্চে আজকার বিকেলের মোটর-ভ্রমণটি।

নাগপুর শহরের চারিধারে যে এমন অদ্ভুত ধরণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট স্থান আছে সে-সব কথা আমি কখনও জানতুম না। কেউ বলেও নি। শহরের উত্তর দিকে পাহাড়ের ওপরকার রাস্তা দিয়ে আজ আমরা মোটর নিয়ে গিয়েছিলাম। যোধ-পুরী ছাত্রটি আমাদের নিতে এসেছিল। সে যে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, তা লিখে

প্রকাশ করতে পারি নে। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অস্তদিগন্ত রঙে রঙে রঙীন। বহু-দূরে দূরে, উচ্চ মালভূমির সুদূর প্রান্ত সান্ধ্যছায়াচ্ছন্ন, দিক্‌চক্রবালরেখা নীল শৈলমালায় সীমাবদ্ধ, সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে যেদিকে চাই, ধূধূ বৃক্ষহীন, অন্তহীন উচ্চাবচ মালভূমি, শৈলমালা, শিলাখণ্ড,—দু-চারটা শালপলাশের গাছ। মাথার উপর অপূর্ব্ব নীল আকাশ, ঈষৎ ছায়াভরা কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসচে—পিছনের পাহাড়টি ক্রমে গাড়ির বেগে খুব দূরে গিয়ে পড়চে, তার ওপরকার বৃক্ষশ্রেণী ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসচে—সামনের শৈলমালা ফুটে উঠেছে—ক্রমে অনেক দূরে সিতাবলডির পাহাড় ও বেতার টেলিগ্রাফের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। তার নীচে চারিদিকের মালভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা একটা খাঁজের মধ্যে নাগপুর শহরটা। এমন একটা মহিমময় দৃশ্যের কল্পনা আমি জীবনে কোনদিনই করতে পারি নি—বাংলাদেশ এর কাছে লাগে না—এর সৌন্দর্য্য যে ধরনের অনুভূতি ও পুলক মনে জাগায়, বাংলাদেশের মত ভূমিসংস্থান যে সব দেশের সে সব দেশের অধিবাসীদের পক্ষে তা মনে কল্পনা করাও শক্ত। উড়িষ্যার দৃশ্যও এর কাছে ছোট বলে মনে হয়—সেখানে জঙ্গল আছে, বুনো বাঁশের ঝাড় আছে বটে, কিন্তু এ ধরনের অবর্ণনীয় সুমহান, বিরাট, রুক্ষ সৌন্দর্য্য সেখানকারও নয়। তখন আমি এসব দেখি নি, কাজেই উড়িষ্যাকেই ভেবেছিলাম এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের চরমতম সৃষ্টি। আমি বনশ্রী খুব ভালবাসি, বন না থাকলে আমার চোখে সে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যই নয়—কিন্তু বন না থাকলেও যে এমন অপূর্ব্ব রূপ খুলতে পারে, এমন Superb অনুভূতি মনে জাগতে পারে তা আমার ধারণাও ছিল না।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেচে। এখানে পাহাড়ের ওপর দুটো হ্রদ আছে, একটার নাম আম্বাজেরী আর একটার নাম কি বললে যোধপুরী ছাত্রটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুটোই বড় সুন্দর—অবিশ্যি আম্বাজেরী হ্রদটা অনেক বড় ও সুন্দরতর। এ হ্রদের সামনে কলকাতার ঢাকুরে লেককে লজ্জায় মুখ লুকাতে হয়। এর গম্ভীর মহিমার কাছে ঢাকুরিয়া লেক বাল্মীকির কাছে ভারতচন্দ্র রায়। এর কি তুলনা দেব? ম্লান জ্যোৎস্না উঠল। যোধপুরী ছাত্রটি লোক ভাল, কিন্তু তার দোষ সে অনবরত বকচে। প্রমোদবাবু তার নাম রেখেচেন 'মুলো'—সে চুপ করে থাকলে আমরা আরও অনেক বেশী উপভোগ করতে পারতুম।

আসবার পথটিও বড় চমৎকার—পথ ক্রমে নেমে যাচ্চে—দুধারে সেই রকম immensity। মনে হল আজ পূজার মহাষ্টমী—দূর বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে এখন এই সন্ধ্যায় মহাষ্টমীর আরতি সম্পন্ন হয়ে গেছে, প্রাচীন পূজার দালানে নূতন জামা-কাপড় পরে ছেলেমেয়েরা মুড়ি-মুড়কি, নারকোলের নাড়ু কোঁচড়ে ভরে নিয়ে খেতে খেতে প্রতিমা দেখচে। বারাকপুরের কথা, তার ছায়াঘেরা বাঁশবনের কথাও এ সন্ধ্যায় আজ আবার মনে এল। সজনে গাছটার কথাও—সেই সজনে গাছটা।

মহাষ্টমীতে আজ ক্র্যাডক্‌-টাউনে প্রবাসী বাঙালীদের দুর্গোৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। নাগপুরে বাঙালী এত বেশী তা ভাবি নি ; ওরা প্রসাদ খাবার অনুরোধ করলে—কিন্তু নীরদবাবুকে রুগ্ন অবস্থায় বাসায় রেখে আমরা কি করে বেশীক্ষণ থাকি?

মারাঠী মেয়েরা রঙীন শাড়ি পরে সাইকেলে চেপে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। আমরা মহারাজবাগের মধ্যের রাস্তা দিয়ে এগ্রিকালচারাল কলেজের গাড়িবারান্দার নীচে দিয়ে ভিক্টোরিয়া রোডে এসে পৌঁছুলুম। রাত সাড়ে সাতটা, জ্যোৎস্না মেঘে ঢেকে ফেলেচে।

সেদিন বনগাঁয়ে ছকু পাড়ুইর নৌকাতে সাতভেয়েতলা বেড়াতে গিয়েছিলাম—এবার বর্ষায় ইছামতী কূলে কূলে ভরে গিয়েছে—দুধারের মাঠ ছাপিয়ে জল উঠেচে—তারই ধারের বেতবন, অন্যান্য আগাছার জঙ্গল বড় ভাল লেগেছিল। অত সবুজ, কালো রংয়ের ঘন সবুজ,—বাংলা ছাড়া আর কোথাও দেখা যাবে না, বনের অত বৈচিত্র্য ও রূপ কোথাও নেই—নীল আকাশের তলায় মাঠ, নদী, বনঝোপ বেশ সুন্দর লেগেছিল সেদিন। কিন্তু আজ মনে হল সে যত সুন্দর হোক, তার বিরাটতা নেই—তা pretty বটে, majestic নয়।

চারিধারে জঙ্গলাবৃত—গাছপালার মধ্যে হ্রদটা। হ্রদের বাংলোতে বসে লিখচি। প্রমোদবাবু বলচেন, সূর্য্য ঢলে পড়েচে শীগগির লেখা শেষ করুন। এখান থেকে আমরা এখন রামটেক্ যাব। কি গভীর জঙ্গলটাতে এইমাত্র বেড়িয়ে এলাম—বুনো শিউলি, কেঁদ, আবলুস, সাঁইবাবলা সব গাছের বন। সামনে যতদূর চোখ যায় নীল পর্ব্বতমালা বেষ্টিত বিরাট হ্রদটা। এমন দৃশ্য জীবনে খুব কমই দেখেচি। পাহাড়ে যখন মোটরটা উঠল—তখনকার দৃশ্য বর্ণনা করবার নয়। সময় নেই হাতে, তাই তাড়াতাড়ি যা-তা লিখচি। সূর্য্য ঢলে পড়েচে—এখনও এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী রামটেক্ দেখতে যাব। প্রমোদবাবু তাগাদা দিচ্চেন। বনশিউলি গাছের সঙ্গে বনতুলসী গাছও আছে—কিন্তু তা পাহাড়ের বাইরের ঢালুতে। একটা সুন্দর গন্ধ বেরুচ্চে। মোটরওয়ালা কোথায় গিয়েছে—হর্ন দিচ্চি—এখনও খোঁজ পাই নি। পাহাড়ের গায়ে ছায়া পড়ে এসেচে। দূরের পাহাড় নীল হতে নীলতর হচ্চে। এখানে হ্রদের সাজানো বাঁধানো সিঁড়ি ভেঙে জল সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। বাংলোয় চৌকিদারের কাছ থেকে জল চেয়ে দুজনে খেলাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়। ড্রাইভারটা কোথায় ছিল—হর্ন দিতে দিতে এল। প্রমোদবাবু ছড়ি ফেলে এসেছেন—হ্রদের ঘাটে নেমে আনতে গেলেন। ফিরে বললেন—ছায়া আরও নিবিড়তর হয়েছে বনের মধ্যে। অপরাহ্নের ছায়ায় বন আরও সুন্দর দেখাচ্চে। ওখান থেকে মোটর ছেড়ে, শৈলমালাবৃত সুন্দর পথে রামটেক্ এলাম। রামটেক্ যখন এসেচি, তখন বেলা আর নেই, সূর্য্য অস্ত গেছে। অপরাহ্নের ছায়ায় রামটেকের সুবৃহৎ উপত্যকা ও ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যাবৃত শান্ত অধিত্যকাভূমির দৃশ্য আমাদের কাছে এতই অপ্রত্যাশিত ভাবে সুন্দর মনে হল যে, আমি মনে মনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। এই সুন্দর গিরিসানুদেশ এখনি জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠবে, এই নির্জ্জনতা, সেই প্রাচীন দিনের স্মৃতি—এসব মিলে এখনি একে কি অপরূপ রূপই দেবে—কিন্তু আমরা এখানে পৌঁছতে দেরি করে ফেলেচি, বেশীক্ষণ এই ছায়াভরা ধূসর সানু-শোভা উপভোগ করতে তো পারব না। পথ খুব চওড়া পাথরে বাঁধানো—কিন্তু উঠেই চলেচি, সিঁড়ি আর শেষ হয় না। প্রথমে একটা দরজা, সেটা এমন ভাবে তৈরী যে দেখলে প্রাচীন আমলের দুর্গদ্বার বলে ভ্রম হয়। তারপর একটা দরজা, তারপর আর একটা—সর্ব্বশেষে মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করে বহিরাঙ্গণের প্রাচীরের ওপরকার একটা চবুতারায় আমরা বসলাম। নীচেই বাঁ ধারে কিন্‌সী হ্রদ, পূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্র উঠচে, চারিধারে থৈ-থৈ করচে বিরাট Space, পশ্চিম আকাশ এখনও একটু রঙীন। মন্দিরে আরতির সময়ে এখানে নহবৎ বাজে, এক ছোকরা বাইরে পাঁচিল ঠেস দিয়ে বসে সানাই বাজাতে শুরু করলে। আমি একটা সিগারেট ধরালাম।

একটু পরে জ্যোৎস্না আরও ফুটল। আমাদের আর উঠতে ইচ্ছে করে না, প্রমোদবাবু তো শুয়েই পড়েচেন। দূরে পাহাড়ের নীচে আম্বারা গ্রামের পুকুরটাতে জ্যোৎস্না পড়ে চিক্ চিক্ করচে। মন্দির দেখতে গেলাম। খুব ভারী ভারী গড়নের

পাথরের চৌকাঠ, দরজার ফ্রেম—সেকেলে ভারী দরজা, পেতলের পাত দিয়ে মোড়া মোটা গুল্ বসানো। মন্দিরের দুপাশে ছোট ছোট ঘর, পরিচারক ও পূজারীরা বাস করে। তাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করচে, মেয়েরা রান্নাবাড়া করচে। রাম-সীতার মন্দিরের দরজার পাশে অনেকগুলি সেকেলে বন্দুক ও তলোয়ার আছে। একজনকে বললুম—এত বন্দুক কার? সে বললে—ভোঁস্লে সরকারকা। ১৭৮৩ সালে রঘুজী ভোঁসলা এই বর্ত্তমান মন্দির তৈরী করেন। আম্বারা সরোবরের পাশে ভোঁস্লাদের বিশ্রামাবাসের ধ্বংসাবশেষ আছে, আসবার সময় দেখে এসেচি। মন্দিরের পিছনের একটা চবুতারায় দাঁড়িয়ে উঠে নীচে রামটেক্ গ্রামের দৃশ্য দেখলাম—বড় সুন্দর দেখায়! রামটেক্ ঠিক গ্রাম নয়, একটা ছোট গোছের টাউন।

মন্দির প্রদক্ষিণের পর পাহাড় ও জঙ্গলের পথে আমরা নেমে এলাম। জ্যোৎস্নার আলোছায়ায় বনময় সানুদেশ ও পাষাণ বাঁধানো পথটি কি অদ্ভুত হয়েচে। এখানে বসে কোন ভাল বই পড়বার কি চিন্তা করবার উপযুক্ত স্থান। এর চারিধারেই অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্য্যময় গলিঘুঁজি, উচ্চাবচ ভূমি, ছায়াভরা বনান্ত দেশ। আমার পক্ষে তো একেবারে স্বর্গ। ঠিক এই ধরনের স্থানের সন্ধানই আমি মনে মনে করেচি অনেকদিন ধরে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের থেকে এর সৌন্দর্য্য অনেক বেশী, যদিও চন্দ্রনাথের মত এ পাহাড় অতটা উঁচু নয়। আম্বারা গ্রামটি আমার বড় ভাল লাগল—চারিধারে একেবারে পাহাড়ে ঘেরা, অনেকগুলি ছোট ছোট দোকান, গোলা ঘর, একটা সরাইও আছে। ইচ্ছে হলে এখানে এসে থাকাও যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নামতে পারলাম না, যদিও প্রতিমুহূর্ত্তে ভয় হচ্ছিল, মোটর ড্রাইভার হয়তো কি মনে করবে। বেচারী সারাদিন কিছু খায় নি। আম্বারা গ্রামটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার সময় ছিল না, তাড়াতাড়ি মোটর ছেড়ে সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে, কাটা পথটা ঘুরে রামটেক্ টাউনের মধ্যে ঢুকল। পাহাড়ের ঢালুতে বন্য আতাবৃক্ষ অজস্র, এখানে বলে সীতাফল—নাগপুর শহরে যত আতাওয়ালী আতা ফিরি করে—তার সব আতাই ফলে সিউনি ও রামটেক্ পাহাড়ে।

রাত বোধ হয় সাতটা কি সাড়ে সাতটা। মন্দিরের ওপরে চবুতারায় বসে দূরে নাগপুরের বৈদ্যুতিক আলোকমালা দেখেছিলাম ঠিক সন্ধ্যায়—তাই নিয়ে প্রমোদবাবুর সঙ্গে তর্ক হল, আমি বললুম—ও কাম্‌টির আলো—প্রমোদবাবু বললেন—না, নাগপুরের।

কিন্‌সী হ্রদের বাংলোতে খাবার খেয়েছিলাম, কিন্তু চা খাই নি। রামটেকের মধ্যে ঢুকে একটা চায়ের দোকানে আমরা গাড়িতে বসে চা খেলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—রামটেকের পাহাড়ের ওপর সাদা মন্দিরটা জ্যোৎস্নায় বড় চমৎকার দেখাচ্চে—চা খেতে খেতে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আজ কোজাগরী পূর্ণিমা, এতক্ষণ বারাকপুরে আমার গাঁয়ে বাড়িতে বাড়িতে শাঁখ বাজচে। লক্ষ্মীপুজোর লুচিভাজার গন্ধ বার হচ্চে বাঁশবনের পথে—এতদূর থেকে সে-সব কথা যেন স্বপ্নের মত লাগে! রামটেকের পথ দিয়ে মোটর ছুটল। কিন্‌সী হ্রদ থেকে মোটরে আসবার সময়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম, তেমনি আনন্দ পেলাম। সামনে তখন ছিল আঁকা-বাঁকা, উঁচু-নীচু পার্ব্বত্য প্রদেশের কঙ্করময় পথ, ডাইনে ছায়াবৃত অরণ্যেভরা শৈলমালা—এখন ঠিক তেমনি পথ দিয়ে মোটর তীরের বেগে ছুটে চলেচে—প্রমোদবাবু বললেন: a glorious drive.

রামটেক্ স্টেশনে নাগপুরের ট্রেনখানা দাঁড়িয়ে রয়েছে, সুতরাং বোঝা গেল এখনও সাড়ে আটটা বাজে নি। একটু গিয়ে প্রমোদবাবু মাইল স্টোনে পড়লেন—

নাগপুর ২৮ মাইল, মান্সার ২ মাইল। দেখতে দেখতে ডাইনে মান্সারের বিরাট ম্যাঙ্গানিজের পাহাড় পড়ল—জ্যোৎস্নার আলোতে সুউচ্চ অনাবৃতকায় পাহাড়গুলো যেমনি নির্জ্জন, তেমনি বিশাল ও বিরাট মনে হচ্ছিল। মনে ভাবছিলাম ওই নির্জ্জন শৈলশিখরে, এই ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় তাঁবু খাটিয়ে যারা রাত্রিযাপন করে একা একা—তাদের জীবনের অপূর্ব্ব অনুভূতির কথা। আরও ভাবছিলাম এই জ্যোৎস্নায় বহুদূরের বাংলাদেশের এক ছোট্ট নদীর ধারের গ্রামের একটা দোতলা বাড়ির কথা। ভাবলাম, অনেকদিন হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সে এখন আরও কাছে কাছে থাকে—যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে—হয়তো আজ এই জ্যোৎস্নারাত্রে আমার কাছে কাছেই আছে। মান্সারে যেখানে নাগপুর-জব্বলপুর রোড থেকে রামটেকের পথটা বেঁকে এল—সেখানে একটা P.W.D. বাংলো আছে, সামনে একটা পদ্মফুলে ভরা জলাশয়। স্থানটি অতি মনোরম। দুপুরে আজ এই ম্যাঙ্গানিজগুলি আমরা দেখে গিয়েছিলাম—বিরাট পর্ব্বতের ওপর মোটর গাড়ী উঠিয়ে নিয়ে গেল—অনাবৃতদেহ পর্ব্বতপঞ্জর রৌদ্রে চকচক করচে, খাড়া কেটে ধাতুপ্রস্তর বার করে নিয়েচে—সামনে schist ও granite- নীচের স্তরগুলোতে কালো ম্যাঙ্গানিজ। একজন ওদেশী কেরানী আমাদের সব দেখালে, সঙ্গে দু টুকরো ম্যাঙ্গানিজ দিলে কাগজ-চাপা করবার জন্যে। তারই মুখে শুনলাম এই ম্যাঙ্গানিজ স্তর এখান থেকে ২৫।২৬ মাইল দূরে ভাণ্ডারা পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে—মাঝে মাঝে সমতল জমি, আবার পাহাড় ঠেলে ঠেলে উঠেচে। নাগপুর-জব্বলপুর রোডে অনেক পাহাড় পড়ে জব্বলপুরে যেতে ; সিউনির দিকেও পাহাড় ও জঙ্গল মন্দ নয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দৃশ্য নাগপুর-অমরাবতী রোডে। নাগপুর শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাজারগাঁও গ্রাম থেকে কানহৌলি ও বোরিনদীর উপত্যকাভূমি ধরে যদি বরাবর সোজা উত্তর-পশ্চিম দিকে যাওয়া যায়, তা হলে শৈলমালা, মালভূমি ও অরণ্যে-ঘেরা এক অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে।

মান্সার ছেড়ে আমরা নাগপুর-জব্বলপুর রোডে পড়লাম। দুধারে দূরপ্রসারী সমতলভূমি জ্যোৎস্নায় ধূ-ধূ করচে—আকাশে দু-দশটা নক্ষত্র—দূরে নিকটে বৃক্ষশ্রেণী। এখনও নাগপুর ২৫ মাইল। সারাদিন পাহাড়ে ওঠানামা পরিশ্রমের পর, হু-হু ঠাণ্ডা বাতাস বেশ আরামপ্রদ বলে মনে হচ্চে। ক্রমে কামটি এসে পড়লাম। পথে কান্হান্ নদীর সেতুর উপর এসে মোটরের এঞ্জিন কি বিগড়ে গেল। আমরা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নদীবক্ষের দিকে চেয়ে আর একটা সিগারেট ধরালাম। পেছনে রামটেক্ প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানা কান্হান্ স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে—আমার ইচ্ছে ছিল ট্রেনে মোটরে একটা রেস হয়—কিন্তু তা আর হল না, ট্রেন ছাড়বার আগেই মোটরের এঞ্জিন ঠিক হয়ে গেল। কামটিতে এঞ্জিন আবার বিগড়ালো একবার, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ঠিক হল। তারপর আমরা নাগপুর এসে পড়লাম—দূর থেকে ইন্দোরের আলো দেখা যাচ্চে।

কিন্তু কিন্সী হ্রদের তীরের গিরিসাপুর জঙ্গল আমি এখনও ভুলি নি। শরতের নীল আকাশের তলায় সেই নিবিড় ছায়ানিকেতন অরণ্য প্রদেশটি আমার মনে একটা ছাপ দিয়ে গেছে। আহা! ঐ বনের শিউলি গাছগুলোতে যদি ফুল ফুটত, আরও যদি দু-চার ধরনের বনফুল দেখতে পেতুম—তবে আনন্দ আরো নিবিড় হত—কিন্তু এমনি কত দেখেচি, তার তুলনা নেই। বুনো বাঁশের ছোট ছোট ঝাড়গুলির কি শ্যামল শোভা! পুজোর ছুটি ফুরিয়ে যাবে, আবার কলকাতার লোকারণ্যের মধ্যে ফিরে যাব, আবার দশটা পাঁচটা স্কুলে ছুটব, আবার 'ক্যালকাটা

কেবিনে' বসে অপকৃষ্ট চা ও ডিমের মামলেট খাব—তখন এই বিশাল পার্ব্বত্যকায় সরোবর, এই শরতের রৌদ্র-ছায়াভরা কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা ঘন অরণ্যানী, এই জ্যোৎস্না-প্লাবিত নির্জ্জন গিরিসানু—এই আম্বারা, কিন্‌সী, রামটেকের মন্দির-দুর্গ—এসব বহুকাল আগে দেখা স্বপ্নের মত অস্পষ্ট হয়ে মনের কোণে উঁকি মারবে।

একটা কথা না লিখে পারচি নে। আমি তো যা দেখি, তাই আমার ভাল লাগে—বিশেষ করে যদি সেখানে বন থাকে। কিন্তু তবুও লিখচি আমি এ পর্য্যন্ত যত পাহাড় ও অরণ্য দেখেচি—চন্দ্রনাথ, ত্রিকূট, কার্টনি অঞ্চলের পাহাড়—ডিগরিয়া ও নন্দন পাহাড়ের উল্লেখ করাই এখানে হাস্যকর, তবুও উল্লেখ করচি এইজন্যে যে, এই ডায়েরীতেই কয়েক বছর আগে আমি নন্দন পাহাড়ের সুখ্যাতি করে খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনা লিখেচি—এসব পাহাড় কিন্‌সী ও রামটেকের কাছে ম্লান হয়ে যায় সৌন্দর্য্যে ও বিশালতায়।

কাল নাগপুর থেকে চলে যাব। আজ রাত্রে নির্জ্জন বাংলোর বারান্দাতে বসে জ্যোৎস্নাভরা কম্পাউণ্ডের দিকে চেয়ে শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়চি। সেই পুরনো বইখানা, সিদ্ধেশ্বরবাবুদের অফিসে কাজ করবার সময় টেবিলের ড্রয়ারে যেখানা লুকনো থাকত। কাজের ফাঁকে ফাঁকে চট করে একবার বার করে নিয়ে পাহাড়, জঙ্গল, দূর দেশের বর্ণনা পড়ে ক্লান্ত ও রুদ্ধশ্বাস চেতনাকে চাঙ্গা করে নিতুম। এখনও মনে পড়চে সেই ছোট টেবিলটা, তার ড্রয়ারটা, ডাইনে কাঠের পার্টিসনটা—সেই রোকড় খতিয়ানের স্তূপ, ফাইলের বোঝা।

কাল বৈকালে একা বেড়াতে বার হয়েছিলাম, কারণ সকালের বম্বে মেলে প্রমোদ-বাবু হাওড়া ফিরলেন। আমি তাঁকে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হ'ল, তাঁর বাড়ি খড়্গপুর, তিনি মতিকাকাকে চেনেন। বললুম, মতিকাকার কাছে আমার নাম বলবেন।

তারপর বৈকালে একা বার হলাম। South Tiger Gap Road দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে একটা মুক্ত জায়গায় সাঁকোর ওপর বসলাম। সামনে ধূ-ধূ প্রান্তর, দূরে দূরে শৈলশ্রেণী—বাঁয়ে সাতপুরা, ডাইনে রামটেকের পাহাড় ও মানসারের ম্যাঙ্গা-নিজের পাহাড় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে। একটু পরে সূর্য্য ডুবে গেল, পশ্চিম দিগন্তে কত কি রঙ ফুটল। আমার কেবলই মনে আসতে লাগল ঐ শ্লোকটা—'প্রস্থিতা দূরপন্থানং'...শ্লোকের টুকরোটার নতুন মানে এখানে বসেই যেন খুঁজে পেলাম। ভাবলাম আমার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, আরও অনেক পেছনে কাশী ও বিন্ধ্যাচল, মির্জ্জাপুর ও চুনার পড়ে আছে—পশ্চিম ঘেঁষে প্রাচীন অবন্তী জনপদ—পূর্ব্বে প্রাচীন দক্ষিণ কোশল, সামনের ঐ নীল শৈলমালা—যার অস্পষ্ট সীমারেখা গোধূলির শান্ত ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে—ঐ হল মহাভারতের কিংবা নৈষধ চরিতের সেই ঋক্ষবান পর্ব্বত। এই যেখানে বসে আছি, এখান থেকে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে অমরাবতীর কাছে পদ্মপুর বলে গ্রামে কবি ভবভূতির জন্মস্থান। এ সব প্রাচীন দিনের স্মৃতি জড়ানো প্রান্তর, অরণ্য, শৈলমালা দিগন্তহীন মালভূমির গম্ভীর মহিমা, এই রকম সন্ধ্যায় নির্জ্জনে বসলেই মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়।

পূর্ব্বে চেয়ে দেখি হঠাৎ কখন পূর্ণচন্দ্র উঠে গেছে। তারপর জ্যোৎস্না-শোভিত Tiger Gap Road-এর বনের ধার দিয়ে শহরে ফিরে এলাম। শরতের রাত্রের হাওয়া বন্য শিউলির সুবাসে ভারাক্রান্ত ও মধুর। Lawrence Road-এর মোড়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—তিনজন বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা—তারা আমার বাংলোর কাছে পেঁাছে দিয়ে গেল।

আমি ওখান থেকে চলে গেলাম সীতাবলডির বাজারে ঘড়ির দোকানে। সেখানে রেডিওতে কলকাতা Short Wave ধরেচে, বাংলা গান বাজচে—একটু পরে রেডিও স্টেশনের বিষ্ণু শর্ম্মা সুপরিচিত গলায় কি একটা গানের ঘোষণা করলে। মনে মনে ভেবে দেখলাম কত পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে ৭৫০ মাইলের ব্যবধান ঘুচিয়ে বিষ্ণু শর্ম্মার গলা এখানে এসে পৌঁছলো—যে মুহূর্ত্তে সে গার্স্টিন প্লেসের সেই রাঙা বনাত মোড়া ঘরটায় বসে একথা বললে সেই মুহূর্ত্তেই! রেডিওর অদ্ভুতত্ব এভাবে কখনো অনুভব করি নি—কলকাতায় বসে শুনলে এর গভীর বিস্ময়ের দিকটা বড় একটা মনে আসে না।

তারপর টাঙা নিয়ে নেরুলকরের ওখানে গেলাম। ডাক্তার বেরিয়ে গিয়েচে—বসে বসে "The Story of Mount Everest" বইখানা পড়লাম—রাত দশটা বাজে, এখনও ডাক্তার এল না। আমি একটা চিঠিতে লিখে এলাম, কাল সকালে দুবেকে সঙ্গে নিয়ে যেন নেরুলকর আমাদের ওখানে আসে। তারপর একটা টাঙা নিয়ে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত স্টেশন দিয়ে ফিরলাম।

সকালে সীতাবলডির ঘড়ির দোকানে ঘড়ি সারাতে গেলাম—ওখান থেকে গেলাম ডাঃ নেরুলকরের ওখানে ও স্টেশনে বার্থ রিজার্ভ করতে। দুপুরে মিউ-জিয়ামে গিয়ে গোঁড় জাতির অস্ত্রশস্ত্র, বালাঘাট পার্ব্বত্যদেশের খনিজ প্রস্তর, fossil, জব্বলপুরের অধুনালুপ্ত অতিকায় হস্তী, নর্ম্মদার উত্তরে অরণ্যের অধুনা-লুপ্ত সিংহ, বনবিড়াল, ঝিন্দওয়ারা জঙ্গলের বাইসন বা গৌর—কত কি দেখলাম। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের চেদীরাণী লোহলের প্রস্তরলিপি ও বৌদ্ধ রাজা সূর্য্য ঘোষের পুত্র রাজপ্রাসাদের ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যাওয়াতে ভগবান তথাগতের উদ্দেশ্যে পুত্রের আত্মার সদ্গতির জন্য তিনি যে মন্দির নির্ম্মাণ করেন—সে লিপিটিও পড়লাম। আজ খুব রোদ, আকাশ খুব নীল, বাংলোর বারান্দায় বসে লিখচি। এখনি চা খেতে যাব।

তারপর আমরা রওনা হলুম। ডাঃ নেরুলকর স্টেশনে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। দ্রুগ ও ডোঙ্গরগড়ের মধ্যবর্ত্তী বিখ্যাত সালাকেসা ফরেস্ট দেখব বলে আমরা রাত দেড়টা পর্য্যন্ত জেগে বসে রইলাম। নাগপুর ছাড়িয়ে ছোট ছোট শালের জঙ্গল অনেক দেখা গেল—জ্যোৎস্না রাত্রে প্রকাণ্ড অরণ্যটার রূপ আমার মনে এমন এক গম্ভীর অনুভূতি জাগালে—সে রাত্রে ঘুম আমার আর এল না—ডোঙ্গরগড় স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল, রাত তিনটে বেজে গেল, ঘুমুবার ইচ্ছেও হল না—জানালা থেকে চোখ সরিয়ে নিতে মন আর সরে না।

নাগপুর থেকে ফিরেই দেশে গিয়েছিলাম। ইছামতী দিয়ে নৌকোতে বিকেলের দিকে গ্রামের ঘাটে পৌঁছুলাম। বাল্যে একটা কি ছেলেদের কাগজে একটা কবিতা পড়েছিলাম—

'ঘাটের বাটে লাগল যবে আমার ছোট তরী, ঘনিয়ে আসে ধরায় তখন শীতের বিভাবরী।'

এতকাল পরে সেই দুই চরণই বার বার মনে আসতে লাগল। মাধবপুরের মাঠে সূর্য্য অস্ত গেল, চালতেপোতার বাঁকের সবুজ ঝোপঝাপ দেখলাম—এবার কিন্তু চোখে লাগল না তেমন। কেন এমন হল কি জানি?

অবশ্য একথা ঠিক, এমন ঘন সবুজ ও নিবিড় বনসম্পদ C.P. অঞ্চলের নেই—সে হিসেবে বাংলাদেশের তুলনা হয় না ওসব দেশের সঙ্গে, কিন্তু ভূমিসংস্থান

বিষয়ে বাংলা অতি দীন। জলকাদা, ডোবা, জলা, ugly জঙ্গল, এ বড় বেশী। লোকও ভূমিশ্রী বর্দ্ধিত করতে জানে না, নষ্ট করতে পারে। নানা কারণে বর্ষাকালে বাংলাদেশ আদৌ ভাল লাগে না। আবার খুব ঘন বর্ষায় খুব ভাল লাগে—যেমন শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের অবিশ্রান্ত বর্ষণের দিনগুলিতে, যখন জলে থৈ-থৈ করে চারিধার। শেষ শরতের এসব বর্ষার সৌন্দর্য্য নেই, কিন্তু অসুবিধে ও শ্রীহীনতা যথেষ্ট। গাছ-পালায় মনকে বড় চাপা দিয়ে রাখে।

এবার কলকাতায় বড় ভাল লাগচে।

কাল সাহেবের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েচি সারাদিন। সকালে বিশ্বনাথের মোটরে গোপালনগর গিয়েছিলাম—তারপর লাঙলচষার প্রতিযোগিতা হল, ছেলেদের দৌড় হল—তারপর বিকেলে বেলেডাঙ্গা গেলাম। সেখানে একটা ডাব খাওয়া গেল—স্কুলে যুগল শিক্ষক এল।

দেশ, খয়রামারির মাঠ এত ভাল লাগচে এবার! কাল হারাণ চাকলাদার মহাশয়ের ছেলের কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম—মাঠের মধ্যে ফুলের চাষ করেচে—বেশ দেখাচ্চে। একটা ষাঁড়া গাছের কুঞ্জবন বড় সুন্দর। এবার জ্যোৎস্না খুব চমৎকার, শীতও বেশ। রোজ খয়রামারির মাঠে বেড়াই। আজ একা যাবো। একলা না গেলে কিছু হয় না।

রাজনগরের বটতলায় রোজ বেড়াতে যাই। সামনে অপরূপ রঙে রঙীন সূর্য্য অস্ত যায় দিগন্তের ওপারে, নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ চারিদিক—মাটির সুঘ্রাণ স্মরণ করিয়ে দেয় ইসমাইলপুরের জনহীন চড়ায় এমন সব শীতের সন্ধ্যা, কত সুদীর্ঘ অন্ধকার রাত্রি, কত কৃষ্ণা নিশীথিনীর শেষ যামের ভাঙা চাঁদের জনমানবহীন বনের পেছনে অস্ত যাওয়া, কত নীল পাহাড় ঘেরা দিকচক্রবাল, বিষম শীতের রাত্রে গনোরী তেওয়ারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শোনা অগ্নিকুণ্ডের চারিধারে বসে বসে।

সে সব দিন আজকাল কতদূরের হয়ে গেছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটাতে সকালে নীরদবাবুর সঙ্গে বহুকাল পরে বেলুড় গিয়েছিলাম। পেছনের ছাদটাতে বসে আবার পুরনো দিনের মত কত গল্প করলাম। পেছনের ছাদটা, বেলুড়ের বাড়ির চারিপাশের বাগান এত ভাল লাগল। ভেবেছিলাম এখানে আর আসা হবে না। সেই বেলুড়ে আবার যখন আসা হল,—বিশেষ করে সেই শীতকালেই, যে শীতকালের রাত্রির সঙ্গে বেলুড়ে যাপিত কত রাত্রির মধুর স্মৃতির যোগ রয়েচে—তখন জীবনের অসীম সম্ভাব্যতার উপলব্ধি করে মুগ্ধ না হয়ে পারলাম না। সবাই মিলে আমরা চড়ুইভাতি করে খেলাম নীচের রান্নাঘরটাতে। পেঁপের ডাল হাতে রুদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসলাম মালীর ঘরের সামনে, নীচের ছাদটায় ফলসা গাছের ডালে সেই অপূর্ব্ব অবনমন দেখলাম, যা ওই ফলসা গাছটারই নিজস্ব, অন্য গাছের এ সৌন্দর্য্যভঙ্গি দেখি নি কখনো—বাগানের পাঁচিলের ওদিকে পাটের কলে নিবারণ মিস্ত্রীর সেই গোলপাতার ঘরখানা, শীতের দিনে গাঁদাফুল-ফোটা নিকানো দুপাশে তক্‌তকে উঠোন,—সব যেন পুরাতন, পরিচিত বন্ধুর মতো আমাদের প্রাণে তাদের স্নেহস্পর্শ পাঠিয়ে দিলে, বড় ভাল লাগল আজ বেলুড়।

সন্ধ্যার আগেই মোটরে চলে এলাম কলকাতায়। কাল গিয়েছে পূর্ণিমা, আজ প্রতিপদের চাঁদ রাত সাড়ে সাতটার পরে উঠল। ধোঁয়া নেই, এই যা সৌভাগ্য।

অনেকদিন পরে আজ আমড়াতলার গলির মুখে গিয়ে পড়েছিলাম—এতদিন

চিনি নি—আজ চিনেচি।

এবার ইস্টারের ছুটিটা কাটাতে এলুম এখানে। সেবার এসে নীল ঝরনার যে উপত্যকা দেখে গিয়েছিলাম—আবার জ্যোৎস্না রাত্রে নিমফুল ও শালমঞ্জরীর ঘন সুবাসের মধ্যে সে সব স্থান দেখলাম। রানীঝরনার পথে পাহাড়ে উঠে গোঁড় জাতির গ্রামে আবার বেরিয়ে এলাম। আজ বেড়িয়ে এলাম সকালে কাঁকড়গাছি ঘাট। সারা পথের দুধারে বন, তবে এখন শাল ও মহুয়া গাছ প্রায় নিষ্পত্র। তলায় সাদা সাদা মহুয়া ফুল টুপ টাপ ঝরে পড়চে। রাখামাইন্‌স্ ছাড়িয়ে খানিকটা গেলে বন বেশ ঘন, বড় বড় ছায়াতরুও আছে। কাঁকড়গাছি ঘাটটা বড় চমৎকার,—এখানে একটা জায়গার চারিধারেই পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট একটা ঝরনা আছে—তবে এখন ঝরনাতে জল খুবই কম। ওদিকে বনগাছের শোভা এদিকের চেয়ে সুন্দর। অপরাহ্নে বা জ্যোৎস্নারাত্রে যে এসব স্থানের শোভা অপূর্ব্ব হবে সেটা বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। নীরদবাবুরা গরুর গাড়িতে এলেন—আমি দেখলাম ওর চেয়ে হেঁটে আসা অনেক বেশী আরামের। বাংলোর সামনে ছোট বাঁধটাতে স্নান করে এলাম। জল বেশ ভাল। খুব সম্ভব আজই রাত্রে কলকাতাতে ফিরব।

কাল রাখামাইন্‌স্ থেকে বৈকালে হেঁটে আমরা তিনজন চলে এলাম শালবনের মধ্যে দিয়ে অস্তসূর্য্যের আলোয় রাঙানো সুবর্ণরেখা পার হয়ে! আজ সকালে গালুডির বাংলোর পিছনে সেই শিলাখণ্ডে বসে লিখচি। কাল রাতের চাঁদটা যে কখন কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর পিছন দিয়ে উঠল তা মোটেই টের পাই নি—স্টেশন থেকে এসে দেখি চাঁদ উঠে গিয়েচে। কিন্তু অনেক রাত্রে স্টেশনের পথের ছোট ডুংরিটার সাদা সাদা কোয়ার্টজ পাথরের চাঁইগুলো, ছোট বটগাছটা অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। আজ সকালে গুইরাম গাড়োয়ানের সঙ্গে দেখা, সে বললে ঠিকরী ও ধারাগিরির পথের জঙ্গলে খুব বন, বাঘের ভয়ও আছে। এবার আর যাওয়া হল না, পূজোর সময় যাব।

এবার জীবনটা খুব গতিশীল হয়ে উঠেচে। এই তো গত শনিবারের রামনবমীর দোলের দিনও বারাকপুরে ছিলাম। দেখলাম আমাদের বাড়ির পিছনে বাঁশ বনে কি রকম শুকনো পাতার রাশ পড়েচে, নদীর ধারে চটকাতলা খালের উঁচু পাড়ে কি রকম ঘেঁটুফুল ফুটেছে, রঘুদাসীদের বাড়িতে ওরা আবার এসেচে, পথে রঘুদাসীর সঙ্গে দেখা। তারপরে খয়রামারির মাঠে সেই বেদেদের তাঁবুর ছোট গর্ত্তটা, সেখানে সেদিনও আকন্দ ফুলের শোভা দেখতে গিয়েচি—রাজনগরের বটতলাটা সন্ধ্যাবেলায় একা বেরিয়ে এসেচি আর ভেবেচি এসব জায়গা কত নিরাপদ, কত নিরীহ—হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যে গালুডির বাংলোর পিছনে বসে লিখচি—রানীঝরনা নেকড়েডুংরি সব দেখা হয়েই গেছে। রাখামাইন্‌সে দুরাত্রি যাপন করে এলাম।

কিন্তু একটা দেখলাম ব্যাপার। এসব স্থানে সঙ্গী নিয়ে আসতে নেই। একা থাকলে নিজের মন নিয়ে থাকা যায়। তখন নানা অদ্ভুত চিন্তা, অদ্ভুত ভাব এসে মনে জোটে। কিন্তু সঙ্গীরা থাকলে তাদের মন আমাকে চালিত করে—আমার মন তখন আর সাড়া দেয় না, যেমন গভীর অতল তলে লাজুক তার মুখ লুকিয়ে থাকে। কাজেই সঙ্গীদের চিন্তা তখন হয় আমার চিন্তা—সঙ্গীদের ভাব তখন হয় আমার ভাব, আমার নিজস্ব জিনিস সেখানে কিছু থাকে না। কাল সুবর্ণরেখার পারের

সূর্য্যাস্তের দৃশ্যটা, কিংবা গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় মহুলিয়ার প্রান্তরের ও নেকড়ে-ডুংরি পাহাড়ের সে অবাস্তব সৌন্দর্য্য, একা থাকলে এসব দৃশ্যে আমার মন কত অদ্ভুত কথা বলত—কিন্তু কাল শুধু আড্ডা দেওয়াই এবং চা খাওয়াই হল—মন চাপা পড়ে রইল বটে, অর্থহীন প্রলাপ বকুনির তলায়, সম্মিলিত সিগারেট ধূমের কুয়াশার আড়ালে।

তাই বলচি এসব স্থানে আসতে হয় একা। লোক নিয়ে আসতে নেই।

আজই এখান থেকে যাব। এখনি বলরাম সায়েরের ঘাটে নেয়ে আসবো—অনেকদিন পরে ওতে বড় আনন্দ পাব। দূরে কালাঝোর পাহাড়, চারিধারে তালের সারি, স্বচ্ছ শীতল জল—দীঘিটা আমার এত ভাল লাগে!

শালবনে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে। দূরে কোথায় কোকিল ডাকচে কালাঝোর পাহাড়ের দিকে। এত ভাল লাগচে সকালটা!

খুড়োদের ছাদে বসে লিখচি। গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ি এসেচি। এবার গালুডিতে অনেকদিন থেকে আমার যেন নতুন চোখ খুলেচে, গাছপালার বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্য এবার বেশী করে চোখে পড়েচে। সমস্ত প্রাণটা যেন একটা পার্ক—আমার বাড়িতে কোন গাছ থাকুক আর নাই থাকুক, সারা গ্রাম এমন কি কুঠির মাঠ, ইছামতীর দুই তীর, শ্যামল বাঁশবন—এ সবই আমার। আমি দেখি, আমার ভাল লাগে—আমার না তো কার?

প্রায়ই বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে যাই, এবার একটা নতুন পথ খুলেচে মাঠের মধ্যে দিয়ে, সেটা আরও অপূর্ব্ব। এমন সবুজ মাঠে উলুফুল ফুটেচে চারিধারে, শিমুলগাছ হাত বেঁকিয়ে আছে, দূর বনান্তশীর্ষে বিরাটকায় Lyre পাখীর পুচ্ছের মতো বাঁশবনের মাথা দুলচে, এমন শ্যামলতা, এমন শ্রী—এ আমাদের এই দেশটা ছাড়া আর কোথাও নেই। দুপুরে আজ বেজায় গরম, কাল রাতে ভাল ঘুম হয় নি বলে অত গরমেও খুব ঘুমুলাম।

উঠে দেখি মেঘ করেচে। উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন নীল-কৃষ্ণ কালবৈশাখীর মেঘ, —তারপর উঠল বেজায় ঝড়। আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না, একখানা গামছা নিয়ে তখনি নদীর ঘাটে চলে গেলাম। পথে জেলি বললে শিগগির নেকো তলায় যান, ভয়ানক আম পড়চে। কিন্তু আজ আর আম কুড়োবার দিকে আমার খেয়াল নেই। আমি নদীর ধারে কালবৈশাখীর লীলা দেখতে চাই। নদীজলে নামবার আগেই বৃষ্টি এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল—জলে নেমে দেখি জল গরম, যেন ফুটচে। এপার ওপার সাঁতার দিতে লাগলাম। কালো জলে ঢেউ উঠেচে, মুখে নাকে মাথায় ঢেউ ভেঙে পড়চে, ওপারে চরের ওপর বিদ্যুৎ চমকাচ্চে, বন্যেবুড়ো গাছ ঝড়ে উল্টে যাচ্চে, বৃষ্টির ধোঁয়ায় চারিধার অন্ধকার হয়ে গেল, নদীজলের অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ বেরুচ্চে, দূর দূর সমুদ্রের কথা মনে হচ্ছে। এমনি কত ঝটিকাময় অপরাহ্ন ও নীরন্ধ্র অন্ধকারময়ী রাত্রির কথা—প্রকৃতির মধ্যে এমনি মিশে হাতধরাধরি করে চলা—ঐ শ্যামল-ডালপালাওঠা শিমুলগাছ সাঁইবাবলা গাছ—এই তো আমি চাই। এদের সঙ্গে জীবন উপভোগ করব—ঐ ঝোড়ো মেঘে আমার ভগবানের উপাসনা, ঐ তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুতে, এই কালো নদীজলের ঢেউয়ে, ঝড়ের গন্ধে, বাতাসের গন্ধে, বৃষ্টি ভেজা মাটির গন্ধে, চরের ঘাসের কাঁচা গন্ধে—।

কাল কুঠীর মাঠে বসে এই সব কথা ভাবছিলাম। তারপর নদীজলে নাইতে নেমে কেমন একটা ভক্তির ভাব মনে এল। সমস্ত দেহ মন যেন আপনা-আপনি নুয়ে

পড়তে চাইল। এ ধরনের ভক্তি একটা বড় bliss, জীবনে হঠাৎ আসে না। যখন আসে, তখন বিরাট রূপেই আসে, আনন্দের বন্যা নিয়ে আসে প্রাণের তীরে। এ Realisation যেমন দুর্লভ, তেমনি অপূর্ব।

আমি ভগবানকে উপলব্ধি করতে চাই। তাঁর এই লক্ষ বিরাট রূপের মধ্যে দিয়ে।

এবার মোটে বৃষ্টি নেই,—পথঘাট এখনও শুকনো খটখটে, অন্যবার এমন সময় খানা ডোবা জলে ভরে যায়, কুঠীর মাঠের রাস্তায় কাদা হয়। তবে এবার সোঁদালি ফুল যেন কমে আসছে, বেল ফুলের গন্ধেরও তেমন জোর নেই।

কাল বিকেলে পাঁচি এসেচে। সে, আমি, খুকু, রাণু মায় নদি ক'জনে কাল বসে কালিদাসের মেঘদূত ও কুমার-সম্ভবের চর্চ্চা করেচি। বিকেলে আমি কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। ঘাটে স্নান করতে এসে দেখি ওরা সবাই ঘাটে—খুকু ও রাণু সাঁতার দিয়ে গিয়েচে, প্রায় বাঁধালের কাছে। আমি স্নান সেরে উঠে আসচি, কালো তখন গেল শিমুলতলাটার কাছে। আমি বললুম, তোর মা ঘাটে তোকে ডাকচে। সে 'যাই' বলে একটা বিকট চিৎকার করে চলে গেল। একটু পরে দেখি খুকু আমায় ডাকচে। বাঁশবন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেচে—ও ঘাট থেকে আসবার সময় বোধ হয় অন্ধকার দেখে ভয় পেয়েচে। আমি দাঁড়িয়ে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলুম।

আজ ওবেলা স্নানের সময়ে মনে কি যে এক অপূর্ব্ব ভাব এসেছিল! প্রতিদিনের জীবন এই মুক্তরূপা প্রকৃতির মধ্যে সার্থক হয় এখানে—এইসব ভাবে ও চিন্তার ঐশ্বর্য্যে।

আজ অনেক কাল পরে নদির কাছ থেকে গৌরীর হাতের লেখা একখানা গানের খাতা পেয়েচি। এতদিন কোথায় এখানা পড়ে ছিল, বা কি করে নদির হাতে এল—তার কোন খবর এরা দিতে পারলে না। Appropriately enough, খাতায় প্রথম গানটিই হচ্চে—

ঐ নীল উজ্জ্বল তারাটি
করুণ, অরুণ তরুণ কিরণ অমিয় মাখান হাসিটি
বহুদূর জগতে গিয়েচে গো চলি প্রণয়বৃন্ত ছিঁড়িয়া
ভালবাসা সব ভুলে গেছে...

চোদ্দ-পনেরো বছর আগের এমনিধারা কত উজ্জ্বল রৌদ্রালোকিত প্রভাত, বর্ষার কত মেঘমেদুর সন্ধ্যার কথা মনে আনে।...

যাক। কাল আকাশে হঠাৎ বৃশ্চিক নক্ষত্র দেখেচি—একে প্রথম চিনি বেল-পাহাড়ের স্টেশনে—পরিমল আমাকে চিনিয়ে দেয়—আমি ওটা চিনতাম না। কাল দেখি শ্যামাচরণদাদাদের বাঁশঝাড়ের মাথার ওপর বিরাট ওর অগ্নিপুচ্ছটা বেঁকে আছে। আকাশের ওদিকটা আলো হয়ে উঠেচে...খুকুকে বললুম, ঐ দ্যাখ বৃশ্চিক নক্ষত্র—

তাকে চিনিয়ে দিলুম। রাণু জিজ্ঞেস করলে—তবে তার বয়েস যদিও খুকুর চেয়ে অনেক বেশি, সে অত বুদ্ধিমতী নয়—পনেরো মিনিট কঠিন পরিশ্রমের পরে তাকে বোঝাতে পারলুম কোন্‌টাকে আমি বৃশ্চিক রাশি বলতে চাচ্চি।

এদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল ঢলে পড়চে ক্রমেই মেজো খুড়ীমাদের রান্নাঘরের ওপর। রাত অনেক হল, ওরা তবুও তাস খেলবেই। বেগতিক দেখে বললুম, আলোতে তেল নেই।

নইলে ঘুম হবার জো নেই, ওদের খেলার গোলমালে।
লণ্ঠন নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম, রাত তখন বারোটার কম নয়।

বিকেলে কালো আর আমি মোল্লাহাটির পথে বেড়াতে গেলাম। আজ দুপুরে যখন এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাই, তখনই খুব মেঘ করেছিল—একটু পরে সেই যে বৃষ্টি এল ; আর রোদ ওঠে নি। মেঘ ভরা বিকেলে শ্যামল মাঠ ও দূরের বাঁশ বন, বড় বড় বটগাছ, এক রকম কি গাছ আছে, মখমলের মত নরম সবুজ পাতা ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে ঝোপের সৃষ্টি করে—এসবের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে মোল্লাহাটি ও পাঁচপোতা বামুনডাঙ্গার পথের মোড়ে গিয়ে একখানা ছই-চাপা গরুর গাড়ির সঙ্গে দেখা হল। তাদের গাড়োয়ান জিগ্যেস করলে, বাবুর কাছে কি বিড়ি আছে?

—না নেই। বিড়ি খাই নে—

—আপনারা কোথায় যাবেন?

—কোথাও যাব না, এই পথে একটু বেড়াচ্চি।

ফিরবার পথে মনে হল কলকাতায় থাকবার সময় যখন গাছপালার জন্যে মনটা হাঁপায়, তখন যে কোনো একটু ছবি, একটা বনের ফটোগ্রাফ দেখে মনে হয়, ওঃ কি বনই এদেশে! প্রায়ই বিদেশের ফটো—আফ্রিকার, কি দক্ষিণ আমেরিকার—কিন্তু তখন ভুলে যাই যে আমাদের গ্রামের চারিপাশে সত্যিকার বন জঙ্গল আছে অতি অপূর্ব্ব ধরনের—যখন বিলিতি Grand Evening Annual দেখি তখন ভুলে যাই কত ধরনের অদ্ভুত গাছ আছে আমাদের বনে জঙ্গলে—যা বাগানে, পার্কে নিয়ে রোপণ করলে অতি সুদৃশ্য কুঞ্জবন সৃষ্টি করে—যেমন ষাঁড়া, কুঁচলতা, ঐ নাম-না-জানা গাছটা—এরা যে-কোন বিখ্যাত পার্কের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে।

সেদিন যখন আমি, রাণু, খুড়ীমা, ন'দি নদীতে বিকেলে স্নান করচি তখন একটা অদ্ভুত ধরনের সিঁদুরে মেঘ করলে—ওপারের খড়ের মাঠের উলুবনের মাথা, শিমুলগাছের ডগা, যেন অবাস্তব, অদ্ভুত দেখাল, যেন মনে হচ্ছিল ওখান থেকেই নীল আকাশটার শুরু।

কিন্তু কাল সন্ধ্যায় একা নদীতে নেমে যে অপূর্ব্ব অনুভূতি হয়েছিল তা বোধ হয় জীবনে আর কোনদিন হয় নি। শিমুলগাছের মাথায় একটা তারা উঠেছে—দূরে কোথায় একটা ডাহুক পাখী অবিশ্রান্ত ডাকচে। মাধবপুরের চরের দিকে ভায়োলেট রঙের মেঘ করচে—শান্ত, স্তব্ধ নদীজলে তার অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব।

মানুষ চায় এই প্রকৃতির পটভূমির সন্ধান। এতদিন যেন আমার Emerson-এর মতের সঙ্গে খুব মিল ছিল। সেদিনও বঙ্গশ্রী আপিসে কত তর্ক করেচি, আজ একটু মনে সন্দেহও জেগেছে। মানুষ এই সৃষ্টিকে মধুরতর করেচে। ওই দূর আকাশের নক্ষত্রটি—ওর মধ্যেও স্নেহ, প্রেম যদি না থাকে, তবে ওর সার্থকতা কিছুই নয়। হৃদয়ের ধর্ম্ম সব ধর্ম্মের চেয়ে বড়।

আজ সকাল থেকে বর্ষা নেমেচে। ঝিম্-ঝিম্ বাদলা, আকাশ অন্ধকার। আজ এই মেঘমেদুর সকালে একবার নদীর ধারে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করচে—বাঁওড়ের ধারের বেলে মাটির পথ বেয়ে একেবারে কুঁদীপুরের বাঁওড় বাঁয়ে রেখে মোল্লাহাটির খেয়া পার হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে পিসিমার বাড়ি পাট্‌শিমলে বাগান-গাঁ। কাল

সুন্দরপুর পর্যন্ত বেড়াতে গিয়েছিলুম বৈকালে—ও পথের প্রাচীন বটগাছের সারির দৃশ্য আমি আবাল্য দেখে আসচি, কিন্তু ও পুরনো হল না—যত দেখি ততই নতুন। গাছে গাছে খেজুর পেকেচে, কেঁয়োঝাঁকা গাছের তলায় ব্যাঙের ছাতা গজিয়েচে এই বর্ষায়। আরামডাঙ্গার মাঠে মরগাঙের ওপারে, সবুজ আউশ ধানের ক্ষেত এবং গ্রামসীমায় বাঁশবনের সারি মেঘমেদুর আকাশের পটভূমিতে দেখতে হয়েচে যেন কোন বড় শিল্পীর হাতে-আঁকা ল্যান্ডস্কেপ। ক্ষেত্রকলু ওদিক থেকে ফিরচে, হাতে ভাঙা লণ্ঠন একটা। বললে মোল্লাহাটির হাটে পটল কিনতে গিয়েছিল।

—পটল না কিনেই ফির্‌লে যে?

—কি করব বাবু, দু'পয়সা সের দর। একটা পয়সাও লাভ থাকচে না। গোপালনগরের হাটেও ওই দর। এবার তাতে আবার পটল জন্মায় নি! যে দুব্বচ্ছর পড়েচে বাবু!

কলকাতাটা যেন ভুলে গিয়েচি। যেন চিরকাল এই বটের সারি, বাঁওড়, সুন্দরপুর, সখীচরণের মুদীখানার দোকানে কাটাচ্চি জীবনটা। এদের শান্ত সঙ্গ আমার জীবনে আনন্দ এনেচে উগ্র দুরাশার মত্ততা ঘুচিয়ে। সে দুরাশাটা কি? নাই বা লিখলাম সেটা।

আজ বিকেলে সারা ঈশান কোণ জুড়ে কালবৈশাখীর মেঘ করল এবং ভয়ানক ঝড় উঠল। হাজারী জেলেনী, জগবন্ধু, কালো, জেলি ওরা আম কুড়ুতে গেল বাগানে—কারণ এখনও আম যথেষ্ট আছে, ঝিনুকে গাছ, চারা বাগানে, মাঠের চারায়।

তারপর ঘন বর্ষা নামলো—আমি আর কালো বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম বর্ষাস্নাত গাছপালা, বটের সারি, উলুর মাঠের মধ্য দিয়ে বেলেডাঙ্গাতে। সেখান থেকে যখন ফিরি, বর্ষা আরও বেশি, বিদ্যুতের এক একটা শিখা দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী—আকাশে কালো কালো মেঘ উড়ে চলেছে—আমার মনে হল আমিও যেন ওদের সঙ্গে চলেচি মহাব্যোম পার হয়ে চিন্তাতীত কোন্ সুদূর বিশ্বে—আকাশ মহাকাশে আমার সে গতি—পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন, সুখদুঃখ ঘরগৃহস্থালীর বন্ধনমুক্ত আমার আত্মা, সে পায়ের তলায় সারা পৃথিবীর মোহ মাড়িয়ে চলেচে—মহাব্যোমের অন্ধকার, শূন্য, মেঘ, ইথার, সমুদ্র ভেদ করে মুক্তপক্ষ গতিতে অমিত-তেজে চলেচে— দিক্‌পাল বৈশ্রবণের বিশ্ববিদ্রাবণকারী পৌরুষের বীর্য্যে।

নদীতে স্নান করতে নেমে সাঁতার দিয়ে বৃষ্টি মাথায় চলে গেলুম ওপারে মাধবপুরের চরের ওপর বর্ষা দেখতে—পশ্চিম দিকে পিঙ্গল বর্ণের মেঘ হয়েচে, ওপারের বাঁশবন হাওয়ায় দুলচে—তারপর আমরা আবার এপারে এলাম—ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি এলাম।

আজকার সন্ধ্যাটি ঠিক বর্ষাসন্ধ্যা—কিন্তু কেমন যেন নিঃসঙ্গ মনে হচ্চে। যেন আর কেউ থাকলে ভাল হত—কত থাকলেই তো ভাল হত—সব সময় হয় কৈ?

আমার মনে এই যে অনুভূতি—এ অনেক কাল পরে আবার হল। আমি কত নিঃসঙ্গ নির্জ্জন জীবন যাপন করেচি কতকাল ধরে, লোকালয় থেকে কতদূরে। কিন্তু ১৯২৩—২৬ সালের পরে ঠিক এ ধরনের বেদনা-মাখানো নিঃসংগতার অনুভূতি আর কখনো হয় নি। এই মনের অবস্থা আমি জানি, চিনি একে—এ আমার পুরাতন ও পরিচিত মনোভাব, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ভুলে গিয়েছিলাম একে —আবার সেই ফিরে এল।

কাল আবার খুব আনন্দ পেয়েচি। মনের ও ভাবটা কাল আর ছিল না।

বিকেলে আমরা কাঁচিকাটার পুলের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। নীল মেঘে সারা আকাশ জুড়ে ছিল—কাল স্নান করে ফিরবার পথে শিমুল গাছটার ওদিকে আউশ ধানের ক্ষেতের ওপরকার নীল আকাশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম—অমনি মনের ভাব বিকেলেও হয়েছিল। আরামডাঙ্গার ওপারে সেই খাবরাপোতার দিকের আকাশে একটা নীল পিঙ্গল বর্ণ-শ্রী, সূর্য্য বোধ হয় অস্ত যাচ্ছিল, আমরা কিন্তু পেয়ারা গাছটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না—আমি আর কালো কত খুঁজলাম, আরামডাঙ্গার পথে মরগাঙের ধারে সেই পেয়ারা গাছ যে কোথায় গেল!

সন্ধ্যার কিছু আগে কুঠির মাঠে একটা ঝোপেঘেরা নতুন জায়গা আবিষ্কার করা গেল—এদিকটায় কখনো আসি নি—এমন নিভৃত স্থানটা, খুব আনন্দে নদীতে সাঁতার দিলাম।

এবার বারাকপুরে চমৎকার ছুটিটা কাটল। সমস্ত ছুটিটাই তো এখানে রয়েচি। আর বছর এখানে ১০।১১ দিন মাত্র ছিলাম—বনগাঁয়ে ছিলাম বেশীদিন। এবার এখান থেকে কোথাও যাই নি। এখান থেকে যেতে মনও নেই। কলকাতার জীবনটা যেন ভুলে যেতে বসেচি।

কাল বিকেলে ঘন কালো মেঘ করে বৃষ্টি এল। আমি আর কালো বৃষ্টি মাথায় বেলেডাঙ্গার পুল পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলাম। ঝোপঝাপ ভিজে কেমন হয়ে গিয়েচে—গাছপালার গুঁড়ির রং কালো—ডালপাতা থেকে জল ঝরে পড়ার শব্দ। তারপরে নদীর জলে স্নান করতে নামলাম—সাঁতার দিয়ে বাঁধাল পর্য্যন্ত গেলাম।

সাঁতার দিয়ে এত আনন্দ পাই নি কোনদিন এবারকার গরমের ছুটির আগে। কুঠীর মাঠের একটা নিভৃত স্থানে চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—মাথার ওপর কালো মেঘ উড়ে যাচ্চে—দিক্ থেকে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুতের শিখা—শুধু চারিদিকে বৃষ্টির শব্দ,—গাছে পাতায়, ডালপালায় ঝোড়ো হাওয়া বইচে—নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থাকার সে অনুভূতির তুলনা হয় না। তার প্রকাশের ভাষাও নেই—যা খুব ঘনিষ্ঠ, খুব আপন, তাকে কি আর প্রকাশ করা যায়?

আজ বিকেলে বহুদিন পরে ভারী সুন্দর রাঙা রোদ উঠল। বাঁধালের কাছে নাইতে নেমে মাঝ-জলে গিয়ে ওপারের একটা সাঁইবাবলা গাছের ওপর রোদের খেলা দেখছিলাম—কি অদ্ভুত ধরনের ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশ, আর কি অপূর্ব্ব সোনার রং রোদের।...সকলের চেয়ে সেই সাঁইবাবলা গাছের বাঁকা ডালপালা ও ক্ষুদে ক্ষুদে সবুজ পাতার ওপর সোনার রংয়ের রোদের খেলা।...তারই পাশে ওপারের কদম্ব-গাছটাতে বড় বড় কুঁড়ি দেখা দিয়েচে...শ্রাবণের প্রথমেই ফুল্লপুষ্পসম্ভারে নতশাখ-নীপতরুটি বর্ষাদিনের প্রতীক্ স্বরূপ ওই সবুজ উলুখড়ের মাঠে স্বমহিমায় বিরাজ করবে—বর্ষার ঢল নেমে ইছামতী বেড়ে ওর মূল পর্য্যন্ত উঠবে, ঝরা কেশররাজি ঘোলাজলের খরস্রোতে ভেসে চলে যাবে...উলুবন আরও বাড়বে...আমি তখন থাকবো কলকাতায়, সে দৃশ্য দেখতে আসবো না।

কাল সকালে এখান থেকে যাবো, আজই এখানে থাকার শেষ দিন এ বছরের মতো। এবার ছুটিটা কাটল বেশ—কি প্রকৃতির দিক থেকে, কি মানুষের দিক থেকে, অদ্ভুত ভাবে ছুটিটা উপভোগ করা গেল এবার। কলকাতায় থাকলে আমার যে আফ্রিকা দেখবার ইচ্ছে হয়, পাহাড় জঙ্গল দেখবার ইচ্ছে হয়—এখানে দীর্ঘদিন কাটালে কিন্তু আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। গাছপালায়, নীল আকাশে, নদীর

কালোজলে সাঁতার দিতে দিতে দুপাশের বাঁশবন, সাঁইবাবলার সারি চেয়ে চেয়ে দেখা, সবুজ উলুর মাঠের দৃশ্য, পাখীর অবিশ্রান্ত ডাক—এখানে মনের সব ক্ষুধা মিটিয়ে দেয়। বসে লিখচি, রাণু এসে বললে—দাদা, এক কাপ চা খাবেন কি? সে ওদের রান্নাঘর থেকে চা নিয়ে এসেচে বয়ে। আর কাল থেকে অনবরত বলচে—দাদা চলে যাবেন না কাল, আর একদিন থাকুন, আপনি চলে গেলে পাড়া আঁধার হয়ে যাবে।

কাল সমস্ত দিনের মধ্যে অন্ততঃ তিন-চার বার একথা বলেছে—অথচ ওর ওপর কি অবিচার করেচি এবার—ওকে নিয়ে তাস খেলি নি একটি দিনও—ও খেলতে চাইলেও খেলি নি। ভাল করে কথাও বলি নি।

বললে—জন্মাষ্টমীর ছুটিতে আসবেন তো?

আমি বললাম—যদিই বা আসি, তোর সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। তুই তার আগেই তো চলে যাবি।

এদের কথা ভেবে কলকাতায় প্রথম প্রথম কষ্ট হবে।

পূজার ছুটিতে বাড়ি এসেচি। রাখামাইন্‌স্ গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন একা মেঘান্ধকার বিকালবেলাতে সার্টাকিটার অরণ্যময় জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে এসেছিলাম। এই পথে একা যেতে ওদেশের লোকেও বড় একটা সাহস করে না—যখন একটা ছোট পাহাড়ী ঝরনায় নেমে রবীন্দ্রনাথের চিঠির একটা অংশ সেখানে রেখে দিচ্চি, কাল নীরদবাবুদের বিশ্বাস করাবার জন্যে, তখন সেখানে কুলুকুলু ঝরনার শব্দটি মেঘশীতল বৈকালের ছায়ায় কি সুন্দর লাগছিল! পাহাড়ের Saddleটা যখন পার হচ্চি তখন ঝম-ঝম করে বৃষ্টি নামল, হাজার হাজার বনস্পতির পাতা থেকে পাতায় ঝর্-ঝর্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। দূরের কালাঝোর পাহাড় মেঘের ছায়ায় নীল হয়ে উঠেচে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে খেলা করচে। কালিদাসের 'সানুমান আম্রকুট' কথাটি বার বার মনে পড়ছিল—একা সেই মহুয়াতলায় শিলাখণ্ডে বসে।

একদিন রাখামাইন্‌স্-এর বাংলোর পেছনে বনতুলসীর জঙ্গলে ভরা পাহাড়টার মাথায় অস্তগামী সূর্যের আলোতে বসেছিলাম, ওদিকে রাঙা রোদ-মাখানো সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথাটা দেখা যাচ্ছে, এদিকে পাহাড়ের Ledge থেকে দূরে গালুডির চারুবাবুর বাংলো দেখা যাচ্চে—সেদিন কি আনন্দ যে মনে এল—তার বর্ণনা ভাষায় দেওয়া যায় না। সেদিন আবার বিজয়া দশমী—নীল ঝরনার ধারে একটা শিলাখণ্ডে একা বসে রইলাম সন্ধ্যাবেলাতে, ক্রমে জ্যোৎস্না উঠল, মহুয়াতলার ঘাট দিয়ে পাহাড়ের দিক দিয়ে ঘুরে আসতে আসতে কুসুমবনীতে উড়িয়া মুদীর দোকানে গেলাম সিগারেট কিনতে। আশ্চর্য্যের বিষয় এইখানে হঠাৎ নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তিনি ও তাঁর স্ত্রী Shanger সাহেবের বাংলো থেকে চা খেয়ে ঐ পথে মেঘ-ঢাকা অস্পষ্ট জ্যোৎস্নাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন—বিজয়ার কোলাকুলি সেই দোকানেই সম্পন্ন হল। ভাবলাম, আজ আমাদের দেশে বাঁওড়ের ধারে বিজয়া দশমীর মেলা বসেচে।

তার পরদিন আমরা গালুডিতে গেলাম ডোঙাতে সুবর্ণরেখা পার হয়ে—চারুবাবুদের বাংলোতে গিয়ে সুরেনবাবু, আমি নেকড়েডুংরির পাহাড়ে গিয়ে উঠে বসলাম। চা খেয়ে আশাদের বাড়ি গিয়ে গান শুনলাম আশার—সেখানে বিজয়ার মিষ্টিমুখ না

করিয়ে ছাড়লে না। ফিরবার পথে সুবর্ণরেখাতে ডোঙা পাওয়া গেল না—অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রে সুবর্ণরেখা রেলের পুল দিয়ে চন্দ্ররেখা গ্রামের মধ্যে দিয়ে অনেক রাত্রে ফিরলাম রাখামাইন্‌সে্‌র বাংলোতে। নদী পার হবার সময়ে সেই ছবিটা...সেই নদীর ওপরে জ্যোৎস্নাভরা আকাশে একটিমাত্র নক্ষত্র দেখা যাচ্চে, নীচে শিলাস্তৃত সুবর্ণরেখা, পশ্চিম তীরে ঘন শাল জঙ্গল, দূরে শ্যামপুর থানার ক্ষীণ আলো, লাইনের বামদিকের গাছগুলো আধ জ্যোৎস্নায় আধ অন্ধকারে দেখা যাচ্চে না, কিন্তু ফুটন্ত ছাতিম ফুলের ঘন সুগন্ধ ; বাংলোতে ফিরে এসে দেখি—প্রমোদবাবু এসে বসে আছেন।

পরদিন আমরা সবাই মিলে সার্টকিটার জঙ্গলের পথে গেলাম—তার পরদিন গালুডি থেকে চারুবাবু, সুরেনবাবু ও মেয়েরা এলেন। চার নম্বর খাদানের নীচের জঙ্গলের মধ্যে পিক্‌নিক্‌ হল। ঝুনু, আশা, আমি, চারুবাবু, সুরেনবাবু ও ভিক্টোরিয়া দত্ত বলে একটি মেয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি আরোহণ করলাম। একেবারে সিদ্ধেশ্বরের মাথায়। একটা অম্লমধুর বনফুলের কাঁচা ডাল ভেঙে নিয়ে পাহাড়ে উঠলাম—তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।

সেদিন আমি স্টেশনের বাইরে কি একটা গাছের ছায়ায় পাথরের ওপর বসে রইলাম যেমন সেদিন সকালে আমি ও গ্রামের প্রমোদবাবু পিয়ালতলার ছায়ায় প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডে শুয়ে বটগাছটার দিকে চেয়ে প্রভাতী আলোতে অজানা কত কি পাখীর গান শুনছিলাম।...

বেলা পড়ে এসেছে...বারাকপুরে বসে এইসব কথা লিখতে লিখতে মন আবার ছুটে চলে যাচ্ছে সেই সব দেশে। শীতের বেলা এত তাড়াতাড়ি রোদ রাঙা হয়ে গাছের মাথায় উঠে গেল! বকুলগাছের মাথায়, বাঁশগাছের মাথায় উঠে গিয়েচে রোদ একেবারে।

সেই সুন্দর লতাপাতার গন্ধটা এবার ভরপুর পাচ্চি—ঠিক এই সময়ে ওটা পাওয়া যায়। কাল এখানে চড়কতলায় কৃষ্ণযাত্রা হল, জ্যোৎস্নারাত্রে গাছপালায় শিশির টুপটাপ ঝরে পড়চে—আমি চালতেতলার পথে একা শুধু বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলাম। কি রূপ দেখলাম কাল জ্যোৎস্নাভরা রহস্যময়ী হেমন্ত রাত্রির! কাল নদীর ধারে বিকেলেও অনেকক্ষণ বসে রইলাম।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পাটলবর্ণের মেঘস্তূপের দিকে চোখ রেখে একটা জলার ধারে বসলাম—গাছপালার কি রূপ! সেই যে গন্ধটা এই সময় ছাড়া অন্য সময় পাওয়া যায় না—সেই গন্ধ দিন রাত সকাল সন্ধ্যা আমাকে যেন অভিভূত করে রেখেচে।

আজ কদিন বর্ষা পড়েচে—বসে বসে আর কোন কাজ নেই, খুকুদের সঙ্গে গল্প করচি, কাল সারাদিনই এইভাবে কেটেছে, তবুও কাল নদীতে এপাড়ার ঘাট থেকে ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিলাম, একটু ব্যায়ামের জন্যে। আজ সকালে নদীর ঘাটে ভোরবেলা গিয়ে মেঘমেদুর আকাশের শোভায় আনন্দ পেলাম। এই শিমুলগাছগুলো আমাদের এদেশের নদীচরের প্রধান সম্পদ! এগুলো আর সাঁইবাবলা না থাকলে ইছামতীর তটশোভা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হত।

আজ সকালে নদীর ঘাটে গিয়ে চারিদিকের আকাশে চেয়ে দেখলাম মেঘ অনেকটা কেটেছে—আকাশের নীচে একটু একটু আলো দেখা যাচ্চে—বোধ হয় ওবেলা আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। মনটা তপ্ত নির্ম্মল আকাশ ও প্রচুর সূর্য্যালোকের জন্যে

হাঁপাচ্চে—কাকাদের শিউলি গাছটার দিকে চেয়ে দেখচি গাছপালার স্বাভাবিক প্রভাতী রং ফিরে এসেচে—সে ঘষা কাচের মত রং নেই আকাশের। কিন্তু একটু পরেই ঘন মেঘে সব ঢেকে দিলে।

আমি আবিষ্কার করেচি আমাদের দেশের প্রথম হেমন্তের সে অপূর্ব্ব সুগন্ধটা প্রস্ফুটিত মরচে-লতার ফুলের গন্ধ। হঠাৎ কাল বিকেলে আমি এটা আবিষ্কার করেচি। কুঠীর মাঠে আজ স্নানের পূর্ব্বে বেড়াতে গিয়ে বনে বনে খানিকটা বেড়ালাম, লক্ষ্য করে দেখলাম এই সময়ে কত কি বনের লতাপাতায় ফুল ফোটে। মরচেলতা তো পুষ্পিত হয়েছেই, তা ছাড়া মাখমসিমের গোলাপী ফুলের দল ঘন সবুজ পাতার আড়ালে দেখা যাচ্চে, কেঁয়োঝাঁকার লতায় ক্ষুদে ক্ষুদে ফুল ফুটেচে, ফুল বলে মনে হয় না, মনে হয় যেন হলদে পুষ্পরেণু,—কি ভুরভুরে মিষ্টি গন্ধ, ডালের গায়ে পর্য্যন্ত ফুল ফুটেছে। ছাতিম ফুলের এই সময়, কুঠীর মাঠের জঙ্গলে একটা নবীন সপ্তবর্ণ তরুর দেখা মিলল, কিন্তু ফুল হয় নি তাতে। মেটে আলু তুলবার বড় বড় গর্ত্ত বনের মধ্যে, এক জায়গায় একটা খুব বড় কেয়োঁঝাঁকার ঝোপকে কেটে ফেলেচে দেখে আমার রাগ ও দুঃখ দুই-ই হল, নিশ্চয় যারা মেটে আলু তুলতে এসেছিল, তাদেরই এই কাজ। সজীব পুষ্পিত গাছ—কারণ এই সময় কেঁয়োঝাঁকার ফুল হয়—কেটে ফেলা যে কতদূর হৃদয়হীন বর্ব্বরতা, তা আমাদের দেশের লোকের বুঝতে অনেকদিন যাবে। সেবার অমনি যুগল কাকাদের বাড়ির সামনের কদমগাছটা কালো বিক্রী করে ফেললে তিন টাকায়, জ্বালানি কাঠের জন্যে। এমনি কি কেউ কোথাও শুনেচে? কদমগাছ, যা গ্রামের একটা সম্পদ, যে পুষ্পিত নীপ সকল বৈষ্ণব কবিকুলের আশ্রয় ও উপজীব্য—সামান্য তিনটে টাকার জন্যে সে গাছ কেউ বেচে? শুধু আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা সম্ভব হয়, সুন্দরকে দেখবার চোখ থাকলে, ভালবাসার প্রাণ থাকলে এ সব কি আর হত?

কাল বিকেলে অল্পক্ষণের জন্য সোনালী রাঙা রোদ উঠল—বেলেডাঙ্গার পথে যেখানে একটা বাবলা গাছের মাথায় একটা বুনো চালকুমড়ো হয়ে আছে, ঐখানটাতে বসলুম—কত দিনের মেঘমেদুর আকাশের পরে আজ রোদ উঠেচে, এ-যেন পরম প্রার্থিত ধন!

এক জায়গায় সোঁদালি ফুল ফুটে থাকতে দেখলাম মাঠের মধ্যে। কার্ত্তিক মাসে সোঁদালি ফুল, কল্পনা করতেই পারা যায় না। কেলেকোঁড়ার ফুলও এসময়ে হয়।

কাল মেয়েরা চোদ্দ শাক তুললে, চোদ্দ পিদিম দিলে—খুকুদের বোধনতলায় বড় একটা প্রদীপ দিয়েছিল, বিলবিলের ধারে, উঠোনের শিউলিতলায়। বারাকপুরে চোদ্দ পিদিম দেওয়া দেখি নি কতকাল!

আজ বিকেলে খুকুদের কুঠীর মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলাম। পুরনো কুঠীর হাউজঘরে ঘোর জঙ্গল হয়ে গিয়েচে—কত কি বনের লতা হয়ে আছে—খুকুর তা দেখে আনন্দ উৎসাহ দেখে কে! একটা লতার মধ্যে কি ভাবে ঢুকে সে খানিকটা দুললে, মাঠে গিয়ে ছুটোছুটি করলে—আমায় কেবল চেঁচিয়ে বলে—দাদা, এটা দেখুন, ওটা দেখুন। তারপর ফিরে এসে ছেলেদের নিয়ে গোপালনগরে গেলাম কালী পূজোর ঠাকুর দেখাতে। হাজারীর ওখানে অনেক রাত হয়ে গেল তাস খেলতে বসে—অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরদিনও আবার কুঠীর মাঠে যাওয়ার কথা ছিল—ওরা সবাই গেল, কিন্তু

মনোরমার ভাই কালো কুঠীর জঙ্গলে হাঁটুটা বেজায় কেটে ফেললে, তার ফলে সকলেরই বেড়ান বন্ধ হল। রাত্রে খুকুকে অনেক গল্প শোনালাম অনেক রাত পর্য্যন্ত।

আজ সকালে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। রায়বাড়ির পাঁচি কাঁদচে, ওর দাদা আশু মাস-খানেক হল মারা গিয়েচে, সেই জন্যে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের ধরনে 'ও ভাই রে, বাড়ি এসো', বলে চেঁচিয়ে কাঁদচে। কিন্তু আমার মনে সত্যিই দুঃখ হল ওর জন্যে। পাঁচিকে এ গাঁয়ের সব লোকেই 'দূর, ছাই' করে, সবাই ঘেন্না করে—আজ পাঁচি ওদের সবারই বড় হয়ে গিয়েচে। তবুও তার প্রতি সহানুভূতি নেই কারুর—কান্না শুনে পিসিমা বলচেন, মুখ বেঁকিয়ে—'আহা! মনে পড়েচে বুঝি ভাইকে।'

নৌকো করে বনগাঁয়ে যাচ্চি সকালবেলা। চালকীর ঘাটে এসেচি—এবার এদিকের পাড় ভেঙেচে। কেমন নীল রং-এর একটি পাখী বাবলা গাছে শিস্ দিচ্চে। নৌকোর দুলুনিতে লেখার বড় ব্যাঘাত হচ্চে। নীল কলমীর ফুল, হলদে বড় বড় বন-ধুঁধুলের ফুল ফুটেচে। আর এক রকম কি লতায় কুচো কুচো হলদে ফুল ফুটে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপের মাঝে আলো করে রেখেচে—সে যে কি অপূর্ব্ব সুন্দর তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই ফুলের নাম জানি নে, যেন হলদে নক্ষত্র ফুটে আছে—ছোট ছোট ক্ষুদে ক্ষুদে, যেন নববধূর নাকছাবি। কার্ত্তিকের শেষে এই ফুলটা ফোটে জেনে রাখলাম, আবার আসচে বছর দেখতে আসবো। এতদিন এ ফুল আমার চোখে পড়ে নি। হেমন্তে এত বনের-ফুলও ফোটে এদেশে! ঝোপের মাথা আলো করে সবুজ পাতালতার মধ্যে তিৎপল্লার ফুল, ক্ষুদে ক্ষুদে ঐ অজানা ফুল, মাঝে মাঝে বড় বড় বনকলমীর ফুল—কি রূপ ফুটেচে প্রভাতের। কাশফুল তো আছেই মাঝে মাঝে, নদীতীরের কি অপূর্ব্ব শোভা এখন—তা ছাড়া পুষ্পিত সপ্ত-পর্ণও মাঝে মাঝে যথেষ্ট।

ঐ অজানা ফুলটা মাঝিকে দিয়ে ঝোপ থেকে পাড়িয়ে আনলাম—দশটি করে ছোট ছোট পাপড়ি—ছ'টা করে পরাগ কোষ বা গর্ভকেশর প্রত্যেকটাতে। জলে কচুরী-পানার ফুল ফুটেছে, অনেকটা কাঞ্চন ফুলের রং, কিন্তু দেখতে বড় চমৎকার—একটা লম্বা সরস সবুজ ডাঁটায় থোকা থোকা অনেকগুলো ফুল—ঐ সুন্দর ফুলের জন্যেই কচুরীপানা সৃষ্টির মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে- ভগবানের কাছে সুন্দরের সার্থকতা অমর—তার utility-টা গৌণ। মাঝি গল্প করছিল, এবার অনেকে ইছা-মতীতে মুক্তা পেয়েছে ঝিনুক তুলে। এ সময়ে বন্যেবুড়ো গাছেও শাল-মঞ্জরীর মত দেখতে সবুজ রং-এর ফুল ফুটেচে—আর এক প্রকার জলজ ঘাসের নীল ফুল ফুটেচে—এর রং ঠিক তিসির ফুলের মত নীল। এক একটা ছোট গাছের মাথায় ছোট ঝোপে ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে অজানা ফুল ফুটে আলো করচে।

কাল রাত্রে কি একটা কথা মনে এল—তার শব্দ-পরম্পরায় মনে একটা অপূর্ব্ব অননুভূত ভাবের উদয় হোল। শব্দেরও ক্ষমতা আছে। প্রমথবাবু বলেন, নেই। এই নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একদিন তর্ক করেছিলাম।

আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ একেবারে নিৰ্ম্মেঘ, নির্ম্মল। দুঃখ হোল এই ভেবে যে আমিও বারাকপুর থেকে এলাম আকাশও গেল পরিষ্কার হয়ে' আজ এই জন্যে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল—বারাকপুরে এমন নীল আকাশটা দেখতে পেলাম না! খুকুর গাওয়া সেদিনকার গানটা বার বার মনে আসতে লাগল—

মোর ঘুম-ঘোরে এলে মনোহর
নমোনমঃ, নমোনমঃ, নমোনমঃ

কাল কলকাতা থেকে এসেছি, বেশ ভাল লাগল আজ সকালে খয়রামারির মাঠ ও বন। বনে সাদা সাদা সেই কুচো ফুল—শীতকালে অজস্র ফোটে এদেশের বনে জঙ্গলে—নদীয়া ও যশোর জেলার সর্ব্বত্র দেখেছি এ সময়ে। কলেজে পড়বার সময় যখন প্রথম প্রথম মামার বাড়ি যেতাম—তখন ভবানীপুরের মাঠের ওদিকের পথ দিয়ে যাবার সময়ে দেখতাম একটা বড় ঝোপে ঐ ফুলটা ফুটে থাকত। কেলো এসেছিল আমার সঙ্গে আমার বাসায়—একসঙ্গে বাক্স, বিছানা বেঁধে বাসা থেকে রওনা হলাম। অনেকদিন পরে ওকে দেখে মনে বড় আনন্দ পেয়েছি কাল।

বড়দিনের ছুটিতে অনেককাল বারাকপুরে আসিনি—এবার এলাম। শীতের পল্লীপ্রান্তরে কি শোভা, তা এতদিন ভুলে ছিলাম। বিকেলে আজ যখন বেলেডাঙ্গা বেড়াতে গেলাম—বনের কোলে সর্ব্বত্র ফুটন্ত ধুর ফুলের প্রাচুর্য্য ও শোভা দেখে মনে হোল, সেদিন মণি বোসের আড্ডায় যারা বল্‌ছিল যে, বাংলাদেশের বনে ফুল তেমন নেই, তারা বাংলাদেশ সম্বন্ধে কতটুকু জানে? ক্রোকাস, মার্গারেট্, কি কর্ণ-ফ্লাওয়ার এখানে ফোটে না বটে—কিন্তু যে দিকে চোখ তাকাই, সে দিকেই এই যে প্রস্ফুট নীলাভ শুভ্রবর্ণের ধুর ফুলের অপূর্ব্ব সমাবেশ—এর সৌন্দর্য্য কম কিসে? কি প্রাচুর্য্য এই ফুলের—ঝোপের নীচেও যে ফুল—সেখান থেকে থাকে থাকে উঠেচে ঝোপের মাথা পর্য্যন্ত, আগাগোড়া ভর্ত্তি। এত নীচু ও অত উঁচুতে ও ফুল কি করে গেল তাই ভাবি। ঋতুতে ঋতুতে কত কি ফুল ফোটে আমাদের দেশের বনে-ঝোপে, আমার দুঃখ হয় এর সন্ধানও কেউ রাখে না, নাম পর্য্যন্ত জানে না। অথচ সুন্দরকে যারা ভালবাসে—তারা বাংলার নিভৃত মাঠ বনঝোপের এই অনাদৃত অথচ এই অপূর্ব্ব সুন্দর ফুলকে কখনো ভুলবে না।

বেলেডাঙ্গায় গিয়ে সেক্‌রার দোকানে বসে গল্প করলাম। ছোট্ট খড়ের ঘরে দোকান। বাঁশের বেড়া। ননী সেক্‌রার মেজছেলে বিড়ি বাঁধ্‌চে—তার দোকান-ঘরের সামনে একটা নতুন কামার-দোকান হয়েচে—সেখানে হাল পোড়াচ্ছে। হালের চারধারে ঘুঁটের সনসনে আগুনে অনেক লোক বসে আগুন পোয়াচ্চে। দোকানের পিছনের বেড়ায় ধুরফুল ফুটে আছে। যেদিকে চাই সেদিকেই এই ফুল—এক জায়গায় মাঠের মধ্যে থাকে থাকে কতদূর পর্য্যন্ত উঠেচে এই ফুলের ঝাড়। রাঙা রোদ ও রাঙা সূর্য্যাস্ত শীতকালের নিজস্ব! এমন অস্ত-আকাশের শোভা অন্য সময় দেখা যায় না।

যুগল বোষ্টমের সঙ্গে দেখা ফিরবার পথে—সে বল্লে তার চলচে না, আমি তার G. T. পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কিনা।

কাল আবার ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে কুঠীর মাঠের নিভৃত বনঝোপের ধারে গিয়ে বসলুম। ধুরফুল কি অপূর্ব্ব শোভাতেই ফুটেচে। পাখী এত ভালবাসি কিন্তু কাক ছাড়া কলকাতাতে আর কোন পাখী নেই—এখানে কত কি অজস্র পাখীর কলকাকলি, গাছপালা বন ঝোপের কী সীমারেখা, যেন নৃত্যশীল নটরাজ, ওপারের কাশচরে শিমুলগাছটা দেখা যাচ্ছে, নীলাকাশে রোদ ঝলমল করচে। একটা বাব্‌লা-গাছের ফাঁক দিয়ে চাইলে কোন অজানা দেশের কথা মনে আনে—শীতের অপরাহ্নে বাংলার এই নিভৃত পল্লীপ্রান্তে যে কি সৌন্দর্য্য ভরে থাকে, চোখে না দেখলে সে বোধ হয় নিজেই বিশ্বাস করতুম না। আর দেখলাম এক জায়গায় বসে থাকলে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায়। ভাল করে সে জায়গার রস অনেক বেশী পাওয়া যায়—

কোথায় লাগে গালুডি, কোথায় লাগে কাশ্মীর, কোথায় লাগে ইটালি—আমার মনে কতটুকু আনন্দ ও চিন্তা সে জাগাতে পারে—এই যদি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উৎকর্ষের পরিমাপক হয়...তবে আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি ইছামতী তীরের এই নিভৃত বন-ঝোপ, ধুরফুল-ফোটা মাঠের, রাঙা-রোদমাখা শিমুলগাছের, বনপাখীর এই কলকাক-লির অপরূপ সৌন্দর্য্যের তুলনা নেই। যে পরিদৃশ্যমান আকাশের এক-তৃতীয়াংশে দেড়লক্ষ Super Galaxy আছে, এখানে বসে বসে ভেবে দেখলুম—সে সব বড় বিশ্বের মধ্যে কি আছে না আছে জানিনে—তবে এখানে যা আছে, সেখানেও তাই আছে বলে মনে হয়! What is in microcosm is also in macrocosm—সে সব দার্শনিক আলোচনা এখন থাকুক, বর্ত্তমানে এই সুবৃহৎ বিশ্বের এককোণে ধুরফুল-ফোটা বনঝোপের পাশে ক্যাম্পটুলটা পেতে বসে একটু আনন্দ পাচ্ছি, পাই।

অনেক বেলা গেলে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলাম। একটু আগে যেতাম, খুকু বসে ছিল, বল্লে একটু দেরি করুন, আরও বেলা যাক্। খুব জোর-পায়ে হেঁটে পেঁাছে গেলাম বেলেডাঙগার সেক্‌রার দোকানে—মধ্যে এই ধুরফুল ফোটা বিশাল মাঠটা যেন এক দৌড়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর ননী সেক্‌রার কত গল্প শুনলাম বসে বসে। তার ন'টা গরু ছিল, আর বছর ফাগুন মাসে একে একে সব কটা মরে গেল গাল-গলা ফুলে। দোকানের সামনে একজন লোক বসে হাল পোড়াচ্চে আর অত্যন্ত খেলো ও বাজে সিগারেট টানচে। আমি বল্লাম, ও খেয়ো না, ওতে শরীর খারাপ হয়। বল্লে, আমি খাইনে বাবু, এক পয়সায় সে দিন হাটে কিনলাম ছ'টা—তাই এক একটা খাচ্চি!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়েচে—কুঠীর মাঠে সুঁড়ি জঙ্গলের পথটা অন্ধকার হয়ে গিয়েচে, পথ দেখা যায় না। নদীর ধারে এসে দাঁড়ালাম আমাদের ঘাটে—ওপারে একটা নক্ষত্র উঠেচে—সেটার দিকে চেয়ে কত কথা যে মনে পড়ল। ঐ Super Galaxy-দের কথা—বিরাট Space ও নীহারিকাদের কথা—এই বনফুল ও পাখীদের কথা। কতক্ষণ সেখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম—এই নক্ষত্রটার সঙ্গে যেন আমার কোন্ অদৃশ্য যোগসূত্র রয়েছে—বসে বসে এই শীতের সন্ধ্যায় এই ইছামতীতে কত কি ঘটেছিল পুরোনো দিনে, সে কথা মনে এলো।

গৌরীর কথা মনে এলো—তারপর অন্ধকার খুব ঘন হয়ে এলো। আমি ধীরে ধীরে উঠে বাঁশবনের পথ দিয়ে বাড়ি চলে এলাম। আজ দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আমার সেই পুরোনো জায়গায় বসলাম—সেই যেখান থেকে কুঠীর দেবদারু গাছটা দেখা যায়—কি অপরূপ শোভা যে হয়েচে সেখানে ফুটন্ত ধুরফুলের, তা না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো যাবে না। এই যে আমি লিখচি, আমারই মনে থাকবে না অনেকদিন পরে,—ওই ছবিটা অস্পষ্ট হয়ে যাবে মনের মধ্যে। এরকম হয় আমি জানি—তবুও আজই দেখেচি, তাই নবীন অনুভূতির স্পর্দ্ধায় জোর করে বলছি বনফুলের শোভার এ প্রাচুর্য্য আমি দেখিনি। বিহারে নেই, সিংভূমে নেই, নাগপুরে নেই—এই বাংলা দেশের sub-tropical বন জঙ্গল ছাড়া গাছপালার এই ভঙ্গি ও ফুলের এই প্রাচুর্য্য কোথাও সম্ভব নয়। কেন যে লোকে ছুটে যায় বম্বে, দিল্লী, কাশী, দেওঘর তা বলা কঠিন! বাংলাদেশের এই নিভৃত পল্লী-প্রান্তের সৌন্দর্য্য তারা কখনো দেখেনি—তাই।

আজ বিকেলে টুনি, কাতু, জগো, বুধো এদের সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে বনঝোপের ধারে টুলটা পেতে বসলাম। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে গেল—একটা

ফুল-ফোটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম। তারপর একটা নরম কচি, ঘাসে-ভরা জলার ধারে মুক্ত সান্ধ্য হাওয়ায় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি খেলা করলুম কতক্ষণ—আমি এই সবই ভালবাসি। সাধে কি কলকাতা বিষ লাগে! এই শীত-কালের সন্ধ্যায় এতক্ষণ ধোঁয়ায় সারা কলকাতা শহর ভরে গিয়েচে—আর এখানে কত ডাহুক, জলপিপি, দোয়েল, শালিকের আনন্দ-কাকলি, কত ফুটন্ত বনফুলের মেলা, কি নির্ম্মল শীতের সন্ধ্যার বাতাস, কি রঙীন অস্তদিগন্তের রূপ, শিরীষ গাছে কাঁচা সুঁটি ঝুলচে, তিত্তিরাজ গাছে কাঁচা ফলের থোলো দুলচে, জলার ধারে ধারে নীল-কলমী ফুল ফুটেচে। মটর শাক, কচি খেঁসারি শাকের শ্যামল সৌন্দর্য্য—এই আকাশ, এই মাঠ, বন, এই সন্ধ্যায়-ওঠা প্রথম তারাটি—জীবনে এরা আমার প্রিয়, এদেরই ভালবাসি, এরাই আবাল্য আমার অতি পরিচিত সাথী—এদের হারিয়ে ফেলেই তো যত কষ্ট পাই!

বিকেলে আজ বেলেডাঙার মরগাঙের আগাড়ে একটা নিরিবিলি জায়গায় এক বোঝা পাকাটির ওপর গিয়ে বসে ওবেলার সেই কথাটা চিন্তা করছিলাম—ভগবান তাঁর পুজো না পেলে প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে ওঠেন না—ও'র পুজোর সঙ্গে ভয়ের কোন সম্পর্ক নেই—তাঁর যে পুজো, সে শুধু প্রেমের ও ভক্তির, এই পাড়াগাঁয়ে এদের সেকথা বোঝানো শক্ত। পুজোর ঘরে বসে আজ ওবেলা যখন শালগ্রাম পুজো কর-ছিলাম, তখনই আমার মনে হোল, এই ঘরের বন্ধ ও অমুক্তির পরিবেষ্টনীর মধ্যে ভগবান নেই, তাঁকে আজ বিকেলে খুঁজবো সুন্দরপুরের কিংবা নতিডাঙ্গার বাঁওড়ের ধারে মাঠে, নীল আকাশের তলায়, অস্ত-বেলার পাখীদের কলকাকলির মধ্যে। তাই ওখানে গিয়ে বসেছিলাম।

বসে বসে কিন্তু আজমাবাদের কথা মনে এলো। এই পৌষ মাসে ঠিক এই সময়ে আমি সেখানে যেতুম, ঠিক এই বিকেলে রাঙা রোদের আভা মাখানো তিন-টাঙার বনের ভেতর দিয়ে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপারে যেতুম ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াতে—কলাইক্ষেত থেকে কলাইয়ের বোঝা মাথায় মেয়েরা আসতো, গঙ্গার বুকে বড় বড় পাল তুলে নৌকা চলে যেত মুঙ্গেরের দিকে, ভীমদাস-টোলায় আগুনের চারিধারে বসে গ্রামের লোকে গল্পগুজব করতো। ফিরবার পথে বাঁধের ওপর ওঠবার সময় দেখতুম চারিধারের মাঠ কুয়াশায় ভরে গিয়েচে—সেই ছবিগুলো মনে হলো। তার চেয়ে যে আমাদের দেশের ভূমিশ্রী, এই নির্জ্জন শান্তিতে ভরা অপরূপ সুন্দর পল্লীপ্রান্ত, ওই মরগাঙের শুকনো আগাড়ের নতুন কচি ঘাসের ওপর চরে বেড়াচ্চে যে গরুর দল, ওই দূরের বটগাছটা, মাঠের ওপারের বনফুল-ফোটা বনঝোপ, এই ডাহুক পাখীর ডাক, গ্রামসীমার বাঁশবন—এসব যে রূপের বিত্তে নিঃস্ব তা নয়, বরং আমার মনে হয় এরা বিহারের সেই বৃক্ষলতা-বিরল প্রান্তরের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধ-তর, কিন্তু সেখানে একটা জিনিস ছিল, যা বাংলাদেশের এ অঞ্চলে অন্ততঃ নেই—Space!...Wide open Space! দূরবিসর্পী দিগ্বলয়, দূরত্বের অনুভূতি, একটা অদ্ভুত মুক্তির আনন্দ—এ যেমন পেয়েছিলাম ইসমাইলপুরের দিয়ারাতে ও আজমাবাদে—আর কোথাও তা মিলবে না।

আজ খুকু দুপুরে খানিকটা বসে রইল—আমি মাঠে বেড়াতে যাবো বলে গোপালনগরে গেলাম না। মরগাঙের আগাড়ে আজও অনেকক্ষণ গিয়ে বসে ছিলাম। বেলেডাঙ্গার পুলের কাছে ফিরবার পথে কি একটা বনফুলের সুগন্ধ বেরুল—খুঁজে

বার করে দেখি কাঁটাওয়ালা একটা লতার ফুল। লতাটা আমি চিনি, নাম জানিনে। ননী সেকরার দোকানের কাছেই ঝোপটা। ননী কাদা দিয়ে রুপো গালাবার মুচি গড়চে। ওদের সঙ্গে খানিকটা গল্প করবার পরে নদীর ধারে এসে খানিকটা দাঁড়ালাম —ওপারে কালপুরুষ উঠেচে, নীল Rigel-এর আলো নদীর জলে পড়েছে। নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ একা দাঁড়িয়ে ওপারের তারাটার দিকে চেয়ে থাকবার যে আনন্দ, যে অনুভূতি, তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—কারণ অনুভূতির স্বরূপ তাতে বর্ণিত হয় না, অথচ কতকগুলো অর্থহীন কথা দিয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে অনুভূতির প্রকৃতি সম্বন্ধে লোকের মনে ভুল ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয়। এ অব্যক্ত, অবর্ণনীয়।

আজ এই সন্ধ্যাতেই একটা উল্কাপাত দেখলাম—ওপাড়ার ঘাটের মাঝামাঝি আকাশে—প্রথমে দেখা, তারপর নীল ও বেগুনি রং হয়ে গেল জ্বলতে জ্বলতে—জলে ছায়া পড়ল। আমি অমন ধরনের উল্কাপাত দেখিনি!

আজ এখানে বেশ শীত পড়েচে। দুপুরের আগে ফুল-ফোটা মাঠে বেড়াতে যাওয়া আমার প্রতিদিনের অভ্যাস। আজ আকাশ কি অদ্ভুত ধরণের নীল! কুঠীর সেই দেবদারু গাছটা, কানাই ডোঙার গাছ, শিরীষ, তিত্তিরাজ কি সুন্দর যে দেখাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে! মাঝে মাঝে দু'একটা চিল উড়চে বহুদূরে নীল আকাশের পথে! এসব ছবি মনে করে রাখবার জিনিস। কি আনন্দ দেয়, কত অননুভূত ভাব ও অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত করে এরা। প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, নির্জ্জন স্থানে প্রকৃতির এই রূপ মনে নতুন ধরণের অনুভূতি ও চিন্তা এনে দেয়। এ আমি জীবনে কতবার দেখলাম—তার প্রমাণ পাই প্রতি সন্ধ্যায় আজকাল কুঠীর মাঠ থেকে ফিরবার পথে, নিভৃত সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে দাঁড়িয়ে ওপারের চরের আকাশে প্রথম-ওঠা দু'চারটা নক্ষত্রের দিকে যখন চেয়ে থাকি তখনই বুঝতে পারি। যে দেবলোকের সংবাদ তখন আমার মনের নিভৃত কন্দরে ঐ রিগেল্ বা অন্য অজানা নক্ষত্র বহন করে আনে সে গহন গভীর উদাত্ত বাণী অমৃতের মত মনকে বৈচিত্র্যময় করে, সাধারণ পৃথিবীর কত ঊর্দ্ধলোকের আয়তনে মনকে উঠিয়ে নিয়ে যায় একমুহূর্ত্তে। এ একটা বড় সত্য। বড় বড় সাধক, কবি, দার্শনিক, সুরস্রষ্টা, চিত্রকর, শিল্পী—যাদের চিন্তা আর ভাব নিয়ে কারবার, এ সত্যটা তাদের অজ্ঞাত নয়। এজন্যেই এমার্সন বলেচেন, "Every literary man should embrace solitude as a bride." এ সম্বন্ধে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হিউ ওয়ালপোল গত জুলাই মাসের Adelphi কাগজে বড় চমৎকার একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। নির্ব্বাসিত দান্তে বলেছিলেন, 'কি গ্রাহ্য করি আমি, যতক্ষণ আমার মাথার ওপর আছে নীল আকাশ আর অগণ্য তারকালোক'। জার্ম্মান মিস্টিক্ এক্হার্ট কখনো লোকের ভিড়ে বা শহরের মধ্যে থাকতে ভালবাসতেন না—তাঁর "Our Heart's Brotherhood" গাথাগুলির মধ্যে অনেকবার উল্লেখ আছে এ কথার।

ওকথা যাক্। আমি নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করেচি, যাকে এতদিন বলে এসেচি ধুরফুল, তার আসল নাম হোল এড়াঞ্চির ফুল। ধুরফুল লতার ফুল বিলবিলেতে ছিল, সাদা বড় বড় ফুল ফুটত—পুঁটি দিদি বলছিল। আজকাল আর দেখা যায় না। শ্যাম-লতা, ভোমরা-লতার ফুলও এসময় ফোটে। আগে নাকি আমাদের পাড়ার ঘাটে শ্যাম-লতার ফুল ফুটে বৈকালের বাতাসকে মধুর অলস গন্ধে ভরিয়ে দিত—আজকাল সে লতাও নেই, সে ফুলও নেই।

কাল সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে কুঠীর মাঠে বেড়াতে বেড়াতে রঙীন অস্ত-আকাশের

দিকে চেয়ে অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে কত বিচিত্র ধরণের গাছপালার সীমারেখা দেখলাম—এদের এখানে যা রূপ, তা এক যদি ভারতবর্ষের মধ্যে মালাবার উপকূলে এবং আসাম ও হিমালয়ের নিম্ন অঞ্চলের অধিত্যকায় থাকে—আর কোথাও সম্ভব বলে মনে হয় না।

ছোট এড়াঞ্চির ফুল সকলের ওপরে টেক্কা দিয়েচে। কাল যখন মাঠের মধ্যে দিয়ে বেলেডাংগার গোয়ালপাড়ায় গেলাম—উঁচুনিচু মাটি ও ডাঙা পাশে রেখে, ফুল ফোটা বড় বড় বনঝোপের নীচে দিয়ে—কত কি পাখী বেড়াচ্চে ঝোপের নীচে শুকনো পাতার রাশির ওপরে। কাঁটাওয়ালা সেই সবুজ লতাটায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে—খুকু বল্লে, বনতারা।—নামটি ভারি সুন্দর, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা গেল না ও কোন লতার কথা বলচে—আর চারিদিকে অজস্রসম্ভারে ঢেলে দেওয়া ছোট এড়াঞ্চির ফুল। বনে, ঝোপে, বাবলাগাছের মাথায়, কুলগাছের ডালে, বেড়ার গায়ে, ডাঙাতে যে দিকেই চাই সেই দিকে ওই সাদা ফুলের রাশি। আমি বাংলায়ও বনের এমন রূপ আর কখনো দেখিনি। যদি জ্যোৎস্না রাত্রে এই রূপ দেখতে পেতাম!

এ ক'দিন ছিলাম কলকাতায়। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে এবার নন্দলাল বসুর দুখানি বড় সুন্দর ছবি দেখে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। খুকু ও জাহ্নবীর মেয়ে খুকী সংগে ছিল—তারাও দেখেছে, তবে নন্দবাবুর ছবির তারা কি বুঝবে? ওদের দেখালুম বায়োস্কোপ, জু, সার্কাস্—আর এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালুম। একদিন সজনী দাসের বাড়ি, একদিন নীরদের বাড়ি, একদিন নীরদ দাসগুপ্তের ওখানে। দুঃখ হোল যে এখানে এসময়ে সুপ্রভা নেই।

কাল নৌকায় বনগাঁ থেকে এলাম। কি অদ্ভুত রূপ দেখলাম সন্ধ্যায় নদীর। শীতও খুব, অন্ধকার হয়ে গেল। কলকাতার হৈ চৈ-এর পরে এই শান্ত সন্ধ্যা, ফুল ফোটা বন, মাঠ, কালো নিথর নদীজল মনের সমস্ত সংকীর্ণ অবসাদ দূর করে দিয়েছে। চালতেপোতার বাঁকে বনের মাথায় প্রথম একটি তারা উঠেচে—কত দূর দেশের সংবাদ আলোর পাখায় বহন করে আনচে আমাদের এই ক্ষুদ্র, গ্রাম্য নদীর চরে—আমার মনের নিভৃত কোণে।

ঘাটে যখন নামলুম, তখন খুব অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। খুকু ও আমি জিনিস-পত্র নিয়ে বাঁশবনের অন্ধকারে ভয়ে ভয়ে বাড়ি এলুম, খুকু তো একবার ভয়ে চীৎকার করে উঠল কি দেখে। ভয়ের কারণ এই যে, এসময়ে আমাদের দেশে বাঘের ভয় হয়।

দুপুরে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে কুঠীর এদিকে বনের মধ্যে সেই যে ঢিবিটা আছে, সেখানে খানিকটা বসলুম—তার পরে একটা নাবাল জমি, আর ওপারে সেই বটগাছটা। আকাশ কি অদ্ভূত নীল! ছোট এড়াঞ্চির ফুল এখনও ঠিক সেই রকমই আছে—কদিন আগে যা দেখে গিয়েচি, সৌন্দর্য্য এখনও ম্লান হয় নি। প্রায় পনেরো দিন ধরে এর সৌন্দর্য্য সমান ভাবে রয়েচে, এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি এ বড় আশ্চর্য্যের কথা। এমন কোন বনের ফুলের কথা আমার জানা নেই, যা ফুটন্ত অব-স্থায় এতদিন থাকে। বালজ্যাকের গল্পটা (Atheist's Mass) তখনই পড়ে সবে বেড়াতে গিয়েচি, আকাশ যেন আরও নীল দেখাচ্ছিল, বনফুল-ফোটা ঝোপ আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। নাইতে গিয়ে বাঁশতলার ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়ে এলাম।

বিকেলে ক্যাম্প-টুলটা নিয়ে গিয়ে কুঠীর সেই ঢিবিটাতেই অনেকক্ষণ বসে রইলুম—রোদ রাঙা হয়ে গেল, ওপারের শিমুলগাছটার মাথার ওপর উঠে গেল,

তখনও আমি চুপ করে বসেই আছি। (কি ভয়ানক শীত পড়েচে এবার, এই যে লিখচি আঙুল যেন অবশ হয়ে আসচে।) আমার সামনে পেছনে ফুল-ফোটা সেই ঝোপ বন, পাশেই নদী। একবার ভাবলুম বেলেডাঙ্গায় যাবো, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উঠতে পারা গেল না এই সৌন্দর্য্যভূমি ছেড়ে।

নির্জ্জন সন্ধ্যায় প্রতিদিনের মত নদীতীরে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর পারের দ্যুতিলোকের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—ওপারের চরের ওপরে উঠেচে কালপুরুষ, তারপর এখানে ওখানে ছড়ানো দু'চার দশটা তারা। এই নিভৃত সন্ধ্যার আনন্দ সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক—আমি দেখচি কুঠীর মাঠের যে আনন্দ তার প্রকৃতি Aesthetic, কিন্তু এই জনহীন নদীতীরে কুঁচঝোপ, বাঁশবন, ওপারের খড়ের মাঠ, এদের সবার ওপরকার ওই দ্যুতিলোক যে বাণী প্রাণে এনে পৌঁছে দেয়, তা বিশ্বলোকের এবং অন্তরলোকের যিনি অদৃশ্য অধিদেবতা, তাঁর বাণী—আজকাল যেন তার প্রকৃতি একটু একটু বুঝতে পারি। আর আসলে বুঝতে ওইটুকু পারি বলেই তো তা আমার কাছে তাঁর বাণী এবং পরম সত্য, নইলে তো মিথ্যে হোত। যা ধরতে পারিনে, বুঝতে পারিনে, আমার কাছে তা ব্যর্থ।

কাল দুপুরে রোদে পিঠ দিয়ে বসে অনেকগুলি ভাল ভাল ফরাসী গল্প পড়লাম। তারপর স্নানের পূর্ব্বে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। যে জায়গাটাতে অনেকদিন যাইনি—সেই চারিদিক বনে ঘেরা ধুরফুল-ফোটা ঝোপের বেড়া দেওয়া মাঠের মধ্যে বসে রইলাম। শীতের দুপুরে নীল আকাশের রূপ, আর সূর্য্যাস্তের রূপ—এদের অন্য কোনো ঋতুতে দেখা যায় না। শীতকালে ইসমাইলপুর আর আজমাবাদের দিগন্তব্যাপী মাঠের প্রান্তে রাঙা সূর্য্যাস্ত দেখে ভাবতাম এ বুঝি বিহারের চরের নিজস্ব সম্পত্তি—কিন্তু এবার দেখলাম বাংলাদেশেও অমনি রক্তাভ অস্তদিগন্ত স্বমহিমায় প্রকাশ পায়। আজ বিকালেও সূর্য্যাস্তের শোভা দেখবার জন্যে কুঠীর মাঠে গিয়ে এক জায়গায় কটা রোদ-পোড়া ঘাসের ওপর গায়ের আলোয়ানখানা বিছিয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। ডাইনে একটা বাব্‌লাগাছের শুক্‌নো মগডালে অনেক পাখী এসে বসে যেন নামজাদা চীনে চিত্রকরের একটা ছবি তৈরী করেচে। সামনের বনঝোপ, কুঠীর শিরীষ গাছে রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, নীল আকাশের কি রূপ! বারাকপুরে আর হয়তো কখনো আসবো না—কুঠীর মাঠ আর দেখবো কি না কি জানি! আজকার এই অপরাহ্ন যেন চিরদিন মনে থাকে—এর সুখ, আনন্দ ও এর দুঃখ। মাঠ থেকে উঠে গেলাম গঙ্গাচরণের দোকানে—সেখানে সবাই বসে দেশবিদেশের গল্প করচে। অশ্বিনী যাত্রা-দলের বাজিয়ে, এখানেই ঘর বেঁধে বাস করে। তার বাড়ি পূর্ণ গোঁসাই বলে একটা লোক এসেছিল—সে এখানে এসে গল্প করে গিয়েচে যে, সে বিলেত ঘুরে এসেচে। প্রমাণস্বরূপ বলেচে কোথায় নাকি প্রকান্ড পিতলের মূর্ত্তি সে দেখেচে—এ দ্বীপে একখানা পা, আর একটা দ্বীপে আর একখানা পা—তার তলা দিয়ে সে জাহাজে ক'রে গিয়েচে। এ একটা অকাট্য প্রমাণ অবিশ্যি যে, সে লোকটা বিলেতে গিয়েছিল!

আজই যাবার কথা ছিল কিন্তু খুকু বল্লে আজ থাকুন। গত শনিবারে খুকুদের বাড়ি বারাকপুরে গিয়েছিলাম। ও দাঁড়িয়ে রইল পৈঠেতে আসার সময়। সকালে গোঁসাই বাড়ির পাঠশালা Examine করতে গেলাম। বোষ্টম বুড়ীর বাড়ির সামনে বড় বটগাছের তলায় যুগল বসে কথা বলচে একজন বৃদ্ধ মুসলমানের সঙ্গে। বৃদ্ধ বলচে,

'আমাদের দিন পার হয়ে গিয়েচে, বেলা চারটে, এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথ দেখাও, পথ দেখাও।' কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। দুপুরে আটির ধারে মাঠে যেমন রোজ বেড়াতে যাই, আজও গেলাম। দুপুরের আকাশ যেমন নীল, অপরূপ নীল—এমন কিন্তু অন্য কোনো সময়ে পাইনি। দুপুরের পরে খুকু এসে অনেকক্ষণ ছিল। তাই দুপুরে কিছু লেখা হয়ে উঠল না। বিকেলে আমি গিয়ে কুঠীর মাঠে একটা নিভৃত স্থানে গায়ের আলোয়ানখানা ঘাসের ওপর বিছিয়ে তার ওপর চুপ করে বসে রইলাম। এতে যে আমি কি আনন্দ পাই! একটা অনুভূতি হোল আজ, ঠিক সেই সময় রাঙা রোদ ভরা আকাশের নিচের গাছপালায় আঁকা-বাঁকা শীর্ষদেশ লক্ষ্য করতে করতে।

সকালে উঠে নৌকাতে আবার বনগাঁয়ে যাচ্চি। জলের ধারে ধারে মাছরাঙা পাখী বসে আছে নলবনে। কাঁটাকুমুরে লতায় থোকা থোকা সুগন্ধ ফুল ধরেচে। তবে ফুলের শোভা নেই, গন্ধই যা আছে।

বড়দিনের ছুটি শেষ হোল। আবার কলকাতায় ফিরতে হবে। কে জানে, কবে আবার দেশে ফিরতে পারব!

ঊর্মিমুখর

(মে ১৯৩৫—সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)

অনেকদিন এবার গ্রামে আসি নি। প্রায় মাস-তিনেক হোল। এবার দেশে গরমও খুব। একটুকু বৃষ্টি নেই কোনদিকে। দুপুরের দিকে হাওয়া যেন আগুনের হল্‌কার মত লাগে।

এবার গ্রামে এসে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে দেখি সল্‌তেখাগী আমগাছটা ঝড়ে ভেঙে গিয়েচে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। সল্‌তেখাগী ঝড়ে ভেঙে গেল! ও যে আমার জীবনের সঙ্গে বড় জড়ানো নানাদিক থেকে। ওরই তলায় সেই ময়নাকাঁটার ঝোপটা, যার সঙ্গে আবাল্য কত মধুর সম্বন্ধ।

সল্‌তেখাগীর সঙ্গে আর দেখা হবে না। ওকে কেটে নিয়ে জ্বালানী করবে এবার হাজারী কাকা। সত্যিই আমার চোখে জল এল। যেন অতি আপনার নিকট বিয়োগ অনুভব করলুম।

গাছপালাকে সবাই চেনে না। এতদিনের সল্‌তেখাগী যে ভেঙে গেল, তা নিয়ে দের পাড়ার লোকের মুখে কোনো দুঃখ করতে শুনি নি।

পথের পাঁচালীতে সল্‌তেখাগীর কথা লিখেচি। লোকে হয়তো মনে রাখবে ওকে

খুকুদের কাল আসবার কথা গিয়েচে দু-ধার থেকে। আজও এল না, বোধ হয় আবার জ্বর হয়ে থাকবে।

আজ বিকেলে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে বার হয়েচি, পথে গিয়ে বসেচি গঙ্গাচরণের দোকানে, কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে গল্পসল্প করচি, এমন সময়ে কি মেঘ করে এল সুন্দরপুরের দিক থেকে! গঙ্গাচরণ বললে, খুব বৃষ্টি এল। আমি ওর দোকান থেকে বার হয়ে যেমন এসে বাঁওড়ের ধারের পথে পা দিয়েচি, অমনি বেলেডাঙার ওপারের বাঁশ বনের মাথার ওপর কালবৈশাখীর মেঘের নীল নিবিড় রূপ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। কোথা থেকে আবার এক সারি বক সেই সময় নীল মেঘের কোলে উড়ে চলেচে—সে কি অপরূপ রচনা! এদিকে মনে ভয় হচ্চে যে তাড়াতাড়ি গাঁয়ে ফিরতে হবে, ঝড় মাথায় মাঠের মধ্যে থাকা ভাল নয়, অথচ যাবো তার সাধ্যি কি! পা কি নাড়তে পারি? তারপর সোঁদালী ফুলের-ঝাড়-দোলা বনের ধার দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পেঁাছলাম আমাদের ঘাটে। সেখানে স্নান করে যখন আমাদের গুয়াতেলির তলা দিয়ে যাচ্চি—হাজারী জেলেনী সেখানে আম কুড়ুচ্ছে—বড় চারার তলাতেও রথযাত্রার ভিড়। বৃষ্টি এল দেখে পালিয়ে বাড়ি এসে ঢুকলাম।

সল্‌তেখাগী আমগাছটা একেবারে কেটে ফেলে করাতীর দল তক্তা তৈরী করচে। হাজারী ঘোষ রোড্‌সেস নীলামে বাগান কিনেচে—ওই এখন তো কর্ত্তা। ও কি জানে সল্‌তেখাগীর সঙ্গে আমার বাল্য জীবনের কি সম্পর্ক!

কাল বিকেলে গোপালনগরে গিয়ে হাজারীর বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে ছিলুম। তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে ফর্দ্দ ইত্যাদি করা হচ্চে, সকলে খুব ব্যস্ত। এমন সময়ে অনেকদিন আগেকার দেখা সেই ভদ্রলোকটি, হল্‌দিবাড়িতে যাঁর পাটের ব্যবসা ছিল, তিনি এলেন। আজ প্রায় পনেরো বছর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। আমি যখন কলেজে পড়তুম—ইনি তখন এই গ্রীষ্মের বন্ধের সময়ই মাঝে মাঝে এখানে আসতেন। মতি দাঁয়ের দোকানের বাইরের বারান্দায় বসে এঁর সঙ্গে কত কি আলাপ হোত। তখন এঁর বয়স ছিল পঞ্চাশ, এখন পঁয়ষট্টি। কিন্তু তখন ইনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ঘোর তার্কিক ছিলেন, অনেক ব্যাপারের খোঁজখবর রাখতেন। এখন হয়ে পড়েচেন একেবারে অন্য রকম। আর কিছুতেই উৎসাহ নেই, নানারকম বাতিকগ্রস্ত হয়ে উঠেচেন। একটা প্রধান বাতিক তার মধ্যে এই দেখ্‌লুম যে ওঁর বিশ্বাস, ওঁর শরীর খারাপ হয়ে গিয়েচে,

আর সারবে না। আমি কত বোঝালুম, বললুম, 'আপনার বয়েস হয়েচে, তার তুলনায় আপনার শরীর ঢের ভাল। কেন মিছে ভাবচেন?' ভদ্রলোকের ছেলে আমার সঙ্গে গোপালনগর স্কুলে পড়তো অনেক দিন আগে। সে ছেলেটি শুনেচি মারা গিয়েচে। আমি সে কথা জিগ্যেস করিনি।

ভদ্রলোক আমার সঙ্গে খানিকদূর এলেন। আমি তাঁকে বোঝাতে বোঝাতে এলুম। তুঁতৃতলায় স্কুলের কাছে তিনি চলে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়েচে. মাথার ওপর বৃশ্চিক উঠেচে, জ্বল জ্বল করছে নক্ষত্রগুলো—বাঁওড়ের মাথার ওপরে উঠেচে সপ্তর্ষি। এতক্ষণ বিয়ের বড়লোকী-ফর্দ্দরূপ বদ্ধ হাওয়ার মধ্যে থেকে মনটা হাঁপিয়ে উঠেছিল, এইবার এসে আকাশের দিকে মুক্ত বহুদূর নাক্ষত্রিক জগতের দিকে সেটা ছড়িয়ে দিয়ে বাঁচলুম।

হাট থেকে এসে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম। বেলা খুব পড়ে গিয়েচে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালের নির্ম্মেঘ অপরাহ্ণের শোভা এত সুন্দর যে যার অভিজ্ঞতা নেই তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। এই অপরূপ সৌন্দর্য্যলোকের মধ্যে বসে কত কথাই মনে আসে!

হাজার বছর কেটে যাবে—এই রঙীন মেঘমালা, এই গায়কপাখীর দল, এই সব নরনারী, গাছপালা—কোথায় ভেসে যাবে কালস্রোতে, কিন্তু মানুষ তখনও থাকবে। নতুন ধরনের কি রকম মানুষ আসবে, কি রকম হবে তাদের সভ্যতা, কি জ্ঞানের আলো তারা পৃথিবীতে জেবলে দেবে—এই সব ভাবি।

নদীতে স্নান করতে নেমেচি, পুঁটি দিদি তখনও ঘাটে। বৃশ্চিক রাশির একটা নক্ষত্র খুব জ্বল্ জ্বল্ করচে। নদীর ওপারে সাঁই-বাবলা গাছগুলোতে অস্ত-দিগন্তের রঙিন্ মায়া-আলো পড়েচে।

সারারাত কাল আম কুড়িয়েচে লোকে লণ্ঠন ধরে। আমার মাঝে মাঝে ঘুম ভাঙে. মাঝে মাঝে দেখি সবাই আম কুড়ুচ্চে।

কাল করুণার সঙ্গে আকাইপুরে গেলুম যেমন প্রতি বৎসর যাই। করুণার মায়ের মুখে সেখানের গল্প শুনে বড় তৃপ্তি পাই। সহায়হরি ডাক্তারের দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা আবার শুনলুম। সে এক করুণ কাহিনী। তারপর শুনলুম মধু মুখুয্যে ও প্রেমচাঁদ মুখুয্যের বাড়ির ডাকাতির গল্প। এ গল্প অবিশ্যি আমি ছেলেবেলায় শুনেচি, তবুও আবার ভাল করে শুনলুম। করুণাদের বাড়ির অতিথি-সেবা ও তার বাপের টাকা ওড়ার গল্প বড় মজার। টাকা আদায় করে নিয়ে আসছিল গোমস্তা। ২৫০৲ টাকার হিসাব দিলে না। বললে, কর্ত্তা মশায়, মাঠে ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল, টাকা-গুলো উড়ে গিয়েচে, আর পেলুম না।' ওর বাবা তাকে রেহাই দিলেন। মরবার আগে সবাইকে ডেকে যত বন্ধকী খত ছিঁড়ে ফেললেন। ওঁর ছেলেরা কার নামে নালিশ কর্ত্তে যাচ্ছিল, করুণার মা বললেন—শোন্, তা তো হবে না, কর্ত্তা বারণ করে গিয়েচেন মরবার সময়ে। ওদের পীড়ন করতে পারবে না। যা দেয় নাও গে যাও।

একদিকে যেমন করুণার বাবা, অন্যদিকে তেমনি সহায়হরি ডাক্তার। সহায়হরির মত অর্থপিশাচ মানুষ পাড়াগাঁড়ে বেশী নেই। খতে টাকা উশুল দিলে দেয় না, অথচ আদায়ী টাকার জন্যে খাতকের নামে নালিশ করে। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের এক আধলা রেহাই দেবে না খাতককে।

বিকেলে একটু মেঘ করেছিল। গঙ্গাচরণের দোকানে কবিরাজ মশাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিলুম। আমি বললুম—কি রাঁধলেন, কবিরাজ মশাই?—কণ্টিকারীর ফল ভাজা আর ভাত। এই কবিরাজটি বড় অদ্ভুত মানুষ। বয়স প্রায় সত্তর হবে, কিন্তু সদানন্দ, মুক্তপ্রাণ লোক। কোন্ দেশ থেকে এদেশে এসেচে কেউ জানে না। বিশেষ কিছু হয় না এই অজ পাড়াগাঁয়ে। তবুও আছে, বলে—এদেশের ওপর মায়া বসে গিয়েচে। সোঁদালি ফুল দিয়ে একটা বালিশ তৈরি করেচে, সেই মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকে।

একটু পরে ঘন মেঘ করে এল। বেলেডাঙার ওপারে বাঁশবনের মাথার ওপরকার আকাশে যে কি সুনীল নিবিড় মেঘসজ্জা! মেঘের কোলে আবার একসারি বক উড়ল। কি রূপ যে হোল, আমি বৃষ্টির ভয়ে পালাচ্ছিলুম, কিন্তু সৌন্দর্য্য দেখে আর নড়তে পারি নে। কে একটি মেয়ে নদীর এপারে কালো চুলের রাশি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। কি চমৎকার ছবিটি!

আজ বেশ মনের আনন্দ নিয়েই সকাল সকাল বেলেডাঙা গিয়েছিলুম। তখনও চারটের গাড়ি যায় নি। গঙ্গাচরণের দোকান খোলে নি। আইনদ্দির বাড়িতে তেল-পড়া নেবার জন্যে পাঁচী পাঠিয়েছিল আমার সঙ্গে জগোকে ও বুধোকে। আইনদ্দির বাড়িতে ছেলেবেলাতে একবার গিয়েছিলুম, ওর ছেলে আহাদ মণ্ডল তখন বেঁচে ছিল। আইনদ্দির বাড়িটা কি চমৎকার স্থানে! সেখান থেকে দূরের মেঘভরা আকাশের নীচে প্রাচীন বট অশ্বত্থের সারি কি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল! আইনদ্দি চক্মকি ঠুকে সোলা ধরিয়ে তামাক সাজলে ও একটা সোলা ফুটো করে আমায় তামাক খেতে দিলে। তারপর সে কত গল্প করলে বসে বসে। ১২৯২ সালে সে প্রথম এদেশে এসে বাস করে। তখন তার বয়েস বিয়াল্লিশ বছর। সে বছর বন্যার জল উঠেছিল তার উঠোনে। মরা গাঙ তখন ইছামতী ছিল, একথা কাল মতি মণ্ডলও জলের ওপর দাঁড়িয়ে আমায় বলেছিল। আইনদ্দি বললে—বড্ড ফূর্তি করেচি মশাই, যাত্রার দলে গাওনা করেচি, বহুরূপী সেজেচি, বেহালা বাজিয়েচি। আপনাদের শাস্তরটা খুব পড়েচি। ধরো গিয়ে বেরষোকেতু, সীতার বনবাস, বিদ্যেসুন্দর সব আমার মুখস্থ। তারপর সে 'বিদ্যা-সুন্দর' থেকে খানিকটা মুখস্থ বলে গেল। মহাভারত থেকে 'দাতাকর্ণ' খানিকটা বললে। এখন ওর বয়েস নব্বুইয়ের কাছাকাছি, এই বয়সেও সে নিজে চাষবাস দেখে। সে হিসাবে আমি তো নব্য যুবক। আমার সামনে এখন কত সময় পড়ে আছে। মনে করলে কত কাজ করতে পারি। কাল মতি মণ্ডলকে ঘুনি তুলতে দেখেও ঠিক এই কথাই মনে হয়েছিল।

আইনদ্দির বাড়ি থেকে সুন্দরপুরের পথে খানিকটা বেড়াতে গেলুম। মরগাঙের বাঁকে দাঁড়িয়ে আরামডাঙার ওপারের চক্রাকার আকাশের নীলমেঘের সজ্জার দৃশ্য যেন মনকে কতদূরে কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল।

পথে আসতে আসতে একটা করুণ দৃশ্য দেখে সন্ধ্যাবেলাটা মন বড় খারাপ হয়ে গেল। গোয়ালাদের একটা ছোট মেয়েকে তার মা ঘরের উঠোনে এমন নিষ্ঠুরভাবে মারচে, আর মেয়েটা কাঁদচে। আহা, নিজের সন্তানের ওপর অত নিষ্ঠুরভাবে হাত ওঠায় কি করে তাই ভাবি! কি করবো, আমার কিছুই করবার নেই। এদিকে বৃষ্টি পড়চে টিপ্ টিপ্ করে, সঙ্গে দুটো ছোট ছোট ছেলে, তাড়াতাড়ি কুঠীর মাঠের বনের পথ দিয়ে আমাদের আর বছরের চড়ুইভাতির জায়গাটা বুধোকে আর জগোকে একবার দেখিয়ে—তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলুম।

আজ দিনটা মেঘে মেঘে কেটেচে! কিন্তু সকালবেলায় একটু সূর্য্যের মুখ দেখেছিলুম। মেঘ হওয়ার সংগে সংগে মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। দুপুরে ঘুমুচ্চি, জগো এসে ওঠালে। একটু পরে খুকুও এল। জানলার গরাদটা ধরে দাঁড়িয়ে তার নানা গল্প। তার মাথা নেই, লেখাপড়া কি করে হবে...এই সব কথা। আমার কর্ত্তব্য হিসাবে তাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলুম। তারপর পাঁচীকে আর ওকে রোয়াকে বসে সূর্য্য ও গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে অনেক কথা বললুম। খুকু বেশ আগ্রহের সঙ্গে শুনলে। বললে, এ আমার বেশ ভাল লাগে। সূর্য্য সম্বন্ধে কিছুই জানতুম না। আরও বলবেন একদিন।

তারপর আমি বেলেডাঙ্গার মাঠে বেড়াতে বার হোলাম। কি সুন্দর বিকেলটা আজ! ঠাণ্ডা অথচ পথঘাট শুক্‌নো খট্‌খট্‌ করচে। মাঠের গাছপালাতে সোনালী রোদ পড়েচে। কুঠীর মাঠে যেতে যেতে প্রত্যেক সোঁদালি গাছ, ঝোপঝাপ, বাঁশবন আমার মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করচে। নতজানু হয়ে ভগবানের কাছে তাই মনের আনন্দ জানালুম। কুঠীর মাঠে ঘাসের ওপর এখনও জল বেধে আছে।

কবিরাজ ও গঙ্গাচরণ পথের ধারে মাদুর পেতে বট অশ্বত্থের ছায়ায় বসে গল্প করচে। কাপড় কেটে কবিরাজ নিজেই জামা সেলাই করচে। শুক্‌নো ভেষজ পাতালতা কলকাতায় চালান দেবে, তারই মতলব আঁটচে। বড় ভাল লাগল বিশেষ করে আজ ওদের গল্পসল্প। আসবার সময় ছাতা নিয়ে এলুম, তখন রাত হয়ে গিয়েচে, আমাদের ঘাটে যখন নাইতে নেমেচি, আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে।

ক-দিনই মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ। বিশেষ করে যখনই কুঠীর মাঠে যাবার সময় হয়, তখনই সেটা বিশেষ করে হয়। কাল যখন বিকেলে ঘন নীলকৃষ্ণ মেঘ করল, তার কোলে বক উড়ল, তখন আমি সেদিকে চেয়ে এক জায়গায় বসে আছি। আবার যখন পুলের রেলিং ধরে উঠে দাঁড়াই, অস্ত-আকাশের পটভূমিতে সবুজ বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকি, তখন আমি যেন শত-যুগজীবী অমর আত্মা হয়ে যাই। সেদিন যেমন হয়েছিল, আজও তাই হোল—বেলেডাঙ্গার ওদিকের মোড় থেকে চক্রাকৃতি দিগ্বলয়লীন শ্যাম বেণুবনের অপূর্ব্ব শোভায় মেঘধূসর আকাশতলে মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যখন এই শুক্‌নো মরাগাঙে আবার ইছামতী বইবে, তখন আমি কোন্‌ নক্ষত্রে রইবো—কত কাল পরে—কে জানে সে খবর? বাবলার সোনালী ফুল দোলানো গাছের তলা দিয়ে সেই পথ। ভাবতে ভাবতে চলে এলুম। পুলের ওপর খানিকটা দাঁড়াই। সেই কত কালের প্রাচীন বট অশ্বত্থ, কত কালের আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি ও বাঁশবনের সারি। মনে এ কয়দিনই সেই অপূর্ব্ব অনুভূতিটা আছে। পুলের পাশে একটা হেলা বাবলা গাছে ফুলের কি বাহার! যখন নদীর ঘাটে এসে নামলুম স্নান করতে তখন অন্ধকার হয়ে গিয়েচে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে শুধু বৃশ্চিকের একটা নক্ষত্র অস্পষ্টভাবে জ্বলচে। মাথার উপর দ্যুতিলোক, চারিদিকে নীরব অন্ধকার, নদীজল ও গাছপালার দিকে চেয়ে মনে যে ভাব এল, তা মানুষকে অমরতার দিকে নিয়ে যায়। বুড়ো ছকু পাড়ুই এই সময় তার স্ত্রী আদাড়িকে সঙ্গে করে নদীতে গা ধুতে এল। সে অন্ধকারে চোখে দেখতে পাবে না বলে স্ত্রী ওর সঙ্গে এসেচে।

সকালে উঠে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে আজ বড় আনন্দ পেলাম। দুপুরে পাট্‌শিমলে রওনা হওয়া গেল পায়ে হেঁটে। কবিরাজ মশায় পাঠশালায় ছেলে

পড়াচ্ছেন. তাঁর কাছে বসে একটু গল্প করে বট অশ্বত্থের ছায়াভরা পথ দিয়ে মোল্লাহাটির খেয়া ঘাটে গিয়ে পার হলাম। কেউটে পাড়ার কাছে গিয়েচি, এক জায়গায় অনেকগুলো বেলগাছ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। সেখানে বড় বৃষ্টি এল। পূর্বদিকের আকাশ বৃষ্টিধোয়া, নীল ; পরিষ্কার সেই ইন্দ্রনীল রং-এর আকাশের পটভূমিতে দূরে গ্রামের তাল-খেজুরের সারি. বাঁশবনের শীর্ষ, কি চমৎকার দেখাচ্চে। আর এদিকে ঘন কালো বর্ষার মেঘ জমেচে। গোবরাপুরের মোড় বেঁকে কুঁদীপুরের বাঁওড়ের ওপারে রানীনগর বলে ছোট একটা চাষা-গাঁয়ের দৃশ্য ঠিক যেন ছবির মত। এখানে একজন বৃদ্ধাকে পথ জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন--তোমার নাম বিভূতি? সাতবেড়েতে একবার গিয়েছিলে না? আমি বললুম--হ্যাঁ। আপনি কি করে চিনলেন? তিনি নিজের পরিচয় দিলেন না। গোবরাপুরের একটা দোকানে মণীন্দ্র চাটুয্যের ভটচায্যির সঙ্গে দেখা। সেখানে বসে একটু গল্প করেই আবার পথে বেরিয়ে পড়ি। কি ঘন বন পথের দু-ধারে। বড় বড় লতা কালো কালো গাছের গুঁড়ির গায়ে উঠেচে—এই কয়দিনের বৃষ্টিতেই গাছের তলায় বনের ছোট ছোট গাছপালার জঙ্গল বেধে গিয়েচে। 'বৌ-কথা-কও' ডাক্‌চে চারিধারে। কেউটে পাড়ার গায়ে পথের ধারের একটা সোঁদালি-ফুল গাছে এই আষাঢ় মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়েও অজস্র ফুল দেখছি। পাট-শিমলের মধ্যে কি ভীষণ tropical forest-এর রাজত্ব! ছোট ছোট জাম ফলে আছে বুনো জামগাছে—বড় বড় লতা-বনের মধ্যেটা মিশ-কালো। পাট্‌-শিমলের মোহিনী কাকার সঙ্গে বাঁওড়ের ওপারে একটা চাষাগাঁয়ে দেখা হোল। তিনি আমার সঙ্গে গেলেন প্রায় বাগান গাঁ পর্য্যন্ত। পিসিমার বাড়ি গেলুম তখন সন্ধ্যা হয়েচে। পিসিমার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। দু-জনে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করা গেল। সকালে কোদ্‌লার জলে নাইতে গিয়ে দেখি সে টলটলে জল আর নেই নদীর —কচুরি পানায় নদী মজে গিয়েচে, জল রাঙা, ঘোলা- সেইটুকু জলে সব লোকে নাইচে, গোরু বাছুরের গা ধোয়াচ্চে।

পরদিন সকালে খাওয়া-দাওয়া করে বৃষ্টি মাথায় আবার বাড়ি রওনা হই। সারা-পথটা বর্ষা আর বাদলা- কিন্তু খুব ঠাণ্ডা দিনটা। আবার সেই ঘন বন পাট্‌-শিমলে থেকে গোবরাপুরের পথে দু-জন চাষা লোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে এলুম। আবার সেই ঘন tropical forest-এর মত বন, বড় বড় কাছির মত লতা—পথ নির্জ্জন, টুপ্‌টাপ্‌ করে জল ঝরে পড়ছে গাছের মাথা থেকে. আরণ্যশোভা কি অদ্ভুত! রানীনগরের এপারে একটা সাঁকোর ওপর কতক্ষণ বসে বসে নীল আকাশের পটভূমিতে আঁকা গ্রামসীমার বাঁশবনের দিকে চেয়ে রইলুম। মোল্লাহাটির ঘাট যখন পার হই তখনও খুব বেলা আছে। আজ মোল্লাহাটির হাটবার, হাটে গিয়ে একটা আনারসের দর করলুম। সুন্দরপুরের গোয়ালাদের একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হোল। মনে পড়ছিল আজ ওবেলা যখন আসছিলুম পাট্‌-শিমলের ঘন ক্ষুদে জামবনের মধ্যের সেই পথটা দিয়ে -মনে হচ্ছিল আমি একজন বন্ধনহীন মুক্ত পথিক, দেশে দেশে এই অপূর্ব্ব রূপলোকের মধ্যে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানোই আমার জীবনের পেশা। কি আনন্দ যে হয়েছিল, কি অপূর্ব্ব পুলক, মুক্তির সে কি অমৃতময়ী বাণী! কেন মানুষে ঘরে থাকে তাই ভাবি। আর কেনই বা পয়সা খরচ করে মোটরে কি রেলের গাড়িতে বেড়ায়? পায়ে হেঁটে পথ চলার মত আনন্দ কিসে আছে? সে একমাত্র আছে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ঘোড়ায় চড়ার আনন্দ আমি জানি। তার সঙ্গে কিছুরই তুলনা হয় না।

মোল্লারহাটির হাট ছাড়িয়েচি, পথে আমাদের গাঁয়ের গণেশ মুচি নক্‌ফুল গ্রামে

ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে যাচ্ছে। ওকে দেখে বড় আনন্দ হয়—শান্ত, সরল, সাধু-প্রকৃতির লোক বলে বাল্যকাল থেকে ওকে আপনার-জনের মত দেখি।

বেলা যাব-যাব হয়েচে দেখে একটু জোর-পায়ে পথ হাঁটতে শুরু করলুম। খুব রাঙা রোদ উঠেচে চারি ধারে। খাব্‌রাপোতা ছাড়লুম, সাম্‌নে আইনদ্দির বাড়ির পেছনের প্রাচীন বটগাছটা, আইনদ্দির বাড়ির মোড় থেকে দেখতে পাওয়া সেই দূরপ্রসারী দিগ্‌বলয়—আজ আবার মেঘভাঙা রাঙা অস্ত-সূর্য্যের রোদ পড়েচে দূরের সেই সব বাঁশবন, শিমূলবনের মাথায়, ঝিঙে ক্ষেতে ফুল ফুটেচে, বৈশাখের গায়ক পাখী পাপিয়া আর 'বৌ-কথা-কও' চারিদিকে ডাক্‌চে, বেলেডাঙার হাজারী ঘোষ গোরুর পাল নিয়ে নতিডাঙার খড়ের মাঠ থেকে বাড়ি ফিরচে, মেয়েরা মরগাঙের ঘাট থেকে কলসী করে জল নিয়ে যাচ্ছে,—কি সুন্দর শান্ত গ্রাম্য দৃশ্য, একবার মনে হ'ল পাট্‌-শিমলের সেই কালীবাড়ি ও দেবোত্তর বাঁশঝাড়ের কথা। আজ দুপুরবেলা সেখানে ছিলাম, কালীবাড়ির পেছনের এক গৃহস্থের বাড়ির বৌ প্রতিবেশিনীকে ডেকে বলছিল—ও সেজ বৌ, একটু তরকারী দেবো, খুকীকে দিয়ে বাটি পাঠিয়ে দ্যাও তো!

সন্ধ্যার আগে কতদূর এসে গিয়েচি। সন্ধ্যাও হ'ল, বাড়ি এসে পা দিলাম, আমার পথ চলাও ফুরুল।

আজ শরতের অপূর্ব্ব দুপুরে পাগল করেচে আমায়। অনেক দিন লিখি নি—নানা গোলমালে অবসাদে মনটা ভাল ছিল না—আজ রবিবার দিনটা দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠেচি—কি পরিপূর্ণ ঝলমলে শরতের দুপুর। এর সঙ্গে জীবনের কি যে একটা বড় যোগ আছে—ভাদ্রমাসের এই রোদভরা দুপুরে কেন যে আমায় পাগল করে তোলে। বনে বনে মটরলতার কথা মনে পড়ে, ইছামতীর ঘোলা জল, পাখীর ডাক—মনটা যেন কোথায় টেনে নিয়ে যায়! সব কথা প্রকাশ করা যায় না—কারণ আনন্দের সবটা কারণ আমারই কি জানা আছে? কি করচে খুকু এই শরৎ দুপুরে, বকুলতলায় ছায়ায় ছায়ায়, একথাও মনে এসেছে। ওর কথা ভেবে কষ্ট হয় যে, ওর লেখাপড়া

কাল দিনটি বড় সুন্দর কেটেচে, তাই আজ মনে হচ্চে আজ সকালটিও বড় চমৎকার। অনেকদিন কলকাতায় একঘেয়ে জীবনযাত্রার পরে কাল বাড়ি গিয়েছিলুম। প্রথমেই তো খয়রামারি মাঠে দুপুরের রোদে বেড়াতে গিয়ে সবুজ গাছপালা লতা-পাতার গন্ধে নতুন জীবন অনুভব করলুম। হাওয়াতেও একটা তাজা গন্ধ আছে যা কিন্তু শহরে নেই। ঝোপে থোলো থোলো মাখম শিমের নীলফুল ফুটেচে, মটরলতার সবুজ ফল ও সোঁদালি গাছের কাঁচা সুঁটি বন-জঙ্গলের শোভা কত বাড়িয়েচে—তাদের ওপর আছে শরতের মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ, আর আছে তপ্ত সূর্য্যালোক। প্রতিবারই দেখেচি নতুন যখন কলকাতা থেকে আসি এমন একটা আনন্দ পাই! মনে হয় এই তো নীলাকাশ আছে মাথার ওপর, চারিপাশে বেষ্টন করে রয়েছে ঘন সবুজ গাছপালার ঝোপ, পাখীর ডাক আছে, বনফুলের দুলুনিও আছে—এ থেকে তো এতই আনন্দ পাচ্চি—তবে কেন মিথ্যে পয়সা খরচ করে দূরে যাই! দূর আমায় কি দেবে, এমন কি দেবে, যা এখানে আমি পাচ্চি নে? আসল কথা দূরও কিছু নয়, নিকটও কিছু নয়—প্রকৃতি থেকে আনন্দ সংগ্রহ করবার মত মনের অবস্থা তৈরী হয়ে যদি যায় তবে যে কোনো জায়গায় বসে দুটো গাছপালা, একটুখানি সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, দুটো বন্য পক্ষীর কলকাকলী, বনফুলের শোভাতেই পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করা যায়।

কাল বারাকপুরে গেলুম সকাল বেলা। দুপুরে ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে সত্যি বড় আনন্দ পেয়েচি। কূলে কূলে ভরা নদী, দু-ধারে অজস্র কাশফুল, আরও কত কি লতা ঝোপ, বর্ষার জলে সব ঘনসবুজ—চক্‌চক্‌ করচে কালো কচুর পাতা, মাখম শিমের নীল ফুল ফুটেচে—একটা গাছে সাদা সাদা বড় বড় ঢোল-কলমীর ফুলও দেখলুম।

বৈকালে যখন খুকু, আমি আর কালো নৌকোতে বনগ্রামে আসি, তখনও দেখলুম দু-ধারে গাছপালার কি অপরূপ রূপ, বনের ফুলের কি শোভা!

ছকু মাঝিকে জিজ্ঞেস্‌ করলুম—ওটা কি ফুল ছকু? ছকু বললে—কোয়ারা...

খুকুকে কাশফুল দিয়ে একটা বাংলা সেন্টেন্স তৈরি করতে দিলাম!

রাঙা-রোদ-বৈকালটি মেঘমুক্ত আকাশে, নদীতীরে অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করচে।

কাল রাত্রের ট্রেনে তারাভরা আকাশের তলা দিয়ে যখন এলুম, সেও বেশ লাগছিল।

আজ স্কুলের ছুটি হবে। সুন্দর প্রভাতটি।

আজ সকালটি বড় সুন্দর! গুয়া নদীতে হাতমুখ ধুয়ে এসে বটতলায় এসেচি—দূরে সবুজ পাহাড়শ্রেণী—সকালের হাওয়ায় একটু যেন শীতের আমেজ। কাল ঘন জঙ্গলের পথে আমরা অনেকদূর গিয়েছিলুম, পথে পড়ল দুখানা সাঁওতালী গ্রাম। বরমডেরা ও কুলামাতো। আর বছর যে রাস্তা ধরে সার্টিকটা গ্রামে যাই, এবার সে রাস্তায় না গিয়ে চললুম সোজা ধনঝরি পাহাড়ের দিকে। বামে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি। সামনে ডাইনে পিছনে চারিদিকেই পাহাড়। নীলঝরনার ওদিকের পাহাড়ের বড় বড় সামনের চাঁইগুলি নীল আকাশের পটভূমিতে লেখা আছে। ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনা এক জায়গায়। ঝরনা পার হয়ে দু-ধারে শাল, মহুয়া, তমালের বন, বুনো শিউলি গাছও আছে। একটা ভাল জায়গা দেখে নিয়ে আমরা চা খাবো ঠিক করলুম। বন সামনের দিকে ক্রমেই ঘন হচ্ছে, ক্রমে একধারে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, বড় বড় বনের গাছে ভরা, আর বাঁ দিকে অনেক নিচে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে ঘন-সন্নিবিষ্ট গাছপালার মধ্য দিয়ে। আমরা দূর থেকে ওর জলের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। সবাই মিলে নেমে গিয়ে বড় বড় গাছ ও মোটা কাছির মত লতা দিয়ে তৈরী প্রকৃতির একটি ছায়াশীতল ঘন কুঞ্জবনে একখানা বড় চৌরস কালো শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসে চা পান করা গেল। টাঙি হাতে একজন সাঁওতাল জঙ্গলে কাঠ কাট্‌তে যাচ্চে, বললে—বেশী দেরি করবেন না, একটু পরে এখানে বুনো হাতী জল খেতে নামবে। গাছপালার মাথায় মাথায় শরতের অপরাহ্ণের রাঙা রোদ। সাম্‌নে পেছনে বড় বড় পাথর, একখানার ওপর আর একখানা আকশের দিকে ঠেলে উঠেচে—ওদিকে অরও ঘন জঙ্গলের দিকে ঝরনার পথ ধরে খানিকটা বেড়িয়েও এলুম। বেলা পড়লে রওনা হয়ে ছায়াভরা পার্ব্বত্যপথে হেঁটে আমরা এলুম নীলঝরনার উপত্যকার মুখ পর্য্যন্ত। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি মাথা খাড়া করে আছে। আশেপাশের বন্য সৌন্দর্য্য সন্ধ্যার ছায়ায় আরও সুন্দরতর হয়েচে—সেইদিনই যে সুদূর পথে ইছামতীতে স্নানবার সময় আমাদের ভিটেটাতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখেছিলুম—সে কথা মনে পড়চে। নীরদবাবু ও আমি নীল ঝরনা বেড়িয়ে অনেক রাত্রে বাংলোতে ফিরি।

সকালে উঠে সুবর্ণরেখার পুলের ধারে মাছ কিনতে এলুম। সকালটি বড় চমৎকার, নির্ম্মেঘ নীল আকাশের দিকে চাইলে কত কালের কত সব কথা মনে পড়ে।

পুল থেকে চারি ধারে চেয়ে দেখি মাছ বা জলের সম্পর্কও নেই কোনো ধারে। নিচে নেমে ছায়ায় একটা শিলাখণ্ডে অনেকক্ষণ বসে রইলুম—ভাবচি সুপ্রভার পত্রের আজ একটা উত্তর দেব। ওখান থেকে ফিরে এসে বাংলোর পেছনে যে পাহাড়ী নদী—তাতে নাইতে গেলুম আমি আর শঙ্কর। সুন্দর নদীর ঘাটটি, পাথর একখানা বড় ঘাটে ফেলা আছে, জলের ধারে একটা অশ্বত্থ গাছের নিচে জলজ লিলি ফুটে। সামনে থৈ থৈ করচে পাহাড়শ্রেণী, ঘন সবুজ তার সানুদেশ। দূরে Governor's pool-এর কাছে একটা গাছের আঁকাবাঁকা মাথা সবুজ পাহাড়ী ঢালুর পটভূমিকে দেখা যায়। এ ক-দিনের প্রখর সূর্য্যালোক আর বছরের এ সময়ের বর্ষা-বাদলের কথা মনে করিয়ে দেয়...সূর্য্যের আলো না থাকলে এসব পাহাড় শ্রেণী, এ পাহাড়ী নদী, এই গাছপালা —এই প্রসারতা এত ভাল লাগত? এই এখন বসে আছি বাংলোর বারান্দাতে, দূরে দূরে কালাঝোর ও অন্যান্য পাহাড় শ্রেণী অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদে কি সুন্দরই না দেখাচ্চে! দুপুরে মহুলিয়ার পোস্ট মাস্টার এসেছিল, কেষ্ট আবার এসেছিল—ওরা বললে সেদিন যে হাতীঝরনায় গিয়ে চা খেয়েছিলুম, তার ওদিকে বাঁকাই বলে গ্রাম আছে, গভীর জঙ্গল তার ওপারে—ধান পাকলে নিত্য হাতীর দল বার হয়। বাসাডেরা ও ধারাগিরির পথ এখন নিরাপদ নয়, কেষ্ট বলছিল। সেদিকে এখন জঙ্গলও খুব ঘন, তাছাড়া বড় বাঘের ভয় হয়েচে, অনেকগুলো মানুষ-গরুকে বাঘে নিয়েচে এ বছর। সাতগুড়ুমের পথেও বাঘের উপদ্রব হয়েছে এ বছর।

পোস্ট মাস্টার বললে—আপনার জন্যে জমি রেখে দিলে বিষ্টু প্রধান, আর আপনি মোটে এলেন না। নেন যদি, জমি এখনও আছে।

বিজয়ার দিন মহুলিয়া যাবো, সেখান থেকে টাটানগর ও চাঁইবাসা।

এইমাত্র পাহাড়ের সানুদেশে বসে হালুয়া তৈরি করে চা খাওয়া গেল। মাথার ওপর অষ্টমীর চাঁদ, আকাশে দু-দশটা তারা, সামনে অরণ্যাবৃত পাহাড়ের অন্ধকার সীমারেখা, দূরে বামদিকে অরণ্য আরও গভীর, মৃদু জ্যোৎস্নালোকে পাহাড়, উপত্যকা, সানুদেশস্থ বনানী অদ্ভুত হয়েচে দেখতে। আজই পট্টনায়েকবাবু বলেছিল ৪নং shift-এ বাঘ আছে, সেজন্যে সন্ধ্যার পরে আমাদের সকলেরই গা ছম্‌ছম্ করচে। রামধন কাঠ কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখেচে পাছে বাঘভাল্লুক আসে সেই ভয়ে। কেবলই মনে পড়তে থাকে আজ মহাষ্টমীর সন্ধ্যা, বাংলাদেশের গ্রামে-গ্রামে এই সময়টিতে পুজোর চণ্ডীমণ্ডপে দেবীর আরতি হচ্চে শঙ্খ-ঘণ্টা রবের মধ্যে, ছেলে-মেয়েরা হাসিমুখে নতুন কাপড় পরে ঘুরচে—আর আমরা সিংভূমের এক নির্জ্জন বনাজন্তু-অধ্যুষিত পাহাড়ের মধ্যে বসে গল্প করচি ও প্রকৃতির শোভা দেখচি।*

ওখান থেকে ফিরচি, রুথামের মুদীর দোকানের সামনে সাঁওতালী নাচ হচ্চে, মাদল বাজার তালে তালে। আমাদের একটা কম্বল পেতে দিলে, আমরা অষ্টমীর চাঁদের নিচে পাহাড়ের সামনের ছোট গ্রামে খাঁটি সাঁওতালী নাচ দেখে বড় আনন্দ পেলুম। কবিরাজের সঙ্গে বসে একটু গল্প করা গেল। তার বাংলোর সামনে কবে রাত্রে চিতাবাঘ এসে দাঁড়িয়েছিল, সাঁওতালদের গোরস্থানে সেবারে ভূত দেখেছিল, ইত্যাদি কত গল্প।

মহুলিয়াতে আজ সারা দুপুর ঘুরে বেড়িয়েচি। বাদলবাবুর বাংলো থেকে

---

* এই অংশটি ৪নং shift-এ বসে লেখা।

কালাঝোরের দৃশ্যটি বেশ লাগল। বলরাম সায়েরের ধারে সেই গাছটি, নানারকমের পটভূমিতে দুপুরের পরিপূর্ণ সূর্য্যালোকে কি অদ্ভুত যে দেখাচ্ছিল! তিনটের ট্রেনে গেলাম টাটানগর। বাসে কাশিডি নেমে আশুর বাসা খোঁজ করে বার করি। সে একটা গন্ধরাজ ফুলগাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দু-জনে সন্ধ্যার পরে নিউ এল্-টাউনে প্রতিমা দেখে এলাম। লোক-জনের ভিড়, মেয়েদের ভিড়, তারপর ওল্ড এল্-টাউনের প্রাইমারি স্কুলে ঠাকুর দেখি। একবার আশু বাড়ি এল মোটর লরি দেখতে—পাওয়া গেল না, তারা সব বর্ম্মা জিঙ্কে ঠাকুর দেখতে যাচ্চে। হেঁটে বর্ম্মা জিঙ্ক যাবার পথে ডুপ্লে প্ল্যাণ্ট্ ও slug ঢালার সময়কার রক্ত আভা থেকে মনে হ'ল আগ্নেয়গিরি কখনো দেখি নি, বোধ হয় এই ধরনের জিনিস হবে। ওই সাদা আগুনের স্রোতের মতই তার উষ্ণ লাভা-স্রোত। বর্ম্মা মাইন্সের ঠাকুর সাজিয়েচে খুব ভাল, আবার তার সামনেই একটা কৃষ্ণলীলার ছবি সাজিয়েচে। বাসে স্টেশনে জুগস্লাই ও বিষ্ণুপুর ঘুরে কাশিডি এলাম। পথে বাস হাঁকছে, 'টিন্প্লেট', 'বর্ম্মা জিঙ্ক', যেমন কলকাতায় হাঁকে 'ভবানীপুর', 'আলিপুর'।

সকালে টাটানগর থেকে প্যাসেঞ্জারে বাসায় নামলুম। শ্যামপুর গ্রামখানা পাহাড়ী নদীর ঠিক ওপারে, কাঁকুরে জমি, কাছেই এদেশের ধরনের বনজঙ্গল। পথে সিংভূমের প্রকৃত রূপ দেখলুম, অর্থাৎ উচ্চাবচ ভূমি, পাথরের চাঁই, শাল ও কেঁদ গাছ, রাঙা মাঠ। তিনটের ট্রেনে মহুলিয়া থেকে বাদলবাবু, বিশ্বনাথ বসু প্রভৃতি অনেকে এল। অশ্বত্থ তলায় বসে চা খাওয়া গেল। বেলা পড়ে এসেচে। দুটো বাজে। সে সময় আমি একা গেলুম পাহাড়ী নদীর ধারে শালচারার জঙ্গলে একা বসতে। সামনে পাহাড় শ্রেণী থৈ থৈ করচে, দূরে কালাঝোরের নীল সীমারেখা নীল আকাশের কোলে। ঐ দিকে আজ বাংলাদেশে আমাদের গ্রামের বাঁওড়ের ধারে আড়ং বসেচে, কত দোকানদারের কত বেচাকেনা, কত নতুন কাপড়-পরা ছেলেমেয়েদের ভিড়। পাথরের ওপর অপরাহ্নের ঘনায়মান ছায়ায় এক জায়গায় বসে চারিধারের মুক্ত প্রসারতা দেখে কেবলই বাংলা-জোড়া বিজয়া দশমীর উৎসব ও কত হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের হাসিমুখ মনে পড়ল। দু-দিনের বিজয়া দশমীর কথা আমার মনে আছে ছেলেবেলাকার...যুগল কাকা সেদিন এসে রান্নাঘর ও বড়ঘরের মাঝখানে উঠোনেতে দাঁড়িয়ে বাবার সঙ্গে বিজয়ার আলিঙ্গন ও প্রণাম করলেন।...আর যেদিন গঙ্গা বোষ্টমকে আমরা আশুদের চণ্ডীমণ্ডপে ব্রাহ্মণ ভেবে ভুলে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলুম।

আজকার দিনে যেখানে যত লোককে ভালবাসি সকলের কথাই মনে পড়ল, তাদের মধ্যে কাছে কেউই নেই, অনেকে পৃথিবীতেই নেই, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ প্রীতিনির্দ্দেশ হয়তো বা ব্যর্থ যাবে না।

গালুডির হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে অনেককাল পরে আজ দেখা। সে গিয়েছিল ধলভূমগড়ের রাজবাড়িতে রোগী দেখতে, আমরা এখানে আছি শুনে বাদলবাবুদের সঙ্গে এখানে ট্রেন থেকে নেমেচে ; তার সঙ্গে জ্যোৎস্নাফুল্ল সন্ধ্যায় পাহাড়ী নদীর ধারে তপ্ত শিলাখণ্ডের ওপর গিয়ে বসলুম। অমনি যেন অন্য এক জগতে এসে পড়েচি মনে হ'ল। দূরে নদীর কুলুকুলু জলস্রোত, ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র পাহাড় শ্রেণী, খুব একটি আঁকাবাঁকা কি গাছ, আর এক প্রকারের বনফুলের মিষ্টি সুবাস—মাথার ওপরের নক্ষত্রবিরল আকাশ—সবগুলো মিলে আমায় এমন এক রাজ্যে নিয়ে গেল যে চুপ করে সেদিকে চেয়ে বসেই থাকি, হরিদাস ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলা আর আমার

হয় না, কথা বলবার মত মনও নেই, কেমন যেন হয়ে গেলুম। দু-জনেই চুপচাপ, কতক্ষণ বসে থেকে রাত দশটার কাছাকাছি বাংলোতে ফিরি।

বৈকালে নীলঝরনা বেড়াতে গেলুম কিন্তু বেলা গিয়েছিল বলে বেশীক্ষণ নীলঝরনার উপত্যকায় বসে থাকা সম্ভব হ'ল না। পাহাড়ের ওপারে উৎরাই-এর পথে বনতুলসীর জঙ্গলে ঘন ছায়া নেমেচে, তার মধ্যে বড় বড় কেঁদ গাছ, সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মাথায় অস্তমান সূর্য্যের আভা একটু। ঝরনা পেরিয়ে বরম্-ডেরার পথে খানিকটা উঁচু জায়গায় পাথরের স্তূপ খুঁজচি, জনকয়েক লোক কুলামাতোর দিক থেকে আসচে, ওদের সঙ্গ নিলুম। ওরা বললে, তুই এখানে কি করচিস রে? বললাম, পাথর কিনতে এসেচি।

৪নং shift-এর কাছে এসেচি তখনও জ্যোৎস্না ওঠে নি, মুদীর দোকানটা আজ বন্ধ, রাধাচূড়া গাছে যে ফুলের লতাটা সেদিন দেখেছিলুম, তাতে আজ আর ফুল নেই। এঞ্জিনিয়ারের বাংলোতে লোক খাটচে কারণ ডেপুটি কনজারভেটর অফ ফরেস্টস এখানে একমাসের মধ্যে এসে বাস করবে। পট্টনায়েক যে বাংলো দেবে বলেছিল, সেটা দেখলাম। বড় বড় গাছের মধ্যে বাংলোটা, বারান্দায় বসে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির দৃশ্য উপভোগ করা যায়। নিকটেই নীলঝরনা, জলের কষ্ট হবে না।

কবিরাজ নেই, ডাক্তারও নেই ওদের বাংলোতে। কবিরাজ গিয়েচে টাটানগর, ডাক্তার গিয়েচে মহুলিয়া, কাজেই বিজয়ার সম্ভাষণ এদের আর জানানো গেল না। ফিরবার পথে আমি গুররা নদীর ধারের পুলের ওপর বসে রইলুম অনেকক্ষণ। দূরে কালাঝোর জ্যোৎস্না রাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। পাহাড়ী নদীর কুলুকুলু শব্দ যেন সংগীতের মত শোনাচ্চে। তামা পাহাড়ের মাথার ওপর দু-একটা তারা মনকে নিয়ে যায় অনেক দূর, কতদূর, পৃথিবী পার করিয়ে অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

একটু পরে পট্টনায়েক এল পুলের ওপরকার কাঠ ধরে। আমি বসে আছি দেখে বললে, চলুন আমার বাসায়। একটু বিজয়ার মিষ্টিমুখ করবেন।

আমি বললুম- হেঁটে ক্লান্ত আছি, আজ আর নয়।

তারপর সে অনেকক্ষণ বসে নানা গল্প করলে। রাত নটার সময় বাড়ি ফিরি।

পশুপতিবাবু আজ আসবেন কথা ছিল, এলেন না, সেজন্যে মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। আমি আর নীরদবাবু* বেরুলাম সন্ধ্যায় ঠিক সময়ে। যাওয়ার পথে অপরাহ্নের ঘন ছায়া নেমে এসেচে পাহাড়ের অধিত্যকায়, তার কোলে-কোলে এদিকে ওদিকে চারিদিকে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। সমস্ত দিনের অবসাদ একমুহূর্ত্তে কেটে গেল যেন, সেদিকের অপরূপ সন্ধ্যার পানে চাইলুম। ওখান থেকে এসে নীলঝরনার দিকে চলি। তামা পাহাড়ের ওপর উঠলুম পিয়ালতলা দিয়ে। বড় বট গাছটাতে একরাশ জোনাকী জ্বলচে, ওধারে উঠেচে ত্রয়োদশীর চাঁদ, তামা পাহাড়ের বিরাট অধিত্যকার গায়ে পূব থেকে পশ্চিমে দীর্ঘ বড় বড় ছায়া পড়েচে। আমরা দু-ধারে পাহাড়ের গিরিপথটা পার হয়ে নামলুম ওপারের জ্যোৎস্নাশুভ্র উপত্যকায়। বনতুলসীর জঙ্গল আর তার মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে শাল ও তমাল। চারিধারে রূপ যেন থৈ থৈ করচে। পাহাড়ের মাথায় এদিকে ওদিকে দু-চারটি নক্ষত্র।

নীলঝরনার জল পার হয়ে বরমডেরার পথে একজন পাহাড়ী লোকের সঙ্গে

* নীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

দেখা। সে একা একটা লাঠি হাতে গান গাইতে গাইতে চলেচে কুলামাতোর দিকে। তাকে বললাম—অত জঙ্গলে এত রাত্রে একা যাবি, যদি বাঘের হাতে পড়িস্।

সে বললে—খেদিয়ে দিব বাবু!

অর্থাৎ সে লাঠি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেবে। আমরা আর একটু এগিয়ে যেতেই চারিধারের পাহাড়ী অধিত্যকার নির্জ্জনতায় জ্যোৎস্না-ধৌত সৌন্দর্য্যে যেন কেমন হয়ে গিয়েচি। একটা ভারি আশ্চর্য্য জিনিস দেখা গেল। দূরে ধঞ্জরী শৈলমালার গায়ে একটা নক্ষত্র জ্বলছিল, খানিকক্ষণ থেকে সেটা আমরা দেখচি। আর আমি মাঝে মাঝে দেখচি ডাইনের রুখাম্ পাহাড়ের দিকে, বাংলা দেশের আলো ছায়া ভরা কোজাগরী পূর্ণিমা রাত্রের কথা ভাবচি, এমন সময় নক্ষত্রটা যেন টুপ করে খসে গেল পাহাড়ের ঢালু থেকে। আর সেটা দেখা গেল না। আমরা দু-জনেই অবাক হয়ে রইলুম।

সবুজ ঝরনার কাছে এসে বসলুম, ওখানে একটি সুবৃহৎ শিমূল গাছের শাখা নত হয়ে আছে। ঝরনার জলের ওপর কুলুকুলু ক্ষীণ শব্দ হচ্চে ঝরনার জলধারার, জ্যোৎস্না রাত্রে ঝরনার জল চিক্‌চিক্ করচে, বড় শিমূল গাছের মাথায় একরাশ জোনাকী জ্বলচে, সে এক অপরূপ ছবি। ছবিটা বহুদিন মনে থাকবে। তারপর রুখামের পাহাড়ের একেবারে মাথায় একটা বড় শিলাখণ্ডের ওপরে উঠে বসি। যেদিকে চাই, জ্যোৎস্নাবিধৌত বনরাজিশোভিত শৈলমালা, দূরে টাটার কারখানার রক্ত-আভা যেন বহুদূরের কোন অজানা আগ্নেয়গিরি অগ্নিগহ্বরের রক্তশিখার আভা বলে মনে হচ্ছে। পিছন দিকের ঢালুটা সহজ বলে মনে হ'ল, সেখানেই নেমে জঙ্গলের মধ্যে পথ ঠিক করতে পারচি নে। নারীকণ্ঠে বললে, কে, এদিক দিয়ে বাবু। চেয়ে দেখি নিচে একটা সাঁওতালদের ঘর। নেমে এলুম তাদের উঠোনে। দুটি মেয়ে ও একটি পুরুষ উঠোনে আগুন জ্বেলে সম্ভবতঃ আগুন পোয়াচ্চে।

আমরা তাদের জিজ্ঞেস করলুম—এই বনে পাহাড়ের নিচে আছিস্ কেমন করে, হাতী বাঘ নামে না?

তারা সবাই দেখলুম অদৃষ্টবাদী। বললে—বাবু, ভয় করে কি হবে? যেদিন বাঘে নেবে সেদিন নেবেই।

রুখাম থেকে আমাদের বাংলো প্রায় দু-মাইল, এদিকে রাত হয়েচে, ন-টা বাজে। আর বেশীক্ষণ এ সব জায়গায় থাকা ভাল নয় বুঝে দু'জনে বেশ জোর পায়ে হেঁটে রাত পৌনে দশটায় পরিপূর্ণ ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে বাংলোতে পেঁাছে গেলাম।

আজকার রাতের জ্যোৎস্নাটি আমাকে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দিলে কেন এত? Shuqul সাহেবের বাগানের মধ্যের গাছগুলো ঠিক যেন ইসমাইলপুর কাছারীর চারিপাশের সেই বনঝাউ গাছ। আহারাদির পরে বাংলোর সামনে বসে গল্প করচি, একটা প্রকাণ্ড উল্কা জ্বলতে জ্বলতে অত জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও ঠিক যেন হাউই-বাজির মত আগুনের রেখা সৃষ্টি করে আকাশের গায়ে মিলিয়ে গেল।

ভারি সুন্দর ভূমিশ্রী সিংভূমের, ভারি চমৎকার জ্যোৎস্না-রাত্রিটা আজ! অনেককাল এদের কথা মনে থাকবে।

রাখামাইন্‌স্ থেকে এসেও যখন বারাকপুরের এই গাছগুলোর গন্ধ, ছায়া ও শ্যামলতা আমাকে এত মুগ্ধ করেচে তখন আমাদের এ অঞ্চলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমার মত আরও দৃঢ় হয়ে গেল সন্দেহ নেই। সকালে একটু রোদ উঠলে যখন গাছ-

পালায় ঝোপে, ছায়ায় ছায়ায় বেড়ান যায় তখন যে বনলতার কটূতিক্ত সৌরভ, বনফুলের সুবাস পাই, পাখীর যে কলকাকলী শুনি, কোথায় এর তুলনা? পাহাড় শ্রেণী না থাকলে রাখামাইন্‌স্‌ তো মরুভূমি। তবে পাহাড়ের ওপরকার বন সকালের ছায়ায় ভাল হয় কিন্তু কেন জানি না সেখানে এ ধরনের কোমলতা নেই, স্নিগ্ধ নয় রুক্ষ। শাল তমাল গাছের বৈচিত্র্য নেই, তারা মোহ সৃষ্টি করতে পারে না, তাদের বনে লতা নেই, প্রাকৃতিক কুঞ্জ সৃষ্টি করতে পারে এমন পুষ্পিত বৃক্ষ বা লতা নেই। এই সব জন্যেই তো প্রথম হেমন্তে দেশের বন এত ভাল লাগে। সুস্মিত জ্যোৎস্না রাতে কোথায় এমন পুষ্পিত তৃণপর্ণের মন-মাতান সৌরভ!

কাল বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে কুঠির মাঠের বনশোভা দেখে আরও বেশী করে আমার থিওরীটার সত্যতা উপলব্ধি করলুম অর্থাৎ আমাদের এ অঞ্চলের গাছপালার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য সিংভূম সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়ার অরণ্যের শোভার অপেক্ষা অনেক বেশী। কত কি লতা, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ধরনের পত্রবিন্যাস—এত বৈচিত্র্য কোথায় ওসব দেশের অরণ্যে? আমি রাখামাইন্‌স্‌ থেকে বারো মাইল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সবটাই হেঁটে মুসাবনি রোড পর্য্যন্ত গিয়েচি, সিংভূমের বিখ্যাত সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখেচি, গবর্নমেণ্ট প্রোটেক্টেড্‌ ফরেস্টের মধ্যে গিয়েচি। সেখানে বন খুব ঘন ও বহুবিস্তৃত বটে কিন্তু বনশোভা নিম্নবঙ্গের বনের মত নয়। ও অঞ্চলের বড় বড় গাছের মধ্যে শাল, কেঁদ, আসান, পলাশ ও মাঝে মাঝে আমলকী ও বন্য শেফালি এই কটি প্রধান। বন্যলতা আমার চোখে অন্ততঃ পড়ে নি। কোন কোন স্থানে শিমুল বৃক্ষ আছে। সারবান কাঠ বাংলাদেশের বনে তত নেই যত ওদেশে আছে কিন্তু আমার বলবার উদ্দেশ্য বাংলা দেশটাতে যদি আজ সারেণ্ডা রিজার্ভ ফরেস্টের মত একটা অরণ্য গড়ে উঠত, তার বনবৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য এবং নিবিড়তা অনেক বেশী হ'ত—শ্রীনগরের ও ছঘরের পথের ধারের বন দেখে এ ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েচে। তবে বাংলার বনে পাহাড়ী নদী বা ঝরনা নেই, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডও নেই—তেমনি ও সব বনের পথে এত পাখী নেই, বিচিত্র বর্ণের বনপুষ্পের সুবাস নেই।

এ আমি স্বীকার করি যদি বাংলা দেশের বনভূমির পিছনে থাকত দূরবিস্তৃত নীলগিরিমালা, মাঝে মাঝে যদি কানে আসত পাহাড়ী ঝরনার কুলুকুলু শব্দ, শিলাসন আস্তৃত থাকত স্নিগ্ধ ছায়া ঝোপের নিচে, চরত ময়ূর, চরত হরিণ-নন্দন—উপলাকীর্ণ বন্য নদীর শিলাময় দুই তটে স্তবকে স্তবকে সুবাসভরা বনকুসুম ফুটে থাকত—গিরি-সানুদেশে থাকত ঘনসন্নিবিষ্ট বাঁশবন—তবে এ বন আরও সুন্দর হ'ত।

কল্পলোক ছাড়া সে বন কোথায়—যেখানে এত সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ সম্ভব? অন্ততঃ আমি তো দেখি নি।

যদি কোথাও এমন থাকে ভারতবর্ষের মধ্যে তবে আমার সন্দেহ হয় তা আছে বা থাকা সম্ভব গোদাবরী তীরের অরণ্যে, রাজমহেন্দ্রী থেকে গোদাবরীর উজান পথে গিয়ে উতকামন্দ ও কোদাইকানাল অঞ্চলে। মহীশূর ও ত্রিবাঙ্কুরের রিজার্ভ ফরেস্টে, হিমালয়ের নিম্ন অধিত্যকায়, আসামের বনে। যদিও এদেশের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি যা কল্পনা করচি তা আছে কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল। জগো আর গোপালকে সঙ্গে নিয়ে বন-ফুলের সুবাসভরা বনপথ দিয়ে বেলেডাঙার আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ি গেলাম। আইনদ্দি যত্ন করে বসালে—ও নিজে কত গ্রামে পরিচিত সে গল্প করলে। 'বহুরূপী সেজেছি বাপু, কাটামুণ্ডুর খেলা খেলেচি—নাগরদোলা ঘুরিয়েচি।'

আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—চাচা তোমাকে অনেক দূরের লোকে জানে।

ও বড় খুশি হ'ল। বললে—শোন তবে আমায় কত গাঁয়ের লোকে জানে। এই কাটকোমরা, ইচ্ছেপুর, মেটিরি, শুল্‌কো, হানিডাঙা...

তার তালিকা আর শেষ হয় না।

বললে—তা লাঠিতে বা বন্দুকে মরব না, আমার গুরুর কৃপায়। আগুন খাব। শূন্যে উড়ে যাব। মুণ্ডু কেটে আবার জোড়া দেব।

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম—বল কি চাচা?

—হ্যাঁ, তোমার বাপ-মার আশীর্ব্বাদে গুণ কিছু ছেল শরীলে। ওই যেখানে চটকাতলায় সায়ের ছেল, ওখানে এক সন্নাসি এসে আস্তানা বাঁধে আজ চল্লিশ বছর আগে। আমার তখন অনুরাগ বয়েস। তিনিই আমার ওস্তাদ।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েচে দেখে উঠলুম। জগো, গোপাল ও আমি ঘন বনের পথে আবার ফিরি। তখন কুঠীর মাঠের জঙ্গলে অন্ধকার বড্ড ঘন হয়েচে। ওরা বাঘের ভয়ে বনের মধ্যে কথাবার্ত্তা বলে না। আমি যত সাহস দিই, ওরা তত ভয় করে।

আমাদের ঘাটে যখন এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নদীচরের ওপরকার আকাশে অগণ্য দ্যুতিলোক—বনশিমের ফুল ফোটা ঝোপটি ঘাটের ওপর নত হয়ে আছে, জোনাকী ঝাঁক জ্বল্‌চে অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে।

বাড়ি এসে দেখি সবাই বাড়ির চারিদিকে প্রদীপ জেবলেচে, কারণ আজ দীপ দান করবার নিয়ম! ক্ষুদুদের বোধনতলায়, আমার লেখ্‌বার ঘরের সামনে, পুঁটি-দিদিদের রোয়াকে, খিড়কীর পথে, বাঁশবনে—সর্ব্বত্র প্রদীপ জ্বলচে।

ন-দি হেসে বললে—এই দ্যাখো, এবার তোমাদের কলকাতার হ্যারিসন রোড হয়ে গিয়েচে। না?

ক-দিনই বড় আনন্দে কাটল। আজ দুপুরে একটা মাল্লো এলো সাপ খেলাতে। আমতলায় চেয়ার পেতে আমরা সবাই বসে সাপ খেলানো দেখি। ন-দি, খুড়িমা, ক্ষুদু, পাঁচী, জগো, গোপাল—সাপ খেলা দেখে সবাই খুব খুশী। এবার পুজোর ছুটিতে যত গান শুনেচি দুটো গান আমার মনে বড় ছাপ রেখে গিয়েচে, গানের সুরের জন্যে নয়, যে বিশেষ স্থানে ও বিশেষ অবস্থায় সেই গান দুটি গাওয়া হয়েছিল তার জন্যে। সেদিন পাহাড় পেরিয়ে এসে রুখামের মুদীর দোকানে একটা ছোকরা যে গাইছিলঃ—

হায় হায় শিশুকালে ছিলাম সুখে...

এ গানটার এই পর্য্যন্ত মনে আছে। আর একটা আজকার সাপুড়ের গানটাঃ—

সোনার বরণ লখাই আমার হয়ে গেল কালো
(ওগো) কি সাপে দংশেচে তারে তাই আমাকে বলো।

সাপুড়ে উচ্চারণ করলে—'ডুংশেচে'—তাই যেন আরো মিষ্টি লাগলো।

তার পরেই রোদ পড়ল। কুঠীর মাঠে বন ঝোপের ধারে কেলেকোঁড়ার লতায় ফুলের সুগন্ধে বৈকালের বাতাস ভারাক্রান্ত। তারই মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম, বেড়ালুম। ছেলেমানুষের মত প্রকান্ড মাঠটার এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করে বেড়িয়ে আবার যেন বাল্যের আমোদ ফিরিয়ে পেলুম। ভাগ্যে ওদিকে কেউ লোকজন থাকে না তাহলে আমাকে হয়তো ভাবতো পাগল।

পল্লীপ্রান্তের বনশোভা ও বনপুষ্পের সুবাস আর এবারকার অপ্রতিহত পরি-

পূর্ণ তপ্ত সূর্য্যালোক—তার ওপর সব সময়ের জন্যে মাথার ওপরকার ঘন নীল আকাশ—আমাকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছে। দিনরাত এই মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও যেন আমার আশ মেটে না—রাত্রির নক্ষত্ররাজি কি জ্বলজ্বলে, কত রকমের, দিক্‌বিদিকে কতদূর ছড়ানো।

বেজায় শীত পড়লো শেষ রাত্রে। সকালে নদীর ঘাট থেকে ফিরচি, আমাদের ঘাটের পথে গাবতলায় সাত-আটখানা বড় বড় মাকড়সার জাল পাতা। রোদ পড়ে বিচিত্র ইন্দ্রধনুর রং-এর সৃষ্টি করেচে। আমগাছের এডালে ওডালে টানা বেঁধে উঁচুতে নিচুতে কেমন জাল বুনেচে। প্রত্যেক জালেতে গোটাকতক মশা মরে রয়েচে। একটা মাকড়সা জাল গুটিয়ে একটা মাত্র টানার সুতোতে পর্য্যবসিত করলে—সেই সুতোটা বেয়ে ছোট্ট মাকড়সাটা গাব গাছের ডালে উঠে গেল। বনে বনে এই সব দেখে বেড়ালেও কত শিক্ষা হয়। আমাদের দেশে কত ফুল, ফল, দামী ঝোপঝাপ, কীট পতঙ্গ। এদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়—একরাশ প্রাণী-বিজ্ঞানের বই ঘাঁটলেও তা হয় না।

"We live too much in books and not enough in nature, and we are very like that simpleton of a Pliner the younger who went on studying a Greek author while before his very eyes Vesuvious was overwhelming fine cities beneath the ashes."

তারপর কতক্ষণ দুপুরে মানুদের বাড়ি ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার নিমন্ত্রণে গিয়ে ওদের সঙ্গে বসে গল্প করলুম। কে বলেছিল 'অন্ধ নাচার বাবা', ক্ষুদু খুব উৎসাহের সঙ্গে সে গল্প করলে। আমি বনপথ দিয়ে তালঘাট গেলাম। সেখানে নিরাপদদের বাড়ি চা খেয়ে কতক্ষণ গল্প করি। নিরাপদ এক অদ্ভুত লোক। সে বলে নাকি ভূত দেখে। মাঠে-ঘাটে সর্ব্বদাই ভূত বেড়াচ্চে সরু সুতোর মত।

আমি বললুম—বলেন কি?

—হ্যাঁ, বিভূতিবাবু। ওরা আবার তারা ধরে নামে। আমি সকালে উঠে দেখেচি বনের সব তারা পড়ে আছে। সূর্য্য ওঠবার আগে তারার ঝাঁক আপনিই আকাশে উঠে যায়। কেবল যেগুলো শিশিরে খুব ভিজে যায়, সেগুলো ঝোপের তলায় খুব ভোরে পড়ে থাকে। ভিজে ভারি হয়ে যায় কিনা, তাই আর উঠতে পারে না।

আমি খুব অবাক-মত মুখখানা করে নিরাপদর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ও নাকি সূর্যালোক থেকে তাপ সংগ্রহ করে দেশের কাজ করবে, সেজন্যে সূর্যকে জয় করচে। রোজ মাঠে বসে সূর্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

ঘন অন্ধকার। বড় বড় গাছের মাথায় অগণ্য নক্ষত্রদল জ্বলজ্বল করচে—কি অসীম দ্যুতিলোক পৃথিবীর চারিধার ঘিরে। টর্চ্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে এসেচে বলে একরকম অন্ধকারেই চলে আসতে হোল। নিরাপদ সঙ্গে খানিকদূর এল গল্প করতে করতে—রাস্তার ধারে সাঁকোর ওপর দু-জনে কতক্ষণ বসলুম। আমি গল্প করি আর মাথার ওপর চেয়ে চেয়ে নক্ষত্র দেখি, একবার চারিধারের অন্ধকার বনানী দেখি।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে একটা চমৎকার সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করলুম। আর সেই বন-ঝোপের সুগন্ধ! এ গন্ধটা আমায় এবার বড় মুগ্ধ করে রেখেচে। এদের ছেড়ে কলকাতা যাবার দিন নিকটবর্তী হয়েচে মনে ভাবলেই মনটা খারাপ না হয়ে পারে

না, কিন্তু এখানে নানা কারণে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠচে না—প্রথম কথা, সঙ্গে বই নেই—আমার নোটবইগুলো নেই। এমন কি লেখবার উপযুক্ত খাতা বা কাগজপত্র পর্য্যন্ত বেশী আনে নি। বই ভিন্ন আমি থাকতে পারি নে। বই উপযুক্ত সংখ্যায় না আনা একটা বড় ভুল হয়ে গিয়েচে এ ছুটিতে। এমন ভুল আর কখনো হবে না। দুটো ছোট গল্প লিখেচি—এবারকার পুজোতে তার বেশী কিছু হল না।

আমাদের পাড়ার সবাই কাল সকালে সাত-ভেয়ে কালীতলায় যাবে। অভিলাষের নৌকো ব'লে ওই পথে অমনি সইমাদের রান্নাঘরে গিয়ে বসলুম। কতকাল পরে যে ওদের রান্নাঘরে গেলাম! নলিনীদিদি যত্ন করে বসালে—চা আর খাবার দিলে, তার-পর কতকালের এ গল্প ও গল্প, কত ছেলেবেলার কথা, নলিনীদের বিয়ের সময়-কার ঘটনা। ওর স্বামী উত্তম আফ্রিকায় ছিলেন সে সব গল্প। সোনার মেয়ে হয়েচে, কি সুন্দর টুকটুকে মেয়েটি, কি চমৎকার মুখখানি, বছর দুই বয়েস হবে। আমায় দেখে কেমন ভয় পেলে, কিছুতেই আমার কোলে আসতে চাইলে না।

টেঁপিদিদিকে দেখলুম আজ সকালে বছর পনেরো পরে। একেবারে বুড়ী হয়ে গিয়েচে। সেই ফর্সা রঙ, সুন্দর চোখমুখের আর কিছু নেই। মানুষের চেহারা এত বদলেও যায় কালে! যা হোক. ষোল বছর পরে যে ওরা আবার দেশে এসেচে এই একটা বড় আনন্দের বিষয়।

আমাদের গ্রামের প্রকৃতি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষগুলো বড় খারাপ। পরস্পর ঝগড়াদ্বন্দ্ব, ঈর্ষা. পারিবারিক কলহ. জ্ঞাতিবিরোধ. সন্দেহ, কুসংস্কার এতে একেবারে ডুবে আছে। লেখাপড়া বা সৎচর্চ্চার বালাই নেই কারো। AEschylus-এর কথায়ঃ

"They live like silly ants
In hollow caves unsunned;
To them comes no sun, no moon,
No Stars, music, no spring
Flower perfume..."

আজ সকালে আমরা নৌকোয় সাত-ভেয়ে কালীতলায় গেলাম। পথে চালতে-পোতার বাঁকে কত রকমের ফুল যে ফুটেচে—সেই আর বছরের কুঁচো কুঁচো হলদে ফুলগুলি. নীল ঘাসের একরকম ফুল. কলমীর ফুল—সকলের চেয়ে বেশী ফুটেচে তিৎপল্লার ফুল, যে ঝোপের মাথা দেখি—সর্ব্বত্র আলো করে রয়েচে ওই ফুলে। বেলা একটার সময় কালীতলায় গিয়ে পেঁছিনো গেল। তারপর আমরা গেলুম রেলের পুলে বেড়াতে। বটতলায় রান্না করে খাওয়া হোল। ক্ষুদু ছুটে গেল আমাদের সঙ্গে রেলের রাস্তায়। আমরা পুরোনো বনগাঁয়ের দিকে যাচ্চি—রামপদ সাইকেল নিয়ে এসে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খাবার পরে আবার একটু রেল লাইনে বেড়িয়ে সন্ধ্যার সময় নৌকোয় উঠে নৌকো ছাড়ি। পথে কত কি গল্প করতে করতে চমৎকার জ্যোৎস্না রাত্রির মায়া যেন আমাদের পেয়ে বসল। যখন চালতেপোতার বাঁকে এসেচি, তখন নিস্তব্ধ নির্জ্জন সুগন্ধ বনের চরে কাটা চাঁদের শিশির-পাণ্ডুর জ্যোৎস্না ও নক্ষত্রলোকের শোভা যেন সমস্ত নদী ও বনকে মায়াময় করেচে মনে হোল। চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ঘাটে এসে নৌকা লাগল।

তবুও মনে হয় এ সব জায়গায় বারো মাস আসা আমাদের মত লোকের চলে না। কারণ জীবন নদীর স্রোতধারা এখানে মন্দ গতিতে প্রবহমান—সক্রিয়, উন্নতিশীল, বেগবান জীবন এখানে অজ্ঞাত। বদ্ধ জলে পানা-শেওলা জমে, জলকে শীঘ্র দূষিত করে ফেলে। যে চায় জীবনকে পরিপূর্ণ ভাবে ভোগ করতে, যাকে তার উপযুক্ত

বুদ্ধিবৃত্তি ও ক্ষমতা দিয়ে ভগবান সৃষ্টি করেচে, যাকে dull, bore এবং stupid করে সৃষ্টি করেন নি, যার জীবনের পুঁজি অনেক বেশী, তার জন্যে এসব জায়গা নয়। কিছুকাল এসে বেশ কাটানো যায় বা আসাও উচিত। কিন্তু চিরদিন এখানে যে কাটাবে তাকে তাহলে নিজের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে সেবাব্রতে দীক্ষিত হতে হবে, যে বলবে, আমার নিজের কিছু চাই নে, দেশের ছেলেদের জন্যে স্কুল খুলব, তাদের পড়াব, দরিদ্রদের দুঃখ মোচন করব, ম্যালেরিয়া তাড়াব ইত্যাদি—সে রকম মানুষ হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ও অন্ধকারকে বরণ করে নিয়ে এখানে এসে চিরকাল বাস করতে পারে।

আজ শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে একবার বাইরে এলুম, মনে হোল খুব মৃদু জ্যোৎস্না-লোক ঘরের দাওয়ায়—চাঁদ তো অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েচে তবে এখন কিসের জ্যোৎস্না ? ক্ষীণ হলেও এটা জ্যোৎস্নালোক সে বিষয়ে কোন ভুল নেই, কারণ খুঁটির ছায়া পড়েচে, বেড়ার কঞ্চির ছায়া পড়েচে, আমার নিজের ছায়া পড়েচে। দূরে আকাশে এক সময় হঠাৎ নজর পড়ল—দেখি শ'ইতে তারা উঠেচে। শুক্র-জ্যোৎস্না এত স্পষ্ট কখনও দেখি নি জীবনে—সত্যি কথা বলতে কি, স্পষ্টই কি বা অস্পষ্টই কি—শুক্র-জ্যোৎস্নাই দেখি নি কখনো। এমন অবাক হয়ে গেলুম, এত কথা মনে আসতে লাগল যে ঘুম আর হোল না। আমার মন পৃথিবীর গণ্ডি ছাড়িয়ে বহু-দূর ব্যোম-পথে গেল উড়ে—আমি যে গ্রহলোকের জীব, আমার বাসস্থান যে বিশাল শূন্যের মধ্যে, অন্য আরও গ্রহ ও অগণ্য তারাদলের মধ্যে, কত কোটি সূর্য্য সেখানে দীপ্যমান, কত নীহারিকা পুঞ্জ, কত দৃশ্য অদৃশ্য শক্তি, বিদ্যুৎ, কসমিক রে,—এদের সংগে আমার আত্মা যেন এক হয়ে গেল। আমার অর্থলিপ্সু বৈষয়িক আত্মা মুক্তিলাভ করলে অল্প কয়েক মুহূর্ত্তের জন্যে, ওই শুক্র-তারার আলোর পথ বেয়ে উড়ে চলে গেল অসীম দ্যুতিলোকের মধ্যে।

কাল এখান থেকে চলে যাব। তাই যেন সব কিছুর ওপর মায়া হচ্চে। ছায়াঘন অপরাহ্নে আমাদের পোড়ো ভিটের পেছনকার বাঁশবনে বেড়াতে গিয়ে এক জায়গায় খানিকটা চুপ করে বসে রইলুম। রাঙা রোদ পড়েচে ওদিকের একটা বাঁশঝাড়ের গায়ে। সেই রাঙা রোদ মাখানো বাঁশঝাড়ের দিকে চেয়ে সমস্ত জীবনের গভীর রহস্যের অনুভূতি যেন মনে এসে জমল। কতকাল আগে এমন কার্ত্তিক মাসের দিনে মামার বাড়ি থেকে বাবার সংগে এসে প্রথম এ গাঁয়ে উঠেছিলুম আমার বাল্যকালে। চুপ করে ভাবলে সে দিনের হেমন্তদিনের কটুতিক্ত বনলতা ফুলের গন্ধভরা দিন-গুলির স্মৃতি আজও আমার মনে আসে—কেমন একটা মধুর, উদাস ভাব নিয়ে আসে ওরা। তারপর কত পথ চলেচি, কখনও কণ্টকাকীর্ণ আরণ্যপথ বেয়ে, কখনও রৌদ্র-দগ্ধ মরুবালুর বুক চিরে, কখনও কোকিল-কূজিত পুষ্পসুরভিত কুঞ্জবনের মধ্যে দিয়ে, চলেচি...চলেচি...কত সংগী-সাথীর হাসি-অশ্রুভরা নিবেদন আমার মনের মধ্যে সঞ্চিত হোল, কাউকে পেলাম চিরজীবনের মত, কাউকে হারালুম দু-দিনেই, কিন্তু অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য্যই দেখলুম জীবনের সব চেয়ে বড় ঐশ্বর্য্য। সুখ দুঃখ দু-দিনের—তাদের স্মৃতি চিরদিনের, তারাই থাকে। তারাই গভীরতার ও সার্থকতার পাথেয় আনে জীবনে। আজ এই শুকনো বাঁশের খোলা বিছানো, পাখী-ডাকা, রাঙা রোদমাখানো বাঁশবনের ছায়ায় বসে সেই কথাই মনে হোল। সেই বাঁশের শুকনো খোলা! মামার বাড়ি থেকে প্রথম যেদিন এ গ্রামে আসি তখন দুপুরে আমাদের বাড়ির দরজার সামনে ধুলোর ওপর যে বাঁশের খোলা নিয়ে রাজলক্ষ্মী ও পটেশ্বরীকে

খেলা করতে দেখেছিলুম ত্রিশ বছর আগে। আজ কোথায় তারা?

ইছামতীর ওপর দিয়ে নৌকো বেয়ে চলেচি। বেলা গিয়েচে। দু-ধারের অপূর্ব্ব বনঝোপে রাঙা রোদ পড়েচে। কত কি ফুলের সুগন্ধ। কিন্তু চালতেপোতার ডান ধারে যে সাঁই বাবলার নিভৃত পাখী-ডাকা বন ছিল, মনি গাঁয়ের নতুন কাপালীরা এসে সব নষ্ট করে কেটে পুড়িয়ে ফেলে পটল চাষ করেচে। আমার যে কি কষ্ট হোল! পুত্রশোকের মত কষ্ট। কত তিৎপল্লার ফুল ফুটে থাকত, বন-কলমীর বেগুনী ফুল ফুটে থাকত—আর বছরও দেখেচি। কত কচি কচি জলজ ঘাসের বন, তার মাথায় নীল ফুল—এবার ডান ধার এরা সাফ্ করে ফেলেচে। আমার নৌকোর মাঝি সীতানাথ বলচে—'দা-ঠাকুর, বড্ড পটল হবে, চারখানা পটলে একখানা গেরস্তের তরকারি হবে। আমার জ্ঞানে কখনও এখানে কেউ আবাদ করে নি।' কুলঝুটির ফুল আর বনশিমের ফুল এবার অজস্র। এই দস্যি কাপালীরা, Destroyers of Beauty, কোথা থেকে এসে যে জুটল, ইছামতীর পাড়ের রূপ এরা কি নিষ্ঠুর ভাবে নষ্ট করে ফেলচে।

রোদ একেবারে সিঁদুরে হয়ে বাঁশঝাড়ের মাথায় উঠেচে। অপরাহ্নের বাতাস নানা অজ্ঞাত বনফুলের মিষ্ট গন্ধে ভারাক্রান্ত। নদীপথে বিকেলে ভ্রমণের মত আনন্দ আর কিসে আছে? কি গভীর শান্তি, কি বন-শোভা, কি অস্ত আকাশের মায়া!

ছুটির দিন। কলকাতা ভাল লাগচে না। এই ক-দিনেই কলকাতা যেন বিস্বাদ হয়ে গিয়েচে। আজ বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে থ্যাকারের দোকানে গিয়ে একখানা বই পড়ছিলুম কার্জ্জন পার্কের সামনের জানালায় দাঁড়িয়ে। সেখানে থেকে মাঠে একটা জায়গায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। একটা বেঞ্চে বসে আছি, দেখি ডাঃ পি. সি. রায় সামনে দিয়ে যাচ্চেন। দু-জনে গল্প করতে করতে বেড়ালুম অনেকদূর পর্য্যন্ত। উনি বেশির ভাগ বললেন, 'প্রবাসী'র কথা। যোগেশ বাগল 'প্রবাসী' ছেড়ে গিয়েচে সেজন্যে দুঃখ করলেন। গিরিশবাবুও * দেখি বিছানা পেতে লর্ড রবার্টসের প্রতি-মূর্ত্তির পাদপীঠে বসে আছেন। আমরাও গিয়ে জুটলাম। আজ রাত্রে মাদ্রাজে মেলে ডাঃ রায় বাংগালোর যাবেন, সে কথা হচ্ছিল। তাঁর গাড়িতে ফিরে এলাম। Nineteenth Century Review থেকে কটা ভালো ভালো কবিতা তুলেচিঃ—

Beyond the East Sunrise, beyond the West the sea,
And East and West wander-thirst that will not let me be.
And come I may, but go I must, if men ask you why.
You may put the blame on the stars and the sun, on the white
cloud and the sky.

'To scorn all strife and to view all life
With the curious eyes of a child.'

'To travel hopefully is better than to arrive.'

'To love Nature for the sake of what it brings forth, for its beauty, for its harmony will help a little nearer to perfection.'

'To feel love for humanity in the sweetness of spiritual communion, in the joy of helping one another, in the happiness of playing a

* গিরীশবাবু—বংগবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।

part together in the everlasting Work of the farm of worlds and universe, will bring you all the nearer to the goal of evolution.'

আজ আশুতোষ হলে জাপানী কবি ইয়োনে নোগুচির বক্তৃতা শুনতে গেলুম। চিত্রকর হিরোসিকের কতকগুলো ছবি, প্রধানতঃ ল্যান্ডস্কেপ, বড় ভাল লাগল—বিশেষতঃ অর্দ্ধচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, নানারকমের চাঁদের রূপ। প্রধানতঃ পল্লীদৃশ্য, ঝরনা, বাঁশঝাড়, গ্রাম্য নদী ইত্যাদি। হকুসাই ও হিরোসিকে এ দু-জনের শক্তিই এ বিষয়ে খুব অসাধারণ বলে মনে হয়েচে আমার। নোগুচির বক্তৃতাও বেশ সুন্দর—সকলের চেয়ে আমার ভাল লাগল ঐ কথাটা—'In the twilight, when the vision awakes'; আমি ত আমার জীবনে কতবার এটা দেখেচি বলেই আমার কথাটা বড় মনে ধরেচে। নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক ভালো কথাই যে বোঝা যায় না, আমাদের দেশের অনেক Self-styled সমালোচক সেই সব বোঝেন না। সেদিন বাঁশবাগানে রাঙা রোদ পড়ে যে দৃশ্যটার সৃষ্টি করেছিল, আজ পনেরো-ষোল দিন হয়ে গেল এখনও এই নোগুচির বক্তৃতা শুনতে শুনতে সেই কথাটা মনে হোল। সে আনন্দ মনের গোপন মন্দিরে এখনও সেই রকম সতেজ ও নবীন আছে। ওই দৃশ্যটা মনে এলেই আনন্দটাও আসে সঙ্গে সঙ্গে। প্রকৃতিকে দেখবার চোখ না খুললে মানুষের জীবনে সত্যিকার আনন্দ নেই, একথা কতবার বলেচি আমার নানা লেখার মধ্যে—কিন্তু আমাদের দেশের লোকে সব এক জোটে চোখ বন্ধ করে আছে। চোখ খোলার সাধ্য কার? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও হার মেনে গিয়েচেন। অনুর্ব্বর মরু বালুতে বীজ বপন করে ফল পাওয়ার আশা তো আকাশ-কুসুম হতে বাধ্য।

আজ রবিবার দিনটা দমদমার ওপারে একটা বাজে বাগান বাড়িতে গিয়ে নষ্ট হোল। আমার এ ধরনের Outing মোটে পছন্দ হয় না—কি করি, দলে পড়ে যেতে হোল—বিশেষ করে মহিলাদের কথা ঠেলতে পারা যায় না; কিন্তু একটা কপির ক্ষেতের সামনে বসে শতরঞ্চি বিছিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান শুনে সদলবলে চা খাওয়ায় যে কি আনন্দ আছে, আমি তা বুঝলুম না। আর কি মশা! কলকাতার উপকণ্ঠে এই শীতকালে যেমন ভয়ঙ্কর মশার উপদ্রব, পাড়াগাঁয়ে বর্ষাকালেও এর সিকি নেই। অথচ শহরের লোকে বিশ-ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করে শহরের উপকণ্ঠে এই ধরনের সাজানো-গোছানো বাগান বাড়ি করে—মাঝে মাঝে সেখানে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হল্লা হবে। এই সব insipid ধরনের Outing-এর সংসর্গ আমার ছাড়তে হবে এবার।

সার অলিভার লজের পত্রাবলীর মধ্যে সেদিন পড়লুম এই বিশাল বিশ্বের আকৃতি, গঠন-প্রসারতা (Structure and extent of the Universe) তাঁকে চিরকাল মুগ্ধ করে এসেছে—তাই এক জায়গায় তিনি বলেচেন দেখলুম—'Universe is the body of God—this is one of His modes of manifestations,' তাঁর রচিত বিশ্বের আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, মানুষ, জীবজন্তু—সব মিলেই তিনি। তিনি এই ভাবে পদার্থের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করচেন। তাই উপনিষদ বলেচে—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। একই আছে, দ্বিতীয় আর কিছু নেই। ঈশোপনিষদের—'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।'

আজ সন্ধ্যায় দমদমার বাগান-বাড়ি থেকে ফিরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নক্ষত্র জগতের পানে চেয়ে চেয়ে ঐ সব কথাই মনে হচ্ছিল। সেদিনকার সেই গানটা—

'The home I was born.' আমার কানে এখনও যেন বাজচে—তা থেকেই কথাটা মনে এল। এ রকম যে কতবার হয়েচে! একটা অনুভূতি পেলে মন শীঘ্র চলে যায় আর এক শ্রেণীর অনুভূতিতে।

শুক্রবার বিকেলে বনগাঁয়ে গেলাম। সেখানে নেমে বাসায় গিয়েই খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম। তখন চাঁদ উঠেচে—মাটির সোঁদা সোঁদা সুগন্ধ ভুর ভুর করচে বাগানে। কেলেকোঁড়ার ফুল এখনও আছে বটে, সুগন্ধ নেই।

দু-দিন বনগাঁয়ে থেকে আজ বিকেলের ট্রেনে এলুম কলকাতায়—জাপানী কবি নোগুচিকা P.E.N.-এর পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। প্রথমেই হোটেলের হলে ঢুকে দেখি তখনও সবাই আসে নি, কেবল মণীন্দ্র বসু ও দু-পাঁচজন এখানে ওখানে আছে। কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে গালুডি ও ঘাটশিলা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলচি, এমন সময়ে পবিত্র এসে বললে, তোমাকে ডাকচে, নলিনী পণ্ডিত তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাকে কে একজন তোমার সম্পর্কে পত্র লিখেচে সেজন্যে।

বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, মণীন্দ্র এসে টেনে নিয়ে গেল। তারপর সবাই টেবিলে যে যার বসে গেল। সুরমা বসু ও ক্ষীরোদের স্ত্রী, আমি এবং নির্ম্মল বসু এক টেবিলে। চা পরিবেশন হওয়ার পরে স্যাণ্ডউইচ চলেচে সেই সময় নোগুচি এলেন। কালিদাস নাগ নিয়ে এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী কবি-সম্মেলন থেকে। রামানন্দবাবু উঠে তাঁর ষষ্ঠিতম জন্মতিথি উপলক্ষে অভিনন্দন জানালেন। নরেন দেব আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন চারু রায়ের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করতে। চারু রায় কেন যে সাহেবী পোশাক পরে এসেচেন, এ আমি বুঝতে অক্ষম, যেখানে নোগুচি নিজে এসেচেন জাপানী পোশাক। তারপর নোগুচি নিজের জাপানী কবিতা পাঠ করলেন এবং তারপর ইংরেজী অনুবাদ পড়লেন। কালিদাস নাগ আন্তর্জাতিক P.E.N.-এর সভাপতি H.G. Wells-এর একখানা চিঠি পড়লেন—আমাদের বঙ্গীয় P.E.N.-এর প্রতি শুভেচ্ছাজ্ঞাপক পত্র। জাপানী কনসাল-জেনারেল কিছু বললেন, কিন্তু তা কেউ বুঝতে পারলে না। যখন এ পর্য্যন্ত হয়েচে—তখন চপলা দেবীর ভাই ফণী চক্রবর্ত্তী এসে আমাদের টেবিলে বসল। সুরমা বসু তাকে চা করে দিলেন। ফণীর সঙ্গে মণীন্দ্র বসু আমার আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছিল- ফণী হেসে বললে অনেক কালের আলাপ আছে, আলাপ করিয়ে দিতে হবে না। তারপর জাপানী সাহিত্য সম্বন্ধে সে কিছু কিছু নিজের মত জানালে, বিশেষতঃ নোগুচির কবিতা সম্বন্ধে। আমি, নির্ম্মলবাবু ও ফণী তিনজনেই তখন মজে গিয়েচি। সুরমা বসুকে ইউরোপীয় সঙ্গীত বিষয়ে জিজ্ঞেস করলুম। কারণ তিনি মিউনিকে বেহালা শিখতে গিয়েছিলেন এবং জার্ম্মান ক্লাসিক্যাল মিউজিক সম্বন্ধে কিছু কিছু জানেন। ক্ষীরোদের স্ত্রীও বেশ মেয়ে।

নোগুচি জাপানী কবিতা পড়লেন, রামানন্দবাবু সামান্য কিছু বক্তৃতা করলেন—তারপর আমরা মীরা গুপ্তের দলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করে নীরদবাবু ও সোমনাথ-বাবুর সঙ্গে মোটরে ময়রা স্ট্রীটে এলুম। ওঁরা একটু পরে গেলেন Regal-এ A mid-summer Nights Dream দেখতে। আমি বাড়ি চলে এলুম।

আজ সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকান থেকে বার হয়ে গোলদীঘিতে গিয়ে যখন বসেচি,

তখন রাত সাতটা। ধোঁয়া এত বেশী যে আকাশে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেচে; ট্রামের আলো, বাড়ীর আলো, রাস্তার আলো, ধোঁয়ার জালের মধ্যে মিটমিট করচে। মনে পড়ল ১৯১৪ সালের এমন দিনের কথা। আজ একুশ বছর আগেকার ব্যাপার। আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, সবে কলকাতায় এসেচি—এই রকম ধোঁয়া দেখে মন তখন দমে যেত। নতুন এসেচি গাছপালা ও ইছামতী নদীর সংসর্গ ছেড়ে। তারপর কতদিন কেটে গেল—কত বিপদ, আনন্দ, দুঃখ ও আশার মধ্য দিয়ে। তখন আমরা সবাই তরুণ। The world was very young then—মামাদের তখনও বিয়ে হয় নি। এই বৈশাখে ছোট মামার বিয়ে হল। এখন মন পরিণত হয়েচে—কত ভুল শুধরে নিতে পেরেচি, অপরের মত সহ্য করবার ক্ষমতা অভ্যাস করেচি—আমার মনে হয় জীবনে এই জিনিসটাই সব চেয়ে বড়। Intolerence-এর চেয়ে বড় শত্রু জীবনে আর কিছু নেই। ইউনিভার্সিটির আলোগুলোর দিকে চেয়ে সেই সব দিনের কথাই মনে পড়ছিল, সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও পেলুম খুব। জীবনে একটা গভীরতার দিক আছে, সেটা সব সময় আমাদের চোখে পড়ে না—এই রকম নির্জ্জনে বসে না ভাবলে।

কাল মতিলাল ও আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে বেরিয়ে কার্জ্জন পার্কে অনেকক্ষণ বেড়ালুম ও গল্প করলুম। মতিলাল আমার ক্লাসফ্রেন্ড, ও কলেজ থেকে বার হয়ে কিন্তু বিবাহ বা চাকরি করলে না, পৈতৃক কিছু টাকা আশ্রয় করে আজ ষোল বছর ধরে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়চে- জানবার জন্যে যে, মানুষের আত্মা সত্যিই অমর কি না।

ও বললে, মা মারা যাওয়ার পরে এ প্রশ্ন আমার মনে জাগে—তারপর ঢুকলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে, নিজেও অনেক বই কিনেচি।

বললুম—কি সিদ্ধান্তে উপনীত হলে?

ও বললে—মানুষের আত্মা অমর। আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

—তা তো হল, কিন্তু জীবনটাকে দ্যাখো এইবার। পড়াশুনো করেই জীবন কাটালে। এবার সংসার কর। জীবনের অভিজ্ঞতা কোথায় তোমার?

মতিলাল বললে—এবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ছাড়বো। একখানা বই লিখচি এ বিষয়ে। সেখানা শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। এবার ছাড়বো।

তারপর ওখান থেকে ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে দেখি শেরিফ বড়লাটকে যে গার্ডেন-পার্টি দিচ্ছে সেই উপলক্ষে বাগানে চমৎকার আলো দিয়ে সাজিয়েচে—গাছপালার ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠচে যখন ঝিলের ধারে ফুটন্ত ফুলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ওখান থেকে গিয়ে মাঠের মধ্যে একটা ক্লাবের সাদা বেঞ্চির ওপর বসলুম—সামনেই পূর্ণিমার চাঁদ। স্থানটা নির্জ্জন—কেবল আধজ্যোৎস্না অন্ধকারের মধ্যে একজন অশ্বারোহী পুলিস এল, গেল। আধঘণ্টা পরে লর্ড রবার্টস-এর প্রতিমূর্তির পাদপীঠে গিয়ে দেখি শুধু গিরিশ বোস এসে শুয়ে আছেন, ডাঃ রায়ের* চাদর পাতা, কিন্তু তিনি বালিগঞ্জে গিয়েচেন এখনও আসেন নি। তাঁর আসতে একটু দেরিই হোল। সোয়েন হেডিনের তাকলা-মাকান মরুভূমি পার হওয়ার গল্প করলুম—ওঁরা খুব মন দিয়ে শুনলেন।

সকালে বীরেশ্বরবাবু এলেন। তারপর বালিগঞ্জে অন্নদা দত্তের বাসায় গেলাম,

* আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। অন্নদাবাবুর শরীর খুব খারাপ—পূর্ব্বে দেশের জন্যে খুব করেচেন—এখন কেউ মানে না, পোঁছে না—অথচ চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলের জন্যে উনি কি ভয়ানক পরিশ্রমই না করেচেন। আমি সব জানি। ১৯২২-২৩ সালের কাউন্সিলে উনি চট্টগ্রামের প্রথম M. L. C. ছিলেন। আমি ওঁর কাগজপত্র আমাদের League Office থেকে টাইপ করে এনে দিতুম। অন্নদাবাবুর মেয়ে মণির সঙ্গে পনেরো বছর পরে দেখা। ওর ভাল নাম যে মণিকুন্তলা তা আমি আজ এত কাল পরে ওর মুখে শুনলুম। মণি তখন ছোট মেয়ে ছিল,—আমি যখন ১৯২২ সালে অন্নদাবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলুম চট্টগ্রামে। আমার মুখে গল্প শুনতে ও ভালবাসত। মণি যে বৃত্তি পেয়ে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাস করেছিল—সে সব খবর আমি আজই প্রথম জানলুম। ওর ছোট একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে বসে রইলুম—বেশ চার মাসের ছোট্ট খুকীটি। পৃথিবী অদ্ভুত, জীবন অদ্ভুত। কে ভেবেছিল যে আজ এত বছর পরে মণির সঙ্গে বালিগঞ্জে এভাবে আবার দেখাশোনা হবে! মণির মুখে শুনলুম সুপ্রভা মণিদের নিচে পড়ত এবং দু-জনে একসঙ্গে দেশে যেত।

ওখান থেকে বার হয়ে আমি আর বেগুন এলুম মণীন্দ্র বসুর বাড়ি। সেখান থেকে সুরমা বসুর বাড়ি,—রামমোহন রায় রোডে। বেশ সাজানো বাড়ি, সাজানো ড্রয়িং রুম। সুরমা বসু ও তাঁর একটি বোন গান গাইলেন বড় চমৎকার। মেয়েটি মিউনিকে ছিলেন, ইউরোপীয়ান মিউজিক শিখতেন।

দেখে মনে হোল এই সব মেয়ে, মণি, সুরমা বসু কেমন চমৎকার ঘর বর পেয়েচে, বেশ আছে। কিন্তু যার আরও বেশী ভালভাবে এ সব জিনিস পাওয়া উচিত ছিল—সে কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে, তার কিছুই হোল না। জীবনে এমন ট্র্যাজেডি কতই যে হচ্চে প্রতিনিয়ত। অথচ সে কি বুদ্ধিতে, কি বিদ্যায়—কোন অংশে এদের চেয়ে কম তো নয়ই- বরং অনেক বেশী। ভেবে সত্যিই বড় কষ্ট হয়।

সুরমা বসুর সুন্দর গান শুনবার সময়ে আরও মনে হোল পল্লীগ্রামের সেই সব অভাগিনী মেয়েদের কথা, যারা জীবনে কোন সুখই কোনদিন পেল না। এমন কত আছে, জীবনে তাদের সঙ্গে কত ভাবে কত পরিচয়। আজ সন্ধ্যায় তাদের সবারই করুণ মুখ মনে পড়ে আনন্দের পরিবর্ত্তে গভীর দুঃখ ও সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল।

আজ সাতভেয়ে-তলায় আমাদের বনভোজন গেল। বনগাঁয়ের আমাদের বন্ধুবান্ধব উকীল মোক্তার সকলেই ছিল, তা ছাড়া সাবরেজিস্ট্রার ও ডাক্তার। বেলা দশটার সময়ে নৌকো করে আমরা গান করতে করতে নদীপথে চলেচি—পুরনো বনগাঁ ও শিমুলতলার সবাই ভাবচে এ আবার বাবুদের কি খেয়াল! তারপর বটতলায় গিয়ে মাদুর পেতে বসে আমরা সবাই খুব গল্পগুজব করলুম। আমরা ধূমপান করতে পারি নি, কারণ প্রবীণের দল সর্ব্বদা কাছে কাছে রয়েচে। সতীশ মামাকে অনেক কৌশল করে সরিয়ে একটু আমাদের সুবিধে করে নেওয়া গেল। এর আগেও গত পূজোর ছুটিতে একদিন সাতভেয়ে-তলায় এসে খুদু, খুড়ীমা, ন-দি আমরা সবাই বনভোজন করে খেয়েছিলাম। এত বড় বটগাছ এখানে আর কোথাও নেই,—এক রাজনগরের বট ছাড়া। নদীর দু-ধারে এড়াঞ্চির ফুল ফুটে আছে—কিন্তু কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই এখানে। রামায়ণে সেই শ্লোকটা মনে পড়ল—

সন্তি নদ্যো দণ্ডকেষু তথা পঞ্চবটী বনে।
সরযূ-বিচ্ছেদ-শোকং রাঘবস্তু কথং সহেৎ॥

পঞ্চবটী ও দণ্ডকারণ্যে তো কত নদনদী বর্ত্তমান, কিন্তু সরযূ-বিরহ-দুঃখ কি রামচন্দ্র সহ্য করতে পারেন?

আমার মনে হয় বারাকপুরের ওদিকের বনশোভা নেই এই অঞ্চলে। মাঠে এদিকে চাষ অত্যন্ত বেশী, পোড়ো জমি কোথায় যে যদৃচ্ছবিস্তৃত বনভূমি গড়ে উঠবে? আরণ্য-প্রকৃতি এখানে মানুষের সংস্পর্শে এসে ভীতা, সঙ্কুচিতা—তার সে উদ্দাম স্বাধীনতা নেই।

রান্না শেষ হবার কিছু আগে আমরা নদীর ধারে রৌদ্রে বসে তেল মেখে সাঁতার দিয়ে স্নান করলুম। আমি তো তেল মাখলুম বোধ হয় তিন বৎসর পরে। সাঁতার দেবার সময়ে খুব আনন্দ হোল। ওপারে কচি মটরের ক্ষেতে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেচে—এই দলের মধ্যে গাছপালা ভালবাসে দেখলাম কেবল একমাত্র সাবরেজিস্ট্রার। আর কারো সেদিকে খেয়াল নেই।

বেলা তিনটের সময় আমরা সবাই খেতে বসলুম। নিশিবাবু ও সুরেনবাবু পরিবেশন করলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া হয়ে গেল কিছু বেশী। সন্ধ্যার সময় সেই ঝোঁকে আমরা গল্প করতে করতে ফিরলুম।

সন্ধ্যার সময় যতীন ডাক্তারের দোকানে। আমার বাল্যবন্ধু নিতাই পড়ুইয়ের সঙ্গে যতীনদার দোকানের অংশ নিয়ে খুব ঝগড়া হোল। নিতাই নিজের জিনিসপত্র, লেপ বালিশ, দাঁড়িপাল্লা নিয়ে ছোট ছেলের হাত ধরে অন্ধকার রাত্রে বাড়ি চলে গেল। যতীনদা ওর প্রাপ্য টাকা দিলে না, আরও বললে, তুমি দোকানের তালের মিছরি খেয়েচ, তোমার ছেলে দুধ খেয়েচে,—টাকা আমার যখন খুশি হবে তখন দেব। কার যে দোষ তা দু-পক্ষের কেউই বুঝতে দিলে না—এ বলে ওর দোষ, ও বলে এর দোষ। বাঙ্গালীর ব্যবসায় এই রকম করেই নষ্ট হয়ে যায়।

র‍্যাস্কোর পল্ ভারলেনের জীবনী পড়ছিলুম। নিচের লাইন কটি বড় চমৎকার!

Et je m'en vais	And I going
Au vent mauvais	Born by blowing
Qui m'emporte	Wind and grief
Dec'a, del'a,	Flutter here and there
Pareil'a la	As on the air
Feuille morte.	The dying leaf.

শেষের ছত্র কয়টির ছন্দ ও সুর এত মধুর যে বার বার পড়লেও তৃপ্তি হয় না। ওর প্রথম দুটো stanzas

Les sanglots longs	Long sobbing wind
Des violons	The violins of a autumn drove
De l'automne	Wounding my heart
Blessent mon coeur	With languor as smart
D'une langueur	In monotone
Monotone	Choking and hale
Tout suffocant	When on the gale
Et bleme, quand	The hours sound deep
Sonne l'heure,	I call to mind
Je me souviens	Dead year behind

Des jours anciens   And I weep.
Et je pleure.

Verlain-এর বিষয়ে এ কথাটা ঠিকই মনে হয় যে, লেখক বর্ত্তমান যুগের লোককে মজাতে না পারলে সে কোন যুগের লোককেই মজাতে পারবে না। Bernerd Shaw তাঁর Sanity of Art-এ যে কথা লিখেচেন, ভারি সত্য।

The writer who aims at producing the platitudes which are 'not for this age but for all time' has his reward in being unreadable in all ages. Whilst Plato and Aristophanes peopling Athens with living men and women, Shakespeare peopling with Elizabethan Mechanics and Warwickshire hunts, Carpaccio painting the life of St. Ursula exactly as if she were a lady living in the street next to him, are still alive and at home everywhere among the dust and ashes of thousands of academic, punctilious, archaeologically correct men of letters and art.

Montaign সম্বন্ধে একটি কথা বড় ভাল লাগলো। 'He was the greatest artist of all—he knew the art of living'.

অনেক দিন আগে ঠিক এই দিনে আজমাবাদ কাছারী থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে কলবলিয়া পার হয়ে কাটারিয়া পুলের ওপরে সূর্য্যাস্ত দেখেছিলুম। মেসে বসে আজ ডালহাউসি স্কোয়ার ঘুরে বেরিয়ে এসে সে কথা মনে পড়ল ডায়েরী দেখে। কি উন্মুক্ত জীবনের পরে কি বন্ধ জীবন যাপন করেচি এখানে। ঠিক সেই বিকেলেই আজ বইয়ের গুদামে বসেছিলুম!

আজ সারাদিনটা অত্যন্ত ঘোরা হয়েচে, বেলা সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত। আমার মেস থেকে বেরিয়ে নীরদ চৌধুরীর বাড়িতে চা খেয়ে পশুপতিবাবুর বাড়ি গিয়ে পেনেটীর বাগান-বাড়ি যাবার কথা বলি। বন্ধুদের নতুন বাসায় যাই, তার আগে একবার নতুন পত্রিকার আপিসেও যাই। বেশী আড্ডা দিলে একটা অবসাদ আসে—শারীরিক ও মানসিক, যদিও আমি তা আজ অনুভব করি নি, তবুও আমার মনে হয় এতে কোনো আনন্দ নেই। তবে সপ্তাহে একদিন এমন বেড়ানো যেতে পারে—যদি অন্য সব ক'টা দিন নিজের কাজ করা যায়।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও দিনের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ও বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়া খুব খারাপ। এক বিষয়ে মনোনিবেশ অভ্যাস করতে হয়, এবং যে এক বিষয়ে মনোনিবেশ করে, সে হয়তো আরও পাঁচটা জিনিস থেকে বঞ্চিত আছে, কিন্তু সে সৃষ্টি করতে পারে।

অনেকদিন পরে পানিতর গেলুম। রাত্রে ইটিণ্ডা ঘাটে নেমে একজন লোক পাওয়া গেল। সে আবার ইটিণ্ডা বাজারের ডাক্তার। হাটে ভিড় ঠেলে রাত্রে পানিতর গিয়ে পৌঁছাই। উপেনবাবুর বাড়ি বেড়াতে গেলুম, বৃদ্ধ শয্যা আশ্রয় করেছেন। পুঁটীর সঙ্গে দেখা করলুম বাড়ির মধ্যে গিয়ে, ওরা জল-খাবার খাওয়ালে। নরেনের বাড়িতেও আবার খাবার খেলুম। তারপর পানিতরের ওপরের ঘরে (দোতলার উপরের ঘরে) রাত্রে শুলুম। কোণে সেই খাটখানা পাতা আছে, প্রথম পানিতরে গিয়ে ঐ খাটখানাতেই আমি শুয়েছিলুম মনে আছে। ঠিক সেই পুরানো জায়গাতে খাটখানা এখনও পাতা।

রাত্রে কত কথা মনে পড়ল। আজ কতদিনের কথা যেন সে সব। জাঙ্গিপাড়ায় দিনের কথা, সেই অন্ধকারময় দুঃখের দিন। তখন কি ছেলেমানুষ ছিলুম আর কি নির্ব্বোধই ছিলুম তাই এখন ভাবি। তখন বি-এ পাস করে, কি না জানি ভাবতাম নিজেকে।

আমি খেয়া পার হয়ে বাসে উঠে আসচি, শ্বশুর মহাশয়ের সঙ্গে পথে দেখা। তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা বলে আবার বসিরহাট এলুম ওঁদের নতুন বাসায়। দিদি ও পাঁচী ওখানে আছেন। দিদিকে দেখলে চেনা যায় না এমন নয়, তবুও সে দিদি আর নেই—কি যেন নেই মুখে যা তখন ছিল। একথা বলা বড় কঠিন। বয়স হলে মানুষের মুখের কি যেন চলে যায়, এর উত্তর কে দেবে? পাঁচীকে তো চেনাই যায় না। দেড়টার গাড়িতে পাঁচীর সঙ্গে এক গাড়িতে কলকাতা এলুম।

ঠাকুরমায়ের শ্রাদ্ধের পর সেই মার্টিন লাইনের গাড়িতে বসিরহাট থেকে এসেছিলুম, তখন আমি জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকরি করি। কলেজ থেকে বার হয়ে প্রথম চাকরিতে ঢুকেচি। আর আজ এই সতেরো-আঠারো বছর পরে মার্টিনের গাড়িতে চড়ে বসিরহাট থেকে এলুম। সতেরো-আঠারো বছরের আগের আমি আর আজকার আমি, আমার চিন্তাধারা, অভিজ্ঞতা, জীবনের out-look সব বিষয়ে কি ভয়ানক বদলে গিয়েচে তাই ভাবচি।

দিদি তাঁর মেয়ে মানীর বিয়ের জন্যে ট্রেনে উঠবার সময় পর্য্যন্ত বললেন। বললেন—ভেবেছিলুম তোমার সঙ্গে দেখা হোল না, এখানে যখন এলুম, তখন দেখা হবে তোমার সঙ্গে। কিন্তু এ কথায় তেমন আনন্দ পেলুম না। আগে হলে দিদির কথায় কত খুশি হতাম কিন্তু আজ—মানুষের মন কি বদলেই যায়! মন যে কি বহুরূপী দেবতা, কি বিচিত্র রহস্যময় তার প্রকৃতি, ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বন্ধুর বাসায় গিয়ে চা খেয়ে একটু গল্পগুজব করলুম রাত নটা পর্য্যন্ত। আসবার সময় ১০নং রুটের বাসে অনেকদিনের অচল একটা টাকা চলে গেল। গত পুজোর সময় টাটানগরে খ্যাঁদা টাকাটা আমায় নোট ভাঙ্গানি দিয়েছিল, কিছুতেই এতদিন চলে নি।

আজ সকাল থেকে কত ছবি চোখের সামনে এল গেল। ইটিণ্ডার পথ, চাঁদা-কাঁটার বন ইছামতীর ধারে। বিস্তৃত ইছামতী, ইটিণ্ডার ঘাটে লোকে সব বসে রোদ পোয়াচ্চে, ইন্দুবাবুর ছেলে অনাদি, নরেনের ছেলে, দিদি, দিদির মেয়ে মানী, পাঁচী। ছোট লাইনে আসবার পথে মনে পড়ল, আগে রবীন্দ্রনাথের বলাকা থেকে কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করতুম 'এবার আমায় সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়'। কবিতাটি বড় প্রিয় ছিল তখন।

কাল সারাদিন যে বসিরহাট পানিতর অঞ্চলে কাটিয়েছি, আজ যেন সে সব স্বপ্নের মত মনে হচ্চে। ইছামতীর তীরের চাঁদা-কাঁটার বনের পথে, ওই স্রোতাপসারিত কর্দ্দমাক্ত তীরভূমির সঙ্গে প্রথম যৌবনের যে সব স্মৃতি জড়িত, তা কাল একটু একটু অস্পষ্ট মনে এল। প্রসাদকে কাল বড় ভাল লেগেচে—আর প্রসাদের বাবাকে।

আজ সকালে উঠে রমাপ্রসন্নের বাড়ি গিয়ে শুনি সে গিয়েচে আপিসে। বাসায় ফিরেই হঠাৎ গিরীনবাবু এসেচে দেখলুম। সে বললে, রাজা নাকি মারা গিয়েচেন শুনেচেন? আমি অবিশ্যি জানতুম পঞ্চম জর্জ্জ খুব অসুস্থ, কিন্তু এত শীঘ্র যে মারা যাবেন, তা ভাবি নি। খবরের কাগজ মেসে আসে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'—তাতে

মাত্র এই খবর দেখা গেল 'King's life is peacefully drawing to a close'—একজন গিয়ে পাশের বাসা থেকে স্টেট্স্ম্যান দেখে এসে বললে রাজা মারা গিয়েছেন বাস্তবিকই।

স্কুলে গিয়ে তখনি ছুটি হয়ে গেল। নতুন একটি প্রকাশক আমার কাছে ঘুরছিল বই নেবার জন্যে, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে গেলুম শৈলজাবাবুর বাড়ি, সেখান থেকে বিচিত্রা আফিসে, সেখান থেকে নাট্যকার যোগেশ চৌধুরীর বাড়ি। রাত দশটায় বাড়ি ফিরলুম।

সম্রাট বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং গত ১৯২৮ সালে অত বড় অসুখ থেকে উঠে কাবু হয়েও পড়েছিলেন। মনে পড়ে ১৯১২ সালের কথা, যখন তাঁর দরবার উপলক্ষে আমাদের স্কুলে ভোজ হয়েছিল, আমি তখন বনগ্রাম স্কুলের ছাত্র। সেই উপলক্ষে জীবনে প্রথম বায়োস্কোপ দেখলুম বনগ্রামে ডেপুটিবাবুর বাসার প্রাঙ্গণে। সে সব বাল্যস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হয়েচে—তারপর দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কেটে গেল। জীবনের পথে আমিও কতদূর অগ্রসর হয়ে এসেচি। বর্ত্তমান প্রিন্স অফ ওয়েল্স্কে বালক দেখেছি (ফটোতে অবিশ্যি), দেখতে দেখতে তাঁর বয়স এখন হোল তেতাল্লিশ বছর।

জীবন, বছর, আয়ু হুহু করে কেটে যাচ্চে। বিরাট স্রোতস্বতী এই রহস্যময়ী জীবনধারা, কে জানে একে? ডিসরেলী বলেছিলেন জীবন সম্বন্ধে 'Youth is a blunder, maturity is a struggle and old age is a regret'—চমৎকার বিশ্লেষণ ও summing up; তাই সত্যি কি না কে জানে!

কাল রাজপুরে অনেকদিন পরে বেশ কাটল। বেলা পড়লে আমি ও ভোম্বল ধুনি ডাক্তারের বাড়ি বসে গল্প করে বোসপুকুরে বেড়াতে গেলুম। তখন কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, বোসপুকুরের ওপারের নারকেল গাছগুলোর কি রূপ ফুটেচে! ফিরবার পথে একটা বাঁধানো পুকুরের ধারে দু-জনে বসে গল্প করলুম। বাঁধা ঘাটটা বড় সুন্দর। এই রাস্তাটার ধার দিয়ে একবার আমি কিশোরী বসুর বাড়ি থেকে বোসপুকুরে বেড়াতে এসেছিলুম, তখন মা আছেন। ওখানে পুকুরঘাটে একটা ছেলে এসে জুটল, সে থাইসিসে ভুগছিল বলে তার বাড়ির লোকে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে তাকে নৈনিতালে রেখেছিল। সে এসে বললে—এদেশে কোন কিছু ভাল বিষয়ের চর্চ্চা নেই, এখানে বসে মন টিকচে না। তারপর আমরা গেলুম খুকীদের বাড়ি, সেখানে আহারাদির পরে খুকী পাড়ার লোকের নানা দুঃখের কাহিনী বললেঃ মহেন্দ্রবাবুর পনেরো বছরের নাতনীটি বিধবা হয়েচে, তার মাও বিধবা, জায়ের ছেলের গলগ্রহ, কারণ ধীরেন (ওই ছেলেটির নাম, এক সময়ে ও আমার ছাত্র ছিল) বাড়ির মধ্যে একমাত্র রোজগারে লোক। ধীরেনের মায়ের কটূক্তির জ্বালায় ওদের মা ও মেয়ের জীবন অতিষ্ঠ হয়েচে। তারপর মেয়েটি আবার অন্তঃসত্ত্বা। মা বলে মেয়েকে, তুই বিষ খেয়ে মরে যা, আমি তোকে নিয়ে কি করি! একাদশীর দিন মেয়েটা মরে যাওয়ার যোগাড় হয়। তার ওপর পেটের ছেলে টান ধরে, জলতেষ্টায় ও খিদেতে, একাদশীতে বড় কষ্ট পেয়েচে। সবাই বলেছিল জল খেতে দাও, মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ও দেবী দু-জনেই বলেচে, একে তো বাড়ির দুই ছেলে (মহেন্দ্রবাবুর মেজো ও সেজো ছেলে) এর আগে মারা গিয়েচে, একাদশীতে বাড়ি বসে বিধবা জল খেলে, পাছে আরও কোন অকল্যাণ হয়! দেবী বলেচে, আমার তো ওই বাচ্চা, আমার সে সাহস হয় না বাপু, জল খাওয়াতে হয় ও মেয়েকে নিয়ে তুমি অন্যত্র যাও।

কাজেই মেয়ের জল খাওয়া হয় না।

এরা একটা কথা ভুলে যাচ্চে—

'By day and by night, year in and year out, century after century, there is going out a colossal broadcast of power which gives real life to all who will enter into it. Normal function of the organism is to act as a receiving set for Life Power. Clear out hatred, malice, lust, fear and all other frictions and you will find that entirely without any other effort on your part, their will prevade your being and your life that hitherto unheard wave of spiritual power.'

আমরা আরও ভুলে যাই যে, পাপ জিনিসটাতে ভগবান রাগ করুন বা না করুন—

'Sin should be synonymous with bad rational production. A bad man is known by its poor reproduction of God's life.'

'When we began to deny ourselves for the good of others it was a highly important step in the soul's development and destined to lead on to increasing concern for others' good. Then we begin to realise God with a personal interest in our life and we decide to consider his wishes.'

আরও কথা আছে। টাকা রোজগারই তো সংসারের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের চরম সার্থকতা আসবে মনের পথ ধরে। কিন্তু সময় আসে যখন মনে হয় ভগবান জীবনের কেন্দ্র, তাঁর কাছ থেকে সব মঙ্গল আসবে। 'It is well to have a clear-cut aim. Unless we are striving to attain, our policy is drift, and drift will not bring us the lost things. The lost things have to be thought for, prayed for, worked for and the Supermost thing in earthly life is the development of soul qualification for a spacious and satisfying activity when entering the Beyond.'

'It is the outermost or highest sphere. Life there is realised more impersonally. One's whole work and activity on that sphere would be solely for the good of others. There would be no personal bias, selfish aims or ambitions would be impossible.'

আজ বেশ একটা অভিজ্ঞতা হোলো। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল সকাল স্কুল বন্ধ হবার পরে গেলুম কার্জ্জন পার্কে ডালিয়া ফুল ফোটা দেখতে। সেখান থেকে বেরিয়ে একবার ভাবলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে কিছু একটু পড়ব। সাত পাঁচ ভেবে সামনেই একখানা টালিগঞ্জের ট্রাম দেখে উঠে পড়লুম তাতে। টালিগঞ্জ ডিপোতে নেমে একটু ফাঁকা মাঠ কি পাড়াগাঁ খুঁজে নেবার জন্যে হেঁটে চলেচি, কালী ফিল্মের স্টুডিও পার হয়ে একটা খাল পেলাম। খালে খেয়া আছে, আধপয়সা করে তার পারানি। খাল পেরিয়ে যাচ্চি। একটা লোক আমার আগে যাচ্ছিল, তার মুখে শুনলাম যে নিকটে কোন গ্রামে মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষে কি একটা মেলা হয়। সেখানে চলেচে সে। আমি তার সংগ নিলুম। ভাবলুম দেখাই যাক কি রকমের মেলা। চলেচি তো চলেইছি, দিব্যি পাড়াগা, বাঁশঝাড়, শিমুল গাছে রাঙা ফুল ধরেচে, ঘেঁটুবনে

মুকুল দেখা দিয়েচে, সজনে ফুলের মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে, দু-একটা কোকিলও ডাকচে॥ ক্রমে দূর থেকে লোকজনের কলরব শোনা গেল। দু-একটা দোকান বসেছে,* অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কাছে গিয়ে দেখলুম। একটা নীচু পাঁচিলে ঘেরা বাগানবাড়িমত জায়গায় অনেকগুলি মেয়ের ভিড়—প্রায় চার পাঁচ শো মেয়ে। পুরুষ তত বেশী নয়, সবাই মহা ব্যস্ত, ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করচে, ছেলেমেয়ে কাঁদচে, চীৎকার করচে। বাগান বাড়িতে ঢুকে দেখি ছোট্ট একটা একতলা বাড়ির সামনের উঠোনে গাছতলায় প্রায় দু-তিনশো মেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে শালপাতা পেতে বসে আছে। শুনলাম তারা খেতে বসেচে কিন্তু আগের দল খিচুড়ি সব খেয়ে সাবাড় করে দিয়েচে। খিচুড়ি চড়েচে, আবার না নামলে এদের খেতে দেওয়া যাবে না। মেয়েরাই সেখানে কর্ত্রী, তারাই সবাইকে দিচ্চে থুচ্চে, আদর-আহ্বান করচে, কাউকে বা শাসন করচে। একটা ছোট ঘরের মধ্যে সবাই ভিড় করে ঠাকুর দেখতে ঢুকচে দেখে আমিও ঢুকলাম। ছোট্ট কালী প্রতিমা, নাম সুশীলেশ্বরী। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, এখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন, তিনিই এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেচেন। একটু পরে সেই বৃদ্ধাকেও দেখলুম, সবাই তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করচে। আর তিনি সবাইকে মিষ্টি কথায় বলচেন—না খেয়ে যেও না যেন বাবা। একটা ইট বাঁধানো চৌবাচ্চায় খিচুড়ি ঢালা হচ্চে, পাশেই আর একটা চৌবাচ্চায় কপির তরকারি। সকাল সকাল খাবার জন্যে সবাই উমেদারী করচে—অনেক দূর যাব, মেয়েছেলে নিয়ে এসেচি, ভাড়াটে গাড়ি, প্রসাদ দিয়ে দিন।

আমাকে একটা ঘরে খাওয়াতে বসালে। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হোল এখানে কি খাওয়ায় না দেখে যাবো না। তাই একটি মেয়েকে বলতেই সে আমায় ঐ ঘরটায় নিয়ে একখানা পাতা করে বসিয়ে দিলে। ঘরের মধ্যে আমার বসবার আসনের কাছেই আর একটি বাইশ-তেইশ বছরের মেয়ে বসে খাচ্ছে আর তার ছোট ছোট দুটি ছেলে-মেয়েকে খিচুড়ি মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। যে মেয়েটি আমায় পাতা করে বসিয়ে দিয়েছিল সে কোথায় চলে গেল। আর একজন আমায় পরিবেশন করলে। খিচুড়ি, চচ্চড়ি, আলুর দম, কপির তরকারি, বেগুন ভাজা, চাটনি, পায়েস, দই, মুড়কী ও রসগোল্লা। তা খুব দিলে, পাতে ঘি দিলে। এটা নেবে, ওটা নেবে জিজ্ঞেস করে খাওয়ালে। কেমন যত্ন করলে যেন বাড়ির ছেলের মত, অথচ আমাকে তারা জীবনে এই প্রথম দেখলে। মেয়েদের এই একটা গুণ, খাওয়াতে মাখাতে যত্ন করতে ওদের জুড়ি মেলে না।

খাওয়া শেষ হোল, আর একটি মেয়ে আবার সাজা পান দিলে। এমন মচ্ছবের খাওয়ায় যেখানে রবাহূত অনাহূত কত আসচে যাচ্চে তার ঠিকানা নেই, এখানে কে আবার খাওয়ার পরে পান দেয়! এ আমি এই প্রথম দেখলুম।

দেখে কষ্ট হোল আমি যখন খাওয়া শেষ করে বাইরে এলুম, তখন সেই অল্প বয়সের বধূটি রোয়াকের সামনে পাতা পেতে বসে আছে—তখনও তাঁদের কেউ খেতে দেয় নি। এদের জিনিসপত্র বেশী কিন্তু লোক কম। খাওয়ার সময়ে পরিবেশনকারিণী মেয়েরা বলাবলি কচ্ছিল—আর পারি নে বাপু। সকাল থেকে খাটচি, আর রাত বারোটা পর্য্যন্ত কত খাটি? আসচে বছর আর এখানে আসা চলবে না দেখচি।

ওখান থেকে বার হয়ে একটা বাঁশবনের মধ্যের পথ ধরে অনেকটা হেঁটে গেলুম, বেলা পড়ে এসেচে, বাঁশবনে বেশ ঘন ছায়া, এক জায়গায় সাতটা ভাঙা শিব মন্দির সারি সারি, অনেকগুলো শিমুল গাছ।। ফুলে ফুলে রাঙা। বড় মাঠে বসে খানিকটা বিশ্রাম করলুম—তারপর এসে ট্রাম ধরে চৌরঙ্গির মোড়ে নামলুম। সেণ্ট্রাল এভিনিউ

দিয়ে হেঁটে সুধীরবাবুর দোকানে এসে ভাবলুম সরোজকে গল্পটা করব, দেখি সরোজ বেরিয়ে গিয়েচে।

কি একটা অবর্ণনীয় আনন্দ পয়েছি আজ! অথচ কেন যে সে ধরনের আনন্দ এল, এর কোন কারণ খুঁজে পাই নে। নীরদবাবুর বাড়ি যখন বসে আছি, তখনই এটা প্রথম অনুভব করলুম, কিন্তু তখনই পশুপতিবাবু ফোন করলেন এখুনি আসুন ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে প্রমথ বিশীর নাটক হচ্ছে। নীরদ যেতে পারলে না, আমি মিসেস দাসগুপ্তকে নিয়ে ওদের মোটরে ইন্‌ষ্টিটিউটে এলুম। সেখানে পরিমল গোস্বামী, প্রমথ বিশী এরা সবাই হাজির। পরিমল বললে, আপনার 'দৃষ্টি-প্রদীপ' পড়েচি, কাল রাত্রে। বড় ভাল লেগেচে। আরও গল্পগুজব চলল। আমি গিয়ে বৌঠাকরুনের সঙ্গে দেখা করে এলুম। তারপর ওখান থেকে পার্ক সার্কাসে মণীন্দ্র বসুর বাড়িতে চা-পার্টিতে এলুম, কারণ সেখানে জ্যোৎস্নার বিবাহের কথা হবে অন্নদাশঙ্করের আত্মীয়ের সঙ্গে এবং আমিই তার ঘটক। পার্ক সার্কাসের বাসা থেকে নেমে যখন মণীন্দ্র বসুর বাড়ি যাচ্ছি, তখন ছিন্নভিন্ন বাদলা মেঘের অন্তরালে প্রতিপদের চাঁদ উঠেচে, সে যে কি এক সৌন্দর্য্যভরা ছবি, না দেখলে বোঝানো যাবে না। তখনই আমার বিহারের জঙ্গলের ও তার হতভাগ্য দরিদ্র নরনারীদের কথা কি জানি হঠাৎ মনে পড়ল, তাদের মধ্যে ছ-বছর থেকেচি, তাদের সব অবস্থাতে দেখেছি, জানি। আর সেই নির্জ্জন বনানী!

রাত্রে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না উঠেচে যখন বিছানাতে এসে শুই ; মণীন্দ্রবাবুর বাড়িতে চারু রায়, সুরেন্দ্র মৈত্র এঁদের সঙ্গে spiritualism নিয়ে ঘোর বাদানুবাদ করে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচি। তারপর হিমালয়ের শৃঙ্গরাজি ও গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সম্বন্ধে আর একপালা বাদানুবাদ।

আজ ট্রামে স্কুল থেকে গেলাম গঙ্গার ধারে। গিরিজাপ্রসন্ন সেনের কবিরাজি ডিস্‌পেন্‌সারির মধ্যে অয়েল-পেন্টিংখানা ঠিক সেই জায়গাটিতে আছে—বাবার সঙ্গে কতবার ভগবতীপ্রসন্ন কবিরাজের কাছে আসতুম। বাড়িটা সেইরকমই আছে, তবে খুব পুরোনো হয়ে পড়েচে। ভাবলুম আজ এই যে এই ঘরে ঢুকলুম, জীবনে যা কিছু সব হয়েচে, সেবার এই ঘর থেকে বার হবার ও এবার পুনরায় ঢুকবার মধ্যে, সেই যে ছেলেবেলায় কিশোর কাকা সত্যনারায়ণের পুঁথি পড়তেন তাও...যুগল কাকাদের ঢেঁকশেলে আমি, ভরত, নেড়া বাদলার দিনে খেলা করতাম তাও, বাবার সঙ্গে আমি হুঁকোর দোকানে বসে লুচি খেয়েছিলুম তাও, প্রথম যেদিন ধানবনের মধ্য দিয়ে স্কুলে ভর্ত্তি হতে যাই বনগাঁয়ে তাও, সব কিছু—সব কিছু, কত কথা মনে হোল, সারা জীবনটা যেন এক চমকে দেখতে পেলুম গঙ্গাপ্রসাদ সেনের বড় অয়েল পেন্টিংটার সামনে বসে।

তারপর গিরিজাবাবুর সঙ্গে ওদের বৈঠকখানায় অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। কত পুরোনো আমলের ছবি টাঙানো, যে সব ছবি আর এখন মেলে না। উঠোনের সেই জায়গাটি যেখানে বসে বাল্যে একদিন মধুছন্দার অভিনয় দেখেছিলুম ভূষণ দাসের যাত্রার দলে, সব সেই রকমই আছে তবে যেন বড় পুরোনো হয়ে গিয়েচে।

বারাকপুরে শৈশবে যাপিত কত রাঙা সন্ধ্যা, পাখীর ডাক ও মায়ের মুখ মনে পড়ল—বাড়ির পিছনে বাঁশবনের কত দিনের ছায়াগহন, রাঙা রোদ গাছের মাথায় মাখানো সন্ধ্যা। যে সন্ধ্যা, যে শৈশব, যে বারাকপুর আর কখনও ফিরে আসবে না আমার জীবনে।

ওখান থেকে বার হয়ে গঙ্গার ধারে বাঁধানো ঘাটের পৈঠায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

কালোর বৌভাতে শনিবার বাড়ি গিয়েছিলুম। দুপুরে খয়রামারির মাঠে যেমন বেড়াতে যাই,—গিয়েচি। একটি ঝোপের ধারে বৈঁচি গাছে কচি পাতা গজিয়েছে, মাথার ওপর নীল আকাশ, কী ঘন নীল, বাতাসে যেন সঞ্জীবনী মন্ত্র, মাঠের সর্ব্বত্র ছড়ানো শিমুল গাছ ফুলে রাঙা হয়ে রয়েচে। ট্রেনে আসতে কাল শনিবারে রাঙা শিমুল ফুলের শোভা মুগ্ধ হয়ে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখেচি, মনে মনে ভাবি প্রতি বছর দেখচি আজ চল্লিশ বছর কিন্তু এরা তো পুরোনো হোল না, কেন পুরোনো হোল না—কেন প্রতি বৎসর শিরায় শিরায় আনন্দের স্রোত বইয়ে দেয়, তা কে বলবে?

গত শুক্রবারে আবার বসিরহাট গিয়েছিলাম। মাঠে মাঠে শিমুল গাছগুলি রাঙা হয়ে উঠেচে ফুলে ফুলে, বৈঁচি ফুল ফুটেচে বাঁশবনের শুকনো ঝরা লতার মধ্যে, বাতাবী লেবু ফুলের গন্ধও মাঝে মাঝে পাচ্চি। বসিরহাটে নামলুম বিকেলবেলা, প্রসাদের সঙ্গে বাঁধানো জেটির ঘাটে গিয়ে বসে রাঙা রোদ মাখানো ইছামতীর ওপারের দৃশ্যটি দেখলুম। এই স্থানটিতে দাঁড়িয়ে একদিন গৌরী বলেছিল—'গাড়িতে কেমন কলের গান হচ্চিল, শুনছিলাম মজা করে'। সে কথাটি বললুম প্রসাদকে। রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দিদির সঙ্গে গল্প করলুম। পরদিন সকালে অর্থাৎ শনিবার কবি ভুজঙ্গভূষণ রায় চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বয়স চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি বছর হয়েচে, কিন্তু মাথায় একটা চুলও পাকে নি, আমায় দুখানা বই দিলেন, চা খাওয়ালেন। গীতার কাব্যানুবাদ করচেন পড়ে শোনালেন, বেশ লোক।

এই দিন বিকেলের ট্রেনে ফিরলুম কলকাতায়, ওপথে গাছপালার সৌন্দর্য্য তেমন নয়। একটি মেয়ে ট্রেনে কেমন গান করে শোনালে। সন্ধ্যার সময় নীরদবাবুর বাড়িতে সাহিত্য সেবক সমিতির অধিবেশনে যেতে যেতে নিৰ্জ্জন অকল্যাণ্ড স্কোয়ারে বসে কি অপূর্ব্ব আনন্দ-পেলুম, দু-একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে। এ আমার অতি সুপরিচিত পুরাতন আনন্দ। ছেলেবেলা থেকে পেয়ে আসচি, এতে অবিশ্যি আশ্চর্য্যের কথা কিছু নেই। অনেকে আমার এ আনন্দটা বোঝে না, কিন্তু তাতে কিই বা যায় আসে —আনন্দের উপলব্ধিটুকু তো আর মিথ্যে নয়।

বাইরে কোথাও ভ্রমণের একটা পিপাসা আবার জেগে উঠেচে। ভাবচি আফ্রিকা যাব, শম্ভু আজ এসেছিল, সে বললে, তার কে একজন আত্মীয় ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী আপিসে কাজ করে, তারই সাহায্যে যদি কিছু হয় দেখবে ও চেষ্টা করে। আজ সারাদিন স্কুলেও ওই কথাই ভেবেচি, বেশীদূর কোথাও যেতে চাই নে। কিন্তু জগতের খানিকটা অন্ততঃ দেখতে চাই।

সেদিন P. E. N. Club-এ যে মধ্যাহ্ন ভোজ হোল বোটানিক্যাল গার্ডেনে—সেখানে অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হোল। মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী, অক্সফোর্ড থেকে এম্-এ পাস করে এসেচে।

পরের বৃহস্পতিবার ইদের ছুটিতে বাড়ি এলুম। আসার উদ্দেশ্য এই ফাগুনে বাংলার বনে, মাঠে অজস্র ঘেঁটুফুল ফোটে—অনেকদিন ঘেঁটুফুলের মেলা দেখি নি, তাই দেখব। তাই আজ সকালে এঞ্জিনিয়ার ও সাবডেপুটীবাবুর সঙ্গে মোটরে বেড়াতে গেলুম চৌবেড়ে। সেখানে ওদের ইউনিয়ন বোর্ডের এক কাজ ছিল, মিটিয়ে সবাই

মিলে যাওয়া হোল দীনবন্ধু মিত্রের বাড়ি। ভাঙা সেকেলে পুরোনো কোঠা, বট অশ্বত্থের গাছ গজিয়েছে—তাঁর জন্মস্থান দেখলুম—দীনবন্ধু মিত্রের এক জ্ঞাতি ভাইপো বাড়ির পিছনে একটা সজনেতলা দেখিয়ে বললেন—ঐ গাছতলায় তখনকার আমলে আঁতুড় ঘর ছিল—ওইখানে দীনবন্ধু কাকা জন্মেছিলেন। আমি ও মনোরঞ্জন-বাবু সার্কেল অফিসার স্থানটিতে প্রণাম করলুম। তারপর ঘেঁটুফুলের বন দেখতে দেখতে মাঠে মাঠে অনেকগুলো চাষাদের গ্রাম ঘুরে বেড়ানো গেল—চৌবেড়ে, ন'হাটা, সনেকপুর, দমদমা, মামুদপুর ইত্যাদি। বেলা একটার সময় এলুম কালীপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি। সেখানে কালীপদ খুব খাতির করলে। ওখান থেকে বার হয়ে আমি নামলুম চালকী। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করলুম। চালকীর পিছনের মাঠে কি ঘেঁটুবনের শোভা। দিদিদের বাড়ি বসে ঘটুর বিয়ের বড়মানুষি গল্প শুনলাম। সন্ধ্যার কিছু আগে বনগাঁয়ে গিয়ে খয়রামারির মাঠে ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপব কতক্ষণ বসে রইলুম। দূরে গাছের ফাঁকে চাঁদ উঠেচে—মাথার ওপর দু-চারটা তারা। মনের কি অপূর্ব্ব আনন্দ! কাছে ছিল একখানা বই—বেদান্ত দর্শনের ব্যাখ্যা। সেখানে ঐ রকম স্থানে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে বসে পড়ে যেন একটা মসৃণ অনুভূতি নিয়ে ফিরলুম।

ঘোষপাড়ার দোলে এলুম অনেকদিন পরে। আজ সকালে বনগাঁ থেকে ট্রেনে বার হয়ে রানাঘাটে সাড়ে দশটায় শান্তিপুর লোকাল ধরলুম, দোলের মেলায় আসতে হোল বেলা সাড়ে বারোটা। ছোট মাসীমা খেয়েদেয়ে ওপরে শুয়ে ঘুমিয়েছিলেন, আমি আসতে চা করে দিলেন। দুপুরের রোদে বাঁশবাগান আমার বড় ভাল লাগে—আর এই সব বাঁশ বনের সংগে আমার আশৈশব সম্বন্ধ। বিকেলে একটু ঘুমিয়ে উঠে দোতলায় গিয়ে একটি বড় সাংঘাতিক ঘটনা চোখের ওপর ঘটতে দেখলুম। এক-জন গুণ্ডা জনৈক যাত্রীর পকেট কেটেছিল, পাশেই ছিল একজন হিন্দুস্থানী ভলাণ্টিয়ার, সে যেমন ধরতে গিয়েচে, আর গুণ্ডাটি ওকে মেরে দিয়েচে ছুরি। আমি যখন গেলুম, তখন আহত লোকটাকে ওদের তাঁবুতে এনে শুইয়েচে, খুব লোকের ভিড়। একটু পরেই সে মারা গেল। ওদিকে সেই গুণ্ডাটিকেও পুলিসে ধরে ফেলেচে তাকে লোকে মেরে আধমরা করেছে। মেলাসুদ্ধ লোক সন্ত্রস্ত—সবাই বলচে, এমন কাণ্ড কেউ কখনও এমন স্থানে ঘটতে দেখে নি! আমি আরও খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে চলে এলুম। রায়বাড়ির পাশের একটা ঘন বনের মধ্যের পথ দিয়ে ঢুকে একটা শুকনো পুকুরের পাড়ে ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ফিরে যখন আসচি তখন একটা শিমুল গাছের বাঁকা ডালপালার পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠচে—স্থানটি আফ্রিকা হতে পারতো, কি নির্জ্জন, আর কি ভীষণ জংগল—বাংলাদেশের গ্রামে এমন জঙ্গল আছে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে? কি মহিমময় দৃশ্য সেই উদীয়মান পূর্ণচন্দ্রের, সেই ঘন জংগলের মধ্যে, আঁকাবাঁকা শিমুল গাছের ফাঁকে। আজ আমার ঘোষপাড়ার দোলে বেড়াতে আসা সার্থক হোল মনে হচ্চে শুধু এই দৃশ্যটা দেখবার সুযোগ পেলুম বলে। সেদিনের সেই খয়রামারির মাঠে শুকনো ডালের ওপর বসে থাকা ঘেঁটুবনের মধ্যে, আর আজকাল কামারপুকুরের পাড়ের জঙ্গলে এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়—এবারের দোলের ছুটির মধ্যে এই দুটো ঘটনা জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার মধ্যে আসন পেতে পারে।

তারপর মাসীমা ছাদে বসে চা করে দিলেন, লুচি ভাজলেন, আমি কাছে বসে গল্প করলুম। অনেকদিন আগের কথা তুললেন, আমি গৌরী, মণি ও মাসীমা ছাদে বসে

কত তাস খেলতুম। আমি তো ভুলেই গেছলুম, এতদিন পরে আবার সেকথা মনে এল। সুপ্রভার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

এর মধ্যে একদিন কার্জ্জন পার্কে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে জনৈক জাপানী চোরের আত্মকাহিনী পড়ছিলুম। বইখানাতে আছে, সে নিজে ভয়ানক বদমাইশ থেকে যীশুখ্রীস্টের বাণীর প্রভাবে কেমন করে হঠাৎ ভাল লোক হয়ে পড়ল। আমার ডাইনে এক গাছে ফুটেচে চেরী ফুল, সামনে লাটসাহেবের বাড়ির কম্পাউণ্ডে সারি সারি দেওদার গাছে নতুন কচি পাতা গজিয়েচে—সেদিন ভুলে গেলুম যে কলকাতায় বসে আছি—ট্রাম, বাস আসচে যাচ্চে, সে যেন আমার চোখেই লাগে না—আমি যেন বহু-দূরে হিমালয়ের কোন অরণ্যে বসে আছি—সে গম্ভীর হিমারণ্যের নিস্তব্ধতা শুধু ভঙ্গ করচে তুষার-নদীমুক্ত স্রোতধারা আর দেওদারের শাখা-প্রশাখার মধ্যে বায়ুর স্বনন।

তারপরেই একদিন গেলুম রাজপুরে। সন্ধ্যার সময় গিয়ে মাঠের ধারে বসলুম, মাথার ওপরে এক-আধটা নক্ষত্র উঠেচে, হুহু দক্ষিণ হাওয়া বইচে, সামনে একটা বট-গাছ, দূরবিসর্পী দিকচক্রবাল সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হোল—গত শনিবারে শার্লি টেম্পলের ছবি দেখে যেমন আনন্দ পেয়ে-ছিলুম, এ যেন তার চেয়েও বেশী—যদিও শার্লিকে আমার খুবই ভাল লাগে এবং ঐ ছোট্ট মেয়েটির ছবি থাকলেই আমি দেখি।

'To those who have some feeling that the natural world has beauty in it, I would say, cultivate this feeling and encourage it in every way you can. Consider the seasons, the joy of spring, the splendour of the summer, the sunset colours of the autumn, the delicate and graceful bareness of winter trees, the beauty of snow, the beauty of light upon water, what the old Greek called the unnumbered smiling of the sea.'

'In the feeling for that beauty, if we have it, we possess a pearl of great price.'

—Lord Grey of Falloden

এ দিনটি প্রথম এক বাণ্ডিল পরীক্ষার কাগজ সুনীতিবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলাম। কথা ছিল মণিকুন্তলারা আজ রাজপুরে যাবে পিকনিক করতে, ৮।৫৪ লোকাল ট্রেনে। আমিও ওদের সঙ্গে যাব, কিন্তু স্টেশনে যেমনি পা দেওয়া অমনি ট্রেন গেল চলে। পরের ট্রেনে গেলাম। বেগুনের মা খুব রান্না-বান্না করেচেন গিয়ে দেখি। মণিকুন্তলাকে বললুম—দু-দিন তোমার ওখানে গিয়ে দেখা পাই নি, এখানে এসেচ ভালই হয়েচে। আমরা খুব আনন্দ করে চা ও কলার বড়া খেলাম। মণির বোন রেণুর সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ মেয়েটি, বুদ্ধিমতী খুব। রেণু যে ভাল নাচতে পারে, এ আমি এই প্রথম শুনলুম মণির মুখে। রেণু আমার কাছে এসে বললে—গল্প বলুন। ছেলেমানুষ—দু-একটি ভূতের গল্প শোনালুম। তারপর সে আর আমার কাছছাড়া হয় না। যেখানে আমি যাব, সে সেইখানেই আছে উপস্থিত।

বললে—আপনাকে আমার বড় ভাল লাগচে। তারপর সবাই মিলে বোসপুকুরে নাইতে গেলুম। খুকীকে ডেকে নিলাম ওর বাড়ি থেকে। বোসপুকুরে সাঁতার দিয়ে পার হয়ে গেলাম। তারপর আর একটা পুকুরে নাইলাম।

রেণু বললে—এক একজনকে কেমন হঠাৎ বড় ভাল লাগে, আপনাকে যেমন লেগেচে। দেখচেন না সব সময় আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছি।

তারপর বাড়ি এসে আমার আঙুলগুলো মটকাতে লাগল। বললে—আর-জন্মে আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ ছিল।

আমি বললুম—আমি তোর বাবা হব, তুই আমার মেয়ে হবি?

সে বললে—তাহলে মেয়ের মতই দেখুন। বলে—পাশে এসে আমার কাঁধে মাথা রেখে বসল।

মণিকুন্তলা গান গাইলে আর ও নাচলে।

'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমো, নমো নমো।'

বাবার শোকে রেণু নাকি পূর্ব্বজন্মে আত্মহত্যা করেছিল, ওকে কে বলেচে নাকি। অদ্ভুত মেয়ে! ওর দিদি জ্ঞানবাবুর বাড়ি গেল—ও গেল না। বললে—ওরা মোটরে যাক্, আপনি আর আমি যাব হেঁটে।

সারা পথ ট্রেনে দু-বোনে গান গাইলে। বালিগঞ্জে জোর করে আমায় নামিয়ে নিলে। একটা গন্ধরাজ ফুল কোথা থেকে তুলে নিয়ে এসে আমায় দিলে। চেয়ারের পাশে জ্যোৎস্নায় বসে রইল সব সময়। বললে—ঠিকানা দেবেন, বাড়ি গিয়ে পত্র দেব। দুঃখ এই যে শীগ্‌গির চলে যাচ্চি। আগে কেন ভাব হোল না।...ইত্যাদি। অদ্ভুত মেয়ে বটে! ভারী ভাল লাগে ওকে, সব সময়ে 'বাবা' বলে ডাকবে আমাকে।

রেণুর কথাটা কেমন এক ধরনের আনন্দে আমায় ক-দিন যেন ডুবিয়ে রেখেচে। এমন একটা মনের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল—যার সন্ধান পথে ঘাটে পাওয়া যায় না। তাই সবাইকে গল্প করে করে বেড়াচ্চি। আজ বিকেলে নীরদবাবু, বউঠাকরুন, পশুপতিবাবু, মিসেস দাশগুপ্ত সবাই মিলে গড়িয়ার মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সঙ্গে হারমোনিয়াম গিয়েছিল, স্টেশনে নেমে মাঠের মধ্যে বসে আমরা গান গাইলুম। আমি হালুয়া তৈরী করলুম উনুন জেবলে। চা খাওয়ার পরে গল্পগুজব হোল। আমার কিন্তু রেণুর কথা বার বার মনে হয়ে বিকালটা কি রকম হয়ে গেল। কেবলই মনে হয়, আহা, রেণু থাকলে বেশ হোত! ওদের কাছে কথাটা বললুম। ওরা তো শুনেই বললে, আগে কেন বললেন না, আমরা গিয়ে তাকে নিয়ে আসতাম।

কাল রেণুদের বাড়ি গিয়েছিলুম। যেমন গিয়েচি ও তখনই দৌড়ে একখানা পাখা নিয়ে আমায় বাতাস করতে বসল, বললে—শরবৎ করে নিয়ে আসি, দাঁড়ান। তারপর সব সময়েই মণি, আমি আর ওর বাবা গল্প করচি, রেণু আমার পাশে জানলার ধারে বসে রইল। লক্ষ্মীপুজো গিয়েছে কাল ওদের বাড়িতে, তা ও ভুলেই গিয়েচে। ওর বাবা বলে, আপনি এসেচেন আর ও সব ভুলে গিয়েচে। বাইরের বারান্দাতে জ্যোৎস্নায় মণি ওর কলেজ-জীবনের কত কথা বললে। রেণু বললে—আপনার জন্যে রজনীগন্ধা রেখেছিলুম, শুকিয়ে গিয়েচে, পদ্ম আছে, দেব এখন? আসবার সময় নিচু পর্যন্ত নেমে এল সঙ্গে, আর কেউ নয়, মণি এসেছিল, কিন্তু ওর বাবা ডাকলেন বলে আমি আবার ওপরে গেলুম উঠে, তাই মণি এবার আর আসে নি কিন্তু রেণু দু-বারই এল। আমার কোলের কাছটি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি বুধবারে আসবেন তো? আমি পথের দিকে চেয়ে থাকি, কখন আসবেন। কি সুন্দর মেয়ে!

ছ-বছর পরে খুদুদের ওখান থেকে বেড়িয়ে এসে দুপুর বেলাতে মনে বেশ আনন্দ হোল, কারণ পথে পথে নতুন-পাতা-ওঠা গাছ, কোকিলের ডাক। রাত দশটার পরে জ্যোৎস্না উঠেচে, চেয়ার পেতে বাইরে বসে দেখি আর ভাবি, কাল ঠিক জ্যোৎস্না উঠতে দেখে মণি আমার সঙ্গে তর্ক করলে যে এটা নাকি শুক্লপক্ষ—ওদর বাড়ির ছাদে। তারপর, তিনু আর আমি খয়রামারির মাঠে গেলুম বেড়াতে। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে—পথে ঝোপেঝাড়ে কত কি ফুলের সুগন্ধ। এই গ্রীষ্মকালে বনঝোপে রাত্রে নানারকম বনফুল ফোটে—তার মধ্যে বনমল্লিকা বেশী। মনে এমন একটা অদ্ভুত আনন্দ ও উত্তেজনা আসে যে মনে হয় খয়রামারির মাঠেই সারারাত বসে থাকি। খুকুর কথা ও রেণুর কথা যত মনে হয় আর তত আনন্দ বেশী পাই। মাথার ওপরে কেমন নক্ষত্র উঠেচে, এই জ্যোৎস্নারাত্রে সারা বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে যে প্রীতি ও ভালবাসা উৎসারিত হচ্চে, পবিত্র প্রাণের অবলম্বনে তারা আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সেই প্রীতি ভালবাসার কিছু অংশ homely ভাবে পরিবেশন করবে। কতরাত্রে ফিরে এলুম, তবুও ঘুম আসে না। একে গরম, তাতে আনন্দের উচ্ছ্বাস মনের মধ্যে, কি করে ঘুমোই? জীবনে আজকাল বড় বেশী আনন্দ পাচ্চি, খানিকটা প্রকৃতি থেকে, খানিকটা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক থেকে।

নৌকা করে সকালে বারাকপুর যাচ্চি। এ সময়টা আর কখনও ইছামতীতে নৌকো করে যাই নি, বর্ষাকালের চেয়ে প্রকৃতি এখন আরও সবুজ—সত্যিই আরও সবুজ। গাছে গাছে নতুন শোভা। চারিদিকে পাখী ডাকচে পিড়িং পিড়িং, কোকিল ডাকচে, ট্যাং উঁচু করে বকগুলি শেওলার দামে বসে আছে—শিমুল গাছগুলোর রূপ কি অদ্ভুত! শিমুল ঝাঁড়া আর বাব্‌লা গাছে নদীর শোভা বাড়িয়েচে। আমি বসে কাগজ দেখচি মেয়েদের, প্রায়ই সব পাস করিয়ে দিচ্চি—মেয়েদের ফেল করাতে মন সরে না—আর রেণুর কথা ভাবচি, কাল খুদু বলেছিল বিকেলে—'আপনার সঙ্গে কথা বলে যেমন অদ্ভুত আনন্দ পাই, এমন আর কারও সঙ্গে কথা বলে পাই নে' সেই কথা ভাবচি। খুদু কাল যেতে বলে দিয়েচে কিন্তু আজ রাত্রেই আমি যাব চলে, সুতরাং কাল কি করে তার সঙ্গে আর দেখা করব? এ ক-দিনই কি অদ্ভুত আনন্দে কাটচে।

আমাদের ঘাটে গিয়ে নৌকো লাগল। এবার বন জঙ্গল কেটে দেশের শোভা অনেকটা নষ্ট করে ফেলেচে। দুপুর হয়ে গিয়েছিল, আমি কুঠীর মাঠের দিকে একটু বেড়াতে গেলুম—পুঁটি দিদিদের বাড়ি ব্যাগ রেখেই। বাঁশবনে পাতা পড়িয়েচে—চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। স্নান করতে গেলুম ঘাটে, সেই বর্নানিমের ঝাড় দাঁড়িয়ে আছে, খুকু আর আমি সেই ঘাটে নাইতে আসতুম, খুকু ওর তলায় দাঁড়িয়ে থাকত—মনে হোল যেন কত কাল হয়ে গেল। খেয়ে বিশ্রাম করে চড়কতলায় গেলুম। উমা এসেচে অনেকদিন পরে, তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। মণিকন্তলার পত্রখানা ও আবার দেখলে। চড়কতলায় এসে কতযুগ পরে কাদামাটি দেখি। সোনা, নলিনীদির মেয়ে তাকেও দেখলুম কতকাল পরে। পাগলা জেলে সন্ন্যাসী সেজেচে, ওকে কত ছোট দেখেচি। অজয় মণ্ডল বড় বুড়ো হয়ে গিয়েচে। সে জিজ্ঞেস করলে আমার বাড়ির কথা, আমার ভাই কেমন আছে।

চালতেপোতার বাঁধ দিয়ে যেতে-যেতে এখন এই অংশটা লিখচি। কি অপূর্ব গাছপালার শোভা,—বারাকপুরের পুলে,—আর এই চালতেপোতার পুলে। নদীর জলের ও হাক্‌রা বনের এই যে সুগন্ধ এটা আমাদের ইছামতীর নিজস্ব। এবার গুড

ফ্রাইডের ছুটিটা সর্ব্বরকমে বড় আনন্দেই কাটল। এত আনন্দ জীবনে অনেক দিনই পাই নি।

রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ডাইনে চালকীর পথের ধারে কচি পাতা ওঠা শিমুল গাছটায় চাইলে চোখ যেন আর ফেরানো যায় না। যখন এ সব দৃশ্য দেখি, তখন অনর্থক অর্থব্যয় করে দেশভ্রমণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। এর চেয়ে ভাল কোন দেশ আছে! এত বিচিত্র বনশোভা কি ট্রপিক্যাল আফ্রিকার? একটা পাপ্‌ড়ি ফাটা শিমুল গাছের কি শোভা হয়েচে। পাপ্‌ড়ি ফেটে তুলো বেরিয়ে আছে আঁকাবাঁকা গাছের ডালে ডালে। নদীর জলে মাঝে মাঝে কচ্ছপ ভেসে উঠে, মুখ বার করে 'ভু-উ-উস্' শব্দে নিঃশ্বাস নিচ্চে।

আজ অনেকদিন পরে জালিপাড়ার সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দু-চারজন আছে বাল্য জীবনের আলাপী, তাদের সঙ্গে যখন পথে ঘাটে এইভাবে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তখন বড়ই আনন্দ হয়। একজন আমাদের 'আর্চ্চার-দা', একজন হচ্চে চালকীর শশিবাবুর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছিল, মোল্লাহাটীতে আম কিনতে সেই যে ছোকরা, যাকে আমি ও ছোটমামা আমাদের বাড়ি ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়েছিলুম, আর একজন হচ্চে পেরুর কন্‌সাল ডন মটয়াস্‌কি, যাকে পায়েস খাইয়েছিলুম, বনগাঁয়ের বাসা থেকে তৈরি করে। এই বছরটাতে কি যোগ আছে জানি নে, যত সব পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল আবার—যেমন ধরি মণিকুন্তলা-দের সঙ্গে, এই বছরই বিশেষ করে আবার যোগ পুনঃস্থাপিত হয়েচে রাজপুরের অন্নপূর্ণাদের সঙ্গে, রামপ্রসন্নদের সঙ্গে, সুরেনদের সঙ্গে। মিনুও সেদিন আমার কথা গ্রামে এসে বলেছিল বুড়োর কাছে, বুড়ো বল্‌লে, সেদিন রাত্রের ট্রেনে বনগাঁ থেকে আসবার সময়ে। এই বছরেই কতকাল পরে দেখা হয়ে গেল রাজলক্ষ্মীর সঙ্গে—সেদিন রাণাঘাট স্টেশনে। আর্চ্চারদার সঙ্গে রাণাঘাট মেডিকেল মিশনে, চড়কের দিন দেখা হোল। উমার সঙ্গেও বারাকপুরে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর পরে। এই বছরেই ডাঃ পি. সি. রায়দের আড্ডাতে আবার যাচ্চি ১৯১৪ সালের ছাত্র-জীবনের মত। এই বছরেই বনগাঁয়ে মিনুদের বাসায় গিয়ে রোজ গান শুনি, সেখানে ১৯১৮ সালের পরে আর কোনদিন পদার্পণ করি নি। আবার এই গত গ্রীষ্মাবসানেই বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসীমার বাড়ি গিয়েছিলুম, তের বছর পরে। এই বছরেই এই সেদিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের সেই ডিসপেন্‌সারি ঘরটাতে গিয়ে গিরিজাপ্রসন্নবাবুর সঙ্গে কথা বলে এলুম—যেখানে আমার ন-বছর বয়সের শৈশবে শেষ বার গিয়েছিলুম। এ সবের চেয়েও বড় ও আমার কাছে সকলের চেয়ে মধুর—এই বছরেই এই সেদিন শনিবার গিয়ে পানিতরে সেই ওপরের ঘরটাতে রাত্রিযাপন করলুম বহুকাল পরে, আমার বিয়ের পরে যে ঘরটাতে আমি ও গৌরী থাকতুম। ওদের সঙ্গেও আবার একটা যোগ স্থাপিত হয়েচে এই বছরেই : জীবনে কখনোও যে আবার যাব তার আশা ছিল না। শ্বশুরবাড়িতে ওদের বাড়িটার পিছনে কি আছে জানতুম না—তা এবার জেনেছি। বহুকাল পরে মুরাতিপুরে মামার বাড়ির ওপরের ও নিচের ঘরে এবার দোলের সময় আবার রাত্রি কাটিয়ে এসেচি। আন্নির সঙ্গে দেখা হয়েচে এ বছরে, দিদির সঙ্গে দেখা হয়েচে তাও এ বছরে।

অপূর্ব্ব ১৩৪২ সাল কেটে গেল আমার পক্ষে। পুরোনো বন্ধুদের হারাতে চাই নে, বড় কষ্ট হয়। যে যেখানে আছে, যাদের কতভাবে, কতরূপে পেয়েচি—সব ভাল থাকুক, মাঝে মাঝে তাদের যেন দেখতে পাই।

ওঃ সেই বায়োস্কোপওয়ালা সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে কি আনন্দই পেয়েছিলুম আজ বিকেলে। ভাল কথা—লিখতে ভুল হয়ে গিয়েচে, এই কালই বিকেলে ভাগলপুরের যতীনবাবুর মেয়ে সত্যপ্রিয়ার সংবাদ পেয়েচি।

কেবল দুটি কষ্ট মনে রয়েচে—ঊষার সঙ্গে দেখা হয় নি বহুকাল—ভাবচি গরমের ছুটিতে, কি পুজোর ছুটিতে একবার এলাহাবাদে যাব। আবার একদিন রাজপুরের বিন্দুদের শ্বশুরবাড়িতে গেলুম রাধানাথ মল্লিকের লেনে। বিন্দু বড় ভাল মেয়ে, ভারি আদর-যত্ন করলে। একে ছোট অবস্থায় দেখেছিলুম—আবার দেখলুম এই বছরই প্রথম। আমার বড়মামার ছেলে গুলুকে আজ আট বছর পরে এই বছরই দেখলুম। কত বছর পরে কুসুমের সঙ্গেও দেখা হয় গত ১৫ই মে। রেণুদের বাড়ি আর একদিন গিয়েছিলুম। ওরা ছেলেমানুষ, ভূতের গল্প শুনে খুব খুশি। আমায় আবার একটা লেবেঞ্চুশের কৌটা উপহার দিলে রেণু। বললে, আপনি আমাদের মত ছেলেমানুষ, তাই এটা দিলাম আপনাকে। ওরা কাল রবিবারে চাটগাঁ চলে গেল, আমি সকালে তুলি দিতে গেছলুম, ওরা ঠিকানা দিয়ে চিঠি দিতে বললে। রেণুর তো কথাই নেই, সে জেতনকে বললে, আপনাকে ধন্যবাদ যে আপনি এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।

রেণুর পত্র পেয়েচি। সে গিয়েই পত্র লিখেচে, আর তাতে লিখেচে, 'আসুন শীগগির একবার চাটগাঁয়ে।' আমি আর একদিন রাজপুরে গিয়েছিলাম। যদুনাথ ও খুকী বলছিল, রেণু আর একদিন ওখানে গিয়েছিল বেড়াতে, সেদিন আমি ছিলাম না তাই শুধুই আমার নাম করেচে।...ওইখানে বাবা শুয়েছিলেন, এখানে বসে বাবার সঙ্গে কত গল্প করেছিলুম...শুধু এই সব কথাই হয়েচে। সেদিন রাজপুর থেকে ফিরবার পথে জ্যোৎস্নালোকিত প্লাটফর্ম্মে বসে বসে কেবল এই সব ভেবেচি।

আজ একটি অদ্ভুত তালজাতীয় গাছের কথা পড়লুম, নাম Microzeminar Plum। অস্ট্রেলিয়ার Tambourine mountain-এ বিস্তর রয়েচে। এই গাছ নাকি বহুকাল বাঁচে। সেখানে পনেরো হাজার বছর একটা গাছ বেঁচে ছিল, সেটা দুশো ফুট উঁচু হয়। Prof. Chamberlain সেখানে অত উঁচু গাছ দেখে খুব উৎসাহিত হয়ে গিয়েছিলেন। পনেরো হাজার বছর বয়সী প্রাচীন গাছটা কে সেদিন কেটে ফেলে দিয়েচে, তাই নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে হৈ হৈ পড়ে গিয়েচে, ব্রিস্‌বেনের টেলিগ্রামে প্রকাশ (রয়টার, ৮ই মে, ১৯৩৫, অমৃতবাজার পত্রিকাতে পড়লুম) বাকী গাছ যা সব আছে, তার মধ্যে একটার বয়েস এগারো হাজার বছর, বাকীগুলি তিন-চার হাজার বছরের শিশু।

কাল স্কুলের ছুটি হবে। আজ ছেলেরা খুব খাওয়ালে। আমি নানা জায়গায় ঘুরে টরুকে সঙ্গে নিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ি গেলুম। কুসুমের সন্ধান করে তার ঠিকানা পেলুম। টরুকে সঙ্গে নিয়ে তেত্রিশ বছর পরে গিয়ে কুসুমের সঙ্গে দেখা করলুম। আমার ন-বছর বয়সে কুসুম আমায় কত গল্প বলত। এখন তার বয়স ষাট-এর কম নয়—গরীব, লোকের বাড়ির ঝি। সে চেহারাই আর নেই। ওর সে চেহারা আমার মনে আছে। মানুষের চেহারার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হয়।

তপুর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েচে, আজ দিন তিনেক আগে। তাকে দেখেছিলুম দু-বছরের ছেলে—এখন তার বয়েস তের-চৌদ্দ বছর। এ বছরটিতে পুরোনো আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হচ্চে।

আজ এ বছর গ্রীষ্মের ছুটির প্রথম দিন এখানকার। বাড়িতে কেউ নেই, পাড়া নির্জ্জন একমাত্র পাঁচী ও ন-দিদি আছে। বকুলতলায় দুপুরে অনেকক্ষণ বসে Valia, গল্পটি পড়ছিলুম। একটা দাঁড়াশ সাপ সুপুদের নারিকেল গাছটাতে উঠে পাখীর বাসায় পাখীর ছানা খুঁজচে। আর পাখীগুলো তাকে ঠুকরে কি বিরক্তই করচে। গঙ্গাহরি, তুলসী, হাজু সবাই আমার কাছে এল। দুপুরের পরে একটু ঘুমিয়েচি, নির্জ্জন মেঘমেদুর অপরাহ্ন, বাঁশবনের দিকে গরু চরচে, মেজ খুড়ীমার বাড়ীর দিক থেকে মেজ খুড়ীমার গলার সুর পাওয়া যাচ্চে। বাবার একটা শ্লোকের খানিকটা মনে এল ঘুমের ঘোরে। এত স্পষ্ট মনে এল যেন বাবার সঙ্গে বসে আমি কবিতা আবৃত্তি করচি বাল্যদিনের মত। কথাটি এই—'নীচৈস্তুর্বিরুচিঃ' এই টুকরোটুকু যেন উদ্ভট শ্লোকে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম। আমাদের ভিটের পিছনের বাঁশবাগানে গেলুম বেড়াতে ও আমগাছের ফল গুনতে। এখান থেকে বেলেডাঙ্গার মাঠ। কুঠীর মাঠের বাড়ির দু-ধারে বন কেটে উড়িয়ে দিয়েচে—সেই লতাবিতান, সেই ঝোপ-ঝাড় এবার কোথায় উড়ে গিয়েচে। দেশময়ই দেখচি এই অবজ্ঞা। বেলেডাঙ্গার পথের ধারে একটা কামারের দোকানে দশ-বারো জন লোকে বসে আছে—তার মধ্যে বিরাশি বছরের সেই হরমোতীও বসে আছে। বহুবছর আগের মোল্লাহাটী কুঠীর সাহেবদের গল্প করলে। পুলের ওপরে গিয়ে দাঁড়ালুম—এক ফকির সেখানে গোয়ালপাড়ার একটা মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করচে। আমায় আবার সে ভক্তি করে একটা বিড়ি খাওয়ালে। আমি তাকে একটা পয়সা দিলাম। হরমোতী এসে বললে—'বাবু, দুক্খের কথা বলব কি, আমার ছেলেডা বলে, তোমাকে আর ভাত দেব না! বিরাশি বছর বয়েস আমার, কোথায় এখন যাই আমি এই বৃদ্ধ বয়সে?'

সন্ধ্যাবেলা ন-দির সঙ্গে রেণুর গল্প করি। রাত্রে এখন ঢোল বাজচে, জিতেন কামারের বাড়ি নাকি মনসার ভাসান হচ্চে। একবার ভাবচি যাই, কিন্তু বাড়িতে আমি একা, তার ওপর আজ অমাবস্যার রাত—জিনিসটা-পত্রটা আছে, ফেলে রেখে ভরসা করে যেতে পারচি নে।

রোয়াকে বসে লিখচি ভারী আরামে, বকুলগাছে, কুলগাছে কত কি পাখী ডাকচে—বিল্বপুষ্পের মধুর গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে—দুটো বিড়ালছানা আমার মাদুরের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করচে, সামনের রাস্তা দিয়ে ছেলেরা আম পাড়তে যাচ্চে, জেলেরা মাছ নিয়ে যাচ্চে। একবার পটল যাচ্ছিল, আমি ডেকে বললুম—ও পটল উমা চলে গিয়েচে? পটল বড় লাজুক মেয়ে। পেয়ারাতলা পর্যন্ত এসে নিচুমুখে দাঁড়িয়ে বললে– দিদি ২৭শে জ্যৈষ্ঠ চলে গিয়েচে দাদা।

ছেলেবেলার সেই বুড়ো আকন্দ গাছটায় থোলো-থোলো ফুল ফুটেচে। পাখীর ডাক আর পুষ্পের সুবাসে মাতিয়ে রেখেচে।

বিকেলে হাটে গেলাম। এ বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম হাট। পথেই আফ্‌জলের সঙ্গে দেখা, সে হাটে পটল বেচতে যাচ্চে। তুঁততলার স্কুলের ভিটে দেখিয়ে বললে—দা-ঠাকুর, এখানে মোরা পড়িচি, কত আনন্দই করিচি এখেনে, মনে আছে?

তা আছে। তুঁততলার স্কুলের কথায় হাঁড়ি-বেচা মাস্টারের কথা উঠল, আর কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো, সে কথাও উঠল।

অনেকদিন পরে গোপালনগরের হাটে গিয়েচি। সেই আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটির পর আর আসি নি। সবাই ডাকে, সবাই বসতে বলে। মহেন্দ্র সেক্‌রার

দোকান থেকে আরম্ভ করে সবজির গোলা পর্য্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষী জিজ্ঞেস করে—কবে এলেন বাবু?

ওদের সকলকে যে কত ভালবাসি, কত ভালবাসি ওদের ওই সরল আত্মীয়তাটুকু, ওদের মুখের মিষ্ট আলাপ। যুগল বৈষ্ণব এসে আমার ছেলেবেলার গল্প করলে, আশু ঠাকুর এসে আমায় অনুযোগ করতে বসলো, আমি বিয়ে করচি না কেন এই বলে। ব্রজেন মাস্টার নতুন লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে গেল, মনু রায় তার বিড়ির দোকানে ডেকে নিয়ে বসিয়ে বিড়ি খাওয়ালে, যুগল ময়রা নতুন তৈরী দোকানঘরে বসিয়ে তামাক সেজে দিলে—এদের যত্ন—আত্মীয়তার ঋণ কখনো শুধতে পারবো না। গৌর কলুর দোকানে চা কিনতে গেলাম, সে আর আমায় কিছুতেই ছাড়তে চায় না। সেও আমার এক সহপাঠী, ওই তুঁততলার স্কুলে ১৩১০-১১ সালে তার সঙ্গেও পড়েচি। সে সেই কথা ওঠালে, আবার একবার হিসেব হোল কে কে আমাদের সঙ্গে পড়তো। এক বছর পরে দেশে যখন আসি, সবাই আমায় পেয়ে আবার সেই পুরানো কথাগুলো ঝালিয়ে নেয়।

এ বছরটা কলকাতায় বড় কর্ম্মব্যস্ত জীবন কাটিয়েছি। এই একটা মাস এদের সরল সাহচর্য্য, সুপ্রচুর গাছপালার সান্নিধ্য, নদী, মাঠ, বনের রূপবিলাস আমার সমস্ত ক্লান্তি, সমস্ত অবসাদ জুড়িয়ে দেয়। গত দেড় মাস রোজ রাত সাড়ে তিনটার সময় উঠে ইলেকট্রিক লাইট জেবলে খাতা দেখতে বসেচি, সেই কাজ শুরু করেচি আর রাত বারোটা পর্য্যন্ত চলেচে নানা কাজ, চাকরি, লেখা, পার্টি, টাকার তাগাদা, বক্তৃতা করা ও শোনা, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি দেখা করতে যাওয়া, আমার এখানে যাঁরা আসেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা—সমানে চলেচে। এদিকে শুয়েচি রাত সাড়ে বারোটা—আবার ওদিকে উঠেচি রাত সাড়ে তিনটাতে! এখানে এসে বেঁচেছি একটু মন ছড়িয়ে বিশ্রাম করে।

হাট থেকে এসে নদীর ধারের মাঠে বেড়াতে গিয়ে এই কথাই ভাবছিলুম। ঝির-ঝির করচে হাওয়া, সোঁদালি ফুল ফুটেচে নদীর ধারে। কোকিল ডাকচে—বেলা পড়ে গিয়েচে একেবারে—কি সুন্দর যে লাগছিল। আর উঠতে ইচ্ছে যায় না নদীর ধার থেকে, কি অদ্ভুত শান্তি!

এখন বসে লিখচি, অনেক রাত হয়েচে! বাঁশজঙ্গলের মাথায় বিশাল বৃশ্চিক রাশি অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে জ্বল্‌জ্বল্‌ করচে। অনেক দূরে একটা কি পাখী একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে একঘেয়ে কু-স্বর করে ডাকচে। নায়েব-বাড়ির দিকে একপাল কুকুর অকারণে ঘেউ ঘেউ করচে।

আজ সকালে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর গেলুম সকালের গাড়িতে। অনেক জায়গায় গেলুম, কারণ বাবার সঙ্গে সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিলুম, আজ সাতাশ বছর আগে। আবার সেই রাজবাড়ির ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হোল জীবনের যে সব স্মরণীয় ঘটনা ঘটেচে এর পরে। সেই ব্রাহ্মসমাজ, সেই A. V. School, সেই লীলা-দিদিদের বাড়ী। লীলাদির সঙ্গে দেখা হোল না।

বিকেলে আজ সইমাদের বাড়ি বেড়াতে গেলাম। বাণীকে দেখলুম অনেকদিন পরে, সে এত মোটা হয়েচে যে তাকে চিনতে পারা যায় না। তার দুটি সতীনঝিও এসেচে, ছেলেমানুষ—কিন্তু একজন আবার ওদের মধ্যে বিধবা। আমাদের দেশে বিধবা হবার যে কি কষ্ট অন্নপূর্ণার মুখে, ধীরেনের খুড়তুত বোনের গল্প শুনে বুঝতে পারি।

তারপর গেলুম কুঠীর মাঠে বেড়াতে। যেতে যেতে দেখি নদীর ধারে মাধবপুরের চরের গাছপালার গায়ে মেঘে চাপা হল্‌দে রোদ পড়েচে—তার নিছক সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ, অভিভূত করলে। বেলা সাড়ে ছ-টা হবে, সন্ধ্যার দেরি নেই, সেই শান্ত গ্রীষ্মের অপরাহ্ণে উষ্ণমণ্ডলের বনপ্রকৃতি, সূর্য্য, আকাশ, নদী, মাঠ, তার সমস্ত ইন্দ্রজাল, সমস্ত রূপ-বিভব আমার চোখের সামনে মেলে ধরেচে। শুধু শিমুল গাছের ডাল-গুলোর আঁকা-বাঁকা সৌন্দর্য্যময় রূপ, মেঘপর্ব্বতের পাশ দিয়ে বলাকা সারির ভেসে যাওয়া, শুধুই বনফুলের দেবলোকের দুলুনি, আর বন্যপাখীর গান। কতবার দেখেচি, আজ বত্রিশ বছর ধরে দেখে আসচি। কিন্তু এরা কখনো পুরোনো হোলো না আমার কাছে। কখনও যেন হয়ও না, এই প্রার্থনা করি, এদের আসন যেন মৃত্যুঞ্জয় হয় আমার জীবনে।

অতি ভয়ানক দুর্য্যোগ, ভয়ানক বর্ষা। আজ ক-দিন চলেচে এমন। খানা ডোবা সব ভর্ত্তি, জল থৈ থৈ করচে। এমন ভয়ানক বর্ষা জ্যৈষ্ঠমাসে দেখেছিলুম কেবল সেইবার, যেবার কলকাতা থেকে আবার ফিরে গেলুম বেলাদের তত্ত্ব নিয়ে, যেবার খুকুর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, ১৯৩২ সালে। তারপর কত পরিবর্ত্তনই না হয়ে গেল জীবনে! ১৯৩২ সালের সেই সময়ের এবং ১৯৩৬ সালের এই আমিতে বহু তফাৎ হয়ে গিয়েচে।

বিলবিলের ডোবাতে ব্যাঙ্‌ ডাক্‌চে। বুধো, কেতো এরা এই ভয়ানক দুর্য্যোগ অগ্রাহ্য করে ভিজতে ভিজতে আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে। সাবি ওদের বাড়ি থেকে বিড়ি নিয়ে এল আমার জন্যে, কারণ ওবেলা ওর ভাইকে বলেছিলুম এনে দিতে। মনোরমা আবার দুটো কলমের আম এনেছিল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করলে। আমি পাঁচীর বাড়ি গেলুম মাংসের ভাগ নিতে, কারণ ওখানে পাঁঠা কাটা হয়েচে সকালে। পাঁচী চা করে দিলে, শম্ভুর অসুখের জন্যে অনেক দুঃখ করলে।

সবাই ওকে ঘৃণা করে আমাদের গাঁয়ে। কিন্তু আমি দেখি ও ঘৃণার পাত্রী নয়, অনুকম্পার পাত্রী। বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল, তখন ওর বয়েস ছিল মোটে তের বছর—কি বা বুঝত বিয়ের? সে স্বামী মারা গেল, তখন ওর বয়েস বছর পনেরো। ওদের ওই গরীব সংসার, ভাইগুলো অপদার্থ, কেউ এক পয়সা রোজগার করে না। ভাইয়ের ছেলেমেয়েগুলো একবেলা খায়, একবেলা খায় না। ওদের এই দুঃখ ঘুচোতে ও এই কাজ করেচে কিনা তাই বা কে জানে? কারণ হরিপদ দাদার টাকা আছে সবাই জানে। ও আজ কাঁদতে কাঁদতে সে কথার কিছু আভাস দিলে। এই ব্যাপারের পর ওর সঙ্গে এই প্রথম আমি দেখা করলাম,—যতটা খারাপ লোকে ওকে মনে করে, আমি ততটা ভাবতে পারলাম না। তবে একটা কথা ঠিকই যে, সমাজের পক্ষে এই আদর্শটা বড় খারাপ। গ্রামের বাইরে গিয়ে যা খুশি কর বাপু, গ্রামের মধ্যে কেন? গৃহধর্ম্মের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে লাভ কি?

আবার সজোরে বৃষ্টি এল।

তারপর বেলা পাঁচটা থেকে কি ভীষণ ঝড় উপস্থিত হোল! গাছপালায় বেধে ক্রমবর্দ্ধমান ঝটিকার সে কি ভীষণ শব্দ! আমি ভাবলাম যে রকম কাণ্ড, একটা সাইক্লোন না হয়ে আর যায় না। গতিক সেই রকমই দেখাতে লাগল বটে। সন্ধ্যার আগে এমন ভয়ানক বাড়ল যে আমি আর ঘরে থাকতে না পেরে বাঁশবনের পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম নদীর দিকে। দেখব ঝড়ের দৃশ্যটা। আমাদের বাড়ি যেতে বড় একটা বাঁশ পড়েচে—পাড়ার শ্যামাচরণ দাদাদের বাগানেও বড় বাঁশ পড়েচে। গাছপালা,

বাঁশবনে ঝড়ের কি শব্দ—আর সে কি দৃশ্য! প্রত্যেক গাছতলায় আম পড়ে তলা বিছিয়ে আছে ঠিক যেন পিটুলি ফলের মত, কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারে আর এই ভয়ানক দুর্য্যোগ মাথায় জনপ্রাণী বাড়ির বার হয় নি। আমি যা পারলাম কুড়িয়ে নিলাম কিন্তু কোন পাত্র সঙ্গে আনি নি, আম রাখি কিসে? মাঠের মধ্যে নদীর ধারে গিয়ে আর অগ্রসর হতে পারি নে। যে-দিকে যাব, সে-দিক থেকেই ঝড় উড়িয়ে আনছে বৃষ্টির ধারা, ঠিক যেন বন্দুকের ছর্রার বেগে। ধোঁয়ার মত বৃষ্টির ঢেউ উড়ে চলেচে। গাছপালা মাটিতে লুটিয়ে-লুটিয়ে পড়েচে। ঝড়ের শব্দে কান পাতা যায় না। সে দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করল। অনেকদিন প্রকৃতির এ রূপ দেখি নি, কেবল শান্ত সুন্দর রূপই দেখে আসচি।

তারপর মনে হোল আমিই বা কম কি? এই ঝড়ের বেগ আমার নিজের মধ্যে আছে। আমি একদিন উড়ে যাব মুক্তপক্ষে ওই বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জের পাশ দিয়ে, ওই বিষম ঝটিকা ঝঞ্ঝাকে তুচ্ছ করে ওদের চেয়েও বহু গুণ বেগে। আমি সামান্য হয়ে আছি—তাই সামান্য।

এই কথাটা যখন ভাবি, তখন আমার মধ্যে যেন কেমন একটা নতুন শক্তির হয়। সে শক্তি কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, সেখানেই শেষ।

কাল সুপ্রভার চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়ে আজ সকালে বাগান-গাঁয়ে পিসিমার বাড়ি যাব বলে বেরিয়ে পড়েচি। আজ দিনটা সকাল থেকে মেঘ ও বৃষ্টি, পথ হাঁটার পক্ষে উপযুক্ত দিন, রোদ নেই, অথচ বৃষ্টি খুব বেশীও হচ্চে না। ঠান্ডা জোলো হাওয়া বইচে মাঝে মাঝে। কুঠীর মাঠে আসতেই আমাদের ঘাটের পথে শুয়োখালী আমগাছে অনেকগুলো আম পড়ল ঢুব্‌ঢাব্‌ করে। গোটাকতক আম কুড়িয়ে পথের ধারে বসেই খেলাম। কারণ যেতে হবে প্রায় তের-চৌদ্দ মাইল পথ, কখন গিয়ে পৌঁছুব তার নেই ঠিকানা। কুঠীর মাঠ দিয়ে, বৃষ্টি-ধোয়া বনঝোপের মধ্যে দিয়ে আসতে আসতে কি আনন্দই পেলাম। পথ হাঁটতে আমার বড় আনন্দ। এই যে বাড়ি থেকে বেরিয়েচি, পথে পথে অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানের উদ্দেশ্যে চলেচি, এতেই আমার আনন্দ। কাঁচি-কাটার পুল পার হয়ে একটা লতা-ঝোপওয়ালা সুন্দর বাবলা গাছ ভেঙে পড়েচে রাস্তার ওপরে, এ রকম সুন্দর গাছ ভাঙলে আমার বড় কষ্ট হয়। বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছের ঘন ছায়া, পথের দু-ধারে বুনো খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর দুলচে, 'বউ-কথা-কও' পাখী ডাকচে—বাংলা দেশের রূপ যদি কেউ দেখতে চায়, তবে এই সব গ্রাম্য পথে যেন প্রথম বর্ষার দিনে পায়ে হেঁটে বহুদূর গ্রামের উদ্দেশ্যে যায়, তবেই সে বাংলাকে চিনবে, পাখী আর বনসম্পদ, তার পুষ্প-রাজি, তার মেয়েদের দেখবে, চিনবে, ভালও বাসবে। আমি এই নেশাতেই প্রতি বৎসর এই সময় বেরিয়ে পড়ি।

বাগানগাঁয়ের পথে বড় একটা বট গাছের তলায় বসে লিখচি। চারি ধারে মাঠ, বৃষ্টি পড়চে ঝর ঝর করে, বেলা কত হয়েচে মেঘে আন্দাজ করা যায় না, জোলো হাওয়ায় আউশের ভূঁই থেকে ধানের কচিজাওলার মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসচে, বট গাছের ডালে কত কি পাখী ডাকচে, মাঠের মধ্যে অসংখ্য খেজুর গাছ। চাষীরা ক্ষেতে নিড়েন দিচ্চে, তামাক খাচ্চে, নীল মেঘের কোলে বক উড়চে।

কাঁচিকাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। তার বয়েস ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁট্‌লা, কাঁধে ছাতি। আমি বললুম—কোথায় যাবে হে? সে বললে—আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা

যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোঁসাইপাড়া।

লোকটা বললে—একটা বিড়ি খান দাদাবাবু।

বেশ লোকটা। ও রকম লোক আমার ভাল লাগে। সহজ সরল মানুষ, এমন সব কথা বলে যা আমি সাধারণতঃ শুনি নে।

সুন্দরপুরে আসতে প্রমথ ঘোষ সাইকেল চেপে কোথায় যাচ্চে দেখলুম। আমি আর আমার সঙ্গী দু-জনে মোল্লাহাটির খেয়াঘাটে পার হই। সুন্দর মেঘাচ্ছন্ন সকাল বেলা, নদীজল শান্ত, ওখানে সবুজ কষাড় বন। খেয়া পার হয়ে কেউটে পাড়া, মড়িঘাটা ছাড়িয়ে আমরা গোবরাপুর এলুম। আর বছর বাজারের যে দোকানে তামাক খেয়েছিলুম সেখানে আমরা তামাক খাবার জন্যে বসতে গিয়ে দেখি গোবরাপুরের জজ্‌বাবুর সেজছেলে মল্লিনাথ বসে আছে। সে আমাকে দেখে টানাটানি করতে লাগল তাদের বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। অন্ততঃ চা খেয়েও যেন যাই। তার দাদা রামকৃষ্ণ-মিশনের সন্ন্যাসী, অনেকদিন পরে বাড়ি এসেচেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তিনি নাকি আমার বই-এর খুব অনুরাগী ইত্যাদি বলে বাড়ি নিয়ে গেল। আমার সঙ্গীকেও সে নিমন্ত্রণ করলে। ওদের মস্ত বড় বাড়ি, আর কত যে ছেলে মেয়ে! সব ভাইগুলি বড় চাকরি করে বিদেশে, এবার বাড়িতে ওদের সন্ন্যাসী ভাই এসে রামকৃষ্ণ-উৎসব করচেন সেই উপলক্ষে সবাই এসেচে। ওপরের ঘরে মেয়েরা গান গাইচে, বাইরের বৈঠকখানায় ছেলেরা তাস খেলচে—হৈ হৈ কাণ্ড। আমরা চা খাবার খেয়ে ভদ্রতা বজায় রাখার উপযুক্ত একটু গল্পগুজব করে তখনি আবার পথে বার হলুম। পথে বার হয়ে কোথাও একদণ্ডও থাকতে আমার ভালো লাগে না। আমার সঙ্গীটি যাবে পাশেরই গ্রামে তার জামাই-বাড়িতে। ওরা আচার্য্যি বামুন, এতক্ষণ নিজের মেয়ের ভাসুরের কথা বলতে বলতে আসছিল। সেই ব্যক্তিটি ঘরে খুব সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ছেলে না হওয়ার অজুহাতে, আজ দু-মাস হোল পুনরায় দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করেচে। সেই গল্প সে আমাকে নানাভাবে শোনাচ্ছিল। হঠাৎ জজ্‌বাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে আমার ওপর অত্যন্ত ভক্তিমান হয়ে উঠল। জজ্‌বাবুদের বাড়িতে আমার আদর-যত্ন দেখেই বোধ হয় ওর মনের ভাবের এ পরিবর্ত্তনটুকু হোল। বললে, দাদাবাবু, আপনাকে এতক্ষণ চিনতে তো পারি নি। আপনি মাথা থেকে বের করে এমন একখানা বই লিখেচেন যার অত বড় দামী দামী লোকে এত সুখ্যাতি করলেন, তখন তো আপনি সাধারণ মানুষ নন।

সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধায় তার সুর গদ্‌গদ হয়ে উঠেচে, তারপর বললে, তবে বাবু যদি অনুমতি করেন, আমিও নিজের পরিচয়টা দিই। এতক্ষণ দিই নি, কারণ বিদেশে, পথঘাটে, নিজের পরিচয় না দেওয়াই ভাল। দিয়ে কি হবে? আমার নাম নদে শান্তিপুর থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্য্যন্ত সবাই জানে, আপনার শ্রীগুরুর চরণকৃপায়, হেঁ হেঁ। কৌতূহলের সহিত ওর মুখের দিকে চাইলুম। কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষের সঙ্গে এতক্ষণ আমার ভ্রমণ করবার সৌভাগ্য ঘটেচে না জানি।

লোকটা বললে—আমার নাম, দাদাবাবু, হাজারী পরটা।

আমি অবাক হয়ে বললুম—হাজারী—?

—আজ্ঞে, হাজারী পরটা।

—হাজারী পরটা?

—আজ্ঞে, সেই আমিই এই অধীন।

বলে সে আমার মুখের ভাব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবার জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ হয় আমার বিস্ময়কে পূর্ণ বিকাশের সময় দেওয়ার জন্যে। কিন্তু

আমি তখনও সেই অবাক ভাবে চেয়ে আছি দেখে বললে, দাদাবাবু যদিও আমরা ভট্চায্যি কিন্তু আমার উপাধি পরটা। মানে এমন পরটা আর কেউ তৈরী করতে পারতো না নদে-শান্তিপুরের মধ্যে। পাঁচ সের ওজনের একখানা খাস্তা পরটা—যেখানে ধরুন খসে আসবে। আমার দোকান ছিল গ্রাম চাঁদপাড়ায়, দৈনিক দশ-বারো টাকা বিক্রি, পরটা, লুচি, আলুর দম, ডিম, মাংস। আমার দোকানে যে একবার খেয়েচে দাদাবাবু, সে আপনাদের বাপ-মার আশীর্বাদে কখনো ভুলতো না। কলকাতা পর্য্যন্ত আমার নাম-ডাক। খ্যাঁদা মিত্তিরের বাড়ি রশুই করেচি এক হাতা-বেড়ীতে পাঁচ বছর।

তার গল্প তখনও ভাল করে শেষ হয় নি. একজন ডেকে বললে.—এই যে, বেয়াই মশাই যে। আসুন আসুন, কি সৌভাগ্য আমার। নমস্কার, নমস্কার।

হাজারী পরটা স্মিতহাস্যে বললে—নমস্কার। তা আপনারা তো খোঁজ করবেন না, মেয়েটা আছে পড়ে, বলি এই একবার—আচ্ছা দাদাবাবু, আসুন একটু পায়ের ধুলো নিই।

বলেই লোকটা ঝুঁকে পড়ে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে বসলো। তারপর তার বেয়াই-এর দিকে চেয়ে বললে—দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েই বুঝেচি উনি মহৎ লোক। ওঁর সঙ্গে জজ্‌বাবুর বাড়িতে গিয়ে খাসা আম, উৎকৃষ্ট সন্দেশ, চা কত কি খেলাম। কি আদর সেখানে ওঁর। শুনেই তার বেয়াই আমায় বিনীত ভাবে অনুরোধ করতে লাগলো, সেখানে দুপুরে থাকবার জন্যে। ভাবলে, জজ্‌বাবুরা যখন খাতির করেচে, তখন আমিই কোন্ ডেপুটী কি অন্ততঃপক্ষে একজন পুলিসের দারোগা না হব? আমি আমার অক্ষমতা জানিয়ে বিদায় নিলাম। তারা সকলে যতক্ষণ আমাকে দেখতে পায়, আমার দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এবং আমার সম্বন্ধে কি সব কথা বলাবলি করতে লাগলো।

আমি বেরিয়ে এসে মাঠে পড়লুম। দু-ধারে আউশ ধানের ক্ষেত। একটা বৃহৎ জিউলি গাছের তলায় যখন পৌঁছেচি, তখন জোর বৃষ্টি আসাতে গাছের নিচে বসলুম। মাটি ভিজে গিয়েচে, আর প্রকাণ্ড ডালগুলোর সর্ব্বত্রই আঠার ঝুরি ঝুলছে —অথচ কাল সুপ্রভার চিঠি আঁটবার জন্যে বারাকপুরে একটু জিউলির আঠা খুঁজে পাই নি।

কি সুন্দর লাগছিল উন্মুক্ত মাঠের হাওয়া, দু-ধারে সবুজ ধানের ক্ষেত, বর্ষাস্নাত গাছপালার ঝোপঝাড়। একটা প্রকাণ্ড বটগাছ মাঠের মধ্যে, তার তলায় অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করলুম বৃষ্টি না থামা পর্য্যন্ত। ট্যাঙ্‌রা সুন্দরপুর, কমলাপুর প্রভৃতি গ্রাম পার হয়ে একটা সুন্দর জলাশয়ের তীরে এক প্রকাণ্ড বট গাছের তলায় কলের গান হচ্চে দেখে সেখানে গেলাম। অনেক গ্রাম্য লোক জড় হয়েচে। গ্রামবধূরা ওপারের ঘাট থেকে গান শুনচে। জন-দুই পথ-চলতি লোক কলের গান নিয়ে যেতে যেতে এখানে বট গাছের তলায় শ্রান্তি দূর করবার জন্যে বসে কল বাজাচ্চে। আমিও গিয়ে দুটো রেকর্ড বাজাতে বললুম। তারা আমায় খাতির করে বসালে, বিড়ি খেতে দিলে, রেকর্ডের বাক্স এগিয়ে দিয়ে বললে.—বলুন বাবু, কোন্ গান আপনার পছন্দ!

সামনের জলাশয়টা শুনলাম জাম্‌দার বাঁওড়ের আগড়। কি সুন্দর যে তার দৃশ্য সেই বটতলা থেকে! বাঁওড় অর্থাৎ মজা নদী। তার ওপারে যতদূর দৃষ্টি যায় বড় বড় নিবিড় বাঁশবন জলের ওপর ঝুঁকে পড়েচে—পদ্মফুল আর পদ্মপাতায় জল দেখা যায় না, আরও ওদিকে শেওলা দাম বেধে গিয়েচে। আমি গান শুনতে

শুনতে সেই দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি। মনে একটা অপূর্ব্ব মুক্তির সুখ। বেলা সাড়ে দশটা কি এগারটা,—কলকাতা হলে এতক্ষণ ছুটতে হোত স্কুলে। রুটিন বাঁধা জীবন স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে এই সুন্দর পল্লীগ্রামের পদ্মফুলে ভরা জলাশয়ের তীরে প্রাচীন বটতলায় বসে।

পিসিমার বাড়ি বেলা একটার সময় এসে পেঁছে দেখি পিসিমা খেতে বসেচেন। আমিও স্নান করে এসে খেয়ে নিয়ে একটু বিশ্রাম করলুম। পিসিমার ঘরটাতে কেমন একটা পুরানো পুরানো গন্ধ পাওয়া যায়। ১৩০০ সালের পরে আর এঘরে নতুন পাঁজি আসে নি (১৩০০ সালে পিসেমহাশয় মারা গিয়েছিলেন)। সেকালের গন্ধে, সেকালের আবহাওয়ায় ঘরটা ভর্ত্তি। কড়ির আলনা, সেকালের কাঁথা, কড়ির চুবড়ি, কাঁঠাল কাঠের সিন্দুক, গড়ুর মূর্ত্তি বসানো পেতলের ঘণ্টা, বেতের প্যাঁট্‌রা—যে সব জিনিস একালে কোনও বাড়িতে দেখা যায় না। একখানা কাশীদাসী মহাভারত আছে ১২৭৬ সালে ছাপা। অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে সেই সব প্রাচীন দিনের বাতাসে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিলাম, কত পুরোনো দিনের কথা মনে হয়,...যেদিন মেনকা পিসিমা আমার বাল্যে বাবার ওপর রাগ করে এখানে চলে এসেছিলেন,...বাবা এসে একবার কথকতা করেছিলেন।

বিকেলে হাটতলায় এক ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হোল। ডাক্তারটি অত্যন্ত দুরবস্থাগ্রস্ত। একটা বাঁশের মাচায় মলিন শয্যা, একখানা ভাঙা টেবিল, গোটা বিশ-পঁচিশ শিশি, অন্যদিকে আর একটা মাচাতে এক বস্তা তামাক। একটুখানি বসবার পরই তিনি নিজের দুঃখের কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন। আজ চার মাস থেকে এখানে এক পয়সা রোজগার নেই। হাটখোলার মুজিবর মিঞার দোকানে চালডাল ধার নিয়ে আজ চার-পাঁচ মাস চলচে। এদিকে বাড়িতে মেয়ের বিয়ের দিন স্থির হয়েছিল চৌঠো জ্যৈষ্ঠ। টাকা যোগাড় না করতে পারায় বিয়ে ওদিনে হয়নি। তারপর বললেন—দেখুন এখানে একঘর বামুন আছে, বেশ বড় গাঁতিদার, তাদের বাড়ির এক বৌ আজ চার মাস শয্যাগত, তা মশায় একবার ডাকে না। বলে ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়ে কি হবে, আমরা ফকির দেখাচ্চি।

হাটখোলার এক দোকানে এক মৌলবী সাহেব আমাদের ডাকাডাকি করলেন বলে গেলাম,—এখানকার মক্তবে তিনি নতুন মৌলবী হিসেবে এসেচেন। মাসে বারোটা টাকা পাবেন, হাটখোলাতে একটা মুসলমানদের দরগা ঘর আছে, সেইখানেই আপাততঃ থাকবেন। তাঁর মুখে মধুবাবু সাব-ইনস্পেক্টরের গল্প শুনলাম। মধুবাবু আমাদের কালে, আমরা যে পাঠশালায় পড়তাম, সেখানে গিয়ে আমায় একবার 'গ্রন্থ' বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন। সে ১৯০৫ সালের কথা হবে।

সন্ধ্যার পরেই বৃষ্টি এল। আমি হাটখোলা থেকে চলে এলাম। রাত্রে একটা গোয়ালার ছেলে অনেক গল্পগুজব করলে।

সকালে স্নান করে পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে পাটশিমুলে মোহিনী কাকার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রওনা হোলাম। আজ খুব রোদ উঠবে, আকাশ নীল, সকালের হাওয়ায় বিলের জল আর ধানের জাওলার গন্ধ। হাটখোলার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করে মাঠের পথে হাঁটি। এদেশে যেখানে সেখানে আমগাছের তলায়, পিটুলি ফলের মত, দিব্যি বড় বড় রাঙা রাঙা আম তলা বিছিয়ে পড়ে রয়েচে, কেউ কুড়োয় না দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—তোমাদের এখানে আম কুড়োয় না কেন? সে বললে—বাবু, এখানে একপয়সা আমের পণ বিক্রি হয়—এত আম এখানে। কে কত খাবে! পাটশিমুলে ঢুকতেই একপাশে একটা বড় বন, একটা উঁচু শিমুল গাছ বনের মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—তার ডালে পাতা

মুড়ে পিঁপড়ে বাসা বেঁধেছে। দৃশ্যটা দেখে আমার মনে হোল এই সব সত্যিকার বাংলার বনের দৃশ্য, ট্রপিক্যাল বনানীর দৃশ্য না দেখলে বাংলাকে চিনব কি করে? শহরের লোকের শহরেই জন্ম, শহরেই বিবাহ, শহরেই মৃত্যু—তারা সত্যিকার বাংলার রূপ কখনও দেখে? যে বাংলার মাটির বৈষ্ণব কবিতা, গ্রাম্য সংগীত, ভাটিয়ালি গান, কীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পাঁচালি, কবি—এরা সে বাংলাকে কখনও দেখলে না। যে-বাংলার শিল্প কাঁথা, শীতলপাটী, মাদুর, কড়ির আলনা, কড়ির চুবড়ি, খাগড়াই পিতল-কাঁসার জিনিস—সে বাংলাকে এরা কখনও জানলে না। অথচ সমস্ত জাতিটার যোগ রয়েচে যার সঙ্গে—আর সে কি গভীর যোগ রয়েচে, তা এই পল্লীপথে পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আমি খুব ভাল বুঝতে পারচি।

পাটশিমুলে ঢুকে একটা ক্ষুদে জাম গাছতলায় শিকড়ের গায়ে বসে এই কথা কটা লিখচি, চারিধারে পাটশিমুলের বন। আমাদের মনে হয় সমগ্র বাংলা দেশের মধ্যে যদি কোথাও বন জঙ্গল ও বাঁশবনকে যথেচ্ছ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হত—তবে এই ধরনের নিবিড়, দুর্ভেদ্য বনানীর সৃষ্টি হোত দেশে। এর প্রকৃতি মালয় উপদ্বীপের বা সুমাত্রা, যবদ্বীপের ট্রপিক্যাল (Rain forest)-এর সমান না গেলেও বিহার, সাঁওতাল পরগণা বা মধ্যভারতের অরণ্যের চেয়ে স্বতন্ত্র। ট্রপিক্যাল রেন্ ফরেস্টের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে লতা জাতীয় উদ্ভিদের প্রাদুর্ভাবে। এত নানা আকারের লতার প্রাচুর্য্য শুধু উষ্ণমণ্ডলের বনানীর নিজস্ব সম্পদ। এই জন্যে এই সব বনের রূপ স্বতন্ত্র। এত বুশ আণ্ডারগ্রোথ্ (Bush undergrowth)-ও নেই সিংহভূম বা মধ্যভারতের বনে। অল্প জায়গার মধ্যে এত বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমাবেশও সে সব বনে নেই।

মোহিনী কাকাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে দেখছিলুম—সামনের বৃষ্টিবিধৌত বনপত্র-সম্ভারের শোভা, নির্ম্মল নীল আকাশে, সেই আকাশ অনেকদিন পরে মেঘশূন্য, আশ্চর্য্য মরকত-শ্যাম পত্রপুঞ্জের ওপর ঝলমলে পরিপূর্ণ সূর্য্যালোক। চণ্ডী-মণ্ডপের উঠোনে একটা তরুণ নারকোল বৃক্ষের শাখাপত্রের স্পন্দন বড় ভাল লাগচে। প্রাচীন কালের ছোট ইঁটের ভাঙা বাড়ি, ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপ, ছাদভাঙা পূজোর দালান পূর্ব্বেকার সম্পন্ন গৃহস্থের বর্ত্তমান শ্রীহীনতার সুপরিচিত চিহ্ন চারিদিকে।

দুপুরের একটু পরেই পাটশিমুলে থেকে বার হই। দুধারে প্রকাণ্ড বাঁশঝাড়, আরবছরে দেখা সেই কালীবাড়ির বাঁশঝাড়টা। বাঁশ না কাটলে কি ভাবে বাড়তে পারে তা কালীবাড়ির বাঁশঝাড় না দেখলে বোঝা যাবে না। বাঁশের দুর্ভেদ্য জঙ্গল। এ বাঁশ কালীপূজোর দিন ভিন্ন এবং ঠাকুরের প্রয়োজন ভিন্ন কেউ কাটতে পারে না, এ গ্রামের এই রীতি। এ গ্রামেও সর্ব্বত্র আম গাছের তলায় যথেষ্ট আম পড়ে আছে, কেউ কুড়োয় না।

মাঠে পড়লুম, অতি ভীষণ রৌদ্র আজ, তবু একটু হাওয়া আছে তাই ঠাণ্ডা। রাস্তায় এসে ছায়া পাওয়া গেল, কিন্তু দুধারে যেমনি জঙ্গল, তেমনি মশা। এক জায়গায় একটা লাল টুকটুকে আম কুড়ুতে একটুখানি দাঁড়িয়েচি, অমনি মশাতে একে-বারে ছেঁকে ধরেচে। সাঁড়াপোতার বাজার ছাড়িয়ে কল্যকার সঙ্গী সেই হাজারী পর-টার বেয়াই বাড়ি গেলুম। হাজারী পরটা বাইরে বসে তামাক খাচ্ছিল, আমায় দেখে লাফিয়ে উঠল, 'আসুন, দাদাবাবু, মহা সৌভাগ্য যে আপনি এলেন, এঃ, মুখ যে লাল হয়ে গিয়েচে রোদে—(মুখ লাল হওয়ার যদিও আমার কোনো উপায় নেই, আমার কালো রং-এ) আসুন, বসুন। তারপর সে নিজেই একখানা পাখা নিয়ে এল ছুটে। বাতাস দিতে আরম্ভ করলে নিজেই, তার বেয়াইকে ডেকে নিয়ে এল, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে—মহা খাতির। অনেকক্ষণ—প্রায় ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে গল্প

করে সেখান থেকে বার হই। ওরা আবার একটু জলযোগ করালে, কিছুতেই ছাড়লে না। আবার রাত্রেও থাকতে বললে। আমি অবিশ্যি তাদের সে অনুরোধ রাখতে পারলাম না। গোবরাপুরের বাজারের কাছে এসে দেখি মণীন্দ্র চাটুয্যে যাচ্ছেন। মণীন্দ্রবাবু প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি, নাম বলতে চিনতে পারলেন, বললেন—চল আমার বাড়ি। আমি বললুম—বাড়ি গিয়ে তো থাকতে পারব না, সুতরাং গিয়ে কোন লাভ নেই। আপনি কেমন আছেন, বলুন। তারপর দু-জনে পথে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। মণীন্দ্রবাবু এ অঞ্চলের মধ্যে একজন মানুষের মত মানুষ। অমন উদারহৃদয় পরোপকারী, সদাশয় বৃদ্ধ এ সব দেশে নেই। আমি ওঁর কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী। সে কথা এখানে আর ওঠাতে চাই নে। তিনিও সে বিষয়ের কোন উল্লেখ করলেন না। বললুম, শনিবারে আসতেই হবে আমাদের এখানে উপেন ভট্চাজের মেয়ের বিয়েতে, সেদিন আবার কথাবার্ত্তা হবে। আজ আসি।

আর কোথাও দাঁড়ালুম না। সূর্য্য হেলে পড়েচে। রোদ নিস্তেজ হয়ে আসচে। আমায় যেতে হবে এখনও সাত মাইল পথ।

কেউটে পাড়ার পথে এক বুড়ী জিজ্ঞেস করলে—বাবু, এত রোদে বেরিয়েচ কেন?

বললুম—যাব অনেকদূর পথ।

বুড়ীটি টিকে বেচতে যাচ্চে গোবরাপুরের বাজারে। মোল্লাহাটির খেয়া যখন পার হই, তখন সূর্য্য হেলে পড়েচে। মোল্লাহাটির হাট বসেচে, আজ আর-বছরের মত হাটে গেলুম। খুব আমের আমদানি। বেলা গিয়েচে দেখে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলুম না। মোল্লাহাটি থেকে খাবরাপোতা পর্য্যন্ত আসতে রোদটুকু একেবারেই গেল। কিন্তু পথের পাশের আরামডাঙার খড়ের মাঠের দৃশ্য দেখে মনে হোল, আমাদের এ অঞ্চলটি সুন্দর বেশী। এত নদী বাঁওড়ের সমাবেশ অন্যত্র নেই।

আইনদ্দি মণ্ডলের বাড়ির পিছনে সেই বাঁকে এসে খানিকটা বসে বিশ্রাম করি। এই জায়গাটা বড় ভাল লাগে আমার। মরাগাঙ্ চক্রবত্তে ঘুরে গিয়েচে, বাঁশবনের শীর্ষ অপরাহ্নের ছায়ায় আর নীল আকাশের তলায় বেশ দেখাচ্চে। পুল পার হয়ে এসে দেখি গঙ্গাচরণের দোকানে তালা, দোকান নাকি উঠে গিয়েচে স্টেশনের ধারে। কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি পৌঁছই। খুদুরা আসে নি, আসবার কথা ছিল কাল। ঊষার চিঠি এসেচে, দেখি খাটের ওপরে পড়ে আছে। চার বছর পরে ওর খবর পেলাম।

আবার বৃষ্টি নামল, খুব ঠাণ্ডা পড়ল কিন্তু কি জানি সারারাত আমার ভাল ঘুম হোল না। শেষ রাত্রের দিকে একটু ঘুম এল।

এসেই ঊষার চিঠি পেলুম, আর একখানা হাওড়ার রমেন ভট্টাচার্য্যের। তার পত্রখানার উত্তর দিতে হবে। ঊষা এসেচে কলকাতায় বহুদিন পরে, এর মধ্যে একদিন গিয়ে দেখা করতে হবে।

একটা শিমূল গাছের গুঁড়িতে বসে কত কথা ভাবলুম। বাল্যে ওই সব বাদলার দিনে কেমন নৌকো বেয়ে একা বেড়াতুম, ওদিকে চালতেপোতার বাঁক চটকা তলার খালের নাম রেখেছিলুম Oysterbrook (অস্টারব্রুক)—তখন সমুদ্রভ্রমণের নানা বই পড়তুম, সর্ব্বদা সেই স্বপ্ন দেখতুম। সেই সমুদ্র ও আমাদের এই ছোট্ট ইছামতী, তার জল একই কালো জল। সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল মাধবপুরের নির্জ্জন চরের একটা অতি সুন্দর তরুণ সাঁই-বাবলা গাছের মাথায়। কত অদ্ভুত চিন্তা মনে আসে তারা-

টার দিকে চেয়ে!

বড় ভাল লাগে এই দূরবিসর্পিত আউস ধানের ক্ষেত, বাঁশঝাড়ের সারি—বসে বসে এই সুখদুঃখময় ভাবনা। কলকাতায় ফিরে এসব দিনের কথা বড় মনে হবে। এর মধ্যে একটা আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি আছে, কলকাতায় মন থাকে উপবাসী প্রকৃতির উপভোগের দিক থেকে, এখানে দুদিন এসে বাঁচি।

তবুও তো এবার রোদ না ওঠার জন্যে ছুটির শেষের দিকটা মন বড় ভাল নয়। নীল আকাশ দেখা এবার ভাগ্যে বড় একটা জুটবে না।

মুসলমান মাস্টারটি এল। দু-জনে গিয়ে পাঠশালার পেছনে মরাগাঙের ধারে বসব, এমন সময়ে এল ঝোড়ো কালো মেঘের রাশি, বারাকপুরের দিক থেকে উড়ে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ বর্ষার বৃষ্টি।

দৌড়, দৌড়, সবাই মিলে ছুটে গিয়ে পাঠশালার ঘরে আশ্রয় নিলুম। সেখানে বসে ও অম্বিকাপুরের মিটিং-এর কথা বলতে পাগল, আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চায় তারা,—কবে আমার যাবার সুবিধে হবে ইত্যাদি।

আধঘণ্টা পরে থামল বৃষ্টি। দু-জনে গিয়ে বসলুম পাঠশালার পেছনে মাঠে মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙার চরের এপারে।

মুসলমান মাস্টারটির বাড়ি বরিশাল জেলা। অনেকদিন থেকে সে এদেশে আছে। তার খেয়াল গ্রামে গ্রামে চাষাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করা। অম্বিকাপুর, মামুদপুর, শচীনন্দপুর মহৎপুর, হুদো, মানিককোল, বউজুড়ি, সর্পরাজপুর—এসব গাঁয়ে সে পাঠশালা বসিয়েচে, নিজে দেখাশুনো করে, চাষামহলে তার খুব খাতির। নিঃস্বার্থ সেবারতে ব্রতী উদার ধরনের যুবক। তাই ওকে বড় ভাল লাগে। বললে—আসুন, বেশ জায়গাটা, বসে একটু গল্প করি। বিড়ি নেই পকেটে—মুশকিল হয়েচে, কাকে দিয়ে আনাই বলুন তো।

আমি গামছা পাতলাম বৃষ্টিসিক্ত কচি ভেদ্‌লা ঘাসের ওপর। ওকে বললুম - বসুন।

ও বললে—আপনার গামছায় বসব?

জোর করে তাকে বসালুম।

তারপর সে একটা গল্প ফাঁদলে।

বললে—শুনুন, সেদিন অম্বিকাপুরে একটা বড় করুণ ব্যাপার হয়ে গিয়েচে। অম্বিকাপুরে আমার যে পাঠশালা আছে, সেখানে একটি মুসলমান মেয়ে পড়ত, তার নাম মোমেনা, ও বছর উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাস করেচে। চাষার মেয়ে, কিন্তু চাষার ঘরে অমন রূপ কেউ দেখে নি। এই টক্‌টকে গায়ের রং, এই পটল চেরা চোখ, এই স্বাস্থ্য, এই গড়ন—সর্বদিক থেকে মেয়েটি যেন আপনাদের বামুন কায়স্থের ঘরের সুন্দরী মেয়ের মত। তার ওপর তার লেখাপড়ার খুব ঝোঁক, গান জানে, শিল্পকাজ শিখচে স্কুলে, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

মেয়েটির এগারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বছরেই বিধবা হয়। উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষা দেবার পর যখন পাসের খবর বেরুল, তখন তার দেওর তার বাপ-মার কাছে যাতায়াত শুরু করলে তাকে বিয়ে করবার জন্যে। মেয়েটির বাপ-মা রাজী হয়ে গেল। কিন্তু মেয়ের তাতে ঘোর আপত্তি। তার দেওর নিতান্ত মূর্খ চাষা। স্বাস্থ্য অতি খারাপ, চেহারা কালো। মেয়েটি ওই গ্রামেরই একটা ছেলেকে ভালবাসে, মুসলমানেরই ছেলে, থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিল রাণাঘাট স্কুলে, এখনও

বাড়িতে বই, খবরের কাগজ আনিয়ে পড়ে। বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ, সুশ্রীও বটে, মেয়েটির বয়েস সতেরো। মেয়ে বাপ-মাকে নাকি গোপনে বলেছিল,—যদি তোমরা আমার বিয়ে দিতেই চাও, তবে অমুকের সঙ্গে দিও, আমার দেওরকে আমি বিয়ে করব না।

বাপ-মা তাতে ঘোর গররাজি। দেওরদের নাকি খুব ধানের গোলা আছে, ক্ষেত খামার আছে, এ ছোকরার কিছু নেই।

মেয়েটির কথা কেউই শুনলে না। তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দিলে তার দেওরের সঙ্গে। বিয়ের সময় আমাদের মুসলমানদের প্রথা আছে বিবিকে মোল্লা জিজ্ঞেস করবে, তুমি একে বিয়ে করতে সম্মত আছ তো?

মোল্লা সে কথা মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই মেয়ের ফিট্ হয়ে গেল সেই বিয়ের আসরে।

ভাবুন, কতটা দুঃখ সে বুকে চেপে রেখেছিল নীরবে মুখ বুজে।

আমি বললুম—বিয়ের কি হোল?

সে বললে—বিয়ে কি আটকে আছে? হয়ে গেল। তারা শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গেল।—বড় লক্ষ্মী মেয়ে, কিন্তু তার জীবনটা—

The usual story—অনেক শুনেচি এমন ধরনের গল্প। কিন্তু কেন এমন হয়, তা কে জানে?

সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। বাবুই পাখীদের অত্যাচারে বড় বেড়ে গিয়েচে। জোলো ধানের ক্ষেতে বেজায় পটপটির আওয়াজ ও ভাঙা টিনের বাজনা। ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের আকাশে যেন একটা কালো আভা লেগেচে।

অমন সুন্দর স্থান, অমন মরাগাঙের ধারে, আরামডাঙ্গার চরের এপারে, অমন ইন্দ্রনীল আকাশের নীচে বসে গল্পটা বড়ই করুণ লাগল।

হয়ত গল্পটা কিছু নয়—মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি—সেটাই আসল জিনিস। আইভ্যান বুনিনের কথায় বলি:—

'Then what is Art? It is the prayer, the music, the song of the human soul'—এই কথাটা আমাদের দেশের পণ্ডিতম্মন্য সমালোচকদের বুঝতে দেরি লাগবে। শুধু teller of tales হওয়া আর প্রাণের ভাষার ব্যঞ্জনা—দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, আমাদের অনেকে বলে—গল্প তো বলা হয়ে গেল, আর কেন? পাঠকে বুঝে নিক না বাকীটুকু।...পাঠকে বুঝবে কাঁকুড়!

রোজই যখন হাট করে ফিরি, তখন আমার চোখে পড়ে বটগাছ, বাঁশবন, আমগাছ, বড় বড় কুকুরে-আলুর লতা গাছের গায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে উঠেছে। পানের মত তার চকচকে সবুজ পাতা, গাছে-গাছে কাঁঠাল ঝুলচে, নারকেলগাছ, কলাগাছ, পেঁপেগাছ, ঘন আগাছার জঙ্গল, বাঁওড়ের চর, কচুরিপানার দাম, কোকিল ও "বৌ-কথা-কও" পাখীর ডাক, কুঁচ ঝোপ, শিমুলগাছ, সোনালী-ফুল-দোলানো বাবলাগাছ, উলঙ্গ শিশুর দল, মাছ ধরা দেয়াড়ী, কুমোর পাড়ায় হাঁড়ি পোড়াবার পন, কলসী কাঁখে গ্রামবধূর দল—ট্রপিক্সের কোনও একটা দেশের পরিচিত দৃশ্য। যেমন দেখা যায় যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, মালয় উপদ্বীপে, বোর্ণিও ও ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে। ইউরোপ আমেরিকা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এদের জীবনযাত্রা, চিন্তাধারা, শিল্প, খাদ্য, পরিচ্ছদ, দেশের দৃশ্য। আমরা বলি আমাদের ভাল, ওরা বলে ওদের ভাল। ওদের বিজ্ঞান আছে, কলকব্জা আছে, সাহস আছে, অধ্যবসায় আছে—আমাদের দর্শন আছে, প্রাচীন ঋষিরা আছেন, পাঁজিপুঁথি বিস্তর আছে...আমরা বলি আমরাই বা কম কি?

আমি তো দেখি এসব কিছুই নয়। এবার ট্রপিক্সের কোনও দেশে (যদিও বাংলা ওর মধ্যে পড়ে না) জন্মেচি, দূর কোনও জন্মান্তরে যাব ইউরোপে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা বৃহস্পতি কি অন্য কোনও গ্রহান্তরে, কি কোন্ দূর নক্ষত্রে—আমি অমর আত্মা, আমি দেশকালের অতীত—কোন্ দেশ আমার, কোন্ দেশ পর? সকলকেই ভালবাসতে চাই স্বদেশ বিদেশ নির্ব্বিশেষে, সকলের সব ভালটুকু নিতে চাই—এই আমার, এই তোমার—এ সংকীর্ণতা যেন থাকে না। এই দেশে জন্মেচি, মানুষ হয়েচি, কিন্তু এদেশের সঙ্গে নিজেকে অনেকটা মিশিয়ে দিলেও যেন খানিকটা আছি কৌতূহলী দর্শকের মত, যেন এই বৃক্ষলতাবহুল সবুজ দেশে এসে দেখে এবার আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, এতিদিন দেখচি আজ চল্লিশ বছর ধরে, তবু তৃপ্তি নেই, এ নিত্য নতুন আমার কাছে, কোনও দিন বুঝি এর রূপ একঘেয়ে লাগবে না।

সাতবেড়ের একটি ছেলে গল্প ও কবিতা লিখে মাঝে মাঝে আমার হাতে দেয়। গত দু-তিন বছর থেকে দিচ্ছে। গরীবের ছেলে, পয়সার অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে নি, কিন্তু লেখে মন্দ নয়। গল্পের হাত আছে, তবে টেক্‌নিকের ওপর তেমন দখল নেই, থাকবার কথাও নয়—টেক্‌নিক জিনিসটা কতকটা আসে এমনি, কতকটা আসে ভাল লেখকদের গল্পের রচনারীতি দেখে। তার জন্যে পড়াশুনোর দরকার হয়। এ ছেলেটির সেরূপ বই পড়বার সুযোগ কোথায়?

মুচি-বাড়ির সামনে বটতলায় তার সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে আলাপ করবে বলেই ওখানে বসে অপেক্ষা করছিল, বললে। কাঁচুমাচু হয়ে জিজ্ঞেস করলে—আর বছরের সেই লেখাগুলো কি দেখেছিলেন?

ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় বছরে একবার, এই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটিতে। সেই সময় ও আমার কাছে ওর লেখা দেয়, ইচ্ছেটা এই যে কলকাতার কোনও কাগজে ছাপিয়ে দেবো। কিন্তু কাগজে ছাপাবার উপযুক্ত হয় না ওর লেখা। তবুও আমি প্রতি বৎসর উৎসাহ দিই, এবারও দিলাম। মিথ্যে করে বললুম, তোমার গল্প বেশ ভাল হয়েছিল, কলকাতার অনেকে পড়ে খুব সুখ্যাতি করেচে। ও আগ্রহের সঙ্গে বললে—কোন্ গল্পটা? আমার নাম মনে নেই ওর কোনও গল্পেরই, কাগজগুলোও কোন্ কালে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। ভেবে চিন্তে বললুম—সেই যে একটা মেয়ে: বলতেই ও তাড়াতাড়ি বললে—ও বিয়ের কনে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও বিয়ের কনে।

একটা মিথ্যে কথা পাঁচটা মিথ্যে কথা এনে ফেলে। কাঁচিকাটার পুল পর্য্যন্ত বটতলার ছায়ায় ছায়ায় ও আমার সঙ্গে সঙ্গে অতীব আগ্রহ ও কৌতূহলের সঙ্গে শুনতে শুনতে এল, কলকাতার কোন্ কোন্ বড় লোক ওর গল্পের কি রকম সুখ্যাতি করেচে—কোন্ কাগজের সম্পাদক বলেচে যে, আর একটু ভাল লেখা হোলেই তারা তাদের কাগজে ছাপাবে, তার কবিতা পড়ে কোন্ মেয়ের খুব ভাল লেগেছিল বলে হাতের লেখা কবিতাটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে রেখে দিয়েচে কাছে। সন্ধ্যার দেরি নেই, আমি বললুম—তবে আজ যাই, আবার ফিরে নদীর ধারে মাঠে বেড়াতে যাবো। কি করো আজকাল! ও বললে—বাড়ি বসে তো আর চলে না, তাই ওই পথের ধারে ধানচালের আড়তে কাজ নিইচি। আজ এই তিন মাস কাজ করচি। সকালে আসি আর সন্দের সময় ছুটি পাই।

তারপর একটু লজ্জামিশ্রিত সঙ্কোচের সঙ্গে বললে—আসচে হাটে আপনাকে আর গোটাকয়েক গল্প ও কবিতা দেবো—পড়ে দেখবেন কেমন হয়েচে। কলকাতার ওই

বাবুদেরও দেখাবেন। আমি উৎসাহের সঙ্গে বলি—নিশ্চয়ই। বাঃ, চমৎকার লেখা তোমার। পড়ে সেখানে সবাই কি খুশি! তা এনো। আসচে হাটবারেই এনো। তার আর কথা কি!

ও বললে—ফিরবেন তো এমন সময়? আমি লেখা নিয়ে এই বটতলায় বসে থাকবো। আসবেন একটু সকাল-সকাল যদি পারেন—দু-একটা লেখা একটু পড়ে শোনাবার ইচ্ছে—

আমি ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম—শোনাবে নাকি? বাঃ, তবে তো বেশ দিনটা কাটবে। নিশ্চয়ই আসবো। তোমার কথা কত হয় কলকাতায় বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে।

বেচারীকে সত্যি কথা বলে লাভ নেই। ওতেই ওর সুখ, আমরা সবাই জীবনে মিথ্যের স্বর্গ রচনা করে রেখেচি, উনিশ না হয় বিশ। মিথ্যে বলে যদি ওই দরিদ্র, অসহায় পল্লীযুবককে এতটুকু আনন্দ দিতে পারি ভালই। ওর মিথ্যে স্বর্গ আগামী জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত অক্ষয় হোক্।

আজ ঘুম থেকে উঠে যখন হাটে যাই, তখন মেঘলা করে এসেচে, বেশ লাগলো। বনে বনে কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল ফলে আছে, পানপাতার মত বড় বড় লতা উঠেচে গাছে গাছে—ঘন কালো বর্ষায় মেঘ করেচে নৈর্ঋত কোণে। গোপালনগর পৌঁছতেই রাধাবল্লভ নিয়ে গেল ওদের বাড়ি। রাধাবল্লভের স্ত্রী পাঁচী আমাদের গাঁয়ের মেয়ে। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেচি বকুলতলায়—বিলবিলের ধারে, যুগল বোষ্টমের কামরাঙা তলার পথে। ওরা জাতে জেলে। ওর বিয়ের পর ওকে আমি এই প্রথম দেখলুম বোধ হয় বাইশ-তেইশ বছর পরে। দেখে বড় স্নেহ হোল—গড় হয়ে এসে প্রণাম করল। কথাবার্ত্তা খুব বিনীত, নম্রসম্র। একটু ভয়ে ভয়ে কথা বললে।

আমি ব্রাহ্মণ, ওর বাড়িতে গিয়েচি, পাছে আমার কোনও অসম্মান হয়, এই ভয়েই তটস্থ। ওর ছেলেকে দিয়ে একটু সন্দেশ ও জল পাঠিয়ে দিলে। তাও ভয়ে ভয়ে। ভাবলে আমি খাবো কি না। নিজের হাতে সাহস করে নিয়ে আসতে পারলে না। আমি ওকে দেখিয়ে সে সন্দেশ ও জল খেলুম, ওর মনে দ্বিধা ও সঙ্কোচের কোনও অবকাশ দিলুম না।

ও পড়ে গিয়েছে বড় বিপদে। ওর বড় মেয়ের বয়স প্রায় কুড়ি। মেয়েটি দেখতে শুনতে বড় ভাল, লেখাপড়াও শিখেচে। ওদের জাতে ভাল ছেলে বড় একটা পাওয়া যায় না—অনেক খুঁজে পেতে বাপে বিয়ে দিয়েছিল ওরই মধ্যে একটু আধটু শিক্ষিত একটি ছেলের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে ওর ওপর বড় খারাপ ব্যবহার করে বলে, বাপ মেয়েকে আর সেখানে পাঠাতে চায় না। সে জামাই আবার বিয়ে করচে। এই সব নিয়ে গোলমাল। ওরা জেলেপাড়ার মধ্যে বাস করে, ভাল কোঠা বাড়ি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। ওর স্বজাতিরা সেজন্যে ওদের দু-চোখে পেড়ে দেখতে পারে না। তার ওপর মেয়েটা নাকি সর্ব্বদা বই পড়ে। কি সর্ব্বনাশ! জেলের মেয়ে বই পড়বে কি? ওদের পাড়ার লোক ষড়যন্ত্র করে একরাত্রে ওদের ঘরে ঢুকে কিছু টাকা কাপড়চোপড় চুরি করে নিয়ে গিয়েচে, আর এক বাক্স ভাল ভাল বই সব ছিঁড়ে দিয়ে গিয়েচে।

পাঁচী লেখাপড়া জানে না, কিন্তু বইগুলোর শোক ওর লেগেচে খুব। আমাকে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আসুন তো দাদা, দেখুন দিকি, আপনি তো লেখাপড়া জানেন আমার এক বাক্স বই, খুড়শ্বশুরের কেনা—বইগুলো ছিঁড়ে ছুটে তার আর কিছু রেখেচে দাদা?

গিয়ে দেখলুম একটা আমকাঠের সিন্দুকে অনেকগুলো পুরোনো বই, বেশ ভাল বাঁধানো। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কিছু সেকেলে বাজে বটতলার উপন্যাস, মডেল-ভগিনী, কঙ্কাবতী, পুরোহিত দর্পণ (ওদের বাড়ি পুরোহিত দর্পণে কি কাজ জানি নে) রামায়ণ, হরিবংশ এই সব বই। মেয়েটা সেই সব বই পড়তো বলে পাড়ার কারও সহ্য হতো না। তাই বইগুলোর ওপরে ঝাল ঝেড়েচে।

আমি বললুম—যদি ওকে শ্বশুরবাড়ি না পাঠাও, তবে ওর লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করো।

পাঁচীর কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। কতকাল আগে বাল্যে একসঙ্গে খেলা করেচি, ওদের পর ভাবতে পারি নে।

হাট থেকে যখন ফিরি, তখন বেলা গিয়েচে, রোদ রাঙা হয়ে এসেচে। মাঠে নদীর ধারে একটু বসে ওপারের মেঘস্তূপ লক্ষ্য করি, তারপর জলে নামি স্নান করতে। অন্ধকার হয়ে গিয়েছে, ওপারের চরে সাঁইবাবলা গাছের বন, আর সেই প্রতিদিনের উজ্জ্বল তারাটি উঠেচে, দেখতে বড় চমৎকার হয় ওই তারাটা।

সকালে বসে যখন লিখচি, মনোরমা এসে বই চাইলে—পাঁচীর মেয়ে মনোরমা। ও আমার কাছে একখানা বই চেয়েছিল এবার, কিন্তু নানা গোলমালে সুবিধে হয় নি। বললুম, কলকাতায় গিয়ে পাঠিয়ে দেবো, মা।

বেশ মেয়েটি মনোরমা, জেলের মেয়ে বলে ওকে বোঝাই যায় না।

ওপাড়ার ঘাটে সাঁতার দিয়ে যাবার সময় নড়াইল থেকে একখানা নৌকা আসচে দেখি, যাবে গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে, দু-দিন হোল ইছামতী নদীতে পড়েচে। তারা জিজ্ঞেস করলে—ইছামতীর মুখ আর কত দূরে?

ঘাটের কেউ জানে না। আমি বললুম—আরও দুদিন লাগবে চূর্ণি নদীতে পড়তে। সেখান থেকে আর একদিন।

বৈকালে বেলেডাঙার পল্লীমঙ্গল সমিতি প্রতিষ্ঠা করলুম। আরামডাঙা, নতি-ডাঙা, সদানন্দপুর, চিত্রাঙ্গপুর, নতুনপাড়া, পাঁচপেতা প্রভৃতি সাত-আটখানা গাঁয়ের লোক জড়ো হয়েছিল। সদানন্দপুরের সৈয়দ আলি মোল্লাকে সভাপতি করে আমি এক লম্বা বক্তৃতা ঝাড়লাম সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে। ছেলেরা গান গাইলে, ফুলের মালা গলায় দিলে। হৈ-হৈ ব্যাপার। তারপর উপস্থিত লোকেদের মধ্যে বেছে বেছে এক কার্যকরী সমিতি গঠন করি। নূর মহম্মদ মাস্টারের আগ্রহেই সব হোল। সে লোকটা নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণ, গ্রামে গ্রামে ঘুরে লোক যোগাড় করা, সকলকে খবর দেওয়া, এসব সে-ই করেচে। মিটিং-এর পরে বৈকালে নীল আকাশের বিচিত্রবর্ণ মেঘস্তূপের তলে মরাগাঙের ধারে সবুজ ঘাসভরা মাঠের মধ্যে বসে গ্রামের লোক কত দুঃখের কথা আমার কাছে বলতে লাগল। গাঁয়ে জলের কষ্ট, কচুরিপানায় পচা জল খাচ্ছে, বেলে জমিতে ফসল হয় না, ক-বছর অজন্মা, মোল্লাহাটির খেয়াঘাটের ঘাটওয়ালাদের জুলুম।

তাদের বুঝিয়ে দিলাম, এই পল্লীমঙ্গল সমিতি থেকে গ্রামে এসব অভাব অভি-যোগ দূর করবার চেষ্টা করা হবে। তোমরা চাইতে জানো না, তাই পাও না। অন্য গাঁয়ে দুটো টিউবওয়েল হয় দু-পাড়ায়, তোমাদের গোটা গাঁয়ে একটাও হয় না।

সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে রওনা হলুম যখন, তখন মাথায় সেই উজ্জ্বল তারাটি উঠেছে। বাড়ি এসেই ঊষার পত্র পেলুম।

ছুটি শেষ হয়ে আসচে আর আমার মন খারাপ হয়ে আসচে। এই মুক্ত নদীর

চর, নীল উদার আকাশ, বর্ষাশ্যাম তৃণভূমি, আষাঢ়ের টলটলে কালো জল ইছামতী, জোনাকির ঝাঁক, 'বৌ-কথা-কও' পাখীর ডাক, এসব ছেড়ে যেতে কষ্ট হয়।

জীবনের বেগ যেন মন্দীভূত না হয়। আমাদের দেশে, আমাদের জাতীয় জীবনে তার আশঙ্কা খুব বেশী। পেট্রার্ক সম্বন্ধে যেমন উক্ত হয়েচে—'it is a Noble Florentine profile, the whole aspect suggesting abundance of thought and life ...'

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কার সম্বন্ধে সে কথা বলা যায়?

রাত্রে মানু রায়ের বাড়িতে সামাজিক দলাদলির মিটিং হোল রাত একটা পর্য্যন্ত। গাঁয়ের সবাই ছিল, কিছুতেই আর মেটে না। নানা কথা ওঠে, এ রাগ করে চলে যায়, ও রাগ করে চলে যায়। শেষ পর্য্যন্ত কিছু মীমাংসা হোল না। আমায় দু-বার ডাকতে এল, আমি যাই নি।

সারাদিন বর্ষার বৃষ্টি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথে ঘাটে জল বেধেচে। বৈকালে বৃষ্টি একটু ধরেছিল, সন্ধ্যায় আবার মেঘ এল ঘনিয়ে। আমি সেই সময় নদীর জলে নেমেচি নাইতে—মাধবপুরের পারের ওপরে সেই মেঘনীল দিগ্বলয়ের পটভূমিতে একটা শিমুল গাছ কি সুন্দর দেখাচ্চে। এই ইছামতী, এই মেঘমালা, এই বর্ষার সবুজ বনভূমি এমনি থাকবে—অথচ আমরা চলে যাবো আমাদের সকল সুখ-দুঃখ নিয়ে, আজকের এই মেঘ-মেদুর সন্ধ্যার সকল অনুভূতি নিয়ে। ঘাটের ওপর ওই বনসিমলতার কোলের নিচে খুকুর সে ছবিটা ক্রমে বহুদূরের হয়ে পড়েচে. এই পল্লীনদীটির শ্যামতীরে বাঁশ ও বনসিমলতার ছায়ায় অক্ষয় হয়ে থাকবে সে ছবি, এর আকাশে বাতাসে মিলিয়ে, কিন্তু তাকে চিনে নেবার লোক থাকবে না কেউ, কেউ এমন থাকবে না যার মনে ও ছবি বেঁচে থাকবে।

বারাসাত গেলুম পশুপতিবাবুর কাছে। উনি সকালেই যেতে লিখেছিলেন। কিন্তু শরীরটা একটু খারাপ ছিল। বারাসাত নেমে দেখি এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হয়ে গিয়েচে—অথচ কলকাতায় এক ফোঁটাও জল নেই। হাসপাতালে গিয়ে দেখি পশুপতিবাবু জেল দেখতে গিয়েছেন। আমি বসে রইলুম, তারপর পশুপতিবাবু এলেন। আমায় পেয়ে খুব খুশি। দু-জনে হাসপাতাল দেখতে গেলুম, গোবরডাঙ্গা থেকে এসেচে একটা জখম রোগী। তার মাথায় দু-তিনটে বড় বড় গর্ত। তার বড় ভাই নাকি বিষয়ের ভাগ দিতে হবে বলে তার মাথায় ওই রকম মেরেচে। পশুপতিবাবু বললেন, লোকটা বাঁচবে না। জাতিতে ব্রাহ্মণ, গাঙ্গুলি, গোবরডাঙার কাছে বেড়গুমি গ্রামে বাড়ি। হাসপাতালের কালো, মোটা মত একটা নার্স ওকে যত্ন করচে দেখলুম।

তারপর জেল দেখতে গেলুম। তখন কয়েদীরা খেতে বসেচে। খাবার বন্দোবস্ত দেখে মনে হোল জেলের মধ্যে ওরা বেশ সুখেই থাকে। দিব্যি সাদা চালের ভাত, তরকারিটা রেঁধেচে তার বেশ সদ্গন্ধ বেরুচ্ছে, ডালটাও বেশ ঘন। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংস দেয়। ওরা নিজেদের বাড়িতে অমন খাদ্য প্রতিদিন তো দূরের কথা কালেভদ্রে খেতে পায় কি না সন্দেহ। একজন কয়েদী ভদ্রলোকশ্রেণীর, তাকে বললুম, আপনার কি হয়েছিল, কতদিনের জেল? বললে, চিটিং কেস মশাই। পনেরো মাসের জেল। আর একটা ছোকরাকে বসিরহাট অঞ্চল থেকে ধরে এনেচে। তার বিচার এখনও হয় নি। জিজ্ঞেস করলুম—কি করেছিলে?

বললে—একটা মেয়েকে খুন করেচি।

—কেন খুন করলে?

—বাবু, চারদিন খাইনি। ওর গায়ে গয়না ছিল, সেই লোভে মেরেচি।

আমরা বললুম—বাপু! ওরকম বোলো না, পুলিসের কাছেও না বিচারের সময়ও না। বললে মারা পড়বে।

তারপর এসে একটা বড় পুকুরের ধারে বসলুম। তখন বৃষ্টি থেমে গিয়েচে। পুকুরের ওপারের আকাশে মেঘপুঞ্জ, তবে কি আর দেশের মত ভাল লাগছিল, তা নয়। কলকাতার চেয়ে ভাল বটে। একটা ছোট মেয়ে পশুপতিবাবু বলাতে, অনেকগুলো জুঁই ফুল তুলে এনে দিলে। পশুপতিবাবুর বাসায় বারান্দাতে বসে চা খেয়ে অনেক গল্প করা গেল।

রাত্রে ফিরবার সময় মিনুদের বাড়িটা দেখলুম। বাড়িটা ভালই, তবে বারাসাতে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া বলে ও'রা এখানে থাকতে পারেন না।

আজ রাধাকান্তদের বাড়ি গেলুম তার বৌভাতের নেমন্তন্নে। অনেকদিন যাই নি ওদের বাড়ি, ওরাও খুব ভালবাসে। বাইরের ঘরে খুব ভিড় থাকা সত্ত্বেও রাধাকান্ত, ঘিচু, ভীম, বাঁটুল সবাই এসে গল্পগুজব ও আপ্যায়িত করলে। ভীম ও বাঁটুলের সে কি আনন্দ আমি গিয়েচি বলে! রাধাকান্ত খাবার সময়ে হাত ধরে ওপরে নিয়ে গেল ওর বোন লক্ষ্মীর কাছে। লক্ষ্মীকে বললে—এ'কে আলাদা জায়গা করে খেতে দে। লক্ষ্মীর ছোট বোনটা বেশ বড় হয়ে উঠেচে দেখলুম। আমি একবার পুজোর সময় জাহ্নবীর মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলুম, ওর আগের পক্ষের খুড়ীমা তাকে পুতুল দিয়েছিলেন—সে সব কথা বললে।

বাঁটুল একটা ঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে জানলা দিয়ে বৌ দেখালে—ঘরের মধ্যে মেয়েদের ভিড়। সোনারবেনের মেয়েরা অত্যন্ত গহনা পরে, এক একটি মেয়ের আপাদমস্তক গহনায় মোড়া, নাকের নথও বাদ যায় নি। আজকাল যে এত গহনা পরার রেওয়াজ আছে, বিশেষ এই কলকাতা শহরে—সে আমার ধারণা ছিল না।

রাধাকান্তের বোন লক্ষ্মী অন্যরকম দেখতে হয়ে গিয়েচে। শিবু যখন আর একবার দোতলার ঘরে বৌ দেখাতে নিয়ে গেল তখন সে একখানা লুচি হাতে সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল, কিন্তু ও যেন বড্ড ছেলেমানুষ হয়ে গিয়েচে।

রাধাকান্ত ছেলেটি আমায় খুব ভালবাসে এ আমি বরাবরই দেখে আসচি—শিবুর চেয়ে, ভীমের চেয়েও। ওর মধ্যে কপটতা নেই।

কলকাতায় বড় একটা আনন্দ পাওয়া যায় না ; কিন্তু কাল সন্ধ্যা ছ-টার সময় বাসায় ফিরে এসে বারান্দাতে বসে আছি, হঠাৎ মনে আপনা-আপনিই আনন্দ এল। সকলের কথা মনে এল। দেখলুম ভেবে নিরাকার ভগবানকে আমি বুঝি নে, তাঁর ধারণাও করতে পারি নে—God as pure spirit তাঁকে বুঝতে পারবো না যতক্ষণ তাঁর রূপ না পাচ্ছি। যখন তিনি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে আসবেন, তখন তাঁকে আমরা ভক্তি করতে পারি। কেননা মানুষ নিরাকার নয়। এমন সে কখনও জীবের কল্পনা করতে পারবে না যার প্রাণ আছে, মন আছে, অথচ আকার নেই। নিরাকার ভগবানের উপাসনা কি সোজা ব্যাপার?

কিন্তু এসব কথা অবান্তর। আমার মনে উঠল একটা অন্য ভাব। খুকুদের কাছে একটা বারো-তেরো বছরের ছোট মেয়ে খেলে বেড়াচ্চে। মেয়েটি ভারী সুন্দরী, নীলা-

স্বরী শাড়ি পরনে বিদ্যুতের মত ছুটে ছুটে খেলে বেড়াচ্চে। মাথার খোঁপাটিতে যেমন ঘন কালো চুল, তেমনি পরিপাটী করে বাঁধা। ওকে দেখলেই মনে হোল Out of clay ভগবান এমন সুন্দর ছাঁচে গড়েচেন, এমন আকারে গড়েচেন—আর তিনি নিজে নিরাকার, এ কেমন করে ভাবতে ভাল লাগে? কি অদ্ভুত রসায়ন যার বলে মাটি থেকে অমন সুন্দরী মেয়েটির মত চেহারা তৈরি হয়েচে! তিনি নিজেও ইচ্ছা করলে সুন্দর মূর্ত্তিতে প্রকাশ হতে পারেন নিজে, যে দেশের লোকে যা ভালবাসে সেই মূর্ত্তিতে। যেমন ধরা যাক, আমাদের দেশে বহু শতাব্দী ধরে গলে বনমালা, মাথায় শিখিপুচ্ছ, হাতে বেণু এই শ্রীকৃষ্ণের কিশোর মূর্ত্তির প্রচলন, তাও দ্বারকা বা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণকে কেউ চায় না—সে সময় তিনি নিশ্চয় প্রৌঢ় হয়েছিলেন যদি সত্যি ঐতিহাসিক ব্যক্তি হয়ে থাকেন—কিন্তু চাইবে সবাই বৃন্দাবনের সেই কিশোর শ্রীকৃষ্ণকে। সুতরাং আমাদের দেশের লোকের রক্তে ওই শ্রীকৃষ্ণরূপী ভগবানের রূপ নৃত্য করচে—আমাদের দেশের হাওয়ায় তাঁর বাঁশি বাজে, পাখীরা তাঁর নাম করে—এদেশের মাটিতে তাঁর চরণচিহ্ন সর্ব্বত্র। এদেশে ভগবানের সাকার মূর্ত্তির কথা ভাবতে গেলে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিই এসে পড়ে মনে। যে ভালবাসে ওই মূর্ত্তিকেই ভালবাসে, যে না ভালবাসে সেও পাকে-চক্রে ওই মূর্ত্তির কথাই ভাবে, শেষে ভালবাসা এসে পড়ে মনে কোন্ অলক্ষ্য দ্বারপথ বেয়ে।

কলকাতা শহরের একটা অদ্ভুত রূপ আছে, যেটাকে দেখতে হলে বিকেল ছ-টা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত জনবহুল স্কোয়ার, সাধারণ পার্ক, সিনেমা, থিয়েটার, ভাল ক্লাব প্রভৃতি ঘুরে বেড়ানো দরকার। কোনও পার্টিতে গিয়ে স্থাণুবৎ অচল হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলে শহরের এ ঐশ্বর্য্য, রূপ হারিয়ে ফেলতে হয়। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকলে হয় না—ট্রামে বা বাসে ঘুরে বেড়াতে হয়, মোটর যদি না থাকে। আলো না জ্বললে শহরের রূপ খোলে না। আজ ভোরে বেরিয়েছিলুম এক-খানা ট্রামের all day ticket কেটে। কারণ নানা জায়গায় ঘুরতে হচ্চে, রবিবার ভিন্ন সুবিধে হয় না। কমলাদের হোস্টেল হয়ে মণীন্দ্রলালের ওখানে গিয়ে দেখি পুরো আড্ডা বসেচে—পরেশ সেন বিলেতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করচে, ভূপতি, মহিম, নরেনদা সবাই উপস্থিত। সেখানে ঠিক হোল ওবেলা ছ-টার সময় 'বিজলী'তে সবাই মিলে 'She' দেখতে যাওয়া হবে। মণি বৰ্দ্ধনের নাচ হবে আজই ইনস্টিটিউটে, আমায় মণি বৰ্দ্ধন একখানা কার্ড দিয়েচে সে-কথা বললুম। ওরা উড়িয়ে দিলে। তখন ঝম্‌ঝম বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি মাথায় ট্রামে ও বাসে সাঁতরাগাছি গিয়ে পৌঁছই ননীর বাড়ি। ননীরা বাসা বদলে আর একটা বাড়িতে এসেচে।

'বিজলী'তে এসে দেখি শুধু পরেশ সেন এসেচে। একটু পরে মণীন্দ্র ও ভূপতি এল। আমরা সবাই ফিল্ম দেখলুম। 'বিজলী'তে এমন একটা atmosphere আছে যে সেখানে বসে ফিল্ম দেখে সুবিধে হয় না। ভাল সঙ্গ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন যেখানে সেখানে বসে, ছবি বা থিয়েটার বা যে কোনও আমোদ-প্রমোদ ভাল লাগে না। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ, সুবেশা তরুণীর দল, পরিপাটি আসন—এ সবের খুব বড় একটা স্থান আছে ছবি বা থিয়েটার দেখাতে। ওখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে আলিপুর ও খিদিরপুর হয়ে বাসায় ফিরলুম। পথের বৃষ্টিস্নাত গাছপালার ওপর শ্যাওলা পড়ে বেশ দেখতে হয়েচে, কার্জ্জন পার্কে ফুল ফুটে আছে, নরনারীর চিত্র —বেশ লাগল। কলকাতার এই প্রমোদসজ্জা অতি চমৎকার। এত বড় একটা শহরের এ রূপ ভাল করে দেখবার জিনিস।

পরদিন বিকেলে তরুদের বাড়ি গেলুম শ্যামবাজারে, সেখান থেকে সন্ধ্যায় রঙমহলে বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাটক দেখতে গেলুম 'কালের মন্দিরা বাজে' ও 'অতি আধুনিক'। নাটক দু'খানা কিছুই নয়, অতি বাজে, তবে গান ও variety show হিসেবে অনেকগুলো গুণী লোককে একক করেচে বটে, নাটকের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। হেমেনদা এসে এক কোণে চুপ করে বসে আছেন। দেখা করে এলাম। সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খুব জমিয়ে আড্ডা দিতে দিতে থিয়েটার দেখা গেল।

গত শুক্রবারে শ্রীরামপুরে দিদির মেয়ে প্রভার বিয়ে হোল। আমি প্রথমে গেলুম লীলাদিদিদের বাড়ি। লীলাদির শরীর প্রথমে খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন কিছু সেরেচে। অমিয় কলেজ থেকে এল রমেশ কবিরাজকে সঙ্গে করে। ওখানে অল্পক্ষণ বসেই দিদির বাড়ি গেলুম। ওরা সকলে মিলে স্ত্রী-আচারের সময়ে বরকে ঘিরে আলো নিয়ে প্রদক্ষিণ করলে। আমি ওদের সকলকে অনেকদিন পরে এক জায়গায় দেখলুম.—বড় ভাল লাগছিল। রাত দশটার ট্রেনে কলকাতায় এলুম।

পরদিন শনিবার বনগাঁ যাব, ঠিক দুপুরবেলা থেকে ঝম্‌ঝম্‌ বৃষ্টি শুরু হোল —অতি কষ্টে বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তো ট্রেন ধরলুম। বৃষ্টিস্নাত ঘন সবুজ গাছপালা, ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে ট্রেন বনগাঁ গিয়ে পৌঁছল। খয়রামারিতে ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেলুম।

তার পরদিন সকাল থেকে কি বিশ্রী বাদলা। নদীর জলে ঘোলা এসেচে, ঘাস পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েছে, এত জল বেড়েচে নদীতে। এখন তো খুবই ভাল, মুশকিল বাধবে সেই কার্ত্তিক মাসে যখন হাঁটুভ'র কাদা হবে নদীর ধারে সর্ব্বত্র।

সোমবার বৈকালে চলে এলুম কলকাতায়। দিনটা পরিষ্কার ছিল, নীল আকাশ, রৌদ্রও উঠেচে। মনে হোল ওই প্রজাপতির দলের উড়ে বেড়ানোর দিকে চেয়ে চেয়ে সারাদিন যদি বসে থাকি, চমৎকার গল্পের প্লট্‌ মনে আনতে পারি। এই আলো ছায়ার খেলাতেই মনের ভাব নতুন ধরনের হয়—মাটির সঙ্গে প্রস্ফুটিত ভায়োলেট্‌ রঙের বনকলমী ফুলের শোভা বৃষ্টিধোয়া নীল আকাশের রূপে।

আজ স্কুলের ছাদ থেকে দুপুরের চনমনে রোদে দূর আকাশের দিকে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের গানটি মনে পড়ল—

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছল ভরে।
ওগো, ঘরে ফিরে চল কনককলসে জল ভরে'॥

এই গানের ছত্র দুটির সঙ্গে আমার আঠার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রথম যৌবনের জীবনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। চেয়ে চেয়ে মনে হোল বর্ষাসতেজ সবুজ গাছপালা বনঝোপে ঘেরা কোন একটি নিভৃত পল্লীভবনে তারা এখনও সব কিশোরই রয়ে গিয়েচে কত বৎসর আগের সেই এক প্রথম শরতের দিনগুলির মতো। কোথায় যে তারা ছায়া-ছবির মত মিলিয়ে গিয়েচে রজনীর মধ্যযামে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ যেমন মিলিয়ে যায়, এ কথা ভুলেই গেলুম ক্ষণকালের জন্যে। পেট্রার্কের সম্বন্ধে যে কথা হয়েচে, বড় সত্যি সে কথা। 'Know that for a lofty soul death is but a release from prison, that she frightens only those who look for their whole happiness in this poor earth.' ইত্যাদি।

প্রায় ছ-বছর পরে আবার রামরাজাতলায় গিয়েছিলুম রামরাজা ঠাকুরের ভাসান দেখতে। ননীদের বাড়ি গিয়ে উঠলুম, জতু খুব খুশি হোল, জতুর মাকে দেখলুম

আজ বহুকাল পরে। অনেক সব পুরোনো কথা হোল। সাঁতরাগাছি গ্রাম সম্বন্ধে ননী এমন সব গল্প করলে যাতে জায়গাটার ওপরে আমার কোন শ্রদ্ধা রইল না। একজন লোকের স্ত্রী একটু পাগল মত, সে লোকটা নাকি তার স্ত্রীকে প্রায়ই এমন মারে, যে দু-তিন দিন বেচারী আর উঠতে পারে না। অথচ সেই লোকটি এখানে নাকি একজন সমাজপতি! কলকাতার এত কাছে কালচার বলে কোনও জিনিস নেই এখানে, লোকে বোঝে দশটায় খেয়ে আপিসে ছোটা, আর রবিবার দিন ভাল করে বাজার করে দুপুরে ঠেসে খাওয়া। গ্রামটাও অত্যন্ত নোংরা, চারিদিকে খোলা ড্রেন, জঞ্জাল, দুর্গন্ধ, নোংরা জল গড়িয়ে চলেচে রাস্তার পাশ দিয়ে। আমি যতক্ষণ ছিলাম, দম বন্ধ হবার উপক্রম হয় আর কি।

রামরাজার মিছিল বার হবার আগে আমি ননী দু-জনে পথের ধারে একখানা গরুর গাড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। প্রথমে বাক্‌সাড়া ও ব্যাতড়ের নবনারী কুঞ্জর বেরুল, সঙ্গে অনেক সঙ, কাগজের এরোপ্লেন, রাক্ষসী ইত্যাদি। পেছনে এল রামরাজার মিছিল। শেষের মিছিলটাই বড় কিন্তু এমন কিছু দেখবার কি আছে বুঝলুম না। রাস্তার দু-পাশে, ছাদে, বারান্দায়, পথের ধারে হাজার হাজার মেয়েমানুষের ভিড়। এ মেয়েদেরই দেখবার জিনিস। ওরা আজ এখানে আসে রামরাজাতলায় সিঁদুর দিতে ও মিছিল দেখতে। সব মেয়েরই কপালে অনেকটা করে সিঁদুর লেপা। ভিড়ের মধ্যে আমাদের গাঁয়ের কিশোরী কাকার ছেলে সন্তোষ আর জীবনের সঙ্গে দেখা হোল। সন্ধ্যার সময় আবার ননীদের বাড়ি ফিরে এসে চা খেলুম। আজ ২৩শে শ্রাবণ বলেই মনটা মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল, অনেক দিন আগেকার এই সন্ধ্যা-গোধূলির একটা ছবি পর-পর আমার মনে আসছিল। জতু দেখলুম মনে করে রেখেচে, সে ননীকে বললে—কোন্ গানটা গাওয়া যেত না বিভূতির সামনে, মনে আছে? ননীরও মনে আছে। সে বললে—জানি ঃ 'সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে' এই গানটা। আমি হাসলুম। এরা বেশ লোক। আমার জীবনের কতদিন আগেকার কথা এরা কেন মনে রেখেচে, কি দরকার এদের! বিশেষ করে জতু মেয়েটি বড় ভাল, এত স্নেহশীলা! সন্ধ্যার পরে চলে এলুম, বাসে ভয়ানক ভিড়, মল্লিকের ফটক বন্ধ, বাস ঘুরে এল জামতলা দিয়ে। সারাদিন পরে কলকাতার মুক্ত হাওয়ায় এসে এখন বাঁচলুম। জতু বার বার বললে—আজ রাতটা থেকে যান না, পাঁপর ভাজবো এখন। আমার থাকবার জো নেই, লেখা আছে।

বললুম—আর একদিন এসে রাত্রে থাকব।

স্পেনের বিদ্রোহ কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেচে। বাড়াজোজ শহর বিদ্রোহীরা অধিকার করেচে, রাস্তায় রাস্তা barricade এবং প্রত্যেক barricade-এর গায়ে মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে আছে, আর স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা মৃতদেহের স্তূপ খুঁজে নিজেদের বাপ, ভাই, ছেলে, স্বামীর দেহ বার করতে ব্যস্ত। মানুষ এখনও কত আদিম যুগে পড়ে রয়েচে তা এইসব ঘটনা থেকে বোঝা যায়। জার্ম্মানিতে বিদ্রোহের সময়েও ঠিক এই ধরনের নিষ্ঠুর কাণ্ড এই সেদিন ঘটে গিয়েচে, Ernest Toller-এর বই পড়লে তা জানা যায়। মানুষের প্রতি মানুষ এমন senseless নিষ্ঠুরতার অনুষ্ঠান কি করে করতে পারে ভেবেই পাই নে।

এর মধ্যে বড় মানুষও জন্মেচে বৈকি! Ernest Toller-এর ভাষায় বলি ঃ—

In the war there lined a man among millions Karl Liebkrecht ; his was the voice of truth and of freedom. Even the prison groove could

not silence that voice,

এদের ideal যে কি তা বুঝি নে। স্পেনে socialist ও communist-রা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র স্থাপন করলে, খুব ভাল কথা। এ পর্য্যন্ত বুঝি। আবার এল Fascists-এর দল, এরা বিদ্রোহ করচে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে socialist-দের শাসনের বিরুদ্ধে, কিন্তু কি ভীষণ রক্তারক্তি আর নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্চে, ভাবলে বর্ত্তমান সভ্যতার ওপরে মানুষের আস্থা থাকে না। দলে দলে যুদ্ধের বন্দীদের পুড়িয়ে মারচে, বিষাক্ত গ্যাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করচে।

দার্শনিক সত্যিই বলেচে—An easily realizible ideal quickly loses its power of stimulating, nothing lets a man down with such a pump into listless disillutionment as the discovery that he has achieved all his ambition and realized all his ideals. Once actually seized the peach turns out to be a Dead Sea fruit.

এ কথা স্বীকার করতে হবে যে কলকাতায় এবার গ্রীষ্মের ছুটির পর এসে বিশেষ করে নানারকম অভিজ্ঞতা হচ্চে। এই অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রা প্রণালী সম্বন্ধে। জীবনটাকে এভাবে দেখাও বড় দরকার বলে মনে করি। তবে পার্টিতে জীবন দেখার চেয়ে আমি যে লোকজনের বাসায় গিয়ে ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে মিশি, ওতে আরও ভাল করে ওদের দেখা হয়, যেমন রামপ্রসাদের বাড়ি, বঙ্কুদের বাড়িতে বিনুর পাগল হয়ে যাওয়া রাতের দৃশ্য, রমা যখন আমাদের কাছ হতে চলে গেল মীরাট, তার সেই আকুল কান্নার দৃশ্য, রাজপুরে তেঁতুলের বৌয়ের অসুখের জন্যে চান্দ্রায়ণ করবার ব্যাপার ইত্যাদি।

অনেকদিন আগে কামাখ্যা ছিল ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটের একজন চাঁই, থিয়েটারের সময়ে মেয়েদের পার্ট সে-ই করতো, এবং আমাদের সময়ে বেশ নামও করেছিল তাতে। কাল ইনস্টিটিউটে আর একটি ছেলেকে 'মানময়ী গার্লস্ স্কুলে' নীহারিকার পার্ট করতে দেখলুম—এত চমৎকার মানিয়েছিল তাকে যে কোথায় লাগে মেয়েদের। যেমন রূপসী, তেমনি কমনীয় কান্তি, তেমনি গলার সুর ও গান! হায় কামাখ্যা, তুমি এখন কোথায় তাই ভাবি! সে ভাল লেখাপড়া শেখে নি, থিয়েটার করে বেড়াতো, বোধহয় বি. এ. পাসটাও করেছিল। কোন পাড়াগাঁয়ে এতদিন ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে দাবাপাশা ও দলাদলির চর্চা করচে। এখন তার মনের সে স্ফূর্ত্তি নেই, চোখের জলুস কমেচে, চুলে পাক ধরেচে, মুখশ্রীর সে কমনীয়তা আর নেই। এখন যে নীহারিকার পার্ট করল, সে ছেলেটি সে সময়ে হয়তো ছিল তিন-চার বছরের শিশু।

'মানময়ী গার্লস স্কুল' দেখতে দেখতে হঠাৎ আজ কামাখ্যার কথা মনে পড়ল কেন কি জানি।

একদিন মাত্র কলকাতা থেকে বেরিয়েচি অমনি কি ভালই লাগচে। আজ সকালে উঠে অশোক গুপ্তের বাড়ি গেলুম, সেখান থেকে খেয়ে দু-জনেই যতীশবাবুদের গাড়িতে গ্রে স্ট্রীট দিয়ে স্ট্রাণ্ড রোড দিয়ে হাওড়া স্টেশনে। বসুমতীর সেই পুরোনো বাড়িটা, বাবার সঙ্গে যেখানে বাল্যে একদিন এসেছিলুম, সেটা সেই রকমই আছে। কুসুম বলে বাল্যে যে মেয়েটিকে জানতুম, এখন সে বুড়ী হয়েচে, ছেলেবেলায় আমায় তার ছেলের মত ভালবাসতো, সে থাকে কাছেই ওই বাড়িটাতে। ট্রেনে ভিড় নেই, কারণ পুজোর সময় তো আর নয়। দিব্যি আরামে বেঞ্চিতে বিছানা পেতে নিলুম।

সাঁতরাগাছি স্টেশনে উঠলো কিশোর কাকার ছেলে সন্তোষ, তাকে উঠিয়ে দিতে এল জীবন। আজ দিনটা বাদলা, জোলো হাওয়া দিচ্চে। কোলাঘাট রূপনারায়ণের কি রূপ, কূলে কূলে ভরা গৈরিক জলরাশি তীরবেগে ছুটেচে। সেই অন্তরীপ মত জায়গাটা, যেটা প্রতিবারই মনে করিয়ে দেয় পূজোর সময়, সেটা কেমন চমৎকার দেখাচ্চে। রেলের বাঁধের ধারে ঘন বনঝোপে কত কি ফুল ফুটেচে। এসব গাছের নাম জানি নে। এ অঞ্চলে গাছগুলি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত, একমাত্র বনকলমী ফুল ছাড়া। হলদে কাপাস তুলোর গাছের বড় ফুল, ঘেঁটকোল ফুলের মত বড় বড় ফুল, সাদা সাদা কুচো ফুল, আরও কত কি। এবার জল বেজায় বেড়েচে, সব গ্রামের বাড়িঘরের চারিধারে জল ভর্ত্তি, ডোবা, বিল, পুকুর। কোলাঘাটে গাড়ি এক-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল লাইন বন্ধ ছিল বলে। খড়গপুর ছাড়িয়েচি, সেই সময় আবার মেঘ করে এল। ঝাড়গ্রামে থামবার কিছু আগে সন্তোষ গ্রামের কথা উপলক্ষে বললে—গণেশ মুচির ছোট ছেলেটি মারা গিয়েচে। শুনে খুবই দুঃখিত হলুম, গণেশ বুড়ো হয়েচে, ওই ছেলেটিকে বড় ভালবাসতো। আর একটা খবর বললে—হরিদাদার মেয়ে কনকের বিয়ে হয়েচে এক বুড়ো বরের সঙ্গে। আরও দুঃখিত হলুম, কনক মেয়েটি বড় সুন্দরী, তার জন্যে তার বাবা ওর চেয়ে ভাল বর জোটাতে পারলে না কেন জানি নে, কারণ তার বাবা গরীব নয়, ইচ্ছে করলে দু-পয়সা খরচ তো করতে পারতো।

এইবার ঘন মেঘ করে বৃষ্টি এল। গাড়ি এখন শালবন ছাড়িয়ে গিড্‌নী স্টেশনে এসে পোঁছেচে। বড় ইচ্ছে ছিল বাকুড়ি যাবো, কিন্তু যাওয়া হোল না।

সুবর্ণরেখার ধারে এসে ঘন ছায়াভরা বৈকালে শালবনের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। ওই দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরী, যার মাথায় উঠে বসে চিঁড়ে দই খেয়েছিলুম, যার মাথায় উঠে শিলাখণ্ডে নাম লিখে রেখেছিলুম।

চারিধারে শ্যামল বনানী, প্রান্তর, ধানবন, শালগাছ। ওই ওপারে প্রকাণ্ড দীর্ঘ পাহাড়শ্রেণী। সামনে খরস্রোতা সুবর্ণরেখা, তীরে ছোট বড় শিলাখণ্ড, শাল চারার জঙ্গল। সন্ধ্যা নেমে আসচে, পাহাড়শ্রেণী নীরব, বনানী নীরব, মেঘলা, সুবর্ণরেখার কুলুকুলু শব্দ ছাড়া অন্য কোনই শব্দ নেই। গত শনিবারে এমন সময় ইছামতীর ধারে বসে আছি।

এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে পেছনের শালবনের মাথায় ওধার দিয়ে পূবদিকে চেয়ে দেখলুম, দূরে এমনি ইছামতী নদী বয়ে যাচ্চে, বাংলা-দেশের এক অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের কোল দিয়ে। সেই নদীর ধারে একটা গাঁয়ের ঘাটে এক জায়গায় একটা বনসিমের ঘন ঝোপ নত হয়ে আছে ঘাটের পথের ওপরে। একটি মেয়ের ছবি সেই বনসিমের লতার ঝোপের তলায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে আছে। ছবিটি মনে পড়তেই অপূর্ব্ব আনন্দে ও মাধুর্য্যে এই সন্ধ্যা ভরে উঠলো, বাতাস আরও মধুর হোল।

আমার ঘরে গত জ্যৈষ্ঠমাসে একদল রামছাগল উঠে উপদ্রব করছিল, আমি হাট থেকে এসে 'দূর দূর' করে ছাগলের দল তাড়িয়ে দিলুম, সেই কথা মনে পড়লো। এই রামছাগলের দল তাড়ানোর সঙ্গে আমার সেদিনের একটা বড় মধুর ঘটনা মেশানো আছে, কেউ তা জানে না—তা আমি এখানে লিখবও না। এটুকু লিখে রাখলুম এজন্যে যে সুবর্ণরেখার তীরে দাঁড়িয়ে এই বর্ষাসন্ধ্যায় সেই ঘটনাটা আমার মনে এসেছিল।

সুপ্রভা কত দূরে আছে, তার কথাও মনে হোল এ সন্ধ্যায়। বড় ভাল মেয়ে সে, তার মতো মেয়ে কখনো দেখি নি।

এই ডায়েরীটি শেষ হয়ে গেল। আমার জীবনে এই দেড় বছর বড়ই আনন্দের। পরিপূর্ণ আনন্দের। নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত—কত নতুন বন্ধু লাভ, কত অভিজ্ঞতা কত পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ হোল বহুদিন পরে এই দেড় বছরের মধ্যে, এই ১৯৩৬ সালে। যেমন মণিকুন্তলা তার মধ্যে একজন। ভগবানকে এ জন্যে ধন্যবাদ জানাই।

কত কি পেলুম এই দেড় বছরে। সব কথা ডায়েরীতে লেখা যায় না। যা এখানে লিখলুম না তা রইল আমার মনের গভীর গোপন তলে। কর্ম্মহীন অবকাশ-মুহূর্ত্তে তাদের চিন্তা আমায় আনন্দ দেবে। কত জায়গায় বসেই কত ডায়েরী লিখলুম, ভাগলপুরে, ইশ্‌মাইলপুর দিয়ারায়, আজমাবাদ কাছারীতে, কাশীতে, রাখামাইন্‌সে, নাগপুরে, কলকাতায়।

বনে-পাহাড়ে

সিংভূম জেলার বন-জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণী ভারতবর্ষের মধ্যে সত্যিই অতি অপূর্ব্ব। বেঙ্গল নাগপুর-রেলপথ হওয়ার আগে এই অঞ্চলে যাবার কোন সহজ উপায় ছিল না, কেউ যেতোও না সে সময়ে—যা একটু আধটু যেতো—এবং যে ভাবে যেতো—তার কিছুটা আমরা বুঝতে পারি সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' পড়ে। সিংভূম জেলার ভেতরকার পাহাড়-জঙ্গলের কথা ছেড়ে দিই—বাংলাদেশের প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থান জনহীন অরণ্যসঙ্কুল থাকার দরুণ 'ঝাড়খণ্ড' অর্থাৎ বনময় দেশ বলে অভিহিত হোত। লোকে প্রাণ হাতে করে যেতো ঐ সব বনের দেশে। কিন্তু না গিয়ে উপায় ছিল না—যেতেই হোত।

ওই দেশের মধ্যে দিয়ে ছিল পুরী যাওয়ার রাস্তা। মেদিনীপুর জেলার বর্ত্তমান ঝাড়গ্রাম মহকুমার মধ্যে দিয়ে এই পুরোনো পথ এখনও বর্ত্তমান আছে। শ্রীচৈতন্য সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এই পথে একদিন পুরী গিয়েছিলেন। কত লোকে যেতো সেকালে। সাধু ঈশ্বরপুরী একা এই পথে পুরী রওনা হন।

ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে এই পথ আজও আছে, আজকাল জেলা-বোর্ডের রাস্তার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। রাজবাড়ী থেকে পাঁচ মাইল কিংবা তার কিছু বেশি গেলেই বম্বে রোডের সঙ্গে এই রাস্তা মিশে গিয়েছে এবং তারপর সোজা চলেছে উড়িষ্যার দিকে, ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে। এই রাস্তাকে কেন যে বম্বে রোড বলা হয় তা জানি নে—কারণ বম্বের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক চর্ম্মচক্ষে আবিষ্কার করা যায় না। তবে যদি কেউ বলে, এ রাস্তা দিয়ে কি মশাই তবে বম্বে যাওয়া যায় না? আমায় বলতে হবে—বিশেষ করে বম্বে যাবার জন্যে এ রাস্তা নয়। ময়ূরভঞ্জের মধ্যে দিয়ে এ রাস্তা সোজা চলে গেল সমুদ্রতীরের দিকে। তবে এ রাস্তা থেকে অন্য একটা রাস্তা বেরিয়েছে ময়ূরভঞ্জের বাঙ্গিপোস নামক জায়গায়। সে রাস্তায় বেঁকে গেলে কি হয় বলা যায় না—হয়তো বম্বে যাওয়া যেতে পারে, সে রকম দেখতে গেলে তো যে কোনো রাস্তা দিয়েই বম্বে যাওয়া যায়। যে কোনো জেলার যে কোনো রাস্তাকে তবে বম্বে রোড কেন বলা হবে না?

চিরকাল পথে পথে বেরিয়ে অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছে খারাপ। পথ যেন ডাকে, হাতছানি দেয়।

সেদিন ছিল অষ্টমী তিথি।

সন্ধ্যার পরেই কি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। ঝাড়গ্রামে আমার এক আত্মীয়-বাড়ীতে গিয়ে দিন দুই আছি—হঠাৎ ইচ্ছে হলো এমন জ্যোৎস্নায় একটুখানি বেড়িয়ে আসি।

জায়গাটা রাজবাড়ীর পাশে—পুরোনো ঝাড়গ্রাম। স্টেশনের কাছে হয়েছে নতুন কলোনি, কলকাতার অনেক ভদ্রলোক বাড়ী করেছেন সেখানে, কিন্তু পুরোনো ঝাড়গ্রামের একটি নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। এখানে পুরোনো দিনের রাজাদের গড়খাই ও দুর্গপ্রাচীরের চিহ্ন আজও দেখা যায়, আর আছে শালবন, আগাছার জঙ্গল, পুরোনো দেউল, দীঘি। দিব্যি রোম্যাণ্টিক পরিবেশ। পুরোনো দীঘির ধারে হাট বসে, তার আগে সাবিত্রী-মন্দির।

সাবিত্রী-মন্দিরের পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল গ্রামের বাইরে মাঠ ও বনের দিকে। একাই চলেছি, শালবনের কচি পাতা গজিয়েছে, কুসুম-গাছের রঙিন কচি পাতার সম্ভার দূর থেকে ফুল বলে ভুল হয়। গ্রাম ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথ শালবনের মধ্যে দিয়ে দূর থেকে দূরান্তরে অদৃশ্য হয়েছে—সঁড়ি পথের দু ধারে শালবন।

একাই চলেছি। এ পথে কখনো আসি নি, কোথায় কি আছে জানি নে। ভালুক বেরুবে না তো? শুকনো শালপাতার ওপরে খস্‌খস্‌ শব্দ হোলেই ভাবছি এইবার বোধ হয় ভালুকের দর্শনলাভ ঘটলো। আরও এগিয়ে চলেছি—একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী ঝির্‌ঝির্‌ করে বয়ে চলেছে পথের ওপর দিয়ে। হাঁটুখানেক জল, এমনি পার হয়ে ওপারের পাড়ে উঠলাম—উঁচু কাঁকর-মাটির পাড়।

শহর থেকে প্রায় দেড় মাইল চলে এসেছি। জ্যোৎস্নাস্নাত উদার বন-প্রান্তর আমার সামনে। ফিরবার ইচ্ছা নেই। আরও খানিক গিয়ে শালবন পাতলা হয়ে এল—মাঠের মধ্যে দূরে একটা আলো জ্বলছে দেখে সেদিকে গেলাম। ছোট্ট একখানা খড়ের ঘর, ফাঁকা মাঠের মধ্যে—একটু দূরে একটা গ্রাম আছে বলে মনে হোল। ঘরখানার চারিদিকে বাঁশকঞ্চির বেড়া, আমার স্বর শুনে গেরুয়া পরা সন্ন্যাসী ঘর থেকে বার হয়ে এসে বললেন—কোথা থেকে আসছেন?

আমি বললাম, ঝাড়গ্রাম থেকে। এটা কি আপনার আশ্রম?

—হ্যাঁ, আসুন বসুন।

সন্ন্যাসী একখানা দড়ির খাটিয়া ঘরের সামনে মাঠে জ্যোৎস্নায় পেতে দিলেন। বেশ চমৎকার লাগছিল আমার, একদিকে অস্পষ্ট বনরেখা, অন্য দিকে ধূ ধূ করছে জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তর। শহরের পথ চিনে ফিরতে পারবো কি না এই রাত্রে, তাই বা কে জানে? পায়ে-চলা সরু আঁকা-বাঁকা মাটির পথের সন্ধান যদি না-ই মেলে, ফেরবার মুখে?

সন্ন্যাসী বললেন—রাতে বেরিয়েছেন একা?

—কেন, কোনো ভয়-ভীত আছে নাকি?

—নাঃ, কিসের ভয়। তবে ভালুক-টালুক দু'একটা—

—ওর জন্যে ভাবনা নেই। হাট থেকে হরদম লোক যাতায়াত করছে এপথে—মানুষের সাড়া পেলে ভালুক থাকে না।

আমার ইচ্ছে হচ্ছে এই জ্যোৎস্নায় অপরিচিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করি, ওঁর জীবনের কাহিনী সব জেনে নিই। কোথায় বাড়ী, কোথায় দেশ, এসব শুনি। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছ আশ্রমের বেড়ার গায়েই মাটিতে পড়ে আছে—অথচ তাতে অনেক ফুলও ধরেছে।

বললাম—গত আশ্বিনের ঝড়েই বুঝি গাছটা পড়েছে?

—হ্যাঁ, এদিকে ততটা হয় নি, তবুও দু-দশটা গাছ পড়েচে বৈকি।

—মেদিনীপুরের ওই দিকটার সর্ব্বনাশ করে দিয়ে গেল, অথচ পশ্চিম মেদিনীপুরের বিশেষ কিছু হয় নি দেখছি। এই গ্রামের নামটা কি?

—খানাকুই।

—কত দিনের আশ্রম আপনার? আছেন কতদিন এখানে?

—তা প্রায় আট-ন বছর। শিষ্য আছে জন-দুই কলকাতায়—তারাই আশ্রমের ঘর তৈরী করে দিয়েছে—মাসিক কিছু সাহায্যও করে।

—এ বনের মধ্যে ভাল লাগে?

—আছি বেশ। গ্রামের লোকের বড় জলকষ্ট। শিষ্যদের বলে আশ্রমে একটা পাতকুয়ো করে দিয়েছি, গ্রামের সবাই জল নিয়ে যায়। তবে খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট, কিছু মেলে না এ সব গাঁয়ে। কপি আর টোমাটোর ক্ষেত করেছি ঐ দেখুন। ঐ ভরসা। তাও গরমকালে জলাভাবে সব শুকিয়ে যায়। দারুণ জলাভাব।

বসে গল্প করছি, গেরুয়া কাপড় পরা একজন সন্ন্যাসিনী এসে এক পেয়ালা চা

দিয়ে গেলেন। সন্ন্যাসী বললেন, মা ঠাকরুণ।

বললাম—ও, আপনার মা?

—না, আমার শিষ্যা। ওঁরও কেউ নেই। বাঁকুড়া জেলায় বাড়ী। ব্রাহ্মণ ঘরের মেয়ে। আমি কাছে নিয়ে এসে রেখে দিয়েছি আজ পাঁচ বছর। আমার রান্না করে দেন। আশ্রমের কাজকর্ম্ম করেন।

—কেউ নেই? প্রশ্নটা যেন আপন মনেই জিজ্ঞেস করি। সংসারে যার কেউ নেই, এই ভাবেই কোথাও না কোথাও তার আশ্রয় জুটে যায় বৈ-কি। ভগবানই জুটিয়ে দেন।

সন্ন্যাসী বলছিলেন—আমার পাশে জমি কিনে রেখেছে কলকাতার একজন নার্স। তারও কেউ নেই। সে আমার শিষ্যাও নয়। অথচ এই আশ্রয় দেখে আর মা ঠাকরুণকে দেখে বলেছে, এইখানেই আমার থাকা সুবিধে হবে। এইবার বোমার হাঙ্গামার সময়ে এসে আমার এখানে কিছুদিন ছিল।

—জমি পাওয়া যায়?

—কেন যাবে না, নেবেন?

আমার একটা খারাপ অভ্যেস, যেখানে যত ভাল জায়গা দেখবো, সেখানেই আমার ইচ্ছে হবে যে বাড়ী তৈরি করি। সুতরাং অন্যমনস্কভাবে বলেই ফেললাম—ইচ্ছে তো আছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসুন না! জমি আমিই দিচ্ছি। ঘরদোর আপাততঃ আমার আশ্রমের মত খড়েরই করুন, সস্তায় হবে।

—বেশ, তবে ঘর তৈরির দেখাশুনো আপনাকে করতে হবে। আমি তো কালই চলে যাচ্ছি, টাকা পাঠিয়ে দেবো।

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তরের মধ্যে বসে আমি যেন ক্ষণকালের জন্য সেখানকার অধিবাসী হয়ে গিয়েছি মনে হলো। কি সুন্দর হবে যখন এখানে নিজের ঘরের সামনে বসে থাকবো এমনি নির্জ্জন রাত্রির জ্যোৎস্নার মধ্যে।

একটু পরেই সেখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। আজ পাঁচ-ছ'মাসের মধ্যে সেখানে আর যাওয়া ঘটে নি—যেমন ঘটে নি আরও কত ওর চেয়েও ভাল জায়গায় যাওয়া—যেখানে যেখানে বাড়ী করবার অদম্য ইচ্ছা একদিন মনে হঠাৎ জেগেছিল এবং হঠাৎই মিলিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মধ্যে আমার ঝাড়গ্রামের সেই আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন··· তুমি কি কোনো সাধুকে জমি কেনার কথা বলেছিলে? একদিন হাটে আমার সঙ্গে এক সাধুর দেখা। আমায় বললেন, আপনাদের বাড়ীতে এসেছিলেন কলকাতার একটি বাবু, তিনি জমি নেবেন, বলেছিলেন। জমি সব ঠিক করে ফেলেছি, তিনি যদি আসেন তবে জমিটা লেখাপড়া করিয়ে দিই! ভাবে বুঝলাম, তুমি।

মনে পড়লো আরও অনেক জায়গায় অমন জমি নেবো বলেছিলাম। তখন সৌন্দর্য্য দেখে ভুলে যাই যে অত জায়গায় বাড়ী করবার মত পয়সা নেই আমার হাতে। সেবার দার্জ্জিলিঙ গিয়ে ভাবলাম ঘুমে একটা বাড়ী না করলে আর জীবনে ঘুম নেই! কিন্তু যখন জিজ্ঞেস করে জানা গেল অন্ততঃ ছয় হাজার টাকার কমে ঘুম শহরে বাড়ী হবার জো নেই—তখনই—শত হস্তেন বাজিনাম্।

ঝাড়গ্রামের আত্মীয়টির সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়। ব্ল্যাক-আউটের কলকাতায় বসে ক্ষণকালের জন্যে চোখের সামনে ভেসে উঠলো খানাকুই গ্রামের প্রান্তে

সেই জ্যোৎস্নাস্নাত শালবন ও উদাস প্রান্তর ; বনে-ঝোপে অজস্র ফোটা ল্যাণ্টানা ফুল, নানা রং-বেরং-এর। এই ফুলটা ওখানকার জঙ্গলে যত দেখেছি তত বাংলা-দেশের এ অঞ্চলে কোথাও দেখি নি। তবে আজকাল কিছু কিছু আমদানি হয়েছে, বিশেষতঃ রেললাইনের ঢালুতে। রেললাইনের ঢালুতে অনেক বিদেশী ফুল দেখতে পাওয়া যায়। হয়তো রেলগাড়ীর সাহায্যে ঐ সব বীজ দেশবিদেশে কি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে—এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে আমি জানি নে।

জানুয়ারী মাস! আমি ঘাটশিলা আছি সে সময়। পাশের স্টেশন হোল গালুডি। কয়েকটি বন্ধু সেখানে ইংরিজি নববর্ষের উৎসব করবেন, আমাকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করেছেন।

হেঁটেই রওনা হই। বেশি নয়, ছ মাইল রাস্তা। কিন্তু পথের দৃশ্য আমার কাছে বেশ ভালই লাগে। উঁচু রেলপথের বাঁধ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, ডাইনে মাইল দুই আড়াই দূরে এবং বাঁয়ে মাইল চারেক দূরে রেলপথের সঙ্গে সমান্তরাল শৈলমালা চলেছে বরাবর। ডাইনে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলমালা, বাঁদিকে কালাঝোড়।

বেলা পড়ে এসেছে। একস্থানে রেলওয়ে কাটিং, অর্থাৎ সেখানে উঁচু ডাঙার কঠিন পাথরের মধ্যে দিয়ে রেললাইন কেটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বড় বড় চুণা-পাথর ও বালিপাথরের চাঁই পড়ে আছে, খুব উঁচু পাথরের স্তূপ দেখাচ্ছে অনুচ্চ পাহাড়ের মত।

একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। জায়গাটাতে একটু বসে নিলাম। সূর্য্য হেলে পড়েছে সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশের মাথায়। কিছু দূরে জগন্নাথপুর বলে সাঁওতালী গ্রাম। একটা মাদার গাছ। ধূ ধূ করছে সিংভূমের উন্মুক্ত প্রান্তর। শীতের হাওয়ায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে বলে আলোয়ানটা মুড়িসুড়ি দিয়েছি।

হঠাৎ একটা লোক বাংলা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছেঃ "হরি দুখ দাও যে জনারে।"

বাংলাদেশ থেকে এত দূরে নীলকণ্ঠের গান কে গাইতে গাইতে যায়? ছেলে-বেলায় বাবার মুখে শোনা গান—এখন এসব গানের চলন আর কোথাও নেই। সিনেমার গানে দেশ গিয়েছে ভরে!

আমার ডাকে লোকটা কাছে এল। মলিন তালি-দেওয়া নীল প্যাণ্ট ও শার্ট পরা একজন সাঁওতাল যুবক। বললাম—বাড়ী কোথায় রে?

—বনকাটি।

—মৌ-ভাণ্ডারে কাজ করিস্?

—হাঁ বাবু।

—এ গান শিখলি কোথায়?

—বুড়া লোকদের মুখে শেখা বাবু।

—সবটা জানিস্? গা' দিকি—

—বাবু, তোমাদের সামনে কি আমরা গান গাইতে পারি? উশ্চারণ হয় না—

—ঠিক হবে, তুই গা। কি কাজ করিস?

—স্মিলোটে (অর্থাৎ, স্মেলটিং বিভাগে)—

—হপ্তা কত পাস?

—চার টাকা সাত আনা বাবু—

—আচ্ছা গান গা—

গান গেয়ে ছোকরা চলে গেল। আমিও উঠে কাঁদোড় নামে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য ঝর্ণা

পার হয়ে গালুডি এসে পৌঁছলুম। বড় বড় পাহাড়ে তখন ছায়া পড়ে এসেছে—দূর থেকে বেশ দেখাচ্ছে পাহাড়ের গাগুলো। কাঁদোড় নদীতে সাঁওতাল মেয়েরা মাছ ধরছে, কুলিরা মাঠ থেকে ঘুটিং পাথর কুড়ুচ্ছে গালুডির মাড়োয়ারী মহাজনদের জন্যে।

গালুডিতে পৌঁছুতে বন্ধুরা খুব খুশী হলেন। নববর্ষের উৎসবে স্থানীয় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা অভিনয় করলে, যথেষ্ট খাওয়া-দাওয়া গেল। ঘাটশিলাতে ফিরলাম সেই রাত্রেই, জনৈক নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের মোটরে। বাড়ী আসতেই শুনলাম, চাঁইবাসা থেকে মোটর নিয়ে লোক এসেছিল, সেখানে সভা করতে যেতে হবে। বললাম—তারা গেল কোথায়?

—তুমি গালুডি গিয়েছ শুনে, ওরা মোটর নিয়ে সেখানে গেল খুঁজতে।

—পথে তো কোনো মোটরের সঙ্গে দেখা হয় নি, তবে আমরা মোড় ঘুরলে হয়তো ওরা পৌঁচেছে, এ হতে পারে।

আমার ভাবনা হোল বিদেশী লোক রাত্রে থাকবে কোথায়? তাদের তো গালুডি যাবার কোনো দরকারই ছিল না।

সে রাতে কেউ এল না, খুব সকালে দেখি একখানা মোটর বাড়ীর পাশে দাঁড়াল। আমি এগিয়ে গেলুম, চাঁইবাসার তারাই বটে।

—কাল গালুডি গিয়েছিলেন কখন?

—আর মশাই কি কষ্ট। তখন রাত দশটা।

—তারপর?

—খুঁজে তো বাড়ী বের করলাম, তাঁরা বললেন, এইমাত্র মোটরে ওঁরা চলে গিয়েছেন।

—রইলেন কোথায়?

—সেখানকার ডাকবাংলোয়।

যাহোক, খেয়ে-দেয়ে চাঁইবাসা রওনা হই। সুবর্ণরেখার ক্ষীণ জলধারা কংক্রিটের নীচু সাঁকোর উপর দিয়ে ঝির ঝির করে বইছে—আমরা মোটরে সাঁকোর ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলাম—কিন্তু বর্ষাকালে সাঁকো ডুবে যায়, ডোঙা ছাড়া পার হওয়ার কোনো উপায় থাকে না।

মুসাবনীর রাস্তা আরও দু মাইল দূরে। চওড়া মোটর-রোড, একদিকে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি শৈলশ্রেণী, অন্যদিকে বন। টাটা-কোম্পানী এক জায়গায় পাহাড়ের গা থেকে schist পাথর কেটে নিয়ে যাচ্ছে; সেখানটাতে পাহাড়ের গায়ে অনেক দূর পর্য্যন্ত যেন একটা দগদগে ঘা।

রাখা-মাইন্‌স্ পার হয়ে বন পাতলা হয়ে এল। চষা ক্ষেত, সাঁওতালী গ্রাম ডাইনে। বাঁদিকে কিন্তু সেই যে পাহাড় চলেছে তো চলেছেই। শীতকালে পত্রবিরল দীর্ঘ দীর্ঘ শালের গাছগুলো দেখে মনে হচ্ছে কারা যেন পাহাড়ের ওপরে শালের খুঁটি পুঁতে রেখেছে।

বাঁদিকে এক জায়গায় একটা নাবাল মত উপত্যকা। সঙ্কীর্ণ গিরিপথের বাঁ দিকের পাথরে সিঁদুরের দাগ লেপা। এখানকার নাম কাপড়গাদি ঘাট। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসের সময় এই পর্য্যন্ত এসে আর নাকি এগোন নি (পাণ্ডবেরা যান নি দুনিয়ার হেন জায়গা দেখি নি! পাণ্ডবদের পদচিহ্ন সর্ব্বত্র), অতএব এরও আগের ভূভাগ হোল পাণ্ডববর্জ্জিত দেশ। আর এখানে কবে তাঁরা নাকি ময়লা কাপড় সাবান সোডা দিয়ে কেচে পরিষ্কার করেছিলেন। তাই এর নাম কাপড়গাদি ঘাট। বেচারী

পাণ্ডবেরা! বনে জঙ্গলে টো টো করে ঘুরে কাঁহাতক কাপড় পরিষ্কার রাখা যায়? আরও এগিয়ে গেলুম মাইল বারো—সবসুদ্ধ যেতে হবে ৪৭ মাইল রাস্তা এই রকম শোভাময় বনপথ দিয়ে।

একটা ক্ষুদ্র গ্রাম ছাড়িয়ে একটা রেল লাইন আমাদের রাস্তার ওপর দিয়ে কোথায় যেন গেল। শুনলাম, এটা টাটা-বাদামপাহাড় লাইন। এর পরই দীর্ঘপ্রসারী মাঠের মধ্যে তিরিন্ বলে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বাড়ীঘরগুলো বিশাল প্রান্তরে দিক্-হারা হয়ে হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে যেন পরস্পর জড়াজড়ি করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে।

এক পাশে একটা ডাকবাংলোর মত ঘর। সেখানে গিয়ে মোটর থামাতেই একটি বাঙালী বাবু এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনাকে একবার নামতে হচ্ছে।

—কিন্তু বড় দেরি হয়ে যাবে, চাঁইবাসা পোঁছুতে।

—তা হোক্, সামান্য একটু চায়ের ব্যবস্থা—

কি করি, নামতেই হোল! মাঝারি আকারের বাংলো, চারিদিকে ঘোরানো বারান্দা। ভদ্রলোকটির বাড়ী বাঁকুড়া জেলায়; এখানে পি. ডব্লিউ. ডি.-তে চাকুরি করেন।

—কতদিন আছেন?

—তা প্রায় দু বছর—

—কেমন লাগে?

—আমি এক রকম যা হয় করে থাকি, কাজে পাঁচ জায়গায় ঘুরি, কিন্তু বাড়ীর মেয়েদের বড় কষ্ট।

—এ গ্রামে—

—গ্রামের কথা বাদ দিন। এখানকার মেয়েদের সঙ্গে খাপ খায় না—বাঙালীর মেয়ে অন্য বাঙালী মেয়ের মুখ না দেখলে হাঁপিয়ে ওঠে, তাদের হয়েছে সত্যিকারের বনবাস।

—কিন্তু সিনারি বেশ, কি বলেন?

—সে আপনাদের চোখে হয়তো লাগতে পারে। আমাদের মন হাঁপিয়ে ওঠে—

মেয়েদের হাতে যত্নে সাজানো রেকাবে জলখাবার ও চা এল। আমরা সেগুলির সদ্ব্যবহার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাবুটির কথা শুনে গৃহলক্ষ্মীদের জন্যে সত্যিই মনে কষ্ট অনুভব করছিলুম, এ যেন সেই আরিজোনার মরুভূমির মত রুক্ষদর্শন ভূভাগ—কালো কালো বনাবৃতপাহাড়, টিলা, উন্মুক্ত দিকচক্রবাল, এখানে মেয়েদের মন হাঁপিয়ে ওঠবার কথা বটে।

ভদ্রলোকের কাছে বিদায় নিয়ে তাঁর আতিথেয়তার জন্যে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠলুম। আরও মাইল দশ-বারো গিয়ে খড়কাই নদী। নদী পার হয়ে মোটর থামিয়ে সেই নির্জ্জন বালুকাস্তৃত নদীচরে অস্পষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে কিছুক্ষণ দাঁড়াই। দূরে একটা পাহাড়, সামনে কটা রংএর বালুরাশির মধ্যে নাতি-গভীর খাত সৃষ্টি করে ক্ষীণকায়া খড়কাই বয়ে চলেছে। কেমন একটি উদাস শোভা এই জনহীন প্রান্তরের, এই পার্ব্বত্য তটিনীর, রহস্যময়ী সন্ধ্যার।

চাঁইবাসা পোঁছে গেলাম রাত আটটার মধ্যে।

সভার কাজকর্ম্ম পরদিন মিটে গেল। ওখানকার বন্ধুরা তখনও ছাড়তে চান না। দুজন ফরেস্ট-অফিসারের সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়ে গেল। তাঁরা বললেন—আপনি বনের কথা লিখেছেন অনেক, কিন্তু সিংভূমের বন আপনি দেখেন নি—

আমি বললাম—কেন, অনেক বন তো দেখা গেল—

তাঁরা মৃদু হাসলেন। বললেন—আমরা ফরেস্ট-অফিসার হয়ে বন দেখি নি, আর আপনি বন দেখেছেন? হোতেই পারে না।

—কোন্ বনের কথা বলচেন?

—আপনি বাঝিয়াচুর দেখেন নি, চিটিমিটি দেখেন নি, জাতে দেখেন নি—

—জাতে? সে আবার কি রকম নাম? চিটিমিটিই বা কি নাম—

—হো-ভাষার নাম। ও অঞ্চলের বনের বাসিন্দা সবই হো—যেমন রাঁচীর ওদিকে সব মুণ্ডা। চলুন আপনাকে ওদিকটা দেখিয়ে আনি—

আমার আসল বন ভ্রমণ এইভাবে শুরু।

৩রা জানুয়ারী। বন্ধুরা মোটর নিয়ে এলেন। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হোল। রোরো নদী পার হয়ে আমাদের গাড়ী সোজা চললো রাঁচী রোড বেয়ে প্রায় মাইল দশেক। তারপরেই বাঁদিকের ফরেস্ট রোড ধরে বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললো।

চাঁইবাসা ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের বড় শোভা। রাঙা মাটি, উচ্চাবচ ভূমিভাগ, ছবির মত দেখতে সমস্তটা। মুশকিল হয়েছে, যারা সেখানে অনেকদিন আছে, তারা সেখানকার সৌন্দর্য্য ভালো ধরতে পারে না। চাঁইবাসার বাসিন্দাদের অনেকের মতে এসব এমন আর কি?

এখানে একটা কথা মনে পড়লো। ঘাটশিলা থেকে সাত-আট মাইল দূরে বেশ একটি নিৰ্জ্জন বনভূমি ও ক্ষুদ্র একটি ঝর্ণা আছে। তার প্রবেশপথটি সত্যই অতি সুদৃশ্য। শরৎকালে, পৰ্ব্বতসানুর বনে অজস্র বনশিউলি ফুল ফুটে ঝরেছে শিলাতল বিছিয়ে, শিশিরার্দ্র বনস্থলীর সুগন্ধ মনে শান্তি আনে, তৃপ্তি আনে, নব নব কল্পনা জাগায়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন আমাদের সঙ্গে এক বড়ঘরের বধূ ছিলেন, তিনি সারা পথ কেবল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন—এ কি আর এমন। কাশ্মীরে যা দেখেছি তার তুলনায় এ—

আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করছি নে। কাশ্মীর ভালো নয় কেউ বলছে না—তা বলে যে একবার কাশ্মীর দেখেছে তার কাছে সব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিস্বাদ হয়ে যাবে, আর কিছু থেকে সে আনন্দ পাবে না, গাছপালা নদী প্রান্তরের সৌন্দর্য্য দেখবার সহজ চোখ সে হারিয়ে ফেলবে? এ যদি হয় তবে কাশ্মীর না দেখাই মঙ্গলজনক!

বরকেলা শৈলশ্রেণীর মধ্যে বনপথে অনেকখানি গিয়ে সৈদবা নামে একটি বন্য-গ্রাম আছে। সেখানে বন-বিভাগের কৰ্ম্মচারীদের জন্য একটি বাংলো আছে। বেলা প্রায় বারোটা। রান্নাবান্না করে খেয়ে নিতে হবে এখান থেকে। আমরা চা খেয়ে বাংলোর আরাম-কেদারায় গল্প করি কিছুক্ষণ।

মিঃ সিংহ বললেন—আরাম-কেদারায় শুয়ে আছেন বলে ভাববেন না এ বড় আরামের জায়গা।

—কেন?

—রাত্রে এই বাংলোর বারান্দাতেই আমি বাঘ চরতে দেখেছি।

—গ্রাম তো রয়েচে নিকটে।

—গ্রাম থেকে ছাগল ভেড়া ধরে নিয়ে যায় বাঘে।

—মানুষও নাকি ?

—সুবিধে পেলে ছাড়ে না।

ঘরের বাইরে এসে চারিদিকটা ভালো করে দেখে নিলাম।

বাংলোর পিছনে বোধ হয় একশো হাতের মধ্যে উঁচু পাহাড়। ঠিক এ রকমই পাহাড় ও বাংলোর সম্মেলন এইবার আর এক জায়গায় দেখেছিলুম সে কথা পরে বলব। সেটা হোল মানভূম জেলায়। পাহাড়ের ঢালু থেকে বনানী নেমে এসে বাংলোর হাতায় মিশেছে, লোকজন তত চোখে পড়ে না।

একটা ছোট খড়ের ঘরের সামনে এসে মোটর দাঁড়ালো। বস্তি নয়, অন্ততঃ আশেপাশে লোকজনের বাস দেখলাম না। শুনলাম ঘরটা গবর্নমেণ্টের বাংলো, বনবিভাগের লোকজন সেখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতে পারে।

এখান থেকে বামিয়াবুরু প্রায় এগারো মাইল দূরে। এই এগারো মাইলের মধ্যে লোকজনের বাস নেই—ঘন বনের মধ্যে গাড়ী ঢুকে পড়লো ক্রমশঃ—মোটর রোড ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠলো—বড় বড় গাছ দুধারে, শাল আর প্রায়ই মহুয়া।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটু ফাঁকা—চেয়ে দেখি আকাশ যেন অনেকখানি নীচে, বুঝলাম অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েচি।

মিঃ সিংহ বললেন, মুখ বার করে চেয়ে দেখুন, ওই ওপরে ফরেস্ট-বাংলো!

সত্যিই অনেক উঁচুতে বাংলোটা। যে পাহাড়ে উঠচি, এই পাহাড়ের মাথায় সর্ব্বোচ্চ শিখরে একটা বাংলোঘরের লাল টালির ছাদ একটু একটু চোখে পড়চে।

অনেকক্ষণ পরে পাহাড়ের মোড় ঘুরে মোটরটা অপেক্ষাকৃত সমতল স্থানে এক প্রকাণ্ড বাংলোর সামনে এসে থেমে গেল। তখন শীতের সন্ধ্যার রোদ নিকটে দূরে ছোট বড় পর্ব্বতশিখর সোনার পাতে মুড়ে দিয়েচে।

স্থানটির গম্ভীর দৃশ্যে মন মুগ্ধ হয়ে গেল। যেদিকে চোখ যায়, শুধুই বনাবৃত পর্ব্বতশিখর, ছোট বড়—নানা আকারের পর্ব্বতচূড়া, কোনোটা গোল, কোনোটা মোচাকৃতি, কোনোট সমতল, ঘন বনে ভরা, আবার কোনো কোনো পর্ব্বত-গাত্র অনাবৃত, কালো ব্যাসাল্ট পাথরের স্তর সাজানো, রাঙা রোদ পড়ে সোনার পাহাড়ের মত দেখা যাচ্ছে।

বললুম—নিকটে কোনো লোকালয় নেই ?

—নিকটতম লোকালয় সেই কুইপা গ্রাম। এগারো মাইল দূর এখান থেকে—

—বড্ড নির্জ্জন জায়গা। এখানে কি কেউ থাকে ?

—বাংলোর চৌকিদার ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে পাহাড়ের নীচের দিকে।

—অদ্ভুত বনের দৃশ্য বটে। বাঘ ভালুক আছে ?

—বুনো হাতী যথেষ্ট। বাঘও আছে, ভালুকও আছে—

চায়ের টেবিল পাতা হোল—আমি প্রস্তাব করলাম, টেবিল টেনে বাংলোর সামনে সমতল জায়গায় পাতা হোক্। রাঙা রোদ মাখানো অরণ্য ও পর্ব্বতশিখরের দিকে চোখ রেখে বসে চা খাওয়া যাক। সত্যিই এমন গম্ভীর অরণ্য-দৃশ্যের মধ্যে চা খাওয়া হয় নি কতকাল। এই বাংলোর সামনে দিয়ে গভীর রাত্রে কত বন্য হাতী, বাঘ, ভালুক চলে বেড়ায়—গবর্নমেণ্টের নোটিশ টাঙানো আছে বেশি রাত্রে বাংলোর বারান্দায় কেউ না আসে—এমন নির্জ্জন বন্য পরিবেশের মধ্যে রুটি, মাখন, চা প্রভৃতি সভ্য খাদ্য খাওয়ার নূতনত্ব আছে বৈ কি।

চা খাওয়ার পরে মিঃ সিংহ বললেন—অন্ধকার হওয়ার দেরি আছে এখনও।

চলুন আপনাকে মাছ ধরার বাঁধ দেখাই—

আমরা পাহাড়ের নীচে নেমে এলুম। চারিধারে নির্জ্জন ঘন অরণ্যানীর স্তব্ধতা; কয়েকটি হো-কুলি-মেয়ে লতাপাতা নিয়ে তৈরী কুঁড়েঘরের সামনে বসে বুনো খেজুর পাতার চেটাই বুনচে।

আমরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাদের কি হাসি! আমি হো-ভাষা জানি না, মিঃ সিংহ তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথাবার্ত্তা বললেন।

আমি বললুম—কি বলছে ওরা?

—বলচে, বাবু এখানে কি দেখতে এসেচে!

—জিজ্ঞেস করুন ওদের নাম কি।

—একজনের নাম সামান্ কুই, একজনের নাম বুধন্ কুই—কুই অর্থাৎ মেয়ে।

—বেশ নাম। ওরা কি খায়?

—শুধু ভাত। না ডাল, না তরকারী, ও সব খেতে জানে না এদেশে।

-সারাদিনে কি রোজগার করে?

—চার আনা।

—এতেই সন্তুষ্ট থাকে?

—খুব। একটু পরে দেখবেন গান করবে সবাই এক সঙ্গে। ওদের মত অল্পে সন্তুষ্ট জাত নেই। মিথ্যা কথা বলতে জানে না, অত্যন্ত সরল। সভ্যতার সম্পর্কে যারা এসেছে, তারা সবাই দুষ্টু, বদমাইশ হয়ে গিয়েচে। কোনো টাউন বা কারখানার নিকটে যে সব হো বা ওঁরাও বাস করে, প্রায়ই সব খারাপ! কিন্তু এ বনের মধ্যে এরা অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত সৎ।

ওদের মুখের দিকে চাইলেই সে কথা বোঝা যায়। ছেলেমানুষের মত পবিত্র সরল নিষ্পাপ মুখশ্রী। সরলতা ও নির্লোভিতা ওদের মুখে সুকুমার রেখার অক্ষরে লেখা রয়েচে।

মিঃ সিংহ বললেন—আর একটা মজা, এরা বেশী রোজগার করতে চায় না। দিনের সামান্য মজুরি হাতে পেলেই খুশী। আর কিছুতেই কোনো প্রলোভনেই সেদিন খাটতে চাইবে না। এক জায়গায় সবাই গোল হয়ে বসে চেটাই বুনবে, গান গাইবে। কিন্তু রাঁচী শহরে গিয়ে এদের দেখুন, অন্যরকম দেখবেন।

আমরা এগিয়ে গিয়ে একটা বড় ঝর্ণার কাছে এলাম। ঝর্ণার এক দিকে বাঁধ বাঁধা। বর্ষাকালে এখানে একটা পুকুরের সৃষ্টি হয়। মিঃ সিংহের মুখে শুনলাম, এটাই মাছ ধরার বাঁধ। কোথা থেকে মাছ আসে একথা আমি জিজ্ঞেস করি নি।

তখন সে সব তুচ্ছ প্রশ্নের অবকাশও ছিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে অরণ্যের অলি-গলিতে, সুঁড়ি পথে ঘন হয়ে নামচে। যেখানটাতে মাছের বাঁধ তার চারিধারে বড় বড় শালগাছ উঁচু হয়ে আকাশকে ঢেকেচে—শুধু অন্ধকার আর জল-পতনধ্বনি আর নির্জ্জনতা আর মনের মধ্যে এক রকমের গা-ছম্‌ছম্-করা ভয়ের বিচিত্র অনুভূতি। মাছের বাঁধ ছেড়ে আরও প্রায় দু রশি গিয়েচি তখন। দু রশি কি তিন রশি, কিন্তু চারিদিকে চেয়ে আমার মনে হোল এ পৃথিবীতে আমি আর এই দুই বন-বিভাগের কর্ম্মচারী ছাড়া (দুজনেই মিঃ সিংহ—হরদয়াল সিং ও যোগীন্দ্র সিংহ) আর বুঝি কেউ নেই—আফ্রিকার ঘন অরণ্যে নর-খাদক অসভ্য জাতিদের দেশে যেন এসে আটক পড়ে গিয়েচি। যেমন ঘন বনানী তেমনি ঘন অন্ধকার চারিপাশে।

হরদয়াল সিং হঠাৎ বললেন—এইখানটা একটু সাবধান, রয়েল বেঙ্গল টাইগার এখানকার ওই সুঁড়ি পথটা দিয়ে জল খেতে নামে ঝর্ণায়।

জঙ্গলের একপাশ দিয়ে একটুখানি সরু পথরেখা অন্ধকারেও যেন বিভীষিকার সৃষ্টি করে রেখেচে মনে হোল। বললুম—না গিয়ে—এবার ফিরলে ভাল্লো হোত না? বাংলো থেকে প্রায় মাইল দেড়েক তো এসে গিয়েচি।

ফিরবার পথে আবার সেই হো-মেয়েদের আস্তানা। বাঘের, হাতীর, বুনো ভালুকের দেশের মেয়ে এরা। দিব্যি সেই অরণ্য মধ্যে দরজাহীন, অর্গলহীন পাতার কুঁড়ের মধ্যে বসে আগুন জ্বালিয়ে রান্নাবান্না করচে। কেউ কেউ কুঁড়ের সামনে বসে চেটাই বুনচে, গল্প করচে, গান করচে।

আমাদের দেখে আবার ওরা হাসতে লাগলো—অথচ হাসবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ছেলেমানুষের মত সম্পূর্ণ অকারণে উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ।

আমাদের আপ্যায়ন করে বললে—জোম্ পে—জোম্ পে—

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কি বলে?

—বলচে, ভাত তৈরি—খাও।

—চলুন দেখা যাক—কি খাচ্ছে।

বড় বড় মেটে হাঁড়িতে ভাত সিদ্ধ হয়েচে, অথচ কোনো দিকে কিছু দেখা গেল না। ওরা বড় কাঁসার উঁচু থালাতে এক রাশ ভাত ঢেলেছে এক একজনের জন্য। শুধু ভাত—নুনই বা কৈ! আশ্চর্য্য এই যে, ওই নিটোল স্বাস্থ্য শুধু এই উপাদান-বিহীন ভাত খেয়ে। আমি মিঃ সিংহকে বললুম—ওদের জিজ্ঞেস করুন, ওরা ডাল তরকারী খায় না কেন? আমার প্রশ্নের অর্থ যখন তাদের বোধগম্য হোল, তখন তারা আর এক প্রস্থ হেসে উঠলো—যেন আমি খুব একটা হাসির কথা বলেছি। উত্তর দিলে—এই খাই।

কারণ নেই, যুক্তি নেই, কথার বাহুল্য নেই। শুধু উত্তর দিলে—এই খাই।

অনেক ঘেঁটু গাছ বনের প্রান্তে, পাহাড়ী ঢালুর সীমানায়। তবে কিনা এখন ফুল নেই গাছে, তবুও আনন্দ হোল গাছগুলো দেখে, এতদূর পাহাড়ী দেশে বাংলা-দেশের নিজস্ব বন্যপুষ্পের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ ঘটলো।

অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানটি, দূরে সৈদবা গ্রাম, কিন্তু বাংলো থেকে গ্রামের ঘরবাড়ী নজরে আসে না। আমরা কিছু দূরে একটি উপত্যকায় সাবাই ঘাসের চাষ দেখতে গেলুম, একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে মোটর গিয়ে দাঁড়ালো যেখানে, সে স্থানটি চারিদিকে বনে ঘেরা, মাঝখানে খানিকটা সমতল ফাঁকা মাঠ। গাঁট বাঁধা কলে হো-কুলিরা সাবাই ঘাসের আঁটি একত্র করে গাঁট বাঁধছে। নিকটেই গাছতলায় একজন কেরানী বসে কুলিদের হিসেব রাখছে।

কেরানী সর্ব্বত্রই বাঙালী। কাছে গিয়ে বললুম—মশাইকে বাঙালী বলে মনে হচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি এখানে ক্লার্ক? কতদিন আছেন?

—তা সাত বছর হোল।

—এ সাবাই ঘাসের ব্যবসা কাদের?

—আজ্ঞে দেবীপ্রসাদবাবুর, সনুয়া স্টেশনের কাছে আপিস আর আড়ৎ—মাড়োয়ারী।

—মাড়োয়ারী তো নিশ্চয়ই। সে আপনি বলবার আগেও বুঝেচি। জায়গা কেমন এটা?

—ভালো। তবে বড্ড জঙ্গল—মানুষের মুখ দেখার জো নেই।

—থাকেন কোথায়?

—সৈদবা গ্রামেই বাবুদের বাসা আছে কর্ম্মচারীদের জন্যে, সেখানে রেঁধে খাই।

—ভাল লাগে?

—নাঃ। তবে কি করি বলুন, চাকরির খাতিরে সবই করতে হয়। এই বাজারে চাকরিটুকু গেলে—

—সে তো বটেই।

বনবিভাগের দু জন বড় কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে। তাঁরা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন পাহাড়ের ওপরে যেখানে সাবাই ঘাসের চাষ চলচে। পাহাড়ের ঢালু জমিতে বড় বড় ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে পাহাড় ঘিরে। তার আশেপাশে গোছা গোছা উলু ঘাসের মত সবুজ সাবাই ঘাসের গোছা—আমন ধানের গোছার মত।

বললুম—ট্রেঞ্চ কিসের?

দু জন বনবিভাগীয় কর্ম্মচারীই অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বললেন—জানেন না, ওর নাম কনটুর ট্রেঞ্চ—ওই খালের মত কাটা আছে বলে পাহাড়ের মাটি সরস হয়ে উঠচে। ও জিনিসটা নতুন বেরিয়েচে, আগে ও থিওরিটা ছিল না। এখন দেখা যাচ্ছে, কন্‌টুর ট্রেঞ্চের হাওয়া যতদূর যায়, ততদূর সরস হয়ে ওঠে মাটি আর বাতাস।

এ কথা এদের মুখে আরও অনেকবার শুনেছি। কন্‌টুর ট্রেঞ্চ থিওরির বড় ভক্ত এঁদের মত আর দেখি নি। সেই ভীষণ শুষ্ক পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে বিশ্বাস করা শক্ত যে কোনো দিন আবার এখানকার মাটি-বাতাস সরস হবে।

বললুম—আপনারা ইজারা দেন দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারীকে?

—ন বছরের লিজ আছে ওর সঙ্গে। চার হাজার টাকা বছরে—

—তিনি কোথায় ঘাস বিক্রি করেন?

—বামার লরি কোম্পানীর কনট্রাক্ট আছে—তারা সনুয়া স্টেশন থেকে মাল নিয়ে যায়।

—বেশ লাভ আছে, কি বলুন?

—খরচ-খরচা বাদে পাঁচ-ছ হাজার টাকা থাকে দেবীপ্রসাদবাবুর। নইলে কি কেউ ভূতের বেগার খাটে!

মনে ভাবলুম, ভূতের বেগার দেবীপ্রসাদবাবু খাটতে যাবেন কেন, সে যদি কাউকে খাটতে হয় তবে খাটচে, ওই বেচারী বাঙালী কেরানীবাবু। এই নির্ব্বান্ধব স্থানে জঙ্গলের মধ্যে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর খেটে হয়তো মাসে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়—তাও পায় কিনা কে জানে! ধনিক যিনি, তিনি প্রকাণ্ড অস্টিন-গাড়ীতে চেপে এসে একবার এক ঘণ্টার জন্যে হয়তো এসে তদারক করেন।

সেই বনাবৃত উপত্যকার এক প্রান্তে সেই ঝর্ণাটির কুলুকুলু ধ্বনি বনপত্র-মর্ম্মরের সঙ্গে মিশে এক মধুর সংগীত রচনা করে চলেচে। আমরা তিনজনেই বটবৃক্ষের ছায়ায় শুকনো ছড়ানো সাবাই ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, আকাশ দেখি, বিহঙ্গ-কাকলী কান পেতে শুনি, খোশগল্প করি।

বেলা দুটোর পর বাংলোতে গিয়ে আহারাদি সেরে নিলুম। গরম গরম খিচুড়ি খেতে সেই বনের মধ্যে খুব মিষ্টি লাগলো।

আবার বনের মধ্যে দিয়ে পথযাত্রা। দু পাশের ঘন বন, একদিকের পাহাড়ের দেওয়ালের মধ্যেকার চওড়া রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটেচে। বন ক্রমশঃ ঘন হতে ঘনতর

হয়ে উঠেচে। যেতে যেতে এক জায়গায় মনুষ্যকণ্ঠের সম্মিলিত সংগীত কানে এল। ব্যাপার কি? গান গায় কে?

মিঃ সিংহ বললেন—দেখবেন? এখানে কাইনাইটের খনি আছে—

—জঙ্গলের মধ্যে—

—বেশী দূর নয়, পথের ধারে।

মোটর থামিয়ে আমরা গাছপালা ঠেলে বনের মধ্যে ঢুকি। আমাদের সামনে একটা ধাওড়া চালাঘর, জংলীঘাসে ছাওয়া। ত্রিশ-চল্লিশ জন তরুণী স্বাস্থ্যবতী হো-কুলিরমণী সেখানে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে লোহার দুরমুশ দিয়ে পাথুরে কয়লার মত কি জিনিস চূর্ণ করচে আর এক সঙ্গে গান গাইচে হো ভাষায়।

মিঃ সিংহ বললেন—ঐ কালো কয়লার মত জিনিসটাই কাইনাইট্।

—খনি কোথায়?

—আরও জঙ্গলের মধ্যে।

—এর মালিক কে?

—এও দেবীপ্রসাদ মাড়োয়ারীর। বনের মধ্যে খনির কাছেই এর বাসা আর আপিস আছে। সেখানে দু-তিন জন বাঙালীবাবু—

—খাতা লিখছে—

—হ্যাঁ।

আবার মোটরে এসে উঠলুম। বন ছাড়িয়ে উঁচুনীচু মাঠ, মাঠ ছাড়িয়ে আবার ছোটখাটো বন, আবার মাঠ, মাঝে মাঝে পাথর ছড়ানো হো-গ্রাম। ফিল্মের ছবির মত সুন্দর এই বন্য গ্রামগুলি। কালো মাটির দেওয়াল দেওয়া ছোট নীচু ঘরগুলি, চালায় চালায় বসতি। এরা ফাঁকা ফাঁকা ভাবে বাড়ী তৈরী করতে জানে না; এক বাড়ীর দেওয়ালের গায়ে অন্য গৃহস্থ চালা বসিয়েচে অন্যদিকে। বড় বড় পাথর ছড়িয়ে পড়ে আছে চারিদিকে--বোধহয় সেগুলো পারিবারিক সমাধি বা দেবদেবীর স্থান। প্রত্যেক হো বন্য গ্রামেই এমন পাথর ছড়ানো দেখেছি—মোটা মোটা পাথর ডালমেন্ বা মেনহিরের ধরণে খাড়া করে পোঁতা—তাদের গায়ে হিন্দিতে কি লেখাও আছে।

একখানা পাথরের গায়ে লেখা—

বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাই।

ঘর—বনটুডি

জিলা—সিংভূম

জিজ্ঞেস করলুম—কাকে অমর করবার ব্যবস্থা এ?

মিঃ সিংহ বললেন—কেন বনটু মালাইয়ের পুত্র অস্থিক মালাইকে।

—তার কি হয়েচে?

—সে মারা গিয়েচে।

আবার ফিরলাম বামিয়াবুরু বাংলোতে। সন্ধ্যা তখন হয়-হয়।

পরদিন বামিয়াবুরু বনের মধ্যে বেড়াতে বার হওয়া ঠিক হয়েচে, আমরা একটু বেশী রাত্রে খাওয়াদাওয়া শেষ করলাম।

অন্ধকার রাত্রি; আমার চক্ষে ঘুম নেই, এমন বিশাল অরণ্যের মধ্যে কখনো রাত কাটাই নি। বসে বসে দেখছিলাম বাংলোকে ঘিরে চারিধারে শুধু বন আর পাহাড়, পনেরশো ফুট উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় আমাদের এই বাংলো সুতরাং এখান থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্চে ছোট বড় পর্ব্বতশিখর, আবছায়া অন্ধকারে ঘেরা।

যোগীন্দ্র সিংহ বন বিভাগের কর্ম্মচারী বলেই যে বনশ্রী ভালোবাসেন তা নয়—তেমন যোগাযোগটি সব সময় ঘটে না—ভাবুক লোক। অন্ধকারময়ী রজনীর রূপ দেখবার জন্যে তিনিও আমার সঙ্গে জেগে বসে আছেন বাইরে।

কিসের একটা সুগন্ধ বাতাসে। সিংহ বললেন—পাচ্ছেন গন্ধটা?

—ভারি চমৎকার গন্ধ বটে। কিসের?

—কোনো অজানা বনফুলের—

আমি একটা ভয়ানক ভুল অনেকক্ষণ থেকে করছিলাম। বামিয়াবুরু এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্যে একপ্রকার গাছকে আমি বারবার কনকচাঁপার গাছ বলে আসচি এবং এই দুই বনবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারীর সঙ্গে তর্ক করেছি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায়—কারণ ওঁরা বলচেন, চাঁপাগাছ নয়। ও হোল ভেড্‌লেণ্ডিয়া—আর চম্পক হোল মাইকেলিয়া চম্পক; তার পাতা হবে কালো কালো লম্বা লম্বা।

আমি বলে আসচি, না তা নয়। স্বর্ণচাঁপার পাতা অমন হবে না। এই যাকে বলচেন ভেড্‌লেণ্ডিয়া এই হোল স্বর্ণচাঁপা। ওঁরা আমার জেদ দেখে বলেছিলেন—তা হতে পারে হয়তো। কিন্তু ও গাছকে আমরা আগাছা স্বরূপ বিবেচনা করি।

এ ভুল আমার কি ভাবে ভেঙেছিল, সে পরে বলচি—এখন আমার হঠাৎ মনে হোল বনের সেই স্বর্ণচাঁপার সুগন্ধ নয় তো? কিন্তু এখন তো চাঁপাফুল ফোটবার সময়ও নয়।

বড় সুগন্ধ ফুলটার—যে অজানা ফুলই হোক বনের,—অন্ধকারের মধ্যে নির্জ্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্ম-নিবেদন নিশ্চয় ব্যর্থ নয়। বিশ্বের বড় গেরস্থালিতে এতটুকু জিনিসের অপচয় হবার জো নেই!

অদ্ভুত গম্ভীর শোভা এই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যানীর। মাথার ওপরে ঝক্‌ঝকে তারা ছিটানো আকাশ, চারিধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোট বড় চূড়া যেন আকাশের গায়ে ঠেকেছে—মাঝে মাঝে দু-একটা রাত-জাগা পাখীর ডাক, সর্ব্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। শোওয়া কি যায়? এমন রাত্রি নিদ্রার জন্যে তৈরী হয় নি।

আমরা জেগে বসে থাকি, কি বলেন মিঃ সিংহ?

—খুব ভালো।

মনে হোল এমন বিরাট অরণ্য কখনো দেখি নি জীবনে। এমন বিরাট বনস্পতি শ্রেণীর সমাবেশ, সঙ্গে সঙ্গে এই অদ্ভুত-দর্শন শৈলশ্রেণী—দুইয়ের এই যোগাযোগই এই অরণ্যকে সুন্দরতর, অধিকতর রহস্যময় করচে; এ দেখবার সুযোগ বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে? রেলপথের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে অনেকে সহজেই যেতে পারেন বটে যেমন মধুপুর, শিমুলতলা ইত্যাদি, কিন্তু সে সব স্থানে মানুষের ভিড়, ছোট বড় ঘরবাড়ীর ভিড়। দূরে বা নিকটে এমন ধরনের অরণ্য নেই।

দেওঘর থেকে ১৪।১৫ মাইল দূরে এক বিরাট জঙ্গল আছে বটে, কানিবেলের জঙ্গল; সেটা লছমীপুর গাড়োয়ালি স্টেটের অন্তর্ভুক্ত। আমি একবার ভাগলপুর থেকে দেওঘর পর্য্যন্ত পদব্রজে আসি সেই ঘন বনের মধ্যে দিয়ে। সে বন বড় একটা মালভূমির ওপর, তার শেষ প্রান্ত থেকে দূরস্থিত ত্রিকূট পাহাড় নীলমেঘের মত দেখা যায়, কিন্তু সে এমন শৈলমালাবেষ্টিত নয়, এত বড় বনস্পতি সমাবেশও নেই সেখানে। স্টেটের লোক কাঠ বেচে জঙ্গল অনেক নষ্ট করে ফেলেচে। দেওঘর থেকে সেখানে যাবার এক হাঁটা পথ ছাড়া উপায় নেই; কাজেই ইচ্ছে থাকলেও যাওয়ার সুবিধা কোথায়?

হঠাৎ মিঃ সিংহ বললেন—ওই আলোটা দেখচেন আকাশে, কিসের বলুন তো?

একটা পাহাড়ের চূড়ার ওপরকার আকাশে কিসের আলো বটে। যেন দূরের কোনো অগ্নিস্রাবী আগ্নেয় পর্ব্বতের আভা আকাশপটে প্রতিকল্পিত হয়েচে। আমি বুঝলাম না।

মিঃ সিংহ বললেন—ওটা টাটার আলো।

-এতদূর থেকে?

- খুব দূর কোথায়! সোজা ধরলে ত্রিশ মাইল—

একটু পরেই আলোটা মিলিয়ে যেতে আমার আর কোন অবিশ্বাস রইল না।

কিন্তু ঘন বনের দিকে কুকুর ডাকে কোথায়?

বললাম—কোনো বস্তি আছে না কি ও পাহাড়ের মধ্যে?

মিঃ সিংহ বললেন—ও হোল একরকম হরিণের ডাক; বার্কিং-ডিয়ার, ঠিক কুকুরের মত ডাকে; যদি জেগে থাকেন, এ বনে আরও অনেক রকম জানোয়ারের আওয়াজ শুনতে পাবেন। হাতীর ডাক, বাঘের ডাক—

বেশি রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে থাকা আমাদের অদৃষ্টে ছিল না। বাংলোর মধ্যে থেকে হরদয়াল সিং ডাকাডাকি করতে লাগলেন, এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে থাকা ঠিক নয় এসব জায়গায়। বিশেষতঃ ঠাণ্ডা লেগে অসুখও তো হতে পারে।

পরদিন সকালে উঠে মিঃ সিংহ আমাকে এক অপূর্ব্ব সূর্য্যোদয় দেখালেন। সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল থেকে লালসূর্য্য নিজের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। আগে সমস্ত বড় বড় শিখরগুলোতে কে যেন সিন্দূর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিলে। যে-দিকে চাই সেই অজানা আকাশ-পরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। ধীরে ধীরে রোদ ফুটে বেরুলো, শৈলশিখরবাসী সামান্য কুয়াশা দিনের আলোর সামনে মিলিয়ে গেল—কি সুন্দর সুস্নিগ্ধ প্রভাত।

আমরা চা পান করে বন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। চা খেতে একটু বেলা হোল; এখানে জঙ্গলে কোথায় দুধ মিলবে! দশমাইল দূরবর্ত্তী সেই কুইরী গ্রাম থেকে বনবিভাগের লোকে সাইকেল যোগে দুধ নিয়ে এল।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ী পথ—খানিকদূর নেমে এসে রাস্তায় উঠলাম আমরা চার-পাঁচজন লোক; দুজন বনবিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী, দুজন ফরেস্ট গার্ড, আমার স্ত্রী ছিলেন সঙ্গে, আরও কয়েকটি লোক।

রাস্তার পাশের একটা সরু পায়ে চলার পথ নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকার, ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করেচে। একটা সংকীর্ণ পাহাড়ী নালা বনের মধ্যে কুল্ কুল্ করে বয়ে চলেছে। এই নালার হো-নাম হচ্চে পোগা-মারো-গাড়া। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হলো এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করি নি, যা দেখছিলাম তা বাইরে থেকে। এ যেন একটা ভিন্ন জগৎ—সুউচ্চ, সোজা, খাড়া শাল, কেঁদ, বারম প্রভৃতি বনস্পতিশ্রেণীর ঘন সন্নিবেশ দিনের আলোক আটকেচে। সারাদিনের মধ্যে এখানে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ, সুতরাং বনভূমি ঈষৎ আর্দ্র, একটু বেশি শীতল, কাছে কাছে কত সুদর্শন অর্কিড, নিম্নে আগাছার জঙ্গলও বেশ ঘন।

এক জায়গায় ছোট-এলাচের গাছ হয়েচে, মিঃ সিংহ দেখালেন খুব বড় হলুদ গাছের মত পাতায় ছোট এলাচের গন্ধ। এদিক-ওদিক থেকে ক্ষীণ জলধারা আমাদের পথের ওপর দিয়ে গড়িয়ে চলেচে, তার ওপর প্রস্তর-সঙ্কুল পথ, সুতরাং আমাদের যেতে হচ্ছিল খুব সন্তর্পণে।

একটা মাঝারি গোছের গাছ দেখে ওঁরা বিজয়ের হাস্যে বলে উঠলেন—এই। এই

হলো মাইকেলিয়া চম্পক, চম্পক ফুলের গাছ।

আমি বললাম—এ চম্পক গাছ হতে পারে, স্বর্ণচাঁপা নয়।

—আমরা অন্য চাঁপাগাছ চিনি নে—এ গাছে চম্পক ফুল হয়।

—হতে পারে, কিন্তু অন্য শ্রেণীর চাঁপা, আপনারা যাকে ভেড্‌লোন্ডিয়া বলচেন ওই হোল স্বর্ণচাঁপা। এ গাছের পাতা আমাদের দেশের নোনাগাছের মত দেখতে—এ স্বর্ণচাঁপা গাছ নয় কখনো। তবে এ চম্পক ফুল আমি কখনো দেখি নি, সে আমি স্বীকার করচি।

বড় বড় গাছ বেয়ে এক ধরনের লতা উঠেচে। ওঁরা বলেন—বুনো মেটে আলু হয় এর তলায়। এদেশের হো-মেয়েরা বন থেকে এগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

ঘন অরণ্যশীর্ষে প্রভাতের সূর্য্যালোকে, ক্বচিৎ কোন বনপুষ্প সুবাস, এ বড় বনানীর একটা গভীর রহস্যের ভাব আমার মনে এনে দিয়েচে; ভুলতে পারচি নে অরণ্য-সমাকুল সিংভূমের যে অংশে বিচরণ করচি, এটি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য শ্বাপদ-অধ্যুষিত এক মহাবন; ঠিক শৌখীন কোন পার্কে বেড়ানো নয় এটি—যে কোন সময়ে মত্ত হস্তীযূথ বা মহাকায় ব্যাঘ্রের সামনে এসে পড়তে পারি, আমরা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র—ফরেস্ট গার্ডের স্কন্ধস্থ কুড়ুল তখন কি কোনো কাজে আসবে?

হরদয়াল সিং বললেন—এখান থেকে টাইগার হিলে যাবেন?

—সে কোথায়?

—মাইল পাঁচেক দূরে এই বনের নিবিড়তম অংশে। বিহারের গবর্ণর একবার কনজারভেটরকে না কি বলেছিলেন—তোমাদের বনের খুব wild জায়গাটি একবার দেখতে চাই। তাই বনবিভাগ থেকে এই স্থানটি নির্ব্বাচিত করা হয়। অবিশ্যি এর মধ্যে লাটসাহেবের সুখ সুবিধের দিকে কিছু দৃষ্টি রাখা হয়েছিল বই কি!

—কেমন জায়গাটি?

—খানিকটা পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। একটা পাহাড়ের ওপরে সমতলভূমি টেবিলের মত। সেখান থেকে চারিদিকে চাইলে মনে হবে পৃথিবীতে ঘন বন ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই। দৃশ্য বড় চমৎকার। সত্যিকার বনের সৌন্দর্য্য দেখবেন—

যাবার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু পাঁচ মাইল কি যাওয়া যাবে হেঁটে সস্ত্রীক? উনি সঙ্গে না থাকলে কোন কথা ছিল না। দেখি কত দূর কি হয়।

যে নালার ধার দিয়ে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে নালাটির কালো জলে বিশাল বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া। এক জায়গায় খুব বড় কনটুর ট্রেঞ্চ, এখন জল নেই—বর্ষাকালে এর মধ্যে জল জমে বনভূমিকে আর্দ্র করে, মাটিকে সরস করে। বর্ত্তমান অবস্থা দেখলে সে কথা বিশ্বাস করা শক্ত।

এইবার আমরা বনের উঁচুদিকে যাচ্ছি মনে হোল। কারণ লম্বা লম্বা ঘাস দেখা গেল এবার। ভূমি যেখানে অপেক্ষাকৃত নীরস ও পাষাণময়, সেখানে নাকি ঘাস দেখা যায় বনে। এ ধরনের ঘাস আর কোথাও জন্মায় না।

একজন ফরেস্ট গার্ড কি ধরনের এক পাতা তুলে নিয়ে এল। শুনলাম, এ পাতা দিয়ে বনের লোকেরা দিব্যি চাটনি তৈরী করে খায়।

আমার স্ত্রী বললেন—কি করে চাটনি তৈরি হয়?

—শুধু বেটে একটু নুন দিয়ে খেলেই হোল। পুদিনার মত।

বেলা প্রায় দশটা। ঘড়ি দেখে সেটা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এই বনের মধ্যে থেকে তা কিছুই বোঝবার জো নেই। রোদ্দুর পড়ে নি মাটিতে বিশেষ কোথাও। ঘাস পাতা এখনও শিশিরার্দ্র।

আমি বললাম—আপনারা বাঘের ভয় করেন না?

মিঃ সিংহ বললেন—করলে আমাদের কাজ চলে না।

—বাঘের সামনে পড়েছেন কখনো?

—দু-তিন বার। একবার মোটর ড্রাইভ করে ফিরছি পাটনা থেকে, গভীর রাত্রে কোডার্মার জঙ্গলে প্রকাণ্ড রয়েল-বেঙ্গল-টাইগার একেবারে গাড়ীর পাশে।

—পাশে?

—হ্যাঁ, রাস্তার পাশে। একটা প্রকাণ্ড সম্বর হরিণ মেরে তাঁকে খাচ্ছে।

—আপনি কি করলেন?

—কি আর করব। হেড লাইটের আলো পড়তে আমি ওটাকে দেখতে পেলাম, তারপর ভয় হোল গাড়ীর ওপর লাফিয়ে না পড়ে।

হরদয়াল সিং বললেন—আমি একবার বুনো হাতীর পাল্লায় পড়েছিলাম। একটা পাহাড়ের ঢালু দিয়ে সাইকেলে নামচি, একদল বুনো হাতী বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কান নাড়ছে। বাঘের চেয়ে বুনো হাতী বেশী বিপজ্জনক—সোজা সাইকেল চালিয়ে দিলাম, পেছন দিকে আর চাইলাম না।

আমার স্ত্রী বললেন—এ বনে বাঘ আছে?

—বড় বাঘ বিশেষ নেই! অন্য সব জানোয়ারই আছে। তবে বনকে বিশ্বাস নেই জানবেন।

পথের পাশে একটা বড় গাছের ছাল ওপর থেকে খুলে ঝুলে পড়েছে। সেটা দেখিয়ে হরদয়াল সিং বললেন—বলুন তো এরকম কেন হয়েছে?

প্রশ্নটা আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ করে। তিনি কিছু বলতে পারলেন না। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম আগেই। বন্য হস্তীর দন্তাঘাতে বনস্পতির এই দশা।

মিঃ সিংহ বললেন—টাটকা করেছে। এই দেখুন পায়ের দাগ। কাল রাতের ব্যাপার।

সত্যই বটে। মাটির ওপরে হাতীর পায়ের দাগ এবং একটু দূরে হাতীর নাদ। বেশ বোঝা গেল সন্ধ্যার পরে এসব পথে যাতায়াত করা খুব সুবিধেজনক নয়।

এমন একটা জায়গায় এসেছি যেখানে রাস্তার পাশে অনেক নীচে একটা বনাবৃত উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ যে বনের মধ্যে আমরা বেড়াচ্ছি, সেটা যে অনেক উঁচু পাহাড়ের ওপরকার বন, নিম্নের উপত্যকা দেখে সেটা ভালোই বোঝা গেল।

হরদয়াল সিং বললেন—কেমন, যাবেন টাইগার হিলে?

—আর কতদূর?

—চার মাইল কিংবা সাড়ে তিন মাইল—

—ফিরতে তা হলে বেলা একটা বাজবে।

সেখান থেকেই বাংলোতে ফিরবার কথা হোল। আমার স্ত্রী আর যেতেই চাইলেন না।

এইবার যেখানে আমরা ধূমপান ও বিশ্রামের জন্যে বসলাম, সে স্থানটিকে বেমালুম আফ্রিকা বলে চালিয়ে দিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। এদিকে গভীর পাহাড়ী খাদ, অনেক নিচে অগণ্য-বনস্পতির শীর্ষদেশ দেখা যাচ্ছে, দুপুরের রোদ এসে পড়েছে তাদের ওপরে।

বনের প্রকৃতিও অন্য রকম।

হরদয়াল সিং বললেন—ঐ হোল আমাদের মিসেলেনিয়াস ফরেস্ট। শাল ছাড়া আরও অনেক গাছ ওতে আছে।

—ওখানে নেমে চলুন দেখি না।

—পথের ধারে ওরকম একটা বিরাট area পড়বে অন্য জায়গায়। নীচে নেমে কষ্ট পেতে হবে না। ওখানে কিন্তু বিপদ আছে—

—কেন?

—সাপের ভয়। অনেক সময় বড় বড় বিষাক্ত সাপ থাকে। একটু সাবধান হয়ে যাওয়া দরকার।

বাংলোতে যখন পৌঁচেছি, তখন বেলা একটার কম নয়। আমি স্নান করতে চাইলুম নীচেকার সেই ঝর্ণার জলে, কেমন চমৎকার কুলুকুলুনাদিনী স্বচ্ছসলিলা ঝর্ণাটি, বনের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে আসচে—দুধারে কলের চিমনির মত কেঁদ আর শালের ভিড়। সেইখানেই স্নান করে আসি।

মিঃ সিংহ বললেন—না যাওয়াই ভালো। এসব ঝর্ণার জল অনেক সময় খারাপ থাকে।

হরদয়াল সিং বললেন—একবার লোহারডগা না নেতারহাট এমনি কোনো একটা জায়গার কাছাকাছি বনে তিনি একটা ঝর্ণায় স্নান করেছিলেন বনের মধ্যে। তারপর সব শরীরে চাকা চাকা কি বেরিয়ে ফুলে গেল। তা ছাড়া ম্যালেরিয়া জ্বর হোতে পারে।

অতএব ঝর্ণায় স্নানের আশা ছেড়ে আমরা বাথরুমের টবের জলেই স্নানপর্ব্ব সমাধা করলাম। অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর দেখা গেল বনের মধ্যে ছায়া পড়ে আসচে। চারি দিকেই বড় বড় শৈলচূড়া, জায়গাটাতে তাড়াতাড়ি ছায়া নেমে আসে।

বনের মধ্যে সেই ঝর্ণার কাছে গিয়ে আমরা সবাই বসলুম সেই অপরাহ্নে।

এর নাম দিয়েচে এরা মাছের বাঁধ। বন-বিভাগ থেকে একটা বাঁধ মত গেঁথে দিয়েচে বেগবতী পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর বুকে। তাতে তার গতিরোধ হয় নি, আরও দ্বিগুণ উচ্ছ্বাসে আবেগে কংক্রিটের বাঁধ ডিঙিয়ে এপারে ঝাঁপিয়ে পড়চে। এই স্থানটি এত সুন্দর, একবার বসলে উঠে আসতে ইচ্ছেই করবে না।

এর সামনের দিকে সুউচ্চ পাহাড়, তার ঢালুতে বড় বড় শালগাছের বন, এখানে বসে শুধুই দেখা যায় শালগাছের গুঁড়িগুলো নীচে থেকে ভিড় করে ওপরের দিকে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়েছে। আমাদের ডানদিকে চওড়া মোটর-রোড বনবিভাগের নির্ম্মিত, কিন্তু এ পথে মোটর অপেক্ষা বাঘ-ভালুকের যাতায়াত বেশি। যখন কনট্রাক্টরের দলের বনের মধ্যে থেকে কাঠ কাটিয়ে নিয়ে যায়, তখন বছরের মধ্যে দিন-কয়েক ওদের মোট লরি বা মোটর যাতায়াত করে—ক্বচিৎ বন-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মচারী মোটরে সফর করতে আসেন—মিটে গেল। মোটরগাড়ী তো দূরের কথা, সারা বছরে এ পথে আর লোকজন বড় বেশি যাতায়াত করে না।

অতিরিক্ত নির্জ্জন স্থান। চেয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা লোক কোনো দিকে চোখে পড়ে না—শুধু যা আমরাই আছি। ঋষিদের তপোবন এমনি নির্জ্জন জায়গাতেই ছিল। ভারতের সভ্যতার জন্মস্থান এই বনানী, এখানেই বেদ, উপনিষদ, বেদান্তের জন্ম হয়েছিল—হৈ-হট্টগোলযুক্ত শহরের বুকে নয়।

পাশের পথ বেয়ে দুজন লোক পুঁটলি কাঁধে কোথায় চলেছে। তাদের ডাকা হোল হো-ভাষায়, অবিশ্যি আমি ডাকি নি। আমি মিঃ সিংহকে বললুম—জিজ্ঞেস করুন ওরা কোথায় যাচ্চে।

—সৌলবোরা যাব।

—এখান থেকে কতদূর?

—সতের মাইল।

—সেখানে কেন?

—সেখান থেকে টাকা আনবো—মাড়োয়ারীর গদী থেকে। আমরা কুলি। জঙ্গলে কাঠ কেটেছিলাম, তার মজুরি।

—সন্দেবেলা যাচ্ছিস, ভয় করবে না?

—কুইরা গ্রামে গিয়ে রাত কাটাবো!

হরদয়াল সিং সম্মুখের ছায়াচ্ছন্ন শৈলসানুর দিকে চেয়ে আঙুল দিয়ে বললেন—ঐরকম ঢালু জায়গায় আমাকে বুনো হাতীতে তাড়া করেছিল। সাইকেল না থাকলে সেদিন মারা পড়তাম।

আমার স্ত্রী বললেন—তাহলে আজ ওঠা যাক এখান থেকে—

সেই সময় বন-বিভাগের দুইজন উচ্চ কর্ম্মচারী আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন। বললেন—আচ্ছা, বলুন তো এ কংক্রিটের বাঁধটার আর কি উন্নতি করা যায়?

হরদয়াল সিং এ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উঁচু অফিসার। তিনি বললেন—আপনাদের পরামর্শটা একবার নিয়ে দেখি। আমি তো একরকম ভেবে রেখেছি, দেখি আপনারা কি রকম বলেন।

'আপনারা' অর্থাৎ আমি এবং আমার স্ত্রী—এ যেন ডাক্তার বিধান রায় পরামর্শ চাইচেন পাশের বাড়ীর স্কুলমাস্টার বন্ধুর কাছে—বলুন তো মশাই, এ রোগীটির সম্বন্ধে এখন কি ওষুধ দেওয়া যায়? আপনার কি মত!

কিন্তু বিজ্ঞ ভেবেই তো পরামর্শ চাইছেন। খেলো হয়ে যাওয়াটা কিছু নয়। তাহলে লোকে মানে না। সুতরাং মুখখানা গম্ভীর করে কিছুক্ষণ চিন্তা করবার ভান করলুম। যেন সক্কর বাঁধ কিংবা নতুন হাওড়া ব্রীজের প্ল্যান করবার ভার আমার ওপর পড়েছে।

হঠাৎ ভেবে দেখলুম, বাঁধটা এমন করে কেন যে বেঁধেছে, ওখানটাতে অমন নালা কেন করেছে, ওই জায়গাটাতে কংক্রিটের দেওয়ালের কাছে কয়েকটা ফোঁকর কেন—এইগুলো এখনো পর্যন্ত ভাল করে বুঝি নি। দু-একটা ইনটেলিজেণ্ট প্রশ্ন করে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে এ ব্যাপারটা আমার কাছ জলের মতই পরিষ্কার।

সুতরাং বললুম—আচ্ছা, এ বাঁধ এখানে কি জন্যে দেওয়া হয়েছে?

হরদয়াল আমার মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে বললেন—কেন, মাছ ধরার জন্যে!

আমি বললাম—ও।

তাঁর মুখের ভাব দেখে আমার আর কোন ইনটেলিজেণ্ট প্রশ্ন করতে সাহস হোল না। কিন্তু আমার মনের সন্দেহ তখনও ঘোচে নি। এতে কি করে মাছ ধরা হবে, তা তখনও আমার মাথায় ঢোকে নি। বললাম—আচ্ছা বর্ষার জল এতে আটকায় কি করে? জল তো উপচে পড়বে। মাছ দাঁড়াবে কোথায়?

হরদয়াল সিং প্রায় চীৎকার করেই বলে উঠলেন—ওই! ওই তো সমস্যা! ওই কথাই তো বলছিলাম।

যাক! অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লে বাঁশঝাড়ের একটা বাঁশেও লাগবে না? লেগেছে।

আমার স্ত্রী বললেন—চলো, বেলা প্রায় পড়ে এল। এসব জায়গা ভালো নয়। ওঠা যাক।

এ যাত্রা ভগবান মুখ রক্ষে করলেন। আমার স্ত্রী উঠে পড়তে সবাই উঠলাম

সেখান থেকে।

বেলা পড়ে এসেছে। চারিধারের বনে এরই মধ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসবার উপক্রম করছে। সুতরাং বেশীক্ষণ বাইরে থাকা ঠিক হবে না।

আমি বললাম—এ জঙ্গলে আমাদের বন্দুক না নিয়ে বেরোনো উচিত নয় কিন্তু।

মিঃ সিংহ বললেন—বন্দুক আমাদের আছে, তবে আমরা নিয়ে বেড়াই নে। ও একটা ঝঞ্ঝাট।

হরদয়াল সিং বললেন—আমরা ডিপার্টমেণ্টের অফিসার মশাই, বাঘ-ভালুকে আমাদের কিছু বলবে না।

কয়েকটি হো-মেয়ে পাহাড়ের নীচে ভাত রেঁধে খাচ্ছে আজও। এরা সারাদিন জংগলে কাজ করে, বাঘ-ভালুকের মুখে। সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে দুটি নিরুপকরণ তন্ডুল সিদ্ধ খেয়ে মহানন্দে দিন কাটায়। এতেই ওদের খুশি উপচে পড়েছে। আমরা ওদের কাছে কিছুক্ষণ বসলাম। কি সুন্দর জীবন এদের তাই ভাবি। এই যে বাইরের সভ্য জগতে এত যুদ্ধ, খাদ্যাভাব, লোকের দুঃখকষ্ট—তার কোন আঁচ এসে এখানে পৌঁছায় নি। কেরোসিন তেল না পাওয়া গেলেই বা এদের কি, চিনির দাম চালের দাম চড়লেই বা এদের কি, কাপড়ের দাম বাড়লেই বা এদের কি। এরা ওসব কোনো জিনিসে ধার ধারে না। বনে বাস করে, বন-প্রকৃতিই এদের সমস্ত জিনিস যোগায়!

ওদের জিজ্ঞেস করা হোল—চাল যখন না পাওয়া যায়, তখন কি খাবি?

একটি মেয়ের নাম বুধ্‌নি কুই, মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতী বলে মনে হোল তার কথাবার্ত্তা শুনে। কুই হো-জাতির কুমারী মেয়েদের নামের শেষে ব্যবহার হয়।

সে বললে—কেন, বনে খাওয়ার জিনিসের অভাব আছে না কি?

—কি খাবার পাওয়া যায়?

—কন্দমূল। কত রকমের কন্দ পাওয়া যায় বনে। যারা জানে তারা তুলে আনে। বর্ষাকালে আমাদের দু-তিন মাস কন্দ খেয়েই চলে যায়।

কন্দ কথাটা সংস্কৃত হলেও বেমালুম ঢুকে প'ড়েছে হো-ভাষার মধ্যে, 'কান্দা' রূপে। বাংলা দেশের মেটে আলু জাতীয় একপ্রকার মূল এ জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ল্যাটিন নাম 'ডায়াস্ কোরিয়া', খেতেও বেশ সুস্বাদু। এ জাতীয় লতা এই সব বনে সাধারণতঃ শৈল-সানুর অরণ্যে জন্মায়, নিম্নের উপত্যকাতেও কিছু কিছু আছে।

আমি হিন্দীতে প্রশ্ন করলুম—তোরা জঙ্গলে কন্দ তুলতে যাস, বাঘের ভয় করিস নে?

বুধ্‌নি কুই কিছু বুঝতে পারে না, শুধুই হাসে। এরা বাংলা তো দূরের কথা হিন্দীও বোঝে না, বিহারে বাস করে। কারণ এদের কাছে বাংলাও নেই, বিহারও নেই—ওসব কথার কোন অর্থ নেই এদের কাছে। এই অরণ্যভূমি এদের মা ; নিজের ক্রোড়ে আশৈশব এদের লালন-পালন করেছে, ক্ষুধায় অন্ন—তৃষ্ণায় জল যুগিয়ে। একেই চেনে এরা।

দরদয়াল সিং হো-ভাষায় আবার আমার প্রশ্নটি ওদের করলেন। আর বুধ্‌নির উত্তর আমায় বুঝিয়ে দিলেন।

বুধ্‌নি বললে—আমরা দল বেঁধে যাই, চার-পাঁচজন একসঙ্গে।

—বাঘ-ভালুক দেখিস নে?

—মাঝে মাঝে দেখি বই কি।

—ভয় করে না?

—ভয় করলে কি চলে আমাদের! সঙ্গে তীর ধনুক থাকে। তবে বাঘ বেশী মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। হাতী বেশী খারাপ। হাতী তাড়া করে আসে।

—বাঘ কখনো তাড়া করে নি?

—না বাবু, বাঘ কিছু বলে না।

—আর কি জানোয়ার দেখেছিস?

—ভালুক আছে, ভালুকও বড় খারাপ। কখন যে ঘাড়ে এসে পড়বে কেউ বলতে পারে না। তা ছাড়া সাপ আছে।

—কি সাপ?

—শঙ্খচূড় সাপ আছে, মানুষকে তেড়ে কামড়াবে। ময়াল সাপ আছে, খুব মোটা, সেও মানুষকে ধরে। আমরা ময়াল সাপের মাংস খাই, বেশ ভালো মাংস।

সেই বনানীর মধ্যে বসে বনের দুলালী মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে আমাদের এত ভালো লাগছিলো যে কিছুতেই সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাত হয়ে গেল, বড় বড় শাল পাতার পাত্রে ফেনসুদ্ধ ঢেলে বিনা নুনে বিনা তরকারীতে দিব্যি খেতে লাগল। বিলাসিতার সর্ব্ব উপকরণ-শূন্য এই সকল অনাড়ম্বর জীবন-ধারা আমার কাছে এত নূতন, এত অপরিচিত যে শুধু এই দেখবার জন্যে আমি সমস্ত রাত এইভাবে কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ে আসছে, এসময় বাইরে বসে থাকা স্বাস্থ্যের দিক থেকে নিরাপদ নয়। কাজেই আমরা বাংলোর মধ্যে গিয়ে আগুনের ধারে বসলাম।

হরদয়াল সিং বললেন—আমি একটা বড় সাপের কথা জানি।

আমি বললুম—কি সাপ?

—পাইথন। আমার অধীনস্থ এক কর্ম্মচারী একবার পাহাড়ী ঝর্ণায় স্নান করতে যাচ্ছিলেন, শুনলেন জঙ্গলের মধ্যে সড় সড় করে শব্দ হচ্ছে, জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে দেখলেন একটা প্রকাণ্ড পাইথন সাপ। একটা ছোট হরিণকে প্রায় অর্দ্ধেক গিলে ফেলেছে।

তারপর?

—তারপর তিনি বনের মোটা লতা দিয়ে সাবধানে সাপটাকে বাঁধলেন। স্নান সেরে তাঁবুতে ফিরে সকলকে সংবাদ দিতেই কুলি ও ফরেস্ট গার্ডের দল হৈ হৈ করে গিয়ে সাপটাকে জখম করলে। তখন কিন্তু তারা ভেবেছিল যে সাপটা মরেই গেল। বিকেলের দিকে নিকটবর্ত্তী বন্যগ্রাম থেকে হো-অধিবাসীরা সাপের মাংস নিতে এসে দেখে মৃতপ্রায় সাপটা সেখান থেকে দৌড় মেরেছে। ওদের জান বড্ড কড়া। সাপটা লম্বায় প্রায় দশ ফুট ছিল।

—আপনি কত বড় সাপ দেখেছেন?

—পালামৌ-এর জঙ্গলে একবার আঠার ফুট লম্বা একটা পাইথন সাপ এক পাহাড়ী জঙ্গলের ঝর্ণার ধারে গাছের গায়ে জড়িয়ে থাকতে দেখেছিলুম। পাইথন সাপরা সাধারণতঃ ঐ জায়গাতেই থাকে। হরিণ বা খরগোস জল খেতে এলে ঝপ্ করে তাদের উপরে পড়ে জড়িয়ে ফেলে একেবারে হাড়গোড় চূর্ণ করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে গিলতে থাকে। অনেক সময় সম্বর হরিণকেও রেহাই দেয় না।

—মানুষ দেখলে কিছু বলে?

—সাবধান না থাকলে একা মানুষকেও ছাড়ে না। আমি জানি উড়িষ্যার জঙ্গলে একবার একজন কাঠুরে একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি কাটতে গিয়েছিল, গুঁড়িটার চারপাশে বড় বড় বন ছিল, বাইরের থেকে কিছু দেখা যায় না। কাঠুরেটা যেমন সেখানে গিয়েছে অমনি একটা প্রকাণ্ড পাইথন ওর একখানা পা জড়িয়ে ধরে ওকে ফেলে দিলে, তারপর লেজের প্রান্ত দিয়ে গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে ওর সর্ব্বদেহে কুণ্ডলীর আকারে জড়াতে লাগল। ভাগ্যে ওর সঙ্গে আরও লোক ছিল কিছুদূরে। ওর চীৎকারে তারা এসে পড়ে সাপটাকে মেরে ফেলে। দু-তিন মাস ভোগবার পরে লোকটা বেঁচে যায়। আমি শুনেছি চল্লিশ ফুট পর্য্যন্ত সাপ এ জঙ্গলে দেখা গিয়েছে। ঝর্ণার ধারে গাছের উপরেই এ জাতীয় সাপ সাধারণতঃ বাস করে, কারণ ওখানেই ওদের শিকারের সুবিধা।

ক্রমে রাত্রি গভীর হলো. নানা প্রকার সাপ ও বাঘের গল্প শুনে আমাদের মনে একপ্রকার অস্পষ্ট রহস্যময় ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। আমরা সভ্য জগতের অধিবাসী, অন্ধকারময় বনানীর দৃশ্যও আমাদের নিকট গম্ভীর ও সুন্দর বটে, কিন্তু এ অনুভূতিও জাগিয়ে দেয় যে এ আমাদের পক্ষে বিদেশ। এখানে বুধনি কুই-এর মত হো মেয়েরা স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে বিচরণ করতে পারে, বন্য কার্পাস থেকে মোটা কাপড় বুনতে পারে, এরা কন্দমূল ফল আহরণ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে পারে, এরা করনজা মহুয়া প্রভৃতি বৃক্ষের বীজ সংগ্রহ করে তেল তৈরি করতে পারে, কিন্তু আমরা সঙ্গে করে সভ্য খাদ্য না আনলে এখানে তিন দিনও বাঁচবো না। তাছাড়া এসব বনে পাহাড়ী ঝর্ণার জলে স্নান করা বা ঝর্ণার জল পান করা আদৌ নিরাপদ নয়। ম্যালেরিয়ার ভয় যথেষ্ট আছে। বন-বিভাগের কর্ম্মচারীরা বাঁধা নিয়মে পাঁচ গ্রেন করে কুইনাইন প্রত্যহ খান, তবুও ম্যালেরিয়ায় ভোগার কথা ওঁদের কাছেই শুনেছি। অথচ এই সবের মধ্যেও নরনারীর সুন্দর স্বাস্থ্য, উচ্ছল জীবনানন্দ দেখে হিংসা হয়। জ্বর-জাড়ির নামও ওরা শোনে নি। কুইনাইন চক্ষেও দেখে নি। বিনা নুনে ও বিনা তরকারিতে মোটা চালের ভাত ও জঙ্গলের কন্দমূল খেয়ে অমন স্বাস্থ্য কি করে হয় তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। অরণ্যের রহস্য, অরণ্যের গোপন অন্তরালেই প্রচ্ছন্ন থাকুক—আমরা শীতের রাতের শয্যা আশ্রয় করি।

পরদিন সকালে উঠে আমরা আবার মাছ-ধরার বাঁধে গিয়ে বসলাম। কত কি বন্যপক্ষীর কূজন, বনপুষ্পের সুবাস এই স্থানটিতে, সত্যই বড় ভালো লাগে। কাল রাত্রে হয়তো আমরা যেখানে বসে আছি, সেখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার জল খেতে এসেছিল। কংক্রিট বাঁধানো না হলে নরম মাটিতে বাঘের পায়ের চিহ্ন থাকতো। আমাদের সাড়া পেয়ে একটা বনমোরগ কক্ কক্ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের ঝিলিক খেলে উড়ে গভীর বনান্তরালে অদৃশ্য হোল।

আমি আবার বললুম—এখানে নাইবো ?

মিঃ সিংহ বললেন—নাইলেই জ্বর হবে। এসব জল দেখতে ভালো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য। হিমালয়ের যে কোন ঝর্ণার জল সুপেয় ও নিরাপদ—কিন্তু এখানে তা নয়। আমি যখন প্রথম বনবিভাগের কাজ করতে আসি, অনভিজ্ঞতার দরুন এই সব বন্য নদীর স্বচ্ছ জল নির্ব্বিচারে পান করতাম। ফলে ম্যালেরিয়া প্রায়ই হোত। পোড়াহাট ও সারেণ্ডা ফরেস্ট ম্যালেরিয়ার জন্য বিখ্যাত।

আমি বললাম—আপনি কবে বন-বিভাগের চাকরিতে যোগ দেন ?

—১৯২৫ সালে। প্রথম যেদিন জঙ্গলে চাকরি করতে আসি, আমি তখন অনভিজ্ঞ যুবক। সবে বি. এস্-সি পাশ করেছি পাটনা কলেজ থেকে। আরা জেলায়

আমার বাড়ী, বনের কোন ধারণাই নেই, আমাদের দেশে দু-দশটা আম গাছ ও মহুয়া গাছের সমষ্টিকে বন বলে। বিন্ধ্যাচলে একবার গিয়েছিলাম দাদার সঙ্গে, সেখানে সামান্য কিছু বন দেখি—তখন তাই আমার নিবিড়তম অরণ্য।

আমি কখনো বিন্ধ্যাচল যাই নি, আমার বন্ধু বিভূতি মুখুয্যে সেখানে গিয়ে মাসখানেক ছিলেন। তাঁরই মুখে শুনেছিলাম বিন্ধ্যাচলের মাথায় খুব জঙ্গল, সেখানে হরিণ ইত্যাদি চরে। সুতরাং আমি বললাম—কেন, শুনেছি সেখানেও বেশ বন আছে।

মিঃ সিংহ বললেন—সে এক ধরণের বন। এর তুলনায় কিছুই নয়। আমি প্রথম চাকুরি নিয়ে যাই সারেন্ডা ফরেস্টে। সে বন এর চেয়েও ভীষণ। ৪০০ বর্গ মাইল অরণ্যানী তার মধ্যে খানকয়েক বন্যগ্রাম আছে। বন-বিভাগের কাজকর্ম্মের মজুরের জন্যে গবর্নমেণ্ট জমি দিয়ে লোক বসিয়েছে। না দেখলে সে বিরাট অরণ্যের ধারণা হয় না।

—তারপর, আপনার অভিজ্ঞতা বলুন শুনি।

—সে এক গল্প। এখন খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নিই চলুন। আজ আমাদের চিটিমিটি যেতে হবে। বৌদিদি তৈরি হয়ে নিন।

—চিটিমিটি কতদূর?

—এখান থেকে ৪০।৪৫ মাইল পাহাড় ও বনের পথ। সকাল সকাল বেরুতে হবে। পথে আমার প্রথম চাকুরি জীবনের গল্প করতে করতে যাবো—আপনাদের লেখার খোরাক হবে।

বেলা দুটোর পরেই আমরা জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে মোটরে উঠিয়ে রওনা হোলাম।

চিটিমিটি যাবার পথে মোটর পাহাড়-জঙ্গলের পথে এঁকে বেঁকে নামতে লাগলো বামিয়াবুরু থেকে। আমরা চলেচি—চলেচি—ক্রমাগত চড়াই-উতরাইয়ের পথে।

এক জায়গায় পাহাড়ের নীচে বাঁ-দিকের উপত্যকায় বন-বিভাগের 'রক্ষিত ভূমি'—এর রহস্য হচ্ছে এই যে, এই জায়গাতে প্রকৃতিকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে ইচ্ছামত বাড়তে। প্রকৃতির উপর কলম চালানো হয় নি। তাই এখানে বড় বড় ৮।১০ ফুট পরিধি বিশিষ্ট শালগাছ যথেষ্ট—মোটা মোটা লতায় লতায় জড়াজড়ি, গাছপালার নীচেও দুর্ভেদ্য জঙ্গল ছোট গাছগাছালির।

আমরা পাহাড়ের গায়ে আবার দেখলুম খনিজ লবণের স্তর, বন্য জানোয়ার ছাড়া এ নুন কেউ ব্যবহার করে না। হরিণ, ভালুক, বাঘ এই তিনটি জন্তু বিশেষ করে। হাতীরা নুন খাওয়া দরকার বিবেচনা করে না নাকি কেন তা জানি না। অস্তগামী সূর্য্যের রাঙা আলো যখন বাঁকাভাবে এসে পড়ে এই খনিজ লবণের স্তরে, শাল অরণ্যে সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসে, তখন দলে দলে মৃগযূথ আসে নির্জ্জনে লবণের স্তর চাটতে, তাদের সে আনন্দলীলার ছবি হয়তো কবি ভবভূতি আঁকতে পারতেন যিনি প্রস্রবণ-পর্ব্বতের গম্ভীর মহিমা বর্ণনা করেচেন উত্তর-রামচরিতে। অতীত দিনের ভারত-বর্ষের কি অদ্ভুত রূপ কল্পনায় ভেসে ওঠে এই পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে দাঁড়ালে।

হরদয়াল সিংকে বললাম—আপনারা এখান থেকে নুন বিক্রী করেন না?

—না। ওটা বন্যজন্তুদের ব্যবহারের জন্যই।

—গবর্নমেণ্টের বন্দোবস্ত?

—নিশ্চয়। এখানে শিকার করা নিষেধ।

—কি রকম?

—পূর্ব্বে এরকম হয়েচে। হরিণ নুন খেতে এসেচে দলে দলে, শিকারীদের মাহেন্দ্রসুযোগ। লুকিয়ে থেকে গুলি করেছে।

—নিষ্ঠুরতার কাজ বই কি।

—এখন বনের সমস্ত salt lick-এ গবর্নমেণ্টের খরদৃষ্টি। বন্দুক নিয়ে যাবার জো নেই।

মোটর থামানো হোল। মিঃ সিং বললেন—চলুন, দেখবেন কত জানোয়ারের পায়ের দাগ—

যেখানে পাহাড়ের গায়ে salt lick তার নীচে জানোয়ারদের চরবার সুবিধের জন্যে বা দাঁড়িয়ে নুনের স্তর চাটবার জন্যে বন-বিভাগ থেকে পাথর কেটে সমতল করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নরম সাদা মাটিতে সত্যিই অনেক জন্তুর পদচিহ্ন।

হো-জাতীয় ফরেস্ট গার্ড বললেন—হরিণের পায়ের দাগই বেশি, ভাল্লুকেরও আছে— কোঙরার আছে—

আমি বললাম—কোঙরা কি?

মিঃ সিং বললেন—বার্কিং ডিয়ার—

—কত বড়?

—একটা বড় খাসি ছাগলের মত। বামিয়াবুরুতে সেদিন রাত্রে যার ডাক শুনে-ছিলেন—

ফরেস্ট গার্ড বললে—বাঘের পায়ের দাগ একদম দেখ্‌ছি না হুজুর।

আরও মাইল সাতেক গিয়ে আমাদেব গাড়ী সমতলভূমিতে নামলো। সেখানকার আরও মনোহারী শোভা—বাঁ-দিকে একটা পাহাড় চলেচে—বন সেখানে তত ঘন না হোলেও বড় বড় শুভ্রকান্ড শিববৃক্ষ ও গোলগোলি ফুলের গাছে সমস্ত পাহাড়ের সানুদেশ ভর্ত্তি। এই ফুলের গাছ দেখতে আমাদের দেশের আমড়া গাছের মত—অথচ প্রথম বসন্তে সম্পূর্ণ নিষ্পত্র শ্বেতাভ বৃক্ষগুলিতে যখন সূর্য্যমুখী ফুলের মত বড় বড় ফুল ফোটে—কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের পটভূমিতে, মেঘশূন্য নীল আকাশের তলায়, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে কোন্ সৌন্দর্য্যের মায়ালোকের মধ্যে মনকে একেবারে তলিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে যায় যেন!

যতদূর যাই, সমতলের শোভা আর একরকম। ধরণীর উচ্চাবচ ভূমিরেখা এখানে সুপরিস্ফুট, বন তাদের ঢাকে নি, কোথাও দু-এক ঝাড় পাহাড়ী বাঁশ, কোথাও অদূরের শৈলশ্রেণী থেকে নেমে নদী চলেচে বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে : কোথাও দু-একটি বন্যগ্রাম—

আমার স্ত্রী ক্রমাগত বলছেন—আহা, বেশ জায়গা, দ্যাখো দ্যাখো কেমন ঐ গাঁ-খানা পাহাড়ের কোলে—এখানে একটা বাড়ী করলে হয় না?

আবার কিছুদূর গিয়ে—

-দ্যাখো দ্যাখো কি সুন্দর ঝর্ণাটি। বাঁশবন—এখানে একটা বাড়ী করলে হয়—

ডজন খানেক জায়গায় বাড়ী তৈরি করবার পরামর্শ শুনে শুনে মিঃ সিং বললেন —কিন্তু একটা ব্যাপার মিসেস ব্যানার্জ্জি—বাড়ী তো অনেকগুলো করবার প্রস্তাব করলেন—এসব জায়গায় বাস করতে পারবেন?

আমার স্ত্রী বললেন—কেন?

—খাবেন কি? রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে এ সব গাঁয়ে শুধু হো-জাতীয় লোকেরা বাস করে—দোকান টোকান নেই—

—ওরা জিনিস কোথায় পায়?

—কোনো জিনিসের দরকার নেই ওদের—দেখেই তো এলেন বামিয়াবুরুতে—

কিন্তু আমার স্ত্রীর দোষ নেই, সত্যিই মনে হয় এখানে নানা জায়গায় শুধু বাড়ী করি আর বাস করি। কতবার আমার নিজের মনেও কি উদয় হয় নি সে কথা? বড় বাড়ী নয়, ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। পাহাড়ী বেণুবনের ছায়ায়, নৈশ বাতাসে কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাঁশি বাজবে, পর্ণকুটীরে শুয়ে শুয়ে নিস্তব্ধ নিশীথে তা শুধু শুনবো আধ-ঘুম আধ-জাগরণের মধ্যে!

একটা গ্রামে পাহাড়ের নীচে হাট বসেচে।

বললাম—এটা কি গ্রাম?

মিঃ সিং বললেন—ম্যাপ দেখে বলে দিচ্ছি—

মোটর থামানো হোল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম—এই বন পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র হাটটি কেমন, কি জিনিস এখানে কেনাবেচা হচ্ছে দেখতে হবে বৈকি। আমরা সবাই হাটের মধ্যে বেড়াচ্চি, একটা মহুয়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কয়েকটি হো-তরুণী আমাদের দিকে চেয়ে হাসচে দেখে আমরা এগিয়ে গেলুম তাদের কাছে।

আমার স্ত্রী বললেন—ঐ তো কালকের সেই মেয়েটি—সেই বুধনি কুই—

মিঃ সিং হো-ভাষায় ওদের কি বললেন। ওরাও কি উত্তর দিলে হেসে হেসে।

আমি বললাম—কি বলচে ওরা?

—বলচে, বাবুরা হাট দেখতে এলি?

—মেয়েগুলি কোত্থেকে এসেচে!

—ওরা বুধনি কুইয়ের বন্ধুবান্ধব। হাট দেখতে এসেচে। জিনিসপত্র কিনুক না কিনুক, ভাল সাজগোজ করে এদেশে সবাই হাটে আসবেই। হাট ওদের উৎসবের জায়গা। এখানেই সাত দিন পরে পরে পাঁচ গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়—হাটের দিন ওদের কাছে একটা আমোদের দিন—

আমরা সকলে হাটের মধ্যে ঢুকে পড়ি। অনেক হো-নরনারী জড় হয়েচে। মেয়েদের চুলে প্রচুর করন্‌জার তেল, খোঁপা ঢিলে ও বাঁকা, তাতে বন্যফুল গোঁজা। পুরুষদের প্রায় সকলেরই হাতে তীর ধনুক। তীর ধনুক না নিয়ে কোনো হো-যুবক বা বৃদ্ধ পথ চলে না।

বিক্রী হচ্ছে যা গোটা সিংভূমের হাটে সাধারণতঃ বিক্রী হয়ে থাকে। বীচিওয়ালা বেগুন, টোম্যাটো ও পেঁয়াজ, শুট্‌কি মাছ, জোঁদা অর্থাৎ নাল্‌সে পিঁপড়ের ডিম, বাখর অর্থাৎ মহুয়ার মদ তৈরী করবার মশলা—দেখতে কদমার মত; সুন্দর সরু শীতাশাল চাল, মাটির হাঁড়িকুড়ি, মহুয়ার তেল, করন্‌জোর তেল এবং তাতে তৈরী মোটা কাপড় ও গামছা। এদেশে মোটা চাল তত বেশী দেখা যায় না, যত দেখা যায় সরু সাদা ধবধবে সীতাশাল চাল। পাহাড়ী পাথুরে জমি নাকি সরু ধানের পক্ষে অনুকূল।

বুধনি কুইকে জিজ্ঞাসা করা হোল—কি কিনবি রে হাটে?

সে হাসতে হাসতে বললে—কিছুই না।

—তবে কেন এসেচিস্?

—মুরগীর লড়াই দেখতে।

হ্যাঁ—এই একটা আকর্ষণের বস্তু বটে এদের জীবনে। দশক্রোশ হেঁটে এরা আসতে পারে মুরগীর লড়াই দেখতে।

—কোথায় মুরগীর লড়াই হচ্চে রে!

—হয় নি। ওই গাছের তলায় হবে। হাট ভেঙে গেলে হবে, নয়তো মুরগীর

লড়াই আরম্ভ হোলে হাটে কে থাকবে?

কথাটা সত্যি বলেছে বুধনি। কেনা-বেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, টাকা রোজগার—এসব জীবনের অতি তুচ্ছ জিনিস। এর কি দাম আছে জীবনে? আসল জিনিস হোল মুরগীর লড়াই। গাছের তলায় মাদল বাজচে, গোলাকারে উৎসুক নরনারী-ঠ্যাঙে-ছুরি-বাঁধা দুটো লড়াইয়েমোরগের ঝটাপটি দেখচে, টুপটাপ মহুয়ার ফুল ঝরে পড়চে ওদের মাথার, আশেপাশে সামনে দূরে নীল শৈলমালা...

জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ-মুহূর্ত্ত।

এদের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা ও আমোদপ্রিয়তা লক্ষ্য করবার বিষয় বটে।

কি জানি হয়তো চক্রধরপুরের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে শুশুগানপুরের গিরিগুহার চিত্রাবলী এদের পূর্ব্বপুরুষেরা এঁকেছিল কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগে!

আমার স্ত্রী নারীসুলভ বস্তুপ্রিয়তা প্রদর্শন করে বললেন—একখানা নক্শা করা চাদর কিনবো—

আমি চাদর ক্রয়ের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি দেখালুম অবিশ্যি, কিন্তু কিছুই খাটলো না।

আবার আমরা পথে বেরুই। এবার কি বেজায় ধুলো শুরু হোল। স্টীয়ারিংয়ের তলাকার কোন্ ফাঁক দিয়ে ফোয়ারা থেকে জল বেরুবার মত ধুলো ঢুকতে লাগলো।

আর একটা বন্যগ্রাম ও পথের পাশে তাদের মৃতদের উদ্দেশে প্রোথিত প্রস্তর-রাজি। এইগুলো যেখানেই দেখি, সেখানে প্রায়ই থাকে একটা প্রাচীন বট বা মহুয়া গাছ। পাহাড়ের পাশে যদি হয় মনে কেমন এক অদ্ভুত ছন্নছাড়া ভাব নিয়ে আসে।

এমনি এক সমাধি স্থানের বর্ণনা করেছি আমার লেখা 'আরণ্যক'-এ। সে স্থান গয়া জেলার প্রান্তে, দক্ষিণ-বিহারের শৈলামালার নিবিড়তম অভ্যন্তরে অবস্থিত··· অথচ আজ সেই সব দৃশ্যের কথাই আমার মনে আবার নিয়ে আসে এই বন্যগ্রাম ও এদের সমাধি প্রস্তরের চৌরস সারি।

তিনটি বন্যগ্রাম পার হয়ে তবে চিটিমিটি। গ্রামগুলির নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে আমার স্ত্রী একটি ছড়া তৈরী করলেন—

আগে হোল পেটাপেটি
বাঁকে, রুয়াউলি, করজুলি
তারপর চিটিমিটি—

এর কবিত্ব প্রশংসনীয় না হোলেও, নামগুলো মনে রাখার সুবিধে হয়। যেমন মুখস্থ করেছিলুম কোন ছেলেবেলা—

ষোলশ সাতাশ অব্দে জাহাঙ্গীর ম'ল
সাজাহান ভারতের বাদশাহ হোল—

এখন কত উপকার দেয়!

বেলা চলে যাচ্চে, এমন সময় উপরোক্ত ছড়ার প্রথম গ্রামটির মধ্যে গাড়ী ঢুকলো। এবার ধুলো-ভরা রাস্তা ছেড়ে পাহাড়ের পথে উঠচি, একটা পাহাড়ের ওপারেই পেটা-পেটি গ্রাম। এখানে যদি বা বাড়ী করে বাস করবার লোভ সম্বরণ করা চলে, কিন্তু পরবর্ত্তী তিনখানি গ্রামের অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষকে সভ্য জগতের কথা একেবারে ভুলিয়ে দেয়!

আমি এই সময় মিঃ সিংহকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার চাকরি জীবনের প্রথম দিনের সেই অভিজ্ঞতাটার কথা বললেন না?

—চলুন, চিটিমিটি বাংলোতে বসে চা খেতে খেতে আরাম করে শুনবেন। সে

সত্যিই শোনবার মত বটে—

—কোনো বন্যজন্তুর হাতে পড়েছিলেন?

—ঠিক সে ভাবের নয়, তবে পড়লে বিস্মিত হবার কারণ ছিল না।

এমন একটা উঁচু জায়গা দিয়ে আমাদের মোটর যাচ্চে যে আমরা আমাদের সামনে সাপের মত আঁকা বাঁকা সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্চি—কখনও শৈলগাত্র বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে আবার কখনও দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেচে আগে আগে।

বাঁকে গ্রামখানির দুদিকে পাহাড়, সামনে ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেছে কুলকুল শব্দে। পাহাড়ের ওপরে বন্যবাঁশের বন, শালবন, শুভ্রকাণ্ড শিববৃক্ষ। যার কোথাও বাড়ী করবার প্রবৃত্তি হয় না—নিতান্ত আরব বেদুইনের মত যে ছন্নছাড়া ও ভ্রাম্যমাণ—তারও অভিলাষ জাগবে মনে, ঐ পাহাড়ী ঝর্ণার পাশে কিছুদিন বাস করি!

রুয়াডীল।

সাদা কোয়াৎর্জ পাথরের ridge একদিকে ঢেউ-খেলানো পাহাড়—অধিত্যকায় মাঝে মাঝে শালবন। পাহাড়ের গায়ে রোদ পড়ে বেশ দেখাচ্চে।

করজুলি।

দূরে একটা গ্রাম দেখচি থাকে থাকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেচে। করজুলিতে হো-অধিবাসীদের ঘরগুলি শালপাতার ছাওয়া, রাঙামাটির দেওয়াল, পাহাড়ের গম্বুজ উঠেচে দূরের কালো বনরেখার ওপরে; জ্যোৎস্নারাত্রে এই গ্রামগুলি মায়াময় হয়ে উঠবে বেশ বুঝতে পারচি।

বেলা যাবার দেরি নেই—পশ্চিম দিগন্তে দূর বরকেলা শৈলশ্রেণীর ওপরে সূর্য্য ঝুঁকে পড়েচে। এমন সময় মোটর আবার পাহাড়ের ওপরে উঠতে শুরু করলে।

মিঃ সিংহ বললেন—ওই দেখুন চিটিমিটি বাংলো দেখা যাচ্চে পাহাড়ের মাথায়—ওখান থেকে ওপারের সমতলভূমির দৃশ্য বড় চমৎকার দেখায়—

একটু পরে বনপথে উঠে আমাদের গাড়ী একটা ছোট বাংলোর সামনে দাঁড়ালো।

চিটিমিটি বাংলোটি বড় সুন্দর স্থানে অবস্থিত। পাহাড়ের মাথায় ছোট্ট বাংলো, অনেক নীচে সমতল ভূমি, সন্ধ্যার অন্ধকারে অস্পষ্ট। কার্সিয়াং থেকে নীচের দিকে যেমন সমতল ভূমি দেখা যায়, অনেকটা তেমনি দৃশ্য। পেছন দিকে পাহাড়ের নীচে উপত্যকায় বনের আড়ালে করজুলি গ্রামের হো-অধিবাসীরা মাদল বাজিয়ে গান ধরেছে। বাংলোর মধ্যে ঢুকে দেখা গেল অনেকদিন এখানে কেউ না আসার দরুন আসবাবপত্র ভাল অবস্থায় নেই। দুটিমাত্র ছোট ঘর। রাত্রে এখানে থাকার বিশেষ অসুবিধা।

হরদয়াল সিং প্রস্তাব করলেন, এই রাত্রেই চাঁইবাসা ফেরা যাক।

এই বরকেলা শৈলমালার বিপজ্জনক নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে মোটর রোড ঘুরে ঘুরে নীচের সমতলভূমিতে নেমেচে। অন্ধকারের মধ্যে সে পথে মোটরে যাওয়া এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। অগণন জোনাকীপুঞ্জ জ্বলছে গাছের ডালে পাতায় পাতায়। দশ-বিশ হাত অন্তর ফাঁকা। একপাশে গভীর খাদ। তার পরেই বনাবৃত উপত্যকা। ওপারে একটা বেজায় উঁচু পাহাড় খাড়া উঠেচে। মোটর খুব জোরে চলতে পারচে না।

আমি বললুম—কোন বিপদ নেই তো?

হরদয়াল সিং বললেন—বুনো হাতী ছাড়া।

—বুনো হাতীর হাতে পড়েচেন এমন অবস্থায়?

—একবার পড়েছিলুম। এই সংকীর্ণ পথে এমন অন্ধকারে।

—বলেন কি?

—মোটরে যাচ্চি, হাতী সামনে এসে দাঁড়ালো—আর নড়ে না। মোটর ফেরাবার জায়গা নেই। অগত্যা মোটর থামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হাতী পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে শুঁড় নাড়তে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ পরে কেন যে চলে গেল তার কারণ কিছু বলতে পারবো না। সমস্ত রাতও সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সব পথে বিশ্বাস নেই। পরের বাঁকেই হাতী দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বরকেলা পাহাড়ে হাতীর বড় উপদ্রব।

আমরা পাহাড়ের পথে নামছিলুম। আশেপাশে ঘনীভূত অন্ধকার। নিজ্জর্ন অরণ্যপথ—গাড়ীতে অন্ধকারের মধ্যে আমরা চার-পাঁচটি প্রাণী, কোনোদিকে লোকালয়ের চিহ্ন দেখা যায় না, দূরে বা নিকটে একটা আলো কোথাও জ্বলে না—কেবল নৈশ আকাশে অগণন ঝক্‌ঝকে নক্ষত্ররাজি, গাছের ডালে ডালে জোনাকীর ঝাঁক, গাড়ীর মধ্যে দু-একটা জ্বলন্ত সিগারেটের ক্ষীণ দীপ্তি।

গল্প যদি শুনতে হয় তবে এই সময়।

আমি বললুম—চা আছে ফ্লাস্কে?

মিঃ সিংহের আরদালি বললে—আছে হুজুর।

আমি প্রস্তাব করলাম—গাড়ি একটা ভাল জায়গা দেখে থামিয়ে চা খাওয়া এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক্। এই সময়ে মিঃ সিংহ তাঁর প্রথম চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন। গল্পটা মুলতুবী রয়েছে অনেকক্ষণ থেকে।

আরও পনেরো মিনিট পরে বাঁদিকে একটা বড় শিলাখণ্ড পাওয়া গেল, যেন সান বাঁধানো চাতাল। এর পাশে আমাদের গাড়ী থামানো হোল। বেশ আরামে বসে চা খাওয়া গেল পাথরের চাতালে বসে। পাশের খাদে যেন একরাশ নিবিড় অন্ধকার জমে। দু-একটা নৈশ পাখির ডাক বনের মধ্যে। মিঃ সিংহ বললেন—সে হোল ১৯২২ সালের কথা। সেবারে আমি প্রথম বন-বিভাগে ট্রেনিং-এ গেলাম। অর্ডার পেলাম, পোংসাতে গিয়ে বন-বিভাগের কর্ম্মচারীর কাছে কাজ শিখতে হবে।

—পোংসা কোথায়?

—যখনকার কথা বলছি, তখন আমিও জানতাম না। শুধু এইটুকু আমায় বলে দেওয়া হয়েছিল, বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের মনোহরপুর স্টেশনে নেমে সেখানে যেতে হয়।

—কত মাইল?

—ষোল-সতেরো মাইল।

—রাস্তা ভালো?

—সেইটাই আমার গল্পের বিষয়। এ গল্প প্রধানত রাস্তার গল্প। আজ এই অন্ধকার রাত্রে বনের পথে সে কথা বড় বেশি করে মনে হচ্ছে। শুনুন তারপর। মনোহরপুর স্টেশনে নেমে ওখানকার বন-বিভাগের বাংলোতে লোকজনের সঙ্গে দেখা করলাম। তাদেরই মুখে শুনলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে ১৫।১৬ মাইল দূর। বেলা তিনটা। আমার সঙ্গে সাইকেল ছিল, দেশ থেকে এক পাচক ঠাকুরও এনেছিলাম। আমি ভাবলাম, এ আর এমন বেশি দূর কি! সাইকেলে চট করে চলে যাওয়া যাবে। কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম বাধা হোল পাচক ঠাকুর। সে পথ চেনে না। একা এ পথে যেতে পারবে না। অগত্যা আমরা কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে

পদব্রজে কইনা নদী পার হয়ে ওপারে গেলাম। দূরে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য চিরকালই ভালবাসি, নীল পাহাড়শ্রেণী দেখে মনে বড় আনন্দ হোল। ওখান থেকে যেতে পথের ধারে ধারে দু-দশটি শালগাছ, মাঝে মাঝে ছোটখাটো পাহাড়, তার ওপর গাছপালা। আমার বন সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই পূর্ব্বেই বলেছি। বিন্ধ্যাচলে বন দেখে ভেবেছিলাম এই বুঝি নিবিড় অরণ্য। এর চেয়ে আর কি বড় বন হতে পারে? আমার দেশ আরা জেলায়, বন বলে কোনো জিনিস নেই, শুধু ক্ষেত-খামার আর চষা জমি। জমির বড় দাম, এতটুকু পড়তে পায় না।

আমি বললাম—কত দাম জমির?

—পাঁচ-ছশো টাকা বিঘে। তাও ভাববেন না খুব ভাল জমি।

—তারপর?

—তারপর মাইল পাঁচেক পথ এসে কোল-বোংসা বলে একটা ছোট গ্রাম। হো-জাতীয় অধিবাসীদের বাস। সেখানে এসে কুলিরা আর যেতে চাইলে না। তারা বললে সে গ্রামেই তাদের বাড়ী। আর এক পাও তারা নড়বে না, তাদের মজুরি চুকিয়ে দেওয়া হোক। অগত্যা আমাদের সেখানে রাত কাটাতে হোল গ্রামের প্রান্তে বন-বিভাগের একটা ছোট খড়ের ঘরে। ঘরটাতে কেউ থাকে না, ঘরের চারিদিকে বড় বড় শাল গাছ, সারা রাত্রি ধরে শিশির পড়তে লাগলো, যেন মনে হচ্ছিল টুপ টুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সময়টা ছিল কার্ত্তিক মাস।

—খেলেন কি?

—আমার পাচক ঠাকুর দুটি ভাত রান্না করলেন তাই খেয়ে শুয়ে পড়ি। পর-দিন সকালে উঠে জিজ্ঞেস করে জানলাম পোংসা সেখান থেকে দশ মাইল রাস্তা। পাচককে বললাম, কুলি যোগাড় করে আমার পরে পোংসা রওনা হতে। আমি তখনই সাইকেলে চললাম। ঠাকুর বারণ করলে তখন যেতে। আমি বললাম—বন তো ফুরিয়ে গিয়েছে। এ রাস্তা বিশেষ খারাপ হবে না। বন যে আরম্ভ হয় নি তখন কি তা জানি?

মিঃ হরদয়াল সিং বললেন—পোংসাতে আমিও ছিলাম ট্রেনিং-এর সময়। দেরাদুনে ফরেস্ট কলেজে যাওয়ার পূর্ব্বে। ওখানে বেঙ্গল টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানীর আপিস ছিল সে সময়।

মিঃ সিংহ বললেন—কোল-বোংসা থেকে মাইল খানেক রাস্তা বেশ বন পেলাম। কিন্তু নিকটেই গ্রামের গরু মহিষ চরছে, কাঠুরে কাঠ কাটচে, সুতরাং তত ভয় হবার কথা নয়। তারপরে মহাদেবশাল বলে একটা ঝর্ণা পার হলাম, নিবিড় বনের মধ্যে ঝির ঝির করে বইছে পাথরের ওপর দিয়ে। ভাবলাম, বন আর কতদূর হবে? এই শেষ হয়ে গেল! ক্রমে পাহাড়ের ওপর রাস্তা উঠতে লাগলো, উঠচে, উঠচে, সাইকেলে যেতে যেতে পা ভেঙে পড়চে, বুকের মধ্যে কেমন অস্বস্তি হচ্চে, এদিকে বন ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তম হতে লাগলো। জনমানবহীন সুনির্জ্জন সুনিবিড় বনানী সেই ক্রমোচ্চ পাহাড়ী পথের পাশে। আরা জেলার অধিবাসী আমি, অমনতর বনের ধারণাই নেই আমার। ভয়ে বিস্ময়ে আমি কেমন হয়ে গেলাম। একটা মানুষ কি নেই সেই পথে? যত যাই পথেরও কি শেষ নেই? অত বেলা হয়েছে কিন্তু সে বনে ভালো করে তখনও সূর্য্যের কিরণ পড়ে নি। এ রকম আবার বন হয়!

আমরা যেখানে পাথরের চাতালে বসে গল্পটা শুনছিলাম, বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সানুপ্রদেশের বনানীর মধ্যে সেখানে অন্ধকারে চারিদিকে যেন মিঃ সিংহের এ অভি-জ্ঞতা নিজেদের কাছেই বাস্তব হয়ে উঠেছিল। এ গল্প শুনতে হয় এমন জায়গাতে

বসেই বটে!

মিঃ সিংহ বললেন—তারপর এক জায়গায় আমার সত্যিই মনে হোল পোংসা নামক জায়গাতে বেঁচে থাকতে আর বোধ হয় পৌঁছবো না। তখন নতুন বিয়ে করেছি! মনে হোল এখানে বসে পকেটের কাগজ নিয়ে একটা উইল লিখে রাখি। এই যেন হাতী কি বাঘ এসে ঘাড়ে পড়লো বলে। আর কোন আশাই নেই। শুধু দাঁতে দাঁত চেপে মনের জোরে পথ চললাম। অবশেষে বন ক্রমে যেন একটু পাতলা হয়ে এল। একটা পাহাড়ের ওপর একটা ছোট বাংলো পাওয়া গেল। লোকালয় দেখে ধড়ে প্রাণ এল। তখন বেলা তিনটে। জিজ্ঞেস করে জানলাম আমার গন্তব্যস্থান এখান থেকে আরও মাইল ছয়েক। কোল-বোংসায় যে বলেছিল দশ মাইল, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এদের দূরত্ব সম্বন্ধে কোনো ধারণা নেই। আবার বন। তবে আমার মনে অনেকখানি ভরসা হয়েছে।

আমি বললাম—কখন পৌঁছুলেন—

—প্রায় সন্ধ্যার সময়। ওপরওয়ালা কর্ম্মচারী ছিলেন এক পাঞ্জাবী, তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি বাসা দিলেন প্রায় আধ মাইল দূরে এক ছোট্ট খড়ের ঘরে। সারাদিন সাইকেল চড়ার পরিশ্রমের পরে সেই ঘরে দড়ির খাটিয়ার ওপর বিনা বিছানাতে বিনা লেপে শুয়ে রইলাম। দুর্দ্দান্ত শীত। অনেক রাত্রে পাঞ্জাবী কর্ম্মচারীর চাকর আমায় খানকতক রুটি আর একটু ডাল দিয়ে গেল। পরদিন দুপুরের সময় আমার প্লাচক এসে পৌঁছুল আমার জিনিসপত্র নিয়ে। সে না কি ঐ রাস্তায় একটা বাঘকে শুয়ে থাকতে দেখেছিল। বিচিত্র নয়!

মিঃ সিংহ গল্প শেষ করলেন। আমরা আবার মোটরে উঠে সৈদবার পথে বরকেলা পাহাড়শ্রেণী থেকে নেমে এসে রাঁচি-চক্রধরপুর-রোড ধরলাম। রাত দশটায় চাঁইবাসা।

আমি বললাম—পোংসায় আর কিছু ঘটে নি আপনার চাকরির প্রথম দিনে?

মি সিংহ বললেন—আর বিশেষ কিছু নয়, তবে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। কেবল ভাবি, যেমন বন-জঙ্গল দেখচি, হয়তো বাঘ-ভালুক ঢুকেই পড়বে ঘরের মধ্যে। তার উপর ভীষণ শীত, আমার সঙ্গে একখানা মাত্র আলোয়ান এবং সেই একমাত্র শীতবস্ত্র। এত অসুবিধের মধ্যে ঘুম যতটা হওয়া সম্ভব ততটা হয়েছিল।

—কোথায় শোবার জায়গা দিয়েছিল?

—একটা ছোট্ট ঘরে। তার একদিকে জঙ্গল ও ক্ষুদ্র একটি পাহাড়ী ঝর্ণা। গ্রাম থেকে সিকি মাইল দূরে।

এ সব প্রশ্ন সেদিন অত খুঁটিনাটি ভাবে জিজ্ঞেস করেছিলুম এবং তার উত্তর এত আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলুম যে, গৃহ ও পরিবারবর্গের অংক থেকে সদ্যবিচ্যুত একটি অনভিজ্ঞ যুবকের সেই দিন ও রাত্রির তিক্ত অভিজ্ঞতা আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং পথের পাশে অন্ধকার রাত্রে গাছের তলায় চা পানের পরের বৎসর আমি নিজে যখন মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে মনোহরপুর থেকে কোল-বোংসা হয়ে পোংসা এলুম, এমন কি ছোটনাগ্‌রা গ্রামের সেই কুঁড়েঘর দেখলুম যেখানে মিঃ সিংহ রাত কাটিয়েছিলেন—তখন আমার কল্পনায় অঙ্কিত সব ছবির সঙ্গে এত গরমিল হোল, যে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলুম।

গত ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে আমি মিঃ সিংহের সঙ্গে সিংভূমের বিখ্যাত সারাণ্ডা ফরেস্ট ভ্রমণ করি। মিঃ সিংহ তিন মাসের জন্যে সারাণ্ডা বিভাগে বদলি

হয়েছিলেন, আমিও ঐ দুই মাসের সুযোগ গ্রহণ করবার জন্যে ওঁর সঙ্গে সারাণ্ডা ভ্রমণে বের হই।

মনোহরপুর থেকে মোটর ছেড়েই আমরা কইনা বলে একটি পার্ব্বত্য নদী পার হলুম।

তারপর রাঙা মাটির আঁকা-বাঁকা পথ এঁকে বেঁকে যেতে যেতে সাত-আট মাইল দূরবর্ত্তী সপ্তশত শৈলযুক্ত সারাণ্ডা (Saranda of seven hundred hills) অরণ্য-প্রান্তরের নীল রেখার সঙ্গে মিশে গিয়েচে, পথের পাশে এখানে একটা ডুংরি (অনুচ্চ পাহাড়) ওখানে একটা ছোট শালবন, কোথাও বা একটা হো-অধিবাসীদের গ্রাম।

মিঃ সিংহ বললেন- এই সেই পথ, মনে আছে আমার গল্প?

আমি তখনও পর্য্যন্ত বন দেখি নি সে পথে। বললাম—কেন এ পথ মন্দ নয় তো?

মাইল ছ-সাত পরে কোল-বোংসা গ্রামে পেঁছে গেলাম। উনি বললেন—চলুন, এ গ্রামে যেখানে রাত্রি যাপন করেছিলাম দেখিয়ে আনি।

মোটর থেকে নেমে আমরা একটা পাহাড়ের ওপর উঠলাম। সেই পাহাড়ের মাথার ওপর ক্ষুদ্র একটি কুটিরের সামনে এক বৃদ্ধ লোক খামারে ধান ঝাড়চে, কুমড়োর লতা উঠেচে কুটিরের খড়-ছাওয়া চালের ওপর; কুটিরের দাওয়া থেকে সম্মুখের সারাণ্ডা-বনকান্তারের শৈল-শ্রেণীর গম্ভীর দৃশ্য হিমালয়ের পার্ব্বত্যভূমির সৌন্দর্য্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

হিংসে হোল বৃদ্ধ ব্যক্তিটির ওপর, এমন সুন্দর জায়গায় ওর বাড়ী।

মিঃ সিংহ তাকে বললেন—কি জাত?

লোকটা বললে,—'গোসাঁই'। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। এ দেশে ব্রাহ্মণকে বলে 'গোসাঁই'। এতক্ষণ লক্ষ করি নি ওর গলায় মলিন পৈত্য ঝুলচে বটে।

সে পাহাড় থেকে আমরা ওপারের সমতলভূমিতে নেমে আসল গ্রামে পেঁছুলাম।

গ্রামের প্রান্তে একটা ভাঙা কুঁড়েঘর দেখিয়ে মিঃ সিংহ বললেন—এই ঘরে সেদিন রাত কাটিয়েছিলাম।

কুটিরটির চারধারে বড় বড় শালগাছ, একটু দূরে একটা কালো পাথরের ডুংরি অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাহাড়। সে পাহাড়ের উপর শালগাছের সঙ্গে লতা-পলাশের (Buteasuperba) জড়াজড়ি। বসন্তকালে রক্তপলাশের মেলা যখন শুরু হয়ে যাবে বনে বনে, তখন যে কোনো কবি, সাহিত্যিক, ভাবুকের পক্ষে কিংবা ভগবানের চিন্তায় মগ্ন সাধুর পক্ষে এই নিভৃত বনকুঞ্জবর্ত্তী কুটিরটি অতি লোভনীয় হবে সন্দেহ নেই।

কোল-বোংসা গ্রামে বাস করে হো-জাতীয় অধিবাসীরা, ঘরদোর তাদের অত্যন্ত খারাপ—নিতান্ত দীনহীন, কিন্তু তারা এক রমণীয় পার্ব্বত্য দৃশ্যের মধ্যে সর্ব্বদা থাকে, ওদের কুটিরের দাওয়ায় বসলে নীল শৈলমালা ও বনকান্তারের কি শোভন রূপটিই চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অনেক বড়লোকের বাড়ী হয়তো কোনো এঁদো গলির মধ্যে এক ইটের স্তূপ মাত্র, দরজার একপাশে দেখা যাবে ডাস্টবিন; গোটা-কতক কাক আর খেঁকিকুকুর আশপাশে ঘুরে বেড়াচ্চে—এমন নীল বনানীর শোভা, এমন রক্তপলাশের উৎসব সেখানে কোথায়?

কোল-বোংসা গ্রাম ছেড়ে মহাদেবশাল বলে একটি পার্ব্বত্য নদী নিবিড় বনের মধ্যে বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে কুলুকুলু শব্দ করে বয়ে চলেচে। নিভৃত ছায়া-বিতান রচনা করেচে সারাণ্ডা অরণ্যপ্রান্ত। এখান থেকেই চড়াইয়ের পথে মোটর উঠতে

লাগলো। পরক্ষণেই কি নিবিড় বন শুরু হোল রাস্তার দুদিকে, কি দূর সমতল-ভূমির দৃশ্য। ওই দূরে মনোহরপুর ইস্টিশান, ওই ট্রেনের ধোঁয়া উড়চে, ওই সেই কোল-বোংসা গ্রামে ছোট্ট পাহাড়ের ওপর গোসাঁইয়ের কুটির ও খামার।

এক এক জায়গায় বনের গম্ভীর দৃশ্য মনে ভয়ের সঞ্চার করে, তবুও আমরা মোটরে চলচি, সঙ্গে এতগুলো লোক। কিন্তু একটি অনভিজ্ঞ যুবক যেদিন এই বন্য-জন্তু-অধ্যুষিত অরণ্যভূমির মধ্য দিয়ে একা সাইকেলে গিয়েছিল, তার সেদিনকার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারলাম।

মিঃ সিংহ বললেন—এই সেই পথ, দাদা।

—বেশ বুঝতে পারচি।

—এখনও কিছু দেখেন নি। আরও আগে চলুন।

চৈতন্যদেবের সেই "এহ বাহ্য, আগে কহ আর"! বন কি নিবিড় হয়ে উঠেচে, কাছির মত মোটা চীহড় লতা (Bonhivia Vallai) বিশাল বনস্পতির সঙ্গে জড়াজড়ি করে দুর্ভেদ্য ও অন্ধকার লতাকুঞ্জের সৃষ্টি করেচে পদে পদে, অত বেলাতেও সূর্য্যের আলো পড়ে নি।

একটা জায়গা দেখিয়ে মিঃ সিংহ বললেন, এখানে এসে এমন হতাশ হয়ে পড়ে ছিলাম যে ভাবলুম একটা উইল লিখি ও পকেটে একখানা পরিচয় রাখি।

আমি বললাম—বন্যজন্তু আছে এইখানে?

—সারাণ্ডাতে বন্যজন্তু নেই? বাঘ বলুন, বুনো হাতী বলুন, ভালুক বলুন—অভাব কি? বাইসন, সম্বর হরিণ পর্য্যন্ত। বাদ নেই কিছু।

দেড় ঘণ্টা মোটর চালানোর পর বন একটু পরিষ্কার হোল। দূরে দেখা গেল লাল টালির দু-চারখানি ঘরবাড়ি। মিঃ সিংহ বললেন—ওই হোল পোংসা—

পোংসাতে বি. টি. টি. কোম্পানীর (ব্রিটিশ টিম্বার ট্রেডিং কোম্পানী) বড় আড্ডা। এই কোম্পানীর অংশীদারেরা হচ্ছে বিলাতের বড় লোকেরা, এমন কি পার্লামেন্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে এদের মধ্যে। বিদেশীর স্বার্থে আমাদের দেশের বন্যসম্পদ সব লুণ্ঠিত হচ্ছে। গত ত্রিশ বৎসরে সিংভূমের এই অপূর্ব্ব অরণ্যভূমি অনেক নষ্ট হয়ে গিয়েচে। এই ব্যবসায়ের সুবিধা ভোগ করচে বিলাতের বড় মানুষেরা, আর বনভূমির আদিম অধিবাসী হো ও মুণ্ডারা কুলিগিরি করে দাসত্বের অন্ন ভোজন করচে মাত্র।

সেই বনাবৃত স্থানে ছোট্ট একটি গ্রাম। একখানা সাহেবী ফ্যাসানের খড়ের বাংলো ঘরের মধ্য থেকে একজন সাহেব বার হয়ে এল আমাদের মোটরের শব্দ শুনে।

মিঃ সিংহ বললেন—শুনি বি. টি. টি. কোম্পানীর ওয়ার্কস্ ম্যানেজার মিঃ লক্নার ভালো লোক।

একদিকে একটা লম্বা খড়ের ব্যারাক-মত বাড়ী। একটি বাঙালী বিধবা মহিলা একখানা ঘর থেকে বার হয়ে এলেন মোটরের আওয়াজ পেয়ে। শুনলাম ও বাড়ীখানা কেরানীদের থাকবার জায়গা। এতদূরে এই বনের মধ্যে দু-একটি বাঙালী পরিবার কি ভাবে নির্জ্জন জীবন যাপন করচেন চাকুরির খাতিরে—ভাবতে ভালো লাগে।

মিঃ লক্নারের মোটর আছে, তিনি মোটরে মনোহরপুর যেতে পারেন মানুষের মুখ দেখতে, কিংবা যেতে পারেন একশ মাইল দূরবর্ত্তী দুধিয়া ও চিড়িয়া খনিতে, সেখানে শ্বেতকায় ম্যানেজার আছেন। কিন্তু এই বাঙালী কেরানীদের বাড়ীর মেয়ে-ছেলেরা জেলে আবদ্ধ অবস্থায় এখানে কিভাবে দিন কাটান, কি করে বলবো?

আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্ত্তে গাড়ী থেকে নেমে ওই বাঙ্গালী বাবুদের বাড়ীতে চলে যাই, ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করে ওদের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে দিই—

ঠিক বলতে পারি ওরাও খুব খুশী হবেন আমাকে পেয়ে।

পোংসা থেকে কিছুদূর এসে আবার আমরা ঘন বনের পথে ঢুকে পড়লুম, বাঙালী বাবুদের বাসা ও সাহেবদের বাংলো অনেক পেছনে পড়ে রইল।

মিঃ সিংহের সঙ্গে পোংসা থেকে বার হয়ে কিছু দূরে বনপ্রান্তে এসেচি. একটা লোককে খাটিয়াতে শুইয়ে চারজন কুলি কাঁধে খাটিয়াসুদ্ধ মানুষটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটা বালিশে মাথা দিয়ে খাটিয়াতে শুয়ে পড়ে আছে অচৈতন্যভাবে। আমি জিজ্ঞেস করলুম কুলিদের--কে এ বাবু?

–বি. টি. টি. কোম্পানীর লোক।

--কি হয়েছে?

বেমার।

--কোত্থেকে আসচে?

--জঙ্গলের মধ্যে কাজ করছিল।

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

পোংসা। সেখান থেকে মনোহরপুর হাসপাতালে।

-বাঙালী?

হাঁ বাবুজী।

নাম জানো?

—চক্কটি বাবু।

বড় ইচ্ছে হোল এই রোগগ্রস্ত প্রবাসী বাঙালী ভদ্রলোককে নিজে একবার দেখি, দুটো কথা ওঁর সঙ্গে বলি। কিন্তু তিনি জ্বরে বেহুঁশ. আমারও সময় নেই।

মিঃ সিংহ বললেন ভীষণ ম্যালেরিয়া মশাই. সারাণ্ডার ভেতরে।

—লোক থাকে না?

—হো যারা. তারা ভোগে না. ভোগে বিদেশীরা।

সারাণ্ডা ফরেস্টে পক্ষপাতিত্ব আছে বেশ!

-শুধু ম্যালেরিয়া?

—ম্যালেরিয়া আর ব্ল্যাকওয়াটার ফিভার।

খাটিয়াসুদ্ধ রোগী পোংসার দিকে বাহিত হয়ে চলে গেল। আমরা আরও কিছু-দূরে এসে উসুরিয়া নামে একটা পার্ব্বত্য ঝর্ণা বা ক্ষুদ্র নদী পার হলুম। মিঃ সিংহ বললেন - অনেকদিন আগে গ্রেগরি বলে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বাস করতো উসুরিয়া ঝর্ণার ধারে একটা বাংলোতে—আমাকে মাঝে মাঝে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করতো তার বাংলোতে। চলুন সে জায়গাটি দেখে আসি।

১৯২৫ সালে গ্রেগরি ওখানে থাকতো।

উসুরিয়া পাহাড়ী নদী। খুব শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে বনের মধ্যে দিয়ে—দুদিকে পাষাণময় উঁচু তীর। শিলাতটে প্রতিহত হচ্চে উসুরিয়া ঝর্ণার নির্ম্মল জলধারা। অপরাহ্নে ছায়া পড়ে এসেচে. হলদে রোদ উঠেচে গগনচুম্বী তরুশ্রেণীর শীর্ষদেশে।

কতক্ষণ নদীর তীরে শিলাসনে বসে রইলুম। উসুরিয়ার কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সংগীত।

মিঃ সিংহ দেখে এসে বললেন—গ্রেগরির বাংলোর চিহ্ন নেই. সেখানে ঘোর বন।

— গ্রেগরি কি করতো এখানে?

—কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল উসুরিয়ার পাড়ে। সাহেব ছিল কার-খানার ম্যানেজার।

—কারখানা উঠে গেল কেন?

—ঠিক জানি নে। শুধু সাহেবের বাংলো নয়, কুলিদের ব্যারাক ছিল, কারখানা ঘর ছিল। দেখচি কিছুরই চিহ্ন নেই।

—১৯২৫ সালের পর এই প্রথম এলেন ১৯৪৩ সালে?

—তাই। উনিশ বছর পরে।

—"পুরা যত্র স্রোতঃ" কালিদাসের সেই শ্লোক জানেন তো? নগরী হচ্চে বন, বন হচ্চে নগরী। কালিদাসের কালেও তো এমন ধারাই ঘটতো। আজ দেখচেন পোংসায় বি. টি. টি. কোম্পানীর আপিস, মিঃ লক্‌নার তার বড় সাহেব। দু-দিন পরে সব জঙ্গল হয়ে যাবে, বুনো হাতীর ভয়ে দিনমানে মোটর চালানো দুষ্কর হবে।

এইভাবে সেদিন আমি মিঃ সিংহের গল্পে বর্ণিত পথ নিজের চোখে দেখেছিলুম। কিন্তু আমি সারাণ্ডা ফরেস্টের গল্প বলতে বসি নি, বলছিলাম চিটিমিটি থেকে আমাদের চাঁইবাসা ফিরবার গল্প। সেই গল্পই আবার আরম্ভ করি।

গাছতলা থেকে চা খেয়ে ও মিঃ সিংহের গল্প শুনে উঠে দেখি রাত অন্ধকার, গভীর অন্ধকার। বন্যহস্তীর ভয়ে সেই পার্ব্বত্যপথে সাবধানে গাড়ী চালিয়ে আমরা বরকেলা শৈলমালা থেকে ধীরে ধীরে নেমে সমতলভূমির পথে নামলুম। সৈদবা কলি আমাদের ডানদিকে। এবার আর পথের ধারে গভীর খাদ নেই, সুতরাং নিরাপদ পথে দ্রুত ছুটলো মোটর।

মিঃ হরদয়াল সিং বললেন—ঐ সামনেই রাঁচি রোড—

একটু পরেই আমরা পিচ-ঢালা চওড়া রাঁচি রোডে এসে উঠলাম। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে রোরো নদীর সেতু পার হয়ে চাঁইবাসা টাউনে প্রবেশ করলুম—রাত তখন দশটা—এ কথা আগেই বলেছি।

চাঁবাসা ফিরে ঠিক করা গেল পরদিনই আমরা জয়ন্তগড় ও চম্পুয়া যাবো এবং বৈতরণী নদীর ধারে মাঠে ও বনে আমাদের নিক্‌পিক্! প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, যে বনভোজনে বাড়ী থেকে তৈরি খাবার নিয়ে গিয়ে খাওয়া হয় তার নাম হোল নিক্‌পিক্—আর যেখানে রান্না করে খাওয়া হয় সেটা পিক্‌নিক্। নিক্‌পিকের আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন বৌমা, সুবোধের স্ত্রী। তাঁর নিপুণ ও শিল্পহস্তের তৈরি অনেক কিছু সুখাদ্য এলুমিনিয়ম লম্পুটকে ভর্ত্তি হোল, তবে চা নাকি তৈরি হবে বৈতরণী নদী-তীরের চমৎকার মাঠে ও বনের ধারে—তাই চায়ের সাজসরঞ্জাম নেওয়া হোল সঙ্গে।

আমরা জন-পাঁচেক একটা মোটরে। হাট-গামারিয়ার রাস্তায় মোটর হু হু চললো। দুধারে গ্রানাইটের অনুচ্চ পাহাড়, চাঁইবাসার আশেপাশে দক্ষিণ ধলভূমের সর্ব্বত্র এই ধরনের পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখে মনে হয় কালো পাথুরে কয়লার একটি স্তূপ। পাথরগুলোও অনেক জায়গাতেই অমনিতর ছোট ছোট ও আল্‌গা। পাহাড়ের ওপর শিশুগাছ (Dalbergia Sishu) অনেক দেখলুম এ অঞ্চলে। শিশুগাছ সাধারণতঃ পাহাড়ে দেখা যায় না, বনে পাওয়াও কঠিন। বাংলাদেশে যা শিশুগাছ বলে চলে, তা হোল দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি রেইন ট্রি। অনেক জেলা-বোর্ডের পথের ধারে বাংলাদেশে এই জাতীয় গাছ যথেষ্ট দেখা যায়।

মিঃ সিংহ বললেন—কাছেই একটা ভালো ঝর্ণা আছে।

—কতদূর?

—রাস্তা থেকে এক মাইল। বনের মধ্যে।

—এখন যাওয়া যাবে?

—ফিরবার পথে সুবিধা হবে, এখন থাক।

এ পথে হাট-গামারিয়া একটি ভালো জায়গা। মহারাজা শ্রীশ নন্দীর চীনামাটির খনি আছে এখানে। আর একটা আছে কিছুদূরে, সেটার মালিক জনৈক ধনী মাড়োয়ারী মহাজন। ধূ ধূ মাঠ ও রুক্ষ গ্রানাইট পাথরের অনুচ্চ টিলার মধ্যে ক্ষুদ্র একটা লোকালয়, বাজার, চায়ের দোকান, খোলার চালার দোকান-ঘর, একটি ডাক-বাংলো—এই নিয়ে হাট-গামারিয়া। তারপর আবার চওড়া পিচ-ঢালা রাস্তা সীমাহীন অনুর্ব্বর প্রান্তরের বুক চিরে সোজা চলেছে বহুদূরস্ত কেউনঝর-স্টেটের শৈলমালা ও অরণ্যানীর দিকে। মাঝে মাঝে ক্ষীণস্রোতো পাহাড়ী নদী ঝিরঝির করে বইছে। আর একটা কি গ্রাম পড়লো, শুনলুম, অনেক সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের বাস সে গ্রামে। একটা মসজিদও দেখা গেল। বন কোথাও নেই—দু-একটা শাল মহুয়া গাছ মাঠের মাঝে মাঝে।

অনেক দূর গিয়ে সামনে পড়ল একটা নদী, তার ওপর বাঁদিকে একটা ভাঙ্গা পুল। রাস্তা বেঁকে চলে গেল নদী পার হয়ে একটা নতুন তৈরী পুলের ওপর দিয়ে। নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেল গাড়ী। সুবোধবাবু বললেন—বৈতরণী পার হলেন এবার।

—বলেন কি? এত সহজে?

—তাই।

—এখন কোথায় যেতে হবে?

—তিন মাইল দূরে চম্পুয়াতে যাবো।

—সে তো কেউনঝর রাজ্যে!

—বৈতরণী পার হবার সঙ্গে সঙ্গে কেউনঝর রাজ্যে পা দিয়েচেন

—সীমান্ত রক্ষী-টক্ষী নেই?

—ও সবের বালাই নেই এদিকে।

আমরা একটি দৃশ্য দেখলুম—কেউনঝর-স্টেট থেকে লুকিয়ে চাল এনে বিক্রি করছে গরীব চাষীরা। বৈতরণীর এপারের ব্রিটিশ রাজ্যের প্রথম গ্রামে গাছতলায় চোরাই চালের হাট। খরিদ বিক্রি বেশ জোর চলছে। ক্রেতা বেশির ভাগ মাড়োয়ারী মহাজন।

দূরে মাঠের মধ্যে বেশ সুন্দর একটি অট্টালিকা দেখা গেল।

মিঃ সিংহ বললেন—ওই হোল চম্পুয়া ফরেস্টার্স ট্রেনিং একাডেমি।

—কেউনঝর-স্টেটের?

—আমাদের গভর্নমেণ্টের।

স্কুলটা আমরা দেখতে গেলুম। সাহাবাদ জেলার একটি মুসলমান ভদ্রলোক স্কুলের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। তিনি অত্যন্ত যত্ন করে মেয়েদের নিয়ে ক্লাসরুম, মিউ-জিয়ম, বোর্ডিংঘর ইত্যাদি দেখালেন। বড় বড় ব্ল্যাকবোর্ড টাঙ্গানো ক্লাসে ক্লাসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরগুলি। নূতন পালিশ করা 'চেয়ার বেঞ্চ'। বেশ ভালো ব্যবস্থা পড়াশুনোর।

মিউজিয়ম, সিংভূম ও উড়িষ্যা অঞ্চলের বনের বিভিন্ন শ্রেণীর টিম্বার, লতা, বীজ, বনজাত দ্রব্যাদি দিয়ে সাজানো। এখানে প্রথম গিলে বীজ দেখলুম—গিলের সাহায্যে ধুতি পাঞ্জাবি কোঁচাতে দেখেছি, কিন্তু জিনিসটা কি জানতাম না। মহিষের সিং-এর মত প্রকাণ্ড এক প্রকার ফলের মধ্যে যে বীজ তাই হোল গিলে। একটা

ফলের মধ্যে আটটা করে বীজ থাকে। নানা রকমের আঁশ—যা থেকে নাকি রেশমের চেয়েও ভাল কাপড় হতে পারে, তবে হয় না। মিউজিয়মের বাইরে ওসব আর কোথাও দেখা যায় না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বললেন—আপনাদের একটু চা—

আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বললাম—না না থাক, তার আর দরকার নেই। বেলা গিয়েছে।

একটু পরে আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চললাম জয়ন্তগড়। বৈতরণী-তীরে সুন্দর ডাকবাংলো ও মাঠ। বৈতরণীর একটা ছোট খাল, ডাকবাংলোর মাঠের এক ধার বেষ্টন করে রেখেচে। খালে এখন জল নেই। খালের ধারে জলজ ঘাস। স্থানটি বেশ নির্জ্জন ও মনোরম।

সঙ্গে যে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছিল, ওরা ছুটোছুটি করে খেলা করতে লাগলো মাঠে। মেয়েরা চায়ের জল চড়াবার ব্যবস্থা দেখতে গেলেন। নিক্‌পিকের আয়োজন পুরোদমে চললো।

আমরা তিনটি পুরুষ-মানুষ নদীর ধার ঘেঁষে চেয়ার পেতে বসে যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুগম্ভীর বিষয়ের চর্চ্চা করি। একটি ছেলে এসে বললে—মা বলে দিলে কাঠ নেই—

আমি অবাক হয়ে বলি—কাঠ?

—হুঁ!

মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলি—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে?

মিঃ সিংহ সুবোধের দিকে চেয়ে বললেন—কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে?

সুবোধ ছেলেটির দিকে চেয়ে কড়া সুরে হেঁকে বললে—কাঠ নেই বলে দিগে যা--

আমি বললাম—তা হোলে চা-ও থাকবে পড়ে। মেয়েরা কাঠ যোগাড় করবে কোত্থেকে?

একটু পরে ছেলেটি আবার ফিরে এসে বললে—মা বললে কাঠ না পেলে চা হবে না--

আমি সংক্ষেপে বললাম—খুব লজিক্যাল কথা।

সুবোধ চটে উঠে বললে—তবে ব্যবস্থা করুন।

—সবাই মিলে কাঠ কুড়ুতে যাই চলুন।

মিঃ সিংহ বললেন—খুব ন্যায্য কথা!

সুবোধ নিরুপায় হয়ে বললে—ড্রাইভারকে ডেকে বলে দিই কাঠ আনতে।

আমি বলি—অভাবে শুকনো খড়।

চমৎকার নিক্‌পিক্‌ ঘটে গেল জয়ন্তগড়ের ডাকবাংলোর সামনের মাঠে বৈতরণীর তীরে। প্রচুর জলখাবার তার সঙ্গে গরম চা। শীত পড়েছিল, আমরা বেলা সাড়ে চারটের সময় মোটরে উঠলুম আবার। বেশী দেরি করা উচিত হবে না। মাইল সাতেক গিয়ে একটা চীনেমাটির খনি। ধনী মালিকের প্রাসাদোপম বাসগৃহ কারখানা ও আপিস ঘরের হাতায়। আমরা গিয়েছি শুনে ম্যানেজার নিজে এসে কারখানা দেখাতে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে পরীক্ষাগারে নিয়ে গেলেন। এই মাটি দিয়ে চায়ের ডিশ পেয়ালা তৈরির পরীক্ষা চলছে সেখানে।

আমি বললাম—মালিক কোথায় থাকেন?

—ওঁর দেশ গোয়ালিয়র, তবে চাইবাসাতে বাড়ী আছে।

—ভাল কাজ চলছে?

—কাজ দশগুণ বেড়ে গিয়েছে যুদ্ধের দরুন। গভর্নমেণ্ট থেকে বহু চায়ের ডিস্ পেয়ালার অর্ডার পেয়েছি।

—ডিস্ পেয়ালা হচ্ছে ভালো?

—পরীক্ষা চলছে, এখন যা হচ্ছে তা ভেঙে যায় সহজে।

—এ মাটিতে টেকসই হবে?

—নিশ্চয়ই। মাস দুইয়ের মধ্যে আমরা গভর্নমেণ্টের অর্ডারে হাত দিতে পারবো।

তাঁর অনুরোধে আমরা মালিকের প্রাসাদের ছাদে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলাম। তখন সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে দূরে গুয়া আর নোয়ামুণ্ডি পাহাড়-জঙ্গলের পেছনে। পশ্চিম দিগন্তের রক্তাভ আকাশপটে এই নীল অরণ্যানীর দৃশ্য যেন ছবির মত আঁকা। সেই মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে ধনী মালিকের শ্বেত প্রাসাদটি যেন অবাস্তব বলে মনে হচ্ছিল। যেখানে আশেপাশে বহুদূরের মধ্যে গ্রানাইট পাথরের গন্ডশৈল ও মুন্ডারি অধিবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির।

আমরা বললাম—এ বাড়ীতে মালিক থাকেন কখন?

ম্যানেজার হেসে বললেন—যখন তাঁর মর্জ্জি হয়। বাড়ী তৈরি শেষ হয়েছে অল্পদিন।

—এর মধ্যে আসেন নি?

—না। তবে দেখতে আসবেন জানিয়েছেন।

—কত টাকা খরচ হোল বাড়ীতে?

—চল্লিশ হাজারের ওপর খরচ হয়ে গিয়েছে।

ম্যানেজার আমাদের জন্য চায়ের ব্যবস্থা করতে চাইলেন—কিন্তু আমরা ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। হাট-গামারিয়া চীনেমাটির খনিতে পরেশ সান্ন্যাল কাজ করেন। তিনি অনুবাদ-সাহিত্যে হাত পাকিয়েচেন। আমাদের ইচ্ছে হোল ঘোরবার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হাট-গামারিয়া এসে ডাকবাংলোর পেছনে বাসা খুঁজে বার করা গেল। কিন্তু একটি ছোট মেয়ে ভেতর থেকে এসে জানালো, কাকা তো বাড়ীতে নেই—বাজারের দিকে গিয়েচেন। বাজারে এসে খোঁজাখুঁজি করতে পরেশবাবুর দেখা পাওয়া গেল। সেই তেপান্তর মাঠের মধ্যেকার ক্ষুদ্র গ্রামে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর থাকেন এঁরা, অপ্রত্যাশিতভাবে এতগুলি বাঙালীর মুখ দেখে পরেশবাবু খুব খুশী হয়ে উঠলেন। তাঁর বাড়ী গিয়ে আমরা ফিরে এসেচি এতে খুব দুঃখিত হোলেন। বললেন—চলুন, একটু চা খেয়ে আসতে হবে। আমরা বললাম, আজ রাত হয়ে গিয়েছে অনেক। আর একদিন নিশ্চয়ই হবে।

সুবোধবাবু বললেন—আপনি কাল আসুন না চাঁইবাসায়।

—যাবো।

—আপনি এলে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাবো।

আমরা বিদায় নিলাম পরেশবাবুর কাছ থেকে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না!

বার বার আমার মনে হচ্ছে বনের সেই অদেখা ঝর্ণাটির কথা। যদি এতরাত্রে এমন জ্যোৎস্নার মধ্যে সেখানে যাওয়া যেত। কিন্তু কোনো কথা বলতে ভরসা হোল না, রাত প্রায় দশটা বাজে। সুবোধবাবু বললেন—কাল সেরাইকেলা যাওয়া যাবে

যদি পরেশবাবু আসেন—

মিঃ সিংহ বললেন—এবার কিন্তু আর নিক্‌পিক নয়, পুরো পিক্‌নিক্‌ই হোক—

—অসুবিধে আছে। ওসব হাঙ্গামা পোষাবে না। নেমন্তন্ন, মানে পার্টি আছে সেখানে।

—আমরা বিনা নিমন্ত্রণে পার্টিতে যাই কি করে?

—তাতে কিছু আটকাবে না। এ সব নিজেদের মধ্যের ব্যাপার।

পরদিন আমরা বেশ একটা বড় দল সেরাইকেলার পথে রওনা হলাম। ও পথে মাইল পাঁচেক যাবার পরে মুক্ত প্রান্তরের এখানে ওখানে অসংখ্য গণ্ডশৈল আমাদের চোখে পড়লো। আরিজোনার 'পেইণ্টেড ডেজার্ট' ছবিতে যেমনটি দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। কি অদ্ভুত ছন্নছাড়া মুক্তরূপা প্রকৃতি! ধরণীর অরুণোদয় এখানে বাধা-বন্ধহীন, নিজের মহিমাতে নিজে ভরপুর। ঘরদোরের পাঁচিল দেওয়াল এরা এক-মুহূর্ত্তে ভেঙে দিয়ে মনটাকে গৃহবিবাগী, উদাস বাউল করে তোলে। কোনো পাহাড়ের ওপর কোনো গাছ নেই—শুধু কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের স্তূপ, কোনো কোনোটাতে সামান্য একটু ঘাস। দূরে পশ্চিম দিগন্তে সুদীর্ঘ বরকেলা শৈলমালা, দূরত্বের কুয়াশাতে কিছু অস্পষ্ট। ওরই ওপরে কোথাও সেই চিটিমিটি-বাংলো। ওরই সানুদেশের ঘন বনের মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে সেদিন মোটরে চড়ে নেমে আসা!

একটা কি নদী পার হোল গাড়ী। নদীর জলে এখানে ওখানে ডুবে আছে বড় বড় পাথরের চাঁই। সামনে একটা অপকৃষ্ট খোলার বস্তি নজরে পড়লো। নীচু খোলার বস্তির একপাশে একটা সাদা চুনকাম-করা অট্টালিকা।

আমি বললাম—ওটা কি?

সুবোধ বললে- ওই সেরাইকেলা।

সেরাইকেলা ক্ষুদ্র টাউন। ঢুকতেই কতকগুলি খোলার বস্তি, মাঝে মাঝে দু'চারটি চুনকাম করা সাদা একতলা দোতলা বাড়ী। বাজারে অনেক দালান পসার, তবে সবাই যেন খুব গরীব লোক, কাঠের কারিগরেরা বারকোশ খেলনা ইত্যাদি তৈরি করচে ছোট ছোট খোলার ঘরে বসে। বাজারের ভেতরটা বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলেও আমার মনে হোল না।

ঢুকেই যেখানে গেলাম, সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল, টাউনে বেজায় কলেরা দেখা দিয়েচে। আমরা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তবে এখানে আমাদের কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

পি. ডবলিউ. ডি. আপিসে বসে আমাদের কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। একটি বাঙালী যুবক-কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ করলেন। তিনি সুলেখক মানিক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি আত্মীয় হন। আমি মানিকবাবুর সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করলাম তাঁকে; শুনলাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় আওরঙ্গাবাদে (গয়া জেলার মহাকুমা) শিক্ষকতা করেন এবং বর্ত্তমানে সেইখানেই আছেন।

একটু পরে চা লুচি ও সন্দেশ আসতে আমরা একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম।

—এসব—

—কোনো ভয় নেই, সব বাড়ীর তৈরি।

—কিন্তু জলটা—

—ও এই বাংলোর হাতার ইঁদারার। তাও ফুটিয়ে নেওয়া।

—তাই তো—

—কোনো ভয় নেই। দোকানের কোনো জিনিস নেই।

জলযোগ সেরে আমরা রাজবাড়ী দেখতে গেলাম। এমন খুব বড় বাড়ী নয়, বাংলাদেশের গ্রাম্য জমিদার-বাড়ীর মত সাদাসিদে, আড়ম্বরশূন্য। আমরা দরবার-হলে নীত হলাম। এই হলের দেওয়ালে চারিদিকে রাজপরিবারের ব্যক্তিগণের বড় ছোট তৈলচিত্র, একপ্রান্তে থিয়েটারের স্টেজ। এই সেরাইকেলার রাজপরিবার, নৃত্যশিল্পের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, এঁরা অনেকে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। মহাত্মা গান্ধীর সামনে এম্পায়ার থিয়েটারে যে ছৌ-নৃত্য প্রদর্শিত হয়েছিল, তার একটা বড় ফটোগ্রাফ দেখলাম এখানে। পাতিয়ালার রাজবংশের সঙ্গে সেরাইকেলার রাজবংশ বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এ বিখ্যাত ঘটনা যেদিন ঘটেছিল, সেদিন আমি, পরিমল গোস্বামী, 'বঙ্গশ্রী'র সহকারী সম্পাদক কিরণবাবু ও বন্ধুবর প্রমোদ দাশগুপ্ত যাচ্ছিলাম সম্বলপুর জেলার দুর্গম পর্ব্বতারণ্যের অভ্যন্তরে বিক্রমসোল নামক স্থানের অজানা শিলালিপির সন্ধানে। সিনি জংসনে আমরা এই বিয়ের জনসমাগম ও শোভাযাত্রা দেখি। সে হোল ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসের কথা।

রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে আমরা স্থানীয় মিউজিয়ম দেখতে গেলাম। এটি বিশেষ করে এই রাজ্যে যে সব খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, তারই মিউজিয়ম। মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারবাবু হরিদাস মহান্তি আমাদের সে সব দ্রব্য বিশেষ করে দেখালেন। খনিজ এ্যাসবেস্টাস্ এখানে প্রথম দেখলুম একটা কাচের আলমারির মধ্যে।

বললুম—এটা কি জিনিস? কিসের সুতো?

কারণ একগোছা সরু রৌপ্যসূত্রের মত দেখতে জিনিসটা।

হরিদাসবাবু বললেন—ও হোল এ্যাসবেস্টোস্। খনি থেকে ওঠানো অবস্থায়।

আরও নানা ধাতু দেখলাম বিভিন্ন কাচের আলমারিতে।

বিকেলের দিকে আমরা সেরাইকেলা থেকে বার হই।

আমাদের গাড়ীতে এক হাঁড়ি খাবার তুলে দিলেন এঁরা।

আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলুম আসবার সময় পথের ধারে সে সব শৈলমালা দেখে এসেচি, ওদের মধ্যে কোনোটার ওপর বসে নিক্‌পিক্—কিংবা—

নিক্‌পিক্‌ই হয়ে গেল ঠিক।

আমাদের মধ্যে তর্ক বাধলো। কেউ বলে, "এই পাহাড়টা ভালো—", কেউ বলে, "ওটা ভালো"।

অবশেষে বন্ধুবর পরেশ সান্ন্যাল একটি পাহাড় দেখিয়ে বললেন,—"দেখুন এটাই সব চেয়ে ভাল হবে।"

বড় সুন্দর পাহাড়টি, বড় চমৎকার সেই বিস্তৃত প্রান্তর—ঠিক যেন ফিল্মে দেখা আরিজোনার সেই 'পেইণ্টেড্ ডেজার্ট'।

তখন বেলা পড়ে এসেচে। আমরা অনুচ্চ পাহাড়টিতে উঠলাম, ওর সমতল শিখরদেশে আমরা শতরঞ্জি পেতে বসলাম। আমাদের চারিদিকে অনুচ্চ বৃক্ষ, অনুর্ব্বর অসংখ্য পাহাড়—নানা আকৃতির, নানা ধরনের। কোনোটার আকার পিরামিডের মত, কোনোটার বা মন্দিরের মত, কোনোটা নর্মান ক্যাস্‌ল-এর মত, কোনোটা বিরাটাকায় শিবলিঙ্গের মত, কোনোটা গম্বুজাকৃতি। কোনোটার রং কালো, কোনোটা মেটে সিঁদুরের মত রাঙা, কোনোটা ধূসর, কোনোটা ঝক্‌ঝকে মিছরির মত সাদা কোয়ার্টজ পাথরের। প্রত্যাসন্ন শীতের অপরাহ্ণের রাঙা রোদ কোনো কোনোটার মাথায়। হু হু ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে, খড়কাই নদীর দিক থেকে। পশ্চিমে বহুদূরে

দিকচক্রবালের অনেকটা জুড়ে সুদীর্ঘ বরকেলা পাহাড়শ্রেণী, তারই পেছনে এখন টক্‌টকে রাঙা সূর্য্যটা অস্ত যাচ্চে। চারিপাশের সেই সব অদ্ভুত-দর্শন পাহাড় দেখে মনে হয় আমেরিকার কোনো ছন্নছাড়া মরুভূমির মধ্যে বসে যেন space-এর সমুদ্রে ডুবে আছি, থৈ থৈ space-এর সমুদ্র, কুলকিনারা দেখা যায় না।

মনে হয় কলকাতার সরু এঁদো গলির মধ্যে আলোবাতাসশূন্য একতলা ঘরে যারা বাস করে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, যারা সূর্য্যাস্ত দেখবার সুযোগ পায় না, মুক্তরূপা ধরণীর সৌন্দর্য্য, প্রসারতা, অপরাহ্নের ছায়া-নেমে-আসা বিরাট প্রান্তরের ছবি যারা কখনো দেখে নি, নিৰ্জ্জন পাহাড়ের সমতল শিলাসনে বসে দূরের গিরিমালার দিকে চেয়ে থাকে নি কখনো যারা, তাদের নিয়ে আসি, তাদের সব দেখাই। এমন অনেক গরীব গৃহস্থের কথা আমার মনে হয় এই সব মুক্ত স্থানে বসলেই। আমি জানি তাদের, কি ভাবে তারা থাকে।

ওদেরই মধ্যে একটি বধূ আমাকে বলেছিল—দাদা, তারকেশ্বর কোন্ দিকে?

—কেন?

– সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে—

—গেলেই হয়। বেশি দূর তো নয়।

—তাই তো দাদা, পয়সায় যে কুলোয় না! উনি যা পান তাতে এই ঘরভাড়া দিয়ে খেয়ে দেয়ে কি থাকে বলুন। কতদিন থেকে ভাবচি—

-এই বাসায় কতদিন আছ তোমরা?

হয়ে গেল সাত বছর। আমার ঐ খুকির বয়েস, দাদা।

· কোথাও যাওনি এই সাত বছরের মধ্যে?

--হ্যাঁ, যাচ্ছি! কোথায় যাবো? আপনি পাগল! পয়সা কোথায়?

যখন কোথাও যাই, কোনো ভাল জিনিস দেখি, তখন আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া সেই বধূটির কথা মনে পড়ে।

পরেশবাবু একটা গল্প জুড়ে দিলেন। আমরা খাবারের হাঁড়ি খুলে শালপাতায় খাবার ভাগ করে দিতে থাকি। তারপর সবাই খাই, আর চারিদিকে চাই।

এ ঠিক আরিজোনার মরুভূমি, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এখুনি দূরে কোথাও কোয়াট্ ডেকে উঠবে, যার ছন্নছাড়া চীৎকার শুনলে নিৰ্জ্জন মরুপ্রান্তরে অতি বড় সাহসী পথিকেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়।

সেই পাহাড়টিতে আমরা বসে রইলুম সন্ধ্যার একপ্রহর পর পর্য্যন্ত। হাসি গল্পে সময় কাটলো।

মোটরে চাঁইবাসা ফিরবার পথে আমরা জল্পনা-কল্পনা করলাম, একটা জ্যোৎস্না রাত দেখে শীগ্‌গির আবার একদিন ঐ পাহাড়টাতে এসে পিক্‌নিক্ করতে হবে। বড় সুন্দর প্রান্তর, বড় সুন্দর পাহাড়টি। এ ধরনের জল্পনা অনেকক্ষেত্রে অনেক বার হয়, কিন্তু আর কার্য্যে পরিণত হয় না। কোনো ভাল জায়গায় বেড়িয়ে ফিরবার পথে মনে হয়—ও, এই তো। এখানে আবার কতবার আসবো, এই এতো কাছে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। যাওয়া আর ঘটে না।

এখানেও তাই। সেরাইকেলা ভ্রমণের পরে দু'বছর কেটে গিয়েচে—অথচ সেই নিৰ্জ্জন শৈল সন্দর্শনের সৌভাগ্য আর কখনো ঘটে নি আমাদের।

* *

চক্রধরপুর থেকে রাঁচীর পথে বিখ্যাত হিড্‌নি জলপ্রপাত। অনেকদিন থেকে আমাদের দেখবার ইচ্ছে ছিল। গত বৎসর ভাদ্র মাসে (১৩৫০ সালের ভাদ্র) আমি

ঘাটশিলা থেকে সাহিত্যসভা উপলক্ষে চাঁইবাসা যাই। সভা শেষ হোল রাত দশটায়।

গুমট্ গরম। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ী আহারাদি সেরে অনেক রাত পর্য্যন্ত কোলহান পার্কের বেঞ্চিতে বসে গল্পগুজব করলাম। কোলহান পার্ক চাঁইবাসা টাউনের একটা সম্পদ বলে মনে করি। মস্ত বড় পুকুর, পুকুরের ধারে ফুলের বাগান, হু হু করচে জলের হাওয়া, ভুর ভুর করচে হাস্নুহানার সুবাস, বাতাস, ফুটফুটে শরতের জ্যোৎস্না, নির্ম্মেঘ আকাশ। বন্ধুদের মধ্যে কেউ আবৃত্তি করচেন, কেউ গান করচেন, রাত যে কত হয়েচে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। হঠাৎ বন্ধুবর সুবোধ ঘোষ বললেন—চলুন, শোওয়া যাক গে, রাত বোধ হয় বারোটা একটা হয়ে গেল—

বাস্তবিক সে একটা অদ্ভুত রাত্রি কাটিয়েচি কোলহান পার্কের জলের ধারে পাথরের বেঞ্চিতে। পাঁচ ছ'জন বন্ধুবান্ধব, সবাই মিলে গানে গল্পে কোন্ দিক থেকে সময় কেটে গেল, ঘুমোবার ইচ্ছে নেই কারো।

এই সময় মিঃ সিন্‌হা বাড়ী থেকে ঘড়ি দেখে এসে বললেন—রাত তিনটে

আমরা সবাই চমকে উঠি।

—তি-ন-টে?

—খাঁটি তিনটে। এক মিনিট কম নয়!

তাই তো!

সুবোধ প্রস্তাব করলে—তবে আর শুয়ে কি হবে?

আমিও এতে সায় দিলাম।

পরেশবাবু বললেন—আমারও তাই মত।

আমি বললাম—আমার একটা প্রস্তাব আছে।

সবাই বললে—কি?

—এখুনি চলুন সবাই বেরুনো যাক একসঙ্গে। কাল সকালে হিড্‌নি ফল্‌সে নিক্‌পিক্ করা যাবে—

সবাই মিলে হৈ হৈ করে উঠলো। বেশ ভালো প্রস্তাব। পরেশবাবু বললেন—আমারও অনেকদিন ওটা দেখার ইচ্ছে ছিল তাই চলুন। সুবোধ মোটর বার করতে চলে গেল। আমরা মিঃ সিন্‌হার বাড়ী গিয়ে খাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে-ছেঁদে নিলাম। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরবর্ত্তী ঘন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত হিড্‌নি জলপ্রপাতের কাছে বনভোজন করবার সব আয়োজন ঠিক করে মোটর ছেড়ে দিলাম।

আমাদের সঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন, তিনি কেবল বললেন—আমার আজ যাওয়া হবে না। ঘাটশিলায় ফিরতে হবে, আমাকে দয়া করে চক্রধরপুরে বম্বে মেল ধরিয়ে দেবেন—

এখন রাত চারটে। চক্রধরপুর মাইল ষোলো-আঠারো রাস্তা। আমরা জ্যোৎস্না-লোকিত রাঁচি রোড দিয়ে রোরো নদীর পুল হয়ে সবেগে মোটর ছুটিয়ে দিয়েচি। দুধারে ছোট বড় পাহাড়, বর্ষায় বনানী সবুজ হয়ে উঠেচে, জ্যোৎস্না পড়েচে পাহাড়ী নদীর জলে, মাঝে মাঝে দু-একটা হো-অধিবাসীদের বন্যগ্রাম। পরেশবাবু প্রকৃতি-রসিক ব্যক্তি। বললেন—এদিকে কখনো আসি নি—ভারি চমৎকার তো? কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে।

সুবোধ বললে—আরও আগে চলুন, আরও ভাল দেখবেন—

একটু পরে সঞ্জয়-নদীর পুল পার হয়ে আমরা দূরে চক্রধরপুরের সাদা সাদা বাড়ী দেখতে পেলাম। ঘাটশিলার বন্ধুটি তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, পাঁচটা বাজবার

দেরি নেই, বম্বে মেল পাওয়া যাবে তো?

চক্রধরপুরে স্টেশনের বাইরে আমরা মোটর থামালুম, বন্ধুটি নেমে গেলেন।

মিঃ সিন্‌হা বললেন—একটু দুধের যোগাড় করলে হোত। সকাল হোলেই তো চা চাই। দুধ নেই সঙ্গে।

সুবোধ বললে—শেষ রাত্রে এখানে দুধ পাওয়া যাবে বলে মনে তো হয় না। চেষ্টা করতে পারেন।

কিন্তু সুবোধের কথাই ঠিক হোলো। কোথাও দুধ মিললো না চক্রধরপুর স্টেশনে।

আমরা মোটর ছাড়লাম। আরও আধঘণ্টা পরে আমরা কিছু দূরে টেবো পাহাড়-শ্রেণী দেখতে পেলাম। কেউ কেউ এটাকে সেরাইকেলা পাহাড়শ্রেণীও বলে।

পাহাড়ের ওপর ঘুরে ঘুরে রাঁচি রোড উঠেচে ওপরে। পাহাড়ে উঠবার কিছু আগে রাস্তার ধারে ইংরিজিতে লেখা আছে 'এখান থেকে ঘাট আরম্ভ'—পাহাড়ী রাস্তাকে এদেশের ভাষায় "ঘাট" বলে।

অনেকদিন আগের কথা, তখন আমি এসব দিকে আসি নি। আমাদের এক গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোক চক্রধরপুরে কি কাজ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছিলাম চক্রধরপুরে রাঁচি রোডের দৃশ্য অপূর্ব্ব, বিশেষ করে রাস্তা যখন ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর ওঠে। মনে আছে, আমি তাঁকে এ পথের দৃশ্যের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি তত বর্ণনা দিতে পারেন নি, মোটামুটি বলেছিলেন, 'ভালো'। কিন্তু শুধু 'ভালো' বা 'চমৎকার' শুনে আমার মন তৃপ্ত হয় নি, আমি চেয়েছিলাম যা, তিনি তা আমায় দিতে পারেন নি।

সে আজ অন্ততঃ সতেরো-আঠারো বছর আগের কথা।

তখন জানতাম না, একদিন শরৎকালের শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মোটরে সেই অরণ্য-পর্ব্বতের পথে প্রমোদ-ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে ঘটবে। সেই ভদ্রলোকের কথা মনে পড়লো এতদিন পরে। তিনিই প্রথম এ রাস্তার সৌন্দর্য্যের কথা আমায় বলেন, এ পথ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। যতদূর জানি, তিনি এখন আর ইহলোকে নেই, শেষ বয়সে বিদেশে কোথায় কণ্ট্রাক্টারি করতেন, সেখানে মারা যান।

তিনি কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেন নি দেখলুম। পথ ঘুরে ঘুরে যখন উঠতে লাগলাম টেবো পাহাড়ে, তখন মনে হলো, এ পথে সবারই একবার বেড়িয়ে যাওয়া উচিত। অপূর্ব্ব দৃশ্য। পথের দুধারে বড় বড় গাছপালা, বড় বড় পাথর, মায়াময় শিখরদেশ জ্যোৎস্নামাখা, বনের আড়ালে লুকোচুরি খেলচে।

প্রকৃতিরসিক পরেশবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—চমৎকার!

আমরা সকলেই এক বাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলুম।

পাহাড়ের ওপরে রাস্তার দুধারে জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমির কি অপূর্ব্ব শোভা! কেঁদ গাছের কালো কালো পাতায় জ্যোৎস্না পড়ে চক্‌চক্ করছে। ঘন, নির্জ্জন বনানীর নৈশ নিস্তব্ধতা মনে ভয়-মিশ্রিত রহস্যের উদ্রেক করে।

আমি বললাম—এখানে মোটর থামিয়ে একটু বনটা দেখা যাক—

সুবোধ আপত্তি করলো—এখানে বাঘের ভয়, বিশেষ করে এই রাতের বেলায়। মোটর থামিয়ে নামা উচিত হবে না।

মিঃ সিংহ বললেন—কিছু হবে না। নামা যাক।

পরেশবাবুও আমাদের মতেই মত দিলেন। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত মোটর থামানো হোল—আমি, পরেশবাবু ও মিঃ সিংহ নেমে রাস্তার ধারে বনের প্রান্তে একখানা বড় পাথরের ওপর বসলাম। সুবোধ গাড়ীর মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লো।

সে নৈশপ্রকৃতির শোভা নিজের চোখে দেখবার জিনিস। লোকালয় থেকে বহুদূরে পাহাড়ের মাথায় ঘন বন, শেষ রাত্রের জ্যোৎস্নায় আমরা ক'টি প্রাণী সেখানে চুপ করে বসে আছি, যে কোনো মুহূর্ত্তে বাঘ বা যে কোনো বন্যজন্তু বেরুতে পারে, বন্যহস্তীর তো কথাই নেই—এসব বনে হাতীর সংখ্যাই বেশি, ভালুকও যথেষ্ট। বিপদের মধ্যেই ভ্রমণের আসল আনন্দ, অত্যন্ত নিরাপদ স্থানে, সে জায়গা যতই সুন্দর করে সাজানো হোক না কেন, বেড়িয়ে সে ভয়, সে উত্তেজনার সন্ধান মেলে না। অনুভূতির নতুনত্বই মানুষের জীবনের বড় সম্পদ। মিনিট পনেরো পরে আমরা মোটরের কাছে গিয়ে সুবোধকে ঘুম থেকে ওঠালুম। এতক্ষণ সুবোধই চালাচ্ছিল, মিঃ সিংহ বললেন—তোমার হাতে আর বিশ্বাস নেই এই পাহাড়ী রাস্তায়, ঘুমকাতুরে চোখে খাদের মধ্যে ফেলে দেবে। সরো, আমার হাতে স্টীয়ারিং দাও—

রাত শেষ হয়ে আসচে।

সেই গভীর গিরিবনে হেমন্ত রাত্রির কুয়াশা হঠাৎ ঘনিয়ে আসতেই কেউ আর কিছু দেখতে পায় না। মিঃ সিংহ ভরসা করে গাড়ী জোরে চালাতে পারলেন না। চক্ষের নিমেষে কুয়াশা নেমে চারিধার ঢেকে ফেলেছে, পাহাড় দেখা যায় না, জঙ্গলের গাছপালাও খুব স্পষ্ট নয়। সামনে পিছনে সব যেন ঘষা পয়সার মত লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল। সন্তর্পণে গাড়ী চালাতে লাগলেন মিঃ সিংহ। একটু অসাবধানে গাড়ী চালালে পাহাড়ে ধাক্কা লেগে মোটর চুরমার হয়ে যাবার ভয়। এমন সময় পরেশবাবু চেঁচিয়ে উঠে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে লাগলেন—ঐ-ঐ—কি ওটা, দেখুন দেখুন—সকলে চেয়ে দেখলাম কি একটা জানোয়ার মোটরের হেড্‌লাইটের আলোয় মোটরখানার সামনে ছুটে চলেছে।

সুবোধ বললে—হরিণ।

আমি বললাম—বাঘ!

পরেশবাবু বললেন—ভালুক!

সেটা যে জানোয়ারই হোক, রাস্তা ছেড়ে দিতে জানে না দেখা গেল। সামনে সেটা চলেচে গাড়ীর আগে আগে দৌড়ে—পাশ কাটিয়ে আমাদের পথ দেবার কোনো চেষ্টাই তার নেই। সমানে ছুটেচে। আমি বললাম—স্পীড্ বাড়িয়ে ওটাকে চাপা দিলে কেমন হয়, মিঃ সিংহ?

মিঃ সিংহ বললেন—হয় ভালোই, কিন্তু গাড়ী জোরে চালাতে সাহস করি নে এই কুয়াশার মধ্যে।

প্রায় মাইল খানেক পথ গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটবার পরে জানোয়ারটা হঠাৎ লাফ দিয়ে বাঁ দিকের কুয়াশাবৃত বন-মধ্যে অন্তর্হিত হোল। এর আগেও সে অনায়াসেই যেতে পারতো, কেন যে যায় নি সে-ই বলতে পারে।

এই সময়ে সকলেরই ভীষণ ঘুম পেয়েচে। ভোর পাঁচটা ঘড়িতে দেখা গেল। ফুটফুট করচে জ্যোৎস্না, যেন রাত দুপুর। নির্জ্জন নিস্তব্ধ কুয়াশাচ্ছন্ন বনানী আমাদের চারিদিকে ঘিরে। মিঃ সিংহ একবার গাড়ী থামিয়ে রুমাল বের করে চোখ মুছে নিলেন। খুব ঘুম পেয়েচে তাঁরও।

আমি বললাম—গাড়ী একপাশে রেখে একটু ঘুমিয়ে নিন মিঃ সিংহ, এ অবস্থায় গাড়ী চালানোটা—

সুবোধ বললে—খুব বিপজ্জনক! কিন্তু এখানে গাড়ী রাখাটা আরও বিপজ্জনক—

—কেন?

—বাঘের ভয়!

শুনে পরেশবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন—তবে চলুন চলুন, যাওয়াই যাক—

আমি বললাম—হেসাডি ডাকবাংলো আর কতদূর?

মিঃ সিংহ বললেন—বেশিদূর বোধ হয় না—কুয়াশার মধ্যে কিছু যে বুঝতেই পারচি নে—

আমি বললাম—তা হোক মশাই, রাখুন এখানে গাড়ী। ঘুমন্ত অবস্থায় মোটর চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে—

সুবোধ ও পরেশবাবু মহা আপত্তি তুললে। এখানে গাড়ী রাখা যায় না এই শ্বাপদসংকুল অরণ্যানীর মধ্যে, এগিয়ে যাওয়াই ভালো। আরও মিনিট পনেরো কুয়াশার মধ্যে দিয়ে চালানোর পরে বাঁদিকে বনের মধ্যে হেসাডি ডাকবাংলো চোখে পড়লো। আমাদের গাড়ী ডাকবাংলোর হাতায় ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমি পেছনের সিটে শুয়ে আধমিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভেঙেচে, তখন শুয়ে শুয়েই দেখচি সামনের পাহাড়ে রাঙা রোদ, গাছের মাথায় রাঙা রোদ। এদিক ওদিক চেয়ে দেখি গাড়ীর মধ্যে কেউ নেই। চোখ মুছে উঠে দেখি পরেশবাবু ডাকবাংলোর বারান্দায় পায়চারি করচেন। বললাম—সুপ্রভাত, এঁরা কোথায়?

—সব ঘুমুচ্চে।

—ওঠান সব, বেলা হয়েচে অনেক।

একটু পরে আমরা চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে চায়ের টেবিলে ভিড় করেচি, কিন্তু সেই পুরাতন সমস্যা, দুধ নেই। ডাকবাংলোর চৌকিদারকে বলা গেল। তম্বি-গম্বি করা হোল—দুধ নেই। লেবু আছে, তাই দিয়ে করা যেতে পারে না চা?

মিঃ সিংহ বললেন—চমৎকার হবে। তাই হোক। ইটালিতে দেখেচি লেবুর চাক্‌লা কেটে চায়ে ডুবিয়ে চাম্‌চে দিয়ে চেপে চেপে খায়। সে বেশ লাগে।

খাবারদাবারের মধ্যে দেখা গেল ছোলা—রাশীকৃত ছোলা ছাড়া আর কিছু খাবার নেই: অত ছোলা কি হবে? কে খাবে অত ছোলা?

সুবোধ বললে—অত ছোলা খাবে কে?

আমি বললাম—তাই তো! কি হবে অত ছোলা?

মিঃ সিংহ বললেন—না হয় কিছু থাকবে এখন। হিড্‌নি ফল্‌স্ গভীর বনের মধ্যে, সেখানে গিয়ে আমরা খাবো। কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে দেখা গেল একদানা ছোলাও অবশিষ্ট নেই, এমন কি টেবিল থেকে গড়িয়ে যেসব ছোলা মেজেতে পড়ে গিয়েছিল—শেষে দেখা গেল সবাই তাও কুড়িয়ে কুড়িয়ে খাচ্ছে।

সুবোধ বললে—আরও কিছু হোলে হোত দেখা যাচ্ছে।

আমি বললাম—আমারও তাই মনে হচ্ছে বটে।

আরও এক মাইল এগিয়ে গেলাম মোটরে। তারপর মোটর রেখে আমরা রাস্তার ডানদিকে একটা পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে লাগলুম। চারদিকে গভীর বন উঁচু শৈলমালা, একটা পাহাড়ী নদী—পাহাড়ী রাস্তার নীচে দিয়ে বয়ে চলেচে। সামনের দিকে বন গভীরতম।

খানিকদূর গিয়ে আমরা একটু নীচু উপত্যকার মধ্যে নামলাম, আবার সেই পাহাড়ী নদীটা উপলবিছানো পথে পার হলাম। এইবার দূর থেকে জলপতনের

গর্জ্জনশব্দ শোনা গেল—আরও একটু এগিয়ে গিয়ে চোখে পড়লো পেঁজা তুলোর বস্তার মত জলরাশি পাহাড়ের ওপর থেকে, বনের মাথা থেকে উপচে পড়চে। আবার একটা উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকে আমরা নীচে নামতেই বাঁদিকের বনের আড়ালটা সরে গেল। জলপ্রপাতটা একেবারে চোখের সামনে আমাদের।

পরেশবাবু কবি লোক, উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন—বাঃ, অতি চমৎকার!

আমরা সবাই সায় দিলাম। জায়গাটা যেন আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো—কোথাও এতটুকু মাটি বা বালি নেই। স্তরে স্তরে নেমে গিয়েচে পাথরের ধাপে ধাপে—যেন পুকুরের সান বাঁধানো ঘাটে।

মিঃ সিংহ বললেন—আমরা সকলে স্নান করে নেবো চলুন ওই জলে।

পরেশবাবু বললেন—ম্যালেরিয়া হবে না তো নাইলে?

সুবোধ বললেন—না, এখানে ম্যালেরিয়া কোথায়?

আমরা বসে বসে দেখলুম কতক্ষণ।

স্থানটির গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখবার জিনিস। শুধু বর্ণনায় পড়ে ঠিক বোঝা যাবে না। যে উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটা পড়চে, তার চারিপাশে ঘন বনানী, চুনাপাথরের প্রাচীর। যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে ল্যাণ্টানা ক্যামেরা ফুলের গাছ—ফুল ফুটে আছে।

তারপর আমরা জলপ্রপাতের তলায় স্নান করতে গেলাম।

সে এক চমৎকার ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা!

প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হবে অত জল আর অত জোরে যদি গায়ে এসে পড়ে, তবে পিঠ দুমড়ে বেঁকে যাবে। তা অবিশ্যি হয় না কিন্তু এটা মনে হয় যে খুব ভারী কি একটা জিনিস দুড়দাড় করে পিঠে পড়চে। মিঃ সিংহ আবার আমাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে চাইলেন প্রপাতের ধারার পেছনে, পতনশীল জলধারা আর পর্ব্বতের প্রাচীর এ দুয়ের মাঝখানে।

বললাম—কেন?

আসুন, আসুন, মজা হবে।

আমার মজায় কাজ নেই মশায়, ওখানে যাবো না।

একটুখানি এসে দেখে যান—

আমিও যাবো না, মিঃ সিংহ নাছোড়বান্দা।

কিন্তু সেখানে যাওয়া সোজা কথা নয়, প্রপাতের সেই বিরাট জলের ভলুম এড়িয়ে পার হয়ে। মারা যাবো।

দৃঢ়ভাবে বললাম—আপনি যান। আমাকে মাপ করুন।

মিঃ সিংহ সত্যিই গেলেন সেখানে। পতনশীল সেই বিশাল জলধারায় ধোঁয়ার আড়ালে কিছুক্ষণ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পুনরায় তিনি না বার হয়ে আসা পর্য্যন্ত সত্যিই অস্বস্তিবোধ করা যাচ্ছিল।

স্নান সেরে আমরা রওনা হবো, কারণ সঙ্গে খাবার নেই, খেতে হবে সেই চাঁই-বাসায় ফিরে। একজন বন্যলোক হঠাৎ সেখানে এসে পড়লো—হো-ভাষায় তাকে প্রশ্ন করলেন মিঃ সিংহ, সে যা বললে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

—কি করবি এখানে?

—কেন?

—বল না।

—মাছ।

—মাছ ধরবি ?

—হ্যাঁ।

—নাম কি ?

সে নিরুত্তর।

—নাম কি ?

একপ্রকার অস্পষ্ট ঘড়্‌ঘড়্‌ শব্দ।

মিঃ সিংহের কথোপকথন শেষ।

লোকটার হাতে বন্য ডালপালার তৈরি একরকম ছোট খাঁচার মত ব্যাপার। তাই হোল সম্ভবতঃ তার মাছ ধরবার যন্ত্র। কিন্তু এ জল-প্রপাতের উচ্ছল জলধারার মধ্যে মাছ কোথা থেকে আসবে তা আমরা বুঝতে পারলাম না. কি মাছ এখানে পাওয়া যাবে তাও জানি না।

পরেশবাবু আমাদের পেছনে শিলাসনে বসে মনের আনন্দে গান ধরেচেন। সুবোধ মহা ব্যস্ত সর্ব্বদাই. সে ইতিমধ্যে কখন মোটরে গিয়ে বসেচে. আমরা তা জানি নে. দেখি নি তার চলে যাওয়া. পরেশবাবুই প্রথমে বললেন—সুবোধবাবু কোথায় ?

আমি বললাম—তা কি জানি. এই তো এখানে বসেছিল।

আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে এদিক ওদিক চাইতে থাকি। এই ছিল গেল কোথায়। বাঘে নিয়ে গেল না কি। জায়গাটা তো ভাল নয়।

মিঃ সিংহ বললেন- না না, সে মহা ব্যস্তবাগীশ. সে চলে গিয়েচে গাড়ীতে ফিরে। গাড়ীতে বসে আছে রাঁচি রোডে।

তখন আমরা সবাই মিলে ফিরলাম।

আর দেরি করা উচিত নয়। লোকটাকেও দেখা উচিত. ক্ষিদেও পেয়েচে যথেষ্ট।

এবার অন্য একটা পথ ধরে রাঁচি রোড ফিরি। আগে সুবোধ যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল. তার চেয়ে এটা যে কত ভাল !

এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া সর্ব্বত্র। এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো. একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। সারাপথ যেন ঋষিদের পবিত্র তপোবন। জনমানবশূন্য। চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে রাঁচি রোডে এসে মোটরে চড়লাম। হু হু করে মোটর ছুটলো কাল রাত্রিকার দৃষ্ট সেই টেবো অরণ্যভূমি ভেদ করে। কাল দেখেছিলুম শেষ রাত্রের মায়াময় জ্যোৎস্নায়. আজ দেখছি দুপুরের খর রোদে। রাস্তার পাশে ২০০০ ফুট উঁচু টেবো পাহাড়ের উপর টেবো বাংলো।

কেমন সুন্দর নির্জ্জন স্থানে বাংলোটি। দেখে বাস করবার লোভ হয়। চারিধারে বনশ্রেণী. উঁচু পাহাড়ের মাথায় বাংলো। শিউলি ফুল ফুটে আছে।

সুবোধকে বললাম- একটা প্রস্তাব করি—

—কি ?

—এই টেবো পাহাড়ের ওপর লেখকদের জন্যে একটা বাংলো করান—

—তারপর ?

—তারপর গবর্নমেণ্টকে লিখুন লেখকদের সেখানে ফ্রি থাকবার ব্যবস্থা করতে—

—তারপর ?

—তারপর খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে. তার জন্যে নামমাত্র দাম নেবে গবর্নমেণ্ট। যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারে, তবে নিতান্ত বিনা কারণে নয়. বিশেষ কোন

এই লেখবার বা চিন্তা করবার বা প্ল্যান করবার সময় যখন লোকালয় থেকে নির্জ্জনে থাকবার দরকার হবে—তবে গবর্নমেণ্টকে লিখলেই—

তিনি যদি কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে বাংলো দখল করেন?

কোন্ পাগল এই বাঘভালুক ভরা জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে বিনা কারণে আসতে যাবে? যে আসবে সে কাজ ছাড়া আসবে না। জনমানব নেই, চায়ের দোকান নেই, খবরের কাগজ নেই, আড্ডা নেই, কে থাকবে মশাই ওখানে?

পরেশবাবু বললেন যে থাকবে সে সত্যিকার লেখক জানবেন—

মিঃ সিংহ বললেন—অথবা ভ্যাগাবণ্ড—

আমি বললাম- বেশ। সে কি কাজ করচে না করচে তা তদারক করবার ব্যবস্থা না হয় থাক -

সুবোধ বললে -কে সেটা তদারক করবে? ডাকবাংলোর চৌকিদার অথবা রোড ওভারসিয়ার?

কেন?

—তাও কালেভদ্রে ঐ চৌকিদারই ভরসা। লেখা হপ্তায় হপ্তায় সাবমিট করতে হবে ওর কাছে।

রাজী। তবে একটা কথা—

-কি?

গবর্নমেণ্টকে এটাও লিখবেন, চাঁইবাসা থেকে টেবো পাহাড় পর্য্যন্ত আসার ব্যবস্থাটা গবর্নমেণ্ট থেকে করা হবে। এত মাইল রাস্তা আসবে কিসে একজন দরিদ্র লেখক? সব সুবিধে করে দিতে হবে গবর্নমেণ্টকে। তার লেখা বা চিন্তার জন্যে যা কিছু দরকার।

—আর কিছু?

আমি রাগ করে বললাম- এ ঠাট্টার কথা নয়। আজ যদি আমাদের নিজেদের গবর্নমেণ্ট হতো—

—কোন্ দেশের গবর্নমেণ্ট তাদের দেশের লেখকদের জন্যে এমন ব্যবস্থা করে রেখেচে আমি জানতে চাই—

—আমিও বলতে চাই যে যদি না করে থাকে, তাদের করা উচিত। গবর্নমেণ্ট যারা চালায় তাদের কল্পনাশক্তি কম, নিরেট বেশির ভাগ। কবি ও লেখকদের পরামর্শ এ সম্পর্কে তারা যেন নেয়। না নিলে তা সভ্যনামের উপযুক্তই নয়। দেশের লেখকদের এ সুযোগ দেওয়া, এসব সুবিধে করে দেওয়া যে কোনো গবর্নমেণ্টের উচিত। বেশিদিন নয়, দু-একমাস নির্জ্জনে থাকবার পরে আবার লেখক কাজ শেষ করে চলে যাবেন। দেশের দশের কাজই তো। কেন গবর্নমেণ্ট করবে না? করা নিশ্চয় উচিত।

বলা বাহুল্য আমার সে উপদেশ কোনো কাজে এল না। মূল্যবান উপদেশগুলো বৃথায় গেল। গাড়ী পাহাড় থেকে নামলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল অনেকক্ষণ থেকেই। কিন্তু পাহাড়ের নীচে নাকটি ডাকবাংলোতে জলের সন্ধান পাওয়া গেল না। চক্রধরপুরে এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে জল আনিয়ে খাওয়া গেল। চাঁইবাসায় ফেরা গেল বেলা তিনটের মধ্যে।

*　　　*　　　*

এই ভ্রমণের কিছুদিন পরে আমি ঘাটশিলা ফিরে আসি। একদিন সন্ধ্যায় আমার ভীতিপ্রদ অভিজ্ঞতা হয়। সে কথাটা এখানে বলি।

এ অঞ্চলে শঙ্খচূড় বা king cobraর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বনে-জঙ্গলে—এ কথা আমি পূর্ব্বেও শুনেছি। কিন্তু অত বনে বনে বেড়িয়েও কখনো আমার চোখে পড়ে নি।

একদিন আমি রাস্তা থেকে কিছুদূরের একটা পাহাড়ে বেড়াতে যাই ; পাহাড়টার নাম উল্‌দাড়ুংরি। ওদিকের ওসব পাহাড়ে গরু চরে, লোকজন ওঠে নামে, কিন্তু দূর থেকে এ পাহাড়ের দৃশ্য দেখে আমার মনে হল এ পাহাড়টাতে কেউ ওঠে না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল।

ভাবলুম, পাহাড়টাতে উঠে কোনো শিলাখণ্ডে বসে সন্ধ্যার শোভা দেখা যাক। সামান্য খানিকটা উঠে লক্ষ্য করলাম পাহাড়টাতে বেজায় কাঁটাবন। ওপরে আর উঠবার উপায় নেই। অনেকগুলো ঝরা শুকনো পাতা সেই কাঁটাগাছগুলো থেকে ঝরে আমার আশেপাশে সর্ব্বত্র পড়ে স্তূপাকার হয়ে আছে পাথরের ওপরে। কাঁটা-গাছ যে খুব বড় তা নয়, আমাদের দেশের ছোট ছোট বৈঁচি গাছের মত।

বড় চমৎকার শোভা হয়েছে পশ্চিম আকাশের, সেদিকে সুবর্ণরেখার ওপারে পাহাড়শ্রেণীর পিছনে সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্চেন। শালবনের মাথায় রাঙা সূর্য্যাস্তের আভা। হু হু হাওয়া বইছে ওদিক থেকে। নির্জ্জন জায়গা, কেউ কোনোদিকে নেই।

একমনে দেখতে দেখতে বেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি, এমন সময় ঝুপ করে কি একটা শব্দ হোল। শব্দটা একটু অদ্ভুত ধরনের। শুকনো লতাপাতার উপর ঝুপ করে যেন একটা ভারি জিনিস পড়লো। পিছন ফিরে দেখি শুকনো ঝরা পাতার রাশির ওপর একটা বড় মোটা মিশ-কালো সাপ। কিন্তু সাপটার মুখ আর লেজটার দিক চোখে পড়ছে না। আমি মাত্র তার মাঝখানটা দেখতে পাচ্ছি। আমি যেখানে বসে, সাপটা সেখান থেকে হাত আষ্টেক দূরে। ও-ধরনের মোটা সাপ আমি আর কখনো দেখি নি।

হঠাৎ আমার বড় ভয় হলো। এই নির্জ্জন পাহাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে এই ভীষণ-দর্শন সাপের হাতে পড়লে নিজেকে বাঁচানো কঠিন হয়ে পড়বে। তাড়া যদি করে পালাতে পারবো না এই কাঁটাগাছ ঠেলে।

আমার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি উঠে নামতে যাবো, এমন সময় সাপটা যেন পাশের দিকে অগ্রসর হয়ে আমার কাছে এসে পড়লো। এখনও ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং ও আমাকে টের পায় নি।

নামতে গিয়ে মনে হোতে লাগল পাহাড়ের প্রত্যেক ফাটলে অসংখ্য ভীষণদর্শন সাপ বাসা বেঁধেছে। তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেচে : ভালো কিছু দেখতেও পাচ্ছি নে। কাঁটাগাছে হাত-পা ছড়ে রক্তপাত হতে লাগলো। প্রাণভয়ে সব অগ্রাহ্য করে কোনো রকমে নামতে লাগলাম। পথও যেন ফুরোয় না। ওঠবার সময় বেশ উঠে-ছিলাম। এখন সেই পথ দুর্গম ও কঠিন হয়ে পড়েছে।

অন্ধকারও এখন বেশ। যা হোক অতি কষ্টে এক রকম করে তো নামা গেল। ছুটতে ছুটতে শালবনের মধ্যে এসে পড়লাম। উল্‌দাড়ুংরি আর চাঁইবাসার রাস্তার মধ্যে (জায়গাটা রাখা মাইন্‌স ও চন্দ্ররেখা গ্রামের কাছাকাছি) এই চারা শালবন। অদূরে পথ। গালুডির হাট থেকে কয়েকজন বুনো লোক ফিরছিল। তারা আমাকে ওভাবে শালবনের মধ্যে হাঁটতে দেখে অবাক হয়ে গেল।

বললে—কি বাবু ?

তখন তাদের খুলে বললাম।

ওরা বললে—সন্দেবেলা ও-পাহাড়ে কেউ যায়? দেখতে পান নি গরু চরে না ও-পাহাড়ে! যে পাহাড়ে গরু চরে না সে পাহাড়ে বিপদ আছে বুঝতে হবে।

—কি আছে ওখানে?

—ওটা শঙ্খচূড় সাপে ভরা। দিনমানেও কেউ যায় না।

—তোমরা দেখেছ?

—বাবু, এই চন্দ্ররেখা গ্রামের একজন নাপিত ওই পাহাড়ে পাকা কুল তুলে আনতে গিয়েছিল। তখন অনেক কুলগাছ ছিল ওখানে। দুপুর বেলা কুল পাড়তে গিয়ে দ্যাখে মস্ত বড় তিনটে শঙ্খচূড় গাছের গুঁড়ির গায়ে জোট পাকিয়ে রয়েছে। ওকে দেখে একটা তো তেড়ে এল, ও ছুট দিলে। কিন্তু ছুটবে কোথায়? দেখেছেন তো কেমন কাঁটা। কাঁটা পায়ে বিঁধে পাথরের ওপরে পড়ে গেল। ওর পড়ার শব্দে কি রকম ভয় পেয়ে সাপটা পালিয়ে গেল তাই রক্ষে, নয়তো নাপিতের পো সেদিন জন্মের মত কুল খেতো। ওসব পাহাড়ে আর কখনো এমন সময় উঠবেন না।

এদিন ছাড়া আর কোনোদিন সাপ দেখি নি।

তবে একবার সুবর্ণরেখার ওপারের পাহাড়ের নীচে একটা সাপের খোলস দেখেছিলাম মস্ত বড়। সে কি জাতীয় সাপের খোলস তা আমি বলতে পারবো না। তবে সে সাধারণ সাপ নয়, এটা ঠিক। সেদিন ছিল সরস্বতী পূজা। আমি, অমর-বাবু, তিনু ও আমার ভাগ্নে শান্ত আমরা সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ে যাই। আমাদের বাড়ী থেকে সে পাহাড় প্রায় সাত মাইল দূরে। পাহাড়ে উঠে সে পাহাড় পার হয়ে ওধারের বনাবৃত উপত্যকার ঠিক ওপরেই আমরা বসলুম, তখন বেলা তিনটে। রোদ বেড়ে চেলেছে। আমাদের স্নান করার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু জল কোথায়? খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের নীচে একটা ক্ষুদ্র জলাশয় পাওয়া গেল। পাহাড় চুঁইয়ে সেখানে টুপ টুপ করে জল পড়ছে, অনেকটা জল সেখানে। একটা মানুষ কোনো রকমে নেমে নাইতে পারে।

শান্ত বললে—মামা, এই ঝর্ণার কি নাম?

—না কোনো নাম নেই।

—আমার নামে এর নাম দেবেন?

—যাও, আজ থেকে এর নাম শান্ত-ঝর্ণা।

এটা অনেকটা হোল সাঁওতালদের পাহাড় যৌতুক দেওয়ার মত। মেয়ের বিয়ের সময় ওরা জামাইকে যৌতুক দেয়—যাও, ওই পাহাড়টা তোমায় দিলাম।

সে পাহাড়ে হয়তো গবর্নমেন্টের রিজার্ভ ফরেস্ট। জামাতা বাবাজী সেখানে যদি একখানা শুকনো ডাল ভাঙতে যান, তবে তখুনি বনের চৌকিদার তাকে চালান দেবে বেঁধে। কার পাহাড় কে দেয়!

সে যাই হোক আমি সে জলে নামতে গিয়েই চমকে উঠলাম। প্রকাণ্ড এক সাপের খোলস সেই গর্ত্তের গায়ের পাথরে জড়িয়ে। বিরাট খোলস। আমরা কাঠি দিয়ে সেটাকে তুলে দেখি আট-দশ হাত কি তার চেয়েও লম্বা খোলাসটা। মোটাও তেমনি। এমনি একটা বিরাট সাপের খোলস ১৯৪৩ সালের নভেম্বর মাসে সিংভূমের সারাণ্ডা অরণ্যে রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্ত আমায় দেখান। খোলসটা আমি মুড়ে বাড়ী নিয়ে এসেছিলাম। বারো হাত লম্বা আর তেমনি মোটা। এ খোলসটাও ছিল একটা গুহার মধ্যে। শ্রীযুক্ত গুপ্ত বলেছিলেন—পাইথনের খোলস।

শান্তকে অমর করে রাখার পরে সেই বনপথে অগ্রসর হয়ে চলি।

সামনেই যে ঝর্ণা তার নাম দেওয়া গেল তিনুঝর্ণা, সাঁওতালদের বিয়ের যৌতুক-

রূপে পাহাড় দান করবার মত। তবে আজকাল ও দেশে ওর নাম তিনুঝর্ণাই প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েচে। বন-বিভাগের একজন কর্ম্মচারী, আমার বিশেষ বন্ধু, বলেচেন বন-বিভাগের ম্যাপ ও নক্সায় আমাদের দেওয়া এই নামটি তিনি ব্যবহার করেন। সেজন্য আমরা তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

অতি চমৎকার বনভূমি। বসন্তের প্রারম্ভে গোলগোলি ফুল ফুটেছে বনে বনে।

সিংভূমের অরণ্যভূমির এ সুন্দর বনফুলের প্রশংসা না করে থাকা যায় না। বসন্তের প্রথমেই এই ফুল পাহাড়ী বনে ফুটতে আরম্ভ করে—দেখতে অনেকটা সূর্য্য-মুখী ফুলের মত। তিনটি কারণে এ ফুল অতি সুন্দর দেখায়। প্রথম, নিষ্পত্র প্রকাণ্ড গাছে এ ফুল ফোটে ; দ্বিতীয়, সাদা কোয়াৎর্জ পাথরের অথবা কালো কোয়ার্টজাইট পাথরের পটভূমিতে, সবুজ অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ ঠেলে ওঠে, এখানে ওখানে সাদা ডালপালাওয়ালা নিষ্পত্র গাছ ; তৃতীয়, ফুলের রং ও গড়ন অতি সুন্দর। প্যকারের বিখ্যাত বই হিমালয়ান জার্নালের মধ্যে এই ফুলের উল্লেখ আছে ও ছবি আঁকা আছে।

তিনু বললে—দাদা, চলুন আমরা পাহাড়ে ঘুরে যাই।

পাহাড় ঘুরে যেতে গিয়ে এক জায়গায় দেখি গোলগোলি গাছের মেলা। তার নীচেই ধাতুপ ফুলের বন রাঙা হয়ে আসচে নব মুকুলের আবির্ভাবে। এই আর একটি চমৎকার ফুল—মধু চুষে খাওয়া যায় বলে এ ফুল ছেলেপিলের বড় প্রিয়, আরও প্রিয়তর বন্য ভালুকের।

ভালুকের ব্যাপারও অনেকরকম শোনা গিয়েছে, এসব বনে।

আজ থেকে বছরখানেক আগে ঘাটশিলার নিকটবর্ত্তী এংদেলবেড়া বনে একটি কাঠুরে লোককে ভালুকে জখম করে। লোকটা বনের মধ্যে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ একটা ভালুক গাছের ডাল থেকে নেমে ওর দিকে তেড়ে আসে। ভালুক কেন গাছে উঠেছিল জানি না, বোধ হয় সেই গাছে মৌচাক ছিল। লোকটা হাতের কুড়াল নিয়ে ভালুকের সঙ্গে যুঝতে চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি। ভালুকটা ওকে জমিতে শুইয়ে ফেলে ওর বুকে নাকি চড়ে বসে। ওর মুখ ও নাক থাবার আঘাতে রক্তাক্ত করে দেয়।

আর একটা মজার গল্প শুনি দুবলাবেড়া ফরেস্টে।

স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে লোকটা সেরে গিয়েছিল বলেই শুনেছিলাম।

আর একটা মজার গল্প শুনি দুবলাবেড়া ফরেস্টে।

গত ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আমি দুবলাবেড়া পাহাড় ও বনাঞ্চলে কয়েকদিন যাপন করি মিঃ সিংহর সঙ্গে। স্থানটির প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। বনাঞ্চল ভালবাসি বলেই ভগবান নানা সুযোগ ও সুবিধে আমায় ঘটিয়ে দিয়েছেন অতি অদ্ভুত সব beauty spot দেখবার ও বেড়াবার। এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আমার বন-ভ্রমণের কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে বলেই মনে করি। কিন্তু এ ভ্রমণকাহিনীটি বিস্তৃতভাবে এখন বলচি নে, শুধু ভালুকের গল্পটি আমার কাছে বড় মজাদার মনে হয়েছিল বলেই এখানে উল্লেখ করি।

দুবলাবেড়া অরণ্যের মাঝখানে একটা উপত্যকা, দুদিকে দুই পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে। এই পাহাড়-শ্রেণীর ওপরে বেশ জঙ্গল তবে তত ঘন নয়। বেশির ভাগ শাল ও কেঁদগাছের বন, তবে একটা পাহাড়ে অজস্র বন্যশেফালি-বৃক্ষ। শুধুই শেফালি নয়, শেফালির জঙ্গলও বলা যেতে পারে। এর নাম চরাই পাহাড়, আর ওপরের পাহাড়ের নাম আটকুশি রেন্‌জ্। আটক্রোশ দীর্ঘ বলেই বোধ হয় এর এরকম নাম, তবে আমি

সঠিক জানি নে ওটা আটক্রোশ লম্বা কি না।

এই উপত্যকায় ছিল আমাদের তাঁবু, চরাই পাহাড়ের ঠিক নীচের ঢালুতে।

রাত্রিকালে একদিন এখানে একজন লোক এল। সে এসে ওখানকার ভাষায় বললে—বড্ড বিপদে পড়েছিলাম ওই পাহাড়ের নীচেটাতে।

লোকটি হাঁপাচ্ছে। আমরা বলি—কি হয়েছিল?

--বাবু, ভালুকে পথ আটকেছিল।

কি রকম?

সে আসছিল উপত্যকার মুখে যে বন্যগ্রাম আছে সেখান থেকে। সন্ধ্যা তখনও ভালো রকম হয় নি। জ্যোৎস্না রাত্রি। একটা ভালুক মহুয়াফুল খেয়ে মাতাল হয়ে রাস্তার ওপর মাতলামি করছে দেখতে পায়। আর কিছুতেই সে নড়তে পারে না। এদিকে ওদিকে কোনোদিকেই যাবার উপায় নেই। মাতাল হয়ে ভালুক পথ আটকেচে! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে বাবু!

আমরা বললাম- কি রকম মাতলামি করছিল?

-ঠিক যেমন মানুষে করে। হেলছিল, টলছিল।

--আপন মনে?

-একদম আপন মনে!

-তারপর?

—তারপর আর কি। সেখানে দু ঘণ্টা বসে। রাত হয়ে গেল। তারপর ভালুকটার কি খেয়াল গেল পথ ছেড়ে টলতে টলতে বনের মধ্যে ঢুকলো। তাই এই আসচি।

মাতাল ভালুকে কিছু অনিষ্ট করে?

বাবু, ও জানোয়ারকে বিশ্বাস নেই। বাঘকে বিশ্বাস করা যায় তবু ও জানোয়ারকে না। ওর মাতলামি দেখলে না হেসে থাকা যায় না বটে, কিন্তু বাবু, সাহস করে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না। যদি ঘুরে দাঁড়ায়।

সে কথা ঠিক।

এই গেল সিংভূম অরণ্যের ভালুকের কথা। ওদিকে এমন অনেক লোক দেখেছি, যার হয়ত নাক নেই, কি একখানা হাত নেই। ভালুকের হাতে সেগুলো খোয়াতে হয়েছে। পাকা কুল ও মহুয়া ফুলের সময় অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মার্চ মাসের দিকে বনের পথে একা না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সাবধানের বিনাশ নেই।

সিংভূমের বাঘ সম্বন্ধে আরও দু-একটি গল্প এখানে করে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

সিংভূমের বনে লেপার্ড জাতীয় বাঘ এবং রয়েল বেঙ্গল জাতীয় উভয় প্রকারের বাঘই আছে। উভয় জাতীয় বাঘই ভীষণ হিংস্র। রয়েল বেঙ্গল বরং ভাল, লেপার্ড জাতীয় বাঘ বেশী শয়তান। গত বৎসরে আমি সংবাদ পাই স্থানীয় থানায় একটা বাঘ ও একটা মানুষের মৃতদেহ আনা হয়েছে, পরস্পর পরস্পরকে মেরেছে। ব্যাপার শোনা গেল বাসাডেরা নামে একটি বন্য গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে বর্শা পুঁতে বাঘ মারবার ফাঁদ তৈরী করে। একটা বড় বাঘ ঐ অঞ্চলে উপদ্রব করছিল। সন্ধ্যার দিকে বাঘটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে। বাঘের অবস্থা দেখতে যেমন গিয়েছে, অমনী বৃদ্ধ শিকারী পড়ে গেল বাঘের হাতে। দুইজনে জড়াজড়ি করে ঘোর যুদ্ধ। বাঘ প্রচণ্ড থাবার ঘায়ে লোকটাকে ভীষণ জখম করলো, লোকটাও বর্শার ঘায়ে বাঘটাকে ততোধিক জখম করলো। তারপর লোকজন ছুটে এসে পড়ে, তখন বাঘটা মারা গিয়েছে কিন্তু মানুষটা বেঁচে আছে।

ঘাটশিলার হাসপাতালে আনবার পথে বৃদ্ধও মারা গেল।

একবার আমরা এক অদ্ভুত কথা শুনি। সৌরীনবাবু বলে আমাদের একজন পরিচিত ভদ্রলোক বললেন—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচেন? সেখানে আমরা পূর্ণিমার রাত্রে গিয়ে দেখেচি ময়ূরেরা এসে নাচে!

—কি রকম?

—একটা পরিষ্কার জায়গা আছে বনের মধ্যে। সেখানে এসে ওরা গভীর রাত্রে নাচে। পূর্ণিমার রাত্রে কিন্তু। অন্য রাতের কথা আমি বলি নি।

—ময়ূরেরা যে এমন কবি, তা জানা ছিল না। দেখাবেন আপনি?

—খুব! চলুন না।

সোরু ঝর্ণা কোথায় কতদূরে সে সন্ধান দিতে পারলেন না সৌরীনবাবু। তিনি সাঁওতালদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর কোন ধারণাই নেই। তবে সুবর্ণরেখা পার হয়ে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে বনের মধ্যে এটা তিনি ঠিক জানেন। সে বড় দুর্গম জায়গা।

আমরা এক রবিবারের সুবর্ণরেখার ওপারে পিক্‌নিক্ করতে গেলাম। আমার ভাই নুটু, তার বন্ধু সুরেশ, আরও দু-তিনজন। চৈত্রের প্রথম। মহুয়া গাছে ফুল ফুটে টুপটুপ গাছের তলায় পড়চে, লতাপলাশের ফুল ফুটেচে। গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে উঠেচে পলাশের লতা। গোলগোলি গাছে হলদে ফুল। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কতদূর চলে গেলাম। এই সময়ে কেঁদফল পাকে, সিংভূমের বনের বড় সুমিষ্ট ফল। আমরা উঠিয়ে দিলাম একটা লোককে গাছে। সে উঠে গাছ ঝাড়া দিয়ে অনেক কেঁদফল পাড়লো। স্থানীয় হাটে পাকা কেঁদফল শালপাতার ঠোঙায় বিক্রি হয়। আট-দশটা ফল এক পয়সায়।

পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আমরা একটা অনাবৃত উপত্যকা বেয়ে চলেচি কতদূর। চৈত্রের রোদ চড়চে যতই, ততই টুপটাপ করে মহুয়া ফুল ঝরে পড়চে গাছতলায়। ঝাঁটিফুলের মৃদু দুর্গন্ধ বাতাসে, একস্থানে একটি ক্ষুদ্র ঝর্ণা উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেচে। ঝর্ণার দুপাশে বন্য জামবৃক্ষের সারি। ছায়া পড়েচে জলে।

আমরা এই জায়গাটা পিক্‌নিকের জন্যে ঠিক করে ফেললাম। গরুর গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামানো হোল। সবাই বললে, এখানে ছায়া আছে। এখানেই রান্নাবান্না হোক। সবাই মিলে লেগে গেলো কাজে।

আমি একটু পরে সামনের ক্ষীণ পথ-রেখা বেয়ে সামনের দিকে চললাম। দেখি না, ওদিকে কি আছে।

আপন মনে পথ চলেচি, বড় রোদ, পাথর তেতে উঠেচে রোদে, মহুয়া ফুল কুড়িয়ে খেতে খেতে চলেচি। পাহাড়শ্রেণী চলেচে এই ক্ষুদ্র পথটির সমান্তরাল ভাবে বামে ও দক্ষিণে।

অনেক দূরে এসে একটা গ্রাম পাওয়া গেল। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা নয়, একটা বড় কুসুম গাছের তলায় ঘর-পাঁচ-ছয় লোক বাস করচে। গ্রামের একটা লোক গাছের তলার ছায়ায় বসে পাহাড়ি চীহড়লতার ঝুড়ি বুনচে। আর শালপাতার পিকার ধূমপান করচে। পিকা অর্থাৎ কাঁচা শালপাতা জড়ানো খানিকটা তামাকপাতা। এক রকম বিড়ি বলা যেতে পারে। কাছে একটা মস্ত কুকুর। কুকুরটাকে দেখে মনে হোল, সেটা বাঘকেও ভয় করে না। করবার কথাও নয়।

বললাম—এটা কি গাঁ রে?
—বালজ্বড়।
—ক' ঘর আছিস্ রে?
সে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলল—এই যে ক'ঘর দেখছিস্ রে।
—তোর নাম কি?
—চুক্লু।
—কি করছিস্?
—দেখতে তো পাচ্ছিস্। ঝুড়ি বাঁধচি।
—এখানে তো চারিদিকে বন, থাকিস্ কি করে?
—হোই। বেশ থাকি।
—হাতী আছে রে?
—হাতী আছে, বাঘ আছে, ভালুক আছে।

বলেই চুক্লু আমার চোখের সামনে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার করলে। অতিথি-সৎকারের জন্যে একটা কাঁচা শালপাতার পিকা জড়িয়ে সে দুখানা কাঠ ঘষে আমার সামনে আগুন জ্বালাল। বললে—ধরাও—

আমি অবাক! এই যুদ্ধের বাজারে দেশলাই কবে পাওয়া যায় না যায়। এ কৌশলটি শিখে রাখলে মন্দ কি? আমি কৌশল শিখতে চাইলাম। চুক্লু হেসে সামনের পড়াশি গাছের ডাল একটা ভেঙে এনে তার মধ্যে দা দিয়ে ছোট্ট একটা বিঁধ করলে। আর একটা সরু ডালের এক দিক ছুঁচলো মত করে, সেই বিঁধে বসিয়ে দু হাত দিয়ে ঘোরাতে লাগলে। বিঁধওয়ালা কাঠখানার তলায় রাখলে কয়েকটি শুকনো শালপাতা। দেখতে দেখতে শুকনো পাতা দিয়ে ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। চুক্লু ফুঁ দিতেই দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠলো। বিড়ি ধরিয়ে নিলাম।

আমি ওখানে বসে পড়লুম। আমার উদ্দেশ্য হচ্চে সোরু ঝর্ণার সন্ধান নেওয়া। জায়গাটিও চমৎকার লাগচে। চৈত্র দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করচে চারিদিকে। দুদিকে পাহাড়-শ্রেণী, মধ্যে এই সংকীর্ণ বনাবৃত উপত্যকা। প্রথম বসন্তে পাহাড়ের বনে কোকিল ডাকচে। মহুয়া ফুলের মদির গন্ধ গরম বাতাসে। চুক্লুর দুখানা কাঠ ঘষে আগুন জ্বালা। কাঁচা শালপাতার পিকা জড়িয়ে খাওয়া। মুক্ত জীবনের ছন্দে মুখর দুর্লভ মধ্যাহ্নটি।

ওকে বলি—চুক্লু, ময়ূর দেখেচ বনে?
—মজুর? আছে, অনেক আছে। মজুর কত নিবি?
—সোরু ঝর্ণার নাম শুনেচিস্?
—হ্যাঁ, ক্যানে শুনবেক না।
—ওখানে ময়ূর আছে?
—মজুর সব বনেই আছে। এই সব পাহাড়েও আছে। এখানে বোস, সাঁজের সময় কত মজুর দেখবি।

কিন্তু পূর্ণিমায় সোরু ঝর্ণার শিখী নৃত্য? সেটা উপকথা না কিংবদন্তী! তার মূলে কিছু আছে কি না, সে সন্ধান এখানেই আমার আজ নিতে হবে। সে সন্ধানেই বেরিয়েছি আজ।

থলকোবাদে একরাত্রি

['বনে-পাহাড়ে' রচনার পৃষ্ঠপট সারাণ্ডা অরণ্যে ভ্রমণের সময় বিভূতিভূষণ বন-গ্রামবাসী মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে পত্রাকারে তাঁহার এই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতাটি লিখিয়া পাঠান। এই পত্রটি 'পল্লীবার্তা' নামক সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়। বস্তুত ইহাই 'বনে-পাহাড়ে'র সৃষ্টিকেন্দ্র। তৎসত্ত্বেও এই রচনার একটি স্বতন্ত্র স্বাদ আছে, সেই জন্যই এটি পৃথক রচনা হিসাবে এই গ্রন্থে মুদ্রিত করা হইল।—সম্পাদক বিভূতি-রচনাবলী।]

শ্রীচরণেষু,

নিবিড় বনমধ্যস্থ এক বনবিভাগের বাংলো থেকে লিখছি এ চিঠি। গত ৯ই তারিখে ঘাটশিলা থেকে বেরিয়ে রেলে এসেচি চাঁইবাসা, তারপরে মিঃ সিংহের সঙ্গে মোটরে এসেছি ৬৭ মাইল কুমডি বাংলোতে। গুয়া ও নোয়ামুণ্ডি হয়ে। গুয়া ছাড়িয়ে এই ২৭ মাইলের মধ্যে লোকালয় নেই—সারাণ্ডা অরণ্য, ছোটনাগপুরের সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড়তম অরণ্য। ১৬ দিন এই গভীর অরণ্যের মধ্যে বনবিভাগের বাংলোতে ও তাঁবুতে থেকে সারাণ্ডা অরণ্য সবটাই ঘুরবো। কোথাও ডাকঘর বা লোকালয় নেই- এই চিঠি বনবিভাগের পেয়াদা ২০ মাইল হেঁটে বনপথে জেরাইকেলা নিয়ে গিয়ে ডাকে দেবে। যেতে লাগবে ২ দিন ডাকঘরে। কবে চিঠি পান দেখবেন তো? ক'দিনে বনগাঁ যাবে এ বড় কৌতূহলজনক।

কাল গিয়েচে পূর্ণিমা। বাংলো একটা বনাবৃত ছোট পাহাড়ের চূড়ায়, মধ্যে একটা উপত্যকা। যেদিক থেকেই দেখি নিবিড় অরণ্যানী ও শৈলচূড়া ঘিরে আছে চারিদিকে। গভীর রাত্রে কাল জ্যোৎস্নাস্নাত অরণ্যে যখন ময়ূর ও সম্বর হরিণের ডাক শুনলুম, তখন সত্যই মনে হোল কোথায় আছি? বন্য হস্তীর উপদ্রব সর্ব্বত্র। যেখানে সেখানে হাতীর নাদ পড়ে আছে।

কাল বড় মজা হয়েচে। চা খেয়ে আমি, মিঃ সিংহ ও রেঞ্জ অফিসার মিঃ গুপ্ত তিনজনে বাংলা থেকে নেমে বনপথে বেড়াতে গেলুম হেঁটে। কি সুন্দর অপরাহ্নের ছায়াবৃত সে অপূর্ব্ব বনকান্তার! ময়ূর-নিনাদিত বনভূমি বাল্মীকির রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনা স্মরণ করিয়ে দেয়। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল দেখে মিঃ গুপ্ত বল্লেন, চলুন, অন্ধকারে হাতী বেরুবে। যদিও পূর্ণিমা কিন্তু এ বনে চতুর্দ্দিকের শৈলমালা ভেদ করে চাঁদের আলো পড়তে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে যাবে। এই এক ঘণ্টা নিবিড় অন্ধকারে আবৃত বনের মধ্যে এক পাথরের ওপর বসে থাকা নিরাপদ নয়। এমন সময় মানুষের গলা শোনা গেল পায়ে চলা সরু পথটার ওপ্রান্তে। যারা আসচে তারা আমাদের দেখে ভয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েচে। আমরা ডাক দিলুম, দুজন হো জাতীয় লোক। তারা বল্লে—বালজুড়ি থেকে চাল কিনে আসচি। হো ভাষায় বল্লে, মিঃ গুপ্ত জানেন এ ভাষা। বালজুড়ি কোথায়? ওরা বল্লে, বোনাইগড় স্টেট। কখন বেরিয়েচ? বল্লে, বেলা দশটায়। দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অরণ্যভূমির ওপারে উড়িষ্যায় বোনাইগড় করদরাজ্য। সেখানে চাল ছ' সের টাকায়। লোক দুটি সেখানকার সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে লুকিয়ে বনে বনে পালিয়ে আসচে সস্তা চাল নিয়ে। আমাদের ভেবেচে সারাণ্ডা বনের সীমান্তরক্ষী। তাই এই ভয়।

কিন্তু কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য হোল পূর্ণিমার চন্দ্রকরোজ্জ্বল সে বনভূমির! গম্ভীর অরণ্যানী, চতুর্দ্দিকে পাহাড় আর বনাবৃত উপত্যকা। পদে পদে বন্যহস্তী ও ব্যাঘ্রের ভয় সে সৌন্দর্য্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। চলে আসচি. গম্ভীর বনে কুকুর-ডাকার মত শব্দ। মিঃ গুপ্ত বল্লেন, ও কুকুর নয়, লোকালয় নেই, কুকুর কোথা থেকে আসবে? ও বার্কিং ডিয়ার, এক প্রকার হরিণ। কে বর্ণনা দিতে পারে এ জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমির? গম্ভীর অরণ্যে দূরের কোন পার্ব্বত্য নদীর অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি ও ঝিঁঝিঁ পোকা এবং নৈশ পাখীর কূজনদ্বারা বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর নৈঃশব্দ্য বর্ণনার জিনিস নয়, উপলব্ধি করার জিনিস। না দেখলে উপলব্ধি হবেই বা কেমন করে। বনের মধ্যে পাষাণময় তীরভূমির মধ্যে দিয়ে কোইনা নদী বয়ে যাচ্ছে, জ্যোৎস্নালোকে আজ আমরা সেখানে রাত্রে পিক্‌নিক্ করতে যাবো ঠিক হয়েচে।

এ অঞ্চলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বতশিখর শশাংদাবুরু ৩০৩৮ ফুট উঁচু। সারা সকাল ধরে বনের মধ্যে দিয়ে গিয়ে পরশু আমরা এই শিখরে উঠেছিলুম। অত্যন্ত দুরারোহ ও ঘন বনে আচ্ছন্ন সরু পথ দিয়ে উঠচি, উঠচি, তার যেন আর শেষ নেই। এক একটা শাল গাছ কলের চিমনির মত ঠেলে উঠেচে আকাশে, কোথাও বন্য দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা, আরও কত কি বনকুসুম ফুটে আছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, কে তাদের নাম জানে? কোথাও ঝর ঝর করচে পাহাড়ী ঝরণা—শশাংদাবুরু শিখরদেশ থেকে খাড়া নীচে পড়চে, বনে বনে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার শব্দ। কোথাও বনের মধ্যে বুনো রামকলা গাছ, কে খায় সে কলা হাতী আর বাঁদর ছাড়া। এই সারাণ্ডা অরণ্য অবিচ্ছেদ্য ৪০০ বর্গ মাইল, জনহীন, শুধু বন বিভাগের বাংলো ছাড়া কোনো থাকবার জায়গা নেই, বনবিভাগের তৈরি মোটর রোড ছাড়া রাস্তা নেই। উঠতে উঠতে ঘন ঘন হাঁপাচ্চি, বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা মারচে. পা সামান্য তুলতেও কষ্ট হচ্চে। আবার বনের মধ্যে এত বেলাতেও সূর্য্যের আলো পড়েনি, সে নিবিড়তা ও গাম্ভীর্য্যের তুলনা কোথায়?

ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম, সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে ফরেস্ট গার্ড কুড়ুল দিয়ে একটা আমলকী গাছের ডাল কাটলে। তখন দেখি অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েচি, কত নীচে উপত্যকা—দূরে দূরে শুধুই বননীল শৈলশিখর। যেদিকে চাই, পাহাড় আর বন, বন! বড় বড় কেলি-কদম্বের পাতা বিছিয়ে বসেচি খাড়া বাঁকা পথটার গায়ে, গড়গড়িয়ে যদি পড়ি, তবে ২০০০ ফুট নীচু উপত্যকার পাষাণময় ভূমিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে যাবো। ওপরে উঠে গেলুম তখন বেলা দুটো। ওপরে উঠে দেখি, বা রে, যেন খয়রামারির মাঠ। অনেক-খানি সমতল মাঠ ২ মাইল লম্বা, প্রায় দেড় মাইল চওড়া। বা রে মজা! মাঠের মাঝে মাঝে কেলিকদম্ব, দেবকাঞ্চন ও শাল। এক জায়গায় একটা জলাশয়। তার তীরে নরম কাদায় বহু গরু ও মহিষের পদচিহ্ন। আমি বল্লুম এখানে গরু চরে কাদের? রেঞ্জ অফিসার গুপ্ত হেসে বল্লেন, গরু কোথা থেকে আসবে এ জনহীন অরণ্যে ৩০০০ ফুট উঁচু পাহাড়ের মাথায়? ওগুলো বাইসন আর সম্বর হরিণের পায়ের দাগ। ফরেস্ট গার্ড হো-জাতীয় বন্য লোক, সে সব পায়ের দাগ দেখে বল্লে, বুনো শুওর, বাইসন আর সম্বরের পায়ের দাগ। হাতীও আছে। বাঘ? এখানে জল খায় না।

ক্ষুধায় শরীর অবসন্ন। সঙ্গে খাবার নিয়ে উঠেছে দুজন ফরেস্ট গার্ড। এক পাথরে বসে পেট পুরে খেলুম। শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে চা হোল। ওঁরা তাড়াতাড়ি করতে লাগলেন, চলুন, বড্ড বাইসন আর হাতীর ভয়। আবার নামি সেই উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখর থেকে নিম্নের ঘন বনের মধ্যেকার সরু দুর্গম পথ দিয়ে। ওঠাও

যেমনি, নামতেও তেমনি। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় নীচে নামলুম বটে, কিন্তু নামলুম কোথায়? বনের মধ্যেই। বনের ছায়া নিবিড়তর হয়ে সান্ধ্য অন্ধকারে মিশে যাওয়ার উপক্রম হয়েচে। ফরেস্ট গার্ড বলচে, হুজুর হাতী বেরুবে, জলদি চলুন। কিন্তু বল্লেই ত হয় না। আরও আড়াই মাইল হেঁটে তবে আমাদের মোটর পর্য্যন্ত পৌঁছবো।

মোটর পর্য্যন্ত পৌঁছতে সন্ধ্যা হোল। হঠাৎ গার্ড বল্লে, হাতী! হাতী! চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের গায়ের বনে রাঙাধুলোমাখা হাতী একটা গাছের তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে। তখন সন্ধ্যা, ভাল দেখা যায় না—কেউ বলে হাতি, কেউ বলে না। আমরা মোটরের ভেঁপু বাজাতেই দেখলুম, রাঙাধুলোমাখা জিনিসটি গাছতলা থেকে সরে গেল সুতরাং নিশ্চয়ই হাতী।

শুক্লাচতুর্দ্দশীর অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না উঠলো তখন আমরা পার্ব্বত্য কোইনা নদীর উপলাস্তীর্ণ তীরে পৌঁছে গিয়েছি। দুধারের নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে দিয়ে কলকল তানে কোইনা নদী বয়ে চলেচে। বল্লুম, চা খাওয়া যাক। চা আছে, চিনি আছে, দুধ নেই। আগুন করা গেল হাতীর ভয়ে। বাংলো আরও ২ মাইল দূরে। ডালপালার আগুনে কেটলিতে জল চড়িয়ে দেওয়া হোল। যেদিকে চাই সেদিকেই ঝিল্লীমুখর বনানী। জ্যোৎস্নাস্নাত প্রাচীর বনস্পতিশ্রেণী ধ্যানমগ্ন ঋষিদের মত শান্ত সমাহিত—জন্মমরণভীতিভ্রংশি কোন্ মহাদেবতার উপাসনায় বিভোর। জয় হোক সে দেবতার, যাঁর করুণায় আজ আমার মত দরিদ্রের এ অপরূপ বনস্থলী দর্শনের সুযোগ ঘটলো। তাঁরই শব্দহীন বাণী এই বনানীর নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রহরে প্রহরে মুখরিত হয়ে উঠচে।

এই পর্য্যন্ত লিখে বেলা সাড়ে পাঁচটার পরে সিংহ, আমি ও গুপ্ত বনের পথে বেড়িয়ে এলুম। আজ আবার প্রতিপদ, চাঁদ উঠতে দেড় ঘণ্টা দেরি। বনানীর চেহারা দেখে অন্ধকারে আমার বড় ভয় হোল ফিরবার পথে। আমি বলি, চলুন, হাতী বেরুবে। আর ঠিক সন্ধ্যায় ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দে কি ময়ূরই ডাকচে বনে। এদিকে একটা ডাকে, ওদিকে গভীর বনে একটা তার উত্তর দেয়—ওদিকে আর একটা ডাকে, অন্যদিক থেকে তার উত্তর আসে, যেন পাল্লা দিয়ে ডাকাডাকি চলেচে। বাংলোতে ফিরে এসে দেখি একদল হো নরনারী হো নাচ দেখাতে এসে বসে আছে। তারা রাত দশটা পর্য্যন্ত নাচলো, মেয়ে পুরুষ একসঙ্গে বেশ নাচলে। দু টাকা বকশিশ পেলে।

এইখানে কালও আসবো। পরশু যাবো ১৫ মাইল বনপথে তিরিশপোখী। সেখান থেকে ছোটনাগরা, তারপর সলাই, সেখান থেকে Ankua waterfalls দেখতে যাবো গভীর বনের মধ্যে ২২ মাইল। ১৬ দিনের টুর প্রোগ্রাম আছে। তবে বড্ড ভীষণ শীত পড়েচে। থলকোবাদ বাংলো, যেখানে বসে লিখচি, এর উচ্চতা ১৮৩০ ফুট। তিরিশপোখি ১৯৭৫ ফুট, এত উচ্চ স্থান, বনে ঘেরা—৪০০ বর্গমাইল গভীর অরণ্যের মধ্যে, সুতরাং শীত তো হবেই। Ankua waterfalls নাকি একটি চমৎকার দৃশ্য, মিঃ সিং বলছিলেন।

এদিকে চাল ৪ সের টাকায়—অবিশ্যি এ বনে নয়। এখানে লোকালয় নেই—গুয়া নামক স্থানের বাজারে দেখে এসেচি। বোনাইগড় স্টেটে ৬ সের টাকায়, সেখান থেকে অনেকে বনপথে চাল লুকিয়ে আনতে যায়—কারণ স্টেট থেকে বার করে আনবার জো নেই। ওখানে কেমন?

আপনি কেমন আছেন? মিতে কোথায়? আপনাদের কথা মনে হয় বড্ড। কালও সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্যপথে বেড়াবার সময় ভাবছিলুম এতক্ষণ দূরে বনগ্রামের

একটি ছোট্ট ঘরে আপনারা বসে গল্পগুজব করচেন। যতীনদা এসে সকলকে হাসাচ্ছেন, আপনি ঘন ঘন তামাক সাজচেন, শিবেনদা চুপ করে বসে আছেন, বিনয়দা গল্প করচেন, সুবোধ দা কত সস্তায় ওবেলা মাছ কিনেচেন সেই গল্প করচেন, জয়কৃষ্ণবাবু তামাক খাচ্চেন, হরি দা এত রাত্রে নেই, ঠাণ্ডার ভয়ে বিকেলেই বাড়ী চলে গিয়েচেন, মনোজবাবু বোধহয় আজকাল আসে না, মিতেও আসে না—কনট্রাকটারি নিয়ে ব্যস্ত। বেশ লাগে ভাবতে এত দূর থেকে—মনে হয় ওরাই সব আমার আপনার লোক, কতদিনের নিবিড় পরিচয়ের প্রিয় সাথীবৃন্দ, কত ভালবাসি সকলকেই। ওদের সকলকেই আমার সশ্রদ্ধ ভালবাসা জানাবেন, আপনি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন। দুলিকে আশীর্ব্বাদ দেবেন, সে কি আমার কথা মনে করে? যতীনদাকে কতদিন দেখিনি, বড্ড মনে হয় যতীনদার কথা। ইচ্ছে হয় আপনাকে ও যতীনদাকে নিয়ে এসে বিশ্বশিল্পীর এ সৌন্দর্য্যভূমি দেখাই, কিন্তু তা কোথায় হচ্ছে! স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। আশা করি যতীনদা কুশলে আছেন।

পুঃ—এই চিঠিখানা মনোজবাবুকে দেবেন 'পল্লীবার্ত্তা'য় ছাপাতে। চিঠির আকারেই দেবেন। প্রুফটা যেন মনোজবাবু* ভাল করে দেখে দেন। তাঁকে প্রীতি জানাবেন।

আপনাদের—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোজকুমার রায়

উৎকর্ণ

দিনলিপি-৬/উৎকর্ণ-১

'জীবনের যাত্রাপথে যাঁরা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, সাহিত্য রচনায় দিয়েছে প্রেরণা, অভিষিক্ত করেছে আনন্দ রসধারায়,—অথচ দাবি করেনি কিছু,—তাদেরই কথা আজ স্মরণ করলাম।'

আজ এই ডায়েরীটা প্রথম আরম্ভ করলুম, জানিনে কতদিনে শেষ হবে, কিন্তু এইজন্যে আরম্ভ করলুম যে সবদিক থেকে আজকার দিনটি আমার জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। দুঃখের বিষয় এই যে এরকম দিন বেশী আসে না জীবনে। আমি এই ডায়েরীটা লিখব এমন ভাবে যে আমার মনের সকল গোপনীয় কথাই এতে থাকবে, কিছু চেপে রাখব না। কাজেই কথাগুলো সব লিখতে হবেই।

অনেককাল আগে, আজ প্রায় আঠারো বছর আগে এই দিনটিতে পুজোর ছুটি উপলক্ষে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখন নতুন বিয়ে হয়েচে, তার আগে কতকাল দেখা হয়নি। গিয়েছিলুম অবিশ্যি আগের দিন, কিন্তু দেখা হয়নি, বেশী রাত হয়ে গিয়েছিল বলে। আজই রাত্রে প্রথম দেখা হয়। সেই পুজোর সময়েই তার বাপের বাড়ি থেকে নিতে এল তাকে, আমরা পাঠিয়ে দিলুম, কিন্তু মাসখানেক পরে বাপের বাড়িতে সে মারা গেল।

সেই জন্যেই আজকার দিনটি* আমার এত মনে আছে, থাকবেও চিরকাল।

আর একটা ব্যাপার, যে জন্যে আজকার দিনটি স্মরণীয়, সে হচ্ছে আজ বহুকাল পরে আমাদের দেশে বন্যার জলে নৌকো করে বেড়িয়ে এসেচি। আমার জ্ঞানে এমন বন্যা কখনও দেখিনি। কুঠির মাঠে সাঁতার-জল, সেখানকার বন-ঝোপের মাথাগুলো মাত্র জেগে আছে, যেখানে আর-বছর ব্যায়াম করতুম বিকেলে, যেখানে বসে কেলে-কোঁড়ার ফুলের সুবাস উপভোগ করতুম, সে-সব জায়গা দিয়ে বড় বড় নৌকো চলেছে। আমি এমন কখনও দেখিনি, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতুম না হয়তো! ওবেলা আজ আমি, ন-দি, রামপদ, পিসীমা, জগো সবাই মিলে গাবতলার কাছে নৌকোতে উঠে কুঠির মাঠ দিয়ে, বেলেডাঙা নতিডাঙা হয়ে আবার বাঁশতলার ঘাটে ফিরে এলুম। ওরা চলে গেল ঘাটে নেমে বাড়িতে। আমি চালকীর জোলের মধ্যে ঢুকে জোলের ঘাটে নৌকো থেকে নামলুম।

গাবতলা! যেখান থেকে নৌকোয় উঠবার কল্পনা স্বপ্নেও কখনো করতে পারা যেত না।

তারপর বৈকালে খুকুর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম আজ চার মাস পরে। সে কি আনন্দ যাবার সময়ে! কত গল্প এই চার মাসে জমা হয়ে রয়েচে, ওকে সেসব গল্প করতে হবে। প্রথমে খুড়ীমা এলেন, তারপর খুকু এল। তাকে বই কাপড় দিলুম, সুপুরিগুলো পেয়ে খুব খুশি। শ্রাবণ মাস থেকে সুপুরিগুলো ওর জন্যে রেখে দিয়েচি বাক্সের মধ্যে, দিল্লীর বেশ ভাল মশলা মাখানো সুগন্ধি সুপুরি-কুচোনো। অনেক গল্প-গুজব হোল সন্ধ্যা পর্যন্ত। ওরা বারাকপুর যাবে পুজোর পরেই।

আমাদের বাসায় ঢুকবার জো নেই। ভেলা করে গিয়ে খোকা বাসার চাবি খুলে মশারি বার করে নিয়ে এল। কারণ পুজোতে বাইরে বেড়াতে গেলেই মশারি লাগবে।

তারাভরা অন্ধকার আকাশের নীচে রাত্রের non-stop ট্রেনটা ছুটে এল। আমি বসে বসে আজ সারাদিনের কথাটা ভাবছিলুম। সকালে সেই কানু মোড়লের তামাক খাওয়ানো ডেকে, দারিঘাটার পুলের নীচে বন্যার জলের স্রোত, হরিপদদার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদপ্রাপ্তি গ্রামে ঢুকেই, জল বেড়াতে যাওয়া, চালকী, খুকুর সঙ্গে দেখা—এই সব।

* ২৫শে আশ্বিন

এখন রাত ১২টা। বসে ডায়েরীটা লিখচি। শিলং বেড়াতে যাব বলে গোছগাছ করতে বড় ব্যস্ত আছি। ক'মাস ধরে কি ছুটোছুটিটাই করে বেড়াচ্চি কলকাতায়। এখানে মিটিং, ওখানে engagement, এখানে পার্টি, হয়তো আসলে দেখচি যে টাকাকড়ি নিতান্ত মন্দ আসচে না, কিন্তু অনুভূতির বৈচিত্র্য ও গভীরতা ওখানে কৈ? উত্তেজনা থাকে বটে কিন্তু সত্যিকার আনন্দ নেই। এই যে শেষ শরতের অপূর্ব্ব রূপ এবার—এমন রূপ দেখতেই পেলুম না, গাছপালার নবীন সরসতা উপভোগ করতেই পেলুম না, কলকাতায় এই হৈ-চৈ গণ্ডগোলপূর্ণ জীবনের জন্যে। তাই কাল সারাদিন এখানে ওখানে শত কাজ ও ব্যস্ততার পরে ফিরে এসে রাত্রে শুয়ে ভাবছিলুম এ হৈ-চৈ এর সার্থকতা কি? আমার মনের একটা ব্যাপার আছে বরাবর লক্ষ্য করে দেখে এসেচি—সেটা মাটি ও গাছপালার সাহচর্য্যে বড় ভাল থাকে। সেখানে মন অন্য এক রকমই থাকে, শহরে শত কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে তা হয় না। আনন্দ পাইনে, আমোদ পাই। শান্ত অনুভূতি নেই, উত্তেজনার প্রাচুর্য্য আছে। অনেকে বলে—এই তো জীবন! পুতুপুতু মিন্‌মিনে জীবন আবার জীবন নাকি? এই রকমই তো চাই!

অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ শহরের জীবনে অনেক কিছু পাবার ও নেবার আছে বটে স্বীকার করি, কিন্তু মনন ও ধ্যানের অবকাশ নেই। প্রকৃতির সঙ্গে যোগ না রাখলে হয়তো অপরের চলতে পারে, কিন্তু আমার তো একেবারেই চলে না।

কি করচি এসব করে? কার কি উপকার করচি? কারোরই না। আমার আগে কত লোকে এরকম হৈ-চৈ করে বেড়িয়ে গিয়েছে, কত মিটিং-এর সভাপতিত্ব করেচে, কত সাহিত্যসম্মেলনের পাণ্ডা হয়েচে, কত ব্যাঙ্কে কত চেক্‌ কেটেচে—কোথায় তারা আজ? কে চেনে আজ তাদের!

গভীর অনুভূতির আনন্দ জীবনে সার্থকতা আনে—অন্ততঃ আমার। অপরের কথা জানিনে, কিন্তু আমি ওর চেয়ে বেশী আনন্দ কিছুতেই পাইনে। এত কোলাহলের মধ্যে থেকে বড় কোলাহল-প্রিয় হয়ে উঠেচি বটে, কিন্তু এ আমি সত্যিই ভালবাসিনে। আমার মন ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠচে একটুখানি নীল আকাশের জন্যে। শরতের বনভূমির, মটর লতার ফুল ও বনসিমের ঝোপের জন্যে, কার্ত্তিকের প্রথমে গাছপালার, বনতারা ফুলের সে অপূর্ব্ব সুগন্ধের জন্যে।

কাল যখন আসাম মেলে বেরুতে যাব, তখন কলকাতায় এল ভয়ানক বৃষ্টি। একটা বুড়ো রিক্‌শাওয়ালাকে বললুম, আমায় মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটে নিয়ে চল্‌। সে কালা ও বোকা। তাকে ধমক দিতে দিতে মেস পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম, তারপর মালপত্র নিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে তার রিক্‌শার চাকা গেল ভেঙে। তাকে দিলুম মাত্র দু আনা। সে প্রতিবাদ না করে নীরবে চলে গেল। তার প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে কতটা অন্যায় করলুম, তা বুঝলুম পরে। যত ভাল দৃশ্য দেখি ততই সকলের আগে আমার মনে পড়ে রিক্‌শাওয়ালার সেই করুণ মুখটা।

আসাম মেলে আসবার সময় দেখলুম আড়ংঘাটা ছাড়িয়ে রেলের দুধারে বহুদূর পর্য্যন্ত বন্যার জলে ডুবে আছে। ঠিক আমাদের দেশের মত বন্যা এসেচে এখানেও, সর্ব্বত্রই এবার বন্যা, এ পথে ১৯২২ সালের পরে আর কখনও আসিনি, এবং হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পার হইনি ১৯২১ সালের পরে। তিস্তা ব্রিজ পার হইনি ১৯০৬ সালের পরে আর কখনও। সেই এসেছিলুম বাবার সঙ্গে রংপুরে, তখন আমি আট-ন' বছরের বালক। কত জল তার পরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে চলে গিয়েচে! (ইংরিজি ইডিয়মটি বড় লাগসই, ব্যবহার করবার প্রলোভন সংবরণ করতে পারলুম না।)

লালমনিরহাটে এলুম রাত তখন ১১টা। এখানে খুকুর খুড়তুতো ভাই থাকে, কিন্তু এত রাত্রে কে তার খোঁজ করে? বেজায় ভিড় ট্রেনে, তবুও শোবার একটু জায়গা পাওয়া গেল। গোপোকিগঞ্জ স্টেশন, বাংলার সীমানা পার হয়ে আসামে পৌঁছুলাম। ভোর হোল রঙ্গিয়া জংশনে। নিম্ন আসামের ভূমি জলমগ্ন, নলখাগড়ার বনে পরিপূর্ণ। আমিনগাঁওতে কামাখ্যা দেবীর মন্দিরের পাণ্ডারা এসে জুটলো। কোন রকমে তাদের হাত এড়িয়ে পাণ্ডুঘাটে উঠলুম স্টীমারে। তারপর মোটরে গৌহাটি হয়ে শিলং রওনা হলুম।

এ পথের বন-বনানী ও খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড়ের দৃশ্য ভারি সুন্দর। এ পথের উপযুক্ত বর্ণনা কেউ করেনি। শুধু মাইলের পর মাইল দুধারে উজ্জ্বল শৈলমালা, মধ্যে মধ্যে ঝরণা বা পার্ব্বত্য নদী, নদীখাতে ঘন বন, কত বনফুল, কত বিচিত্র গাছপালা, মোটা মোটা লতা গাছে গাছে ঝুলছে, শেওলা জমেচে বড় বড় গাছের গায়ে, নিবিড় অন্ধকার বনানীর তলদেশে সত্যিকার ট্রপিক্যাল জঙ্গল। ছোটনাগপুর অঞ্চলের পাহাড় এর তুলনায়, উচ্চতায় বা বনশোভায় কিছুই নয়। এরকম নিবিড় ট্রপিক্যাল বন সেখানে নেই, সম্ভবও নয়। আর একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, আমাদের কুঠীর মাঠের সেই ছোট এড়াঞ্চির বন এখানে পাহাড়ের সর্ব্বত্র—অন্ততঃ তিন হাজার ফুট উঁচুতেও আমি ঐ গাছের বন দেখেচি। আসামের পাহাড়েই কি ছোট এড়াঞ্চি গাছের আদি বাসস্থান?

বৈকালে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম লাবানে। পথে দেখি অবিকল সুপ্রভার মত একটি মেয়ে যাচ্ছে। ভাবলুম কে না কে! একটু পরে দেখি মেয়েটি পিছন ফিরে আমার দিকে বার বার চাইচে। তারপর সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল—আপনি!

চেয়ে দেখি সুপ্রভা। সে বললে—ওবেলা মোটর-স্টেশনে লোক পাঠিয়েছিলুম আপনার জন্যে—সে ফিরে এসে বল্লে, আপনি আসেননি। আসুন।

'সনৎ কুটীরে' ও থাকে। সেখানে বীণাও এল দেখা করতে। চা খেয়ে ওর সঙ্গে বেড়াতে বেরুই। সঙ্গে রইল তার ভাইপো। প্রথমে ক্রিনোলাইন ফল্স্ দেখে ও বল্লে, চলুন Spread Eagle falls দেখিয়ে আনি। তাই দেখাতে গিয়ে ও পথ হারিয়ে ফেললে। কতদূর শহরের বাইরে নিবিড় পাইনবনের দিকে বিজন পথে চলে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে। পথে খাসিয়া দস্যুর ভয়। ওর মুখ দেখি শুকিয়ে গিয়েচে, যখন দেখা গেল সত্যিই ষণ্ডামার্কা গোছের দুজন লোক অন্ধকারে আমাদের দিকে এগিয়ে আসচে। ও বল্লে—আমার ভয় করচে। কি বিপদ! ছেলেমানুষের কাণ্ড। তবে বলেছিল কেন যে আমি জানি Spread Eagle fallsএর পথ!

যাই হোক, অবশেষে নিরাপদে শহরে পৌঁছে ট্যাক্সি করে ওকে লাবানে পৌঁছে দিয়ে আমি হেঁটে হোটেলে ফিরি। কারণ ও ছেলেমানুষ, আর হাঁটতে পারবে না দেখলুম। শুধু আমায় দৃশ্যাবলী দেখাবার উৎসাহেই ও অতটা গিয়েছিল।

বড় ভাল লাগল এই বেড়ানোটা আজকার। জীবনে এ একটা স্মরণীয় দিন। যেন অন্য জগতে এসে গিয়েচি। শিলংএর শোভা তো অদ্ভুত বটেই—তা ছাড়া সুপ্রভার মত মমতাময়ী মেয়ের সাহচর্য্য ও সহানুভূতি ক'জন পায়?

হোটেলে এসেই কালকের সেই গরীব রিক্শাওয়ালার কথা মনে এসে দুঃখে চোখে জল এল। যদি আবার তার দেখা পাই! আমার নিষ্ঠুরতার প্রায়শ্চিত্ত করব। বাস্তবিকই অন্যায় হয়ে গিয়েচে।

কিন্তু কী ভালই লেগেছে আজ সন্ধ্যায় বনফুল-ফোটা পাইন বনের পথে সুপ্রভার

সঙ্গে বেড়ানোটা। আর কি সুন্দর দৃশ্য চারিধারে, এমন ঢেউখেলানো ঘন সবুজ শৈল-শীর্ষ অন্য কোন জায়গায় দেখিনি। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের চেয়ে শিলং-এর পাহাড়-রাজি অনেক বেশী সুন্দর। অনেকদিন আগে একবার ডায়েরীতে লিখেছিলুম যে, ছোটনাগপুরের পাহাড় আর বাংলা দেশের বনানী এই দুটোর একত্র সমাবেশ হয়েচে এমন কোন জায়গা যদি থাকে, তবে তার সৌন্দর্য্যের তুলনা হবে না। আমার একটি স্বপ্ন ছিল, ঐ দুইয়ের একত্র সমাবেশ আছে এমন একটা জায়গা দেখব। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে পেছনের মেঘস্তূপগুলোকে পাহাড় কল্পনা করে কতবার নিজের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার চেষ্টা করেচি। কিন্তু এখানকার বনানী দেখে বুঝলুম স্বপ্ন-লোকের সন্ধান পেয়েচি। লতা, ঝোপ, জঙ্গল, নিবিড় undergrowth, পরগাছা, চঞ্চল উচ্ছল ঝরণাধারা, শিলাখণ্ড, বিরাট বনস্পতির দল, বড় বড় নদীখাত—সব রয়েছে এখানে, অনেক বেশী রয়েচে—আর কী বাঁশবন, পাহাড়ের সর্ব্বত্র—শুধুই বাঁশ—আর নতুন কোঁড় বেরুচ্ছে সোনার সড়কির মত হেমন্তের প্রথমে—কি শোভা সে নবোদ্গত তরুণ বেণুদণ্ডের, কি তার ছায়া, কি তার শন্‌শন্‌ মর্ম্মর ধ্বনি, বাংলার গাছগুলোর মত সেই স্নিগ্ধ হৈমন্তী সুঘ্রাণটি পথে পথে। অবিশ্যি তিন হাজার ফুটের ওপরে আর ও-প্রকৃতির ট্রপিক্যাল অরণ্য নেই, শুধুই পাইন আর পাইন।

সকালে উঠেচি, এমন খুব কিছু শীত নয়। বাংলাদেশের পৌষ মাসের শীত এর চেয়েও বেশী হয়। সুপ্রভাদের ওখানে যাব বলে বেরিয়েচি, দেখি সুপ্রভা ও আরও দুটি মেয়ে আসচে, পথে দেখা হোল। একটি মেয়ে আসামী, নাম ঊষা ভট্টাচার্য্য, ফিলজফিতে এম-এ পাস করেচে। সে প্রথমে বললে—আসামী ভাষা ছাড়া সে জানে না। তার খানিকটা পরে বেশ বাংলা বলতে লাগল। পাইন্‌ মাউণ্ট স্কুলের পথে আমরা উঠলুম একটু পাহাড়ের মাথায়—সেখানে একটা চমৎকার পাইনবন, ঘন, নিৰ্জ্জন। তারপর নেমে Kench-strasse দিয়ে সরীতলা বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইন-বনে আমরা বসে রইলুম বহুক্ষণ। বিকেলে ওরা মোটর নিয়ে এল, সবাই মিলে Elephant falls বেড়াতে গেলুম। নির্জ্জন পাইনবনের মধ্যে দিয়ে পথ—gorgeটার ওপর একটা কাঠের পুল আছে। আমরা তার পাশের পাথরে কাটা সিঁড়ি ধরে ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে একেবারে নীচে দাঁড়ালুম। কত বিচিত্র ফার্ন ও বন্যপুষ্প পাহাড়ের গায়ে দুধারে। খুব বৃষ্টি এল, আমি একটা পাথরের ছাদের তলায় দাঁড়ালুম। সুপ্রভারা কাঠের পুলটায় দাঁড়িয়েছিল, নেমে দেখতে এল আমি উঠচি না কেন। সবাই বৃষ্টিতে ভিজে গিয়ে মোটরে উঠলুম, তখন আবার বেশ রৌদ্র। মেঘ কেটে গিয়ে আকাশের নীল ফুটে বেরিয়েচে। সনৎ কুটীরে এলে চা খেয়ে আমি বেরুলুম লেক দেখতে। তারপর চেরাপুঞ্জি যাবার জন্যে মোটর স্টেশনে গেলুম। আসবার পথে ইউনিভার্সিটি থেকে যে ছাত্রদের দল এসেচে, তাদের ওখানে গিয়ে গল্প করলুম।

আপার-শিলংএর যে পথে আজ এলিফ্যাণ্ট্‌ ফল্‌স্‌-এ গেলুম—সেটি বড় সুন্দর জায়গা। মাঝে মাঝে খুব নীচে পাইনবনে আচ্ছন্ন অধিত্যকা—দূরে দূরে লাবান ও শিলং পাহাড়চূড়ায় ঘন কালো মেঘের কুণ্ডলী—এই রোদ, এই মেঘ, আবার এই রোদ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ের মত ছোটখাটো ব্যাপার তো নয় এ, খাসিয়া ও জয়ন্তী শৈল-মালার কুলকিনারা পাওয়া যায় না একটা ছোট জায়গা থেকে। এর কতদিকে যে কত কি দেখবার জিনিস আছে, তা তিনদিনের মধ্যে শেষ করা অসম্ভব। তবে জায়গাটা বড় মেঘলা, বৃষ্টি লেগেই আছে, রোদের মুখ ক্বচিৎ দেখা যায়। এত ভিজে জায়গা আমার পছন্দ হয় না। শুকনো খট্‌খটে, নীরস্‌ জায়গা আমি বেশী পছন্দ করি, শিলং

একটা ভিজে স্যাঁতসেতে ব্যাপার। একঘেয়ে পাইনবনও আমার ভাল লাগে না। এই-জন্যে গৌহাটি থেকে শিলং-এর পথে আড়াই হাজার ফুট নীচেকার নিবিড় বনানীর সৌন্দর্য্য যেমন অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এখানকার rolling downs-এর মরকত-শ্যাম-রূপ তত ভাল লাগে না। আর সব জায়গাতেই মাটি আর কাদা, কোথাও বসা যায় না, ভিজে—একখানা বসবার পাথর নেই কোথাও। ছোটনাগপুর অঞ্চলের মত যেখানে সেখানে শিলাখণ্ড ছড়ানো নেই, অনাদৃত প্রস্তরময় শৈলগাত্র ক্কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এত ঝর্ণা, এত বন্যপুষ্প সেখানে কোথায়? শিলং শহর অতি সুন্দর, ছবির মত সাদা সাদা বাড়িগুলো পাহাড়ের গায়ে ধাপে ধাপে সাজানো। Kench-strasse-এ ধনী ও শৌখিন বাঙ্গালীদের বাস—বেশ চমৎকার সাজানো বাগান সেদিকে। প্রায় সকলের বাড়িতেই ফুলবাগান। গোলাপ, ডালিয়া, কস্‌মস্, ফর্গেট্-মি-নট্ এসময়ে প্রচুর। বন্যজঙ্গলের মধ্যে এক ধরনের Compositae প্রায় পাইনবনের নীচে সর্ব্বত্র। আর এক রকমের lichen—আমি তার নাম দিয়েছি bird's feather lichen—গাছের ডাল থেকে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়চে। এলিফ্যাণ্ট ফল্‌স্ যাবার পথে সুপ্রভা এক-রকম বনের ফল তুলে খাচ্ছিল, আমাকেও খেতে দিলে—রাঙা, ছোট ছোট, যেন কুঁচ-ফলের মত—খেতে টক্। ও ফল আবার খাসিয়া মেয়েরা বাজারে বিক্রী করচে। ও বাজে ফল যে কে পয়সা দিয়ে কিনে খায়! খাসিয়া মেয়েরা দেখতে বেশ, এক-একটা এত সুন্দর ও এমন চমৎকার তাদের মুখশ্রী! ওবেলা 'সনৎ কুটীর' যাওয়ার পথে একটি মেয়ে দেখেছিলুম, সে একেবারে পরীর মত সুন্দরী।

এত ব্যাপার সত্ত্বেও বলতে হচ্ছে যে শিলং শহর আমার ভাল লাগেনি। সে প্রাণ-নাচানো সৌন্দর্য্য, বিরাট রুক্ষ রূপ নেই এখানকার প্রকৃতির—যা দেখেচি নাগপুরের রামটেক পাহাড়ে, Highland drive-এ বা নীলঝর্ণার ছোট্ট পাহাড়ে বা সিদ্ধেশ্বর ডুংরীতে। এ বড় বেশী সাজানো—বেশী পুতুপুতু, সাজগোজ পরানো আহ্লাদী পুতুল! দেখতে চমৎকার কিন্তু মনে কোন বড় ভাব জাগায় না।

একথা কিন্তু খাসিয়া পাহাড়ের lower elevation-এর পক্ষে খাটে না—সেখানে যা দেখে এসেচি, তার তুলনা নেই—আমি এখন বলচি শুধু শিলং শহর ও আপার শিলং-এর কথা। আমি যা ভালবাসি, প্রকৃতির সে বর্ব্বর বন্যরূপ এখানে নেই ঐ যে বললুম, বেশ সাজানো-গোজানো আহ্লাদী পুতুলটি। পাইন-বন অবিশ্যি খুব চমৎ-কার বটে, কিন্তু রোমাণ্টিক্ বৈচিত্র্য নেই ট্রপিক্যাল বনের মত। কিন্তু lower eleva-tion-এ এক জায়গা থেকে স্যার জোসেফ হুকার দু'হাজার নানা শ্রেণীর গাছপালা সংগ্রহ করেছিলেন। শিলংকে রেলওয়ে বিজ্ঞাপনীতে 'প্রাচ্যদেশের স্কট্‌ল্যাণ্ড' বলে কেন জানি নে—এই যদি স্কট্‌ল্যাণ্ড হয় তবে স্কট্‌ল্যাণ্ডের ওপরে আমার শ্রদ্ধা কমে গেল।

অথচ যে কেউ শিলং আসবে, সবাই বলবে—উঃ, কি চমৎকার জায়গা মশাই শিলং! একজন যা বলে, সবাই তার ধুয়ো ধরে। এগুলোর চোখ নেই নাকি? এই ভিজে স্যাঁতসেতে একঘেয়ে পাইনবন তাদের ভাল লাগে? কি ভিজে, 'rain, rain, go to spain'—নীচে নেম চল মন, শিলং মাথায় থাকুক, বাংলার সমতল জমিতে নেমে রোদের মুখ দেখে বাঁচি।

একটা পাহাড়ের মাথায় প্রস্তরখণ্ডে বসে লিখচি। চারিধারে সোনালী কী ফুল ফুটে আছে। দূরে সমুদ্রের মত সিলেটের সমতলভূমি দেখা যাচ্ছে। কি সুন্দর পথ! শিলংটা যেমন বাজে, চেরাপুঞ্জি একেবারে স্বর্গ। শিলং থেকে চেরাপুঞ্জির পথের তুলনা দেব আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, কারণ আমি এ ধরণের ল্যাণ্ডস্কেপ্ কখনও দেখিনি। যাঁরা বিলেত বা আয়র্লণ্ডের ঢেউখেলানো সবুজ ঘাসের মাঠ দেখেচেন, তাঁরা

হয়তো বলবেন এর দৃশ্য surrey downs-এর মত আয়র্লণ্ডের পল্লী অঞ্চলের মত। গোহাটি থেকে শিলং রোডে যা দেখে এসেছি, তা থেকে এর দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক। বড় বড় চুনাপাথরের শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র ছড়ানো—উঁচু-নীচু শৈলমালা সর্ব্বত্র। যেদিকে চোখ যায়—কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প মাঠের মধ্যে। শিলাস্তূপের ধারে ধারে দূরে দু-চারটে সঙ্গীহারা গাছ হয়তো ধু ধু প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। শিলং-এর সেই লাল ফুলটা composite, বন্যমল্লিকা জাতীয় একরকম ফুল। করবীফুলের মত কি ফুল—আরও কত কি ধরণের ফুল। চেরাপুঞ্জির থেকে মুশমাই-এর পথে যে জঙ্গল আছে দেখায় ঠিক যেন লিচুগাছের বাগানের মত—অথচ তাদের ডালে ডালে পরগাছা ও অর্কিডে ভরা—তলায় নিবিড় undergrowth—অদ্ভুত ধরণের বন। এক এক জায়গায় চুনা পাথরের শৈলসানু ও নদীখাতের বিশাল ঢালু সম্পূর্ণরূপে বন্যপুষ্পে ভরা—কত ধরণের যে ফুল, তাই গুনে সংখ্যা করা যায় না। পাইনবন এদিকে একেবারেই নেই। চেরা বাজারে গাড়িতে বসে লিখচি—সামনে নদীর বিরাট gorgeটা মেঘ ও কুয়াসায় ভরে গিয়েচে, তার ধারে নিবিড় বন। গাড়ি ছাড়ল—এত জোরেও গাড়ি চালায় খাসিয়া ড্রাইভারগুলো! উঁচু-নীচু শুকনো খটখটে রাস্তা দিয়ে তীরবেগে গাড়ি ছুটচে, একদিকে উজ্জ্বল পর্ব্বতচূড়া, বনফুলে ভরা শৈলসানু, অন্যদিকে নদীর বিরাট খাত, কুয়াসা ও মেঘ আটকে রয়েচে। তাতে আবার রামধনুর সৃষ্টি করেচে। এক এক জায়গায় ঘন বন, যেন লিচু বাগানের মত দেখতে। অথচ মধ্যে ঘন অন্ধকার, শাখাপত্রে নিবিড়, ডালে ডালে অর্কিড, নীচে undergrowthওয়ালা বন—এ অঞ্চলের কী একটা গাছও চিনিনে! আসামের বন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, না ফার্ন, না Compositae, না প্রাইমুলা, না মল্লিকা, করবীর মত ফুলগুলো—কিছুই কি বাংলাদেশের মত নয়? ঊনবিংশ মাইল থেকে বড় নদীখাতটা শুরু হোল, প্রায় ৮।১০ মাইল মোটরে রোডের সমান্তরাল চলেচে, তবে কুয়াসায় আবৃত বলে ভাল দেখা গেল না। অপর পারের সানুদেশে নিবিড় Temperate forest, ফার্ন আর শেওলা, থুজা আর প্রাইমুলা অজস্র। যার অভাবে শিলং ভাল লাগছিল না—তা পেলুম আজ চেরার পথে। এত বেশী পরিমাণে পেলুম, যে আর আমার কোন অভিযোগ নেই শিলং-এর বিরুদ্ধে। এ এক স্বপ্নলোক আবিষ্কার করেছি চেরার পথে, যে স্বপ্নলোক পাথরে, বনে, ফুলে, মেঘে, ধু ধু নির্জ্জনতায়, বিরাটত্বে, অভিনবত্বে বিচিত্র। যেখানে আজ মুশমাই গ্রামে চেরা মালভূমির প্রান্তে শিলাখণ্ডে বসে লিখছিলুম, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা আছে? ওই তো আমার চিরকালের স্বপ্নের সার্থকতা।

শিলং ফিরে দেখি সুপ্রভা নেই মোটর স্টেশনে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম, তারপর লাবান চলে গেলুম। একটা কথা লিখতে ভুলেচি। বড়বাজারের কাছে যখন বাস থেমেচে, দুটি সাহেবের ছেলে এসে মোটরে উঠল, কি চমৎকার চেহারা দুটির। বড়টির সঙ্গে আলাপ হোল, বেশ লাজুক, কোন ইংরেজ বালকদের মত উগ্র নয়। বললে তার মা খাসিয়া মেয়ে। মোটর স্টেশনে সুপ্রভাদের জন্যে অপেক্ষা করে লাবানে গেলুম। ওরা মোটর যোগাড় করতে পারেনি বলে আসতে পারেনি। সেখানে চা খেয়ে বীণা ও সুপ্রভার সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। বীণা একটা ফুলের তোড়া দিলে, চমৎকার সাদা গোলাপ ফুলের তোড়াটি। কাল যাওয়ার কথাবার্ত্তা হোল, সাড়ে আটটার সময় গাড়ি আসবে আমার হোটেলে। একখানা ট্যাক্সি পাওয়া গিয়েচে, তিনজনে যাব আমরা। ও বল্লে, কমলা নেব অনেক করে সঙ্গে, গাড়িতে বড় মাথা ঘোরে।

বৃষ্টি নামল সামান্য। আমি হোটেলে ফিরলুম। রাত সাড়ে সাতটা।

কাল সকালে শিলংয়ের ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গেলুম, চারিধারে পাইনবনের সারি, দূরে লাবান হিলের চূড়া, লেকের ধারে শিশির-সিক্ত নানা গাছপালা—বেশ ভাল লাগল শিলং শহরটিকে। কিন্তু সময় নেই, তাড়াতাড়ি করে নিতে হবে। সাড়ে আটটাতে সুপ্রভাদের গাড়ি আসবে, কাজেই রেণুর চিঠিখানা ডাকে ফেলে দিয়েই হোটেলে এসে স্নানাহার করে নিয়ে তৈরী হয়ে বসে রইলুম। খানিক পরে সুপ্রভার ভাই শান্তি এসে বললে—এ কি! আপনি রয়েছেন যে! আমি তো অবাক্, রয়েচেন মানে কি! গাড়ি কোথায়? শান্তি বল্লে—গাড়ি তো আপনার এখানে এসেছিল, আপনাকে না পেয়ে চলে গেল! শুনলুম হোটেলের ম্যানেজার ভুল করে বলে দিয়েচে যে, আমি ট্যাক্সি আসার দেরি দেখে বাসে সিলেট্ রওনা হয়েচি। কাজেই ওরা চলে গিয়েচে।

কি বিশ্রী ব্যাপার! রাগে দুঃখে তো আমার চোখে জল এল। আমি হাঁ করে বসে আছি সকাল থেকে সেজেগুজে গাড়ির জন্যে—আর হোটেলের ম্যানেজারটা না জেনেশুনে বলে দিলে আমি সিলেট্ চলে গিয়েচি?...

তখনি একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে প্রথম টোল্ গেটে রওনা হলুম—মাত্র ৩২ মিনিট সময় হাতে আছে, এই ৩২ মিনিটের মধ্যে ১৪ মাইল গিয়ে নঙ্মাল্কি গেটে ওদের গাড়ি ধরিয়ে দিতে হবে। গাড়ি ছুটল তীরবেগে—Upper Shillong-এর রাস্তা দিয়ে। মোড়ের মাথায় আমি থামতে দিইনে। ড্রাইভার বলে গাড়ি উল্টে যাবে বাবু। বাঁকের মুখে দশ মাইলের বেশী চালাবার উপায় নাই, তাতে খালি গাড়ি। এলিফ্যাণ্টা ফল্স্-এর কাছে যখন এলুম, তখন ড্রাইভার বল্লে, ভরসা করছি বাবু, ধরিয়ে দিতে পারব।

চালাও চালাও, আরও জোর দাও। ত্রিশ কেন, চল্লিশ করো না! আর কতটা? শুধুই-উঁচু-নীচু, বাঁকা আর বাঁকা, খাদের মত রাস্তা চলেছে পাহাড়ের গায়ে। জোর দেয় বা কি করে? নঙ্মাল্কি গেট দূর থেকে দেখা গেল। দুখানা বাস আর একখানা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে রয়েচে। আমরা পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই ট্যাক্সিখানা ছেড়ে ঠিক সিলেটের পথে গিয়ে উঠল বাঁদিকে। আমি ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি থামালুম, দেখি তাতে এক সাহেব আর মেম। খবর নিয়ে জানলুম আর একখানা সাদা ট্যাক্সিতে দুটি বাঙালী মহিলা ও এক ভদ্রলোক কিছু আগে চলে গেলেন।

কি আর করি, নিরাশ হয়ে ফিরলুম। শিলং পোস্টাফিসের কাছে দেখি কান্তি দাঁড়িয়ে পথে, তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নিলুম। সে বল্লে—একটায় সিলেটের ডাক-ভ্যান ছাড়ে, তাতে লোকও নেয়। আমার মন বেজায় খারাপ, শিলংএ থাকতে একটুও ইচ্ছে নেই, কান্তিকে সঙ্গে নিয়ে মেল-ভ্যানে টিকিট বুক করে এলুম। পথে সুপ্রভার সেই দাদা মোটরে যাচ্ছিলেন, আমায় দেখে বল্লেন—কি, আপনি যান নি? এখানে যে?

আমি সব বল্লুম। সুপ্রভার বুদ্ধির নিন্দাও করলুম। তিনি বল্লেন—তার কোন দোষ নেই। আমিও ছিলুম তখন, আপনার হোটেলে গিয়ে দশ মিনিট আমরা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে। হোটেলের ম্যানেজার বল্লে—গাড়ি না আসাতে আপনি মোটরবাসেই সিলেট চলে গিয়েচেন। পুঁটুর মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল তাই শুনে। সে খুব দুঃখিত হয়েচে মনে হোল।

কি আর করব, যা হবার তা হয়েচে। এতদিন থেকে ঠিক করে আসচি যে সিলেটের পথ দিয়ে সুপ্রভার সঙ্গে যাব, তা উভয় পক্ষের সামান্য বুদ্ধির দোষে ঘটল না।

একটার সময় বাস ছাড়ল। নঙ্‌মাল্‌কি গেটে গিয়ে আমি টাইমকিপারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানলুম ওবেলা সুপ্রভাদের ট্যাক্সিখানা ৮-৪২ মিনিটে গেট্‌ পার হয়েচে, আর আমি এসেচি ৮-৫২ মিনিটে। ঠিক দশ মিনিট আগে গিয়েচে ওরা।

সিলেটের পথ অপূর্ব্ব। বেশ বিপজ্জনকও বটে, ডাইনে বাঁয়ে বিরাট বিরাট gorge—তায় ঢালু নিবিড় বনে চাপা। ট্রিফার্ন আর কত ধরণের গাছ, কত কি ফুল। চেরাপুঞ্জির পথের সে gorgeটা এদের তুলনায় কিছু না। কুয়াসা করে আছে gorgeএর মধ্যে। যেন ওর মধ্যে কেউ কাঠখড়ে আগুন দিয়েচে, সাদা ধোঁয়া উঠচে। ডাইনে খাড়া উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দেওয়াল, মধ্যে সরু পথ, বাঁয়ে গভীর খাদ। খাদের দিকে জানলা দিয়ে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে, নীচু পর্য্যন্ত দেখা যায় না। ঢালুতে কত রকমের গাছপালায় নিবিড় বন। চেরাপুঞ্জির সেই সব ফুল, আরও সংখ্যায় বেশী। খাসিয়া ড্রাইভার প্রাণের মায়া রাখে না। সেই পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় বেজায় আঁকা-বাঁকা উঁচু-নীচু সংকীর্ণ পথে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়েচে—যদি স্টীয়ারিং একটু বেগড়ায়, কি গাড়ি স্কিড্‌ করে—তবে একেবারে ২০০০ ফুট নীচে পড়ে গাড়িসুদ্ধ চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে।

পাইউম্‌শেল গেটে দুদিকের গাড়ি একত্র না হলে মোটর ছাড়ে না। এদিক থেকে শিলং-এর, ওদিক থেকে সিলেটের বহু বাস ও প্রাইভেট্‌ কার দাঁড়িয়ে। নেমে বেড়ালুম, দূরে সিলেটের সমতলভূমি মেঘের মত দেখা যাচ্চে। আমি কেবলই ভাবচি —কয়েক ঘণ্টা মাত্র আগে সুপ্রভা এইখান দিয়ে চলে গিয়েচে—এখন যদি সে থাকত, দুজনে কত গল্প করতুম! সত্যি, সারা পথটাতে যখনই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্বতায় বিস্মিত, মুগ্ধ হয়েচি, তখনই ওর কথা আমার মনে হয়েচে। হর্ষবিষাদে ছুটেছে আজকের গোটা অপরাহ্নটির এ বিচিত্র যাত্রাপথ। পাইউম্‌শেল ছাড়িয়েও কত gorge —নংটু বলে একটা জায়গা কয়েক মাইল মাত্র আগে একটা সুগভীর নদীখাত, তার মধ্যে কি নিবিড় অরণ্যানী, চেয়ে দেখলুম, অত নীচে তো নজর হয় না, তবুও যতটা দেখলুম, নিবিড় কালো অন্ধকার হয়ে রয়েচে ভেতরটা। শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্চে সেই ট্রিফার্ন শোভিত নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে। নংটু থেকে পথ অনেক নেমে গেল, গাছপালার শোভা আরম্ভ হোল, সত্যিকার বন যাকে বলে তা আরম্ভ হোল। সে বনের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। আমি কখনও সে-ধরণের নিবিড় বন দেখিনি। সে বন অন্ধকারে নিবিড়, দুষ্প্রবেশ্য, আর্দ্র, কত কি বিচিত্র গাছপালায় ভরা। আসামের এদিকের একটা গাছও আমার পরিচিত নয়। জংলা কলা, সুপুরি, Cycades, বাঁশ, পাম্‌ এসবও আছে। ফুলই বা কত রকমের। বড় বড় পার্ব্বত্য ঝর্ণা শিখরদেশ থেকে নীচে সবেগে নামচে। (আর এখন লিখব না, টেপাখোলাতে স্টীমার এল, এর পরেই গোয়ালন্দ, জিনিসপত্র গোছাতে হবে।)

কলকাতায় বসে সেই পথের কথাই মনে পড়ছে।

সেই অপূর্ব্ব পথের সৌন্দর্য্যের মধ্যে বসে সারাক্ষণ কেবল ভেবেছি—আহা, সুপ্রভা যদি থাকত, তবেই এটা দেখাতুম, ওটা বলতুম, আহা! সে নেই, কাকেই বা বলি? আমার পাশে যে কয়েকটি লোক বসে—সবাই লাট-দপ্তরের কেরানী, ছুটিতে বাড়ি যাচ্ছে—তারা বসে ঢুলচে, নয়তো গল্প করছে অবিশ্রান্ত, দুজনে বমি করতে শুরু করে দিলে, কেউ চেয়েও দেখছে না সেই বিরাট gorgeগুলোর সৌন্দর্য্য, তার উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈচিত্র্য, কত ট্রিফার্ন, কত কি বিচিত্র বনফুল, কত ঝর্ণা, মেঘ উঠছে gorge থেকে, গভীর খাতের নিম্নতল থেকে ওপর পাহাড় পর্য্যন্ত বহু

Zone-এ বিভক্ত উদ্ভিজ্জ-সংস্থানের বৈজ্ঞানিক রূপ। কি বিপজ্জনক সংকীর্ণ রাস্তা পাহাড়ের উপর; কি রূপ সারাপথের। নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সে কি নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী গভীর gorge-এর তলদেশ কালো অন্ধকারের মধ্যে, কত জংলী ফল, Cycawers, ফার্ন, আর ফুল, ফুল, ফুল—পাহাড়ের সানুদেশ আলো করে রেখেছে সেই লাল ফুলটাতে—সুপ্রভা বলেছিল যেটা সিলটের সমতলভূমিতেও দেখা যায়—দশ-বারোটা বিভিন্ন শ্রেণীর ফুল গুনেচি, বড় বড় লতা, পরগাছা, অনেক নীচে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী বয়ে চলেচে শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে, সেই ট্রিফার্ন-শোভিত নিবিড় বনের মধ্যে। সত্যিকার ট্রপিক্যাল প্রকৃতির অরণ্যানী এই প্রথম দেখলাম ডাওকির পথে।

ডাওকিতে যখন মোটর পেঁছিল তখন অস্তদিগন্তের আভায় পর্ব্বত ও অরণ্যানীর শীর্ষদেশ রাঙা হয়ে উঠেচে—নিস্তব্ধ চারিদিক। মধ্যে নীচু উপত্যকায় ঘন ছায়া নেমেচে, গাছপালার সুগন্ধ বেরুচ্চে, যেমন হেমন্তের অপরাহ্নে আমাদের দেশে বেরোয়। সুন্দর জায়গাটা দু-একটা ডাকবাংলা আছে টিলার মাথায়। সম্ভবতঃ অস্বাস্থ্যকর স্থান, পাহাড়ের নিম্নসানুতে সাধারণতঃ যেমন হয়ে থাকে। এখানে চা খেয়ে নিলুম, তারপরে আবার মোটর ছুটল—শৈলমালা চলেচে মোটর রোডের সমান্তরাল ভাবে বাঁদিকে, অনেকগুলো ঝর্ণা নেমে আসচে পাহাড় থেকে নিম্নে বনানীর মাথার ওপর, দুধারে ছোটখাটো জঙ্গল আর জলাভূমি, বড় বড় নলখাগড়ার বন। মোটর ছুটেচে তীরবেগে, হু-হু হাওয়া বাধচে বুকে, তৃতীয়ার এককালি চাঁদ উঠেচে সামনের আকাশে। সন্ধ্যায় অন্ধকারেই জয়ন্তীপুর বলে একটা গ্রামের ডাকঘর থেকে ডাক তুলে নেওয়ার জন্যে গাড়ি সেখানে দাঁড়াল। সাড়ে সাতটায় সিলেট টাউনে এল। টাউনটা আমার ভাল লাগল না Reed huts আর টিনের ঘর, সিনেমা—বেতের ও বাঁশের আসবাব বিক্রী হচ্ছে দোকানে। সময় খুব অল্পই ছিল, সুরমা নদীতে খেয়া পার হয়ে স্টেশনে এসে গাড়িতে চড়লুম। কি ভিড় গাড়িতে, আজই সব আপিস-আদালত বন্ধ হয়েচে, সব লোক ছুটেচে বাড়ি, পা রাখবার জায়গা নেই। কুলাউড়াতে আসবার পর কুলাউড়া আর শ্রীমঙ্গলের মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আর ঘন জঙ্গল, চা-বাগানও নীচে আছে, কিন্তু অন্ধকারে কোনটা চা বাগান আর কোনটা জঙ্গল এ বোঝা বড়ই শক্ত। কুমিল্লাতে একদল ছেলে উঠল, তারা ময়নামতী সার্ভে স্কুলের ছাত্র, ছুটিতে বাড়ি চলেচে। ঘুম পেল না গাড়িতে, যদিও জায়গা যথেষ্ট ছিল। চাঁদপুরে স্টীমারে পানীয় জলের ট্যাঙ্কের ওপর বসে বেলা একটা পর্য্যন্ত কাটালুম। ডেকে পা রাখবার জায়গা নেই, সর্ব্বত্র লোকে বিছানা পেতে শুয়ে বসে আছে। পদ্মাবক্ষে কাটল প্রায় এগারো ঘণ্টা। ভাগ্যিস্ কিছু খাবার কিনে খাই। গোয়ালন্দ থামবার আগে সে কি ভীষণ বৃষ্টি আর ঝড়! তাতেই স্টীমার দেরি করে ফেললে আসতে। চাটগাঁ মেলে চড়ে বসে ভাবলুম এ তো বাড়ি এসেচি, আমাদের রাণাঘাট দিয়ে যে ট্রেন চলে সে তো বাড়িরই সামিল।

দীর্ঘ ভ্রমণ শেষ হোল। খুব দীর্ঘ হয়তো নয়, কিন্তু দীর্ঘটা relative term, আমার কাছে এই ভ্রমণই খুব দীর্ঘ বটে। তা ছাড়া সুপ্রভাকে কতদিন দেখিনি, ওর আদর-যত্নে এবারকার ভ্রমণের স্মৃতি মধুর হয়ে থাকবে চিরকাল।

ওখান থেকে ফিরে নলহাটি এসেচি কাল রাত্রে। রেল কোম্পানি জায়গাটা ভাল বলে যতই বিজ্ঞাপন দিক, আসলে জায়গাটা ভাল নয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিক থেকে তো কিছুই না—শুধু ধানের ক্ষেত চারিধারে, একটু ডাঙা আছে, এখানকার

লোকে বলে 'পাহাড়'—আমার মনে হয় সেটা একটা কাঁকর ও রাঙা মাটির ঢিবি। বৈকালের পড়ন্ত ছায়ায় দূর-প্রসারিত শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের শোভা দেখা গেল ডাঙাটার ওপর থেকে, কিন্তু এই পর্য্যন্ত, ওর বেশী আর কিছু নেই এখানে। জগধারী বলে একটা গ্রাম আছে দু'মাইল দূরে, ব্রাহ্মণী নদীর ধারে। সেখানে গুরুপদ সিংহের বাড়ি আমাদের নিমন্ত্রণ হোল। বীরভূমের এ অঞ্চলের ঘর-বাড়ির গড়ন আমাদের চোখে ভাল লাগে না। গৃহ-নিৰ্ম্মাণের শ্রী-ছাঁদ নেই, সৌষ্ঠব নেই, চেরাপুঞ্জিতে খাসিয়াদের পাথরের বাড়িগুলোতেও যে রুচিজ্ঞানের পরিচয় পেয়েচি, এই সভ্য বাংলা-দেশে তার নিতান্তই অভাব চোখে পড়ল। জগধারী গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি দেখলুম পটে দুর্গা পূজা হচ্চে। সেকালের একখানা মহিষমৰ্দ্দিনী দুর্গা দেবীর পট টাঙানো, পেছনে রাঙাপাড় কাপড় পরা আগাগোড়া ঘেরাটোপে ঢাকা কলা-বৌ, পূজার উপকরণ যথেষ্টই, মূৰ্ত্তি নির্ম্মাণ করলে যেমন হয় তেমনি। আমরা নদীতে স্নান করলুম, হাঁটু পর্য্যন্ত জল, কোন রকমে শুয়ে স্নান করা গেল। কাছেই একটা মঠ আছে, সেখানে গিয়ে গুরুপূজার বিধি আছে দেখে এবং একটা মোটা লোকের ফটোগ্রাফের গলায় ফুলের মালা কৌশলে পরিয়ে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজো হচ্চে দেখে চটে গেলুম এবং তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করলুম। নর-পূজা আমার ভাল লাগে না, আমার ধাতে ও বরদাস্ত হয় না।

মুড়াগাছায় গিয়েছিলুম একটা লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবে। লোহারাম মুখুয্যে ওখানকার জমিদার, তাদের বাড়িতে থাকবার জায়গা দিলে। বেশ লোক ওরা, কি খাতির-যত্নটাই করলে! ওদের বাড়ির একটা ছেলে বিলেত-ফেরত, হিসেব শিখতে গিয়েছিল, দেখতে বেশ সুশ্রী, বসে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত স্পেনের গল্প করলে। সকালে উঠে গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এলুম—আমাদের দেশের কত গাছপালা, খুব বড় বড় বাড়ি গ্রামের মধ্যে, বড় বড় সেকেলে পূজোর দালান, যেন দিল্লীর মতি মসজিদ কি দেওয়ান-ই-আমের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। পূজোর দালানের এই স্থাপত্যটা মুসলমান তথা মুঘল স্থাপত্যের অনুকরণ, ও বিষয়ে কোন ভুল নেই। হিন্দু স্থাপত্য যে এটা নয়, ভুবনে-শ্বরের মন্দিরের, কোনারকের সূর্য্য মন্দিরের গঠনরীতি দেখলে তা বোঝা যাবে। কাছেই ধৰ্ম্মদহ গ্রামে বাবা ছেলেবেলায় কথকতা করতে এসেছিলেন, সে কথা মনে পড়ল স্কুলের মাঠে বেড়াতে গিয়ে। বৈকালে অল্পক্ষণই মিটিং-এ ছিলুম, তারপর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে ট্রেনে উঠলুম—দুধার বন্যার জলে ভেসে গিয়েচে, এখানকারও অবস্থা আমাদের দেশের মতই। ক'দিন কেবলই ট্রেনে বেড়াচ্ছি, ১৩ই অক্টোবর শুরু হয়েছে, আর আজ ২৮শে—এই ১৫ দিনের মধ্যে কত জায়গায় গেলুম—আর কত বার বেড়ালুম।

আজ ক'দিন এখানে এসেচি। এবার অতিরিক্ত বন্যা আসাতে কুঠীর মাঠের সে শোভা নেই। আমার তেমন ভাল লাগে না—ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো তো জলে হেজে পচে গিয়েচে, যেখানে সেখানে কাদা ও পানা-শেওলার দাম ও কচুরীপানা। খুকু এখানে আছে, ও রোজ সকালে স্নানের আগে ও দুপুরে আসে। আমি সকালে বাঁশ-বাগানের পথ দিয়ে ঘাটে যাই, বেশী বনের মধ্যে যাই, মাকড়সার জাল এবার চোখে পড়চে না। তা হলেও খুব বড় বড় জাল দেখলুম, শিলং-এ একরকম বড় জাল দেখে-ছিলুম পোস্টাপিসের কাছে। আমাদের এখানে মাকড়সাদের জালের টানা খুব দূরে হয়। আবার খুব ছোট টানার জালও দেখিনি যে তা নয়, যেমন কুঠীর মাঠে একটা ঝোপে

সেবার দেখেছিলুম, এই গাছপালা, লতাঝোপ, মাকড়সা, পাখী এদের একটা বিভিন্ন জগৎ—সহানুভূতির সঙ্গে ওদের না দেখলে কি ওদের বোঝা যাবে না চেনা যাবে?

বিকেলে রোজ মাছ ধরতে যাই। অনেককাল পরে আবার কেঁচোর টোপ গেঁথে মাছ ধরতে বসেচি। বোধ হয় বনগাঁ স্কুলে ভর্ত্তি হবার পরে আর কখনও মাছ ধরিনি—দু'একদিন ধরতে বসলেও এত তোড়জোড় করে যে ধরিনি তা ঠিক। এবার ইছামতীতে মাছও হয়েচে বিস্তর। আমার ছোট ছিপে কেবল পুঁটি আর ট্যাংরা ছাড়া পাইনে, কিন্তু ফণি চক্কত্তি ও হরিপদ রোজ সাত-আটটা বড় বড় বান মাছ ধরে। বেলা যত পড়ে আসে, রোদ খুব রাঙা হয়ে ওঠে। ভারী সুন্দর শোভা গাঙের, বকের দল উড়ে যায় জলের ওপর দিয়ে, সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে নামে—আমি ফাৎনার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে থাকব না সন্ধ্যার শোভা দেখব? চোখ ঠিকরে যায় ফাৎনার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে। চোখে এত ব্যথা হয় যে মনে হয় যেন খুব বই পড়েছি। সন্ধ্যার সময়টা খুব lovely লাগে, কিন্তু বসে পাঁচীদের সঙ্গে গল্প করি।

আজ সর্ব্বপ্রথম ভাল লাগল কুঠীর মাঠ। বন্যার দরুন এবার কুঠীর মাঠের সে সৌন্দর্য্য ছিল না, ছোট এড়াঞ্চির গাছগুলো সব হেজে পচে গিয়েচে, সে শ্যামলতা আর কোনদিকে চোখে পড়ে না। আজ দুপুরে খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে, তারপর আমার মনে পড়ল যে এবার এসে আইনদ্দির সঙ্গে দেখা করা হয়নি। নব্বুই বছর হয়েচে ওর বয়েস, কবে মরে যাবে, যাই একবার দেখা করে আসি। মনে ছিল আনন্দ, কি জানি কেন জানিনে, সেই আনন্দভরা মন নিয়ে গেলুম পড়ন্ত বেলার হলদে রোদমাখানো গাছপালার নীচে দিয়ে কাঁচিকাটা পুলের দিকে। বনের দিক থেকে এক এক জায়গায় কি সুন্দর ফুলের সুবাস ভেসে আসচে, অথচ কি ফুলের যে অত সুঘ্রাণ তা দেখা যায় না। খুঁজে খুঁজে দেখি পথের ধারে এক জায়গায় ঝোপে নাটা-কাঁটার ফুল ফুটেচে, তার গন্ধ ঠিক আতরের মত। কিন্তু যে গন্ধটা আগে পেয়েছিলুম, তা নাটা ফুলের গন্ধ নয়। সে গন্ধ অন্য ধরনের। শুধু ফুলের গন্ধ বলে নয়, বনভূমির পাশ দিয়ে যাবার সময় লতাপাতা, ফুলফলের গন্ধ জড়িয়ে মিশিয়ে যে অপূর্ব্ব সুবাসের সৃষ্টি করে গাছপালারাই তার স্রষ্টা, নীলাকাশের তলায় কোটী যোজন দূরের সূর্য্যের রৌদ্রের সঙ্গে পৃথিবীর মাটির রস, বায়ুমণ্ডলের অদৃশ্য বাষ্প, এদের সংযোগে ওরা যে রসায়ন প্রস্তুত করে, তাই আমাদের প্রাণীজগতের উপজীব্য। ভূতধাত্রী তরুলতা নির্ম্মমভাবে ছেদন করবার সময় একথা সব সময় আমাদের মনে ওঠে না। তাই আজ সকালে যখন দেখলুম তেঁতুলতলার মাঠের ধারে খানিক করে জমির জঙ্গল কেটে দিয়েচে—তখন এত কষ্ট হোল! ওখানে নাকি ওরা বেগুন করবে। আহা, কি চমৎকার সাঁইবাবলা ও কেঁয়োঝাঁকা গাছগুলো কেটেচে, আজ ত্রিশ বছর ধরে ওই বনভূমি কত বনের পাখীর আহার্য্য যুগিয়েচে, আশ্রয় দিয়েচে। সৌন্দর্য্যে, ছায়ায়, ফুলের সুবাসে আমাদের তৃপ্তি দিয়েচে, তাদের ওভাবে উচ্ছেদ সাধন করে যে কোন্ প্রাণে তাও বুঝিনে। একটা গাছ কেউ কাট্‌লে আমি তা সহ্য করতে পারিনে। কাগজের কলের জন্যে আমাদের দেশ থেকে গাড়ি গাড়ি বাঁশ চালান যাচ্চে, বাঁশবন দেশের একটা শোভা, এবার সর্ব্বত্র দেখচি বাঁশবন ধ্বংসের পথে চলেচে। দাম তো ভারী, পাঁচ টাকা করে একশো—আমার ঝাড়ের বাঁশ আমি বেচিনি। দুপুরে যখন রৌদ্রে মাঠের মধ্যে গামছা পেতে চুপ করে শুয়ে থাকি, দূর গ্রাম-সীমান্তে বাঁশের বনে নতুন বাঁশের দল সোনার সড়কির মত উঁচু হয়ে থাকে, নীল আকাশের তলায় শিমুলের ডাল বাতাসে দোলায়, রঙিন-ডানা প্রজাপতিরা বনের ফুলে ফুলে উড়ে

বেড়ায়, একটা গাঙ্‌চিল ইছামতীর পারের বড় কদম গাছটা থেকে ডাকে—মনে আসে অপার ব্যোমের উদার ইঙ্গিত, বনপুষ্পের বাণী, বনবিহঙ্গের কলতান—যে সৃষ্টিকে যে জগৎকে জানিনে, বুঝিনে, ভাল করে চিনিওনে তার রহস্যে দেহমন সবল হয়ে ওঠে।

তারপর গেলুম আইনদ্দির বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে মরগাঙের বড় বড় বট গাছের ছায়ায় ছায়ায় সুন্দরপুরের দিকে। আবার সেই বনঝোপের গন্ধ, সেই ছায়া, সেই পাখীর ডাক। এবারকার বন্যায় অনেক গাছপালা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তবুও এ পথের সৌন্দর্য্য তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। মনে হোল সেই ডাওকি নদীর দোদুল্যমান সেতু ও সেই gorgeটার কথা।

ঠিক্ দুপুর বেলা। অপূর্ব্ব পূজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। নৌকো বেয়ে চলেচি বনগাঁয়ে, মেঘলোক-শূন্য নীলাকাশের কোলে সাদা সাদা বকের দল উড়চে। মনে কেমন একটা বিষাদ গ্রাম ছেড়ে যেতে, ইছামতী নদী ছেড়ে যেতে, খুকুকে ছেড়ে যেতে। তার ওপর দেখে এলুম খুকুর জ্বর হয়েচে, আজ সকাল থেকে সে শুয়েই আছে। কিচমিচ পাখী ডাকচে চালতেপোতার বাঁকে ঝোপে ঝোপে। মন উদাস হয়ে রয়েচে আমার, কিছু ভাল লাগচে না। কেন এমন হয়? যাদের ভালবাসি, কাছে রাখতে চাই, তাদের কেন কাছে পাইনে? কোথায় সুপ্রভা পড়ে রইল শিলং-এ, দেখবার ইচ্ছে হলেই কি তাকে দেখবার উপায় আছে? কোথায় পড়ে রইল খুকু। এই যে ওর অসুখ দেখে এলুম, কিছুই করবার নেই আমার—করতে গেলেই যত নিন্দা, যত কানাকানি হবে এই সব পাড়াগাঁয়ে।

খুব বেড়িয়েচি এবার ছুটিতে। সেই ডাওকি নদীর gorge, চেরার পথে সেই প্রাইমুলা ও Compositae-র বন মনে পড়েচে। চালতেপোতার বাঁকে এই গাছ-পালার সৌন্দর্য্যে, খুকুকে ছেড়ে আসবার বিষাদে মনটা পূর্ণ হয়ে আছে। এ সময় শিলং, নংটু থেকে ডাওকি পর্য্যন্ত সেই বিরাট ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন স্বপ্ন বলে মনে হয়।

এইমাত্র ব্যারাকপুর থেকে মোটরে ফিরে এলুম। আজ বেলা বারোটার সময় পশুপতিবাবু, বৌঠাকরুণ, নীরদবাবু ও তাঁর স্ত্রী, বগলাবাবু ও আমি গিয়েছিলুম মোটরে বারাকপুরে বেড়াতে। পথে টায়ার খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন এক জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। তারপর যখন বনগাঁ এলাম, তখন বেলা গিয়েচে। জিনিস-পত্র কিনে নিতে কিছু দেরি হয়ে গেল। ওখান থেকে বেলা পড়ে গেলে বারাকপুর গেলাম। পুঁটিদিদিদের বাড়ির সামনে মোটর গিয়ে দাঁড়াল। খুকু নিজের বাড়ি কি করছিল, আমি গিয়ে তাকে বল্লুম। সে কাপড় পরে তখনি এল। পশুপতিবাবু খুড়োদের রোয়াকে বসিয়ে তার ফটো নিলেন। আমিও সেখানে পেছন দিকে দাঁড়াই। তারপর বগলাবাবু গান করলেন—'চাঁদ ডুবে যায় ভোর গগনে।' আমি পশুপতি-বাবুকে নিয়ে কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এলাম। এসে দেখি শিবুর মা নীরদবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েচে। একটু পরে তিনি এসে খুকুদের বাড়ি বেড়াতে গেলেন। আমিও দেখতে গেলুম। খুকু ডাকলে, আসুন না? আমি ওদের ঘরে গেলুম। তক্তপোশের ওপর উনি আর খুকু বসে আছেন। তারপর খুকু দোরের কাছে এসে বসল। বগলাবাবু গান করলেন—আমিও সেই দোরের বাইরেই বসে। গান খুব ভাল হোল। তারপর সবাই খেতে বসে গেল। ওদিকে খুকু, বেলা ও পশুপতিবাবুর স্ত্রী খেতে বসলেন! খুড়ীমা পরিবেশন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার পরে খুকু একা এ ঘরের অন্ধকারের

মধ্যে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে আলাপ করলে বগলাবাবুর গানের বিষয়ে। সুপ্রভার পত্র দেখতে চাইলে, তা ওকে তো না দেখিয়ে পার পাবার জো নেই। বল্লে, আবার কবে আসবেন? বল্লুম, সেই বড়দিনের সময়। বল্লে, এসে বড় খারাপ লাগছিল এ ক'দিন, আজ ভাগ্যিস আপনারা এলেন!

রাত নটার গাড়ি গেলে আমরা রওনা হলুম। খুকু রোয়াকে দাঁড়িয়ে ছিল। বল্লে —গুড্ বাই। পশুপতিবাবু বকুলতলায় দাঁড় করিয়ে ওর একটা ফটো তুলেছিলেন, আর একটা কোন্ ঝোপের কাছে দাঁড় করিয়ে।

পথে জাহ্নবীর বাসায় খোকাকে নামিয়ে দিয়ে আমরা ওপারে গেলুম তেল কিনতে। বারাসতের কাছাকাছি এসে গাড়ির টায়ার আবার গেল। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করবার পরে একখানা লরি পেয়ে তাতে করে কলকাতা পেঁছিলাম।

এ বেড়ানো মনে থাকবে বহুদিন।

চন্দননগরে একটা সভায় আমায় সভাপতিত্ব করতে হবে বলে গিয়েছিলেন, কিন্তু শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের আজ বার্ষিক উৎসব। পশুপতিবাবু বিশেষ করে বলে গিয়েছিলেন। দুপুরে কিন্তু বাধ্য হয়ে চলে যেতে হল চন্দননগরেই। সুরেন মৈত্র, সুরেন গোস্বামী, বিজয়লাল চাটুয্যে, আমি সকলে বেলা তিনটের সময় গিয়ে নত্যগোপালের পুস্তকাগারে উপস্থিত হলাম। ওরা লাইব্রেরীতে বসে কথাবার্ত্তা বলছিল- আমি পেছন দিকের নির্জ্জন ছাদের আলসের ধারে দাঁড়িয়ে শীতের অপরাহ্ণের হলুদে রোদ-মাখানো রাধালতাফুলের ঝোপ ও বাঁশগাছের দিকে চেয়ে রইলুম। কেবলই মনে হচ্ছে সুপ্রভা আর খুকু আজ এই অপরাহ্ণে কি করচে। এক একবার আমাদের গাঁয়ের বকুলতলাটি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম, খুকু এখন পড়ন্ত বেলায় ছায়ায় তাদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা পাঁচীর সঙ্গে গল্প করতে এসেচে এ বাড়ি। সুপ্রভার আজ ছুটি, হয়তো পাইন মাউণ্ট স্কুলের পাশের রাস্তা দিয়ে বেড়াতে বেরিয়েচে। ওর রুমালখানা সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলুম। বড্ড ময়লা হয়ে গেছে। ওদের দুজনের কথা ভাবছি, এমন সময় সুরেনবাবু ডাক দিলেন লাইব্রেরীতে ব্রাউনিং শোনাবার জন্যে। সুপ্রভা এবার ব্রাউনিংয়ের 'Rudel to the Prince of Tripoli'র অনুবাদ করেছিল 'বিচিত্রা'য়। সুরেনবাবু তার অন্যভাবে অনুবাদ করেচেন—আমার দুটিই ভাল লাগল—তবে সুপ্রভার অনুবাদ খুব litcral না হলেও মিষ্টি বেশী। সুপ্রভা যে ছন্দটাকে অবলম্বন করেচে, তার ধ্বনি ও লয়ের অবকাশ সুরেনবাবুর অবলম্বিত ছন্দের চেয়ে বেশী। ব্রাউনিং পড়া শেষ হয়ে গেলে আমাদের ফটো নেওয়া গেল। মনে পড়ল গোপীর সঙ্গে কুড়ি বছর আগে একবার এসেছিলুম চন্দননগরে তারপর আর কখনও আসিনি। বিয়ে করব বলে মেয়ে দেখতে এসেছিলুম, তখন আমি কলেজে পড়ি, ১৮ বছর বয়স। অবিশ্যি সে মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে হয়নি। মনে আছে, মেয়েটি ছিল খুব ছোট, বারো বছর বয়স, অত ছোট মেয়ে আমি পছন্দ করিনি। মেয়েটি বেশ ফর্সা, একহারা চেহারা, তাও আজও মনে আছে। এখন গিন্নীবান্নী হয়ে নিশ্চয়ই কোথাও ঘরসংসার করচে—যদি বেঁচে থাকে।

চন্দননগরে সভার কাজ শেষ হবার আগেই সুরেনবাবুকে সভাপতির আসনে বসিয়ে আমি আর বিজয়লাল চলে এলুম। হাওড়া থেকে বাসে দেশবন্ধু পার্কে এলাম। সেখানে শিশিরকুমার ইনস্টিটিউটের থিয়েটার হচ্চে পার্ক স্কুলের প্রাঙ্গণে। নীরদবাবু, বৌঠাকরুণ, পশুপতিবাবু সবাই আছেন। জাস্টিস্ দ্বারিক মিত্রের সঙ্গে পরিচয় হল।

সেদিন রাজপুরে গিয়েছিলুম সন্ধ্যার কিছু আগে। ঢাকুরিয়া, কস্‌বা প্রভৃতি স্থানে রেললাইনের ধারে ছোট ছোট গৃহস্থ বাড়ি। সন্ধ্যার চাপা আলো পড়ে কেমন একটা শ্রী হয়েচে, যেন কত পুঞ্জীভূত শান্তি ও রহস্য, গৃহস্থালির কত স্নেহ ভালবাসা এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, নারীর মুখের মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতে, আর হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয় সে শান্তি ও মাধুর্য্যের নিত্য আরতি চলচে। যেখানেই একটা মেয়ে এঁদো-পড়া পুকুরের ঘাটে বসে এই সন্ধ্যাবেলা বাসন মাজচে, সেখানেই তাকে ঘিরে যেন চারিপাশে গভীর রহস্য। মেয়েরা না থাকলে জগৎটা কি মরুভূমিই হত তাই ভাবি।

রাজপুরে পৌঁছে গল্প করলুম তেঁতুলদের বাড়ি বসে অনেকক্ষণ। ফুলি এল, তেঁতুলের মা বলছিলেন তাঁকে বড়দিনের ছুটিতে হরিদ্বার নিতে যেতে। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত ভ্রমণ সম্বন্ধে পরামর্শ হল—কোথা দিয়ে যাওয়া যাবে, কোথায় নামা যাবে, কি কি সঙ্গে নেওয়া হবে—এই সব কথা।

কিন্তু আমি দেখলুম গৃহস্থালিতে যে খুব শান্তি আছে, যতটা দূরে থেকে ভাবি, তা ঠিক নেই। এ সব বাড়িতে তো ছেলেমেয়েদের সর্ব্বদা কান্নাকাটি লেগেই আছে—যখন ছোট ছেলেমেয়ে চীৎকার করে কাঁদতে শুরু করে, তখন প্রাণ অতিষ্ঠ করে তোলে। আর এ করছে ওর সঙ্গে ঝগড়া, ও করছে এর সঙ্গে ঝগড়া। তেঁতুল তো আপিস থেকে ফিরে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দিলে—তার বৌকে সবাই কেন একলা ওঘরে ফেলে রেখেচে। এ রকম শুধু এদের বাড়ি নয়, সব গেরস্ত বাড়িতেই দেখেচি এই রকম অশান্তি, চীৎকার—চিন্তা ও বিবেচনার সম্পূর্ণ অভাব।

মেয়েরা যদি ভাল হয় তবে সত্যিই সংসারে ওরা শান্তি আনতে পারে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের মেয়েরা অধিকাংশই অশিক্ষিতা, বিশেষ কিছু জানে না, বোঝে না—তুচ্ছ বিষয়ে বড় বেশী ঝোঁক, তুচ্ছ কথা নিয়ে দিনরাত আছে। মনে আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি কম মেয়েরই আছে। যে ধরণের সদাহাস্যময়ী মেয়ে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। আমি হাসিখুশি বড় ভালবাসি, যে মন খুলে হাসতে পারে না, আনন্দ করতে পারে না, তাকে নিয়ে সংসারে চলা যায় কি?

অনেকদিন পরে খাঁ সাহেব আবদুল করিম খাঁর গান শুনলুম কাল ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে। ভাগলপুরে থাকতে হেমেন রায়ের মুখে আবদুল করিমের খুব প্রশংসা শুনি। তখন থেকে ইচ্ছা ছিল এঁর গান শুনব। আমি জানতুম না যে এবার All Bengal Music Conference-এ খাঁ সাহেব আসবেন। সেদিন কাগজে নাম দেখেই স্থির করলুম গান শুনতেই হবে। সত্যিই খুব বড় দরের শিল্পী, তা তাঁর গান শুনে কাল বুঝে নিয়েচি। সত্তর বছরের বৃদ্ধের মুখে এমন চমৎকার মিষ্টি সুর আশা করিনি, যেন সারেঙ্গী বাজ্‌চে।

এবার বড়দিনের ছুটি দেশে বড় আনন্দে কাটিয়েচি। বৈকালে রোজ কুঠীর মাঠে ছোট এড়াঞ্চি ফুলের বনের মধ্যে একটা চাদর পেতে বসে বসে Jeans-এর Universe Around পড়তুম। একদিন চাঁদ উঠেচে ছোট একটা চট্‌কা গাছের পেছনে, বোধ হয় ত্রয়োদশী, বিকেল বেলা, সে একটা অপূর্ব্ব ছবি—কতকাল মনে থাকবে ছবিটা। পরের প্রতিপদেই হালিডাঙ্গার প্রজা বাড়ি থেকে খাজনা আদায় করে ফিরচি, দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে চাঁদ উঠল, কোনদিকে কোন মানুষ নেই, পশ্চিম আকাশে দপ্‌ দপ্‌ করচে শুক্র-

তারা। একটা খেজুর গাছে রসের ভাঁড় পাতা ছিল, ভাঁড়টা নামিয়ে রস খেলাম, কিন্তু গাছে আর সেটা বাঁধতে পারলাম না। তখন আমার মনে হয়নি, তাহলে ভাঁড়টার মধ্যে দুটো পয়সা রেখে এলেই হত।

এবার কি জ্যোৎস্না পেয়েছিলুম দেশে! যেমন দিনে আকাশ সুনীল, মেঘমুক্ত—রাতে তেমনি ফুটফুটে জ্যোৎস্না—অবিশ্যি শীতও অতি ভয়ানক। খুকু ছিল দেশে, সে সর্ব্বদাই এসে গল্প করত, বেশ লাগত তাই।

অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে উঠে গেলুম, চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। কেমন একটা মনোভাব হল, খানিকটা বিষাদও তার মধ্যে যে না আছে এমন নয়। এই চারিপাশের বাড়ির কত লোককে জানতুম যখন প্রথম এ মেসে এসেছিলুম, তারা সবাই কোথায় গেল? কতকাল হল তাদের আর দেখি নে। তাদের কথাই মনে হল এ নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে। দুপুরে স্কুলের ছাদে একা বসে বসে যাদের কথা ভাবি, এরাও তাদের দলে আছে। সত্যি আমার মনের এ যে কি অদ্ভুত অবস্থা, কোন পরিচিত বা অর্দ্ধ-পরিচিত মানুষকে দূরে রাখতে ইচ্ছে হয় না, সকলকে কাছে টেনে রাখতে ইচ্ছে করে যে কেন!

"Space & time, I am learning are mrrely modes or appearance
Sincr a corner with thee darling, seems infinite now.—Goethe.

অনেকদিন পরে দেশে গিয়েছিলুম। দুপুরের পরে গিয়ে পৌঁছই। আমার ইচ্ছে, আমি যে গিয়েচি, কেউ যেন না টের পায়। কেননা তাহলে বড় লোকের ভিড় হয়, এপাড়ার ওপাড়ার মেয়েরা দেখা করতে আসে। আমি অত ভিড় পছন্দ করিনে। বিশেষ করে ইন্দুদের বাড়ি জানতে পারলে তো আর রক্ষেই নাই। কিন্তু শ্যামাচরণ দাদাদের টিউবওয়েলের কাছে গোপাল দেখি কি করচে, সে তো গিয়ে বাড়ি খবর দেবে—সেই ভয়ে চুপি চুপি চলে যাচ্ছিলুম, তবু ও ঠিক টের পেয়েচে। তখন অগত্যা ওদের বাড়ি যেতে হল। তারপর খুকুদের বাড়িতেও গেলুম। খুকুদের বাড়িতে প্রথমটাতে যাইনি। পাঁচীদের বাড়ির উঠোনে আমাকে ঢুকতে দেখেই খুকু ডাকলে, আসুন, আসুন। ওদের দাওয়াতে গিয়ে বসে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ও বল্লে আপনি শনিবার না আসাতে ভয়ানক রাগ করেছিলুম। খুকুদের বাড়ি থেকে যখন ফিরি, তখন বিকেল হয়েচে। সাজিতলার পূবে যেখানে ভাঙন ধরেচে নদীর পাড়ে, সেখানে একটা হেলে-পড়া খেজুর গাছের গুঁড়ির ওপর বসে বসে নদীর দিকে কতক্ষণ চেয়ে রইলুম। বড় আনন্দ ছিল মনে, আরও বসতে চেয়েছিলুম, কিন্তু এদিকে আবার সন্ধ্যা হয়ে আসচে দেখে উঠতে হল। চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে আসা আমার বড় ভাল লাগে—শীতের সন্ধ্যায় ফুটন্ত ছোট এড়াঞ্চির ফুলের বন, শুকনো গাছপালার গায়ে রাঙা রোদ, গরীব লোকের কুঁড়েঘর, ওধারেই নদী, নদীর ধারে মাঠ—দেখতে দেখতে আমি আর উমা যে সাঁকোর ধারে বনের মধ্যে খেলা করতুম, সেখানে এসে উঠলুম।

পরদিন যখন কলকাতায় আসি, ট্রেনে সারাপথ কেবল মড্ কস্টেলোর একটা গানের লাইন মনে আসতে লাগল বার বার—আর কি সে আনন্দ মনে! জীবনটাকে এই একমাসের মধ্যে একটা নতুন চোখে যেন দেখেচি। জীবনের কেন নতুন অর্থ হয়। একটি নতুন উপন্যাস শুরু করব ভাবচি এই সম্পূর্ণ নতুন ধারায়।

তারপর আজ পাটনা এলুম বহুকাল পরে। ১৯২৭ সালের পরে আজ ৯।১০ বছর পাটনা আসিনি। আমি, নীরদ, ব্রজেনদা, সজনী সবাই একসঙ্গে এলুম, কাল রাত্রে একাদশীর পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় বর্দ্ধমানের বড় বড় মাঠের দিকে চেয়ে আমার মনে আসছিল একটি প্রবহমাণ জীবনধারার কথা, যা চিরপুরাতন অথচ প্রতিদিন নিজেকে নতুন করে খুঁজে পায়—সৃষ্টির মধ্যে, রসের মধ্যে যার সার্থকতা। কত সুপ্ত গ্রাম তো এই জ্যোৎস্নায় স্নাত হচ্চে, কিন্তু বহুদূরে এক ক্ষুদ্র পল্লীনদীর তীরবর্ত্তী এমন একটি গ্রামের ছবি বার বার মনে আসে কেন?

এ কথা আরও মনে এল যখন দুপুরে একাই পাটনাতে ওদের বাড়ির সামনের পার্কটাতে বসেছিলুম। ছোট্ট পার্কটা, বড় বড় ডালিয়া ফুটে আছে, আর ক্যালেণ্ডুলার—সেও আধশুকনো। নীল আকাশের নীচে বসে দুপুরের রোদটি এই ভয়ানক শীতের দিনে কি মিষ্টিই লাগছিল। পাটনায় শীতও প্রচণ্ড।

আজ ন'বছর আগে পাটনা থেকে শেষ যখন চলে গিয়েছিলুম, আমার সে জীবনে এ জীবনে অনেকখানি তফাৎ হয়ে গিয়েচে। তখন ছিল অন্য ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি, এখন হয়েচে অন্য ধরণের। এখন যারা এসেচে জীবনে—তখন ওরা ছিল না। ওদের সত্যিই বড় ভাল লাগে। তাই আজ দুপুরে বসে কেবলই কাল রাতের মত ছোট্ট একটি পল্লীনদী, একটি বকুলগাছের ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম-এর কথাই মনে পড়ে। সুপ্রভার কথা সব সময়েই মনে হচ্চে, আহা, কোথায় কতদূরে রয়েচে পড়ে, ওর বাবার আবার অসুখ করেছে—ছেলেমানুষ, তাই নিয়ে ওর মন খুব খারাপ হবারই কথা।

সমস্তদিন যদি এ পার্কটিতে বসে এমনি আপন মনে ভাবতে পারতুম, খুবই ভাল হত। কিন্তু তা হবার নয়, আমরা পাটনা শহরে এসেচি শুনে তাবৎ প্রবাসী বাঙ্গালীরা ভাবচেন আমরা তাঁদের অতিথি, কারণ মাতৃভূমি থেকে এসেচি, একটা প্রীতির চোখে সবাই দেখবেন, ওটা বেশী কথা নয়। বৈকালে একটা চা-পার্টিতে নিমন্ত্রণ ছিল—এখানকার পাব্লিক প্রসিকিউটর মিহিরলাল রায়ের বাড়ি। সেখানে গিয়ে দেখা বৈকুণ্ঠবাবু এ্যাডভোকেটের সঙ্গে—ভাগলপুর থেকে তখন-তখন আপীলের মোকদ্দমা করতে এসে ওঁর বাসায় উঠতাম। অনেকগুলি ভদ্রলোক এসেছিলেন—সবাই যখন চায়ের টেবিলে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা, বিহারীদের সহানুভূতির অভাব, এমন কি বাঙ্গালীদের প্রতি স্পষ্ট বিদ্বেষ প্রভৃতি বর্ণনা করছিলেন, আমি তখন আবার অন্যমনস্ক হয়ে জানলার বাইরে অস্তসূর্য্যের রঙে রঙিন আকাশ ও রাঙা-রোদ মাখানো গাছপালার দিকে চেয়ে ভাবচি, কত গ্রামের গাছপালার ছায়ায় এই সন্ধ্যায় কিশোরী মেয়েরা গা ধুয়ে চুল বেঁধে নিজেদের ছেলেমানুষি মনে কত কি ভাবচে, কত ভাঙাগড়া করচে মনে মনে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে, কত স্বপ্ন দেখেচে—তারপর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত পাড়াগাঁয়ে হাঁড়িকুড়ি নিয়ে সারাজীবন কাটালে।

সন্ধ্যার সময়ে বি-এন্ কলেজের হলে প্রকাণ্ড সভা। নীরদের অভিভাষণ বড় চিন্তাপূর্ণ হয়েছিল। সেখান থেকে আমরা যখন বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছি, তখন ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, আজ পাটনাতে তেমন শীত নেই, আমার কেবলই বাংলাদেশের কথা মনে হয়।

এতক্ষণ সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েচে?

ওরা সবাই?...

সুপ্রভাও?...

সুশীলমাধব মল্লিক এখানকার বড় এ্যাডভোকেট। আমি তাঁকে এর আগে হাইকোর্টে কয়েকবার দেখেচি। তাঁরই বাড়িতে নৈশভোজের নিমন্ত্রণ। তাঁদেরই গাড়িতে

সবাই গিয়ে পেঁাছলুম। সেদিন বনগাঁয় যেমন এক সভা বসেছিল মন্মথ রায়ের বাড়িতে—এদিন এখানেও সুশীলমাধববাবুর বৈঠকখানায় রঙীনদা, কলেজের জনৈক biology-র অধ্যাপক, নীরদ, সজনী, আমি সবাই মিলে আরম্ভ করলুম। আনাতোল ফ্রাঁস সম্বন্ধেই তর্কটা গুরুতর। খাওয়ার সময় সুশীলবাবু নিজে বসে এত তদ্বির করতে লাগলেন—বিশেষতঃ বৃদ্ধ বোধহয় সন্ধ্যার পরে দু-এক পেগ টেনে একটু খোস-মেজাজে থাকেন—যে আমরা না পারি পাতের তলায় সন্দেশ লুকিয়ে ফেলে ফাঁক দিতে, না পারি মাছ-মাংসের বাটিতে একটুক্রো ফেলে রাখতে। পাটনায় এসে কেবলই খাচ্চি, খেয়েই প্রাণ গেল।

রাত অনেক হয়েচে। জ্যোৎস্না আজও ফুটেচে। মণিদের বাড়ি এসে সকলে ঘুমিয়ে পড়লুম।

সকালে উঠে এখানকার সেসন্স্ জজ শিবপ্রিয় বাঁড়ুয্যের বাড়ি আমি, নীরদ আর ব্রজেনদা গেলুম বিলিতী মিউজিক্ শুনতে। নীরদ ও জিনিসটা বোঝে। আমি ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। সাহেবী ধরণের বাড়ি, সবুজ ঘাসে মোড়া লন্, বড় বড় গাছ, ধু ধু করচে সামনে গঙ্গার চর, দূরে ঘাটে স্টীমার পারাপার হচ্ছে। নীল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে কি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম পূর্ব্ব দিগন্তের দিকে চেয়ে। Schudert-এর মোজার্টের সুর কতই বাজচে ওদিকে। গানের সঙ্গে নিজের মনের অনুভূতি জড়িয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দের রসায়ন সৃষ্টি হল, বহুদিন আগে ইসমাইলপুরে থাকতে এমন ধরণের আনন্দ মাঝে মাঝে পেতুম, তারপর আর বহুদিন পাইনি।

ওখান থেকে আমরা গোলঘর নিতাইবাবুর বাড়ির রাস্তা দিয়ে বাড়ি এলুম। আমাদের গরম জল দিয়ে গেল ওদের বাড়ির একটি মেয়ে। দুপুরে কমলবাবুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলুম। অনেক ভালো ভালো গোলাপ দেখা গেল তাঁর বাগানে। সতী-দেবীর মীরাবাঈয়ের ভজন গানখানা খুব ভাল লাগল।

বরিখে বাদরিয়া শাওন কি
শাওন কি মন ভাবন কি—

বাড়ি আবার এলুম এঞ্জিনিয়ারটির মোটরে। আসবার পথে এরিস্টলোকিয়া লতা দেখবার জন্যে ট্রেনিং কলেজে নিয়ে গেলেন। অদ্ভুত লতার ফুলটি।

বৈকালে বি-এন কলেজের হোস্টেলের লনে চা-পার্টি। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। ফটো নেওয়া হল। এখানে প্রীতি সেন বলে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হল তাকে বেশ ভাল লাগল। সন্ধ্যায় মিটিং বি-এন কলেজের হলে। আমি একটা বক্তৃতা করলুম—'রচনার ওপরে ভূমিশ্রীর প্রভাব'—'যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্পটি পড়লুম। বহু জনসমাগম—সভার পরে এক গাদা অটোগ্রাফ খাতা সই করতে প্রাণ যায় যায় হয়ে উঠল। একদল আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাইরে এল। আমার বইয়ের ছোট গল্পের সম্বন্ধে ওদের কিন্তু ভয়ানক উৎসাহ! আমার যে এত ভক্ত আছে তা জানতুম না।

আমি এখনই বক্তিয়ারপুর যাব। রঙীনদা আমায় তুলে দেবেন বলে মোটরে উঠলেন, আর মণি। এঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির মোটর। মণিদের বাড়ি এসে জিনিসপত্র নিয়ে বেরুতে যাব—মোটর স্টার্ট নিলে না। ভদ্রলোক কত চেষ্টা করলেন—হাঁপাতে লাগলেন—আহা! তাঁর কষ্ট দেখে আমার কি কষ্ট! সত্যিই ভেবে এখনও আমার চোখে জল আসচে। মহা অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। মাত্র আর ২০ মিনিট দেরি আছে গাড়ির! একজন লোক ছুটল—একখানা ট্যাক্সি নিয়ে এল। তাতেই এলুম স্টেশনে। এসে দেখি পাঞ্জাব মেল ৫৫ মিনিট লেট। ওরা কেউ আমায় ফেলে যেতে চাইলে না।

আমি একবার এসে সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রে বাঁকীপুর স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। এক একবার মনে হচ্ছিল যেন আমি এখনও ইসমাইলপুরেই আছি। এখান থেকে আজ বা কাল গিয়ে ইসমাইলপুরের সেই প্রান্তরে গিয়ে হাজির হব। কিন্তু কি পরিবর্ত্তনই হয়েচে জীবনে এই ক'বছরে। তখনকার আমি আর বর্ত্তমান আমিতে অনেক তফাত। জীবনে তখন সুখ ছিল, সে অন্যরকম। আর এখন, এ অন্যরকম। তখন জীবন ছিল নির্জ্জন, এখন খুকু এসেছে, সুপ্রভা এসেচে। সুপ্রভার কথা অত্যন্ত মনে হচ্চিল, আমি সেদিন যে পত্র দিয়েচি, তা শিলচরে আজ ঠিক পেয়েচে।

এমন সময় পাঞ্জাব মেল এল। একটি মেয়ে লক্ষ্ণৌ এক্‌জিবিশন দেখে ফিরচে, তার সঙ্গে রঙীনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বল্লেন—'এই যে বিভূতিবাবু, ইনি বলচেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন বিভূতিবাবুর। আমি খুঁজছিলুম, কোথায় গিয়েছিলেন?' মেয়েটা বেশ ভাল, অমায়িক স্বভাব, সুন্দরীও বটে। জিগ্যেস্ করলুম—লক্ষ্ণৌ এক্‌জিবিশন কেমন দেখলেন? তিনি বল্লেন—বেশ ভালই, আপনি দেখেন নি? বল্লুম—কই আর দেখলুম!

মনে হল আমাদের পাড়ার খুড়ীমা, ন'দি প্রভৃতি মেয়েদের কথা। ওরা পরকে ভাবে শেয়াল-কুকুর, কিন্তু নিজেরা যে কিসের মত জীবন যাপন করে তা কি ভেবে দেখেচে? মাঝে পড়ে খুকুটা ওদের মধ্যে পড়ে মারা গেল, একঘেয়েমী ও সঙ্কীর্ণ জীবনের তিক্ততায়।

কি ভয়ানক শীত লাগল ট্রেনে বক্তিয়ারপুর আসতে আসতে। অমন শীত অনেক দিন দেখিনি। রাত বারোটায় এক্সপ্রেস্ বক্তিয়ারপুর পেঁছুল। একটা কুলি নিয়ে কালীদের বাড়ি গেলুম। অনেক রাত পর্য্যন্ত ইরাদিদি ও কালীর সঙ্গে গল্প করলুম।

পাটনা থেকে এসেই জানলুম সুপ্রভা এসেচে কলকাতায়। সেই রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম। গত শনিবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়েছিলুম ওর সঙ্গে। সেদিন কয়েকটি গান করলে—আমি জানতাম না ও এত সুন্দর গান গায়। কি মিষ্টি লাগল ওর গান কটি সেদিন! বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে ফিরেই বনগাঁয় ৬-৫০-এর ট্রেনে। স্টেশনে সুবোধ ও যতীনদার সঙ্গে দেখা। রাত ন'টাতে বনগাঁয়ে পেঁাছেই দেখি জগদীশদা'র মেয়ে হাসির বিয়ে—সেদিনই। প্রফুল্ল, হরিবাবু প্রভৃতি বরযাত্রীদের খাওয়ানোর কাজে মহাব্যস্ত। আমায় বল্লেন—এত রাত্রে কোথা থেকে! খেতে বসে যাও। যোগেনবাবুদের বাড়ি খাবার জায়গা হয়েছিল। খেয়ে যখন বাইরে এলুম তখন চাঁদ উঠেচে, অল্প অল্প জ্যোৎস্না, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ।

পরদিন দুপুরের পরে বারাকপুরে গেলুম। যাবার সময় আজকাল চালকীর মুসলমান পাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে বড় চমৎকার লাগে। খুকুদের রান্নাঘরে ওরা খেতে বসেচে। বল্লুম—খুড়ীমা, অতিথি আছে। ওরা অবাক হয়ে গেল। তারপর খুব খানিকটা গল্পগুজব করে বিকেলে ফিরি। ফেরবার পথে গাজিতলা ছাড়িয়ে সেই খেজুর গাছের হেলানো গুঁড়িটায় বসে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নদীর দিকে, ওপারের মুক্ত তৃণাস্তৃত চরভূমির দিকে চেয়ে রইলুম। সন্ধ্যায় বনগাঁ ফিরে চারুবাবুর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল, চা খাওয়া সেরে সাড়ে-আটটার ট্রেনে কলকাতা রওনা হই।

আজ বিকেলে গোলদীঘিতে কতক্ষণ বসে ছিলুম। গৌরীর কথা মনে হল অনেকদিন পরে। এই সময়েই সে মারা গিয়েছিল। সেই শ্রীগোপাল মল্লিকের লেন, সুন্দর ঠাকুরের দোকানে ধারে লুচি খাওয়া—সেই সব শোকাচ্ছন্ন গভীর দুঃখ ও দুর্দ্দশার দিনগুলো এতকাল পরে দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়।

এরাও তো চলে যাবে। সুপ্রভা পরশু বলচে গঙ্গার ধারে বসে বোটানিক্যাল গার্ডেনে—আপনি শীগগির কিন্তু একবার শিলং যাবেন। আমি বেশীদিন বাঁচব না, সত্যি আমার আয়ু কম, জ্যোতিষী বলেচে। কবে মরে যাব, আপনি টেরও পাবেন না।

খুকুও তো বিয়ে হলে চলে যাবে বারাকপুর ছেড়ে। তখন আবার যে নির্জ্জন, সে নির্জ্জন।

আজ বিকেলে রেডিও আপিস থেকে ফিরবার পথে লালদীঘিতে একটু বসেছিলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। যশোর জেলার দূর এক গ্রামে—তাতে সেই মেয়েটি এখন তাদের বাড়ির সামনের বকুলতলাটিতে আপনমনে হয়তো বসে আছে। সুপ্রভা হয়তো পুরীতে সমুদ্রের ধারে বসে কি ভাবচে। কি জানি কেন বসলেই ওদের দুজনের কথা মনে হয়। তাই মনে হল এই সময় একবার জাঙ্গিপাড়া যাব। কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে সেই একঘেয়ে দুর্দ্দিনে জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। গৌরী তখন মারা গিয়েচে, আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী। তার কথাই তখন আমার সমস্ত মনপ্রাণ ভরে রেখেচে, সেই সময় গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া স্কুলে চাকুরি করতে, ১৯১৯ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী। সে কত সালের কথা হয়ে গেল! তারপর ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভাগলপুরে চাকরি নিয়ে যাবার আগে একবার জাঙ্গিপাড়া গিয়েছিলুম। সেও হয়ে গেল ১২।১৩ বছর আগেকাব কথা। আর কখনও যাইনি। অথচ এই ১২।১৩ বছরে জীবনে সর্বদিক দিয়ে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই হয়েচে! এখন জীবনে কত লোক এসেচে, যাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আমার কাছে তখন ছিল অজ্ঞাত। আসলে দেখলুম অর্থসম্পদ কিছু নয়। মানুষই মানুষের প্রাণে অমৃত সিঞ্চন করে। জীবনে যদি প্রেম এসে থাকে, তবে তুমি পার্থিব বিত্তে দীন হলেও মহাধনী—ফোর্ড বা রকফেলার তোমাকে হিংসা করতে পারেন। আর যদি প্রেম না আসে, যদি কারো স্মিত-হাস্য-ভরা চোখ দুটি তোমার অবসর মুহূর্ত্তে মনের সামনে ভেসে না ওঠে, যদি মনে না হয় দূরে কোনও পল্লীনদীর তটের ক্ষুদ্র গ্রামে, কি কোনও শৈলশিখরের পাইন বার্চ্চ গাছের বনের ছায়ায় কোন স্নেহময়ী নারী নিশ্চিন্ত নিরালা অবসরে তোমার কথা ভাবে, তবে ফোর্ড বা রকফেলার হয়েও তুমি হতভাগ্য।

হয়তো একথা Platitude ছাড়া কিছু নয়, কিন্তু যে Platitude জীবনে অনুভব করে, তখন সে আর Platitude থাকে না, তার জীবনের অভিজ্ঞতায় তা হয়ে দাঁড়ায় পরম সত্য।

জাঙ্গিপাড়া স্কুলে প্রথম চাকরিতে ঢুকি ১৯১৯ সালে। হঠাৎ জাঙ্গিপাড়া যাওয়া ঘটল এতকাল পরে। ১৯২৪ সালে একবার বেড়াতে গিয়েছিলুম, আর কখনও যাইনি। স্কুলের দিকে গিয়ে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে দেখা হল। চিনতেও পারলেন। চন্দনপুরের গাঁয়ের পাড়ে সেই তালতলায় তখন কত বসে থাকতুম। পুরোনো জায়গাটা দেখতে গেলুম শ্রীরামপুরের দিদির সঙ্গে—এই সব জায়গার স্মৃতি বড় বেশী জড়ানো—ওখানে গিয়েই সে কথা মনে পড়ল।

তারাজোলের পথেও খানিকটা গেলাম। সে পথটা তেমন ফাঁকা নেই, বড় বড় গাছ হয়ে পড়েচে। বাজারে আমার কয়েকটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা হল—যেমন গজেন, ফকির মোদক প্রভৃতি। গজেন এই স্কুলেই এখন মাস্টারী করচে।

বিষ্ণুপুর গেলুম বৃন্দাবনবাবুদের বাড়ি। ওদের সেই পুরোনো রান্নাঘরটা ঠিক আছে, তার দাওয়ায় বসে খেলাম অনেক পরে। রাত্রে অনেক গল্প হল পুকুরের ঘাটে

বসে। বিজয়বাবুকে বল্লাম—রাজকুমার ভড় জীবনে বড় বন্ধু ছিল, তার জন্যেই এখান থেকে যাওয়া, সে না থাকলে হয়তো এতদিন পরে এখনও জাঙ্গিপাড়ার সম্পন্ন গৃহস্থ হয়ে বসে থাকতাম।

পরদিন সকালে উঠে ওদের পুকুরপাড়ে সেই উঁচু জায়গাটি দেখে এলাম—একটা বড় তেঁতুল গাছ আছে সেখানে। বহুদিন আগে চট্টগ্রাম জেটিতে বসে এই জায়গাটার কথা ভাবতাম। হঠাৎ যে আজ এখানে আসবে—জাঙ্গিপাড়ায়—এত জায়গা থাকতে তা কি কেউ কখনও ভেবেছিল? থানার পাশ দিয়ে পথটায় হেঁটে যাবার সময় পুরোনো দিনের সব কথা, সব মনের ভাব মনে আসছিল। যে ছোট্ট ঘরটাতে ডাকঘর ছিল, চিঠিপত্রের আশায় বসে থাকতাম—সে ঘরটা এখনও সেই রকমই আছে। আমার ছোট্ট ঘরটাতেও গিয়ে দেখলাম—তবে ঘরটা বন্ধ। পদ্মপুকুরের ঘাটের দিকে বারান্দাটায় দাঁড়িয়ে রইলুম।

দুপুরে আমার ছাত্র গজেনের বাড়িতে গেলুম। ওর ভাগ্নী পরিবেশন করলে—তার আবার স্বামী এসেচে, বেচারী ঘোমটা দিয়ে লজ্জাতেই জড়সড়। ওদের মাটির ঘরটা কেমন চমৎকার সাজানো—মাটির মাছ, খেলনা, পুতুল, পুঁতির মালা ইত্যাদি কুলুঙ্গিতে বসানো। দুটি তরুণী লাজুক মেয়ে আনাগোনা করচে ঘরে ও বাইরে—খাঁটি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থালি।

এক জায়গায় অনেক গাঁদাফুল ফুটে আছে। একজনের বাগান এটা। সে তার মনের সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রকাশ করেচে ফুলের গাছ পুঁতে। এও এক ধরণের কাব্য রচনা। মনের সৌন্দর্য্য যাতেই যে ভাবেই প্রকাশ করা যায় তাই তো শিল্প—সেই হিসাবে উদ্যান-রচনা একটা বড় শিল্প।

ভগবান বোধহয় নিজেকে প্রকাশ করেচেন বিশ্ব-রচনার মধ্যে দিয়ে। Analogyটা হয়তো ঠিক হয় না, কিন্তু ভাবতে বেশ লাগে।

আর কতটা কথা ভাবছিলুম, যাকে ভালবাসা যায় বেশী, তাকে দুঃখ দিলে ভালবাসা বর্দ্ধিত হয়, আদর দিলে তত হয় না। এ পরীক্ষিত সত্য। এতে যে সন্দেহ করে, সে ভালবাসার ব্যাপার কিছু জানে না। যাকে ভালবাসো, তাকে খুব আদর দিও না, ভালবাসা কমে যাবে। মাঝে মাঝে তার প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো, ভালবাসার সঙ্গে করুণা ও অনুকম্পা মিশে ভালবাসার ভিত্তি দৃঢ়তর হবে।

ভগবান যাকে বেশী ভালবাসেন, তাকেই কি বেশী কষ্ট দেন—তবে কি এই বুঝতে হবে?

আজ বিকেলে বিশ্রী ঝড়বৃষ্টি, একঘেয়ে বাদলা। স্কুলের ছেলেদের নিয়ে মিউজিয়মে স্বাস্থ্য-প্রদর্শনী দেখতে গিয়েচি। একদল ঢুকেচে একদল ঢুকতে পারেনি, তাই নিয়ে ওখানকার সেক্রেটারীর সঙ্গে ভীষণ গোলমাল—ছেলেরা হাতাহাতি করতে যায়। আমি তাদের থামিয়ে দিই। সাহেব আমার নাম লিখে নিলে—অর্থাৎ আমার নামে কি যেন রিপোর্ট করবে। করগে যা রিপোর্ট, তোর রিপোর্টকে আমি ভয় করিনে। ওয়াছেল মোল্লার দোকানে জামা-কাপড় কিনতে গিয়ে আটকে গেলুম বৃষ্টিতে। তারপর পরেশ খুড়োর সঙ্গে দেখা করে ফিরি।

ক'দিনই বড্ড ছুটোছুটি হচ্চে, কাল পুরী যাব। ঝড়বৃষ্টি পড়ে গেছে, তা কি করব, উপায় নেই। এখন না গেলে ছুটি কৈ আর? কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে বিকেলবেলা। নগেন বাগচীদের পুকুরঘাটে সন্ধ্যায় সকলে দাঁড়িয়ে কতকটা মনে হল —অনেকদিন আগে এদের এই বাড়িতেই ছিলাম। এই পুকুরঘাটে মা নাইতেন। সেই রকমেই সব আছে বাড়িটার। কিন্তু এই ১৩।১৪ বছরে আমার জীবনে কি পরিবর্ত্তন

হয়ে গিয়েচে তাই ভাবি। সম্পূর্ণ একটা ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে, মনের দিক দিয়ে— সবের দিক দিয়ে। তখনকার আমি আর এই আমি কি এক? মোটেই না—সম্পূর্ণ পৃথক দুই মানুষ।

পুরী যাওয়া হয়নি। ঝড়বৃষ্টি দেখে যাওয়া বন্ধ করিনি। টিকিট কিনে এনেছিলুম, সুপ্রভার পত্র পেলুম, সে ওয়ালটিয়ার গিয়েচে, তাতেই যাওয়া বন্ধ করলুম। দেশে চলে গেলুম সাড়ে ছ'টার গাড়িতে। বেজায় ঝড়বৃষ্টির মধ্যে নেমে যদি গাড়ি না পাওয়া যেত, বড় কষ্ট পেতাম। তার পরের দিন সকালে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে গল্প করি। দুপুরে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম সরস্বতী পুজো করব বলে আমার ঘরে। খুকুরা ওখানেই আছে। খুকু একটু পরেই, বার হয়ে এল। অনেক গল্পগুজব করলে। এবার চড়ক-তলার ছেলেরা বারোয়ারীতে সরস্বতী পুজো করচে। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি চুরি হয়ে গিয়েচে বলে রাত্রে আজকাল সেখানেই শুই। আমার ঘরে তার পরদিন সরস্বতী পুজো করলুম। বাল্যকালে দেশে সরস্বতী পুজো করেচি, আর কখনো থাকিওনি দেশে। এতকাল পরে এই। খুকুরা এসে অঞ্জলি দিলে—পাঁচি ও খুকুকে বল্লুম, তোরা প্রসাদ ভালো করে দে সবাইকে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে একাই গেলুম বেড়াতে। গাছে গাছে কুল খেয়ে বেড়াই ছেলেবেলার মত। চারাগাছে কুল ফলেচে, কিন্তু ছেলেবেলার মত কুলগুলো তেমন মিষ্টি না। শিমুল গাছে প্রথম ফুল ফুটে রাঙা হয়ে আছে। সন্ধ্যায় রাঙা আকাশের তলায় চারিধারে গাছের মাথাগুলো নানা বিচিত্র-ভঙ্গি ও ছত্রবিন্যাসের সৌন্দর্য্যে ভারী চমৎকার দেখাচ্চে। হঠাৎ পাটনায় মিহিরবাবুর বাড়ির চা-পার্টির কথা মনে হল, সেই যে আমি পর্দ্দার ফাঁকের দিকে রাঙা রোদ লাগানো গাছের দিকে চেয়ে দেশের কথা ভাবছিলুম সেদিন। সে তো এই কুঠীর মাঠের কথাই। খুকুর কথাও। তারপরে বাড়ি ফিরে আসতেই খুকু ছুটে এল—সে ভালো কাপড় পরে ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল চড়ক-তলায়। খুড়ীমা বাড়ি নেই—কলে গা ধুতে গিয়েচেন—টিউবওয়েলে।

রাত্রে ইন্দুর বাড়ি বসে ওর মুখে নানারকম গল্প শুনি। ও যশোর জেলায় এক পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারী করতে গিয়েছিল। গ্রামের নাম কালো বেলপুকুর। সেখানে কেমন-ভাবে তাকে একটা গৃহস্থবাড়িতে আদর-অভ্যর্থনা করেছিল, আর এক গ্রামে এক গৃহস্থবাড়ি কেমন অনাদর করেছিল এ সব গল্প করে গেল। ওর গল্পে অনেক অজানা পাড়াগাঁয়ের ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। এমন গল্প বলার ক্ষমতা সকলের থাকে না।

পরদিন কালো এল—ওদের বাড়িতে দুপুরে নিমন্ত্রণ। খুকু বসে মাছ কুটচে রান্নাঘরের সামনে উঠোনে, বেলা দশটা, আমি রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে ওর দাদা আর মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করলুম। নদীতে কালো আর আমি সাঁতার দিয়ে আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে চলে গেলুম রায়-পাড়ার ঘাটে। বৈকালে খুকু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে প্রায় সন্ধ্যার কিছু আগে পর্য্যন্ত। তারপর আমি একটু কুঠির মাঠে পথে বেড়িয়ে এসে স্টেশনে রওনা হলুম জিনিসপত্র নিয়ে। আসবার পথে বুড়ীকে দেখতে গেলাম। বুড়ীর হাত ভেঙে গিয়েচে, ময়লা কাঁথা পেতে শুয়ে আছে। আমায় দেখে কি খুশিই হল! বুড়ী সত্যিই আমায় খুব ভালবাসে। এক-সময় ওর অবস্থা ভাল ছিল, ওর স্বামী ছিল জমীর দেওয়ালি। মুসলমানপাড়ার মধ্যে জমীরের অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। ছেলেবেলায় জমীর দেওয়ালিকে আমি দেখেচি। বুড়ী তারই বৌ। এখন আর কেউ নেই ওর, অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েচে। ভিক্ষে করে চালাতে হয় এমন অবস্থা।

বুড়ীকে কিছু দিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বার হলুম, কারণ ট্রেনের বেশী দেরি নেই। অশথতলায় তখনও জ্যোৎস্না ফোটেনি, শেষ বিকেলের ছায়া। হরিবোলার দোকানে এসে ইন্দু ও ফণিকাকাকে পাওয়া গেল। ওরা বসে গল্প করচে। আমার মনে কি অদ্ভুত আনন্দ! সত্যি এমন সব আনন্দের দিন জীবনে ক'বার আসে? এই জ্যোৎস্না, এই শুক্রতারা, আধখানা চাঁদ, সেক্‌রাদের বাড়ির কাছে নেবুফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—এরই মধ্যে কত কি ভাবনা! এ আনন্দ অনেকদিন ভোগ করলুম বটে। আজ চার বছর এই প্রথম বসন্তের দিনে এখানে ফুল-ফোটা দেখি। আজ চার বছর নানা সন্ধ্যায় নানা ছুটির দিনে নানা বিকেলে খুকু আমায় আনন্দ দিয়েচে—কত ভাবে, কত কথায়। ওই ভাবতে ভাবতে জ্যোৎস্নার মধ্যে স্টেশনে এলুম। গোপালনগর স্কুলে ছাত্রেরা থিয়েটার করচে আজ। আমাদের গাঁ থেকে মেয়েরা দেখতে আসবে। ট্রেনে যখন বনগাঁ আসচি তখনও আমার অদ্ভুত আনন্দ। গাছের সারির ওপর দিয়ে পারঘাটার জলের ওপারে আমাদের গাঁয়ের দিকে চেয়ে ভাবচি, সবাই এখন কি করচে? খুকু এখন কি করচে? হয়তো রান্নাঘরে বসে আছে এতক্ষণ, কারণ আজ কাকার তিথি উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ভোজন হয়েছিল বাড়িতে ওবেলা, এবেলা বাসি পায়েস, ভাত-তরকারী নিশ্চয়ই আছে, তাই সে বসে আছে। ইন্দু এতক্ষণ বারান্দায় ছেঁড়া মাদুর পেতে একা বসে আছে। ওরা বেশ আছে।

ভাবতে ভাবতে বনগাঁয় ট্রেন এসে দাঁড়াল। প্ল্যাটফর্মে আমার কাকার ছেলে লালমোহন লুচি-সন্দেশ বিক্রী করচে। ও এখানে আছে অনেকদিন, লেখাপড়া শেখেনি, গরীবের ছেলে, ওই কাজই করে।

একটু পরে কলকাতার ট্রেন এল—আমি সারাপথ কেবল ভাবছিলুম এই ক'দিনের কথা, আজ সারাদিনের কথা। খুকু কতবার এল, সেকথা কেবলই শুক্রতারার দিকে চেয়ে ভাবি, ওখানেও কি এমন বনশ্যাম পল্লী আছে, তার ধারে ছোট্ট গ্রাম্য নদী বয়ে যাচ্ছে, কত মাধবী রাত্রে, কত বর্ষণমুখর আষাঢ় প্রভাতে, কত বসন্তের দিনে গাছে গাছে প্রথম মুকুল আবির্ভূত হবার সময়ে, ওদের দেশেও চোখে চোখে লোকে কত কথা বলে, কত স্নিগ্ধ মধুর ভাব ও বাণীর বিনিময়। শুক্রতারা নাকি শুধুই বরফের দেশ, সাত হাজার ফুট উঁচু হয়ে গ্লেসিয়ার বরফের স্তর জমে আছে গ্রহের ওপরে।

ভাবতে ভাবতে ট্রেন এসে দাঁড়াল দমদমা গোরাবাজারে। অপূর্ব্ব সরস্বতীপূজার ছুটি শেষ হল। অনেকদিন মনে থাকবে এদিনগুলোর কথা।

সেদিন চন্দননগরে গিয়েছিলুম সাহিত্য-সম্মেলনে। এখান থেকে মোটরে সজনীদের সঙ্গে গেলুম। উত্তরপাড়া, বালি, কোন্নগর প্রভৃতি শহরের মধ্যে দিয়ে—গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে পথ। অনেকদিন এপথে যাওয়া হয়নি, সেই অনেকদিন আগে একবার শ্রীরামপুরে গিয়েছিলুম মোটরবাসে এপথে। সভামণ্ডপে অনেকের সঙ্গে দেখা হল, নীহার রায় বিলাত থেকে ফিরেচে। সুনীতিবাবু বল্লেন, সেদিন কনভোকেশনের দিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনাকে খুঁজলুম, আর দেখা পেলাম না। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটটার কাছে কনভোকেশনের দিনে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর আমি তাঁকে হারিয়ে ফেললুম। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সভার উদ্বোধন করেই চলে গেলেন। আমি গেলুম আহার করতে। তারপর রবীন্দ্রনাথের বোটে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি অমল হোম, নীহার রায় সেখানে বসে। বাগান সম্বন্ধে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিবাবুর। সার যদুনাথ সরকার এলেন বিকেলের দিকে। রবীন্দ্রনাথের বোটটা বড় চমৎকার। মেঘ করেচে আকাশে।

ও-পারের মেঘে-ভরা আকাশটা বেশ দেখা যাচ্ছিল। অনেকদূরের একটা গ্রাম এই সান্ধ্য আকাশের তলায় কেমন দেখাচ্ছে! ওখান থেকে আমরা মতিলাল রায়ের প্রবর্ত্তক-সঙ্গে গেলুম। ফাদার দোঁতেন আমাদের সঙ্গে মিশল এসে সজনীদের গাড়িতে। ফাদার দোঁতেন জনৈক পাদ্রী, কেবল বাংলা জানে। সন্ধ্যার পরে আমরা আবার বালি, শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়ার মধ্যে দিয়ে কলকাতায় ফিরি।

আজ মাঘীপূর্ণিমা। টালিগঞ্জের খাল পার হয়ে সেই যে সুশীলেশ্বরী আশ্রমে আর বছর গিয়েছিলুম, এবারও সেখানে গেলুম। গাছে গাছে আমের বউল হয়েচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে জামতলায়, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ পথে, কোকিল ডাকচে। আর বছরের সেই ইন্দুদিদি আছেন, তিনি ঘরের মধ্যে বসিয়ে বাড়ির ছেলের মত যত্ন করে খিচুড়ি প্রসাদ খাওয়ালেন। বহু মেয়ের ভিড়। কলকাতার উপকণ্ঠে এই নিভৃত পাড়া-গাঁয়ের দেবালয়টি আমার বেশ লাগল।

বসন্তের প্রথম দিনগুলিতে আকাশ খররৌদ্র, নতুন ফোটা ফুলের দল মনে কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ দেবার আশা দেয়, বিশেষ করে এই নীল আকাশ। সেদিন দুপুরে খয়রামারির মাঠে একা বসে বসে বসন্ত-দুপুরের নীল আকাশ আর খর-রৌদ্র ভোগ করছিলুম। মাঠের মধ্যে ফুল-ফোটা শিমুলগাছগুলো সমস্ত পটভূমিকে এমন একটা শ্রী দান করে, তা আর কোন গাছ পারে না, খানিকটা পারে শীতকালের ছোট এড়াঞ্চির ফুল। আমার মনে হয় ওরা গ্রাম্য প্রকৃতির ঘরোয়া ভাবটা কাটিয়ে বৃহত্তর পৃথিবীর বৃহত্তর ভূমিশ্রীর সঙ্গে ওকে এক করিয়ে দেয়—মনে এনে দেয় আফ্রিকার ট্রপিক্যাল অরণ্যের কথা, দক্ষিণ আমেরিকার আধ-মরু আধ-জঙ্গলে ভরা জায়গার কথা—নানা বিরাট, জনহীন, বহুবিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক রাজ্যের ছবি। ওতেই এত ভাল লাগে দিগন্ত রেখার রাঙা ফুলফোটা শিমুল গাছ, অথবা অর্দ্ধ-শুষ্ক খড়ের মাঠে ছোটখাটো ঝোপের মধ্যে থেকে একা উঠেছে একটা বড় শিমুল গাছ—তবে শেষেরটা ভারী অদ্ভুত। মাঠে যদি অমন দেখি, তবে সেখানে বসে সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি। মানুষের মন বড় অদ্ভুত জিনিস। লোকে মুখে যে কথাই বলুক, বা চিঠিতে যে কথাই যাকে লিখুক, তার মন সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। মুখের কথায় আর মনের কথায় এই জন্যেই মিল প্রায় হয় না।

হরিনাভি স্কুলের ছেলেরা ওদের re-unionএ এসেছিল বলতে, ওদিকে মণিবাবুর বাড়িও নিমন্ত্রণ ছিল, দুই কারণে এদিন রাজপুর স্টেশনে নেমে হরিনাভি গেলাম। বসন্তে গ্রাম্য-শোভা দেখাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য। তাই খররৌদ্র-দুপুরে বেগুন-দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাড়ার মধ্য দিয়ে যে পথটা গিয়ে হরিনাভি স্কুলের কাছে মিশল, ওই পথটা দিয়ে গেলুম নেমে। খুব আম্র-মুকুলের সৌরভ, লেবু ফুলের গন্ধ, ঘেঁটুবনের শোভা, কোকিলের ডাক, মাথার ওপর দুপুরের রোদ ঠিকরে পড়া নীল আকাশ। আপনমনে যাচ্চি, কত কালের পুরানো পথ, কতবার এ পথ দিয়ে এসেচি গিয়েচি, যখন হরিনাভি স্কুলে মাস্টারি করতুম। ফণিবাবুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ সেরে স্কুলে এলুম। প্রিয়নাথ ব্রহ্মচারী আমাদের বাল্যকালে স্কুল ইনস্পেক্টর ছিলেন, তাঁকে দেখলুম অনেক কাল পরে। স্কুলের ওদিকের আকাশটা আমার তখন-তখন বড় প্রিয় ছিল, আর পাঁচিলের ওদিকের গাছপালা, সভা ছেড়ে আমি তাই দেখতে উঠে গেলাম। তারপর ভোম্বলের সঙ্গে বেরিয়ে বৈকালের ছায়ায় একটা ছায়াভরা পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা মাঠের ধারে এসে বসলুম। সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছে, দুজনে বসে পুরোনো দিনের গল্প কতই করি। ওখান থেকে উঠে আরও কিছুদূরে এসে একটা

পুরোনো ভাঙা দোলমঞ্চের কার্নিসের ওপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসে থাকি। দোল-মঞ্চটার চারিধারে ভাঙা মন্দির, পাড়ার মধ্যে বসে চারিদিকেই আমবাগান, তার তলায় খুব ঘেঁটুফুল ফুটেচে, একধারে একটা কামিনী ফুলের ঝাড়। নানা ফুলের সম্মিলিত সৌরভে সন্ধ্যার বাতাস ভরপুর। হুতুম-পেঁচা ডাকচে প্রাচীন গাছের কোটরে। দু-একটা নক্ষত্র উঠেচে আমবনের ওপরে আকাশে। অন্ধকার হয়ে গেল। একটা পুকুরের ধারে এসেও খানিকটা বসি।

কাল সন্ধ্যাবেলা নীরদবাবুর বাড়ী গিয়েছিলুম দুপুরে, প্রমোদবাবু অনেক দিন পরে কলকাতায় এসেচে। অনেক গল্পগুজব করলুম। একদিন হিজলী যাওয়ার কথাও হল। ওখান থেকে পশুপতিবাবুকে ফোন্ করে জানলুম দিলীপ রায় কলকাতা এসেছে এবং আজ থিয়েটার রোডে ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বাড়ি সন্ধ্যায় গান হবে। হেমেনদা এলেন তাঁর মেয়েদের নিয়ে। ওদেরই মোটরে ওদের সঙ্গে প্রতাপ মজুমদারের বাড়ি গেলুম। দিলীপের সঙ্গেও দেখা গেটের কাছেই। ওর সঙ্গে কখনও চাক্ষুষ আলাপ হয়নি, যদিও চিঠিপত্রে আজ আট-ন' বছরের আলাপ। নাম শুনে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরল, কি চমৎকার উদার স্বভাব দিলীপের! বড় ভালো লাগে ওকে। বহু বিশিষ্ট নরনারী এসেচেন দিলীপের গান শুনতে। আজ আট-ন' বছর পরে দিলীপ কলকাতায় এল। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, জীবনময় রায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, শচীন্দ্রদেব বর্ম্মণ, উমা মৈত্র, 'পরিচয়' কাগজের দল—অনেককেই দেখলুম। কেবল মণি বোস্‌কে পাওয়া গেল না। আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের কৃষ্ণ-বিষয়ক গানটি আমার সকলের চেয়ে ভাল লাগল। আসল গানটা হিন্দীতে ছিল, দিলীপ বাংলাতে অনুবাদ করেচে। কি চমৎকার গাইচে দিলীপ আজকাল! বাংলা গানের অমন ঢং কোথাও আর কখনও শুনিনি।

কাল দিনটা খুব ছুটোছুটি গিয়েচে। চারুবাবু হাইকোর্টের জজ হয়েচেন বলে তাঁকে আমাদের স্কুল থেকে অভিনন্দন দেওয়া হল। কালই আবার দিন বুঝে ইউনিভার্সিটিতে Examiners' meeting—স্কুলে ফণিবাবু এসেছিলেন, আমাদের স্কুল ছেড়ে গিয়ে পর্য্যন্ত আসেননি। তাঁর সঙ্গে গল্প করে চলে এলুম ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে মণি বোস, প্রমথ বিশী, জসীমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, মনোজ বসু, বারীন্দ্র ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জনবাবু সকলের সঙ্গে দেখা। সুনীতিবাবু প্রধান পরীক্ষক এবারও। ওখানকার কাজ শেষ করে সুধীরবাবুদের বইয়ের দোকানে সবাই মিলে গিয়ে খানিকটা আড্ডা দিলাম। তারপর আবার এলুম স্কুলে। চারুবাবুর অভি-নন্দন সভা তখন জোর চলচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত আমরা ছিলুম। তারপর এক মাস্টারমশাই আর আমি এসে সেন্ট জেম্স্ স্কোয়ারে একখানা বেঞ্চের ওপর বসে অনেক পুরোনো কথার আলোচনা করলুম। রসিদ কি করে আমাদের অনিষ্ট করতে চেয়েছিল। ক্লাজির সাহেবকে আমরা কেমন সাবধান করে দিয়েছিলুম এই সব কথা।

ইস্টারের ছুটিতে বারাকপুরে কাটাইনি অনেকদিন। এবার গিয়েছিলুম। আমার যাওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঘেঁটুফুল দেখা। প্রথম দেখলুম বনগাঁয়ের খয়রামারির মাঠে—কি অজস্র ঘেঁটুবন সেখানে। এর আগের সপ্তাহেও যে তিনদিন ছুটি ছিল, তাতেও বনগাঁ গিয়ে রোজ বিকেলে রাজনগর ও চাঁপাবেড়ের মাঠে যেতুম বেড়াতে। ফিরবার পথে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় একটি ঘেঁটুবনের কাছে বসে থাকতুম। পশ্চিম আকাশে শুকতারা জ্বল্ জ্বল্ করত, তেতো তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধ। পাখী ডাকত, কোকিল ও পাপিয়া। বৌ-কথাক'র এখনও আমদানি হয়নি। বারাকপুরে ঘেঁটুবন

কোথাও তেমন নেই, কেবল আছে সলতেখাগী আমতলায়, বরোজপোতার ডোবার গায়ে আর সাজিতলার পথে। সকলের চেয়ে বেশী পেলুম আসবার সময়ে চালকী মুসলমান পাড়ার ওই পথটায়।

ক'দিন চমৎকার কেটেচে। অবিশ্যি ম্যাট্রিকের কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকার দরুন বড় কোথাও বেরুতে পারতুম না। একদিন গোপালনগর হাটে গিয়েছিলুম, সঙ্গে ছিল জগো, গুটকে ও জীবু। ও পথেও কিছু কিছু ঘেঁটুবন আছে বড় আমবাগানের কাছে। বৈকালে প্রায় কুঠীর মাঠে বেড়াতে যেতুম বেলা পড়ে গেলে। চাঁদ উঠবার সময়ে নদীর ধারে মাঠে একা একা কত রাত পর্য্যন্ত বসে থাকতুম। জ্যোৎস্নায় নদীজলে নামতুম, স্নান করে আলোছায়ার জালবোনা পথে মেয়েদের পিঠে দেওয়ার ঝাঁড়া গাছের তলাটি দিয়ে বাড়ি ফিরতুম। দুপুরে ও বিকেলে কত কি গন্ধ দুধারের মাঠে। রোদপোড়া মাটির গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, শিমুলের গন্ধ, শুকনো পাতালতার গন্ধ, টাটকা-কাটা কাঠের গন্ধ—খয়রামারির মাঠে বনমল্লিকার ঘন সুগন্ধ—প্রভৃতির নানা সুবাসে মন ভরে ওঠে।

কাল মনু রায়দের গাড়িতে বারাকপুর থেকে বনগাঁ ফিরলুম। রাত্রের ট্রেনে কলকাতা।

চৈত্রসংক্রান্তির দিন গিয়েছিলুম বারাকপুরে। একদিন চাঁপাবেড়ের মাঠে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বসেছিলুম, তারপর এসে ফুটবল খেলার মাঠটাতে বসলুম। দুপুরবেলা বারাকপুর গিয়ে পেঁছিই। ঝন্ ঝন্ করচে রোদ। খুকুরা ঘুমুচ্ছিল। ওদের ওঠালুম, তারপর অনেকক্ষণ বসে গল্প করি। ফণিবাবু ও যতীনবাবু গাড়ি করে গেল আমাদের গাঁ দেখতে। তাদের ঘুরিয়ে নিয়ে এলুম কুঠীর মাঠ।

এবার শিমুলের গন্ধ ভাল লেগেচে। ঘেঁটুফুল এখনও আছে—তবে খুব কমে গিয়েচে। কোন কোন বনে কিন্তু নতুন ফুটেচে তাও দেখতে পেলুম।

কাল রাত্রে হেমেন রায়ের বাড়ি দিলীপ রায়ের গান শোনার নিমন্ত্রণ ছিল, তাই আমরা অনেকে গিয়েছিলুম। গণপতিবাবু ও নীরদবাবুরাও ছিলেন। হেমেনদা অনুযোগ করলেন, মঙ্গলবারে পেনিটির বাগানবাড়িতে আমরা তাঁকে কেন নিয়ে গেলুম না! দিলীপ আসতে বড় দেরি করল। এল যখন প্রায় রাত ন'টা। বড় সুন্দর লাগল আব্বাস তায়েবজীর মেয়ের সেই হিন্দীগানের অনুবাদটা—দিলীপের মুখে সেদিন যেটা থিয়েটার রোডে শুনেছিলুম। কাল ওর মেজাজ আরও ভাল ছিল, কি চমৎকারই গাইলে!

কলকাতায় কিন্তু সব সময়ই থাকা আমার বড় খারাপ লাগচে। চারিদিকে দেওয়াল তুলে এখানে মনে প্রসারতা ও আনন্দ বন্ধ করে দেয়। সব সময়েই কোন না কোন ঘরের মধ্যে আছি, হয় স্কুল, নয় ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, নয় মেস, নয় কোন বন্ধুর বাড়ি, নয়তো সিনেমা। এত ঘরের মধ্যে থাকতে পারিনে, দম বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয় এতে। সামনে গ্রীষ্মের ছুটি আসচে—এই যা একটা আনন্দের কথা।

কাল কাগজের বোঝা সুনীতিবাবুর বাড়ি গিয়ে নামিয়ে চলে গেলুম দক্ষিণাবাবুর বাড়ি। হেঁটেই গেলুম। মনে ভারী স্ফূর্ত্তি—কাগজগুলো দেখতে সত্যিই এই দেড় মাস কি কষ্টই না গেছে—আর এই রুদ্দুরে। ফিরবার সময়ে আলিপুর হয়ে বাসায় ফিরি।

এইমাত্র পানিতর থেকে ফিরে এলুম। প্রসাদের বৌ-ভাত গেল কাল। আজ

সকালে আমি কিরণবাবুদের সঙ্গে রওনা হয়েছিলুম। কিছুদূর নৌকো আসতে না আসতেই এল খুব মেঘ, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঝড়। আমরা নেমে ইটিণ্ডার স্কুলঘরে আশ্রয় নিলুম। কিরণবাবুর মেয়েদের ধরে নামালুম একে একে। তারপর বৃষ্টি থামলে ওখান থেকে বার হয়ে এসে নৌকোয় বসিরহাট পেঁৗছেই ট্রেনখানা পাওয়া গেল। পানিতবের খালের ঘাট থেকে নৌকো চড়ে অনেকদিন আসিনি।

ক'দিন বেশ আনন্দে কাটিয়েছি। বুধবার দিন গিয়েছিলুম সকালের ট্রেনে। নৌকো এসেছিল ঘাটে। বাড়ি পেঁৗছে দেখি আন্নাদিদি ইত্যাদি এসেচে। সেই সন্ধ্যাবেলা পিসীমা ও সুশীল পিসেমশায় এলেন, আমি তখন নদীর ধারে বসে আছি, সঙ্গে পানিতরের কয়েকটি ছেলে। প্রথম প্রথম যখন পানিতর আসতুম, তখন এসব ছেলে জন্মায়নি। রাত্রে দুই ঘরের মধ্যবর্ত্তী চাতালে বসে পিসীমা, হেনা দিদি ওদের সঙ্গে গল্প ও আড্ডা। প্রসাদ বসে বসে গ্রামোফোন বাজাতে লাগল। অনেক রাত্রে ছাদের ওপর শুই—কারণ কোথাও শোবার জায়গা নেই।

কি বিশ্রী বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে কাল থেকে! কাল সুপ্রভার ওখানে গিয়ে শুনি সে তখন নেই। হাতে কোন কাজ ছিল না। এসে কাউন্সিল হাউসের সিঁড়িতে বসে রইলুম। কিছু ভাল লাগে না—অন্যমনস্ক মন। তখন স্থির করলুম শিলং থেকে কাল সকালেই চলে যাব। অথচ কালই তো মোটে এসেচি—আর তার ওপর এই বিশ্রী আকাশ। গরম নেই তাই কি? এর চেয়ে গরম ঢের ভালো ছিল যদি রুদ্দুর উঠত। যখনকার যা, তাই লাগে ভালো। সুপ্রভাকে চিঠি দেব বলে পোস্টাপিসে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পোস্টমাস্টার আসেই না। একটা লোক দরজির কাজ করচে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি বসে। এমন সময় দেখি আমার পুরোনো ক্লাসফ্রেণ্ড্ মনোরঞ্জন যাচ্ছে—তার সঙ্গে কাল সন্ধ্যায় ফার্মেসিতে সাক্ষাৎ হয়েছিল—আমার সঙ্গে দেখা হয়ে ও খুব খুশিই হল। কিন্তু আমার মন এই মেঘলায় যেন কিছুতেই ঠিক হয় না! পোস্টাপিস্ থেকে ফিরে শিলং ডেয়ারিতে দুধ খেতে গেলুম। বেশ ভাল দুধ দেয়, পরিষ্কার ঘরটা। জেল রোড আর পুলিস বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে মেঘাচ্ছন্ন লুম্ শিলং-এর দিকে চেয়ে ভাবলুম আমাদের গ্রামে এতক্ষণ রোদে তেতে উঠেচে চারিদিক। মাঠে সোঁদালি ফুল ফুটেচে, ইছামতী নদীতে এই গরমে নেয়ে খুব তৃপ্তি হবে। তীব্র গরম দূর ক'রে হঠাৎ বেলা তিনটের সময় কালবৈশাখীর মেঘ উঠবে, ঝড় শুরু হবে, গরম পড়ে যাবে, সবাই আম কুড়ুতে দৌড়ুবে।

এই এখন বসে লিখ্চি, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি শুরু হয়েচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আমার ঘরের দরজা দিয়ে দূরে পাহাড়ের চূড়া, মেঘে ঢাকা কয়েকটি পাইন গাছ সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে, হোটেলের চাকর ৩নং ও ৪নং ঘরের বাবুদের জন্যে গরম জলের বন্দোবস্ত করচে, জোড়হাটে বাড়ি এক আসামী ভদ্রলোক আমার সঙ্গে গল্প করচেন। কি বিশ্রী বৃষ্টি! এখানে বসে বৌদ্রালোকিত বাংলা দেশ, তার মাঠ, কুঠীর মাঠে বিকেলের ছায়ায় সোঁদালি ফুলের মেলা, সারাদিনের গরমের পরে জ্যোৎস্নারাত্রে ইছামতীর স্নিগ্ধ জলে একা নিৰ্জ্জন ঘাটে নাইতে নামা, খুকুর আস্তে আস্তে আসা ওদের বাড়ির বেড়ার পাশ দিয়ে—এসব স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। বৃষ্টি জোরেই নামল—শীত বেশ। আমাদের দেশের অগ্রহায়ণ মাসের মত শীত। কলকাতাও এর চেয়ে ঢের ভালো, সেখানে দুপুর রোদে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী যাওয়া চল্‌ত একমাস মর্ণিং স্কুলের সময়। বৌঠাকরুণদের বাড়িতে চা পান, কমল সরকারের গান—সেও যেন স্বপ্নের মত মনে হয়। কাল সন্ধ্যায় একবার ওয়ার্ড লেকে বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেই ট্রিফার্ন দুটো

দেখলুম। খাসিয়া মেয়েরা বেড়াতে এসেচে। ওখানে দাঁড়িয়ে কাল কেবলই মনে হয়েছে সুপ্রভা এখানে নেই। একবার মনে হল, সেদিন যে পানিতরে বেশ ক'দিন কাটিয়ে এসেছিলুম সেকথা। সেই চাঁদা-কাটার বন, সন্ধ্যায় একটা তারা উঠল। তাই নিয়ে ওখানকার ছেলেদের সঙ্গে সেই নক্ষত্রজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা।

বৃষ্টি আরম্ভ হয়েচে একঘেয়ে। থামবার নাম নেই। এ যে শ্রাবণ মাস। গরম আর সূর্য্যের আলোর জন্যে মন হাঁপাচ্ছে। লাইউমক্রাতে সুনীলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলেও হত—কিন্তু সুপ্রভা না থাকাতে আমার কোন কাজে উৎসাহ নেই। কে বেরোয় এই বৃষ্টির মধ্যে? ভেবেছিলুম একবার শিলং পিক্-এ উঠব—তাও গেলাম না। মজা এই যে এখানে এতগুলো লোক এসেচে হোটেলে—সবাই কেবল বসে বসে খাচ্চে আর শরীর সারাচ্চে—কোন কিছু দেখবার উৎসাহ নেই ওদের। খাসিয়া ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বড় সাহেবী-ভাবাপন্ন হয়েচে। ওরা সাহেবদের ধরনে হাত নেড়ে আনন্দ জানায়—কাল সনৎ কুটিরের সাম্‌নে এক খাসিয়া ছোক্‌রা তার বন্ধুকে বল্লে—Cheerio! কেন বাবু, তোদের মাতৃভাষায় কোন কথা নেই? গির্জ্জা থেকে কাল রবিবার সন্ধ্যার সময় অনেকগুলো খাসিয়া মেয়েপুরুষ ফিরছিল। নিজের ধর্ম্মও এরা ছেড়েচে।

এই শীত আর বৃষ্টির মধ্যে নাইবার উৎসাহ হচ্চে না। জোড়হাটের ভদ্রলোকটি তেল মাখচেন। আমায় বল্লেন, নাইবেন না? বল্লাম—মাথাটা ধোব মাত্র। আজ এখন চলে যাব—বড্ড ঠাণ্ডা লাগবে সারাদিন।

Rain, Rain, go to Spain—কি একঘেয়ে পাইন বন আর বৃষ্টি, সূর্য্যের আলো নইলে সুন্দর বিকেলের ছায়া নামে না, পাখী ডাকে না, ফুলের সৌন্দর্য্য থাকে না-- একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দে মন খারাপ হয়ে যাচ্চে। দূরের পাইনবনাবৃত পাহাড়ের চূড়াটা বৃষ্টিতে অপূর্ব্ব হয়ে উঠেচে।

এখানে এসেচি অনেকদিন, শিলং থেকে ফিরেই। কিন্তু এতদিন লিখতে পারিনি। এসেই প্রথমে একদিন পায়ে হেঁটে গিয়েছিলুম বাগানগাঁয়ে পিসীমার বাড়ি। কাঁচিকাটার খেয়া পার হয়ে সেদিন গেলুম গাড়া-পোতার বাজারে, গিয়ে একটা দোকানে খানিকটা বসে রইলুম, কারণ সে সময়টা বড় বৃষ্টি এল। তারপর চলে গেলুম পাট্‌শিম্‌লে। সন্ধ্যার আগে বাগানগাঁ। ফিরবার দিন খুব বেলা থাকতেই মোল্লাহাটির খেয়া ঘাটে এসে পেঁাছে গেলাম। জামদা'র বাঁওড় পার হলুম দড়াটানায় খেয়ায়। পার হয়েই—এপারটা বেশ ছায়াভরা চমৎকার জায়গা—খানিকক্ষণ বসে তারপরে রওনা হই। সন্ধ্যার আগে এসে বাড়ি পেঁাছে গেলুম। একটা বটগাছের তলায় অনেকক্ষণ বসেছিলুম মোল্লাহাটির ওপারে—সেটা বড় ভালো লেগেছিল।

দিন বেশ কাট্‌চে। গোপালনগরের বারোয়ারি দেখচি প্রতি বৎসরের মত—কাল রাত্রেও হয়ে গেল। কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেচি। একদিন খিনুদের ওখানেও গিয়েছিলুম।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এবার যেন বেশীদিন এখানে ভাল লাগচে না। মন উড়ু উড়ু করচে, কেন তা কি জানি। জীবন এখানে অনেকটা একঘেয়ে, সেইজন্য কি? কিন্তু নির্ম্মলতা ও প্রাকৃতিক শোভাসৌন্দর্য্যে এর তুলনা নেই বলেই তো এখানে আসা। এবার সেটাও যেন ভাল লাগচে না অন্য অন্য বছরের মত—তার একটা প্রধান কারণ আমি বুঝতে পেরেচি। কলকাতায় যে কর্ম্মবহুল জীবন কাটিয়ে এসেচি এবার, তার তুলনায় এখানকার অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রা মনকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে।

আমি মাঠের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। তবে মোটে সেদিন কলকাতা থেকে এসেচি বলে এই রকম লাগচে—দীর্ঘদিন কাটালে অভ্যস্ত হয়ে যাবে এসব। কথা বলবার লোকের অভাব সকলের চেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে এখানে। শ্যামাচরণদা'র ছেলেটি সেদিন মারা গেল, আমরা সবাই যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলুম তাকে বাঁচাবার। সেজন্যেও মনে একটা কষ্ট আছে।

বিকেলের দিকে কুঠির মাঠে বেড়াতে গেলুম। আজ খুব বৃষ্টি হয়েছিল দুপুরে। তাই পথে একটু বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল—এত ফুল এত গাছ-পালাও কুঠির মাঠে! সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। এখান থেকে আরম্ভ করে বাগানটা পর্য্যন্ত সমস্ত জায়গাটাই একটা প্রকাণ্ড বড় পার্ক। কত বিচিত্র লতাবৃক্ষগুল্মের সমাবেশ, কত বিচিত্র বন্য-ফুলের সমারোহ—কত কি পাখীর ডাক, বাঁশগাছের সারি, প্রাচীন বট-অশ্বত্থ-সবই সুন্দর। মনটা ভার ছিল, একটা ছোট বাব্‌লাগাছের গুঁড়ির ওপর গিয়ে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। আমার চারিপাশে সোঁদালি ফুল ঝুলচে, একদিকের গাছপালার ফাঁকে কি সুন্দর ময়ূরকণ্ঠি রংয়ের নীল আকাশ, বসে কত কী ভাবলুম। এই যে বিরাট বিশ্ব-চরাচর, এতে কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নীহারিকা-রাজি, কত Globuler cluster, কত নাক্ষত্রিক বিশ্ব, এদের মধ্যে কত আমাদের মত প্রাণী রয়েচে। Jeans-এর দল যাই বলুন, আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে শুধু আমাদের এই পৃথিবীতেই বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, আর কোথাও নেই। তা যদি থাকে, ধরেই নেওয়া যাক্, তবে তাদের মধ্যে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে—আজ আমি তাদের দলের একজন। দুঃখে তাদের সঙ্গে আমি এক হয়ে গিয়েছি।

সকালবেলা কি বিশ্রী বর্ষা নেমেছে। আমার ঘরের বাইরে বড় বড় পাতাওয়ালা গোঁড়ালেবুর গাছটাতে থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটেচে। মনটা ভাল না, বসে বসে লিখছিলুম বাইরে বসে, হঠাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আসাতে ঘরের মধ্যে এসে বসেচি। ঝিলবিলের দিকে জলের তোড় ছুটচে কলকল শব্দে। ন'দিদি ও বড় খুড়ীমা ওদের ভূতোতলায় আম কুড়িয়ে বেড়াচ্চে জলে ভিজে। খুকুকে বড় একটা দেখা যাচ্ছে না আমতলায়।

বিকেলে মেঘ-থম্‌কানো আকাশের তলা দিয়ে বেড়াতে গেলুম সুন্দরপুরে প্রমথ ঘোষের বাড়ি। সারা পথটা আকাশে মেঘের কি শোভা! কত পাহাড়পর্ব্বত, আকাশের কি চোখ-জুড়ানো অদ্ভুত নীল রং! নীচে বর্ষাসতেজ শ্যামল গাছপালা, নতুন আউশ ধানের কাঁচ জাওলা বেরিয়েচে মাঠে মাঠে, মরাগাঙের ধারে, বাঁওড়ের ওপারে! আষাঢ় মাসে এদিকে প্রকৃতি যে রূপ পরিগ্রহ করে, তার তুলনা কোথাও বুঝি নেই। শিলং-এর পাইন বন এর তুলনায় নিতান্ত একঘেয়ে। জ্যোৎস্না বেশ যখন ফুটেচে, তখন নদীর জলে এসে নামলুম। জ্যোৎস্না চিকচিক্ করছে জলে, চাঁদ হাজার টুকরো হয়ে জলের মধ্যে খেলা করচে—এখনও নদীপারে বনে কোথায় বৌ-কথা-ক' ডাকচে, নদীর ধারের সোঁদালি গাছগুলোতে এখনও ফুলের ঝাড় ঝরে পড়েনি। কত গাছ, কত লতা, কত ফুল, কত পাখীর খেলা, আকাশে রঙের মেলা, কি ঘন সবুজ চারিধার। নক্ষত্র চোখে পড়ে না আকাশে, হালকা মেঘের পরদার আড়ালে দ্বাদশীর চাঁদখানি মাত্র দেখা যাচ্চে।

এতদিন পরে আবার বারাকপুর বড় ভাল লাগচে। মানুষ এখানে তেমন নেই

বটে কিন্তু প্রকৃতি এখানে অপূর্ব্ব লীলাময়ী। প্রকৃতিকে নিয়ে থাকতে পার তো এমন জায়গা আর নেই। কলকাতার কাজ আর মানুষ—এখানকার প্রকৃতি, এই দুইয়ের সম্মিলন যদি সম্ভব হত! রোজ কাজকর্ম্ম সেরে কলকাতা থেকে দ্রুতগামী মোটরে বেলা ৫টার সময় যদি বেলডাঙার পুলের মুখে ফিরে আসা সম্ভব হত এই আষাঢ় মাসের দীর্ঘ দিনের শেষে, জীবনটা সত্যি উপভোগ করতে পারতুম। নিজের একখানা এরোপ্লেন থাকলে চমৎকার হত। সমস্তদিনের হৈ-চৈ ও কর্ম্মক্লান্তির পরে শান্ত অপরাহ্নে বর্ষণক্ষান্ত আকাশের তলে কাঁচিকাটার পুলের কাছে মরগাঙের এপারে সবুজ ঘাসভরা মাঠে উড়ি ধানের ক্ষেতের ধারে বসে থাকতে পারতুম—তবে contrast-এর তীক্ষ্ণতায় প্রকৃতিকে ভাল করে বুঝবার সুযোগ হত—একে উপভোগ করতে পারা যেত আরও গভীর ভাবে।

আজ বৈকালের দিকে খুব ঝম্‌ঝম্‌ বর্ষা। আমার একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। সন্ধ্যার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে যেন মনে হল এই আকাশ, রঙীন্‌ মেঘরাজি, সবুজ বাঁশবন—এদের সবটা জড়িয়ে যে বিরাট বিচিত্র বিশ্বপ্রকৃতি, তা হৃদয়হীন নয়। তা ভালবাসে, দয়া করে। দুঃখে সহানুভূতি দেখায়। আজ কোন একটা বিষয়ে সেটা আমার অভিজ্ঞতা ঘটেচে। সে অভিজ্ঞতা সত্যিই অপূর্ব্ব।

আষাঢ় মাসের এ দিনগুলি আমার বড় পরিচিত। বাল্যকাল থেকে চিনে এসেচি এদের। মেঘান্ধকার আকাশ, আর্দ্র বাতাস, বাঁশবনে পিপুললতা ও অনন্ত-মূলের নূতন চারা বার হয়েচে, ওলের চারা বার হয়েচে, যখনই এমন হয়, তখনই আমার গ্রীষ্মের ছুটি ফুরিয়ে যায়, ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। কিন্তু একটা তফাৎ ঘটেচে, আগে এই নবোদগত পিপুলচারার সঙ্গে একটা দুঃখ ও বিরহের অনুভূতি জড়ানো থাকত—এখন আর সেটা হয় না। এখন মনে হয় কলকাতা গেলেই ভাল হয়, অনেকদিন তো দেশে কাটল।

কতবার এই নব বর্ষা, এই আষাঢ় মাস আসবে যাবে। যেমন আমার জীবনে এরা কত বার এসেচে গিয়েচে। কতবার কাঁটাল পাকবে, বাঁশবনে অনন্তমূলের চারা বেরুবে, ফলবিরল আমবাগানে হাজারী জেলে ও হাজু কামারনী আম কুড়িয়ে বেড়াবে ভোরে। এসব সুপরিচিত দৃশ্য আরও কতবার দেখব। আমাদের গ্রামটুকু নিয়ে যে জগৎ, এ দৃশ্য তারই। অন্য কোথাওকার লোকের কাছে এসব হয়তো সম্পূর্ণ অপরিচিত তাও জানি, তারা কখনও পিপুললতাই দেখেনি হয়তো।

তারপর আমি চলে যাব, হাজারী জেলেনী চলে যাবে, আমার সমসাময়িক সকল লোকই চলে যাবে, তখনও এমনি আষাঢ়ের নতুন মেঘ জমবে মাধবপুরের ঘরের ওপরে, আর্দ্র বাঁশবনে এমনি ধারা পিপুলচারা বেরুবে, বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক বিরল হয়ে আসবে বকুলগাছটাতে, গাঙের জলে ঢল নামবে—শুধু আমার এই আবাল্য সুপরিচিত জগৎ তখন আর আমার চৈতন্যের মধ্যে থাকবে না।

সবদিনে মানুষের মনে সমান আনন্দ থাকে না জানি, কিন্তু আজকার দিনের মত আনন্দ আমি কতকাল যে জীবনে পাইনি! প্রথম তো সকালে উঠেই দেখলুম আকাশ ভারী পরিষ্কার—নিজের ঘরের দাওয়ায় খানিকটা বসে মুসলমান মাস্টারটির সঙ্গে গল্প করে বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথে একটু বেড়াতে গেলুম। এমন নীল আকাশ অনেকদিন দেখিনি। জেলেপাড়া ছাড়িয়েই ঐ সরু পথটা দিয়ে যেতে যেতে বাঁশঝাড় থেকে একটা সরু কঞ্চি বেছে নিলাম হাতে নেবার জন্যে। বাঁশের কঞ্চির জন্যে এ

আগ্রহটা আমার চিরকাল সমান রইল সেই বাল্যকাল থেকে। যেতে যেতে আমাদের মাথার ওপরকার নীল আকাশটার দিকে চেয়ে মনে হল আষাঢ় মাসের দিনে আকাশ এত নীল, এত নির্ম্মেঘ, এ সত্যিই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। রোদের কি রং। বাঁওড়ের ওপারের আকাশ নিবিড় বট-অশ্বত্থের আড়ালে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। এই বাঁওড়ের ধারের বটতলার পথটা দিয়ে আজ আঠারো-উনিশ বছর কি তারও বেশী এমনি সকালে হাঁটিনি। বটগাছের একটা ডালে কাল খানিকক্ষণ বসেছিলুম, আজও সে ডালটায় বসব বলে গেলাম, কিন্তু আজ একটু বেলা হয়ে গিয়েচে বলে রোদ এসে পড়েচে সেখানে। একটা বাঁশের মাচা করেচে বটতলায় বাঁওড়ের ধারের দিকে। সেখানে বসে কি আনন্দ! আমায় এমনি উদ্‌ভ্রান্তের মত বসে থাকতে দেখে কিন্তু কেউ কিছু ভাবে না—সবাই খুব ভালবাসে দেখলুম। আমি অনেককে চিনি নে, ওরা আমায় চেনে। একজন কাল বলচে—দাদাবাবু আমাদের দেখ বসে আছেন বটের শেকড়ে। দাদাবাবুর অংখার নেই গা। আজ একজন পথচলতি লোক, তার বাড়ি আরামডাঙায় পরে জানতে পারলুম, আমায় বসে থাকতে দেখে পাশে এসে বসল। বল্লে—বাবু, একটা ব্যারামে বড় কষ্ট পাচ্চি। প্যাটের মধ্যে ভাত খেয়ে উঠলি এমন শূলোয় যে আপন্যাকে কি বলব! কি করি বলুন দিকি বাবু?

সে এমন বিশ্বাস ও নির্ভরতার সঙ্গে প্রশ্ন করলে যেন আমি স্বয়ং ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্ত্তী।

কি করি আমার কোন ওষুধই জানা নেই—তাকে পরামর্শ দিলুম রাণাঘাটে গিয়ে আর্চ্চার সাহেবকে দেখাতে। মিশনারী হাসপাতালে পয়সা-কড়ি লাগবে না। মনে এমন দুঃখ হল, একটু হোমিওপ্যাথি জানলেও এইসব গরীব লোকের উপকার করা যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আমি ওর রোগ সারানোর জন্যে আর কি করতে পারি!

ওখান থেকে উঠে মাঠের মধ্যে গেলাম। এক জায়গায় একটা কি চমৎকার লতাবিতান, ওপরে ডালপালার ছাওয়া, মোটা লতার গুঁড়ি কাঠের মত শক্ত হয়ে তার খুঁটি তৈরী করেচে। ওর মধ্যে বসে একটু পাখীর ডাক শুনলুম, তারপর মাটির মধ্যে এসে বাবলাগাছের মাথার ওপরকার আকাশের অপূর্ব্ব নীল রং দেখে সেখানটায় গামছা পেতে ঘাসের ওপর কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। সে যে কি আনন্দ, তা হয়তো আমি নিজেই কিছুকাল পরে অবিশ্বাস করব, কারণ ওসব অনুভূতি মানুষের চিরকাল একভাবে বজায় তো থাকে না, পরে শুধু স্মৃতিটা থাকে মাত্র। মাথার ওপরকার ঐ ময়ূরকণ্ঠ রংয়ের আকাশ, ঘাসের নীচে এই বিচরণশীল পোকামাকড়, ছোট ছোট ঘাসের ফুল, ঐ উড়ন্ত চিল, বটের ডালে লুকানো ঐ বৌ-কথা-ক' পাখীর ডাক, কত বিচিত্র বনলতা, বনফুল—ঐ সূর্য্য থেকে পাচ্চে এদের জীবন, রং ও আলো। কিন্তু এই সবের পিছনে, সূর্য্যেরও পিছনে, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীর সব রূপ-রস-গন্ধের পিছনে যে বিরাট অতিমানস শক্তির লীলা—তার কথা কেবলই এমনি দুপুরে নীল আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে ইচ্ছা করে। ভেবে কিছু ঠিক করতে হবে তার কোন মানে নেই, এই ভাবনাতেই আনন্দ। তখন যেন মনে হয় এই বিশ্বের সঙ্গে আমি এক তারে গাঁথা—অদৃশ্য যে লতায় এই সব ফুল নিয়ে মালা গাঁথা হয়েচে, আমি তাদের দল থেকে বাদ পড়িনি, তাদেরই একজন—বিশ্বের সঙ্গে একটা যোগ স্থাপিত হয় মনে মনে।

মনকে এভাবে তৈরী করে নেওয়ার সার্থকতা আছে, কারণ মনই সব, মন যে ভাবে পৃথিবীকে দেখায়, জীবনকে দেখায়—মানুষে সেভাবেই দেখে। মন দুঃখ দেয়,

সুখ দেয়—মনকে তৈরী করে যে না নিতে পেরেচে, তার দুঃখ অসীম!

ঐ লতাবিতানের মধ্যে আজ সকালে অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলুম—ভারী নিভৃত, ছায়াঘন স্থানটি। প্রকৃতি অনেক যত্নে একে যেন নিজের হাতে গড়েচে। কাঠবিড়ালী খেলা করচে, কত কি পাখী ডাকচে, পত্রান্তরাল থেকে একটু একটু রোদ এসে পড়েচে, ঠাণ্ডা মাটিতে বড় চমৎকার ব্যাঙের ছাতা গজিয়েছে, কেয়োঝাঁকা, ষাঁড়া, ডুমুর, কুঁচকাটার লতার সমাবেশে এই ঝোপটা তৈরী—দুপুরের রোদে এই নিস্তব্ধ ঝোপের ছায়ানিবিড় আশ্রয়ে বসে বইপড়া কি লেখা বড় ভাল লাগে।

এবেলা থেকে বর্ষা নেমেচে। ইছামতীর ওপরকার আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। আজ কলকাতায় রওনা হব ভেবেছিলুম—কিন্তু এরকম বাদলা দেখে পিছিয়ে গেলাম।

আজ সারাদিন মনে একটা অপূর্ব্ব আনন্দ—কাল চলে যাব, গ্রীষ্মের ছুটি তো ফুরিয়ে গেল। যা দেখচি, সবই বড় ভাল লাগচে। খুকু বার বার আসচে আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে, নানা ছুতোয় নানা ফাঁকে। সারা দিন আজ ভয়ানক বর্ষা—বৃষ্টির বিরাম নেই একদণ্ড। দুপুরের সময় যে বৃষ্টি নামল, তা ধরল বিকেল চারটের পরে। খানা-ডোবা ভরে গিয়েচে। আমন ধানের মাঠে রোয়ার জল হয়েচে। বিলবিলে তো জলে টইটম্বুর। মেঘমেদুর বিকেলে সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে জলের উপর পা ফেলে ছপ্ ছপ্ শব্দ করতে করতে গেলুম আইনদ্দির বাড়ি—ওর সঙ্গে আমার জীবনের আনন্দময় দিনগুলোর যোগ আছে—যখনই খুব আনন্দ পেয়েচি, তখনই ওর বাড়িতে গিয়ে বসেচি এই ক'বছরের মধ্যে। আজও গেলাম। ওর বাড়ির দাওয়ায় বসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের ঘন সবুজ আউশের ক্ষেত ও প্রাচীন বটের সারির দিকে চোখ রেখে ওর সঙ্গে কত গল্প করলুম। বয়স হয়েচে ৯৮ বছর, কিন্তু আইনদ্দি কখনও শুধু-হাতে বসে থাকে না। আমি যখনই গিয়েচি, তখনই দেখেচি ও কোন না কোনও একটা কাজ নিয়ে আছে—এখন সে একটা তল্‌তা বাঁশের পাশ চাঁচছিল—বল্লে—মাছধরার ঘুনি বুনব।

ওর উঠোনের দক্ষিণ ধারে একটা বাবলার গাছ, তার জিরে জিরে সরু পাতাভরা ডালগুলোর দিকে চেয়ে মনে যে কি আনন্দ পেলাম—তার যেন তুলনা নেই। ওখান থেকে বার হয়ে কাঁচিকাটা পুলের ওপর এসে দাঁড়ালুম—বর্ষাক্লান্ত বৈকালে দিগন্তে মেঘের যে শোভা হয়, ইছামতীর ওপারে, মাধবপুরের চরের মাথায়, বাঁওড়ের শেষ সীমানার দিকে এদের দেখে তুষারমণ্ডিত হিমালয়শৃঙ্গের কথা মনে পড়ে।

ঘোষেদের দোকানে এসে বসেচি। একটা লোক মাথায় একটা পুঁটুলি নিয়ে ঢুকে বল্লে—মুসুরি নেবা?

ওরা বল্লে—নেবো।

এর বদলে কিন্তু চাল দিতে হবে।

ওরা তাতেই রাজী হল।

তারপর সে বসে বসে গল্প করতে লাগল। চৈত্র মাসে আউশ ধানের বীজ ছড়িয়েছিল বলে তার ক্ষেতে ধান এখন খুব বড় বড় হয়েচে। বাড়ি তার খাব্‌রা-পোতায়। খাবার ধান এখন আর ঘরে নেই, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে এখন সে নিঃস্ব, অথচ এগারো জন লোক তার পরিবারে, দু'বেলা বাইশ জন খেতে। সামান্য কিছু মুসুরী ছিল তাই ভরসা। তাই বদলে চাল নিতে এসেচে।

ফিরবার পথে অস্ত-দিগন্তের মেঘস্তূপে অপূর্ব্ব রাঙা রঙ ফুটল, দেখে দেখে

চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করে না।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে প্রায় মাসখানের হল। কলকাতায় এসে পুরোনো হয়ে গেল। এরই মধ্যে একদিন বারাসাত গিয়েছিলুম পশুপতিবাবুদের সংগে, একদিন রাজপুর গিয়েছিলুম। একদিন ডাঃ মহেন্দ্র সরকারের বাড়ি নিমন্ত্রণ ছিল, অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা গভীর বিষয়ে আলোচনা শুনলুম তাঁর মুখে। আমার মন উদ্বিগ্ন হয়েচে আর একবার ইছামতীতে স্নান করবার জন্য। এরই মধ্যে যেন মনে হচ্চে কতকাল এসেচি।

গত শুক্রবার বারাকপুর গিয়েছিলুম। পরিপূর্ণ বর্ষার শোভা অনেকদিন দেখা হয়নি—এবার এই বারাকপুরে থাকব বলে গিয়েছিলুম। ইছামতীর জল ঘোলা হয়ে এসেচে। দুদিনই বাঁওড়ের তীরে বটতলার পথে সকালবেলা বেড়াতে গেলুম—দুদিনই ঘোলা গাঙে খুকুদের সংগে স্নান করলুম। রৌদ্রে নতুন ওঠা কচি ঘাসের ওপর খানিকটা করে শুয়ে ঘাসের সাদা সাদা দুটো ফুল লক্ষ্য করলুম। বটগাছের তলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে আজই সকালে কতক্ষণ বসে রইলুম। বিশেষ করে শনিবার বিকেলে নাদিদির কাছে নতুন বইখানার প্রথম দিকের গোটাকতক অধ্যায় শুনিয়ে যখন ইন্দু মাছ ধরতে বসেছিল তাই দেখতে গেলুম—তখন যেন একটা নতুন দৃশ্য দেখলুম। নকুলের নৌকোতে বেলেডাঙার মাঠে নতুন জায়গায় নেমে নীল আকাশের কোলে রঙীন্ মেঘস্তূপ দেখে মনে হল এমন দৃশ্য ফেলে কেন কলকাতায় পড়ে থাকি।

রানাঘাট হয়ে কলকাতা ফিরলুম বিকেলে। বেশ লেগেচে শ্রাবণ মাসে দেশে গিয়ে। অনেকদিন যাইনি এ সময়। কাল দুপুরের পরে নাদিদিদের দালানে বসে যখন পুষ্পের কথা পড়ে শোনালুম নতুন বই থেকে, খুকু খুবই খুশি। ওদের উঠোনে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল, বল্লে—সব বইতে কেবল তুমি আর আমি, ওই নিয়েই গল্প—এটা নতুন ধরণের হয়েচে।

নকুলের নৌকোয় যখন যাচ্চি, নদীর ধারে এক জায়গায় প্রকাণ্ড একটা বাব্লা-গাছ থেকে কত কি বন্যলতা ঝুলচে, ডাইনে রঙীন্ মেঘস্তূপ, আবার একটা জায়গায় আধভাঙ্গা একটা রামধনু। বেলেডাঙার মাঠে নেমে সবুজ ঘাসের একধারে বড় সুন্দর একটা ঝোপ। এদিকটা কখনও আসিনি। কতক্ষণ মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর শুয়ে রইলুম। মটরলতা তো যেখানে সেখানে—নতুন পাতার সম্ভার নিয়ে দুলচে প্রতি ঝোপের মাথা থেকে—আমার কি জানি কেন ভারী আনন্দ হয় নতুন কচি মটরলতা দেখলে। ওর সংগে যেন কিসের যোগ আছে আমার। আজ সকালে জগো আর গুটুকে যখন কুঠীর মাঠের গাছটাতে পেয়ারা পাড়চে আমি একটা মটরলতার ঝোপের তলায় বসলুম—নতুন এক ধরণের চওড়া পাতা নরম ঘাসের ওপরে। সে এক অপূর্ব্ব অনুভূতি। তার বর্ণনা দেওয়া যায় না—মনের আনন্দই তার চরম প্রকাশ।

আমি ডায়েরীতে অনেক বারই লিখি—"এ আনন্দের তুলনা নেই।" হয়ত একঘেয়ে হয়ে যায় কথাটা, কিন্তু আনন্দটা যে একঘেয়ে হয় না। যে আনন্দ মনকে ভরিয়ে দেয়, তা সব সময়ে, সর্ব্বকালে এক। যখনই পাই, তখনই মনে হয় এ বুঝি নতুন, এমনটা আর কখনও বুঝি হয়নি। সেই নিত্যনূতন চির অক্ষয় আনন্দ, তার কি ভাবে বর্ণনা দেব একমাত্র ঐ কথা ছাড়া যে 'এর আর তুলনা নেই'! জীবন যে বহু আনন্দ-মুহূর্ত্তের সমষ্টি, তাদের পৃথক পৃথক বর্ণনা নেই, তারা চির নবীন, শাশ্বত, অক্ষর, অব্যয়—কাজেই তাদের তুলনা নেই। সত্যিই তো তাদের তুলনা আর কিসের সংগে

দিতে পারি? অন্য অন্য দিনের আনন্দের সঙ্গে? কিন্তু তারা তো তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্য্যবসিত—বর্ত্তমানে যা পাচ্চি, তাই তখন বড়।

এত শীগ্‌গির যে আমায় আবার শিলং আসতে হবে, তা ভাবিনি। কিন্তু সুপ্রভা আসতে লিখলে, আর আমারও একটা সুযোগ উপস্থিত হল আসবার। কাজেই চলে এলুম।

কাল বিকেলে ট্রেনে সময়টা কি চমৎকার কেটেছে! কত নতুন অনুভূতি, কত নতুন চিন্তা। নৈহাটির কাছাকাছি যখন গাড়িখানা এল, তখন মনে হল, এখান থেকে সোজা বারাকপুর কতটুকুই বা আর, এখন দুপুরবেলা, আমাদের বকুলতলায়, বিল-বিলের ধারে ছায়া পড়ে গিয়েচে, খুকু এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েচে, বৃহস্পতিবার আজ গোপালনগরের হাট, সব লোক হাট করতে যাচ্চে, কত গ্রামে বাঁশবনের ছায়ায় ঢাকা কত পল্লীকুটিরে কিশোরী মেয়েরা প্রেমের রঙীন স্বপ্নজাল বুনে ঘুরে বেড়াচ্চে, খুঁটির কাছে বসে চলে যাবার সময় চেয়ে বসে থাকার; নদীর ধারে কত বন-সিমলতার আড়ালে চোরা চাউনি ও হাসির কত ঢেউ—এই সব ছবি মনে আসে। বিকেলে তারা জলে নেমেচে গা ধুতে। পার্ব্বতীপুর এসে এসে যেন সব চেনা পুরোনো হয়ে গিয়েচে। গাড়িতে বেশ জায়গা ছিল। ট্রেনে ঘুমও হল খুব। লালমণিরহাটে নেমে জেলি ও পাগলার খোঁজ করলুম। অত রাত্রে কোথায় পাব?

ভোর হল রঙ্গিয়া জংশনে, এখানেই প্রতিবারে ভোর হয়। আর যখনই এপথে এখানে এসেচি, বৃষ্টিছাড়া দেখিনি কখনও। ভিজে স্যাঁতসেঁতে জলাভূমি আর ফার্ন গাছের বন, কাদাভরা মাটির পথ-ঘাট, কলার ঝাড়, নীচু নীচু খড়ের বাড়ি।

ব্রহ্মপুত্র কূলে কূলে ভরা। কি ঠাণ্ডা জল! জলে নেমে মুখে মাথায় জল দিয়ে তৃপ্তি হল ভারী। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে, মেঘমেদুর আকাশ, ওপারের পাহাড়ে কুয়াসার মত মেঘ জমে রয়েছে।

গৌহাটি-শিলং মোটরবাসে ত্রিপুরার মহারাণীর একদল পরিচারিকা উঠল—তাদের কথাবার্ত্তা বিন্দুবিসর্গও বুঝিনে—মোটর যেমন পাহাড়ের পথে উঠল—অমনি ওরা সবাই সামনের বেঞ্চিতে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল—সবারই নাকি মাথা ঘুরচে। বেশ গরম, নংপোতে এলুম তখনও এতটুকু ঠাণ্ডা নয়, এমন কি শিলংএও নয়। বরপানি নদীতে বর্ষার পরিপূর্ণ যৌবনের জোয়ার এসেচে—এক শিলাখণ্ড থেকে আর এক শিলাখণ্ডে লাফিয়ে আছড়ে পড়ে কি তার উদ্দাম মাতন!

আমার পুরোনো স্নো-ভিউ হোটেলে এসেই উঠলুম। ওদের কর্ত্তার কাছে সেই গোলাপগাছটা তেমনি আছে, থোকা থোকা রাঙা গোলাপ ফুটেচে।

ঝড় মেঘ আর বৃষ্টি শিলংএ। পাইন বনে মেঘ জমে আছে শাশ্বত, আর টিপ-টিপে জল, রৌদ্র দেখলুম না কখনও শিলংএ।

লাবানে যাবার সময় গোটা পথটাতেই বৃষ্টি। আজ আসামের ভূতপূর্ব্ব গবর্নর সার মাইকেল কিনের মৃত্যু উপলক্ষে স্কুল কলেজ আপিস সকালে ছুটি হয়ে গিয়েচে। তাই ভাবলুম সুপ্রভাদের কলেজও নিশ্চয়ই বন্ধ হওয়াতে সে সনৎ কুটিরেই ফিরে এসেচে। ওকে পেলামও তাই। হঠাৎ আমায় দেখে খুব খুশি হল। আমিও বড় আনন্দ পেলাম অনেকদিন পরে ওকে দেখে। ওর দিদির দুই মেয়ে রেবা ও সেবাকেও দেখলুম। কমলা সেনের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকক্ষণ বসে ওদের সঙ্গে গল্প করে সাড়ে ছ'টায় উঠে গবর্নরের বাড়ির পেছন দিয়ে সুশীলবাবুদের বাড়ি Health

Back Cottage-এ গেলুম। সুশীলবাবু তো আমায় দেখে অবাক! আমি কোথা থেকে এলুম শিলংএ! শঙ্কর এল ফুটবল খেলে সন্ধ্যার সময়। সে বড় হয়ে গিয়েচে, আর যেন চেনা যায় না।

লুম্ শিলংএর পাইনবনে মেঘ জমেচে! এই সন্ধ্যায় আমি দূর বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র পল্লীর কথা ভাবচি।

সুপ্রভা বলছিল, কাল আপনি ডাউকি পর্য্যন্ত বেড়িয়ে আসুন। শঙ্করও বল্লে, সে কাল সকালে এখানে আসবে। দেখি কোথায় যাওয়া যায়।

সকালে শঙ্কর এসে ডাকাডাকি করে ঘুম ভাঙালে। তার সঙ্গে ওয়ার্ড লেক্ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়িয়ে মোখ্রা গেলুম ডাউকির মোটর কখন ছাড়ে দেখতে। শুনলুম এ পর্য্যন্ত রিটার্ণ টিকিট দেয় না—সুতরাং চেরাপুঞ্জি রওনা হলাম। আবার সেই আপার শিলংএর রাস্তা! সেই পাইনবন পথে তিন চার রকমের বন্যফুল ফুটে আছে প্রান্তরে, একটা হলুদে, একটা ভায়োলেট, একটা লাল, একটা সাদা। ঠিক যেন মরসুমী ফুলের ক্ষেত। সর্ব্বত্র অজস্র ফুটে রয়েচে—চেরার একটু আগে পর্য্যন্ত। চেরাতে নেই, মুস্মাইতেও নেই। যাবার সময় Gorge-এ খুব মেঘ করেছিল, খানিক-দূর পর্য্যন্ত মনে হল যেন আকাশে এরোপ্লেনে চলেচি। চেরার কাছে অদ্ভুত আকৃতির জঙ্গল আছে—তার প্রত্যেক গাছটাতে অসংখ্য পরগাছা, শেওলা ঝুলচে, ফার্ন হয়ে আছে—কি ঘন কালো জঙ্গলের তলাটা। আনারস কিনে খেলুম চারপয়সা দিয়ে একটা। খাসিয়া দোকানদার কেটে প্লেটে করে দিলে। বেশ মিষ্টি আনারস। একজন ডাক্তার তার ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে বসালেন। তারপর মুস্মাই পর্য্যন্ত গেলুম বাসে। চমৎকার দিন আজ, মুস্মাই-এর পথে নীল আকাশ একটুখানি দেখা গেল। সবাই বল্লে, এত ভাল দিন অনেকদিন হয়নি। মুস্মাই-জলপ্রপাতের এপারে একটা পাথরে কতক্ষণ বসে রইলুম—একধারে সিলেটের সমতলভূমি ঠিক যেন সমুদ্রের মত দেখাচ্চে। একসময়ে তো ওখানে সমুদ্রই ছিল, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পাহাড় ছিল প্রাচীন যুগের সমুদ্রতীর। ঢেউ এসে তাল মারত পাহাড়ের দেওয়ালের গায়ে। চেরা থেকে ফিরবার পথে আবার সেই ফুলের ক্ষেত—মাঠের সর্ব্বত্র, শৈলসানুর সর্ব্বত্র ওই চার রকম ফুলের বাগান। একটা খাসিয়া গ্রামে বাংলা দেশের গোয়ালের মত একখানা অপকৃষ্ট ভাঙা খড়ের ঘরে টুপিপরা ছেলেমেয়ে, ফর্সা মেয়েরা। বেড়ার ফর্গেট্-মি-নটের বাহার দেখে মনে হল এ কোন্ দেশে আছি! চেরা থেকে এসে চা খেয়ে ওয়ার্ড লেকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। খুকু এতক্ষণ ঘোলার গাঙে গা ধুতে নেমেচে। আমাদের দেশে নাটাকাঁটার ফুল ফুটেছে—সে এক দেশ আর এই এক দেশ! অনেককাল আগে এই গোধূলিতে একটা স্মৃতি জড়ানো আছে, পাইনবনের মধ্যে বসে সেটা মনে আনতে বেশ লাগে। সুপ্রভাদের ওখানে গিয়ে দেখি সুপ্রভার বাবা এসেচেন সিলেট থেকে। আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ভারী চমৎকার লোক, এমন সরল, সদানন্দ, অমায়িক স্বভাবের ভদ্রলোক আমি কমই দেখেচি। অনেক-দিন পরে সুপ্রভার ছোট বৌদিদির হাতের তৈরী ভ্যানিলা দেওয়া নারকোলের সন্দেশ খাওয়া গেল।

সন্ধ্যার দেরি নেই। লুম শিলংএর পাইন বনে মেঘ জমেছে। পশ্চিম দিগন্তে কিন্তু অল্প একটু নীল আকাশের আঁচ—মেঘে রং লেগেচে, ওয়ার্ড লোকের ওপারে পূর্বদিকের বহু দূরের আকাশে জমেচে অন্ধকার। কেবল শুনি মোটরের ভেঁপু

কত গাড়ি যে যাচ্চে সামনে দিয়ে। খাসিয়া মেয়েরা গল্প করতে করতে যাচ্ছে। গির্জায় প্রার্থনা হচ্চে, সম্মিলিত ইংরিজী গানের সুর কানে ভেসে আসচে। আমি কাউন্সিল হাউসের সোপানে বসে আছি। কি জানি কেন এই সন্ধ্যায় কেবল আমাদের গাঁয়ের কথা মনে পড়ে। এ যেন কোথায় এসেচি, কতদূরে—সুপ্রভা না থাকলে একটুও ভাল লাগত না। আমরা যখন পৃথিবীকে ভালবাসি বলি—তখন ভেবে দেখিনে, অনেকেই ভালবাসি খুব সংকীর্ণ অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত একটা জায়গা। সেখানকার গাছপালা, নদী, মাটি, লোকজন আমার কাছে বড় আদরের—তাই তাদের পেয়ে ও ভালবেসে মনে হয় এই পৃথিবীকে বড় ভালবাসি। আসলে সেই গ্রাম বা নগরটাই আমার পৃথিবী। এমন কি রোদ বা জ্যোৎস্না সেখানে যত মিষ্টি, অন্য জায়গায় ঠিক ততটা নয়।

আজ সকাল থেকে অত্যন্ত বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছিল, বেলা ১০টায় বৃষ্টি ধরেচে। সুপ্রভাদের হোস্টেলে গিয়ে বল্লুম—আজই চলে যাব! সুপ্রভা যেতে বারণ করলে, তবুও বলে এলুম, না আজই যাব। কিন্তু হোটেলে এসে আর যেতে ইচ্ছে হল না। ভাবলুম, সুপ্রভা বারণ করলে, আজ থেকেই যাই। দুপুরে সুপ্রভার বাবা, সুপ্রভা, বীণা, রেবা দেখি একেবারে আমার ঘরের মধ্যে উপস্থিত—আমায় মোটরে উঠিয়ে দিতে। রেবা চকোলেট ও ফুল এনেচে। ওদের সবাইকে দেখে এত আনন্দ পেলুম। তারপর সকলে মিলে গেলুম সুপ্রভাদের কলেজ ও হোস্টেল দেখতে। নতুন তৈরী বিরাট কাঠের বাড়ি, দেখবার মতন জিনিস বটে। ওখান থেকে বীণাদের বাড়ি গিয়ে চা, তালের ক্ষীর, তালের বড়া, লুচি কতরকম খাবার খেলুম। সুপ্রভার মাকে দেখে বড় কষ্ট হল। আহা, এই বয়সে এই শোক পেয়েছেন, তাতে মেয়েমানুষ, মনকে বোঝানো ওদের পক্ষে খুবই শক্ত। সুপ্রভার বাবাকে যতই দেখচি, ততই মুগ্ধ হচ্চি, তাঁর মনের স্থৈর্য্যে ও প্রসারতায়। তিনি যত সহজে শোক জয় করতে পারচেন, সুপ্রভার মা তা পারচেন না। কাজেই তাঁর মনে কষ্ট হয়।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। চাঁদ উঠেছে মেঘের ফাঁকে, দক্ষিণ বনের মাথায়। একটা সীমাহীন নক্ষত্র মিট্‌মিট্ করচে লুম শিলংএর ওপারের আকাশে। গির্জ্জা থেকে দলে দলে খাসিয়া মেয়ে-পুরুষ উপাসনান্তে বাড়ি ফিরচে। অনেকগুলি খাসিয়া মেয়ের বাঙালীদের ধরনে কাপড় পরা। তাদের দেখাচ্ছে ভালো।

শিলংএ একটা জিনিস নেই। এখানে কোন সৎপ্রসঙ্গের চর্চ্চা দেখলুম না কোথাও। না সাহিত্য, না গান, না অন্য কোন শিল্প। লোকেরা সব চাকুরিবাজ, নয়তো স্বাস্থ্যান্বেষী হাওয়াখোর। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক কিম্ভূতকিমাকার ধরণের জীব। রোগের কথা, পথ্যের কথা, শরীরের উন্নতি কার কতটুকু হয়েছে, এ ছাড়া অন্য বিষয়ে তারা interested নয়। আর এরা প্রায়ই ত্রিকালোত্তীর্ণ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ। এদেরই বড় ইচ্ছা বাঁচবার। যেন তারা বেঁচে দেশে ফিরে গেলে সোনার দেউল ওঠাবে।

পীরতলা জায়গাটা পাইন বনের মধ্যে একটা ভ্যালি। ছোট্ট ভ্যালিটা যদিও, চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট পাইন শ্রেণী, মাঠের মাঝখান দিয়ে একটা পাহাড়ী নদী বয়ে চলেছে, বেশ সুন্দর জায়গাটা। এদিন সকালে লাবানে যাবার পথে একটা উঁচু পাহাড়ী টপ্‌কে পাইন বনের ছায়ায় ছায়ায় সোজা রাস্তাটা দিয়ে যাবার সময় দূরে লাবান হিলের মাথায় ওধারকার পাইন বনগুলো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। মর্নিং গ্লোরি ফুল থোকা থোকা ফুটেছে লোকের বাড়ির বেড়ার গায়ে, মাকড়সার বিচিত্র জাল বুনেচে।

সুপ্রভাদের বাড়ি গিয়ে রেবাকে একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করে ঠকিয়েছিলাম। যীশুখৃষ্ট কতদিন মারা গিয়েচেন, এ প্রশ্নের জবাব সে দিতে পারলে না। ওকে দেশলায়ের বাক্সে ম্যাজিকটা দেখিয়ে বাক্সটা দিয়ে দিলুম। বেলা সাড়ে ন'টা। সুপ্রভার সঙ্গে পীরতলা বেড়াতে গেলুম। একটা নদীর ধারে মাঠের মধ্যে পাইন বনে ঘেরা নির্জ্জন স্থানটিতে বসে গান শোনা গেল। তারপর ওখান থেকে চলে এসে সেই পাহাড়টার উপর দিয়ে আসছি, রেবার দাদা আসচে, বল্লে—কাউন্সিলে গিয়েছিল অর্থাৎ শিলং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্ব্লিতে। একটা টিকিট দিলে আমায়। আমি গিয়ে কাউন্সিল হাউসে ঢুকলাম। একজন পুলিশ দেখিয়ে দিলে ওপরের সিঁড়িটা। ওপরের গ্যালারিতে লোকে লোকারণ্য। আইন সভার অধিবেশন হচ্ছে নীচের হলটাতে। বসন্তকুমার দাস নিচেকার উঁচু চেয়ারে ডবল কলার পরে গম্ভীর মুখে বসে। তার সামনে, ওপরে, দোতলায়, পেছনে উঁচু চেয়ারে আসামের গভর্নর রিড্ বসে। একজন কংগ্রেস-সদস্য মন্ত্রীদের বেতন সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। রাজস্ব-সদস্য স্যার আবদুল্লা তার জবাব দিতে উঠলেন। একপক্ষ যখন বক্তৃতা করতে ওঠে, অপর দল দেখলুম হাসি, টিট্‌কিরি সব রকম চালায়—এ বিষয়ে আইন সভা সাধারণ স্কুলের ডিবেটিং ক্লাসের চেয়েও অধম।

কাউন্সিল হাউস থেকে এসে জিনিসপত্র গুছিয়ে মোটর স্টেশনে এলুম। দুটোর সময় মোটর ছাড়ল—অপরাহ্নের ছায়ায় মোটর-রাস্তার দুধারে অরণ্য-দৃশ্য অতি সুন্দর —পাহাড়ী নদীটাই কি অদ্ভুত! ফিরে আসতে আসতে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে দেখলে মায়ের সেই কড়াখানার কথা মনে হয়। সন্ধ্যায় গৌহাটিতে নামবার পথে মণি ডাক্তারের কথা ভেবে দেখলুম। গাঁয়ের হাটতলায় সে এতক্ষণ সেই মুদীর দোকানটাতে বসে গান করচে। হয়তো বেচারা এবারও বাড়ি যেতে পারে নি। সাম্‌নে সূর্য্যাস্তকে লক্ষ্য করেই যেন মোটর ছুটেচে, সামনে কামাখ্যা দেবীর মন্দির পড়ল একটা উঁচু পাহাড়ের মাথায়। খুকু এতক্ষণ হয়তো গাঙ্ থেকে গা ধুয়ে ফিরে এল। জঙ্গলে ভরা পোড়ো-ভিটেটাতে ছায়া পড়ে এসেছে। স্টীমারে এসে ওপারের ডেক থেকে পাহাড়ে ঘেরা আধ অন্ধকার বৃক্ষপত্রের দিকে চেয়ে রইলাম কতক্ষণ, কত চিন্তা যে মনে আসে এই সন্ধ্যায়! ট্রেনে উঠে তাড়াতাড়ি শোবার ব্যবস্থা করিনি—বরপেটা স্টেশন পর্য্যন্ত বসে আসামের সুবিস্তীর্ণ জলাভূমি ও ছোট ছোট গ্রাম দেখতে দেখতে এলুম। কেবলই মনে হয় ওবেলা পীরতলা ভ্যালিতে বসে সেই যে গানটা সুপ্রভা গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের—

যৌবন সরসীনীরে
মিলন শতদল
কোন চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল

আর একটা গান—'রোদন ভরা এ বসন্ত'—চিত্রাঙ্গদা গীতি-নাট্যের-গানটা।

কামরূপ জেলার দিগন্তব্যাপী প্রান্তর ও জলার ওপর আকাশের ছায়া পড়েচে, সন্ধ্যা হয়ে এলেও সূর্য্যাস্তের after glow এখনও আকাশে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকচে বনে বনে, সুপ্রভা ও শিলং অনেক দূরে গিয়ে পড়েচে।

মণি ডাক্তার এতক্ষণ বাসা পৌঁছে তার সেই ছোট চালাঘরখানায় ভাত চড়িয়ে দিয়েচে। আহা, গরীব বেচারা! কত গ্রাম, কত মাঠ-ঘাট-প্রান্তর, এখান থেকে বাংলা-দেশের সঙ্গে কত গ্রামের কত সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা দ্বন্দ্বের মধ্যে একখানি মাত্র ক্ষুদ্র খড়ের ঘরের জন্যে আমার সহানুভূতি এত বেশী কেন?

রাণাঘাট স্টেশনে পরদিন দুপুরে পৌঁছে যেন মনে হল বাড়ি এসেচি। এখান

থেকে আমার সুপরিচিত সব কিছুই। মনে হল নিবারণ গোয়ালা এতক্ষণ ওপাড়ার ঘাটে স্নান করতে নেমেচে—কি জানি কেন এই চিন্তাটা মনে হয়ে বড় আনন্দ পেলাম।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে দেশে যাওয়া আমার পক্ষে আনন্দজনক ব্যাপার। এই জন্মাষ্টমীর সঙ্গে আমার জীবনের অনেক শুভদিন, বিশেষ করে একটি অতীব শুভ-দিনের স্মৃতি জড়ানো। তাই জন্মাষ্টমী এলেই মন ব্যস্ত হয়ে ওঠে দেশে যাওয়ার জন্যে। এই ক'বছর তার সুবিধা ও সুযোগও ঘটেচে—১৯৩৪ সাল থেকে। এবারও কাল গিয়েচে জন্মাষ্টমী, আজ নন্দোৎসব। বনগাঁয়ে গিয়েছিলুম শনিবারে। সেদিন কি ভয়ানক বর্ষা! খানাডোবা জলে ভর্ত্তি হয়ে থৈ থৈ করচে। ওদিন দুপুরে খুব জল হয়ে গিয়েচে ওখানে। গিয়েই শুনি ফণিবাবু ওভারসিয়ারের মেয়েটি সেই বিকেলে নিমোনিয়ায় মারা গিয়েচে। সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সেখানে গিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইলুম। পরদিন খয়রামারির মাঠে আমার সেই প্রিয় স্থানটাতে দুপুরে গিয়ে দেখি মটরলতার ঝাড় তখনও টাট্‌কা রয়েচে, ছোট এড়াঞ্চির ঝোপগুলো বর্ষার জল পেয়ে বিষম বাড় বেড়েচে। বিকেলে ছ'টায় গেলুম। যাবার পথটি বড় সুন্দর লাগল সেই ছায়াভরা বিকেলে। খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সন্তু এসেও বসল। কালোর মেয়েকে এনে খুকু আমার কোলে দিলে। সন্তুকে জিগ্যেস করলুম সিলে'ডাইন্ মানে কি? খুকু বল্লে -আহা, ওকথা আর জিগ্যেস করতে হবে না। মিন্‌তো বাংলাদেশের রাজধানী বলতে পারলে না—বলে খুকু তো হেসেই খুন। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওদের ওখানে ছিলাম, তারপর চলে এলুম। দেবেনের ডাক্তারখানার সামনে বিশ্বনাথ আর সরোজ বসে গল্প করচে অন্ধকারে। আমি সেখানে একটু বসে চলে এলুম ডাক্তারবাবুর বাড়ি গান শুনতে। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় কি ভাবে, খুকু সেই গল্পটা করলে সন্তুকে। ১৯১৮ সালের জন্মাষ্টমী ছুটিতেও এই বাসাতে এসেছিলুম সকালে। তখন খিনুরা থাকত, খিনুর মা তখনো বেঁচে। সরকারী ডাক্তারখানার কোয়ার্টারে তখন ওরা থাকত।

আজ সকালে ছায়াভরা পথ বেয়ে একা হেঁটে যাই বারাকপুরে। বর্ষায় বনস্থলীর শোভা আরও বেড়েচে। কোথাও তেলাকুচো পেকে টুক্ টুক করচে, নাটাকাঁটার ফুল ফুটেচে, বনকলমীর ফুল ঝোপের মাথায় ক্কচিৎ দৃশ্যমান, 'ক্কচিৎ' এইজন্যে বললুম যে এই ফুলটা এবার যেন দেশে একটুকু কম, ঢোলকলমীর ফুল খুব ফুটেচে, কিন্তু বনকলমী তেমন দেখা যায় না। জগোর সঙ্গে বেলেডাঙার পথে বেড়াতে যাই বাড়ি পেঁাছে। বড় আমবাগানের পথে সইমার সঙ্গে দেখা বাঁশতলায়, তিনি হরিপদর বিরুদ্ধে কি একটা নালিশ করলেন আমার কাছে। সেই গাছতলায় গাছের গুঁড়ি ঠেস্ দিয়ে বসি, সেবার যেখানটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। আইনদ্দির নাতি স্কুলে যাচ্ছে পথ দিয়ে, আমায় দেখে হাসচে। তাকে ডেকে বাড়ির কে কেমন আছে জিগ্যেস করলুম। আজ সোমবার, ভাবছিলুম যে ও সোমবারের আগের সোমবারে ঠিক এ সময়টা আমি আর সুপ্রভা পীরতলায় বসে আছি শিলংএ পাইনবনে ঘেরা সেই ছোট্ট উপত্যকাটিতে, ছোট্ট নদীটার ধারে।

তারপর জগো আর আমি মাঠে রৌদ্রে একটু নরম ঘাসের উপর শুয়ে থেকে আমাদের ঘাটে নাইতে নামি। ভারী তৃপ্তি হয় ঘোলা জল ইছামতীতে এই সময়টা স্নান করে। একটা ঝোপ থেকে একটা বনসিমের ফুলের ছড়া তুলে নিলাম। দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম দস্তুরমত যে এই ভাদ্র মাসেও কুঠীর মাঠে দুটো গাছে ঝাড়

ঝাড় সোঁদালি ফুল ফুটে রয়েচে।

খুকুদের বাড়িটাতে কেউ নেই। দাওয়ায় গরু উঠেচে, ভাঙ্গাচোরা পৈঠে। একবারটা সেইদিকে গেলুম। দুপুরে আমার ঘরটাতে শুয়েচি—ইন্দু এসে খানিকটা গান করলে। আমাদের ভিটের দিকে গিয়ে দেখি ঘন জঙ্গল হয়েচে, মায়ের সেই ভাঙ্গা কড়াখানা জঙ্গলে ঢেকে ফেলেচে। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ল, যাকে অনেকদিন আগে এই দিনটিতে এখানে দেখা যেত।

নৌকো করে বনগাঁয়ে এলুম বিকেলে। ইছামতীর জল খুব বেড়েচে—জলের ধারে উলুটি বাচ্‌ড়া, নরম সবুজ ঘাসে ভরা, মাঝে মাঝে বনকলমীতে ছাওয়া ঝোপ। বিকেলের ছায়ায় নদীবক্ষের কি শান্ত শোভা!

ক'দিন থেকে পুজোর আগে বড় কাজকর্ম্ম চলেছে। স্কটিশচার্চ্চ কলেজে বক্তৃতা ছিল, সেখান থেকে সেদিন বার হয়ে ডি এম লাইব্রেরীতে এলুম। এবার প্রভাবতী দেবী সরস্বতীকে দেখলাম না, অন্য অন্য বার দেখি। প্রমোদবাবু এসেছিলেন শনিবারে। ঠিক করা গেল এবার পুজোয় কোথায় যাওয়া যাবে, অনেকটা ঠিক হল—হয় চাটগাঁয়ে, নয়তো রাখামাইন্‌সে। আজ সকালে সাঁতরাগাছি হয়ে গেলুম শ্রীরামপুরে। বর্ষার সবুজ বনরাজির শোভা দেখতে দেখতে আমি ও সুরেন মৈত্র গিয়ে উঠলুম শ্রীরামপুর টাউনহলে। কে একজন বল্লে—আপনার বদ্দিবাটি আসবার কথা ছিল না? বলতে বলতে হরিদাস গাঙ্গুলী এলেন, তাঁরই বাড়িতে ছিল খাওয়ার কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। বাইরে আকাশ আজ বড় নীল,—তালগাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। অনেকদূরের আকাশে একটা খড়ের বাড়ি পড়ে আছে, দাওয়ায় গরু-বাছুর উঠছে। বাড়িটাতে কেউ নেই। দিদিদের বাড়িও গেলাম, আগেকার দিনের মত কি আর আছে? আগে ট্রেনে যেতে যেতে দানিবাবু আমাকে সাহস দিতেন, তবে যেন শ্রীরামপুরের মাটিতে পা দিতে পারতুম।

আজ সারাদিন ভীষণ দুর্য্যোগ, যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। সকালে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াতে গিয়ে রমাপ্রসাদের সঙ্গে গল্প করলুম। তারপর স্কুল গেল ছুটি হয়ে। বৃষ্টির মধ্যে গেলুম ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী, সেখান থেকে প্রবোধ সরকারের দোকান হয়ে গুরুদাস চাটুয্যে এণ্ড সন্‌স ও কাত্যায়নী বুক স্টল। ওখানে আমার একখানা উপন্যাস 'আরণ্যক'-এর আজ কন্ট্রাক্ট হওয়ার কথা। হয়েও গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যে সুধীর সরকারের বইয়ের দোকানে এলুম ট্রামে, সেখান থেকে রমাপ্রসাদের বাসায় এসে খানিকটা গল্প করি।

কি দুর্যোগ আজ! রাত্রে এখন যেন ঝড় বেড়েচে। আজ সারাদিন এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে টো টো করে ঘুরে বেড়িয়েচি।

রাত্রি ১০টা। বৃষ্টি সমানে চলচে, গোঁ গোঁ করে ঝড় বইচে। আমি ভাবচি বহুদিন আগে ১৯২৭ সালে ঠিক এই রাত্রিটিতে এই সময়ে আমি আর অম্বিকা ভাগলপুর থেকে পায়ে হেঁটে দেওঘর যেতে জামদহ ডাকবাংলোতে কাটিয়েছিলুম। এখনও মনে পড়চে নির্জ্জন শালবনের মধ্যে চানন নদীর ধারে সেই বাংলোটি—আমি এদিকে কোণের ঘরে টেবিলের ওপর বসে ডায়েরি লিখ্‌চি, আর বাংলোর ওদিকে লছ্‌মীপুর স্টেটের ম্যানেজার নদীয়াচাঁদ সহায় প্রজাপত্তর নিয়ে কাছারী করচেন। এই রাত্রেই শোবার সময় আমি অম্বিকাকে বলি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে দিয়ে কাল লছ্‌মীপুর হয়ে কানিবেলের জঙ্গলের পথে দেওঘর যেতে হবে। তাতে

প্রথমে সে ঘোর আপত্তি জানায়, শেষে রাজী হল।

সেই ১৯২৭ সালের এই দিনটি—আর ১৯৩৭ সালের এই দিন! কত পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে জীবনে সব দিক থেকে...যদি ধরা যায় তারও আগে ১৯১৭ সালের এই সময়ের কথা...সেই মামার বাড়িতে থিয়েটার করলুম আমি ও মেজমামা মিলে...করুণা গান গাইলে ঃ—

আমি না তোর জান্ কলিজা
ভালবাসা গেছে বোঝা

তবে তো পরিবর্ত্তনের অনন্ত অকূলে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে হবে।

১৯২৭ সালে আমি মুক্ত পথিক, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই অপ্রত্যাশিত অজানার সন্ধানে—চোখে মায়ার ঘোর, সৌন্দর্য্যের ঘোর, এখনও আমার সে ঘোর কাটেনি, বরং অনেক—অনেক ঘনীভূত হয়েচে। জীবনে তখন ছিলুম একা, এখন আরও সব অনেক এসেছে। যেমন সুপ্রভা, খুকু, মিনু, রেণু,—এরা সব। এই সামনের রবিবারে তো খুকুর সঙ্গে দেখা হবে ছ'ঘরেতে—তারপর ৯ই অক্টোবর সুপ্রভা আসবে শিলং থেকে। ওর মায়ের সঙ্গে কাশী যাচ্চে পুজোয় বেড়াতে—ওর সঙ্গেও দেখা হবে। তারপর আমি চাটগাঁ যাব ইচ্ছে আছে, সেখানে রেণুর সঙ্গে দেখা হবেই। এরা এখন জীবনে এসে আমার খুব আনন্দ দিয়েচে —তবুও দশ-এগারো বছর আগেকার সেই বনে, পথে, প্রান্তরে, অরণ্যসীমায় যাপিত দিনরাত্রিগুলির স্মৃতি ফিরে এলে মনটা কেমন হয়ে যায়...

অভিজ্ঞতা অর্জ্জন যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই দীর্ঘকালের ব্যবধান, উভয় দিনের মধ্যে আমায় কত বিচিত্র অমূল্য অভিজ্ঞতা বহন করে এনে দিয়েচে। আমি সেদিক থেকে ধনী, তবুও আজ কেউ যদি বলে—সে জীবন চাও না এ জীবন? আমি সেই জীবনে আবার এখুনি ফিরে যেতে চাই, যদি কেউ সেই দিনগুলো ফিরিয়ে দিতে পারে।

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বেঁচে থাকব কি? কি লিখব সে দিনটিতে? তখন কোথায় থাকবে আজকের দিনের সঙ্গীরা? কোথায় থাকবে খুকু, সুপ্রভা?...রেণু-মা?

কে বলবে?

ভীষণ ঝড়ের রাত্রি। ঝড়ের বিরাট গোঁ সোঁ শব্দ। রাত্রে ভয়ে ঘুম হল না মেসসুদ্ধ। রাত দেড়টা। মনে হচ্চে যেন মেসের বাড়িটা দুলচে। এমন ভীষণ ঝড় ১৩১৬ সালের পরে আর দেখেচি বলে মনে পড়চে না তো। সারা আকাশ রাঙা ধূসর মেঘে উগ্রমূর্ত্তি, রুদ্র প্রকৃতির রক্তচক্ষু যেন মেঘের আড়াল থেকে উঁকি মারছে।

কাল স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েচে। অন্য অন্য বার এ সময়ে বাইরে যাবার জন্যে কত আগ্রহ থাকে, কত উদ্যোগ আয়োজন করি। এবার অন্য অন্য দিক থেকে আমার ব্যাপার মন্দ নয়, কিন্তু বাঁ পা-খানা হঠাৎ সেদিন বনগাঁয়ে মুচকে গিয়ে এক রকম শয্যাগত হয়ে আছি—কোথাও দূরে বেড়াতে যাওয়া অসম্ভব। সেজন্য মন ভাল নয়। ভাল লাগে কি এ সময় কোথাও বাইরে যেতে না পারলে? সবাই দূরে কোথাও যাবার পরামর্শ আয়োজন করচে, সজনী ও ব্রজেনদা আজ সন্ধ্যায় চলে গেল ভাগলপুরে। সুধীরবাবু কাল রাত্রের এক্সপ্রেসে যাচ্ছেন হরিম্বার ও মুসৌরী, অপূর্ব্ববাবু আজ সকালে চলে গেছেন শিমুলতলা, নীরদ চৌধুরী গেছে রাঁচী, অশোক গুপ্ত যাচ্চে বেনারস, শচীন সরকার কাল সকালে চট্টগ্রাম যাবে, নীরদ দাশগুপ্ত তো সস্ত্রীক আগেই

চলে গেছে চট্টগ্রাম—আজ সুধীরবাবুদের দোকানে দুপুরবেলা বসে কেবলই শুনি ওদের টিকিট কেনার, বার্থ রিজার্ভ করার, হাওড়া স্টেশনের এন্‌কোয়ারী আপিসে ফোন্ করার বিপন্ন ব্যস্ততা। হৈ চৈ এর মধ্যে ওরা নিজেদের ডুবিয়ে রেখেচে—কোথাও যাব এ আমোদটা কোথাও গিয়ে পৌঁছানোর আমোদের চেয়ে বেশী—কিন্তু আমি শুধু বিষন্নমুখে বসে বসে ওদের আয়োজন দেখচি আর ভাবচি এবার আমার আর কোথাও যাওয়া হল না। সুপ্রভা লিখেছিল ৯ই তারিখে ওরা এখানে আসবে কাশী যাবার পথে—তাও সে চিঠি লিখেচে এবার তার যাওয়া হল না। আমার যাওয়ার মধ্যে দেখচি খালি মজিলপুরে দত্তদের বাড়ি সাহিত্য-সেবক সমিতির নিমন্ত্রণ আছে, তারা আমাকে বিশেষ করে ধরেচে যাওয়ার জন্যে—ঐ একমাত্র জায়গা যেখানে যাওয়া ঘট্‌তে পারে, কারণ তারা মোটর পাঠাবে।

হায়, হায়, কি বিভ্রাট এবার—শিলং গেল, চট্টগ্রাম-চন্দ্রনাথ গেল, কাশী গেল, হরিদ্বার গেল, মুসৌরী-দেরাদুন গেল -শেষকালে কি না পুজোতে বেড়াতে যাব জয়নগর-মজিলপুর? আরো না জানি অদৃষ্টে কি আছে!

অথচ মজা এই, সকলেই বলচে আমাদের সঙ্গে এস। সুধীরবাবুরা বলচেন, চলুন আমাদের সঙ্গে হরিদ্বার, নীরদ দাশগুপ্ত তো কাল স্টেশনে লোক পাঠাবে, চট্টগ্রাম স্টেশনে—কারণ কাল সকালের ট্রেনে আমার সেখানে পৌঁছানোর কথা পূর্ব্ব ব্যবস্থামত—অপূর্ব্ববাবু তো কাল কলেজ স্কোয়ারে সাধাসাধি—আমার সঙ্গে শিমুলতলা চলুন। সজনী বলচে আসুন দু দিনের জন্যেও ভাগলপুরে।

এমন সময়েও পা ভাঙে মানুষের?

পুজোটা এবার একেবারে মাটি হল। অগত্যা কাল দেশেই যেতে হবে।

কাল পর্য্যন্ত ভেবেছিলুম কোথাও যাওয়া হবে না। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পা অনেকটা সেরে উঠল। রাত্রিটা বসে বসে ভাবলুম কোথাও যাব না, এটা কি ঠিক? চাটগাঁতেই যাওয়া যাক্। সকালে উঠে স্টেশনে এসে দেখি চাটগাঁয়ের একটা স্পেশাল ট্রেন ছাড়চে। শচীনবাবুও যাচ্চে সেটিতে। বেজায় ভিড় এমন কিছু নয়—তবে ভিড় দেখলুম স্টীমারে ও চাঁদপুর ট্রেনে বসে, শোওয়া তো দূরের কথা, কাৎ হবার জায়গা নেই। তার ওপরে এক এক স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় আর ছাড়তে চায় না- বিষম বিরক্তির ব্যাপার! চাটগাঁয়ে এসে নীরদবাবুর বাসা খুঁজে না পেয়ে রেণুদের বাড়িতে এলুম। রেণু তো অপ্রত্যাশিতভাবে আমায় দেখে খুব খুশি। ওপরের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে তুললে। রেণুর দাদা এল, মা এলেন। সবাই খুশি আমায় দেখে। রেণু বাক্স থেকে কাপড় বের করে কুঁচিয়ে নীচে নিয়ে গেল স্নানের জায়গায়। স্নান করে খেয়ে ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা গল্প করি। ষোল বছর আগে এদের বাড়িতে এসেছিলুম—আর এই এখন ষোল বছর পরে। আজ চাটগাঁয়ে বড় গরম, হাভন্ পার্কে আমি রেণুর দাদার সঙ্গে গিয়ে বসলুম—বেজায় ধুলো চাটগাঁয়ের রাস্তায়। নবগ্রহ বাড়িতে সপ্তমী পুজোর ঢাক বাজচে। একটা বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। এবার আর হবে কি না কে জানে?

সন্ধ্যার সময় রেণু এসে বসে কত গল্প করলে।

ওবেলা দুপুরে খাওয়ার পরে একটু ঘুমুব বলে শুয়েছি—রেণু এসে গল্প করতে লাগল, ঘুম চটে গেল। ও চলে গেলে ঘুমুবার চেষ্টা করতেই ঘুম এল। ও কখন চা এনে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমায় ডাকে নি। সেই সময় আমায় একটু নড়তে দেখে বল্লে—উঠবেন না? চা এনেচি, কিন্তু আপনি ঘুমিয়ে আছেন দেখে আমি আর

ডাকিনি। চা খাবেন আসুন উঠে।

নীরদবাবুদের বাসা খুঁজে পেলুম না বটে, কিন্তু সেজন্য আমার কোন কষ্ট নেই। এদের আতিথ্যে যত্নে, সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েচে।

সকালে রেণুদের বাড়িতে যখন আজ ঘুম ভাঙল তখন জানলার ধারে শুয়ে দেখি রাঙা রোদের আভাস পূব আকাশে। পরিষ্কার দিনের অগ্রদূত এই অরুণ বর্ণ উদয় দিগন্তের। ভাবচি—আমি কি বনগাঁর বাসায়? চাটগাঁয়ে এদের বাড়িতে ষোল বছর পরে এসেচি, এ যেন স্বপ্ন। সেবার যে সেই এদের বাড়ি থেকে অন্নদাবাবুর সঙ্গে ফেণী চলে গিয়েছিলুম—তারপর পৃথিবীতে যুগ পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েচে। হাওড়ার পুলের নীচে দিয়ে অনেক জল চলে গিয়েচে। তখনকার দিনের জীবন আর এখনকার জীবন! সেই আমি আর এই আমি? তারপর ঘটেচে ঢাকা, বর্দ্ধমান, হরকু, চরি, ইসমাইলপুর, গোটা ভাগলপুরের জীবনটাই। তারপর আমার সাহিত্যিক জীবনের আরম্ভ—স্কুল, কত নতুন বন্ধু লাভ, সুপ্রভা, খুকু ওরা সব। জীবনের চলমান স্রোতে কোথা থেকে কোথায় ভাসিয়ে এনে ফেলেছে দ্যাখো!...

রেণু চা নিয়ে এল। বুদ্ধু বল্লে—আজ চন্দ্রনাথে চলুন।

বেশ যাব। কখন গাড়ি আছে দ্যাখো।

সাড়ে দশটায় গাড়ি।

সওয়া দশটা বেজে গেল বুদ্ধুর দেখা নেই। কোথায় বাইরে গেছে।

আমি একলা স্টেশনে এলুম—ফেরিওয়ালা বিক্রী করচে—চাই বনরুটি, কেক—বলবাশিংসু! আমি ভাবি 'বলবাশিংসু'টা কি জিনিস? চাটগেঁয়ে কোন খাবারের নাম নাকি?

চাই বলবাশিংসু...বলবাশিংসু...

কান পেতে শুনে বুঝলুম লোকটা আসলে বলচে—ভাল পাশিং শো। চাটগাঁয়ে 'ও'-কারান্ত শব্দের উচ্চারণ করে 'উ'-কারান্ত শব্দের মত। জ্যোৎস্নাকে বলবে জুৎস্না। 'শো' হয়ে গিয়েচে 'শু'।

যাক্। চন্দ্রনাথে এসে নামলুম বেলা বারোটা তখন। ঝম্ ঝম্ করচে দুপুরের রোদ। নীল ইস্পাতের মত আকাশ। একা হেঁটে ভাঙা পা নিয়ে পাহাড়ে উঠচি। পায়ের ব্যথা এখনও সারেনি—এখনও বেশ খচ্ খচ্ করে হাঁটতে গেলে। বিরূপাক্ষ মন্দির থেকে যাত্রীদের দল নামচে। দুপুরে ঘেমে নেয়ে উঠচি। বিরূপাক্ষ মন্দিরে উঠতে বাঁ ধারে বনের মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ আছে—সেইটে ধরে চললুম। বড় নির্জ্জন রাস্তাটা। হঠাৎ বাঁ দিকে চেয়ে দেখি সমুদ্র দেখা যাচ্চে। পাহাড়ের ধার দিয়ে সরু পথটা বনস্পতি-সমাকুল ঘন বনের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে উঠে নেমে ঊনকোটি শিবের গুহা বলে একটা ছোট্ট গুহার কাছে গিয়ে শেষ হয়েচে। ঘামের উপদ্রবে দুবার এর মধ্যে গাছের ছায়ায় শিলাখণ্ডে বসেচি। একটা বনকলার পাতা হাতে নিয়েচি—যেখানে সেখানে সেটা পেতে বসচি। ঊনকোটি শিবের গুহা দেখে ফিরবার সময় একটা ছোট ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। পেছনে উঁচু পাহাড়ের দেওয়াল, ঘন জঙ্গলাবৃত—ঝর ঝর ঝরণার জলের তোড়ের শব্দ পাচ্চি। একটা কী পাখী ডাকচে, ঠিক যেন ঘণ্টা বাজচে। সামনে সমুদ্রের দৃশ্য। সমুদ্রের দিক থেকে মাঝে মাঝে বেশ হাওয়া বইচে—এই ভীষণ গরমে ও রোদে সে ঝিরঝিরে হাওয়াতে যেন সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল। ডাইনে একটা উঁচু চূড়ায় একটি মাত্র নির্জ্জন বনস্পতি অত উঁচুতে সুনীল আকাশের নীচে একটা অসাধারণ ছবির সৃষ্টি করেচে। সুন্দর, কিন্তু যেন অবাস্তব।

অত উ'চুতে কি গাছ থাকে ?

ফিরবার পথে সেই ঝরণার ধারে বসলুম। যেমন বড় বড় গাছ জায়গাটাতে, তেমনি বড় বড় শিলাখণ্ড। সি'ড়ি বেয়ে অনেকটা ওপরে উঠলুম—ওপরে বিশাল অরণ্য—regular mountain forest—বেশীদূর উঠতে সাহস হল না এই মচকানো পা নিয়ে—পথটাও জনহীন, শুনেচি চন্দ্রনাথে বাঘ আছে। নেমে আসবার পথে প্রথমে বসলুম সি'ড়িটার ওপরে—মাথার ওপরে চূড়ার পাশে বনের গাছপালা—তার মাথায় চিল উড়চে, দূরে সমুদ্র বে'কে গিয়েচে। ওই সমুদ্রের দূর গায়ে বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র গ্রামের কত প্রতিমা, কত উৎসব!

সমুদ্রকে সামনে করে একটা আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে পড়ন্ত বেলায় অনেকক্ষণ বসে রইলুম। চন্দ্রনাথ পাহাড়কে কতভাবে যে দেখলুম আজ! এক এক জায়গায় এর এক এক স্বরূপ, নামবার পথে সেই ঝরণাটার ধারে ঘন ছায়ায় আর একবার খানিকটা বসলুম, বিকেলের ঘন ছায়ায় এই বনের দৃশ্য উপভোগ করবার জন্যে। সেই যে নীচের পুলটাতে ষোল বছর আগে রোজ সন্ধ্যায় বসতুম এখানে থাকতে—সেইটাতে ঠিক সন্ধ্যার সময়েই আজ বসলুম। আবার এই ষোল বছরের অতীত ঘটনাবলী মনের মধ্যে একে একে উদিত হল। পরিবর্ত্তন ...পরিবর্ত্তন...একেবারে আমি নতুন মানুষ এখন। সে আমিই নেই। শম্ভুনাথের মন্দিরের ডাইনের ঘন বনের রাস্তাটি দিয়ে নামলুম। বনের মাথায় মাথায় শাদা শাদা যেন অনেকটা কাপাস তুলোর ফুলের মত ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। আরও অনেক রকম ফুল দেখলুম।

ফেরবার পথে অখিল চক্রবর্ত্তীর এক ভাই-এর সঙ্গে দেখা। অখিল সেবার আমার পাণ্ডা ছিল—ষোল বছর আগে যখন চাটগাঁ এসেছিলুম। তাদের সে বাড়িটাও দেখলুম। একটা ছোট্ট মেটে বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করলুম। তখন ছায়া ঘন হয়ে এসেচে। মাটির উঠান ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, পেছনে বাঁশের ছে'চার বেড়া ও বেতবন, ছোট্ট প্রতিমাটি, কতকগুলি গ্রাম্য নরনারী প্রতিমা দেখতে এসেচে, ট্যাং ট্যাং করে ঢোল বাজচে! ওখান থেকে বার হয়ে স্টেশনের কাছে এক বড় পূজোর বাড়িতে মহাষ্টমীর আরতি দেখলুম। সুপ্রভাদের বাড়ি পূজো আছে, সে-ও এমন সময় হয়তো আরতি দেখচে দাঁড়িয়ে—খুকুও।

ট্রেন এল। অখিল চক্রবর্ত্তীর ভাই আমার টিকিট কিনে ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। কত কথা ভাবতে ভাবতে চাটগাঁয়ে এলুম। এসে ওপরে বসেচি, রেণু তখনি এক গ্লাস শরবৎ নিয়ে এসে হাতে দিলে। তারপর চন্দ্রনাথ ভ্রমণের গল্প করি বসে। সবাই একসঙ্গে খেতে বসলুম রান্নাঘরে নেমে—রেণু, আমি, বুদ্ধু ও বুদ্ধুর মামা। বুদ্ধুর মামা চন্দ্রনাথের এক পাণ্ডার কীর্ত্তিকলাপ বলতে লাগল।

ডায়েরী লিখবার সময় বসে বসে ভাবলুম দশমীর দিন দেশে কাটাব।

এবার পাঁচ দিন পূজো—তাই আজও মহাষ্টমী। আজ সন্ধিপূজো। কাল রাত্রে সংকল্প করেচি যে যখন এবার পাঁচ দিন পূজো—তখন দেশে দশমী কাটাতে হবে। সকালে উঠে বাইরের ঘরে বসেচি—রেণু এসে বল্লে, বাতাবি নেবু খাবেন? একটা ফিরিওয়ালার কাছে বাতাবি লেবু কিনে বাড়ির মধ্যে থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল একটা প্লেটে করে। বল্লে—লেকে বেড়াতে যাবেন, তো? আমি যাব আপনাদের সঙ্গে।

দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠলুম আজ রাত্রে ট্রেনে জাগতে হবে বলে। মোটর এল, রেণুর দাদা, আমি, রেণু বেরিয়ে পড়লুম। শহর ছাড়িয়ে ছোট পাহাড়, বন্য কাঁটাল গাছ—কেলে কোঁড়া লতা এত দূরেও দেখে অবাক হয়ে গেলুম। হ্রদটি জঙ্গলে ভরা,

পাহাড় বেষ্টিত, বৃষ্টি পড়তে লাগল—রেণুকে ছাতি দিলুম, সে কিছুতেই খুলবে না। জোর করে খোলালুম। একটা পাহাড়ের ওপর উঠলুম সমুদ্র দেখব বলে, সামনে আর একটা পাহাড় দৃষ্টি আটকেচে।

বাড়ি ফিরে আমি বিছানাপত্র বেঁধে নিলুম। আমি, বুধু, রেণু একসঙ্গে খেতে বসলুম ওদের রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে। গাড়ি এল। রওনা হলুম স্টেশনে। সঙ্গে একজন লোক এল, বুধু তাকে পাঠিয়ে দিলে। তাকে কিছু বখশিশ দিলুম। ফেরিওয়ালা হাঁকচে—চাই বল্বাশিংসু...

ঘুম হয়নি ট্রেনে, যদিও শুয়েই এসেছিলুম। লাক্‌সাম জংশন ছাড়িয়ে একটু-খানি শুয়েচি—অমনি উঠে দেখি চাঁদপুর ঘাট। স্টীমারে এসে বেশ জায়গা পেলুম। যেমন ঝড়, তেমন বৃষ্টি। রাজবাড়ি, তারপাশা, মৈনট্‌ কত কি স্টেশন। ওই ঝড়-বৃষ্টিতে যখন নৌকা করে খাবার বিক্রী করতে আসচে, জলের ঝাপটায় ওদের ধারে যাবার জো নেই। বড় বড় নৌকা করে যাত্রীরা বাক্স-বিছানা, মোট-পুটুলি নিয়ে ছাতি মাথায় ভিজতে ভিজতে তীরে যাচ্ছে স্টীমার থেকে। বড় বড় চর, কাশবন। চরের মধ্যে লোক বাস করচে। স্টীমার খুব বেগে যাচ্ছে। কিন্তু সারাদিনের মধ্যে বৃষ্টি থামল না। একঘেয়ে বসে বসে ভাল লাগচে না। বেলা চারটার সময় গোয়ালন্দ ঘাটে স্টীমার এসে লাগল। ভাবলুম নিজের দেশেই যেন এলুম। এই তো গোয়ালন্দ পোড়াদহ এলুম—তো নিজের দেশ আর কতটুকু?

কলকাতা নেমে দেখি টরু আমার ঘরে বসে আছে! সে কলকাতা বেড়াতে এসেচে। আমি ট্রামে বিভূতিদের বাড়ি গেলুম। মন্মথ এসে বল্লে, না খেয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু। খেতে রাত বারোটা হয়ে গেল। তখনও পথেঘাটে মেয়েছেলের হাত ধরে লোকে ঠাকুর দেখে বেড়াচ্চে।

সকালে উঠে বাগবাজারে গেলুম পশুপতিবাবুদের বাড়ি নীরদবাবুদের কি হল সে সন্ধানে। বাড়ি তো গেলুম, গিয়ে শুনি নীরদবাবুরা গিয়েচেন গালুডি। সেখানে চা খেয়ে বৌঠাকরুণের সঙ্গে গল্প করি। বৌঠাকরুণ বিজয়ার প্রণাম সারলেন বিসর্জ্জনের আগেই পায়ে হাত দিয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে। আমিও তাই করি। বগলা এল, তার সঙ্গে সার্ব্বজনীন দুর্গোৎসব দেখতে গেলুম বাগবাজারে। প্রতিমা বড় সুন্দর হয়েচে। দুজন ছেলের সঙ্গে বগলা আলাপ করিয়ে দিলে এবং তাদের দেখিয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বসল। তাকে কমল যেতে লিখেচে ঘাটশিলায়। তার সঙ্গে সুবর্ণরেখার ধারে বসে কাব্যালোচনা করবে বলে মহা উৎসাহে চলেছিল, কিন্তু ট্রেন ফেল করলে। আমি ওখান থেকে বাসায় এসেই ট্রেনে বনগাঁ রওনা হলুম।

দুপুরের পরে এসে বনগাঁয়ে পৌঁছুই। প্রফুল্লদের বাড়ি ঠাকুর বরণ হচ্ছে। আমি, বীরেশ্বরবাবু, যতীনদা, মনোজ সবাই সেখানে গিয়ে বসি। একটু পরে বেলা পড়লে আমি ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুর গেলুম বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখব বলে। কতকাল দেখিনি গ্রামের মেলাটা। এবার যখন আছি দেশে, তখন একবার যাবার খুব ইচ্ছে হল। পথে খুব ভিড়, চালকীপোতা চাঁপাবেড়ে থেকে বিজয়ার মেলা দেখতে আসচে লোকে বনগাঁ। চাষার মেয়েছেলেরা রঙিন কাপড় পরে আসচে। এই জোড়া বটতলা, এই রায়দের বড় বাগান—গ্রামে পৌঁছে গিয়েছি, আমাদের গাঁ!...কোথা থেকে কোথায় এসেছি দ্যাখ!

বাঁওড়ের ধারে ছেলেবেলাকার মতই মেলা বসেচে। গোপালনগরের হাজারি ময়রা

পাঁপর ভাজচে, বাসন-বেচা কুণ্ডু পানের দোকান খুলেচে, গ্রাম্য নরনারী ছেলেমেয়ের ভিড় খুবই। বাঁওড়ে দশ-পনেরোখানা নৌকার বাচ্ খেলা হচ্চে। শ্যামাচরণদা, ফণি-কাকা, সাতুকাকা, বৃন্দাবন—এদের সঙ্গে দেখা হল। অমূল্য কামারের ছেলে এসে হাত ধরে বল্লে—কাকা, একটা পয়সা দিন না, পাঁপর ভাজা কিনব। রায়দের বাড়ির ছেলেরা অমনি ঘিরে দাঁড়াল—আমাদেরও দিন। প্রকাণ্ড বড় বটতলায় মেলা হয়। ছায়া পড়ে এসেচে ঘন হয়ে। আমি যেন স্বপ্ন দেখচি। কোথায় চট্টগ্রাম, রেণু—কোথায় মেঘনা আর পদ্মা, কুমিল্লা জেলা, নোয়াখালি জেলা, আর কোথায় দাঁড়িয়ে আছি একেবারে আমাদের গ্রামে, বাঁওড়ের ধারে বিজয়ার আড়ং দেখচি।

সন্ধ্যা হয়ে আসচে, মেলার জায়গা থেকে বুড়ীর বাড়ি এলুম। বুড়ীকে কিছু দিলাম বিজয়ার দিন -সে তো আমায় দেখে কেঁদেই আকুল। এখন যেন আর ভাল চোখে দেখতে পায় না—বড্ড বয়স হয়ে গিয়েচে। পুঁটি দিদিদের বাড়ি এসে দেখি বিলবিলের ধারে বসে পুঁটিদিদি বাসন মাজচে। খুকুদের বাড়িটা শূন্য পড়ে রয়েচে। ন'দিদিদের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর সকলকে বিজয়ার প্রণাম করে কিশোর-কাকার বাড়ি এলুম। কিশোর কাকা কিছুতেই ছাড়লেন না, বসিয়ে একটু জলযোগ করালেন। কতদিন কিশোর-কাকার বাড়ি বসে বিজয়ার দিন, জলযোগ করিনি। তারপর অশথ-তলাটায় দাঁড়িয়ে একবার ভাবতে চেষ্টা করলুম—কালও ছিলুম পদ্মার ওপরে স্টীমারে —রাজবাড়ি, বিক্রমপুর এপারে—ওপারে ফরিদপুর, কোথায় সেই চন্দ্রনাথ পাণ্ডার বাড়িতে সেই ছোট্ট প্রতিমাখানা, সেই আমলকী গাছে ঠেস দিয়ে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে থাকা—আর কোথায় আমার বারাকপুরের হেলা কাঁটালতলা!

চলে এলুম গাড়ি করে বনগাঁয়ে। হরিবাবুর বাড়ি, পটলের বাড়ি, বীরেশ্বর-বাবুর বাড়ি বিজয়ার প্রণাম আলিঙ্গন সেরে ফেললুম। সুপ্রভাদের বাড়িতে তারাও বাবার বাড়ি বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ করচে পরস্পরে। খুকু—সুপ্রভা—রেণু—ওদের সকলকেই মনে মনে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দিই।

এবার ভারী চমৎকার পূজো কাটল। সপ্তমীতে প্রতিমা দেখলুম চট্টগ্রামে, অষ্টমীতে চন্দ্রনাথে, নবমীতে কলকাতায় বিভূতিদের বাড়ি, দশমীর প্রতিমা বনগাঁয়ে ও বারাকপুরে। আর কোথাও যাব না। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে—ঘোড়ার গাড়ি যেন চলেচে ঘন বনবীথির মধ্যে দিয়ে বনগাঁয়ে। আমি বসে বসে চাটগাঁয়ের কথা, পথের কথা ভাবচি। সুপ্রভার কথা ভাবচি। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর রাত্রি! বন-পুষ্পের জ্যোৎস্নামাখা সুবাস সন্ধ্যার হিম বাতাসে।

আজ দিন-দশ বারো এখানে এসেচি। ক'দিন খুবই ভাল লেগেছিল—এখনও লাগচে মন্দ নয়। বৈকালে কুঠীর মাঠের সেই জলাটার ধারে বেড়াতে যাই—বনে ঝোপে সর্ব্বত্র বনমরচে ফুলের সুগন্ধ। ওইখানের ঝোপগুলোতে কেলেকোঁড়া আর কেঁয়ো-ঝাঁকার ফুল ফুটে গন্ধে আমোদ করচে—বিশেষ করে কেঁয়োঝাঁকার ফুল। কুঠীর মাঠের দিকে বনমরচে লতা বেশী নেই। রোদ রাঙা হয়ে আসে, তখনও পর্যন্ত বসে থাকি, আজও আবার এক রাখাল ছোঁড়া জুটে গল্প করে আমার চিন্তার ব্যাঘাত করতে লাগল। ফিরবার সময় আটির মাঠ দিয়ে গিয়ে বাঁওড়ের ধারের পথে পাড়ি ও গোসাঁইবাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরি। আজ কি চমৎকার রাঙা মেঘ করেছিল সন্ধ্যার কিছু আগে! আমি গায়ের চেক্ চাদরখানা পেতে কতক্ষণ মাঠের মধ্যে বসে রইলুম ভূষণো জেলের কলাবাগানের পাশের জমিতে। এক পাশে আটির ডাঙায় নিবিড় বন, সামনে মুক্ত মাঠে বৈকালের ঘন ছায়া, মাথার ওপরে আকাশে ময়ূরকণ্ঠি রং, চারিধারে

রাঙা মেঘের পাহাড়পর্ব্বত—যেন উঠতে ইচ্ছা করে না। সুপ্রভা কাল যে রুমাল ও বালিশ ঢাক্‌নিটা পাঠিয়েছে, তার সঙ্গে চিঠি ছিল, কাল তো নদীর ধারে মাঠে বসে হাট থেকে এসে পড়েছিলুম, কিন্তু সন্ধ্যার ধূসর আলোয় ভাল পড়তে পারি নি, আজও সেখানা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলুম। খুকু এবার এখানে নেই, সদাসর্ব্বদাই তার কথা মনে হয়—দুপুরে সে যেন পাশের পথটা দিয়ে আসচে। এসেই বলচে—কি করচেন? চার পাঁচ বছর পরে এই প্রথম দীর্ঘ অবসান আমি বারাকপুরে কাটাচ্চি, যখন ও এখানে নেই। সেই জন্যই এখনও ওর অনুপস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি মন।

ন'টার গাড়ি যাওয়ার শব্দ পাচ্চি, নিজের খড়ের ঘরটায় বসে আলো জেবলে ডায়েরীটা লিখ্‌চি। এখনও মশারির মধ্যে হ্যারিকেন লণ্ঠন জবালালে গরম বোধ হয়—অথচ মশা এমন যে মশারি না খাটিয়ে লেখাপড়া করার জো নেই রাত্রে। দিনটা এখানে বেশ কাটে, রাত্রে অন্ধকার আর নির্জ্জনতায় যেন হাঁপ লাগে। কারো বাড়ি গিয়ে একটু দুদণ্ড গল্প করব এমন জায়গা নেই। পচা রায় ছিল, সে ডাক্তারী করতে গিয়েচে শুনচি আমডোরে।

আমাদের বাড়ির পেছনের ওই বাঁশবাগানটায় যে ডোবা আছে, আজ দুপুরে শুকনো বাঁশের খোলা পেতে রোদে ওখানে খানিকটা বসে ভারী ভাল লাগল। ঘন বাঁশবন, চারিদিকে বনমরচে ফুলের ঘন সুগন্ধে আমোদ করেছিল দুপুরের বাতাস—বরোজপোতার ডোবার ওপারে কখনো বসে দেখিনি কেমন লাগে। জায়গাটা বড় চমৎকার।

কুঠীর মাঠের অনেক বন কেটে ফেলেচে বেলেডাঙার চাষীরা। ওরা এবার অনেক জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করচে। কুঠীর মাঠের বন আমাদের এ অঞ্চলের একটা অপূর্ব প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু কাকে তা বোঝাব!

আজকাল বনে-জঙ্গলে মাকড়সার নানা রকম জাল পাতা দেখি—দু' তিন বছর থেকে আমি এটা লক্ষ্য করচি। জাল গড়বার কৌশল ও বৈচিত্র্য আমায় বড় আনন্দ দেয়—কিন্তু আজ সকালে কুঠীর মাঠে একটা জাল দেখেচি, যা একেবারে অপূর্ব্ব। ঘাসের মধ্যে দুটি দুর্ব্বাঘাসের পাতায় টানা বাঁধা ঠিক একটি এক-আনির মত একটা মাকড়সার জাল। মাকড়সাটা প্রায় আণুবীক্ষণিক, তাকে খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব—একটা ঘাসের পাতা ধরে একটুখানি নাড়া দিতে একদিকের জাল যেন একটু নড়ে উঠল—কি যেন একটা প্রাণী নড়াচড়া করচে সেখানটাতে। ওই এক আনির মত ছোট্ট জালটুকুই ওর জগৎ।

ন'টার গাড়িতে রাণাঘাট গেলুম অবনীবাবুদের বাড়ি। অমৃত-কাকা সঙ্গে গেলেন। বৈকালে ওখান থেকে বন্ধুর শ্বশুরবাড়ি। বন্ধুর স্ত্রী এখানেই আছে। রেলবাজারে নীরুর সঙ্গে দেখা, তার মুখে শুনলুম খিনু এখানে নেই। গোপালনগর নেমে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমি ও নন্দ ঘোষ বাজার পর্য্যন্ত এলুম। যুগলের দোকানে ভাগ্যিস বুদ্ধি করে লণ্ঠনটা রেখে গিয়েছিলুম ওবেলা।

আজ বিকেলে কুঠীর মাঠে গিয়ে সেই ঝোপটার পাশে ঘন অপরাহ্নের ছায়ায় ঘাসের ওপর একটা মোটা চাদর পেতে বসে, 'কেঁয়েঝাঁকা' ফুলের সুঘ্রাণের মধ্যে 'আরণ্যক'-এর একটা অধ্যায়ের খসড়া করছিলুম। কি নীরব শান্তি, কি পাখীর কাকলী, কি বন-ফুলের ঘন সুবাস! নানারকম চিন্তা মনে আসে ওখানে নির্জ্জনে বসলে, আমি দেখেচি

ঘরের মধ্যে বসে সেরকম খুব কম হয়। মনের আনন্দই তো সৃষ্টির গোড়ার কথা—দুঃখও বটে—কারণ আসলে অনুভূতির গভীরতাটাই আসল, দুঃখেরই হোক বা আনন্দেরই হোক। আজ সকালেও বেলেডাঙার বটতলার পথটাতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, মাঠের মধ্যে সেই যে একটা ঝোপ আবিষ্কার করেছিলাম সেবার—তার পথটা বুজে গিয়েচে শেঁয়াকুলকাঁটায়, ঢুকতে পারা গেল না। নদীতে নেমে সাঁতার দিয়ে গিয়ে উঠলাম রায়পাড়ার ঘাটে।

সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে বসে লিখচি, শিবুদের বাড়ি কলের গান হচ্চে দেখে শুনতে গেলাম। এইমাত্র ফিরচি। অন্ধকার রাত, অন্ধকার আকাশে কি অসংখ্য নক্ষত্রের ভিড়। কত জগৎ, কত পৃথিবী—Jeans, Eddington-দের ও কথাই মানিনে যে এই পৃথিবী ছাড়া আর কোথাও মানুষের বাসের উপযুক্ত গ্রহ বা নক্ষত্র নেই। এই রকম পরিচিত গ্রামের পথ, ওই যে বকুলতলাটা, শিউলিতলাটা—যা কত দিনের স্মৃতিতে মধুর—আর কোথাও বিশ্বে এমন নেই—স্রষ্টা বুঝি দেউলে হয়ে পড়েছিলেন কায়ক্লেশে পৃথিবীকে তৈরী করেই।

সে অনন্ত, বিরাট দেবতাকে প্রণাম করি। কে-ই বা তাঁকে চেনে, বোঝে বা জানে! যাঁরা জেনেছিলেন, তাঁরা কাউকে বলে বোঝাতে পারেননি বা সে চেষ্টাও বোধ হয় করেননি—অসম্ভব বলেই করেননি—সাধারণ লোকের জন্যে কতকগুলো মিথ্যে মনগড়া ফাঁকির সৃষ্টি করে গিয়েচেন।

আজও বিকেল তিনটার সময় কুঠীর মাঠের জলার ধারে সেই ঝোপটাতে এসে বসে 'আরণ্যক' এর একটা অধ্যায় লিখচি। লেখবার জন্যেই এই জায়গাটাতে এসেচি। ভারী সুন্দর বনকুসুমের গন্ধটা—চাঁপা ফুলের গন্ধটাই বেশী। আমার মাথার উপরে থোকা থোকা ফুলে ভরা ডালটা দুলচে, এখন রোদ রাঙা হয়ে এসেচে যখন এটা লিখচি, জলার পাখীর দল কি অবাধ কূজন শুরু করেচে, গন্ধটা আরও ঘন হয়েচে। ওপারে গাছগুলোর বিচিত্র ও বিভিন্ন ধরণের শীর্ষদেশে রাঙা রোদ পড়ে কি সুন্দর দেখতে হয়েচে! পাখীর দল উড়ে যাচ্চে। এইখানে বসে সুপ্রভার ৺বিজয়ার চিঠিখানা পড়ছিলুম আজ। এইখানেই লেখা বন্ধ করি। সন্ধ্যা হয়ে এল। জগোদের নিয়ে হাজারির ওখানে গোপালনগরে কালীপূজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে সন্ধ্যার পরেই।

উঠে বাড়ি এসে জগো ও জিবুকে নিয়ে প্রথমে গেলুম বুড়ীর বাড়ি। বুড়ী উঠতে পারে না, তাকে দেখেশুনে গোপালনগর গেলুম। দারিঘাটা পুলটার ওপর থেকে ছায়াপথটা কি চমৎকার দেখাচ্ছিল। কত নক্ষত্র, অসংখ্য, অসীম। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম পুলের ওপরে। হাজারিদের বাড়িতে কালীপূজোতে প্রতি বৎসরই আনন্দ উৎসব হয়। এবার জিতেন, সুধীরদা ছিল—চট্টগ্রাম ভ্রমণের গল্প করলুম ওদের কাছে। বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল রাত এগারোটা। নক্ষত্রের জ্যোতি আরও ফুটেচে। কালপুরুষ নদিদিদের উঠোনের ওপারেই উঠে এসেচে। আজ যে নক্ষত্রসংস্থান এই কালীপূজোর রাতে, পঞ্চাশ বছর আগেও এমনি উঠত, আমার ঠাকুরদাদা যখন শিশু তখনও এম্‌নি উঠেচে, দুশো বছর আগে যখন শাঁখারীপুকুরের ধারে বর্দ্ধিষ্ণু শাঁখারীর বাস ছিল তখনও এমনি উঠত। আবার পঞ্চাশ বছর কি দুশো বছর পরে ঠিক এমনি দিনে এমনি কালীপূজোর রাতে ওরায়ন নদিদিদের বাড়ির উঠোনের ওপরে এমনি উঠবে—কিন্তু তখন পাশের বাড়ির পথটা দিয়ে বিলবিলের পাশ দিয়ে খুকুও অমন আসবে না—কে কোথায় চলে যাবে। নতুন দল তখন আসবে পৃথিবীতে—তাদের

হাসি কান্না প্রেম ভালবাসায় মুখর হয়ে থাকবে গ্রামের বাতাস।

কাল এখান থেকে চলে যাব। পুজোর ছুটি ফুরিয়ে গেল। এবার খুকু ছিল না, তা হলেও কেটেছিল বেশ। বৈকেলে প্রায়ই কুঠীর মাঠে বনে ঝোপের ধারে বসে বিকেলটা কাটাতুম—ভারী আনন্দ পেতাম। এখন রাত্রি দশটা, আমার ঘরে নির্জ্জনে বসে লিখচি। পুঁটি দিদি মাঝের গাঁ থেকে এসেচে, আমার জন্যে একটা ভাঙীর ফুলের ডাল এনেচে ফুল সুদ্ধ। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ি বসে একটু গল্প করে এলুম। কাল গ্রাম ছেড়ে যাব, সকলের জন্যেই কষ্ট হচ্চে। গঙ্গাচরণ মনু রায়দের বাড়ি বসে ভাঙা হারমোনিয়ম বাজিয়ে বেসুরো গলায় সেকেলে যাত্রা দলের গান গাইচে ; মনে হচ্চে, আহা, ওই একটু গিয়ে বসে শুনে আসি। এদের সকলের জন্যেই কষ্ট হয়। গ্রামের এই সব লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত—ওদের জীবনে কোন আমোদ-প্রমোদ নেই- জগতের কিছু দেখেও নি, শোনেও নি। সকলের জন্যেই মন কেমন করে। মনু রায়দের বাড়ির মেয়েরা বাঘ-আঁচড়ায় গিয়েছিল কালীপুজো দেখতে—এখন সব গরুর গাড়ি করে বাড়ি এল।

সীতে জেলের নৌকোয় বিকেলে বনগাঁ এলুম। বেলা তিনটার সময় বেরিয়েচি, গাজন বাঁশতলার ঘাটে মাছ ধরচে, ফণিকাকা মাছ ধরচে চট্‌কাতলার নীচে। চালকীর ঘাটে একটা লোক ছিপে প্রকাণ্ড কাছিম বাধিয়েছিল, আমরা নৌকা নিয়ে কাছে গেলাম, সুতো কেটে নিয়ে কাছিমটা গেল পালিয়ে। সীতানাথ মাঝি বিশ বছর আগে নেপাল মাঝির নৌকোয় ভোলা ও বরিশালে গিয়েছিল—সে গল্প করতে লাগল, ওরা নৌকোতে কাজ করত, বাদুড়ে থেকে খাবার জন্যে চাল ডাল কিনত। নলচিটিতে সুপুরি কিনে বিক্রী করতে করতে বনগাঁ পর্য্যন্ত আসত—ওখানে সব বিক্রী হয়ে যেত। নৌকোতে মধু ছিল—চালতেপোতার বাঁকে ছায়াভরা সেই সুন্দর বনঝোপের কাছে এসে সে নৌকার দাঁড় বাওয়া রেখে তামাক সাজতে বসল। রোদ ক্রমে রাঙা হয়ে এল, দুধারে বড় ঝোপ, সাঁইবাবলা বনের অপূর্ব্ব শোভা! পুজোর ছুটিটা বারাকপুরে বেশ কেটেচে, বরোজ-পোতার ডোবার ওপারের কথা এখনও ভুলতে পারচি নে। এই বাঁশবাগানটায় কি যে একটা মায়া আছে! তারপর সাজিতলার বনটা এবার নতুন আবিষ্কার। সকলের চেয়ে আমার ওইটাই লেগেচে ভাল। কুঠীর মাঠের জলার ধারে ওই ডাঙাটা। সবই ভাল, কেবল সন্ধ্যার পরে লোক অভাবে বড় নির্জ্জন লাগে। নয়তো এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সমাবেশ কোথায় আছে কলকাতার এত কাছে? সুপ্রভাকে পাঠাব বলে কিছু বনের ফুল সংগ্রহ করেছিলুম। কাল পাঠাব।

কাল বৈকালে খুকুদের ওখানে দেখাশুনো করে এলুম। বেশ কাটল বিকেলটা। যতীনদার বাড়ির ধারের ডোবাটাতে সকালে উঠে যেতে গিয়ে দেখি সাদা সাদা কচুরির ফুল ফুটে আলো করে রেখেচে। কি যে তার শোভা! আবার বেড়িয়ে ফিরবার সময় ঘণ্টা-দুই পরে দেখি সূর্য্যের কিরণে ফুলগুলোর রং এর মধ্যেই নীলাভ হয়ে উঠেচে। সূর্য্যের আলোয় কি যে রসায়ন বুঝলুম না—ফুলগুলির কাছে ঘাসপাতার কি ল্যাবোরেটরি নিহিত, তাই বা কে বলবে? আমি দেখে ভারী মুগ্ধ হয়েচি।

আজ সকালে রাম অধিকারী ডাক্তারের সঙ্গে দেখা মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটে। সে ধরে নিয়ে গেল তার বাড়ি। সেখান থেকে গল্পগুজব করে এসে বাড়িতে অভিভাষণের

শেষটুকু লিখি। দুপুরের পরে গেলুম সজনীর বাড়ি। ছেলেবেলায় রামকৃষ্ণ রায়ের পদ্য-মহাভারত একবার পড়েছিলুম, গ্রামে তখন কি একটা নিমন্ত্রণ ছিল। মা এক বাটি সুজি করে দিলেন খেতে অনেক দেরি হবে বলে, আর চালভাজা। আমি খেতে খেতে মহাভারতখানা পড়তে লাগলুম রান্নাঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু সেদিন আর দেরি হয়নি, অল্প পরেই খাবার ডাক এসেছিল। আজ সেই মহাভারতখানা সকালে পড়তে পড়তে ছেলেবেলার সেই কথাই মনে পড়েছিল।

সজনীর বাড়ি অমিয় মোটর নিয়ে এল আমাদের নিয়ে যেতে। মনোজ বসু আমাদের সংগে যাবে বলে এসেচে। ওকে দেখে খুব খুশি হলুম। প্রেমেনকে তুলে নিলাম বরানগর থেকে কালী ব্রিজ পার হয়ে। আজকাল দক্ষিণেশ্বর একটা রেলওয়ে স্টেশন হয়েচে জানতুম না। শ্রীরামপুরে টাউন হলে যখন আমরা পেঁাছুলাম তখন চারটে বেজেচে। লোক আসতে শুরু হয়েচে। সভার কাজ আরম্ভ হল। প্রথমেই কথাসাহিত্য শাখার কাজ আরম্ভ করবার জন্যে সবাই মত দিলে। কাজেই আমার অভিভাষণ প্রথমেই পাঠ করতে হল। তারপরে প্রেমেনের। বেশ বিকেলটা। সভার কাজ করতে করতে ডাইনের বড় জানলা দিয়ে অপরাহ্নের আকাশ ও একটা তালগাছের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল আগে শ্রীরামপুরে আসতুম জ্ঞানবাবুর সংগে—সে এক ধরণের দিন ছিল। আমাদের গ্রামে আমার খড়ের ঘরখানার কথাও মনে হল। বকুলতলায়ও এমনি ছায়া পড়ে এসেচে, এই তো সেদিন ছেড়ে এসেচি, কিন্তু তাদের কথা মনে হচ্ছে।

সভার কাজ শেষ হবার কিছু আগে আমি চলে এলুম বিনয়দাদের বাড়ি। হরিদাস গাঙ্গুলী সামনের রবিবার শেওড়াফুলি যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। দিদিদের বাড়ি দেখলুম শান্তি এসেচে, মানুও আছে। শান্তি আমার অনেক বই পড়েচে, বলতে লাগল। ওখান থেকে উঠে লীলা দিদিদের বাড়ি এলাম। লীলা দিদি না খাইয়ে ছাড়লেন না। তারপর ট্রেনে আমি, প্রেমেন, সুরেন গোস্বামী একসংগে এলুম। মনোজদের দল আগের ট্রেনে চলে গিয়েচে সভা ভাঙতেই। বেশ কাটল রবিবারটা। কাল স্কুল খুলবে। পুজোর ছুটি আজই শেষ হল।

ঘুমিয়ে উঠেই মনে পড়ল বহুদিনের কথা—যখন আমরা কেওটা থেকে ফিরচি—আমার বয়স ছ'বছর—রাজি ও পটীদিদি আমাদের বাড়ির সামনের পথে বাঁশের খোলা ও ধুলো নিয়ে খেলা করচে। ওরাও তখন নিতান্ত বালিকা। আজ এতক্ষণ পাগলা জেলে গিয়ে নদী থেকে নেয়ে এসেচে। কারণ সাড়ে এগারোটার ট্রেনে সে গিয়েচে—ওর কথা ভাবতেই মনে পড়ল।

বারাকপুরকে মধুর করে গিয়েচে কত লোক। পিসীমা ছেলেবেলায়। মা, চক্কত্তি-খুড়ীমা, জ্যাঠাইমা, সইমা, মণি আর একটু বেশী বয়সে। প্রথম যৌবনে গৌরী। এদের দান কত বড় তাই ভাবছিলুম। সেই পিসীমার উঠোন ঝাঁট দেওয়া, হেমন্তের এক বিকেলে হঠাৎ কোথায় অন্তর্ধান। সেই গৌরী তাকের কোণে কি একটা নিতে এল। সদ্যস্নাতা কিশোরী, ভিজে চুল পিঠে দুলচে। আমি কাছেই তক্তপোশে বসে পড়চি পুরানো বই—আমার দিকে চেয়ে লাজুকচোখে হাসলে—তারপর সেও কোথায় গেল চলে। মার কত দিনের কত ভালবাসা মনের মধ্যে গাঁথা রয়েচে।

এখন যারা বারাকপুরে বাস করে তারা জানে না বারাকপুর কি। এখানে যে দেবী বাস করেন, সৌন্দর্য্যময়ী রহস্যময়ী গ্রাম্যদেবী—বরোজপোতার বাঁশবনে রাঙা-রোদ সন্ধ্যাবেলায় তাঁর আসন পাতা, আমি যেন কতবার একলা সেখানে বেড়াতে গিয়ে

দেখেচি। আর কেউ দেখেনি।

একসঙ্গে সবাই দেহ ধরে পৃথিবীতে এসেচি এ্যাড্ভেঞ্চারের জন্যে। সবাই, পৃথিবীসুদ্ধ নরনারী একই সময়ে যারা পৃথিবীতে এসেছে—পরস্পরের আত্মীয়। তাদের উচিত পরস্পরকে সাহায্য করা, পরস্পরকে elevate করা। কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে থাকার জন্যেই পরস্পরকে শত্রু বিবেচনা করে। নইলে কি স্পেনে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলে অসহায় শিশু ও নারীদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারত আজ?

মনে পড়ল, পিসীমা শীতের বদলে 'জাড়' কথাটা ব্যবহার করতেন, ছেলেবেলায় শুনেচি। এখন আর কারো মুখে আমাদের গাঁয়ে ও কথাটা শুনিনে।

আজ বিকেলে P. E. N. Club-এর একটা বিশেষ অধিবেশন ছিল, সরোজিনী নাইডু ছিলেন প্রধান অতিথি। তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন—তাই এই বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

সকালে আজ কলেজ স্কোয়ারে যখন বেড়াতে যাই, তখনও আমি জানতুম না যে ব্যাপারটা আজই হবে। সরোজ ও গিরিজাদা ছিল স্কোয়ারে, আমি আর রমাপ্রসন্ন তো আছিই। ওখানেই সরোজ কথাটা বল্লে, কারণ আমি তখনও পর্য্যন্ত চিঠি পাইনি —তারপর বেড়িয়ে এসে পত্র পেলাম।

নীরদবাবুর সঙ্গে গেলাম, চৌরঙ্গীতে একটা রেস্তরাঁতে হচ্ছে। খুব বেশী লোক হয়নি, জন চল্লিশ। মেয়েদের মধ্যে শান্তা ও সীতা দেবী। আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সুরেশ বাঁড়ুয্যে, সরোজ চৌধুরী, সুধীরবাবু—মণি বোস—এই রকম জনকতক। খগেন মিত্র ও হুমায়ুন কবীর একটু দেরি করে এলেন।

সরোজিনী নাইডু দেখলুম অদ্ভুত কথা বলতে পারেন। মেয়েদের মধ্যে অমন সুবক্তা আর অমন নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ মেয়ে আমি খুব কমই দেখেচি। ইংলণ্ডের নানা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তরুণ বয়সে কি ভাবে ওঁর প্রথমে আলাপ হয়, সে বিষয়ে অনেক গল্প করলেন, ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের কথা এত ভাল লাগছিল আমার যে আরও দুঘণ্টা বল্লে যেন ভাল হয়, এমন মনে হচ্ছিল।

ওখান থেকে সোমনাথবাবুর ও সুশীলবাবুর বাড়ি হয়ে ফিরলুম নীরদবাবুর বাড়িতে। ওরা 'বিচিত্রা' সম্পাদক হওয়ার জন্যে আমায় বিশেষ অনুরোধ করচে, কিন্তু আমি রাজী হইনি। সুশীলবাবু আজ বিশেষ পীড়াপীড়ি করলেন। আমার তো ইচ্ছে নয়।

ঈদের ছুটিতে শুক্রবারে বনগাঁ এসেচি। একদিন রাজনগরের মাঠে গিয়ে বিকেলে বসি। ঠিক যেন ইসমাইলপুরের সেই সোঁদামাটির ও কাশের গন্ধ। পরদিন চলে গেলুম বারাকপুরে। পুঁটিদিদি একা বাড়ি আছে। বরোজপোতার ডোবার ধারের বাঁশবাগান শীতের দুপুরে কি সুন্দরই হয়েচে। দুপুরের পরে গেলুম কুঠির মাঠে ইন্দুদের বাড়ি খেয়ে। ছোট এড়াঞ্চির গাছে মুকুল ধরেচে—নিৰ্জ্জন মাঠ, ভূষণ জেলের পুরোনো কলা বাগানের পাশেই। ভারী সুন্দর লাগছিল। রোদ রাঙা হয়ে গেলে উঠে এলুম বরোজপোতার বাঁশবনে আবার। তারপর হেঁটে বনগাঁয় এলুম সন্ধ্যার পরে।

আজই সকালে দেশ থেকে ফিরেচি। দেশে ভারী চমৎকার কাট্‌ল, যদিও খুকু

ছিল না, কেউ ছিল না। একাই পুঁটিদিদিদের ঘরে থাকতুম, সকালে বিকেলে নিজে খাবার তৈরী করে খেতুম, কঞ্চি কাটতুম, জল আনতুম, কাঠ ও বাঁশের শুক্‌নো খোলা কুড়িয়ে আনতুম। আর রোয়াকে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, খুকুদের বাড়ির দিকের নেবুতলার ঘাটে ফিরে সেই মেয়েটি আসচে না বসে বসে ভাবতুম। এবার বারাকপুর একেবারেই শূন্য। তবুও বেশ লেগেচে। দুপুরের পরে ভূষণ মাঝির জমিতে একটা খেজুর গাছে ঠেস্‌ দিয়ে বসে লিখতুম কি পড়তুম। ছোট এড়াঞ্চি ফুলের কি শোভাই হয়েচে চারিধারে। একদিন বেলেডাঙার পথে আমি ও ইন্দু বসে কতক্ষণ গল্প করি। নীল আকাশের তলায় বটতলার কোলে শাদা বক উড়চে। আমি বসে ভাবচি কে বলেচে আপনার সুখ্যাতি শুনতে বেশ ভাল লাগে। তাই তো শুনতে চাই।

একদিন চালকী গেলুম শিবে বাগ্‌দীর বাগানে রস খেতে। বড় বটগাছটার তলায় সে বসে বসে ভূতের গল্প করলে। একদিন আইনদ্দির বাড়ি গেলুম বিকেলে—তার এক ছোট নাতি বই নিয়ে আমার কাছে এল। বাড়ির মেয়েরা দেখতে লাগল, বনগাঁয়েও খুব হৈ হৈ করা গেল। রোজ রোজ ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আড্ডা হত। একদিন দেবেনের মোটরে সুপ্রভার চিঠি আনতে গোপালনগরে গেলুম বনগাঁ থেকে—সেদিন হাজারীর বাড়ি কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার গিয়েচে অনুকূলের মেয়ের চিকিৎসা করতে। তাদের সঙ্গে খুব আনন্দ হল। এক মুচি বুড়ীকে কাপড় দিতে আসবার আগের দিন সর্ব্ব পরামাণিকের বাগান দিয়ে নেমে ওর বাড়ি গেলুম। বেশ লাগল সে সকালটা। ইন্দুর বাড়ি সন্ধ্যায় বসে নানা গল্প হল—আগুন করে আমতলায় ন'দি ও খুড়িমা পোয়াত।

কিন্তু সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুসলমান বুড়ী মারা গেল, আমি তখন ওখানে। তার কবর দেওয়ার সময়ে আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলুম ; আর রাধাবল্লভ বোষ্টমের বাড়ির পাশের পথটা দিয়ে এলুম কতকাল পরে এক সন্ধ্যায় বুড়ীকে দেখতে। তখনো সে বেঁচে ছিল—পরদিন সকালে মারা গেল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন।

সেনেটে বিজ্ঞান কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ক্লিওরের বক্তৃতা ছিল—সেখানে খুব ভিড় হয়েচে শুনতে গিয়ে দেখি। আগের বেঞ্চিগুলো প্রতিনিধিদের জন্যে রিজার্ভ আছে, কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে অধ্যাপককে দেখা—কাজেই আমি এগিয়ে প্রতিনিধিদের বেঞ্চি দখল করে বসলুম। কি আর করি! আমার আসনের পেছনে মেয়েদের আসন, সেখানে একটি মেয়েকে যেন সেদিন ইন্দিরা দেবীর ওখানে দেখেচি। বক্তৃতা তো শেষ হল, ভিড়ের মধ্যে আমি সেনেটের পূর্বদিকের হলে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় তিনটি লম্বা-চওড়া সাহেব হলে ঢুকতে গিয়ে ঢুকবার জায়গা না পেয়ে একটা চেয়ার পেতে একপ্রান্তে বসল। আমার মনে হল এদের মধ্যে একজন সাহেব Sir James Jeans, মূল সভাপতি।

গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি স্যার জেমস্‌ জিনস্‌ ?

—হাঁ।

—আপনার বক্তৃতা কবে হবে ? আমি আপনার বইয়ের একজন ভক্ত। আপনার অধিকাংশ বই পড়েচি।

—বক্তৃতা হবে বুধবারে।

—বিষয় কি ?

—নেবুলা।

—দার্জ্জিলিং ও হিমালয় আপনাদের কেমন লাগল?

—চমৎকার।

—আপনাকে আর একটি প্রশ্ন জিগ্যেস করব। আমাকে সময় দেবেন কি?

—আমার গলা ধরেচে ঠাণ্ডা লেগে। কথা বলতে কষ্ট হয়।

আমি নাছোড়বান্দা। বল্লুম—দয়া করে এক মিনিট সময় দেবেন?

—কি বল?

—আপনার নাম কি ব্রিটিশ এসোসিয়েশন ফর সাইকিক্ রিসার্চেসের সঙ্গে জড়িত আছে?

—না, কখনো না। আমি ও জিনিস বিশ্বাস করি না।

ইতিমধ্যে একটি মেমসাহেব অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এগিয়ে এল দেখে আমিও আমার পকেট থেকে মোহিত মজুমদারের পাটনার অভিভাষণখানা বার করলুম—এই একমাত্র কাগজ যা আমার পকেটে ছিল। স্যর জেম্‌স্ মেমটির অটোগ্রাফ লেখা শেষ করে তাকে জিগ্যেস করলেন—আমি কি তোমার এই পেন্সিলটি ব্যবহার করতে পারি?

তারপর আমাকে অটোগ্রাফ দিলেন।

সেনেট হলের মধ্যে আমিও ঢুকলুম স্যার জেম্‌স্ জিন্‌সের পিছু পিছু। ওঁদের কাউন্সিলের মিটিং বসবে—ডাঃ শিশির মিত্র মঞ্চ থেকে লোকের ভিড় সরাতে ব্যস্ত। শিশিরবাবুকে বল্লুম—এঁদের মধ্যে এডিংটন আছেন? শিশিরবাবু বল্লেন—না।

ডঃ কালিদাস নাগ আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন—ডাঃ এ্যালবার্ট ডেভিস মিড-এর সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীও সঙ্গে ছিলেন। দুজনের সঙ্গে করমর্দ্দন করলুম ও কার্ড বিনিময় হল। আমি তাঁরও অটোগ্রাফ নিলুম।

ভুলে আমার ফাউণ্টেন পেনটা ডাঃ মিড-এর কাছে রেখে গিয়েছিলুম, সেনেট্ হল থেকে বার হয়ে ট্রাম লাইনের কাছে গিয়ে মনে পড়ল। ফিরে এসে সেটা আবার নিলুম।

স্যার জেমস্ জিন্‌স্-এর সঙ্গে আলাপ করেছি! স্মরণীয় দিন না জীবনের?

আজ সারাদিনটি কি অপূর্ব্ব আনন্দে কাটল! এমন দিন কটাই বা আসে জীবনে! প্রথমে তো সকালে বিশ্বনাথ এসে বনগ্রাম সাহিত্যসম্মেলনের কথা বল্লে। দেশে এমন একটা সাহিত্য সভা হবে শুনে খুবই আনন্দ হল! সেই আনন্দ নিয়েও যদি কমল সরকার আমাদের দেশে যায়, তবে সে কেমন গান গাইবে পুঁটিদিদিদের ভাঙা রোয়াকে বসে বসে—সে কথা ভাবতে ভাবতে তো স্কুলে গেলুম। স্কুল থেকে বিকেলে সুধীরবাবুর দোকানে গিয়ে শুনি আজ স্যার জেমস্ জিন্‌সের বক্তৃতা শোনা যাবে না। কার্ড বিলি করা হয়েচে, বিনা কার্ডে ঢুকতে দেবে না, মণীন্দ্রলাল বসু ওদের নাকি বলেচে। আমি মনে ভাবলুম, এই কলকাতা শহরে এমন কোন লোক নেই যে আজ আমায় Jeans-এর বক্তৃতা শুনতে বাধা দেয়। দেখি ঢুকতে পারি কিনা!

গিয়ে দেখি সেনেটের সব দরজা বন্ধ। পেছন দিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে গিয়ে দেখি সেদিকেরও দরজা বন্ধ। তখন পূর্ব্বদিকের দালানের কোণের দরজা খোলা দেখে সেখান দিয়ে ঢুকলুম। দেখি অত বড় হলে মাত্র ছ'জন প্রাণী উপস্থিত। একজন তার মধ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান জগতের লোক সুধাংশু। সে আমায় ডাক্‌লে। তার কাছে গিয়েই বসলুম! কিছু পরে সোমনাথবাবু সস্ত্রীক এলেন। ডাঃ সুশোভন সরকার এলেন, আমাকে দেখে পাশে এসে বসলেন। একটু পরে ভীষণ ভিড় জমে গেল।

দরজা সব বন্ধ, দরজার লোক ধাক্কা মারতে লাগল। ভিড় ঠেলে দেখি নুটু আসচে। নুটু সামনের দিকে গেল। বি. এম. সেন, মাইক্রোফোনের কাছে দাঁড়িয়ে বল্লেন—Ladies & Gentlemen, Sir James Jeans has arrived and I am only testing the microphone—একটা খুব হাসির রোল উঠল। একটু পরে জিনস্ বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। যখন যে শ্লাইড্খানা পড়ে পর্দ্দায় আমি অমনি বলি ওরায়ণ, নেবুলা, এটা এণ্ড্রোমিডা, সিফিড্ ভেরিয়েবল্স্-এর কথা Jeans তুলতেই সুশোভনবাবুকে বল্লুম। নিজের ওপর নিজের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। পেছনের সন্ধ্যার আকাশে দূরে একটা গ্রামের এক মেয়ে বলেছিল—আপনার সুখ্যাতি শুনতে ভাল লাগে—সেই কথা, সেই বাঁশবন, সেই বকুলতলা, সেই ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা নির্জ্জন মঠে—বার বার মনে হচ্ছিল —আর মনে হচ্ছিল শিবুর বাবাকে। আজ ফি-এর টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি—শিবুর ম্যাট্রিকের ফি, গরীব লোক, কাল হাটবেলা, পিয়নে যখন টাকা দেবে, কি খুশিই হবে। পশুপতিবাবু যে কাল ফোনে বলেছিল—আপনি মিডিয়ম ভালোই, তামার তার ভিন্ন কি বিদ্যুৎ চলে? খুব ভাল কথা।

বক্তৃতা অন্তে কালিদাস নাগ ও সেই পরশুকারের এ্যাল্বার্ট ডেভিস্ মিডের সঙ্গে দেখা। কালিদাসবাবু বল্লেন—রবিবার দুপুরে কোন এনগেজমেণ্ট নেবেন না, বিভূতিবাবু।

আমার বোধ হয় উনি কাল পার্টি দেবেন বৈদেশিক ডেলিগেটদের।

বাইরে আসবার পূর্ব্বে ডাঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দেখা। বল্লুম—মেঘনাদদাদা, ময়দান ক্লাবের কথা মনে আছে? ১৯১৪ সালের?

ট্রাম লাইনের কাছে সেনেটের সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়েই দেখি জিনস্-এর বক্তৃতার সেই কালপুরুষ উঠেচে বিদ্যাসাগরের মূর্ত্তির মাথার ওপরকার আকাশে। এই পাশের কার্নিসে বসে মাধববাবুর বাজার থেকে ফুলুরি কিনে খেতুম যখন ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—সে কথা মনে পড়ল। সেও এই শীতকালে। তখন কোথায় কি? কোথায় সুপ্রভা, কোথায় খুকু, কোথায় আমি! সুপ্রভার কথা বড্ড মনে হচ্ছে। যদি এ সময়ে সে আসত! যখন যে মেয়ে হলে ঢোকে, তখনই আমি দেখি সুপ্রভা যদি তাদের মধ্যে থাকে!

নীরদবাবু ও কান্তিবাবু রাস্তা পার হচ্ছেন, বল্লেন—কত খুঁজলুম আপনাকে। সোমনাথবাবুর মুখে শুনলুম আপনি এসেচেন। কাল যাবেন ঠিক সাড়ে চারটার সময় —'বিচিত্রা' সম্পর্কে পরামর্শ আছে।

সুধীরবাবুর দোকান হয়ে রমাপ্রসন্নের বাড়িতে বসে আশু সান্ন্যাল ও রমাপ্রসন্নের স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করে বাসায় এসে দেখি সুপ্রভা পত্র লিখেচে। সে আসচে ২৫শে জানুয়ারী কলকাতায়। কি আনন্দ যে হল; এখন যদি আসে তবে তো! তার কথার কোন ঠিক নেই।

Eddington-এর বক্তৃতায় সেনেটে বড় কড়া ব্যবস্থা ছিল। ও দুদিন খুব ভিড় ছিল বলে এ ব্যবস্থা এরা করেচে। দিনগুলো বড় ব্যস্ততা ও engagement-এর মধ্যে দিয়ে কাটচে। Dr. Fisher-এর সঙ্গে সত্যেন বোসের তর্কযুদ্ধ সেদিন বেশ উপভোগ করা গেল বেকার ল্যাবরেটরিতে। আজ সকালে সজনীর বাড়ি থেকে সাড়ে ন'টার সময় আসচি, দেখি খুব ভিড় সেনেটে। ঢুকে দেখি লর্ড হারবার্ট স্যামুয়েলের বক্তৃতা হচ্চে, বিষয় 'Basis of Philosophy', Sir James Jeans সভাপতিত্ব করচেন—তারপর জিনস্কে ভলাণ্টীয়ারেরা ঘিরে নিয়ে এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিলে—ওদিকে বক্তৃতা-মঞ্চে

লর্ড স্যামুয়েলকে বহুলোকে ঘিরেচে বক্তৃতা-মঞ্চের ওপরে, অটোগ্রাফের জন্য। জিনস্ অনেকক্ষণ মোটরে বসে ডাঃ কমল মুখার্জ্জির সঙ্গে কি বিষয়ে কথা বলার পরে মোটর থেকে নেমে লর্ড স্যামুয়েলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। লর্ড স্যামুয়েলকে বল্লেন—I will see you after lunch. এইটুকু মাত্র আমার কানে গেল। তারপর লর্ড স্যামুয়েল গবর্নরের মোটরে চলে গেলেন। বহুলোক জড় হয়েছিল সেনেটের সামনের রাস্তায় এঁদের দেখবার জন্যে।

দুটো বিষয়ে দুটো অদ্ভুত গোলযোগ ঘটল দিন কয়েকের মধ্যে, তাই সেটা এখানে লিখে রাখলাম। প্রথম কথাটা আগে বলি। ১৯১৩ সালে যখন আমি বন-গাঁয়ে বিধুবাবুর ওখানে থাকি, ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, তখন নতুন 'ভারতবর্ষ' বেরুল। মন্মথবাবু মোক্তার আমাকে তখন 'ভারতবর্ষ' পড়তে দিতেন। 'ভারতবর্ষ'-এ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক একজন নতুন লেখকের গল্প পড়ে অল্প বয়সেই মোহিত হয়ে যাই। ভাবি, এমনধারা লেখক তো কখনো দেখি নি—কত তো গল্প পড়েছি। তারপর বহুদিন কেটে গিয়েছে, যাক্।

গত রবিবার সেই বনগাঁয়ে সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায় বসে গল্প করচি অনেকে—এমন সময়ে অপূর্ব্বের ছেলে অরুণ একখানা অমৃতবাজারে পত্রিকা হাতে দিয়ে বল্লে—শরৎবাবু মারা গিয়েচেন, এই যে কাগজ।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কাগজখানায় বেরিয়েচে, রবিবারে তিনি বেলা দশটার সময় মারা গিয়েচেন।

কি যোগাযোগ তাই ভাবি। কত জায়গায় বেড়ালুম, কত দেশে গেলুম, কত লোকের বৈঠকখানায় বসলুম—কিন্তু শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ কোথায় পেলুম—না সেই বনগাঁয়ে, সেই মন্মথ মোক্তারের বৈঠকখানায়, যে আমায় অত বছর আগে শরৎচন্দ্রের লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় করে দিয়েছিল!

ভাববার কথা নয়?

এইবার অন্যটার কথা বলি। সেটা ঘটল আজ এখুনি, এই সন্ধ্যার সময়।

১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাসে আমি মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের একটা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে দিনকতক খেতুম। উড়ে ঠাকুরটার নাম সুন্দর ঠাকুর। সে এখনও আছে বেঁচে, তবে ওখানকার হোটেল সে আজ ১৫।১৬ বছর উঠিয়ে দিয়েচে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে পথেঘাটে দেখাশোনা হয়।

এখন এই ১৯১৯ সালের জানুয়ারী মাস আমার জীবনে বড় শোকাবহ দুর্দ্দিন—হাতে নেই পয়সা, মনেও যথেষ্ট অবসাদ ও হতাশা। গৌরী সেবার মারা গিয়েচে। সুন্দর ঠাকুরের দোকানে রাত্রে গিয়ে লুচি খেতুম—কোথা থেকে যে দাম দেব না ভেবে খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি।

তারপর সুন্দর ঠাকুরের হোটেল উঠে গেল, সেখানে অন্য কি দোকান হল। আমিও চলে গেলুম কলকাতার বাইরে। জাঙ্গিপাড়া, হরিনাভি, চাটগাঁ, কুমিল্লা, ভাগলপুর, মুঙ্গের নানাস্থানে—কোথায় বা না গিয়েচি চাকরি নিয়ে? বহুকাল পরে কলকাতায় ফিরে আবার যখন এইখানেই চাকরি নিলুম, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় সুন্দর ঠাকুরের হোটেলের ঘরটা প্রায়ই চোখে পড়ত। ভাবতুম পুরোনো দুর্দ্দিনের ঘটনা ওই ঘরটায় সেদিন আমার সেই মেঘাচ্ছন্ন দিনগুলির স্মৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো—না ভেবে পারিনে।

আজ একটা বালিশের খোলে তুলো ভর্ত্তি করার দরকার হল। পাটনায় বক্তৃতা আছে শনিবার, সেখানে যেতে হবে, অথচ ভাল বালিশ নেই। মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটে এক

জায়গায় একটা তুলোর দোকান। দোকানে বসে তুলো ভর্ত্তি করে উঠতে যাচ্ছি এমন সময়ে নজর করে দেখলুম এটা সেই পুরোনো দিনের সুন্দর ঠাকুরের সেই হোটেলের ঘরটা। আজকাল সেখানে তুলোর দোকান হয়েচে।

মনে পড়ল এও জানুয়ারী মাস এবং ১৯১৯ সালের পরে আজ এই প্রথম আবার সেই ঘরটাতে ঢুকে বসলুম। তারপর ফিরে আসচি হঠাৎ মনে পড়ল বালিশের খোলটা সুপ্রভা তৈরী করে পাঠিয়ে দিয়েছিল কিছুদিন আগে। কি অভাবনীয় যোগাযোগ।

কাল হাওড়া স্টেশনে ট্রেন অত্যন্ত দেরিতে এল। রাত্রে ঘুম ভাল হয় নি। একে তো বেজায় শীত, তার ওপর কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠেছে দূর মাঠের মাথায়। ট্রেনের জানালা খুলে সেই শীতের মধ্যেও হাঁ করে চেয়ে আছি। সৌভাগ্যের বিষয় একটা কামরা আমরা একেবারে খালি পেয়েছিলুম, অরবিন্দ গুপ্ত বলে এক ভদ্রলোক (অত্যন্ত সুপুরুষ লোক, আমি অমন সুপুরুষ খুব কমই দেখেচি) সপরিবারে পশ্চিমের দিকে যাচ্চেন, তাঁরাই কেবল ছিলেন আমার কামরাতে, আর কেউ নয়। একখানা পুরোনো ডায়েরী ছিল আমার কাছে বাবার, তাতে পড়ে দেখা যায়—বাবা ১২৮৭ সালের দিকে পশ্চিম ভ্রমণে বেরিয়ে এই পাটনা, মুঙ্গের, আগ্রাতে এসেছিলেন।

ভোর হল শিমুলতলা স্টেশনে। আর বছর যখন পাটনা আসি, আমি, সজনী, নীরদ, ব্রজেনদা—ভোর হয়েছিল কিউল স্টেশনে। অরবিন্দবাবুটি অতি ভদ্রলোক, আমাকে খাবার খেতে দিয়ে বল্লেন—একটু মিষ্টিমুখ করুন। অথচ তিনি আমায় জানেন পর্য্যন্ত না।

রৌদ্র উঠল কিউলে। বিহারের দূরবিসর্পী প্রান্তর, অড়রের ক্ষেত, সরিষার ক্ষেত, খোলার বাড়িওয়ালা গ্রাম, চালে চালে বসতি, ইঁদারা, ফণি-মনসার ঝোপ, মহিষের দল আরম্ভ হয়ে গিয়েচে। শিমুলতলায় পাহাড়ের শোভা যদিও তেমন কিছু দেখলুম না তবুও শেষরাত্রের জ্যোৎস্নায় সাঁওতাল পরগণার উচ্চাবচ প্রান্তর ও ছোটখাটো পাহাড়-রাজি দেখতে দেখতে এত বিভোর হয়ে গেলুম যে ঘুম কিছুতেই এল না।

পাটনা স্টেশনে মণি ও কলেজের ছাত্রেরা নামিয়ে নিতে এসেচে। তার আগে বক্তিয়ারপুর স্টেশনে কালা ও পশুপতি প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে ছিল দেখা করবার জন্যে। অনেকদিন পরে ওদের সঙ্গে দেখা হল। মণিদের বাড়ি আসবার কালে মোটরটা বড় ঘুরে এল—কারণ এক জায়গায় রাস্তায় পিচ্ দেওয়া হয়েচে নতুন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আজকাল পাটনাতেই রয়েচে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বল্লে, এ জায়গা ভাল লাগচে না, বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তারাশঙ্কর একজন সত্যিকার ক্ষমতাবান লেখক, বাংলার মাটি থেকে ও প্রাণরস সঞ্চয় করচে, ওর কি ভাল লাগে এসব জায়গা?

মণিদের ছাদের ওপরে দুপুরের নীল আকাশের তলায় বসে এই অংশ লিখচি। সুপ্রভাকে একটা চিঠি দেব। দূরে তালের সারির মাথায় অনেকটা দূর দেখা যাচ্চে, এই নিস্তব্ধ দুপুরে সুদূর বাংলার একটি সজনে ফুল বিছানো পল্লীপথের কথা মনে পড়চে, একটি সরলা পল্লী বালিকা এসময়ে কি করচে সে কথাও ভাবচি।

ছাদের ওপর যোগীনবাবুর দুই নাতনী খেলতে এসেচে আর বলচে—

চু কপাটি আইয়া
যাকে পাবে ভাইয়া...

এ কি রকম খেলার ছড়া? বাংলাদেশে তো এ ছড়া কোন ছেলেমেয়ের মুখে শুনিনি!

পাটনা কলেজের হলে মিটিং। সেখানে অনেকদিন পরে অমরবাবুকে দেখে বড় আনন্দ পেলুম। সেই ভাগলপুরের অমরবাবু! ইনি শুনলুম এখন এখানে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী, কিছুদিন আগে এখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ ছিলেন। তারাশঙ্করও উপস্থিত ছিল, ও আজকাল এখানেই থাকে মামার বাড়িতে। সভার টেবিলে বাবার পুরোনো ডায়েরীখানা পড়ে দেখছিলুম তিনি পাটনায় এসেছিলেন কবে। ঠিক সাড়ে ছ'টার সময়ে সভা থেকে উঠতে হল, তারাশঙ্করকে সভাপতির আসনে বসিয়ে চলে এলুম, সঙ্গে সঙ্গে এলেন অমরবাবু। ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার পিছু পিছু এসে বল্লেন—একটা কথা বলতে সঙ্কোচ হচ্চে, আপনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, আপনারা কলকাতা থেকে এসে বক্তৃতাটি দিয়েই পালান, এতে এখানকার লোকে দুঃখিত।...একটি ছেলে দোরের কাছে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলে, একবার দুবার। একবার করলে, তখন আমি ওর দিকে চাই নি। আবার যখন করলে, তখন আমি ওর কাঁধে হাত দিয়ে বাইরে নিয়ে গেলুম। বল্লুম—তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? ও বল্লে—বাড়ি ভাগলপুরে। আমি নবীন গাঙ্গুলীর নাতি। তখন তো আমি অবাক্। ওদের বাড়ি কত গিয়েচি ভাগলপুরে থাকতে সে কথা বলি। তিনকড়িকে চেন? বলতেই বল্লে—হাঁ, তিনি আমার মেসোমশায়।

অমরবাবুর মোটরে মণিকে তুলে নিয়ে চলে এলুম মণিদের বাড়িতে। ইন্দু যে কোথায় ছেঁড়া মাদুর পেতে বসে আছে, খুকু যে ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়ে ভুগচে, কেবল এই সব কথা মনে পড়ে। মণির বাড়িতে এসে চা খেতে খেতে অমরবাবুর সঙ্গে ভাগলপুরের দিনের গল্প করি। মোটরে আসতে আসতে তিনি মণিকে ক্ষীরোদবাবুর অশরীরীরূপে ঘরে উপস্থিত থাকার সেই পেটেণ্ট গল্পটি করলেন। আমি তো শুনে অবাক যে গত বছরের সেই সুদর্শন যুবক প্রীতি সেনই ক্ষীরোদবাবুর ছেলে। কি সব অভাবনীয় যোগাযোগ! এবার প্রীতি সেনকে না দেখে দুঃখিত হয়েচি।

অমরবাবুর গাড়িতেই স্টেশনে এলুম। মণি শেষ পর্য্যন্ত রইল। কত পুরোনো দিনের গল্প হল অমরবাবুর সঙ্গে। ওর সাদর আলিঙ্গনটি বড় বন্ধুত্বের চিহ্ন।

ট্রেনে বক্তিয়ারপুর নেমে কালীদের বাড়ি এসে দেখি সে কোথায় থিয়েটারের রিহার্সেলে গিয়েচে। একটু পরেই এল। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প হল। ঠিক হল কাল রাজগীর যাওয়া হবে সকালের ট্রেনে।

কালী ও কালীর মামাশ্বশুর আমার সঙ্গেই ছিল। শো স্টেশনের একটা জায়গা দেখিয়ে কালী বল্লে—ওখানে আমাদের 'রসচক্র' সভা হয়েছিল, আমি একটা কবিতা পড়লুম। আমি বল্লুম—তুমি কবিতা লেখো না কি? বল্লে—শোনাব এখন? বাড়িতে আছে। আহা, ওরা সভা-সমিতিতে যেতে পারে না, এক-আধটু হলে কি খুশিই হয়।

Ignominous thirsts for respect—কি কথাই বলেচে ভিক্টর হিউগো!

চেরো, হরনৌৎ—এই সব স্টেশনের নাম। অপকৃষ্ট ও নোংরা বিহারের বস্তি। ধুলো, ধুলো—সর্ব্বত্র ধুলো। ধুলো-পড়া পেঁড়া, খোয়া ক্ষীর (এদেশে বলে মেওয়া) ও তিলুয়া বিক্রী হচ্চে দোকানে। এক ঘরের দেওয়ালের গায়ে আর এক ঘর বাড়ি তুলেচে।

শো স্টেশনে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ বলে একজন হিন্দি গ্রাম্য কবির সঙ্গে আলাপ হল। লোকটিকে এখানে সবাই পাগল বলে—তা তো বলবেই। কবিকে চিনবার

মত লোক এ সব পাড়াগাঁয়ে কে আছে? কবি আমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। আসবার সময়ে তিনি দয়া করে শো স্টেশনে আবার আমাদের কামরাতেই উঠে দেখা করেছিলেন।

রাজগীরের শৈলমালা দূর থেকে ধোঁয়ার মত দেখা গেল। কিছু পরেই বিহার-শরিফ্ ও নালন্দা। নালন্দা থেকে ট্রেন ছাড়লে দূর থেকে স্তূপ ও বাড়িঘর দেখা গেল। এবার আর নালন্দা যাওয়ার সময় হল না।

রাজগীর নেমে পাহাড়জঙ্গলের পথে সোনভাণ্ডার গুহায় চলে গেলুম। বুদ্ধের চরণরজপূত এই স্থান। ঐ গুহায় বুদ্ধদেব সমাধিস্থ ছিলেন, পাশের গুহায় তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দ ধ্যানস্থ ছিলেন।

এই পাহাড়টার নামই গৃধ্রকূট। গৃধ্রকূটের ওপরে কাঁটাগাছপালা ঠেলে অনেকটা উঠলুম। এক জায়গায় পাথর ঠেস্ দিয়ে যুৎ করে বসলুম। ঠিক দুপুর, নির্ম্মেঘ, নীল আকাশ। দূরে প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান দ্বারা খোদিত একটা স্তূপ বা চৈত্য দেখা যাচ্ছিল। পাহাড় থেকে নেমে আমি সেটা দেখতে পেলুম, কালী পাথরের নুড়ি কুড়ুতে লাগল। আমি চৈত্যটি দেখে ফিরবার সময় বাঁশবনের ছায়ায় ঝরণার স্রোতের ধারে খানিকক্ষণ বসলুম। ওরা ততক্ষণে চলে গিয়েচে। এখানেই সেই করণ্ড বেণুবন, যেখানে বুদ্ধদেব মহানির্ব্বাণ সূত্র বিবৃত করেন আনন্দকে। কালের কুয়াসায় সব ঢেকে মুছে একাকার হয়ে গিয়েচে...কোথায় কি আজ! আড়াই হাজার বছর আগেকার মত বেণু-বন কিন্তু রাজগীরের উপত্যকায় অজস্র। ব্রহ্মকুণ্ডের উষ্ণ জলে স্নান করে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হল। তারপর আমি একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে ছায়ায় বসে দূর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম--হঠাৎ মনে পড়ল আজ গোপালনগরের হাট, বেলা তিনটে, সাড়ে-তিনটে—এতক্ষণ বটতলা দিয়ে কত লোক হাটে চলেচে।

ফিরবার পথে সন্ধ্যার ছায়া পড়ে এসেচে বড় বড় মাঠে। একজন চৈনিক লামা আর একজন লামাকে গাড়িতে তুলে দিতে এসে কি একটা বাজনা বাজাচ্চে ট্যাং ট্যাং করে, আর কেবল ঘাড় নীচু করে প্রণাম কবচে। সে ভারী সুন্দর দৃশ্য! ট্রেন ছেড়ে গেলেও অনেকদূর পর্য্যন্ত বাজাতে বাজাতে চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে এল।

বক্তিয়ারপুর পেঁছে একটি ছোকরা তার কবিতা শোনাতে বসল। গাড়িতে তার লেখা কবিতা দুতিনটা শোনালে। সাহিত্যপ্রীতি ওদের বেশ প্রশংসনীয়—তবে দূর বিহারের দেহাতে কে ওদের উৎসাহ দিচ্ছে আর কে-ই বা ওদের কবিতা ছাপাচ্ছে!

রাত্রের ট্রেনেই কলকাতা রওনা হলুম, দানাপুর এক্সপ্রেসে। সারা রাত্রি ঘুম এল না। একবার একটু তন্দ্রামত এসেছিল—উঠে দেখি জসিডি স্টেশন। তারপর আবার শুয়ে পড়লুম—ভাঙা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠেচে, বেজায় ঠাণ্ডা বাতাস হু হু করে বইচে, জানালা দিয়ে মুখ বার করলে মুখে যেন লক্ষ ছুঁচ ফোটে। কুয়াসা হয়েচে, বনগুলো যেন ঠিক ইসমাইলপুরের সেই বন—অনেক রাত্রে উঠে এই শীতের সময় ইসমাইলপুর কাছারীতে ঠিক যেমন বন দেখতুম তেমনি দেখাচ্চে।

পাটনা থেকে এসে মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গেল। মধ্যে সুপ্রভা কলকাতা এল ওর মা-বাবার সঙ্গে। একদিন ওর সঙ্গে 'মুক্তি' দেখতে গেলুম 'চিত্রা'তে। ভাল লাগল না কারো, সেবা ও রবি ছিল সঙ্গে। তারপর আমার পড়ে গেল বনগ্রামে সাহিত্য-সম্মেলনের হুজুগ। বিশ্বনাথ এখানে খুব যাতায়াত করলে। খগেন মিত্র মহাশয় সভাপতি হয়ে গেলেন এখান থেকে, রমাপ্রসন্ন ও গৌর পাল গেল, খুব হৈ হৈ কাণ্ড হয়ে গেল সরস্বতী পুজোর সপ্তাহে। সাহিত্য-সম্মেলন থেকে আমায় আবার দিলে

একটা মানপত্র ও অভিনন্দন।

পরের সপ্তাহেই পড়ে গেল কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলন। আমি ঈদের ছুটিতে বাড়ি গেলুম। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠেচে, কোকিল ডাকচে, শীত যদিও বেশ, কিন্তু বসন্তের আমেজ দিয়েচে। বাড়ি গেলুম, পাড়ায় কেউই নেই এক ন'দি ছাড়া। নিজের খড়ের ঘরটিতে দুপুরে শুয়ে খুব ঘুম দিই। আগের রাত্রে যতীনকাকার মেয়ে উষার গিয়েচে বিয়ে। তখনও বরযাত্রীরা রয়েচে। যতীনকাকার মেয়ের বিয়ে দেখচি চিরকাল ঐ একই চণ্ডীমণ্ডপে।

বৈকালে কুঠীর মাঠে গাছে গাছে পাকা কুল খেয়ে বেড়াই। ভূষণ জেলের ছেলের জমিতে খেজুর গাছটায় ঠেস দিয়ে বসে 'আরণ্যক' উপন্যাসের এক অধ্যায় লিখি। সন্ধ্যাবেলায় ইন্দুর বাড়িতে সেদিনকার মিটিং ও আমার মানপত্র দেওয়া সম্বন্ধে খুব কথাবার্ত্তা হল। ইন্দু বল্লে—আজ যদি আপনার বাবা-মা বেঁচে থাকতেন!

সকালে টুকোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ছেলেবেলায় টুকো খেলত আমার ছোট বোন মণির সঙ্গে। সে আজ ১৫।১৬ বছর পরে বিধবা হয়ে গ্রামে ফিরে এসেচে। এসে আমায় নমস্কার করলে—ওর মুখ ভুলেই গিয়েছিলুম—এখন দেখে মনে হল—হাঁ, এ মেয়েকে আগে দেখেছিলুম বটে।

পরদিন সকালে নটার ট্রেনে কৃষ্ণনগর সাহিত্য-সম্মেলনে গেলুম। গাছে গাছে শিমুলফুল ফুটে লাল হয়ে আছে। সজনী, অমল বোস, সুনীতি বসু, প্রবোধ সান্যাল, বিজয়লাল সকলের সঙ্গে কৃষ্ণনগর স্টেশনে দেখা। অতুল গুপ্ত ও যামিনী গাঙ্গুলী একখানা মোটরে আসছিলেন, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় তাতেই আমায় উঠিয়ে দিলেন। মনোমোহন ঘোষের যে বাড়িতে আজকাল কলেজিয়েট স্কুল, ওখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ঢুকেই দেখি প্রবোধ সান্যাল বসে খাচ্চে। আমি ও ইউনিভার্সিটির প্রিয়রঞ্জনবাবু একসঙ্গে খেতে বসে গেলুম। খেয়েই সভাস্থলে যাই। প্রমথ চৌধুরী সভাপতি। কৃষ্ণনগর রাজবাটীর নাটমন্দিরে সভা বসেচে। কখনও এর আগে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকিনি—যদিও এর আগে বাল্যকালে একবার কৃষ্ণনগর এসেছি। তার অভিজ্ঞতা খুব অদ্ভুত। আর বছর দুই আগে কয়েক ঘণ্টার জন্যে যে এসেছিলুম আমার ছোট ভাইয়ের জন্যে পাত্রী দেখতে, সে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণনগরে বাবার সেই মা—আমাদের আলুভাতে ভাত খাওয়ানো—আমার হতাদর—কত কথাই মনে পড়ে। সেই আর এই! সে গল্প আর একদিন করব।

কৃষ্ণনগর থেকে সেই রাত্রে রাণাঘাটে এসে খগেনমামার বাড়িতে রইলুম—তাও সেই বাল্যে ওদের বাড়ি শুয়েছিলুম, আর কখনও থাকিনি। একটা সরস্বতীঠাকুর বিসর্জ্জন দিতে গেল শোভাযাত্রা করে অনেক রাত্রে। বেজায় শীত পড়ল রাত্রে।

পরদিন এলুম এগারোটার ট্রেনে গোপালনগরে। স্টেশনে আবার খগেন মিত্র ও প্রভাতকিরণ বসুর সঙ্গে দেখা। রেস্তোরাঁতে বসে চা খেতে খেতে চন্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করা গেল অনেকক্ষণ।

দেশে গিয়ে বেশ লাগল। তখনি ন'দির কাছে একটু তেল চেয়ে নিয়ে নদীতে স্নান করে এলুম। ওপাড়ার সেই কুমুরনী ক্ষার কাচছে।' শুক্‌নো ফুল পড়ে আছে কত বনসিমতলার ঘাটে। পরশু কতক্ষণ ঘাটে বসেছিলুম, বনের কুল পেকেচে একটা ডালে, দরিদ্রা পল্লীজননী আর কি দিয়েই বা আদর করবেন? তবুও কত স্মৃতি জড়ানো রয়েচে এই বনসিমতলার ঘাটের সঙ্গে! খুকু ওখানে দাঁড়িয়ে গল্প করত নেয়ে উঠে—এই তো সেদিনও।

সেদিন এসে ঘুমুলাম দুপুরে। উঠে দেখি বেলা গিয়েচে। চড়কতলায় এসে বসলুম, মুসলমান মাস্টারটি কোথা থেকে সন্ধান পেয়ে এসে পড়েচে অম্‌নি। চাচা এসে আগুন করলে ও বক্‌ বক্‌ শুরু করলে। ইন্দু রাত্রে একটি বিদেশী পথিক সেদিন কেমন করে শিঙেতলার মাঠে বেঘোরে মারা গিয়েছিল—সে গল্প করলে। সে কাহিনী বড়ই করুণ।

পরদিন সকালে সীতানাথ জেলের নৌকাতে বনগাঁয়ে চলে এলুম। ভেবেছিলুম খুকুদের সঙ্গে দেখা করতে যাব—কিন্তু ঘটে উঠল না। রাত্রে খুব চমৎকার জ্যোৎস্নায় মন্মথবাবুর বাড়ি বসে হরিবাবু, যতীনদা, ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া গেল। বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি সত্যনারায়ণের সিন্নীর প্রসাদ পাওয়া গেল।

সেখান থেকে এসে কাল গিয়েছিলুম রাজপুরে।

নগেন বাগচীদের যে বাড়িটাতে থাকতুম—অনেক দিন সে বাড়ির সে ঘরটার পথ বন্ধ ছিল। আজ দুলির ছোট ছেলের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে ঘরটার সে বারান্দাতে গিয়ে বসি। এইখানেই আমার মা মারা যান। তারপর কতকাল এ বাড়িটাতে আসিই নি। এইখানেই বালক কবি পাঁচুগোপালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সতেরো বছর আগে--যে আমায় প্রথম সাহিত্যক্ষেত্রে নামিয়েছিল।

ফিরে এসে ফুলিদের উঠোনে মাচাতলার উনুনে ওরা পরোটা ভাজতে বসল—আমি একখানা বেলে দিতে গেলুম—হল না। ফুলি ও বৌমা তো হেসেই কুটিপাটি। তারপর বৌমা বেলে দিতে লাগল—আমি শুধু নিরপেক্ষ দর্শক মাত্র। সুন্দর লেবুফুলের গন্ধ বেরুচ্ছিল।

জ্যোৎস্নার মধ্যে কাল রাত্রেই কলকাতায় ফিরি। বেগুন আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল একেবারে মেস্‌ পর্য্যন্ত। কত ধরণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির মধ্যে দিয়ে এ দিনগুলো কাটল!...না?...

সাধে কি বলি ভগবানের দান এ জীবন, যে জানে ঠিক মত এর স্বাদ গ্রহণ করতে, সে জানে এ কি মধু!

আর বছর ঠিক এইদিনে পুরী যাওয়া হল না বলে মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এবার ঠিক এই দিনেই বেশ কাটল। শনিবার সুপ্রভা আসবে বলে পত্র পেলুম, বিকেলে বেড়িয়ে এসে একটা কাগজ পেলুম তাতে জানা গেল ওরা কাছাকাছি একটা হোটেলে এসে উঠেছে। দেখা করতে গেলুম ও তারপর কার্জ্জন পার্কে বেড়াতে গেলুম ওকে নিয়ে। পরের দিন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয়ে ইডেন গার্ডেনে খানিকটা বসে কত গল্প করলুম। কিন্তু সকলের চেয়ে আনন্দ হল ওকে তুলে দিতে গিয়ে স্টেশনে। কেউ জানত না যে আমি স্টেশনে যাব—আমি একটি অদ্ভুত আনন্দ পেলুম। ট্রেনটি ছেড়ে চলে গেলেও কতক্ষণ বেঞ্চিতে বসে বসে ভাবতে লাগলাম। কত ধরণের সূক্ষ্ম অনুভূতি! ভাবুকতা জীবনের খুব বড় একটা সম্পদ। এ যার নেই, সে সত্যিই দরিদ্র। টাকায় কি করে?

শেয়ালদ' স্টেশনে আমার কল্যকার সেই দশ মিনিটের দাম অর্থে নিরূপিত হবার নয়।

বসন্তটা এমনভাবে ভাল করে দেখিনি অনেকদিন। শিবরাত্রির ছুটিতে এবার গেলুম বারাকপুরে। কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে চালকীর মুসলমান পাড়ার ওই কাঁচা রাস্তাটার ধারে ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের বনের! তার ওপর নদীর ওপারে, ঠিক গাজি-

তলার পথের বাঁকে একটা চারা শিমুলগাছে ফুল ফুটেচে, আমি যখন বারাকপুরে যাচ্চি তখন দুপুর রোদ্। কি অদ্ভুত যে দেখাতে লাগল সেই ঝম্ ঝম্ দুপুরে ওপারের সেই ফুলে ভর্ত্তি শিমুলচারাটা! অপ্রত্যাশিত ভাবে গিয়ে দেখি খুকুরা ওখানে আছে। অনেক দিন পরে এখানে ওদের পেয়ে মন খুশি হয়ে উঠল। আমি ন'দিদিদের রান্নাঘরের দাওয়ায় জল খেতে গিয়েচি, ও দাঁড়িয়ে আছে পুঁটীদিদিদের উঠোনে। বল্লুম—কি রে! তারপর ওদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম। দুপুরে ওদের রান্নাঘরে বসে পোলাণ্ড বিষয়ে একদিন বল্লুম। শিবরাত্রির দিন ন'দিদিদের ঘরে ওদের কাছে শিবরাত্রি ব্রতকথা শোনালুম। ট্যাংরার মাঠে ইন্দুর সঙ্গে একদিন কুল খেতে গেলুম—বড় খোলা মাঠ, দিক্‌চক্রবাল বড় দূরবিসর্পী, একটা উইয়ের ঢিবির কাছে বসে সেদিন সূর্য্যাস্ত দেখলুম। ঘেঁটুফুল এখানেও খুব ফুটেচে। গণেশ মুচি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েচে, ট্যাংরার ধারে গরু চরাচ্ছিল। লেবুতলার ওই পথে অনেক-দিন কেউ আসেনি, যখন রোয়াকে বসে থাকি, এইদিন দেখলাম নীল শাড়ি পরে আসতে এক জনকে ওই পথটাতে বহুদিন পরে!

গত শনিবার সাউথ গড়িয়া গ্রামে বেড়াতে গেলাম বোধহয় পনেরো বছর পরে। ভূতনাথ এখানে থাকতে আমি এখানে এসেছিলুম, সে কি আজকের কথা? বড় রোদ পড়েচে, বারোটার ট্রেনে ওখান থেকে রাজপুর এলুম। দুলিদের বাড়ির পিছনে বাঁশ-বনের তলায় কেমন ছোট ছোট ঘেঁটুগাছ। বেশ লাগে ওই বাঁশবনের মধ্যের জায়গাটা।

আজ গিয়েছিলুম নীরদবাবুদের মোটরে গড়িয়া গ্রামের একটা ভাঙা শিবমন্দিরের ধারে। জ্যোৎস্না উঠেচে খুব, ভাঙা মন্দির আর একটি প্রাচীন বটগাছ—পটভূমিকা বেশ চমৎকার। বেশ লাগল আজ জ্যোৎস্নাটা। কতক্ষণ বসে গল্প করলুম।

গত সপ্তাহের শুক্রবার থেকে আরম্ভ করে কি ঘোরাই গেল ক'দিন! প্রথম তো শুক্রবার আসাম মেলে রংপুর রওনা হলুম, সেখানে সারস্বত-সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে। দুপুরের রোদ বেশ বাড়চে—পথে পথে ঘেঁটুফুলের শোভা—সারা পথেই ঘেঁটুফুল দেখতে দেখতে চলেছি। নৈহাটির কাছাকাছি এসে মনে হল আমাদের গ্রাম এখান থেকে বেশী দূরে নয়—সোজা গেলে হয়তো বিশ মাইলের মধ্যে। এই দুপুর রোদে আমাদের পাড়ার সবাই যে যার ঘরে ঘুম দিচ্চে হয়তো। রানাঘাট স্টেশনে ইসাক মাস্টার উঠল ট্রেনে, ঈশ্বরদি পর্য্যন্ত গল্প করতে করতে গেল। ক্রমে বেলা পড়তে লাগল। আমি দূরে এক গ্রামের একটি একটি মেয়ের জীবনযাত্রার ছবি দেখি এই ছায়াস্নিগ্ধ অপরাহ্ণে, হয়তো তাদের শিউলিতলা দিয়ে পাড়া বেড়াতে চলেছিল, হয়তো নিজেদের দাওয়ায় বসে গল্প করে, কি বই পড়ে। কোথায় সার্কাস হয়েছিল, সার্কাস উঠে গিয়েচে আজ ৩।৪ মাস—বলে, একবার ভেবেছিলুম খুব বেড়িয়ে আসা যাক্ সার্কাসে—তা সার্কাস গেল উঠে। ওদের কথা দুঃখ হয় ভাবলে। শিলং মেলে সুধাংশু ডাক্তারের দাদা হিমাংশুর সঙ্গে দেখা, সে থাকে কুড়িগ্রামে। চমৎকার জ্যোৎস্না রাত—এবার আমার অদৃষ্টে লেখা ছিল এই পক্ষের জ্যোৎস্নাটুকু নিংড়ে খালি করে উপভোগ করব। রংপুর স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়িতে প্রবোধবাবুর বাড়ি গিয়ে উঠলুম। গিয়ে শুনি ওঁরা আমায় স্টেশনে নিতে এসেছিলেন, কারো সঙ্গে আমার দেখা হয়নি নাকি। পরদিন সকালে সভার অধিবেশন হল টাউন হলে। প্রিন্সিপ্যাল ডি. এন. মল্লিকের সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা। কলকাতা ছাড়বার পরে তাঁর সঙ্গে আর কখনো দেখা হয়নি—সে আজ চোদ্দ-পনেরো বছরের কথা। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে—এখন এখানে কারমাইকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। সভার

পর দুপুরবেলা প্রবোধবাবুর সঙ্গে মোটরে বার হয়ে কলেজ বেড়িয়ে এলাম। অত বড় কলেজের বাড়িটা বাংলাদেশের অন্য কোন কলেজে নেই বলেই আমার ধারণা। ছাদে উঠে দুপুরবেলা চারিদিকে চেয়ে বেশ লাগল। কলেজ কম্পাউন্ড খুব ফাঁকা। তাজহাট রাজবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে তাদের বড় বৈঠকখানায় আমরা সবাই বসে রইলুম—অনেকগুলো ভারী সুন্দর হাতীর দাঁতের চেয়ার দেখলুম—যেমন অনেক বছর আগে আগরতলার রাজপ্রাসাদে দেখেছিলুম—আমার তখন চব্বিশ বছর বয়স—প্রায় আজ চৌদ্দ বছর আগেকার কথা। আবার বিকেলে টাউন হলে সভায় আসবার আগে মাহিগঞ্জে 'রবি মৈত্রের বাড়ি যাওয়া গেল। রবি থাকতে কতবার আসতে বলেছিল, কখনো যাওয়া হয় নি, আজ সে নেই ভেবে কষ্ট হল। রবির দুই দাদাকে দেখতে অনেকটা তারই মত যেন। মাহিগঞ্জ থেকে আসতে পথের দুধারে বড় বড় পাতাওয়ালা গাছ—এখানে 'চোৎরা গাছ' বলে—বিছুটি গাছ, পাতা গায়ে লাগলে সাংঘাতিক জ্বলে।

বৈকালে সভার সময়ে যখন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হচ্ছিল, আমি, জনৈক অধ্যাপক অমূল্য বসু টাউনহলের সামনে মাঠে ঘাসের ওপরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে বসে ছিলুম—আমি তো দূরের আকাশ দিয়ে পূর্ব্বদিকে সব সময়ই চেয়ে। কতদূরে কোথায় কে কি করচে, সেই চিন্তাতেই ভরপুর। সভান্তে জ্যোৎস্নারাত্রে রায় বাহাদুর বসন্ত ভৌমিকের বাড়ি চা-পার্টি। খুব গোলাপ ফুটেচে বসন্তবাবুর বাগানে। তিনি আমাকে তাঁর পড়ার ঘর দেখালেন—বেশ সাজানো, আর অনেক বই আছে। এদেশে ঘর তৈরী করার পদ্ধতি আমার বেশ সুদৃশ্য লাগল। প্রবোধবাবুর বাড়িতেও আবার অনেককে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল—অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করে বসন্তবাবু মজ্‌লিশ জমিয়ে রাখলেন। পরদিন সকালে আবার সভা। দুপুরে একটু ঘুমুই। বৈকালের দিকে শহরের কয়েকটি গণ্যমান্য ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। বৈকালে সভার সময় মোটর থেকে নেমেই দেখি ভিড়ের মধ্যে থেকে জেলি ও পাগ্‌লা, আমাদের গাঁয়ের, দেখা করতে ছুটে এল। ওরা এখানে লালমনিরহাটে রেলে কাজ করে, আমি এখানে এসেচি শুনে লালমনিরহাট থেকে দেখা করতে এসেচে। সভার পরে প্রবোধবাবুর বাড়িতে চা খেয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্টেশনে রওনা হলুম। শহরের কয়েকটি ভদ্রলোক আমায় তুলে দিতে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, পূর্ব্বদিকের আকাশও খুব উজ্জ্বল। গরম একেবারেই নেই। পার্ব্বতীপুরে গাড়ি বদল করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসে চড়ে বসলুম। জ্যোৎস্নারাত্রে পদ্মা দেখে বড় ভাল লাগল। ভোর হল রাণাঘাট স্টেশনে—তখনও আকাশে নক্ষত্র রয়েচে।

কলকাতার বাসায় গিয়ে স্নান করে বসে আছি, এমন সময় নীরদবাবুর ড্রাইভার এসে খবর দিলে গাড়ি এসেচে। নীরদবাবু সস্ত্রীক গালুডি যাচ্ছেন, আমায় সেই সঙ্গে যেতে হবে। তখনি জিনিসপত্র বেঁধেছেঁদে আবার রওনা। নাগপুর প্যাসেঞ্জার বেলা তিনটার সময় গালুডি পেঁছিলো। পথে খড়গ্‌পুরের পরে উঁচু ডাঙ্গা ও শালবনের দৃশ্য দেখবার লোভে দুপুরে একটু ঘুম এল না চোখে।

বহুদিন পরে আবার নামলুম গালুডি—আজ বছর তিন-চার আসিনি—১৯৩৪ সালের পুজোর পর আর কখনো আসিনি। তবে সে গালুডি এখন অনেক বদলে গিয়েচে। নেক্‌ড়েডুংরি পাহাড়টা ন্যাড়া, তার নীচেকার সে চমৎকার শালচারার জঙ্গলটা অদৃশ্য। কে পাথর কেটে নিয়ে যাচ্চে পাহাড়টা থেকে, রোজ সকালে একদল গরুর গাড়ি এসে পাথর কেটে বোঝাই করে নিয়ে যায়—পাহাড়টা এবার গেল। এদিকে কারো জ্ঞান নেই

যে ওটা চলে গেলে গালুডির একটা beauty spot চলে যাবে।

অপরাহ্নে সুবর্ণরেখা পার হয়ে কুমীরমুড়ি গ্রামের জঙ্গলে বসে রইলুম কতক্ষণ। প্রথমে যাচ্ছিলুম রাখামাইন্স্-এ। কিন্তু বেলা গিয়েচে দেখে ভরসা হল না। এক জায়গায় ধাতুপ্ ফুলের ঝাড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম—কাছেই একখানি বড় পাথর। হঠাৎ দেখি বনের মধ্যে একটা গোল্‌গোলি ফুলের গাছে হল্‌দে ফুল ফুটে রয়েছে অজস্র। সেখানে ঢুকে দেখি বনে লতানে পলাশ গাছে পলাশ ফুটেচে, তা ছাড়া একরকম বন যুঁই-এর মত কি ফুল ফুটেচে কামিনী ফুল গাছের মত গাছে। মোরাম্ ছড়ানো মাটি—ঠিক যেন কয়লার টুকরো ছড়ানো পড়ে রয়েচে। বসে বসে মনে হল কাল ঠিক এসময় রংপুরে টাউনহলের ক্লাবঘরে বসে চা খাচ্চি—আর আজ এসময় সুবর্ণরেখার ধারের বনে! কোথায় ছিলুম কোথায় এসেচি! চাঁদ উঠছে ঠিক সেই গোলগোলি ফুল-গাছের পেছনে! প্রকাণ্ড গাছটা—আমাদের দেশের একটা মাঝারি গোছের আমড়া গাছের মত। ফুলগুলো অনেকটা দূর থেকে দেখতে সূর্য্যমুখী ফুলের মত। কতক্ষণ বসে রইলুম, তারপর জ্যোৎস্না ফুটবার পূর্ব্বেই লতানো পলাশের একটা গুচ্ছ তুলে নিয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে গালুডি চলে এলুম।

বড় সুন্দর জ্যোৎস্না! বাংলার বাইরে ভিন্ন এ ধরণের ছায়াহীন অদ্ভুত ধরণের জ্যোৎস্না বড় একটা দেখা যায় না। বাদলবাবুর বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কালাঝোর পাহাড়-শ্রেণীর দিকে চেয়ে চোখ ফেরানো যায় না যেন—জ্যোৎস্নারাত্রে অস্পষ্ট দেখাচ্চে যদিও, তবুও কি তার চেহারা!

হাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েচি। চা খেয়ে ওপারের বনে বেড়াতে যাওয়ার পূর্ব্বে গালুডির হাটে বেড়াতে গেলুম। ১৯৩৪ সালের গুডফ্রাইডের ছুটির পরে এই হাট আমি আর কখনো দেখিনি। সেই পুরানো দিনের মত টোমাটো, শুট্‌কি মাছ, মহুয়ার তেল, বাজে লাড্ডু আর তেলের খাবার বিক্রী করচে। সাঁওতাল মেয়েরা গল্প করচে, পাঁচগ্রামের লোকের সঙ্গে আলাপ করচে। কাল ঠিক এই সময়ে কিন্তু রংপুরের সভাতে বসে আছি।

পরদিন ভোর ছ'টাতে আমরা চারখানা গরুর গাড়ি করে দীঘাগড়া পাথর খাদানে রওনা হই। প্রথমে তো যাবার রাস্তা এরা ভুল করলে। ফুলকাল ও বনকাটি দিয়ে না গিয়ে প্রায় চলে গেল ঘাটশিলার কাছাকাছি। কালাঝোর পাহাড়টা প্রায় সেখানে শেষ হয়েচে। বাদলবাবু কেবলই বলে, এখনো পথটা আসিনি, আরও আছে। এমনি করে অনেকটা গিয়ে তারপর বাঁ-ধারে পথ পাওয়া গেল। ঝাঁপড়িশোল বলে একটা সাঁওতালি গ্রামের প্রান্তে গাছতলায় সবাই শতরঞ্জি বিছিয়ে চা খেতে বসা গেল। মেয়েরা চা করতে লাগলেন। ভিক্টোরিয়া দত্ত খাবার দিলেন সবাইকে। বেলা ন'টা। সামনে কালাঝোর পাহাড়শ্রেণীর পাদদেশে ঘন বন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরের গ্রামের এক পল্লী বালিকা এতক্ষণ বকুলতলায় কি করচে মনে হল। চা-খাওয়া শেষ করে একটা সাঁওতাল ছোক্‌রার সঙ্গে দেখা। আমি তখন গরুর গাড়ি ছেড়ে একটু এগিয়ে চলেছি। সে বল্লে—দীঘার চেয়ে বাসাডেরায় বন খুব বেশী। কিছু পয়সার লোভে সে আমাদের বাসাডেরা নিয়ে যেতে রাজী হল। নীরদবাবু কেবলই কালকার জ্যোৎস্না রাত্রির কথা বলছিলেন। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই তিনি আমার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করিয়ে নিলেন আর একদিন জ্যোৎস্নায় আমরা আবার এখানে আসব। বনের শোভা বড় সুন্দর। প্রথম বসন্তে শৈলসানুর বনে অজস্র গোলগোলি ফুলের গাছে ফুল ফুটেচে, পলাশ ফুটেচে, সাদা সাদা এক ধরণের ফুল, গাড়োয়ানেরা বললে, বুররা। লোহাজালির ফুলে বেশ সুগন্ধ—আর যেখানে সেখানে প্রস্ফুটিত শালমঞ্জরীর তো কথাই নেই—সুবাসে দুপুরের

বাতাস মাতিয়েচে। বনের মধ্যে একটা কুয়া এক জায়গায়, সাঁওতালেরা জল নেয়। আমরা সেই কুয়ার জল খেয়ে নিলাম। ডাইনে বেঁকে বনের মধ্যে বুরুডি গ্রাম। একটা পাথরের কারখানাতে পাথরের গেলাস, থালা, বাটি, খোরা তৈরী হচ্ছে, মেয়েরা নেমে কারখানা দেখতে গেলেন—আমরাও গেলুম সঙ্গে। বেলা সাড়ে দশটা। খুকু এতক্ষণ ওদের রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে রাঁধতে বসেচে। ক্রমশঃ বন গভীর হয়ে এল। পথের ধারে বন্য হস্তীর পদচিহ্ন গাড়োয়ানেরা দেখালে। গাইড্ ছোক্‌রা বল্লে—বনে খুব মজুর আছে। মজুর? মজুর কি? একজন গাড়োয়ান্ বল্লে, বাবু, আপনারা যাকে ময়ূর বলেন। এ বনে যেখানে সেখানে পলাশ গাছ, লতার মত জড়িয়ে উঠেছে অন্য বড় গাছের গায়ে—ফুল ফুটে রয়েচে। গোলগোলি গাছটা এ বনে তত দেখচি নে। একস্থানে উঁচু ঘাট, অনেকটা শিলং-সিলেট্ রোডের মত, ডাইনে নীচু খাদ—গরুর গাড়ি খুব কষ্টে উঠতে লাগল। বাসাডেরা গ্রামের চারিধারেই পাহাড়, মধ্যে একটা উপত্যকায় একটি সাঁওতাল বস্তি। গ্রামের লোকেরা আমাদের গাড়ির দিকে অবাক চোখে চেয়ে দেখচে। বাসাডেরা গ্রাম পার হয়ে কি একটা বেগুনি রংয়ের বড় ফুলগাছ দেখলুম জঙ্গলে—খুব জঙ্গল এদিকটাতে। এখানে ঝাটি-ঝর্ণা বলে একটা জায়গা আছে, সেখানে জঙ্গল্ল আরও অনেক বেশী। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কত গ্রাম রয়েচে। পাহাড়ী ঝর্ণা তাদের জল যোগাবার একমাত্র স্থান। বাসাডেরা গ্রাম ছাড়িয়ে এমন হল যে জল কোথাও পাওয়া যায় না—আমি একটি উপলাকীর্ণ শুষ্ক নদী খাতের পাশের জঙ্গলে একটা মোটা লতার ওপর উঠে বসে রইলুম। একটু পরে গাইড্ এসে জলের সন্ধান দিলে। পাহাড়ী ঝর্ণা বেয়ে এক জায়গায় জলাশয় সৃষ্টি করেচে। আমি সাঁতার দিয়ে সেই জলাশয়ে স্নান করলুম। মেয়েরা রান্না চড়িয়ে দিলেন। আমি ও কনক ডান দিকের পাহাড়টাতে উঠলুম। কনক কিছুদূর গিয়ে আর উঠতে সাহস করলে না—আমি একটা মসৃণ পাথর বেয়ে উঠে গেলুম। খুব ওপরে প্রায় পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকের পাহাড়গুলো চেয়ে দেখলুম। সব পাহাড়ের মাথাতেই বন। বনে আগুন লেগেছিল কিছুদিন আগে, এখনও এ পাহাড়ে একটা মোটা শেকড় ধোঁয়াচ্ছে। একটা শিবগাছের রেণু হাতে মেখে মুখে দিলাম, যেন পাউডার মুখে মাখচি এম্‌নি সাদা হয়ে গেল। নামবার সময় মসৃণ পাথরখানা বেয়ে আর নামতে পারিনে, মাঝামাঝি এসে আটকে গেলাম—অবশেষে একটা শেকড় ধরে এসে নামলুম কনক যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আমার অবস্থা দেখে কনকের ভয় হয়ে গিয়েছিল। আরও নেমে এসে তবে সেই জলাশয় ও সেই প্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা, যেখানে মেয়েরা রান্না করবেন। নেমে এসে দেখি রান্না হয়ে গিয়েচে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে ও বিশ্রাম করতে বেলা গেল। রওনা হবার সময়ে দেখি আমার পায়ের আঙুলে পাহাড়ে ওঠবার সময়ে যে চোট লেগেছিল, তার দরুণ দস্তুরমত ব্যথা হয়েচে। সুতরাং গরুর গাড়িতে চিৎপাত হয়ে শুয়ে সুন্দর অপরাহ্ণ নষ্ট করে ফেলতে হল বাধ্য হয়ে—কেবল পাহাড়ের ঘাট পার হয়ে ঘন জঙ্গলের পথে খানিকটা খালি পায়ে হেঁটে এসেছিলুম। পথে জ্যোৎস্না উঠল। এক জায়গায় বনের মধ্যে গাছতলায় আমরা শতরঞ্জি পেতে বসে চা করে খেলাম, গল্পসল্প করলাম। তারপর ক্রমেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটল। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। আর সেই বনভূমি, অজস্র গোলগোলি ও পলাশ যেখানে ফুটে রয়েচে, যদিও জ্যোৎস্না-রাত্রে এখন ফুল আদৌ দেখা যাচ্চে না। বন-কাটি নামে একটা খুব বড় সাঁওতালি গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা বড় শাল-বনের পাশ কাটিয়ে রাত এগারোটার সময়ে গালুডি এলাম। আমরা যখন এলুম, তখন মেল ট্রেনের ঘণ্টা পড়ল স্টেশনে।

পরদিন দোল। ভিক্টোরিয়া দত্তদের বাড়ি রং খেলা হল—আমি শালমঞ্জরী ভেঙে নিয়ে আজ প্রায় চার বৎসরের পরে বলরাম সায়েবের ঘাটে নাইতে গেলাম। বিষ্ণু প্রধান নাইচে, দোল খেলার রং সাবান দিয়ে তুলে ফেলচে। স্নান করবার সময়ে কালাঝোর পাহাড় শ্রেণীর দৃশ্য আর সেই একটা গাছের আঁকা-বাঁকা সীমারেখা যেন ঠিক একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল। দুপুরে খুব ঘুমিয়ে উঠে চা খেয়ে সুবর্ণরেখা পার হয়ে ওপারের জঙ্গলে বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে ঠেস দিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। পায়ে ব্যথা ছিল। কিন্তু বেশী হাঁটতে হয় নি। কালকার গাড়োয়ান সুজন গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল, তার আগে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল পঞ্চুবাবুর বাংলোয় আমাদের পুরোনো চাকর কেষ্ট। সুজন আমায় গাড়িতে উঠিয়ে নিলে—তারা পাথর আনতে যাচ্চে সুবর্ণরেখার ওপারে।

কতক্ষণ বসে থাকার পর চাঁদ উঠল। ছোট শাল-চারার জঙ্গল—অপূর্ব্ব শোভা হল চাঁদের আলোতে! কতক্ষণ জঙ্গলে এখানে ওখানে বসি, কখনও বা শুক্‌নো শালপাতার রাশির ওপর শুই। সুবর্ণরেখার নদীগর্ভে কতক্ষণ ওপারের পাহাড়ের আলোর মালার দিকে চেয়ে বসে রইলুম। জ্যোৎস্না পড়ে নদীখাতের শুক্‌নো বালির রাশি চক্‌চক্‌ করচে, দূরে মৌভাণ্ডারের আলো—ডাইনে টাটার আলো। ওপারের জঙ্গলের রেখা মুসাবনীর দিকে বিস্তৃত—অল্পক্ষণের জন্যে মনে হল ঠিক যেন ইসমাইলপুরে ঘোড়া করে জ্যোৎস্না রাত্রে বন ঝাউয়ের বনের পাশ দিয়ে কাছারী ফিরচি ভাগলপুর থেকে। বাড়ি ফিরে এসে দেখি গালুডি সুদ্ধ মেয়েপুরুষ একত্র হয়েচে—দোলের ভোজ হচ্চে, মাংস পোলাও কত কি আয়োজন! আমায় দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল—Leader-এর এ কি ব্যাপার! এত রাত পর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন? ...ইত্যাদি।

খাওয়া-দাওয়া সেরে রাত বারোটায় রাঁচী এক্সপ্রেসে কলকাতা রওনা হই। আজ এত রাত পর্য্যন্ত বাইরে জেগে বসে থেকে জ্যোৎস্নাময়ী মুক্ত প্রান্তর ও দূরবর্ত্তী শৈলমালার কি শোভাই যে দেখলুম, তা বর্ণনা করতে গেলেই ছোট হয়ে পড়ে। সে মহিমা ও সৌন্দর্য্য বর্ণনা করে বোঝাবার না। রাত্রে সারারাতই জ্যোৎস্নালোকিত শালবনের শোভা দেখতে দেখতে এলাম। খড়্গপুর ছাড়িয়ে একটু ঘুমিয়ে ছিলাম।

সেদিন স্কুলের পর ভাটপাড়া গেলাম। রাত আটটার সময় ঘোড়ার গাড়ি করে ঘোষপাড়ায় দোল দেখতে গেলুম—সঙ্গে ছোট মামীমা ও মাসীমা। বাল্যদিনে গরিফা হয়ে হালিশহর হেঁটে দু একবার গিয়েছি, সে অনেককালের কথা। তারপর কতকাল পরে আবার গরিফা দেখলুম, হাজিনগর মিল দেখলুম, হালিশহরের পাম্প-ওয়ালা বাঁধা ঘাট ও ঈশান মিত্রের বাড়ি দেখলুম। হালিশহরের বাজারের সেই সব সুপরিচিত গলি ও রাস্তা দেখতে দেখতে কাঁচড়াপাড়া ছাড়িয়ে রাত প্রায় সাড়ে ন'টার সময়ে ঘোষপাড়ার মেলাস্থানে পেঁৗছে গেলাম। মেলার স্থান, ডালিমতলা ইত্যাদি হয়ে পালেদের বাড়ির মধ্যে গেলুম, গোপাল পাল সেখানে মোহান্ত সেজে বসে যাত্রীদের কাছে পয়সা আদায় করচে। নলে পালের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম—সে এক সাহার কাপড় সংক্রান্ত কি মোকদ্দমার মীমাংসা আমায় করতে দিলে। আমি বল্লুম—ও সব এখন পারব না।

মামার বাড়ি গিয়ে নিচুতলার দিকে দরজা খুলে ছাদের ওপর গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না ফুট্‌ ফুট্‌ করচে ছাদের ওপরে। নীচের ছোট ঘরটা বা যে ঘরে গৌরী বসে পান সাজত—সে সব ঘর বেড়িয়ে এলুম। খুকুদের বাড়ির ছাদের মত—এই তো সবে

রাত দশটা—হয়তো ন'দিদিদের বাড়ি সবাই গল্প করচে, কি তাস খেলচে। ছোট-মামীরা চা করচে, আমরা গল্প করতে করতে চা পান করলুম। পটলমামার এক ছোট মেয়ে বেড়াতে এল। রাত এগারোটার সময় মেয়েদের আলাপ শেষ হল, সবাই মিলে আবার এলুম দোতলায়। কোথায় কাল এ সময়ে গালুডিতে দোলের ভোজ চলচে, দূরে সিদ্ধেশ্বর ডুংরি ও কালাঝোর শৈলমালা ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট দেখাচ্চে —আর আজ কোথায় কোন্ পুরোনো স্মৃতি জড়ানো রাজ্যের বুকের মধ্যে এসে পড়েছি! রাত অনেক হয়েচে। শান্তিদের দোকানে গিয়ে ওকে জাগিয়ে কদ্‌মা কিনে সবাই ঘোড়ার গাড়িতে এসে উঠলুম। রাত দুটোতে ভাটপাড়া পৌঁছাই।

ভাটপাড়া থেকে এলুম শুক্রবার সকালে, শনিবার গেলুম বনগাঁ। এই সপ্তাহটা অদ্ভুত ধরনের বেড়ানো হল, নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। বনগাঁ পৌঁছেই চলে গেলুম খয়রামারির মাঠে ও রাজনগরের বটতলাটাতে। মনে পড়ল আজ যখন বটতলায় ঝুরি ঠেস দিয়ে বসে, সেদিন এমনি সময় কুমীরমুড়ির জঙ্গলে সুবর্ণরেখার ওপারে ঠিক এমনি একটা গাছ ঠেস দিয়ে বসেছিলুম—কিংবা তারও আগের দিন বাসাডেরার বন্যপথ দিয়ে গরুর গাড়ি করে গালুডি ফিরচি। ওখানে কতক্ষণ বসে তারপর মাঠের মধ্যে এসে বসলুম। হু হু হাওয়া বইচে, রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধে বাতাস ভরপুর।

পরদিন সকালে উঠে বারাকপুর চলে গেলুম। খুকু রান্নাঘরে রাঁধচে, বেলা দশটা, আমি ইন্দুদের বাড়ি একটু বেড়িয়ে তারপর খুকুদের রান্নাঘরে গিয়ে ডাক্‌চি, ও খুড়ীমা, খুড়ীমা!—খুকু আমায় দেখে অবাক্ হয়ে গিয়েচে। বল্লে—আপনি কখন এলেন? বললুম, এই তো খানিক আগে আসচি। দুজনে গল্প করচি, তখন খুড়ীমা এলেন। আমি একটু পরে বরোজপোতার বাঁশবনে ঘেঁটুফুলের বন দেখে স্নান করতে গেলুম আমাদের ঘাটে। তিত্তিরাজ ফলের বীচির গন্ধ, মাটির গন্ধ, শুক্‌নো পাতা ও ডালের গন্ধ, ঘেঁটুফুলের গন্ধ, কণ্ঠির গন্ধ—নানা প্রকার জটিল ও বহুদিনের সুপরিচিত, বহুদিনের কত পুরোনো-কথা-মনে-আনিয়ে দেওয়া গন্ধের সমাবেশ। তাই আমাদের ঘাটে স্নান করে উঠে কুলতলাটা দিয়ে যখন আসি, মন যেন এক মুহূর্তে নবীন হয়ে বাল্যদিনে চলে গেল বাল্যদিনের পরিচিত গন্ধে । গালুডি ও সিংভূমের বনের সঙ্গে কোন স্মৃতি নেই কাজেই তা রুক্ষ ও বন্য—বাংলাদেশের এই প্রকৃতি মায়ের মত নিতান্ত আপন, নিতান্ত ঘরোয়া এর প্রতি ভঙ্গিটি আমার পরিচিত ও প্রিয়।

চলে আসবার সময়—সন্ধ্যার গাড়িতে চলে এলুম—খুকু ওদের দাওয়ার পৈঠেতে দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল। চুমরি বাগানে কি অজস্র ঘেঁটুবন, আর কি তার মিষ্টি গন্ধ! আমার মনে ভারী আনন্দ, আর তার সঙ্গে ঘেঁটু ফুলের গন্ধটা মিশে আনন্দ ঘনীভূত করে তুললে। বেলা পড়ে এসেচে, হাট থেকে লোক ফিরচে। নানা রকম গাছ, লতা-পাতার সুগন্ধ বেরুচ্চে—শুকনো জিনিসের গন্ধই বেশী, শুক্‌নো ফল, শুকনো মাটি, শুক্‌নো রড়াফলের বীজ, শুক্‌নো ডাল পাতা—এই সব গন্ধ।

রাত সাড়ে দশটায় এসে কলকাতায় পৌঁছাই, গত শুক্রবার রংপুর যাওয়া থেকে আরম্ভ করে নানা রকম বেড়ানোর অভিজ্ঞতা এ সপ্তাহে যা হল, সচরাচর ঘটে না। রংপুর থেকে এসেই গালুডি ও বাসাডেরার জঙ্গল—অমনি সেখান থেকে ফিরেই পুরোনো বাল্যদিনের হালিশহর, শ্যামাসুন্দরীর ঘাট, বল্‌দেকাটা বাগ ও কাঁচড়াপাড়ার মধ্য দিয়ে ঘোষপাড়ার দোল ও মুরারিপুরের বাড়ির ছাদে জ্যোৎস্না-রাত্রে বসে চা খাওয়া—অমনি সেখান থেকে পরদিন রাজনগরের বটতলা ও বরোজপোতার বাঁশবন ও

ঘেঁটু্বন, এ সত্যিই অতি দুর্ল্লভ আনন্দ!

প্রায় একমাস লিখিনি। অনেক রকম ব্যাপার গেল মধ্যে। একদিন রাজপুর রিপন লাইব্রেরীর উৎসবে কৃষ্ণধন দে, অপূর্ব্ব বাগচি, রমাপ্রসন্ন ও গৌরকে নিয়ে এখান থেকে গিয়েছিলুম। ভাঙা রাসমঞ্চে বসে ভম্বলের সঙ্গে সেদিন খুব আনন্দ করা গিয়েছিল। মাচাতলায় বসে ফুলির সঙ্গে অনেক গল্প করি। ফুলিদের বাড়ি আবার ওরা চা খেলে। জ্যোৎস্না রাত্রে ওদের বাড়ির সামনে মাঠে বসে বেশ লাগছিল।

তারপর ইস্টারের ছুটির আগে একটা শনিবারে বনগ্রামে গেলুম এবং ছোটমামার ছেলের পৈতের জন্যে বৈকালের ট্রেনে রানাঘাট হয়ে এলুম। সেদিনটাতে নিজের মনের চিন্তা নিয়ে ভারী আনন্দ পেয়েছিলুম। মামার বাড়িতেও সন্ধ্যার সময় অনেকের সঙ্গে আলাপ হল।

ইস্টারের ছুটিটাও এবার বেশ কেটেচে। খুকুরা ওখানে আছে। আমি বসে কাগজ দেখতুম, খুকু এসে ডাকত ওদের উঠোন থেকে—বলত এদিকে আসুন না। গিয়ে গল্প করতুম। ওদের রান্নাঘরে বসে কত গল্প করেচি।

বনগাঁয়ের সরকারী ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী একদিন গ্রামোফোন নিয়ে গিয়ে আমাদের বাড়ি হাজির। খুব গান হল। খুকুরা ছাদ থেকে শুনলে।

আমি ও ইন্দু জ্যোৎস্না রাত্রে রোজ নদীর ধারে বেড়াতে যেতুম—একদিন তেঁতুলের নৌকোতে পার হয়ে ওপারের উলুটি বাচড়ায় বসে কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি।

খুকু একদিন বল্লে—চা খাওয়াব, সন্দেবেলা আসবেন। গেলুম সন্ধ্যাবেলা, কিন্তু সেদিন কি একটা কাজ পড়াতে চা খাওয়া আর হল না।

সেদিন মরগাঙের ধারে বেলেডাঙায় পাঠশালার নীচে গিয়ে বসেছিলুম ইন্দুর সঙ্গে। ইস্টারমন্‌ডের দিন রত্নাদেবী দেখা করতে এলেন। তাঁদের সঙ্গে টাওয়ার হোটেলে খুব গল্প-গুজব করি। তিনি তাঁর হাতে আঁকা ছবি একখানা দিলেন আমায়।

আজ বহুদিন পরে গিয়েছিলুম নন্দরাম সেনের গলিতে সেই প্রসন্নদের বাড়ি। বাল্যে এখানে কিছুকাল কাটিয়েচি। আমার তরুণী মায়ের মুখের শাঁখ যেন এই সন্ধ্যায় এ অঞ্চলে কোথায় আজও বাজচে। প্রসন্ন বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। প্রসন্নের মা মারা গিয়েছেন গত ফাল্গুন মাসে। সেই মাখম বুড়ী এখনও বেঁচে আছে।

গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে এসেচি। বেশ লাগচে এবার। ছুটি হবার দুদিন আগেই এসেছিলুম, বনগাঁয়ে প্রথমদিন দুপুরবেলা খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে বিল্ব-ফুলের সুগন্ধ আর দুপুরের খর রৌদ্র, নীল আকাশ আমায় স্মরণ করিয়ে দিলে একঘেয়ে কলকাতার সংকীর্ণ জীবন ছেড়ে মুক্ত প্রকৃতির কোলে এসে পড়েচি। দুদিন পরেই বারাকপুর এলুম, খুকু এখানেই আছে, সে সকালে শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে গল্প করে—বনসিমতলার ঘাটে আবার সেদিন ওর সঙ্গে দেখা নাইবার সময়ে, আজ দুপুরে যখন ঝড় উঠল, ও এলো ছুটে আম কুড়ুতে. আমি বিল্‌-বিলের ধারের আম গাছটার দুটো আম ওর কাছ থেকে চেয়ে নিলুম—দুটো মোটে পেয়েছিল—দুটোই দিয়ে দিল আমাকে। স্নান করে এসে রোয়াকে দাঁড়াতেই ছুটে ওদের সামনের উঠোনে এসে জিগ্যেস করলে—বনগাঁয়ে যে বিয়েতে গিয়েছিলেন—বর কেমন হল তাদের?...এসব ১৯৩৪।৩৫ সালের সুন্দর গ্রীষ্মাবকাশ মনে এনে দেয়।

সত্যিই এবার ভারী ভাল লাগচে এখানে এসে। একদিন কুঠীর মাঠে বৈকালে বেড়াতে গিয়েচি, দেখি দুজন লোক খাঁচা নিয়ে ফাঁদ পেতে ডাক পাখী আর গুড়গুড়ি পাখী ধরচে। গুড়গুড়ি পাখী ডাকে কেমন সুন্দর! আমি ও-ডাক অনেক শুনেচি, কিন্তু ও যে গুড়গুড়ি পাখীর ডাক তা জানতুম না।

কাল বৈকালে আদিত্যবাবুর মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণে বিকেলে গেলুম বনগাঁ। সঙ্গে ইন্দুর ছেলে গুটুকে গেল। চালকীপাড়ার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে কি চমৎকার গ্রাম্যছবি—চাষার মেয়েরা ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাইয়ে হাত মুখ ধুইয়ে দিচ্ছে, কেউ বা কাঁথা সেলাই করচে ঘরের দাওয়ায় বসে। সারা পথ বেশ ঝড়ের মত হাওয়া—দুপুরের অসহ্য গুমটের পরে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চাঁপাবেড়ের কাছে ভীষণ মেঘ ও কালবৈশাখীর ঝড়। ডালপালা, ধুলোকুটা উড়িয়ে নিয়ে আসচে পথ দেখবার জো নেই—ঢং ঢং করে ছ'টা বাজল। আমি একটা শিশুগাছের গুঁড়িতে ছেলেটাকে নিয়ে বসি। বাসায় পৌঁছে ওকে কিছু খাবার খাওয়ালুম। মন্মথবাবুর লিচুতলার আড্ডায় খুব গল্প করে আদিত্যবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ খাই। গরমে কিন্তু রাত্রে ঘুম হল না। জলপাইগুড়ি ছাত্র-সমিতি থেকে সেখানে যাওয়ার নিমন্ত্রণ পেয়েচি, কিন্তু এখন যাওয়া অসম্ভব।

আজ সকালে দুজনে দিব্য হেঁটে বারাকপুর এলুম। পথে চালকী দিদির বাড়ি গেলুম। দিদি যত্ন করে বেলের পানা, চা, ক্ষীর, কাঁটাল খাওয়ালেন।

বাড়ি আসবার একটু পরেই নামল বৃষ্টি। সেই থেকেই বাদলা চলচে—এখন বেলা পাঁচটা, বৃষ্টি গুঁড়িগুঁড়ি পড়চে। কাল গিয়েচে যেমন অসহ্য গরম, আজ তেমনি ঠাণ্ডা।

সুপ্রভাকে পত্র দিয়েচি, তার চিঠিও এরই মধ্যে পাব আশা করচি। ইতিমধ্যে পিরোজপুর থেকে যে নিমন্ত্রণ এসেচে, তারই কি করা যায় ভাবচি। সভাসমিতি করে বেড়ানো এ সময়টা মোটেই ভাল লাগে না।

আজ সকালে গোপালনগরে গিয়ে অনেকগুলো চিঠি ডাকে দিলুম। বাড়ি এসে আমতলায় চেয়ার পেতে বসে অনেক দিন পরে Cleopetra পড়চি, এমন সময় খুকু আমার কাছ দিয়ে ন'দিদিদের বাড়ি থেকে গেল। ইচ্ছে করেই গেল, কারণ সুপ্রভাকে চিঠি লিখতে চাইনি। সেই রাগটা নরম করাতে যে এল, এটি বেশ বোঝাই যায়। ওদের দাওয়ার এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত গল্প করলে।

বিকালে আমি The Croxley Master বলে Conan Doyle-এর একটা গল্প পড়তে পড়তে বেলা গড়িয়ে ফেললাম। উঠতে আর পারিনে—এমন কৌতূহল। Conan Doyle ছোট গল্পে ভালো শিল্পী ছিলেন। তাঁর A Straggler of 13 এবং আরও দু'একটা গল্পের মধ্যে দেখেচি, বড় শিল্পীর কৌশল বর্ত্তমান। এত খুঁটিনাটি বর্ণনার ওপর দখল (অদ্ভুত দখল!) নিম্নশ্রেণীর শিল্পীর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সামান্য একটু-আধটু সেকেলে claptrap টেক্‌নিক্‌ আছে—তা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়।

তারপর কুঠীর মাঠ দিয়ে আইনদ্দির বাড়ির পেছনকার উঁচু মরগাঙের পাড় পর্য্যন্ত গিয়ে সেখানে খানিকটা বসে রইলুম। বেলা একেবারে গিয়েচে। সেই যে রাখাল ছোঁড়া আমায় তামাক খাওয়াত, গত কার্ত্তিক মাসে যখন কুঠীর পেছনের বন-ঝোপের ধারে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম—সেই ছোক্‌রা দেখি পুলের নীচের ঘাট থেকে নেয়ে উঠচে। বল্লে—ভাল আছেন দাদাবাবু? কবে এলেন?

একটু পরে প্রমথ ও তার ভাই-এর সঙ্গে দেখা। সাইকেলে গোপালনগর থেকে

ফিরচে। সে বনগাঁ স্কুলের মাস্টার। তার জানবার একমাত্র দরকার দেখলুম ওদের স্কুলের ছেলেরা বাংলায় কত নম্বর পেয়েচে।

সন্ধ্যা হয়ে গেল। বেলেডাঙায় গোয়ালাদের দোকানে বসে একটু গল্প করে মাঠের মধ্যে দিয়ে এসে যখন আমাদের ঘাটে নাইতে নামলুম—তখন অন্ধকার আকাশ তারায় তারায় ভরে গিয়েচে। সাঁতার দিয়ে গেলুম ওপারে। এপারের ঘন অন্ধকার বন-ঝোপে কি জোনাকি পোকার মেলা!

ফিরে এসে খুকুদের দাওয়ায় বসে কতক্ষণ গল্প করলুম—হীরাবাঈ ও কেশরীবাঈ-এর গানের সম্বন্ধে, 'Life of Emile Zola' ফিল্ম সম্বন্ধে। খুকু বল্লে—সেই যে কি একটা ফিল্ম দেখেছিলেন—পাহাড় থেকে পড়ে গেল, কি একটা চমৎকার কথা আছে তাতে?

আমি তখনই বুঝতে পেরেচি, ও 'A Tale of Two Cities'-এর কথা বলচে।

বল্লুম—কথাগুলো কি? 'I am the Resurrection and the Life, saith the Lord: He that believe in Me'—এই পর্যান্ত বলতে ও বলে উঠল—হাঁ, হাঁ—ঠিক।

বল্লুম—পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া তো নয়—গিলোটিনে যখন ওদের প্রাণদণ্ড হচ্চে—সে সময়।

ও বল্লে—ঠিক, এবার সব মনে হয়েচে।

মনে এবার কেমন একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ ও উত্তেজনা।

কাল পচার সঙ্গে বিকেলে কুঠীর মাঠের দিকে বেড়াতে বেরিয়ে যখন বেলেডাঙায় কামার দোকান পর্য্যন্ত গিয়েচি, আইনদ্দি চাচা ডাক দিলে।

—কি চাচা, কেমন আছ?

চাচা বিদ্যাসুন্দর ও মহাভারত দিব্যি মুখস্থ বলে গেল। বল্লে, একখানা বিদ্যা-সুন্দর আমার ছেল, কে যে নিয়ে গেল!

তারপর আমরা গিয়ে কলাতলার দোয়াতে বসলুম। ভারী সুন্দর জায়গা। অনেকখানি জল আছে। জলের একধারে ফুল ফোটা হিঞের ক্ষেত। জলের ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ জলজ ঘাস। বেশ সুন্দর ঠাণ্ডা জায়গা। দূরে বট-অশ্বত্থের সারি।

আজ বৈকালে কলাতলার দোয়াতে বেড়াতে গেলুম। চমৎকার ঝিঙের ফুল ফুটেচে। অনেকক্ষণ কাটালুম বৈকালে—এদের সকলের কথাই মনে হল। ঘর সংক্রান্ত একটা গোলমাল হয়েচে, মট্‌কা কাল ঝড়ে উড়ে গিয়েচে- ভগবান এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

অনেকগুলো চিঠি নানা জায়গা থেকে আজ এসেচে। প্রকাশকদের নিকট থেকে, সভাসমিতি সংক্রান্ত ইত্যাদি। সুপ্রভার চিঠিও ছিল। কলাতলার দোয়াতে জলের ধারে বসে কত কথা মনে এল। রেণুর একখানা পত্রও পেয়েছি আজ অনেকদিন পরে। চাটগাঁয় গিয়েছিলুম সেই কতদিন আগে—এখন আমাদের দেশের এই খেজুরের কাঁদি-ভরা খেজুর গাছ, ওল গাছ, ঝিঙের ক্ষেত, ধানক্ষেত, বট-অশ্বত্থের গাছ, ওপারে আরামডাঙার বাঁশবনে অস্তসূর্য্যের হল্‌দে রোদের দিকে চেয়ে সে কথা ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই।

গোপালনগর যাচ্চি, দারিঘাটার পুল থেকে বাঁওড়ের ওপারের কি একটা গাছ, অনেকখানি নীল আকাশ—দেখে মনে হল এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের পিছনে

যে শক্তি আছেন, সেই শক্তি মানুষের সুখ-দুঃখে সাড়া দেন এবং benevolent নিশ্চয়ই—ওবেলা একটা বিশেষ ঘটনায় তার প্রমাণ পেয়েচি। মনে একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি জাগলো এই কথাটি ভেবে। বস্তুতঃ এই ভাগবতী শক্তি—যে মুহূর্ত্তে আমরা জীবনের পথে মেনে নেব—এর বাস্তবতা অনুভব করব—সেই মুহূর্ত্তে আমরা আধ্যাত্মিক নবজীবন লাভ করব।

সন্ধ্যার পরে ইন্দুদের বাড়ি বেড়াতে গেলুম। ফণিকাকা ছিল বসে—১৩০৫ সালে রামচাঁদ মারা যান, সে কথা হল। যুগলকাকার মা আর সরোজিনী পিসীদের, ত্রিনয়নী পিসীমা (তখন বালিকা) ফণিকাকাদের বাড়ি থাকত সারাদিন, খেত—কারণ খুব গরীব তখন ওরা—সেইসব গল্প শুনলুম।

রোয়াকে বসেচি। তারা ভরা আকাশ। গভীর রাত্রি। পাশের বাড়িতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েচে। আবার সেই সক্রিয়, হৃদয়বান, (পার্থিব ভাষায়) benevolent শক্তির কথা মনে এল। এই শক্তিই ভগবান। যে মনে মনে একে মানে, এই শক্তির বাস্তবতা অনুভব করে প্রাণে প্রাণে, সে সকল বিপদ, দুঃখ, সংকীর্ণতা, মলিনতাকে জয় করে।

বৈকালে সাজিতলার ঘাটে টিনের চালায় আমি আর পচা গিয়ে বসলুম। সারাদিন ঝড় চলচে, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসচে।

বাল্যে আমি আর ভরত এমন দিনে এই গ্রীষ্মের ছুটিতে দিগম্বর পাটনীর খেয়া নৌকোতে মাধবপুরের হাটুরে লোকদের পার করতুম—সে কথা মনে পড়ল। একবার আমার পাঠশালার সহপাঠী বন্ধু পার্ব্বতী আর তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে কি আনন্দের দিনই গিয়েচে!

শম্ভু কি করে মারা গেল ইন্দু সেই গল্প করছিল। ওখান থেকে উঠে আমরা কুঠীর মাঠের দিকে গেলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে মেঘান্ধকার আকাশের নীচে এপার ওপারের শ্যামল মুক্ত মাঠ ও বনানীর, ক্ষুদ্র নদী ইছামতীর কি শোভা! পচাকে আর সঙ্গে নিয়ে যাব না—কথা বলে সব মাটি করে দেয়।

ভীষণ ঝড়বৃষ্টি সকাল থেকে। এক মুহূর্তের জন্যে বিরাম নেই। খুড়ীমা এলেন বৃষ্টি মাথায় চা নিয়ে। বল্লেন—খুকু করেচে, বলছিল, বিভূতিদা'কে একদিন চা করে খাওয়াব বলেছিলাম, তা আজ করি। একটু পরে চায়ের বাটি ওদের বাড়ি দিতে গিয়েচি, খুকু বল্লে—জল খাবেন না? মা জিগ্যেস করল। অর্থাৎ মুড়ি দিয়েছিল চায়ের সঙ্গে তাই জল খাব কিনা জিগ্যেস করচে। জলের ঘটি ওর কাছেই ছিল, নিয়ে জল খেলাম। তারপর গোপালনগর এলাম 'আরণ্যক'-এর প্রুফ্ ডাকে দিতে। মাঝের গাঁয়ের জিতেন সাধু দেখি তেরোখানা মোটর নিয়ে চলেচেন। চালকীর 'জিতেনদা' একখানা মোটরে ছিলেন—সেখানায় দেখি মোটেই স্থান নেই। কাজেই তখন রেল লাইন দিয়ে হেঁটেই পাঁচ মাইল রাস্তা চলে গেলুম। পূর্ব্ব দিকের আকাশ চমৎকার নীল দেখতে হয়েচে। আমি স্টেশনে পেঁাছেচি। অন্ধকারও নামল। অমূল্যবাবুদের বাড়ি গিয়ে সারারাত জাগা, বিজয় মুখুজ্যে আর অনাথ বোসের গান হল। রাত চারটে যখন বেজেছে তখন বীরেন সামনের একটা বাড়ির দোতলায় শোয়াতে নিয়ে গেল আমায়। তখন ঘুম হওয়া সম্ভব নয়, একটু পরে ফর্সা হয়ে গেল। আমি মিনুদের বাড়ি চলে এলুম। সেখানে ওরা ছাড়লে না—খাওয়া-দাওয়া করিয়ে তবে ছেড়ে দেয় বেলা দুটোর পরে। আড়াইটার ট্রেনে জিতেন ঠাকুরের দলবলের সঙ্গে গোপালনগরে নামি। ওরা মোটরে কলকাতা চলে গেল। তারপর

নামল ঘোর বৃষ্টি। আমি এখানে ওখানে বসে গল্প করে সন্ধ্যার আগে বাড়ি এলুম। খুড়ীমা ডাকছেন ও-বাড়ি থেকে, বিভূতি এলে নাকি? বল্লুম—হ্যাঁ খুড়ীমা। তারপরে ওদের ওখানে ঘরে গিয়ে কাল রাত্রের ঘটনা বর্ণনা করি।

সকালে বিশেষ কাজে গোয়াড়ী যেতে হয়েছিল। একটা বড় চমৎকার অভিজ্ঞতা হোল। আজ প্রায় ৩৩ বছর পরে আমাদের বাল্যের চাটুয্যে বাড়ির ঠাকুরমায়ের নাত্নী লীলাদিদির সঙ্গে দেখা হল। গোয়াড়ীর মধ্যে এক সময়ে যদু চাটুয্যে বিখ্যাত উকীল ছিলেন, লীলাদিদির সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে হরি চাটুয্যের বিবাহ হয়েছিল। লীলাদিদি এক সময়ে খুব সুন্দরী ছিলেন--আমি ৩৩ বছর পূর্ব্বে বাবার সঙ্গে একবার সেখানে গিয়েছিলাম, বছর সাতেক বয়স তখন। লীলাদি কড়ায় করে মাছ ভাজছিলেন--সেকথা আমার মনে আছে। এখন তিনি বৃদ্ধা।

কাল ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখি যদুবাবুর বাড়ির পূর্ব্বের সে সমৃদ্ধি কিছুই নেই। চাকরে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল, গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধা বসে আছেন—এই বৃদ্ধা যে ৩৩ বছর পূর্ব্বের সেই সুন্দরী লীলাদিদি, (এখনও আমার একটু একটু মনে আছে বাল্যে দৃষ্ট তাঁর সে অপূর্ব্ব রূপ), তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও মন দিয়ে গ্রহণ করা শক্ত।

লীলাদিদির এক ছোট বোন, তার নাম যোগমায়া--ছেলেবেলায় আমার খেলার সাথী ছিল। লীলাদিদিই বল্লেন—যোগমায়া আমার মেজমেয়ের বয়সী। সুতরাং যোগমায়া লীলাদিদির চেয়ে অনেক ছোট। আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিল যোগমায়া। খুকুদের বাড়িতে বাঁশের ও থলের দোলায় করে খেলা করেছিলুম মনে আছে। কার কাছে যেন শুনেছিলুম--সেও আজ ১৫।২০ বছর আগে, যে যোগমায়া মারা গিয়েচে। মনে দুঃখ হয়েছিল। কাল হঠাৎ লীলাদিদির কাছে যোগমায়ার নাম করতেই তিনি বল্লেন—যোগমায়াও এখানে আছে, খোড়ের ধারে তার বাসা।

আমি তো অবাক।

সেই যোগমায়া... বিশ বছর আগে শুনেছিলুম যে মরে গিয়েচে—আজ বিশ বছর ধরেই মনে মনে ঠিক করে রেখেচি যোগমায়া নেই। সে যদি আজ হঠাৎ বেঁচে আছে শোনা যায় তবে সেটা যেন পুনর্জ্জন্মের মত রহস্যময় শোনায়।

যোগমায়ার সঙ্গে দেখা করা কিন্তু ঘটে উঠল না। ট্রেনের সময় ছিল না। লীলাদি চা ও খাবার খাওয়ালেন। দেখা করে বিদায় নিলুম।

এই তো গোয়াড়ী—একদিন দেখা করব যোগমায়ার সঙ্গে।

সুপ্রভার পত্র শ্যামাচরণদাদা দিলে হাজারির দোকানে, আমি তখন স্টেশনে যাচ্ছি। ট্রেনে পত্রখানা পড়তে পড়তে গেলুম। বেশ আনন্দ পাওয়া গেল পত্রখানা পড়ে।

আজ মনে বড় আনন্দ ছিল, কারণ অনেকদিন পরে মেঘ দূর হয়ে রৌদ্র উঠেছিল। খুকু কতকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের শিউলিতলায় বন্দী করলে। বল্লে, ভবিষ্যতের কথা ভাবলে কষ্ট হয়, না? আমি বল্লুম—সময়ের সার বর্ত্তমান। ভবিষ্যতের ভাবনা মিথ্যে।

বৈকালে পরিষ্কার আকাশের তলা দিয়ে পচার সঙ্গে কলাতলার দোয়া পার হয়ে সুন্দরপুরের কাছাকাছি গেলুম বেড়াতে—এক জায়গায় জলের ধারে দুজনে বসে ওর পঞ্চানন মামা কি করে ফাঁকি দিয়ে বিয়ে করেছিল সে গল্প শুনি। এক গরীব

ভদ্রলোকের মেয়ে ছিল পরমা সুন্দরী, তার বাপকে ওদের সে বখাটে মামা শোনালে যে সে পচাদের বিষয়ের আট আনার অংশীদার। বিয়ে হয়ে গেল—তারপর মেয়েটার কি দুর্দশা! গল্পটা শুনে মনে বড়ই কষ্ট হল।

জলের ধারে ঝিঙে ফুল ফুটেচে। পরিষ্কার আকাশ, খেজুর গাছে গাছে স্বর্ণ-বর্ণ খেজুরের কাঁদি। একপাশে সবুজ উলুটি-বাচ্ড়া, বড় বড় বট-অশ্বত্থ, শিমুলগাছ। ওর মুখে গল্প শুনি আর ওবেলার মনের সে আনন্দটা আবার মনে আনবার চেষ্টা করি। কত গাছ, লতা মোটা মোটা—একটাতে কেমন দুলবার সুবিধে আছে। বিল্ব-পুষ্পের বাস এখনও আছে দু-একটা গাছে। বাঁওড়ের ওপারে কি সুন্দর ইন্দ্রনীল রংয়ের আকাশ হয়েচে!

আইনদ্দি চাচার বাড়ি এসে বসি। আমার মনের আনন্দের সঙ্গে আইনদ্দির বাড়ির একটা যোগ আছে। চাচা বসে খালুই বুনচে। ওর সেই নাতি বসে বসে গল্প করতে লাগল। বেশ ছেলেটি। আমি বসে বসে ওপারের বট-অশ্বত্থের সারির দিকে চেয়ে রইলুম। কি সুন্দর আকাশ, কি চমৎকার সবুজ বনশোভা, কত কথা মনে আছে, সুপ্রভার কথা, সে লিখেচে, এবার আর দেখা হবে কবে? সে কথা।

দেখা ওর সঙ্গে করব শ্রাবণ মাসে, ঠিক করেই রেখেচি। সে সময় চেরাপুঞ্জিতে আনারস খুব সস্তা হবে, সে সময় চেরাপুঞ্জির বাজারের সেই খাসিয়া মেয়েটার দোকান থেকে আর বছরের মত একটা গোটা আনারস কিনে খেতে পারব, সে সময় যাব শিলং।

এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে যেমন অপূর্ব্ব দিনগুলো কাটচে, এমন সত্যিই অনেক দিন কাটেনি। সেবারের বড়দিনকেও ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, রসের ও আনন্দের অভিনবত্বে ও প্রাচুর্য্যে।

এদিন বিকেলে পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাইনি। ওর সঙ্গে বেরুলে কেবল বাজে বকে। প্রকৃতির মধ্যে কিছুক্ষণ নিরিবিলি চুপচাপ বসে চিন্তার আনন্দ উপভোগ করার জন্যে একাই গিয়ে মরগাঙের উঁচু পাড়ে আইনদ্দির বাড়ির পিছনদিকে রাস্তার ধারে বসলুম। সঙ্গে সুপ্রভার চিঠিখানা ছিল। ডাইনে মরগাঙের বাঁকে বাঁশঝাড় ও নতুন পাড়ায় গোয়ালাদের বাড়ি, ওপারে আরামডাঙায় ঝিঙেফুল দু'একটা ঝিঙে ক্ষেতে, পেছনে একটা কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে, খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি স্বর্ণবর্ণ খেজুর—সত্যিকার ট্রপিক্যাল দেশের দৃশ্য! কলকাতা থেকে কত দূরে, কত নিভৃত, শান্ত পল্লী অঞ্চল আমাদের এ দেশ—কেমন একটা অপরূপ শান্তি মাখানো। ভগবান যে Romance ও Poetry-র উৎসমূল, তাঁর মধ্যে যে শুধুই Poetry ও Romance এ আমি বেশ অনুভব করলুম। কোথায় বিরাট দ্যুতিলোকের সৃষ্টি, আর কোথায় এই কাঁদি কাঁদি খেজুর, ওই বেগুনী রং-এর জলকচুরির ফুল, সুগন্ধ বেলফুল সবই তাঁর মধ্যে কল্পনারূপে একদিন নিহিত ছিল। "কল্পনা সৃষ্টিবীজঞ্চ"। কল্পনাই সৃষ্টির বীজ। "যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যাঃ"—কালিদাস কবি হলেও দার্শনিকের দৃষ্টি তাঁর ছিল। আমরা সকল কবিই অল্পবিস্তর ভাবে দার্শনিক তো বটেই। অনেক সময় তাঁরা যা দেখেন, দার্শনিকেরাও তা দেখতে পান না।

এখানে ক'দিন ভয়ানক বর্ষা চলচে। সকালে উঠে বেড়াতে বার হয়েচি পিরোজ-পুর বলে একটা গ্রামের দিকে। পাশে একটা ছোট খাল। বাঙাল মাঝিরা নৌকো

চালাচ্চে। নারিকেল সুপারির বাগান চারিদিকে প্রত্যেক লোকের বাড়ির উঠানে, ঝুপসি বনে অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে মাটি। টিনের চালা-ওয়ালা দরমার বেড়া দেওয়া সব ঘর—তার বাইরে টিনের সাইনবোর্ড ঝুলচে, "মোজাহার আলি মোক্তার" কিংবা "আজাদ আলি, বি-এল, প্লীডার।" বাড়ির পাশে ছোট ছোট ডোবা মত পুকুর—সুপুরির বাকলো দিয়ে ঘেরা বেড়ায় আবরু। আবর্জ্জনা, পচাপাতার জঞ্জাল বাড়ির পাশেই, নীচু আর্দ্র উঠোনে বা মেজেতে। এক জায়গায় লেখা আছে 'রসিকলাল সেন নায়েবের বাসা'। তারপর একটা সরু খালের ধারে ধারে নারিকেল সুপুরির ছায়ায় ছায়ায় কতদূর বেড়াতে গেলুম, ফিরে এসে একটা কাঠের পুলের ওপরে বসলুম। দুটি ছোট ছোট মেয়ে মাছ ধরচে। কতক্ষণ পুলটাতে বসে রইলুম। কি বিশ্রী জায়গা এই পিরোজপুর। পাঁচশো টাকা মাইনে দিয়ে যদি কেউ বলে তুমি এখানে এক বছর থাক—তা আমি কখনো থাকিনে। এমন জায়গায় মানুষ থাকতে পারে? রত্না দেবী ও তাঁর স্বামী সত্যিই বড় কষ্টে থাকেন, অমন আমুদে লোক বেশী দেখা যায় না। রত্না দেবী বড় গল্পপ্রিয়—দিনরাত মুখের বিরাম নেই। আর কি সেবা-যত্ন ক'দিন! নিত্য নতুন খাবার তৈরী হচ্চে আমায় খাওয়ানোর জন্যে। বৈকালে বার-লাইব্রেরীতে মিটিং হল, আমার সাহিত্য-জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একঘণ্টা বক্তৃতা করা গেল। জ্যোৎস্না রাত্রে বাইরে বসে গল্প করি রত্নাদেবীর সঙ্গে।

পিরোজপুর থেকে এসে মনে কোথায় একটা অযুক্তির দৈন্য ছিল। সেখানকার সেই নারকোল সুপুরি বনের ঝুপ্‌সি ছায়ায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে উঠোন আর সুপুরির বাক্‌লোর আবরুর কথা, সেই রসিকলাল সেন নায়েবের কথা মনে হলেই মনে একটা অস্বস্তি আসত। আমাদের দেশে আসবার সময় ঝিকরগাছা ঘাটে পেঁাছেই মনে হল স্বদেশে পেঁাছে গেছি। নাভারনের কাছে যশোর রোড ও বিলিতী চট্‌কার ছায়া দেখে মনে হল আমরা একেবারে বাড়ি পেঁাছে গেচি। বাড়ি এলুম ন'টার গাড়িতে। এসেই খুকুর সঙ্গে দেখা। ও দেখি ওদের দাওয়ায় বেড়াচ্চে, আমায় দেখে প্রথমটা পিছু হটে সরে গেল, তারপরই চিনতে পেরে ছুটে এল। পিরোজপুরের গল্প হল অনেকক্ষণ। ওর জন্যে যে কেক্‌ পাঠিয়েছিল তা দিয়ে এলুম।

পরদিন এল সুধীরবাবুরা। ওদের নিয়ে হৈ হৈ করে দিন কেটে গেল। মোটরখানা ওদের রইল আমাদের আমতলায়। আমাদের ঘাটে স্নান করিয়ে আনলুম সবাইকে। নদীতে স্নান করে সব খুব খুশি।

ওরা চলে গেল বৈকালে। পরদিন এল কালী চক্রবর্ত্তীর ঘোড়া আমাকে সিম্‌লে নিয়ে যাবার জন্যে—অনেকদিন পরে ঘোড়ায় চড়া গেল। গোপালনগর স্টেশনের কাছে ছাতি সারিয়ে নিলুম—তারপর গণেশপুরের পাশ দিয়ে পাকা রাস্তা থেকে মাঠের রাস্তায় নেমে সোজা হাতীবাঁধা বিলের পাশ দিয়ে চললুম। কত গাছপালা, বটতলা,, ঝোপঝাপ পার হয়ে যে চলেচি! আসবার সময়েও তাই। তখন বৈকালের ছায়া পড়ে এসেচে, হাতীবাঁধা বিলের চমৎকার শোভা হয়েচে—কতদূর জুড়ে প্রশান্ত চক্রবালরেখা দূরত্বের কুয়াসায় অস্পষ্ট। হে ভগবান, আমি আপনার এই মুক্ত রূপের উপাসক। যদি কখনো আসেন, তবে এই রূপেই আসবেন। নভোনীলিমা যেখানে মেঘলেশশূন্য, দিকচক্রবাল যেখানে মুক্ত, উদার—ধরার অরুণোদয় যেখানে নিবিড় রাগরক্ত, সে রূপেই আপনি দেখা দিন—রসিকলাল সেন নায়েবের বাসা থেকে আমায় মুক্তি দেন যেন।

সিম্‌লে থেকে ফিরে যখন নদীতে যাচ্চি গা ধুতে—বেলা খুব পড়ে গিয়েচে, ছায়ানিবিড় হয়েচে বাঁশবন। খুকু ওদের সঙ্গিনীদের সঙ্গে ঘাট থেকে ফিরচে, বাঁশ-

বনের পথে দেখা ঠিক পুঁটিদিদিদের বাড়ি থেকে নেমেই। ওরা সঙ্কুচিত হয়ে এক পাশে দাঁড়াতে যাচ্চে, বল্লুম—চলে আয়। ও আমার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে হাসতে হাসতে গেল, কি সুন্দর হাসতে পারে! এক তরুণ মুখের প্রসন্ন হাসিতে সারাদিনের মানসিক দৈন্য যেন এক নিমেষে ঘুচে গেল।

গিরীনদাদাদের কলাবাগানের মাঠে কতক্ষণ বসলুম, আকাশ রঙীন্ মেঘ-স্তূপে ভরা—সবুজ মাধবপুরের চর, বাঁশবনের দুলুনি কেমন সুন্দর! কত বছর চলে যাবে, ঐ বনসিমতলার ঘাটে অনাগত দিনের তরুণী বধূ ও মেয়েদের জলসিক্ত পদচিহ্নে আঁকা থাকবে একটি অপূর্ব্ব প্রণয়-কাহিনী—হয়তো কেউ কখনো বলবে, ছিল এরা দুজন অতি প্রাচীনকালে—গ্রামের স্নিগ্ধ বসন্ত দিনের বাতাসে তার মূর্চ্ছনা থেকে যাবে।

সকালে যখন বসে লিখচি, তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, একটু পরেই এল বৃষ্টি। একবার দেখি খুকু বিলবিলে থেকে উঠে গেল, কিন্তু বোধ হয় খুবই ব্যস্ত ছিল, তাই চেয়ে দেখল না এদিকে। স্নান সেরে এসে যখন গেল, তখন বোধ হয় মনে পড়ল, তাই চেয়ে হেসে গেল। কালোর সঙ্গে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বেড়াতে গেলুম। একটা গাছে উঠে বসেচি, এক বৃদ্ধ তার দুই ছেলেকে নিয়ে বেলেডাঙায় কুটুম বাড়ি যাচ্চে। আমার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ গল্প করে গেল। স্নান করতে জলে নেমে দেখি ভারী চমৎকার দৃশ্য ওপারের মাধবপুরের সবুজ উলুবনের চরে। দুপুরে যখন ঘরে শুয়ে আছি, তখন খুব বৃষ্টি এল। বৈকালে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙার জলে—আবার ওবেলার সেই বেলেডাঙার ছেলেটার সঙ্গে দেখা। নদীজলে স্নান করে আনন্দ হল, জ্যোৎস্না এসে পড়েচে নদীজলে। চমৎকার দেখাচ্চে।

রোয়াকে খুব জ্যোৎস্না। চেয়ার পেতে বসেচি, খুকু ডাকলে—প্রথমে ওদের শিউলিতলার উঠোনে দাঁড়িয়ে হাসচে হি হি করে, তারপর ডাকলে—বল্লে, আসুন না? গিয়ে বসেচি, ও উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করচে। আমার ছুটি ফুরিয়ে এল শুনে বলচে—আমিও ছ'ঘরে যাব। মা এখানে থাকবে। আপনি আর সেখানে যেতে পারবেন না, মজা হবে।

বল্লুম—মজা বেরিয়ে যাবে। বুঝবি তখন।

বল্লে—তা বটে।

বসে গল্প করচি, একবার বৃষ্টি এল। আমার চেয়ার পাতা রয়েচে রোয়াকে, উঠতে যাচ্চি, ও উঠতে দেবে না। বল্লে—বসুন, বসুন, বৃষ্টি ঐ থেমে গেল। বল্লে, কাল অত সকালে উঠে গেলেন কেন? বল্লুম—পাঁচু কাকার ছেলের আশীর্ব্বাদ হচ্ছিল, তাই। একটা ছোট গল্প বলতে বল্লে। কিন্তু সাধক-দাদার বাড়িতে একজন গায়ক এসেছিল, তার গান শুনতে বড় ইচ্ছে হল বলে চলে এলুম।

বনগাঁয়ে যেতে হল নৌকোতে পচা রায় ও তাদের দুই ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে। বার-লাইব্রেরীতে প্রফুল্লের কাছে বিশেষ দরকার ছিল, সেখান থেকে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা করে মন্মথবাবুর লিচুতলা ক্লাবে বসে পিরোজপুর ভ্রমণের গল্প করি। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর নৌকো ছাড়া হল। মেঘলা আকাশে চাঁদ উঠেছে, ঝিরঝিরে বাতাস, পচা বেশ নানারকম গল্প করতে করতে এল। সুখপুকুরের ঘাট থেকে সয়ারামকে উঠিয়ে নেওয়া হল।

খুকু আজ এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ওদের শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে। আমি তখন স্নান করে এসে সবে বসেচি, ঝম্‌ঝম্ রোদে ও খাড়া দাঁড়িয়ে রইল উঠোনে,

আমিও রোয়াকে চেয়ার পেতে বসে রইলুম। একবার দুপুরের পরে খুড়োদের বাড়ির দিক থেকে এল। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করলে। তারপর আমি, Cleopetra পড়ে, তাতেই মশগুল হয়ে বেড়াতে গেলুম বেলেডাঙায় বড় বটতলা ছাড়িয়ে সুন্দরপুরের পথে। রাত্রে খুকুদের দাওয়ায় বসে Cleopetra-র ইতিহাস বলি। ওর ভারী ভাল লেগেচে। বললে,—আজ এত দেরি করে এলেন যে? বল্লুম—খুড়ো এসে বসে গল্প করছিল, তা কি করি? পরদিনও Cleopetra-র গল্প শুনে খুকু ভারী খুশি, হেসে বলচে—আহা, বলবার কি ভঙ্গি! কচুকাটা করচে! ওর হাসি আর থামে না যখন বলেচি হারম্যাকিম্ কি করে মার্ক এণ্টনির সেনাপতিদের Caesar-এর দলে যোগ দেওয়ালে।

সন্ধ্যার জলে নেমে বনসিমতলার ঘাটের দিকে চেয়ে, পয়লা আষাঢ়ের নবনীল-নীরদমালার দিকে চেয়ে, ওপারের শ্যামমাধবপুরের চরের দিকে চেয়ে আনন্দে মন ভরে উঠল। এই বনসিমতলার ঘাট কত ভাবে সার্থক হল!

এবারকার গ্রীষ্মের ছুটির মত আনন্দ কোনবার হয়নি।

বনসিমতলার ঘাট থেকে যখন স্নান করে আসচি, সুয়োথলী আমগাছটার তলায় মাথা মুছবার জন্যে দাঁড়িয়েচি, ঘন মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অস্তমেঘের রাঙা আভা ভূষণ জেলের জমির একটা ময়নাকাঁটা গাছের গুঁড়িতে পড়ে কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েচে!

বাদলা বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মশা বেড়ে গেচে। বিলবিলে জলে টইটুম্বুর, বকুল-গাছ ও আমগাছগুলোর ভিজে ভিজে কালো গুঁড়ি, কাঁটাল গাছে কাঁটাল ঝুলচে। এই আর্দ্র, মশকসঙ্কুল, অতি নিরানন্দ স্থান কিন্তু অপূর্ব্ব কবিতাময়। অন্ততঃ আমার কাছে এ সমস্তটা মিলে এক অফুরন্ত, চিরনূতন কবিতা।

বসে পড়চি রোয়াকে, চেয়ারটা খুড়োদের বাড়ির দিকে ফেরানো, হঠাৎ যেন মনে হল বিলবিলের জলে ঝুপ করে একটা আম পড়ল। তাকিয়ে দেখচি, আর একটা ঝুপ করে শব্দ হল। তারপর আবার একটা।

আশ্চর্য্য হয়ে ভাবচি এত আম পড়চে কোথা থেকে, তখন দেখি কে যেন বিল-বিলের ও ঘাট থেকে কি একটা ডাল ছুঁড়ে জলে মারচে।

আমি চেয়ে দেখতেই খুকু হাসতে হাসতে উঠে এল—বল্লে, কবির তন্ময়তা ভেঙে দিয়ে কি খারাপ কাজই করেচি!

...সুন্দর কবিতা।

কিংবা এ যদি কবিতা না হয়, তবে কবিতা কি, তা আমার জানা নেই।

যেখানে জীবন, যেখানে আনন্দ, যেখানে প্রাণের প্রাচুর্য্য ও নবীনতা—তাই Testament of Beauty—কবিতা।

একদিন বিকেলের দিকে মেঘের সৌন্দর্য্য ভারী চমৎকার ফুটেচে সূর্য্য অস্ত যাবার সময়। পচা রায় মাছ ধরতে বসেচে কুঠীর নীচে—তার ওখানে গিয়ে বসে গল্প করি। আর এপার ওপারের শ্যামল সৌন্দর্য্যের দিকে চেয়ে দেখি—কয়টি উলুবন, খেজুর গাছ, পটল ক্ষেত, ঝিঙের ক্ষেত, শান্ত কালো নদীজল, কাঁটাশেওলার দাম; নলে ভেলের ডিঙি-নৌকা—ওপরে নীল আকাশ, রাঙা মেঘ—সব সুদ্ধ মিলিয়ে

চমৎকার ছবি।

আজ দিনটা বেশ চমৎকার। সারা ছুটির মধ্যে এমন পরিষ্কার দিন আসে নি।

বল্লার ভাঙনের কাছে একটা চারা শিমুল গাছ আছে, তার চারিপাশে সবুজ কাঁচ ঘাস বন, নিকটে উলুখড়ের রাশি রাশি ফুল ফুটেচে, ঝলমলে রোদ, নীল আকাশ। রৌদ্রে ঘাসের ওপর শুয়ে থাকতে বেশ মজা। স্নান করে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেক গল্পগুজব করলে। বিকেলে কি চমৎকার রোদ! এমন রোদ এবার সারা জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখিনি। পচা রায় মাছ ধরতে গেল। কুঠীর নীচেই জলের ধারে ঘন বন, তার মধ্যে ঢুকে খানিকটা বসি। এমন ঘন বন যে এদিকে আছে তা জানা ছিল না আমার। জলের ধারে কতক্ষণ বসে গল্প করি পচার সঙ্গে। আকাশের বড় বড় মেঘস্তূপ ক্রমে রাঙা হয়ে এল বেলা পড়লে। আমি উঠে মাঠের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। এদিকের মাঠ ওদিকের চেয়ে অনেক ভালো। কুঠীর নীচে সেই জলটার চারিপাশের দৃশ্য বড় সুন্দর। আমাদের ঘাটের ওপরে ডাক্তারদের কলাবাগানে একদল গোয়ালা গরু চরাতে এসে রান্নাবাড়া করচে। তাদের কাছে বসে খানিকটা গল্প করলুম। ওদের বাড়ি ঝিকরগাছার কাছে। ও-দেশ জলে ডুবে গিয়েচে বলে এখানে গরু চরাতে এসেচে।

আজ আকাশের রং অদ্ভুত রকমের নীল, এমন নীল রং সেই আর বছর আষাঢ় মাসের পরে আর কখনো দেখিনি, বৃষ্টি-ধোত আকাশ না হলে এমন নীল রং বুঝি ফোটে না। মদের নেশার মত কেমন নেশা লাগিয়ে দিল এই আকাশের নীল রংটা। রোদের রং হয়েচে অদ্ভুত—প্রখর সাদা নয়, যেন হলদে ধরনের। গাছপালা ঘাসের রং যেন হয়েচে হলদে। আমাদের ঘাটে নাইতে যাবার আগে মাঠে বেড়াতে গিয়ে দূরের বাঁশবন, কাঁদি কাঁদি খেজুর ঝোলানো খেজুর গাছ, অন্যান্য গুচ্ছগুলোর রৌদ্রালোকিত পত্রপুঞ্জের দিকে চেয়ে চোখ আর ফেরাতে পারিনে। আমাদের ঘাটের ধারে ফুলভর্ত্তি বাব্‌লা গাছ, সাদা-ডানা প্রজাপতি উড়চে—সে দৃশ্যটা মনে অপূর্ব্ব ভাব নিয়ে এল। এই নীল আকাশ থাকবে আরও যাট বছর পরে, এই বনসিমতলার ঘাট থাকবে তখনও, ওপারের চরে এমনি উলুর ফুল ফুটবে, এমনি সাঁইবাবলার পত্রশীর্ষ বৃষ্টি-ধোয়া নীল আকাশের তলে সূর্য্যের আলোর দিকে খাড়া হয়ে রইবে, কত অনাগত তরুণী বধূরা জলসিক্ত পদচিহ্ন অংকিত করে ঘাটের পথে যাওয়া আসা করবে। আমি তখন আর থাকব না এ গ্রামে জানি—তবুও আমার কথা গাঁয়ের এমনি আষাঢ় দিনের হাওয়ায়, নির্ম্মল নীল আকাশের আনন্দের মধ্যে অদৃশ্য অক্ষরে লেখা হয়ে থাকবে, সেই দূর ভবিষ্যতের কথা মনে হয়ে চলমান জগতের রূপ আমার মনে আনন্দের বাণী বহন করে আনলে।

আজ সন্ধ্যায় কি অপূর্ব্ব শ্রী! অস্তমান সূর্য্যের রঙে সমস্ত মাঠ, বন মায়াময় হয়ে গিয়েচে—সারা পৃথিবীটা কি অপরূপ শিল্প তাই ভাবি। আকাশের রং নীল নয় —সে কি রং তার বর্ণনা দেওয়া কঠিন—ওরকম রংএর কি নাম তা আমার জানা নেই। সন্ধ্যায় নদীজলে নেমে স্নান তো যেন দৈনন্দিন উপাসনা।

আজ এখানে বেড়াবার শেষ দিন। কারণ কাল শুঁটোর বিয়েতে যদি বরযাত্রীদের সঙ্গে যেতে হয়, তবে কাল আর আসতে পারব না। পচা রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাব, তার একটু আগে খুকু উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করে গেল, তাতে হয়ে গেল একটু দেরি। আমি পচাদের বাড়ি গিয়ে দেখি সে নেই! গাজিতলার পথে সে অনেক দূরে চলে গিয়েচে, তাকে সেখান থেকে ডেকে নিয়ে গেলুম বেলেডাঙার বাঁকের মাথায়। কতক্ষণ সেখানে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মরগাঙের ওপারের চর, খেজুর গাছ, বাঁশবন, জলি ধানের

ক্ষেতের দিকে চেয়ে বসে পচা রায়ের সঙ্গে গল্প করি। বেলা যখন যায় যায়, তখন উঠে আইনন্দির বাড়িতে এসে দেখি সে বাড়ি নেই। বেলেডাঙার পুলের ওপর কতক্ষণ বসে রইলাম শ্যামল সবুজের বন্যার দিকে চেয়ে। কি দিগন্ত-প্রসারী ধানক্ষেত, বট-অশ্বত্থের বীথি, নতিডাঙার গ্রামপ্রান্তর, বাঁশ-বনের সারি, কি বিচিত্র মেঘস্তূপ নীল আকাশে! সন্ধ্যা প্রায় যখন হয়ে এল, তারপরে আমরা ওখান থেকে উঠে আসি। পচা একটা কলার বাগান থেকে কলা সংগ্রহ করলে। আমি বনসিমতলার ঘাটে এসে নাইলুম। আকাশে অনেক নক্ষত্র উঠেচে, বনের মধ্যে জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে, অন্যদিনের চেয়ে আজ বেলা গিয়েচে। সন্ধ্যায় খুকুদের বাড়ি বসে অনেক রকম গল্প করলুম, তারপর উঠে গেলুম পাঁচুকাকাদের বাড়ি, ওদের বাড়ি কাল বিয়ে, অনেক কুটুম্ব-কুটুম্বিনী এসেছে—পাঁচুকাকার ভাই ফণিকাকা এসেচেন জলপাইগুড়ি থেকে—একবার সব দেখা-শুনো করে সামাজিকতা রক্ষা করতে যাওয়া দরকার।

আজ চলে যাব। বেলা তিনটের সময় আমার ঘরে ঘুম ভেঙে উঠলুম—তারপর বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে। বেজায় গুমট গরম, আকাশে সাদা মেঘ। একটু পরে পাঁচুকাকার ছেলে শুঁটো বিয়ে করে নববধূ নিয়ে গ্রামে ঢুকল। সানাই বাজচে, ঢোল-বাজনার শব্দ শুনে কল্যাণী, খুড়ীমা, খুকু এরা সেজেগুজে ছুটল। আমতলায় দেখি সব চলেচে। খুকু একবার চেয়ে দেখলে আমার দিকে। ঐ ঘোড়ার গাড়িতেই আমি চলে এলুম বনগাঁ স্টেশনে। সারা পথ ট্রেনে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হচ্ছিল কি অপূর্ব্ব সুন্দর গ্রীষ্মের ছুটিই আজ শেষ হয়ে গেল।

কলকাতায় এসে কদিন বড় ব্যস্ত ছিলুম। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছি—সাঁতরাগাছি ও রাজপুরেও গিয়েছিলুম। পরশু হঠাৎ এলাহাবাদ থেকে উষা এসেছিল- দেখা করতে এসেছিল মেসে। আমি তখন সবে চুল কাটতে বসেচি। তাড়াতাড়ি যেতেও পারিনে—বসতে বলে যত শীঘ্র হয় চুল ছেঁটে দেখা করে এলুম। উষার নির্দ্দেশমত বালিগঞ্জে গেলুম দুপুরের পর। অনেকগুলি মহিলা ছিলেন সেখানে—সাহিত্যিক আলোচনা হল অনেকক্ষণ ধরে—সকাল থেকে বার হয়ে বিকেলের দিকে ইন্দিরা দেবীর বাড়ী গেলুম রেডিওর বক্তৃতার নকলটিকে আনতে। কাল রাত্রে রাজপুরে বেগুন, আমি ও ফুলির দুই ছেলে এক মশারীর মধ্য শুয়ে প্রাণ যায় আর কি—গরমে আর মশায়! সারারাত চোখের পাতা বোজেনি।

এরই মধ্যে একদিন আয়েলীর সঙ্গে দেখা হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে গত মঙ্গলবারে। আমি আয়েলীর কথা বলচি নীরদবাবুদের বাড়ি, যে ওই একটি মেয়ে, যার সঙ্গে আর দেখা হবে না—কারণ ওর মা ওকে নিয়ে সিঙ্গাপুরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েচে। হঠাৎ সেদিন প্রবাসী অফিসে গিয়েচি, সেখানে দেখা ডাঃ প্রমথ রায়ের সঙ্গে। অনেকদিন পরে দেখা, কেউ কাউকে ছাড়তে পারিনে। অনেকক্ষণ ওখানে থেকে বার হয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে গল্প হল পুরোনো দিনের—যখন 'শনিবারের চিঠি' আপিস ছিল মানিকতলায়। প্রমথ এখন বেনারস হিন্দু ইউনির্ভাসিটির অধ্যাপক—ভারী বন্ধুবৎসল, ছেড়ে দিতে আর মন চায় না।

প্রমথ এসে আমায় উঠিয়ে দিয়ে গেল হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত। আমি কর্পোরেশনের কয়েকজন কাউন্সিলরের লিস্ট দিতে গেলুম নীরদবাবুদের বাড়ি—সেখানে ড্রয়িংরুমে ঢুকবার আগেই মেমসাহেবের গলা শুনে আমি অবাক হয়ে ভাবচি কোন্ মেমসাহেব এখানে এল! ঢুকেই দেখি আয়েলী ও মিসেস্ এণ্টনি বসে।

আয়েলীও আমায় দেখে খুব খুশি হল—ওরা সিঙ্গাপুর থেকে দু একদিন হল এসেচে শুনলুম। এখন কলকাতাতেই থাকবে। ভারী আনন্দ পেলাম ওকে দেখে—আয়েলী বড় ভালো মেয়ে। ও এখানে পড়ত লা মার্টিনিয়ারে। এতদিন পড়া বন্ধ ছিল, সেই-জন্যেই ওর মা মিসেস্ এণ্টনি ওকে আর ওর ছোট ভাই পিটিকে এখানে এনেচে।

কাল বালিগঞ্জে এক ভদ্রলোকের ওখানে রাত্রে ছিল নিমন্ত্রণ। মিসেস দে বলে যে মহিলাটির সঙ্গে ঊষার ওখানে সেদিন দেখা হয়েছিল—তিনি চিঠি লিখেছিলেন তাঁর স্বামীর সঙ্গে যাতে আমার আলাপ হয় তাঁর খুব ইচ্ছা। ভদ্রলোকটির নাম কে সি দে—কিরণচন্দ্র দে। কাল সন্ধ্যাবেলা তাঁদের বাড়ি অনেকক্ষণ কাটানো গেল। বড় অমায়িক লোক স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। ভূরিভোজন হল অবিশ্যি, আইসক্রীম পর্য্যন্ত বাদ গেল না। মনীষা সেনগুপ্তা বলে একটি মেয়ে উপস্থিত ছিল, মেয়েটি ছেলেমানুষ। এবার বি-এ অনার্সে ইংরিজীতে প্রথম হয়েচে, কিন্তু এত লাজুক ও মুখচোরা—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়তে বললুম। সবাই পড়চে—মেয়েটি লজ্জায় একেবারে দুমড়ে পড়ল—কিছুতেই পড়বে না। তারপর মিসেস্ দে অনেক করে একটা ছোট কবিতা পড়ালেন।

বেশ কাটল সন্ধ্যাটি, সাহিত্যিক আলোচনাতে, গল্পে, আবৃত্তিতে, খাওয়া-দাওয়ায়। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

পরশু ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে হেস্টিংসে গিয়েছিলুম। কলকাতার মধ্যে অমন চমৎকার ফাঁকা জায়গা বেশী দেখিনি। ওর সন্ধান পেয়ে মনে আনন্দ হল। নীল আকাশ, ফাঁকা সবুজ মাঠ, দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মার্ব্বেল চূড়াটা দেখা যাচ্চে নীল আকাশের পটভূমিতে, যেন আকাশে ভাসচে বলে মনে হচ্চে। কূলে কূলে ভরা গঙ্গা, সবুজ ঘাসে ঢাকা তীরগুলি জল ছুঁয়েচে। জলের ধারে নাটা ঝোপ, কালকাসুন্দা ও বনবেড়ালী—ঠিক যেন পাড়াগাঁ। অথচ জলের ধারে ধারে বড় ছায়াতরু, সেখানে বেঞ্চি ফেলা রয়েচে—সত্যিই বড় ভালো জায়গা—বেশ নির্জ্জন—খুব লোকজন বা মোটর-গাড়ির ভিড় নেই।

বাড়ি এসেই সেদিন ঊষার পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম। সুরেশবাবু বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বেশী বড় যদিও, কিন্তু ভাগলপুরে থাকবার সময়ে মিশতেন ঠিক যেন সমবয়সীর মত। অমরবাবুর বাড়ির আড্ডাতে দিনের পর দিন আমাদের কত চা পানের মজলিশ বসত। সুরেশবাবু একজন ভালো শিকারীও ছিলেন। শিকারের গল্প করে জমিয়ে রেখে দিতেন। একবার বাবারিঘাটে আমি স্টীমার থেকে নামচি—আজিমগঞ্জ থেকে আসচি অনেককাল পরে ভাগলপুরে—সেই স্টীমারে সুরেশবাবুও আসচেন—উনি তখন বর্নেলি রাজ স্টেটের এ্যাসিস্টাণ্ট ম্যানেজার—আমায় দেখে বললেন—এই যে ম্যানেজারবাবু, কোথা থেকে আসচেন? আর কি সে হাসি, কি সে মনখোলা বন্ধুত্বের স্পর্শ!

পরশু বাড়ি ফিরে ঊষার চিঠিতে জানলুম সুরেশবাবু আর ইহলোকে নেই। ঊষারা যেদিন এখান থেকে গেল মজঃফরপুরে, তার পরদিনই সুরেশবাবু মারা গিয়েচেন বলে ঊষা লিখেচে। অত্যন্ত দুঃখ হয়েচে চিঠিখানা পড়ে। ভগবান তাঁর আত্মার সদ্গতি বিধান করুন।

কাল সায়েন্স কলেজের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে আচার্য্য পি. সি. রায়ের সঙ্গে

দেখা করতে গেল্ম অনেককাল পরে। বয়স হয়েচে, কোন্ দিন মারা যাবেন—আর অনেকদিন যাওয়া হয়নি—এইসব ভেবেই দেখা করতে গেলাম। ভারী আনন্দ পেলাম বসে কথা কয়ে ওঁর সঙ্গে। বলল্ম—মাঠে যান এখনও? বল্লেন—ও বাবা, না গেলে কি বাঁচি?...বল্লম—ফিলজফার আসেন? বল্লেন—রোজ আসেন, তোমার কথা যে সেদিন বলছিলেন, তুমি আর যাও না কেন? তারপর আলামোহন দাস বলে একজন বড় ব্যবসায়ীর গল্প করতে লাগলেন—তিনি নাকি প্রথম জীবনে মুড়ি-মুড়কি বিক্রী করতেন। এখন ক্রোড়পতি লোক। চার-পাঁচটা মিল আছে।

বললেন—গ্রিন্ বোট করেচি, শ্রীপুরের ঘাটে বাঁধা রয়েচে। একবার তোদের বারাকপুরে যাব গ্রিন্ বোটে করে, ইছামতী দিয়ে।

বলল্ম—বেশ, আসুন না!

অনেকদিন পরে বুড়োর সঙ্গে গল্প করে বড় আনন্দ পেল্ম। বুড়ো কবে মরে যাবে, একটা অনুতাপ থেকে যাবে মনে।

গত শুক্রবারে অর্থাৎ ২৯শে জুলাই গ্রীষ্মের ছুটির পরে প্রথম বাড়ি গিয়েছিল্ম। ভারী ভালো লেগেচে এবার। খুকুদের দাওয়ায় বসে কদিনই সন্ধ্যার সময় কত গল্পগুজব করি। ওরা একদিন খাওয়ালো। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খুকু রান্নাঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এল। আমি গেলেই শতরঞ্জিখানা ঘরের মধ্যে থেকে এনে বড় করে পেতে দেবে—আর ওর মা বলবে, ছোট করে পাত। ছোট করে পাত। কালিঘাট বেড়াতে গেল্ম পচা রায়ের সঙ্গে। রবিবার হাটে গেল্ম। বকুলতলা দিয়ে হাট করে ফিরি। খুকু দাঁড়িয়ে আছে, আমি বলচি, খুড়ীমা, কাউকে তো দেখতে পাচ্চি নে? ও বলচে, কেন হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছি, দেখতে পাচ্চেন না? তাড়াতে পারলে তো' সব বাঁচেন!

আমি তারপর নদীর জলের একেবারে ধারে গিয়ে বসল্ম। লম্বা শীষ্ ও ফুল ফুটেচে, এপারে ঘন সবুজ গাছপালা, নদীর জল আবর্ত্ত করে ঘুরচে—বেশ লাগচে। দিলীপের সঙ্গে সেদিনকার সেই তর্ক মনে পড়ল। থিয়েটার রোডে ওর বাড়ি বসে তর্ক করেছিল্ম ওর বই নিয়ে। একজন চাষা আজ হাট থেকে ফিরবার পথে গল্প করছিল—লতা যদি বেশি হয়েচে,.তবে আর ঝিঙে তাতে ফলবে না। তার সেই গল্পটা মনে করচি। এই গ্রামের সত্যিকার জীবন—মাটির সঙ্গে সব সময়েই এদের যোগ। মাটির সঙ্গে যোগ হারালে, গাছপালার সঙ্গে যোগ হারালে এরা বাঁচবে না।

বড় বড় বাঁশঝাড়, কত কি বৃক্ষলতা, ষাট বছর পরে যখন আমি থাকব না, তখনও ওরা থাকবে, হয়তো খুকুও অতি বৃদ্ধা অবস্থায় থাকতে পারে। তখনও ইছামতীতে এমনি ঘোলার ঢল নামবে, বনসিমতলার ঘাটে নতুন মেয়েছেলে কত ফুল নিতে আসবে, হাসবে, খেলবে, জল ছুঁড়বে—যেমন একদিন আমরাও করেছিল্ম।

খুকুদের হাসাতুম 'ভাল কি মন্দ? মন্দ হইলে তো গন্ধ হইত' এই কথাটা পূর্ব্ববঙ্গের সুরে বলে। এবার গিয়ে মনে হল এমন বর্ষা-সজল দিনের গভীর আনন্দ কোন বছর এর আগে পাই নি। এ যেন একটা স্বপ্নের মত কেটে গেল—এত সুন্দর সকাল-সন্ধ্যা!

ফাল্গুন মাসে যখন শালমঞ্জরী নিয়ে গিয়েছিল্ম, বা যেবার গিয়ে দেখি উড়েরা তত্ত্ব বয়ে নিয়ে গিয়ে ভাত খাচ্ছে, সেসব দিনের ঘটনা তো এখন পুরোনো মনে হয়— Fresh, ever young! দিনগুলির মধ্যে তাজা আনন্দ তো থাকা চাই-ই, আনন্দের নব নব সৃষ্টি স্রষ্টামনের প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয়।

এই সব দিনের সঙ্গে দশ-বিশ বছর আগেকার পুরোনো, ছাতা-পড়া, ভঙ্গুর দিনগুলির যদি প্রতিযোগিতা হয়, তবে স্মৃতির ও আশার দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে না। তা হেরে যেতে বাধ্য। সেইজন্যেই সেই সব অসহায়, নিরপরাধ, নিরুপায় দিনগুলোর জন্যে মমতা আসে।

নিজের ঘরে বারাকপুরে সেদিন শুয়েচি, শুক্রবার রাত্রে। শুন্চি ন'দিদিদের ঘরে খুব গল্প ও হাসির শব্দ। বোধহয় খুকু কোন গল্প করচে ওদের কাছে। এই ঘরে শুয়ে শুয়ে ১৯২৪ সাল থেকে, আজ ১৯৩৮ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত এই গল্প তো শুনে আসচি—এ একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা। তাই কলকাতা থেকে হঠাৎ এসে একরাত্রে বারাকপুরের খড়ের ঘরে নিৰ্জ্জন রাত্রে শুয়ে সে অভিজ্ঞতাটি হঠাৎ হওয়াতে খানিকটা এমন অবান্তর বলে মনে হল যে অনেকক্ষণ ধরে নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চৈতন্যটাকে এর মাটিতে নামিয়ে এনে তবে সে অভিজ্ঞতা-টুকু গ্রহণ করতে পারলুম।

তারপর আর একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

অনেক রাত্রে চৌকিদার হাঁকতে বেরিয়ে আমার ঘরের মধ্যে লণ্ঠন বাড়িয়ে দেখচে। আমি বল্লুম...কিরে, ভাল আছিস? চৌকিদার বল্লে—হাঁ বাবু, আছি। কবে আলেন বাবু?

তারপর, সে নিজের নিমোনিয়া হয়েছিল, সে গল্প বলতে শুরু করলে। আমার তখন সত্যিই মনে হল আমি এই গ্রামেরই লোক—থাকি প্রবাসে কলকাতায়। আসলে আমার বাড়ি এখানেই। সে যে কি একটা অদ্ভুত অনুভূতি! গ্রামের মাটির সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে সেই গভীর রাত্রে একটা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়ে গেল সুরেন চৌকিদারের একটা কথায়—বাবু বাড়ি আলেন কবে?

রবিবার (১৫ই শ্রাবণ) হাট করতে গিয়ে গোপালনগরের দোকানে দোকানে বেড়িয়েও ঠিক ওই রকম অনুভূতি হল। একজন লোকে তো বল্লে—আপনি কি সেই থেকেই বাড়ি আছেন?

বর্ষা-সজল প্রাতে সোমবারে হেঁটে বনগাঁ এসেও কি তৃপ্তি! ওদেব উঠানে খুকু দাঁড়িয়ে রইল। যখন আসি দরজার কাছেও দাঁড়াল একবার।

বনগাঁয়ে খয়রামারির মাঠে যেখানে সেই মটরলতার ঝোপ, সেখানে এ বছর প্রথম বেড়াতে গেলুম একদিন। ছোট এড়াঞ্চির জঙ্গল বড্ড বেশী বেড়েচে।

সত্যিই, অপূর্ব্ব আনন্দ পেয়েছিলুম দেশে গিয়ে এই বর্ষামুখর শ্রাবণ দিনে। শুক্রবার দিন ছিল ১৩ই শ্রাবণ, আমার ছেলেবেলার ওই দিনটি আমার কাছে ছিল একটা বড় উৎসবের দিন, মনসার ভাসান বসত ওই দিনটিতে, আর তিন-চার দিন ধরে নাচ-গান চলত জেলেপাড়ায় পুরোনো মনসাতলায়। বন্য মটরলতার সবুজ ফলের থোলো যখন দুলত ঝোপে ঝোপে এই শ্রাবণ মাসে, তখনকার দিনগুলির সঙ্গে মনসার ভাসানের সুরেন জেলের নাচ আর গান জড়িয়ে রয়েচে আমার মনে—কতকাল পরে আবার সেই তেরই শ্রাবণ, সেই মনসার ভাসানের উৎসবের সময় বাড়ি গিয়েচি, ঝোপে ঝোপে তেমনি দুলচে মটরলতার কচি সবুজ ফল, মেয়েরা তেমনি নতুন শাড়ি পরে নাগ পঞ্চমীর উৎসবে যোগ দিতে চলেচে নৈবিদ্যির রেকাবি হাতে—কেমন করে বাল্যের সেই স্বপ্নজগতে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলুম অতর্কিতে! কিন্তু স্বপ্ন সেটা নয়, কারণ খুকু ছিল। আর হলই বা স্বপ্ন, জীবনের কতখানি স্বপ্ন দিয়ে গড়া তা কি সবাই জানে?

বাংলা দেশের মৰ্ম্মকাহিনী লুকোনো আছে এই সব নিভৃত পল্লী-প্রান্তের আম-বকুল-বাঁশবনের আড়ালে, যিনি লেখক হবেন, যিনি লেখনী ধারণ করবেন বাংলার কথা

শোনাবার জন্যে তাঁকে আসতে হবে এখানে, মিশতে হবে এদের সঙ্গে, যোগ দিতে হবে এদের এই সব শান্ত উত্তেজনাহীন, তুচ্ছ, অনাড়ম্বর, অখ্যাত গ্রাম্য জীবনের উৎসবে, এদের বুঝতে হবে, ভালবাসতে হবে। খ্যাতি-যশের জন্যে বা টাকার জন্যে কেউ লেখে না জানি—Jules Lemaitre-এর সেই কথা—The end is nothing, the road is all—প্রত্যেক আর্টিস্টের মনে রাখা উচিত।

হাঁ, পচা রায়ের সঙ্গে শনিবারের বিকেলে (১৪ই শ্রাবণ) কাঁচিকাটার পুলে বেড়াতে গিয়েছিলুম—কি অজস্র সোঁদালি ফুল কুঠীর মাঠের প্রায় প্রত্যেক গাছে! আমি তো অবাক, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সোঁদালি ফুল জীবনে তো কখনো দেখিনি।

ভালবাসা জিনিসটা কখনো কখনো কারো গায়ে পড়ে করার মত ভুল আর কিছু নেই। কারণ যাকে তুমি ভালবাসচো অত করে, সে তোমার ওই ভালবাসাকে 'ভালবাসা' বলে গ্রহণ যদি করতে না পারে, তাহলে তোমার ভালবাসার ফল কি? ভালবাসা pity নয়, করুণা নয়, charity নয়, সহানুভূতি নয়, এমন কি বন্ধুত্বও নয়—ভালবাসা ভালবাসা। এখন সেই জিনিসের সূক্ষ্ম মহিমা ও রসটুকু না বুঝে যে নষ্ট করে ফেলে অযাচিত ভাবে দিয়ে, অপাত্রে দিয়ে—তার চেয়ে মূর্খ আর কে?

যারা বলে, "এ তো স্বার্থপর ভালবাসা হল"—শ্রীধর কথকের সেই গান বাবা গাইতেন—"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ইত্যাদি—এ সব কথার কোন মানে হয় না। ভালবাসার নিয়মই এই, না পেলে দেওয়া যায় না, বা না দিলে পাওয়াও যায় না। এখানে এই কথায় খুব গভীর অর্থ আছে। ভালবাসা না পেয়ে যে ভালবাসা দেওয়া—যে পেলে তার কাছে তা আর ভালবাসা রইল না, সে তার উপযুক্ত মূল্য দেবে না—সে গভীর, সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অপরূপ আনন্দ পাবে না ভালবাসা থেকে, পাবে একটা সাময়িক উত্তেজনা বা egoistic satisfaction, তাতে ভালবাসার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হল। আর না দিলে নেওয়াও যাবে না—আমি যাকে ভালবাসিনে, তার কাছে যদি আমি ভালবাসা পাই তাকে আমি ঘাড়ে-পড়া বালাই বলে ভাবি। তার উপযুক্ত মূল্য ও সম্মান আমি দিতে কখনোই পারব না। যে যত গভীরভাবে আমায় ভালবাসবে, আমার দিকে attention দেবে—ততই আমি ভাবব আমার দিকে ঝুঁকচে, বিরক্ত হয়ে উঠব। সে প্রাণপণে ভালবাসচে, অথচ যাকে ভালবাসচে, সে এ থেকে কিছুই আনন্দ পাচ্চে না—এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি আছে? ভালবাসা পাওয়ার যে সত্যিকার অপূর্ব্ব অনুভূতি যা এ ধরনের পাওয়ার মধ্যে থাকে না—সুতরাং এ রকম ভালবাসা এ ক্ষেত্রে না দেখানোই ভালো।

ভালবাসা জিনিসটা দেওয়া নেওয়ার, আমি যে অর্থে ভালবাসা ব্যবহার করচি সে অর্থে। যারা ভালবাসা কি কখনো জানে না, সত্যিকার ভালবাসা কি কখনো পায় নি—তারা 'নিঃস্বার্থ' ইত্যাদি বাজে কথা ব্যবহার করে। ভালবাসা মনের এক অদ্ভুত রসায়ন—উভয় মনের সমান যোগ ভিন্ন এ দিব্য, অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয়, দুর্ল্লভ রসায়ন তৈরী হয় না। যে হতভাগ্য এ আস্বাদ করে নি—সে শাস্ত্র থেকে, দর্শন থেকে, পাঁজিপুঁথি থেকে বড় বড় নিঃস্বার্থতার বুলি আওড়ায় গিয়ে—কিন্তু যে জীবনে এর আস্বাদ পেয়েছে সে জানে, ওসব লম্বা লম্বা কথা কত অন্তঃসারশূন্য ও ফাঁকা, অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ভগবান এইজন্যই বোধহয় মানুষকে ধরা দেন না—অনেক সাধনা যে করে সে তাঁর ধরা দেওয়ার মূল্য দেয়—সহজভাবে ভগবান আমাদের গায়ে এসে ঢলে পড়লে, তাঁর চেয়ে মহকুমার তুলসী দারোগার বন্ধুত্বের মূল্য আমাদের কাছে বেশী দাঁড়াত।

ওপরের কথা যে বলা হল এটা কিন্তু ভালোবাসার অবস্থার প্রথম দিকের কথা নয়। অত্যন্ত প্রাইমারি স্টেজে আলাদা কথা। সেখানে অনেক সময় ভালবাসা দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার চেষ্টা করতে হয়—সে অন্য কথা। যখন কেউ কাউকে ভালো জানে না, সে অবস্থায় কেউ কাউকে খুব খারাপ বা গায়ে পড়াও ভাবে না—তখন দুজনেই দুজনের কাছে খানিকটা রহস্যমণ্ডিত থাকে কিনা—কেউ কাউকে খুব খারাপ ভাবতে পারে না। কিন্তু খানিকটা ভালবাসার পরে যখন দেখবে যে সে তোমার ভালবাসা নিতে পারচে না, নানা রকম চেষ্টা করেও যখন তার মধ্যে ভালবাসার প্রেরণা দিতে পারবে না তখন তার ঘাড়ে পড়ে ভালবাসা দিতে যেও না—তাতে সে বিরক্ত হয়ে উঠবে, তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার ভালবাসার মূল্য সে দিতে পারবে না বরং উল্টোই হবে—তখন তাকে ছেড়ে দিও।

[এই ডায়েরীটা লিখলাম কেন? কোন ব্যক্তিগত কারণ আছে। কিন্তু সেটা আজ আর লিখলুম না]

বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলুম অনুকূলবাবুর নিমন্ত্রণে। কি অমায়িক ভদ্রলোক! কি আতিথেয়তা ও সৌজন্য! সত্যি, অমন ব্যবহার, অমন একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতার আবহাওয়া কতকাল ভোগ করিনি!

বিষ্ণুপুরে জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন মন্দিরগুলি আমার মনে এক অদ্ভুত ভাব জাগিয়েচে। প্রসিদ্ধ দলমাদল কামান এখন লালবাঁধ বলে প্রকাণ্ড দীঘির একপাশে বসানো আছে। অনুকূলবাবুর কাছারীর জনৈক পেয়াদা আমায় নিয়ে গিয়ে দেখালে। জোড়াবাংলা বলে একটি মন্দিরের পাথর বাঁধানো চাতালে আমি ও অনুকূলবাবু বসে রইলুম সূর্য্যাস্তের সময়ে। বড় ভালো লাগল।

বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার মাটি রাঙা, সব শাল ও কেঁদ বন—বড় চমৎকার দৃশ্য, কাঁকুড়ে মাটি, কাদা নেই—খটখটে শুকনো।

দেখে ফিরবার সময়ে দূরপ্রসারী সবুজ মাঠের প্রান্তে দিকচক্রবালের শোভায় বৈকালের দিকে কত কথাই মনে এল! দূরে আমার গ্রাম—আজ রবিবার, এতক্ষণে সকলে হাটে যাচ্চে। যুগল ময়রার দোকানের সামনে ফণিকাকা দাঁড়িয়ে আছে, খাজনা আদায় করচে—এই ছবিই কেবল যেন মনের চোখে ভাসছিল।

বন্যার জল অতি ভীষণভাবে আমাদের গ্রামের চারিদিক ঘিরচে। আজই সকালে চালকী থেকে এখানে এসেচি। প্রথমে মধু পাগলা (আদাড়ি জেলেনীর নাতি) মাছ ধরচে পাকা রাস্তার ধারে। সে পথ দেখিয়ে দিলে। সাজিতলার বাঁকে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য যেন পদ্মা কি সমুদ্রের মত। থৈ থৈ করচে জলরাশি। আমাদের পাড়ায় রামপদর ঘরে বন্যাপীড়িত মানুষেরা আশ্রয় নিয়েচে। ন'দিদি তেল দিলে—আমাদের বাড়ির পিছনে শ্যামাচরণ দাদাদের চারা গাবতলায় স্নান করলাম। বরোজপোতার ডোবা দিয়ে তর তর করে শ্রোত চলেচে। ইন্দু রায়ের সঙ্গে জেলের নৌকো করে খুকুদের চারা আমবাগান দিয়ে গেলুম বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ি। সেখানে একটু গল্প করে এপারে এলুম। বট অশ্বত্থের শ্যামবীথির কি শোভা! সর্ব্বত্র জল, বটতলায় সাঁতার-জল, কিন্তু অপূর্ব্ব শোভা হয়েচে বটে!

চড়কতলার বাগানে নৌকো চড়ে গোঁসাই বাড়ির রাস্তা দিয়ে পাকা রাস্তায় এসে নামলুম। হেঁটে সাড়ে তিনটার সময় বনগাঁ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খুকুদের বাসায় বসে গল্প করি।

পূর্ণিমার রাত্রে ব্রজেন বাঁড়ুয্যে, সজনী, আমি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং সুবল এক সঙ্গে বম্বে মেলে খড়্গপুর এলুম। হাওড়া স্টেশনে প্রথমেই হাসির ব্যাপার। একজন উঠে বল্লে, আপনারা কে লণ্ডন যাবেন? আমরা তো হেসে বাঁচিনে। যাচ্চি মেদিনীপুর, বলে কে যাবে লণ্ডনে! সজনী তো হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি!

খড়্গপুর নেমে মোটরে মেদিনীপুর গেলাম কাঁসাই নদী পার হয়ে। S. D. O. ধীরেনবাবু এসেছিল আমাদের নামিয়ে নিতে। স্যর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন সভাপতি, তিনি ও অমূল্য বিদ্যাভূষণ এক গাড়িতে গেলেন—আমি, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর এক গাড়িতে।

গিয়েই জ্ঞান চৌধুরী উকিলের বাড়ি ডিনারের নিমন্ত্রণ। প্রায় আশি জন লোক নিমন্ত্রিত। ডিনারের পরে ধীরেনবাবুর বাড়িতে আমরা অতিথি হয়ে রইলুম।

সকালে সভা হল। রাধাকৃষ্ণণ বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করলেন, আমি সে সময়টা একটা তেঁতুল গাছতলার ছায়ায় বসেছিলুম। তারপর দেবপ্রসাদবাবু ও চৈতন্য দেবের সঙ্গে নাড়াজোল রাজার গোপপ্রাসাদ দেখে পুরোনো গোপপ্রাসাদে একটা প্রাচীন বাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখতে গেলাম। বেশ সুন্দর জায়গা এই গোপ, খুব উঁচু মালভূমির মত স্থান, সেগুন ও কেলিকদম্বের বন, বেশ ভাল লাগল। ওখান থেকে কাঁসাই নদীর এনিকাট্ দেখতে গিয়ে আমাদের ফটো নেওয়া হল।

ধীরেনবাবুর বাড়ি দুপুরে ব্রজেনবাবু, সজনী সবারই নিমন্ত্রণ। বৈকালে আবার মিটিং—তারপর বার হয়ে ঝুনু দাসগুপ্ত বলে একটি মেয়ের গান শুনতে যাওয়া গেল ওদের বাড়িতে। ঝুনুর বাবা এখানকার D. S. P.

রাত্রি দুটোর ট্রেনে স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলুম, ধীরেনবাবু ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলেন।

মহালয়ার আগের সোমবারে রেজেস্ট্রি আপিসে বারাকপুরের বাড়িটা রেজেস্ট্রি করে নিলাম। রামপদ ও পুঁটিদিদি এসেছিল। মহালয়ার দিন খুকু ও খুড়ীমাকে কলকাতায় আনলুম। অন্নপূর্ণার ঘাটে নেয়ে মদনমোহন ঠাকুর দেখে, Zoo, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও রূপবাণী দেখে রাত দশটার গাড়িতে ওদের নিয়ে ফিরলুম। সেই শনিবার আবার বাড়ি গেলুম—খুকুদের বাসায় রাত্রে খেয়ে সকালে চালকী। ইন্দু এল। তার সঙ্গে বারাকপুর যাই। এখনও বন্যার জল থৈ থৈ করচে। সমুদ্রের মত। এমন দৃশ্য কখনো দেখিনি।

একমাসে অনেক ঘটনা ঘটল। আমি গালুডি গেলুম পূজোর ছুটিতে, সেখান থেকে জ্বর নিয়ে ফিরলুম। বারাকপুর গিয়ে আট-নয় দিন ছিলুম। বড় নির্জ্জন, বিশেষ করে আমাদের পাড়াটা। সেখান থেকে রোজ রোজ মাছ ধরা দেখতে যেতুম নদীর ধারে। ইন্দু মাছ ধরত—ওর একটা ভাঁড় আছে, সেটাতে মাছ পড়বেই পড়বে। গুটকে থাকত। মাছ খুব সস্তা হয়েছিল। সম্প্রতি কালীপূজোর আগে কলকাতায় এসেচি।

চূড়ামণি যোগ গেল গত সপ্তাহে। রাত তিনটের সময় উঠে জগন্নাথ ঘাটে ও তারাসুন্দরী পার্কে গিয়ে ভলাণ্টিয়ারী করলুম, কত ছেলেমেয়ে হারিয়ে যেতে লাগল, তাদের যথাস্থানে পাঠালুম। আমাদের স্কুলের রামচন্দ্র দত্ত তার সেবা-সমিতির সেক্রেটারী, সে-ই আমায় যেতে বলেছিল।

সকালে ফিরে বনগাঁ গেলুম। খুকুদের বাসায় গিয়ে দেখি খুড়ীমা গঙ্গাস্নানে

গিয়েচেন—খুকুর সঙ্গে গল্প-গুজব করলুম, প্রায় সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত, খাওয়া-দাওয়া করলুম ওখানে।

সম্প্রতি নুটু চাকুরি পেয়ে কাল রাত্রে বেলডাঙ্গা চলে গেল। জাঙ্গিপাড়ার বৃন্দাবনবাবু অনেক দিন পরে এসেছিলেন—কাল তাঁর সঙ্গে বসে অনেক কথা হয়, অনেক কাজ করা গেল ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসে।

ঈদের ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিলুম, পরশু এসেছি। প্রথমে খুকুদের নতুন বাড়িতে গিয়ে দেখি ওরা সেই দিনই এসেচে। ও ঘর ঝাঁট দিতে এল আমার ঘরে—কত গল্প হল। রাত্রে অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী লীলার গল্প ও চিরপ্রভা সেনের গল্প করলুম। ভোরে উঠে চালকী। সেখান থেকে বারাকপুর ইন্দুদের বাড়ি। হরিপদদাদা সেখানে উপস্থিত, সে কাঠের ব্যবসা করচে। ইন্দু গল্প-গুজব করলে, সে কচুগাছ পুঁতছিল। আমার বাড়ি গিয়ে চাবি খুলে জিনিসপত্র রেখে স্নান করতে গেলুম। অনেকদিন পরে কুঠীর মাঠে ভূষণের ক্ষেতে বেড়াতে গিয়ে ভারী আনন্দ হল। তবে বন্যার জলে ছোট এড়াঞ্চির গাছ সব মরে গিয়েছে দেখলুম। স্নান করে বাড়ি গিয়ে রোয়াকে বসে লিখলুম হোটেলের গল্পটা। গুটকে এল—সে ভারি খুশি আমি যাওয়াতে। তাকে নিয়ে বিকেলে হাটে যাই। বিজনের ডাক্তারখানায় গল্প করলুম, নুটুর চাকরির কথা বলে। তারপর মাছ কিনে সন্ধ্যার অন্ধকারে চালকী এলুম। পথে লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিলুম একজন লোককে দিয়ে। বনের মধ্যে সাঁইকাটাতে কতক্ষণ বসে। চালকী এসে তারাপদর সঙ্গে গল্প—দিদির বাড়ি গিয়ে কতক্ষণ কথা বলি। সকালে উঠে লিখি। দুপুরের পরে বনগাঁয় খুকুদের বাসায় এলুম। খুকু একটু পরে এসে বল্লে—একেবারে গা ধুয়ে এলুম—আপনার পাল্লায় পড়লে আর তো যেতে পারব না। তারপর কমলের চিঠি, সুপ্রভার কবিতা পড়লে। বেলা পড়ে এল। বল্লে—চলুন, ছাদে যাই, দেখিয়ে আনি। ছাদে গিয়ে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বললুম। মেরী এণ্টয়নেট ছবির গল্প করি। নিস্তব্ধ বৈকাল, ছায়া পড়ে আসচে খয়রামারির দিকে। বেশ লাগল। চোদ্দ বছর বয়সে কি দেখেছিল সে সম্বন্ধে কথা। তারপর চা খেয়ে ওখান থেকে বার হয়ে লিচুতলায় এলুম। আগের দিন যখন রাত্রে থাকি, বেরুবার সময় বল্লে—সকাল করে আসবেন, দেরি করবেন না। লিচুতলায় বিশ্বনাথের সঙ্গে সাহিত্য সম্মেলন সম্বন্ধে আলোচনা, রাত আটটার ট্রেনে কলকাতা।

আজ নীরদবাবুর বাড়িতে সোমনাথবাবুর সঙ্গে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা কথা হল। তারপর পার্ক স্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত হেঁটে এলুম। বেশ লাগছিল শহরের এই জনস্রোত। মেট্রোর সামনে খুব ভিড় Marie Antoinete ছবি দেখানো হচ্ছে, নর্ম্মাশিয়ারার নেমেচে প্রধান ভূমিকায়। রাস্তায় রাস্তায় সাধনা বোস, কাননবালার ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপন।

পঞ্চাশ বছর পরের কলকাতা কল্পনা করলুম। কেউ নেই এরা। কেউ নেই আমরা। সাধনা বোস প্রাচীনা বৃদ্ধা হয়ে হয়তো বেঁচে আছে। তখন নতুন একদল উঠেচে, তাদের নাম কেউ জানে না। জীবনের চিত্র-নাট্যপটে কত অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। গিরিশ ঘোষের স্কুলের প্রবীণা অভিনেত্রী বিনোদিনী আজও আছে। গঙ্গার ধারে বসে মালা জপ করে।

এই তো জীবন—এই যাওয়া, এই আসা, এই পরিবর্ত্তন। দেখতে বেশ লাগে।
আমি সবটা মিলিয়ে দেখি—একটি চমৎকার সিনেমার ছবি।
এই খুকু, এই সুপ্রভা, বনসিমতলার ঘাট, আমি—কে কোথায় মিলিয়ে যাব।

নুটুর বিয়ে হয়ে গেল গত বুধবারে ১৬ই অগ্রহায়ণ। জাহ্নবীকে আনতে গিয়েছিলুম—খুকুদের বাড়িতে গেলুম, কতক্ষণ গল্প করার পর বাইরে জ্যোৎস্না উঠেচে দেখে বাইরে এলুম—ও বল্লে, ছাদে চলুন। ছাদে গেলুম, খুড়ীমা এল না দেখে ও বল্লে—মা এল না। দুজনে কত গল্প করলুম, নতুন ব্লাউজের গল্প, কি করে সেটা ছিঁড়ে গেল তাই নিয়ে হাসাহাসি। পরদিন দুপুরে গিয়েচি, কত গল্প, কেবল বলে, 'বসুন বসুন'। তারপর গাড়ি এসেচে, জাহ্নবীকে নিয়ে যাচ্চি, ও দেখি ছাদের ওপরে উঠেচে। আমি ওদের বাড়ি যাচ্চি দেখে নেমে এল। বাইরের দোর খুলে দিয়ে চলে গেল। তারপরেই পান হাতে করে এল। চায়ের কাপ যে আলমারিতে থাকে, সেখান থেকে টাকা দিলে। ও খুঁজে পায় না—আমি খুঁজে বার করলুম।

সারাপথ ট্রেনে কি আনন্দেই গেলুম! আনন্দেই ভোর। সে আনন্দের ভাবনা আর শেষ হয় না। জ্যোৎস্না-ভরা গত রাত্রির ছাদের কথা, ইছামতীর দৃশ্য, ওর সেই নতুন ব্লাউজের গল্প কেবলই মনে হয়।

মামার বাড়ি যাবার আগে জাহ্নবীদের কলকাতা নিয়ে ঘোরালুম। মামার বাড়ি গেলুম সন্ধ্যার সময়। ভোর রাত্রে দধি-মঙ্গল হল। তখনও ঘুম ভেঙে উঠেই কি সুন্দর ভাবনা! আনন্দের চিন্তাতেই ভোর। সারাদিন ওই একই চিন্তা। অন্য চিন্তাই নেই। সেই রাত্রি, সেই জ্যোৎস্না-ভরা ছাদ, সেই ব্লাউজের গল্পের স্মৃতি। বিয়ে হয়ে গেল। তার পরদিন এক রকম কাটল। শুক্রবারে বৌ-ভাত। খুব জাঁক-জমকেই বৌ-ভাত হল। বিভূতির মা এলেন, বিষ্ণু এল বারাকপুর থেকে। শনিবার ওদের নিয়ে আবার বনগাঁ। আবার কত কথা, কত গল্প। ও বল্লে, যা কিছু শিখেছি আপনারই জন্যে, আপনি কত বিদ্বান, আমি তো কিছুই জানিনে কি করে যে আপনার সঙ্গে এমন হল! দেখুন সংসারের কোন কাজে মন বসাতে পারিনে--মন হু হু করে, কেবল ওই সব কথা ভাবি।

আমি দেখলুম—আমারও তো ওই রোগ। অদ্ভুত! অদ্ভুত! বল্লে, কোথাও তার আগে নিয়ে চলুন। জীবনে অনেক বেড়াব কিন্তু আপনার সাহচর্য্য তো আর পাব না।...

ভগবানের অতি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ল্লভ দান এই জীবনের অমৃত-ধারা। পলে পলে, দণ্ডে দণ্ডে তা অনুভব করচি—আজ সাত বছর ধরে, ১৯৩৪ সাল থেকে। এর তুলনা নেই। এ আনন্দের বর্ণনা করতে পারি এমন ভাষা নেই। কতকাল চলে যাবে—তখন খুকুও থাকবে না, আমিও থাকব না—কে জানবে ইছামতী তীরের এক ক্ষুদ্র গ্রামে শেফালি বকুল গাছের নিবিড় ছায়ায় ছায়ায়, কত হেমন্তের দিনের সন্ধ্যায়, কত শীতের দিনের জ্যোৎস্নায় দুটি প্রাণীর মধ্যে কি নিবিড় প্রীতির বন্ধন ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল!

আকাশে তার বার্ত্তা লেখা থাকবে, সে গ্রামের বাতাসে তার গানের ছন্দ অশ্রুত সুরে ধ্বনিত হবে, সেখানকার মাটির বুকে তাদের চরণচিহ্ন অদৃশ্য রেখায় আঁকা থাকবে চিরকাল অনাগত যুগের প্রণয়ীদের উৎসাহ ও আনন্দ যোগাতে।

কাল বৈকালে বিশ্বনাথ ও আমি বৈকালের ট্রেনে এলাম। এসেই সারারাত মিউজিক কনফারেন্সে গান শুনেচি। এসেচি রাত চারটার সময় বিখ্যাত কেশরী বাঈ ও বরোদার লছমী বাঈয়ের গান শুনে। বেনারসের পুরস্কার মিশ্র ও বিলায়তুর সানাই বাজনা সত্যিকার উপভোগ করবার জিনিস। কেশরী বাঈ যখন বসন্ত-বাহার আলাপ আরম্ভ করলে তখন আমাতে যেন আমি নেই মনে হল—যেন শৈশবে আমাদের গ্রামে শতমধুর

বাল্যস্মৃতির মধ্যে ফিরে গেলুম এক মুহূর্ত্তে। কত মধুর অপরাহ্ণের ছায়ায় অতীত দিনের জীবনের ঘটনাগুলির মধ্যে দিয়ে আমার অতি প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান যেন অস্পষ্ট হয়ে এল—বুঝলুম না কোনটা অতীত, আর কোনটা বর্ত্তমান। কেবল এইটুকু বুঝলুম, গান শুনতে শুনতে আমার মন আরও একজনের জন্যে খুব খারাপ হয়ে উঠল—আজই তাকে ছেড়ে এসেচি. কেবলই মনে হচ্ছিল এত মেয়ের মধ্যে কনফারেন্সের সভায়, আমার যেন কেবল তার কথাই মনে পড়েচে, অবশ্য সেই বয়সের মেয়ে দেখলে। এবার বড়দিনের ছুটি কি আনন্দেই কেটেচে—ওকে নানা রকম গল্প করে ও কত রকমের কথা বলে। সে সব এমন চমৎকার যে সারা বড়দিনের ছুটি কেমন যেন নেশার মত আনন্দের ঘোরে কেটেচে। সকালে দেখা করতে যেতুম—একদিন 'বাজার করব' বলে তাড়াতাড়ি করচি, বল্লে—কেন এখুনি যাবেন? বল্লুম—বাজার না করলে বাড়িতে বকবে জাহ্নবী। ও বল্লে—আপনি একটু বকুনি সহ্য করতে পারেন না? আর আমি যে আপনার জন্যে কত বকুনি সহ্য করেচি মার কাছে। আপনার তো ছোট বোনের বকুনি!

খুড়ীমা দুদিন ভাগবত শুনতে গেলেন—আমি ওর সঙ্গে বসে গল্প করলুম কত ধরনের। বেশ কাটল ছুটিটা। কোন ছুটি এত আনন্দে কেটেচে কিনা এর আগে বলতে পারি নে। ভালবাসার প্রকৃত রূপ কি তার কতকটা যেন বুঝলুম!

হাওড়া টাউন হলে ওরা আমায় সম্বর্দ্ধনা করে মানপত্র দিয়েছিল ছুটির আগেই, তাতে রবীন্দ্রনাথ আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন।

একদিন আশীষ গুপ্তের মোটরে রাজপুরে ফুলিদের ওখানে গিয়েছিলুম, সেও বড়দিনের আগে। ১৯৩৮ সালটা সবদিক দিয়ে বড় অদ্ভুত বছর আমার জীবনে।

এবারকারের আর একটি চমৎকার ঘটনা, ভাগলপুরে সুরেন গাঙ্গুলী মশায়ের সেই চেকভের Cook's Wedding বইখানা—যা পড়ে মুঙ্গেরে কোম্পানীর বাগানে, বড় বাসায় গঙ্গার ধারে আজ চোদ্দ বছর আগে কি অদ্ভুত আনন্দ ও প্রেরণা পেয়েছিলুম—তা পড়লাম বসে—সেই বইখানাই (সুরেন গাঙ্গুলীর কাছ থেকে এনেছি. বইখানা শরৎচন্দ্রের) বারাকপুরের বাড়ির রোয়াকে বসে পড়লুম। আশ্চর্য্য—না!

সুপ্রভা এবার একটা ভালো ক্যালেন্ডার পাঠিয়েচে।

মনে আছে এই শীতকালে পাটনার ডিস্ট্রিক্ট জর্জের বাড়ি গঙ্গার ধারে বেঠোফেনের মিউজিক শুনতে গিয়েছিলুম গ্রামোফোন রেকর্ডে, নীরদ চৌধুরীর সঙ্গে সকাল বেলা। ওপারে ধূ ধূ গঙ্গার চর, শীতের নদী, বড় বটগাছটা—আমাকে কেবলই মনে এনে দিয়েছিল একটি মেয়ের কথা। সে যেন কোথায় দূরে আছে, শিউলি বকুলের ছায়ায় ছায়ায় তাকে মাঝে মাঝে দেখা যায় দুপুরে, সকালে. বৈকালে, সন্ধ্যায় ছায়া ঘন হয়ে যখন নামে। যখন চা পার্টি বসল পাটনায় গবর্ন্মেণ্ট উকিলের বাড়ি সন্ধ্যাবেলা—তখনও রাঙা। রোদ মাখানো বাইরের গাছপালার দিকে চেয়ে ওর কথাই ভেবেচি। আর কি আনন্দেই মন ভরে উঠত!

বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হল পরশু, সরস্বতী পুজোর দিন। সজনীবাবু, ব্রজেনদা, তারাশঙ্কর সবাই গিয়েছিল আমার বাসায়। সজনীবাবুর সঙ্গে খুকুর দেখা করিয়ে দিলাম। দুলুর মা, মাধব ঘোষাল, রমাপ্রসন্ন, গৌরবাবু, সব সকালে গিয়েছিল মোটরে। ওদের নিয়ে গেলুম বারাকপুরে। খুকুদের বাসায় চা খেয়ে গেল সবাই। বারাকপুরে আমার ঘরের মধ্যে বসল। ইন্দুদের বাড়ি সব গেল চা খেতে। আমাদের পুরোনো ভিটে দেখলে। মায়ের কড়াখানা দেখলে—তারপর বরোজপোতার বাঁশবাগানে

গিয়ে সবাই পড়ল শুয়ে। কিছুক্ষণ পরে মোটর মেয়েদের নিয়ে এসে পেঁাছল। দুলুর মা আর খুকু দেখি বাঁশবাগান দিয়ে চলেচে নদীর ঘাটে। দুলুর মা বাঁশবাগানে এসে দাঁড়াল। তারপরে আমরা যখন নদীর ঘাটে যাচ্চি, তখন দেখি খুকু আর দুলুর মা আর উমা আসচে। আমরা কুঠীর মাঠে গেলুম, ভাঙা কুঠীটা দেখলুম। তারপর মেয়েদের রেখে প্রথম আমরা এলুম বনগাঁয়ে। মেয়েরা পরে এলেন। সজনী, ব্রজেনদাকে নিয়ে গেলুম খুকুদের বাড়ি। খুকুর সঙ্গে কথা হল। তারপর বিরাট সাহিত্য-সম্মেলন স্কুলের হলে। সত্যবাবুর পার্টির পরে সবাইকে রওনা করে দিয়ে খুকুদের বাড়ি এসে গল্প করলুম। খুকু কাছের চেয়ারে বসে কাদম্বরী পড়ে। ও আর আমি দুজনে গ্রামে কেমন বেড়ালুম।

বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে তারাশঙ্করদের বাড়ি এসে ক'দিন বেশ কাটালুম। কাল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রে বীরভূমের উদার, উন্মুক্ত মাঠের মধ্যে এক জায়গায় বসলুম। জ্যোৎস্নালোকিত মাঠের মধ্যে বসে দূরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে খুকুর কথা ভাবলুম। ওর দ্বারা আমার যে অভাব পূরণ হয়, তা আর কারো দ্বারা যে হয় না তা বলাই বাহুল্য। ওর স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা, হাসি, চোখের চাহনি, ছাদে প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা—এ সবই আমার জীবনের একটা মস্ত অভাব পূর্ণ করেচে। এই কথাটাই লাভপুরে এসে পর্য্যন্ত মনে হয়েচে—বিশেষ করে কাল ওই নির্জ্জন মাঠের মধ্যে বসে দূর দিগন্তের জ্যোৎস্না-প্লাবিত তালীবনের দিকে চেয়ে চেয়ে—আজ স্তব্ধ রৌদ্রদগ্ধ দুপুরের মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়ে– ওই কথাই মনে হয়েচে বা কাল নির্ম্মলশিববাবুদের বাড়ির পেছনে সন্ধ্যাছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরের মধ্যে একা বসে ওর যে ছবিটি মনে এসেচে সেটি হচ্চে—এই শনিবার, ছাদে দাঁড়িয়ে ও প্রত্যেক ঘোড়ার গাড়ি-খানা সাগ্রহদৃষ্টিতে দেখচে।

মধ্যে এখানে সুপ্রভা এসেছিল—তার সঙ্গে একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গেলুম। তারপর সে চলে গেল। একদিন আমার মেসে এল সকালে প্রীতি সেন বলে একটি মেয়ের সঙ্গে। ওকে শেয়ালদ' স্টেশনে তুলে দিয়ে এলুম। তারপর বাড়ি গিয়ে খুকুদের সঙ্গে এসব গল্প করি। খুড়ীমার অসুখ হয়েচে। খুকু ও আমি বসে অনেক গল্প করি। মনোরমা ও তার বরের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে বারাকপুর গেলুম। প্রচুর আমের বউল হয়েচে দেশে, বউলের ঘন গন্ধ সর্ব্বত্র। নদিদির সঙ্গে গল্প করি। কিশোর বোষ্টুম রোয়াকটা ঝাঁট দিয়ে দিলে। বরোজপোতার বাঁশবনে ডোবার ওপারে কি চমৎকার একটা চারা শিমুল গাছে শিমুল ফুল ফুটেচে। শ্যামাচরণদা'র সঙ্গে গল্প করি। খুকুদের বাড়ির দিকে কেউ নেই—যেন শূন্য! খুকুর কাছে সে গল্প করি দুপুরে গিয়ে। খুকু বলে, 'বসুন, জিরিয়ে যাবেন।' তারপর মাধব ঘোষাল এক-দিন তার বৌদিদি, মাসীমাকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়ে বাঁশবনে বসল—মায়ের কড়াখানা দেখে এল। ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে একদিন Salt Lake দেখতে গেলুম।

পরশু গিয়েছিলুম নুটুর কর্ম্মস্থলে বেলডাঙা। আজ ফিরেচি। কাল এমনি সময় মাসীমা, বৌমাকে নিয়ে বহরমপুর গিয়েছিলুম। জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার ধারে ঠিক যেন ইসমাইলপুরের মত মনে হল। তারপর জীবনের কত পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে ভাবলুম!

আজ ফিরেচি তিনটের ট্রেনে। দুপুর রোদে সারাপথ ঘুমিয়েচি—তবে, বীরনগরের কাছে ঘেঁটুফুল দেখেচি খুব। দূরে এই ফাল্গুন দুপুরে একটি মাত্র গ্রাম এত গ্রামের মধ্যে, যেখানে একটি মাত্র মেয়ের কথা মনে হয়। শিউলিতলায় ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে

আছে। স্কুল কমিটির মিটিং ছিল, মিটিং-এর পরে স্কুলের ছাদ থেকে বড় অনুভূতি হল অনেকদিন পরে। 'জনতার মাঝে জনগণপতি' গানটি বহুদিন পরে গাইলুম—সঙ্গে সঙ্গে সেই অপূর্ব্ব অনুভূতি আবার মনের মধ্যে ফিরে পেলুম। তখন খুকু ছিল না —যখন গাইতুম পঞ্চানন মান্নাকে পড়াবার সময়ে।

ট্রামে আসতে আসতে ভাবছিলুম, সেই যে নাগপঞ্চমীর দিন শ্রাবণ মাসে বারাকপুরে গিয়েছিলুম, খুকুদের বাড়ি যেতুম, ওদের হাসাতুম, 'ছোড় দি, ভাল কি মন্দ' বলে —তারপর যেন আর কখনো বারাকপুর যাইনি—ওকে আর দেখিওনি। ও চলে যেত কাছ দিয়ে, আমি হাত বাড়িয়ে চালের বাতা থেকে কাপড়ের ফালি পাড়তুম—ও বলত, মা রেখেচে তুলে, হাত দেবেন না। তারপর যেন এই দীর্ঘ সাত-আট মাস ওর সঙ্গে দেখা হয় নি।

খুকু একরকম ঠেলেই বারাকপুরে পাঠালে এবার। মহরম ও দোলের ছুটি আর বছর কেটেছিল গালুডি, এবার বনগাঁ। খুব আনন্দে কাটিয়েচি। চারদিন খুকু ও আমি একবার সকালে একবার সন্ধ্যায় বসে গল্প করতুম। একদিন ওকে নক্ষত্র সম্বন্ধে আমার Radio talk-টা পড়ে শোনালুম।

ঝন্‌ঝন্ দুপুরে গেলুম বারাকপুরে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের কি সুগন্ধ! বিশেষ করে চাল্‌কী আর বনগাঁ থেকে বার হয়েই। চাল্‌কী মুসলমান পাড়ার মধ্যে, গাজিতলার রাস্তায় বাঁশবনে একা চুপ করে মাঝের বাড়িখানার সামনে বসে রইলুম। বাঁশপাতায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। কোকিল ডাকচে অনবরত। সেদিন মাধব ঘোষালের মোটরে বেড়াতে এসে ওর বৌদিদি ও মাসীমাকে নিয়ে এই বরোজপোতার বাঁশবনে বসেছিল।

কাল শনিবার বেলডাঙা গিয়েছিলুম নুটুর কাছে। সারাপথ ঘেঁটুফুলের শোভা যা দেখলুম, তাতে মন মুগ্ধ হয়ে গেছে। এই ফুলটা বেশী আছে মদনপুর ও শিমুরালি স্টেশনের কাছে এবং রাণাঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইনের দুধারে, আর আছে বীরনগরে স্টেশনের সামনের মাঠে। কেমন একটা মিষ্টি অথচ ঈষৎ তেতো গন্ধ বার হয় ফুল থেকে! মুর্শিদাবাদ লাইনে ঘেঁটুফুল নেই, বেলডাঙা ছাড়িয়ে বহরমপুরের পথে কিছু আছে, আর আছে 'পাগলাচণ্ডী' বলে স্টেশনের কাছে।

সন্ধ্যার আগে বেলডাঙা থেকে ফিরলুম মামীমাদের নিয়ে, সারাপথ দূরে একটি ঘেঁটুফুলের বনের কথা চিন্তা করেচি, তার বনসিমতলার ঘাট, তার শিউলিতলা, আমতলা এই বসন্তে কি মধুর হয়েচে! একটি মেয়ের কথা মনে হয় ঝন্‌ঝন্ দুপুরে তেতো ঘেঁটুফুলের গন্ধের মধ্যে, সে শিউলিতলার পথ দিয়ে লেবুতলার পাশ দিয়ে আমতলার উঠানে আসচে চুপি চুপি!... এ একটা ছবি, যা এ সময় বড় মনে আসে...

গত শনিবারের আগের শনিবার মাধব ঘোষাল একটা গ্রামোফোন দিলে। তাই নিয়ে বনগাঁ গেলুম। খুকুকে গান শোনালুম, 'খনা' ছবি দেখাতে নিয়ে গেলুম ওদের সকলকেই। খুকু একখানা পাপোশ বুনেছে দড়ির। সেখানা আমায় হাসিমুখে নিয়ে এসে দেখাতে লাগল—দোরের কাছে দাঁড়িয়ে।

—দেখুন, কেমন বুনেছি, ভালো না?

—বেশ ভালো, চমৎকার।

—না সত্যি বলুন!

—না না, বেশ।

তবুও পাপোশখানা হাতে নিয়ে সাগ্রহ মুখে দাঁড়িয়েই রইল দরজার কাছে।

তার সেই হাসি হাসি মুখখানা বেশ মনে পড়ছে এখনও। সুন্দর উজ্জ্বল মুখখানা।

গতকাল রামনবমীর হাফ্ ছুটি পেয়ে রাজপুরে ফুলিদের বাড়ি গেলুম। ওরা সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে আছে। অনেকদিন পরে সত্য মজুমদারের ভেতরের বাড়িতে গেলুম। সেই পুকুরধারটিতে কতকাল পরে আবার দাঁড়ালুম। আমার সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ হয় এই পুকুর পাড়ের ঐ দেবদারু গাছটা দেখে। কি অপূর্ব্ব ভাবই হত মনে!

এই শনিবার (২রা) বাড়ি গিয়ে মুখুজ্যেদের ওখানে খুব গ্রামোফোন বাজানো গেল। গত ঈস্টারের ছুটিতে খুকুকে গ্রামোফোন শোনাব বলে বনগাঁয়ের ডাক্তারবাবুকে কত বলে বারাকপুরে নিয়ে গিয়েছিলুম। এবার ও নিজেই একটা গ্রামোফোন পেয়েচে মাধব ঘোষালের কাছ থেকে। আমায় রেকর্ড চেয়ে আনতে বলেছিল। ওরাও দেখি, দিলীপ রায়ের আর বছরের ভাল গান 'এই পৃথিবীর পথের পরে' প্রভৃতি ভাল গান-গুলো পেয়েচে। সেদিন রবিবারে রাতে এগারোটা পর্য্যন্ত আমায় উঠতে দেয় না—কেবল বলে—"এইটে শুনে যান না! লাইলি মজনুর পালাটা শুনে যান।" বহু লোক এসেচে, চা করচে খুব, আর বলচে—"রবিবার দিনটাই কি সব যত ভিড়! অন্য দিনও তো আসলে পারত গান শুনতে।" ওর জন্যে প্রাণপণে ঘুরে রেকর্ড সংগ্রহ করেচে ওর দাদা, বনগাঁর সব জায়গা ঘুরেচে! আমায় বলেছিল—আমিও অপূর্ব্ববাবুর বাড়ি থেকে, দেবাশিসের কাছ থেকে, গণপতিবাবুকে বলে নানা জায়গা থেকে অনেক রেকর্ড যোগাড় করেচি। বীণা চৌধুরীর গান, দিলীপের, জ্ঞান গোঁসাই-এর গান ইত্যাদি। ভারী উৎসাহ লেগেচে রেকর্ড সংগ্রহ নিয়ে ও গান বাজানো নিয়ে। সেদিন বল্লে—এবার টিপ্ আনবেন আমার জন্যে।

বল্লাম—বেশ।

—আর কি আনবেন?

—বল না।

—কলকাতায় আর একবার যেতে হবে।

—যেও, ভালই তো।

—টিপ আনবেন ঠিকই।

মধ্যে গেলুম রাজসাহী নওগাঁ। রাত্রে মোটর নিয়ে গেলুম মহাদেবপুর জমিদার বাড়ি। সেখান থেকে পাহাড়পুর। প্রায় সত্তর মাইল মোটরে বেড়ানো গেল। এ শনিবারে বনগাঁ গিয়েচি—পান্নারা নিয়ে গেল বাসে। যখন যাচ্ছি তখন খুকু দেখি জানলার কাছে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্চে। সকালে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করেছিল—আমায় বল্লে, টিপ ফুরিয়ে গিয়েচে, টিপ আনবেন কিন্তু।

আজ একুশ বছর পরে বারাকপুরে কালীর সঙ্গে বেলডাঙ্গা বেড়াতে গিয়ে মরগাঙের ধারে সেই উঁচু জায়গাটাতে বসলুম। ১৯১৮ সালের মে মাসে প্রথমে শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে ওকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে বসে গল্প করেছিলুম। আজ আবার এত বৎসর পরে ওর সঙ্গে মরগাঙের ধারে বসেচি সেই মে মাসেই। জীবনের

কত ঘটনা তারপর ঘটে গেল—গৌরী এখানে এল, তাকে নিয়ে পানিতরে গেলুম—সে মারা গেল—তারপর জব্বলপুর, হরিনাভি, চট্টগ্রাম, ঢাকা, আবার কলকাতা ভাগলপুর—আবার কলকাতা, (১৯৩৩—৩৯)—কত কি, কত কি। আবার এতকাল পরে ও এসেচে, ওর সঙ্গে বিকেলে বেড়াতে এসেচি বেলেডাঙ্গায়। ওর সঙ্গে অনেক গল্প করে আইনদ্দির বাড়ি গিয়ে দুজনে বসি। ওবেলা আমগাছে পরগাছা হয়েছিল তাই তুলে এনেছিলুম। খুকু তাই পরে এসে দেখালে কেমন দেখাচ্চে।

গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—এতদিন পরে বেশ লাগচে। আবার শুরু হয়েচে শিউলিতলার উঠোনে আসা-যাওয়া—নারকোল গাছের পাতায় লণ্ঠনের আলো পড়া—সেই সব প্রতি বছরের মত।

বিকেলে একটা সোঁদালি গাছে ঠেস্ দিয়ে কুঠীর মাঠে অনেকক্ষণ বসেছিলুম। তারপর বনসিমতলার ঘাটে এসে দেখি খুকু ঘাট থেকে পথে উঠেচে। খুড়ীমা তখনও জলে। ওরা উঠে চলে গেল, আদাড়ি এসে নামল জলে। আজ কি চমৎকার কালবৈশাখীর কালো মেঘ করে এল কাঁচিকাটার দিকে। জলে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখলুম। তারপরে শিমুলতলায় এসে দেখি উত্তর মাঠে কালবৈশাখী আরও নিবিড় হয়ে আসচে। কত কথা মনে করিয়ে দেয় এই বারাকপুরের কালবৈশাখী—এমন আর কোথাও যেন দেখিনি। জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে আসা সার্থক এই কালবৈশাখীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া যায় বলে। বারাকপুরে আজকাল জীবনটা নানা সুখেদুঃখে হর্ষবেদনায় স্পন্দমান, পুরোনো দিনের স্মৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়—তাই হয়েছিল কিন্তু দিনকতক, ১৯২৩—১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। অদ্ভুত ধরণের জীবন্ত দিন আজকাল—তবে বোধহয় এইবার যেন আরও বেশী। পরশু সুপ্রভার পত্র পেয়েচি—রত্নাদেবীর চিঠিতে তিনি লিখচেন তাঁদের ওখানে যেতে। দেখি কতদূর কি হয়।

আজ সকালে যখন কুঠীর মাঠে গিয়েচি, তখনই দূরে কোথাও আকাশের কোলে মেঘ ডাকচে। কি সোঁদালি ফুলে-ভরা মাঠের শোভা। ওপাড়ার ঘাটে যখন নেমেচি জলে, তখন ঝড়ো মেঘের কি শোভা! ঘন কালো মেঘপুঞ্জ ঘুরে ঘুরে ওলট-পালট খেতে খেতে মাধবপুরের মাঠের দিকে উড়ে চলেচে—তারপরেই এল ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি। খানিক পরে উঠল রোদ। খুকু ওই অত বেলায় উঠে যাচ্চে নদিদির বাড়ি থেকে—আমি বলতেই হেসে চলে গেল। তারপর সারাদিনের মধ্যে কতবার এল গেল—নানা ছুতোয়। আমতলায় চেয়ার পেতে বসে আছি—দুবার এসে খানিকক্ষণ করে রইল। বলে—এক পা এগিয়ে যাই তো দু' পা পিছুই। কেন তা কি জানি। সে কথাটা ওদের দাওয়া থেকে নেমে ছুটে এসে আমতলায় বলে চলে গেল। বিকেলে গোপালনগর থেকে এসেচি—ও অমনি এল শিউলিতলায়। খানিকটা পরে নাপিত বৌ আসাতে আমি চলে গেলুম গা ধুতে। ভূষণ মাঝির জমির ওপারে সোঁদালী ফুল ফুটেচে—সে দিকে চেয়ে আমার কি আনন্দ—এমন অপূর্ব্ব আনন্দের অনুভূতি কোথাও হয় না কেন তাই ভাবি। জলে গা ধুতে নেমেও যেন আর উঠতে ইচ্ছে করে না। বনসিমতলার ঘাট, একফালি চাঁদ আকাশে, কুঁচ-কাঁটার জঙ্গল—ঘাটে স্নানরত খুকুর দিদি—বিশেষতঃ ঘাটের পথে—এই সব মিলে কি আনন্দই এল মনে! অপূর্ব্ব আনন্দে কাটচে গ্রীষ্মের ছুটিটা। রোজ সকালে উঠে মনে হয় আজ না জানি কি ঘটবে। খুকু থাকে বলেই আনন্দটা ঘনীভূত হচ্চে। আনন্দের উৎসমূল তো ওই-ই।

আজ ভারী চমৎকার কালবৈশাখী হয়ে গেল বিকেলটাতে। কালবৈশাখীর যে অপূর্ব্ব প্রকাশ এখন সন্ধ্যার কিছু আগে! একটা চাপা রাঙা মেঘ হয়েচে এমন অপরূপ। কাল চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েচি। সে লিখেচে—বাবা, আপনি একবার এখানে চলে আসুন। লিখতে লিখতে মেঘটা অতি অপরূপ রাঙা রং ধরেচে। বারাকপুরে এবার অতি সুন্দর কাটচে—তবে ঝড়-বৃষ্টি অতি কম—ক'দিন তো বেশ গরম গেল।

আমি আর কালী কুঠীর গাছে ডুমুর পাড়লুম। তারপর বেলডাঙা যেতে যেতে ভীষণ কালবৈশাখীর ঝড় পেলুম। ঘোষেদের দোকানের মধ্যে আমি, কালী, আইনদ্দির নাতি আর দোকানদার মনু ঘোষ। ঝড়ের বেগে দোচালা জীর্ণ ঘর উড়ে যায় আর কি—সবাই মিলে বাঁশ ধরে থাকি—তবে রক্ষা হয়। তারপর দেখি বড় অশ্বত্থ গাছটা পড়ে গিয়েচে। আমার নারকোল গাছটাও পড়েচে। খুকুরা নারকোল কুড়িয়ে রেখেচে সব। খুকু সন্ধ্যার সময় আমায় লণ্ঠন ধরে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। বল্লে, আজ খুব ভালো গল্পের দিন। যাবেন না আমাদের বাড়ি? ও রোজ সন্ধ্যার সময় আমায় নিতে আসে—ছুতো করে ন'দিদিদের বাড়ি আসে আমায় নিয়ে যেতে। যাবার সময় বলে—যাবেন না কি?

আজ বিকেলের দিকে অপূর্ব্ব কাজল মেঘ করে এল—থমকে রইল, বৃষ্টি হয় না। খুকু আজ সকাল থেকে কতবার যে এল! আমি বেলেডাঙ্গায় বেড়াতে গেলুম, পুলের এধারে ঘাসের ওপরে বসি। খেজুর গাছে কাঁদি কাঁদি খেজুর, শিমুল, বাঁশ বনের মাথায় কালো কাজল মেঘ (খুকুকে দুপুরে বলছিলুম আমতলায় যখন সে দিলীপ রায়ের 'তরঙ্গ রোধিবে কে?' বইখানা দিতে এল—তুই বলতিস—কা-লো-কাজল মেঘ) সব সুদ্ধ মিলে বড় অপূর্ব্ব লাগল।

এই পল্লীগ্রামের যে জীবনযাত্রা, শতাব্দীর পর শতাব্দী এই রকম, এই বাঁশ শিমুল বনে অপরাজেয় শোভা এমনি ধারা দেখা যায়—ঝিঙে ক্ষেতে এমনি ফুল ফোটে—কত বনসিমতলার ঘাট, কত গ্রাম্য মেয়ে, কত হাসি কান্না প্রেম বিরহ—এই রকম চলবে। এদের নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখব আজ মাথায় এসেছে। পৃথিবীর ঊর্দ্ধে এই শ্যামল মেঘ-স্তূপ যেমন শান্ত, স্থির তেমনি নির্ব্বিকার। মহাকাল যেন এই উপন্যাসের পটভূমি—নায়ক-নায়িকা গ্রাম্য নরনারী। Da Vinci-র শেষ জীবনের মত গম্ভীর তার আকৃতি। সন্ধ্যায় স্নান করে ফিরে এলুম—খুকু মনোরমার মার সঙ্গে বাঁশতলার পথে ঘাটে যাচ্চে। তাকেও এই উপন্যাসের মধ্যে স্থান দেব।

আজ দিনটি সব দিক দিয়ে ভারী চমৎকার। বেশ মেঘ করে এল, ঘন আমতলায় চেয়ার পেতে বসে দাওয়ার কোণে দণ্ডায়মানা খুকুর সঙ্গে কথা বলচি। দুপুরের পর ইন্দু, আমি, গুটকে কুঠীর মাঠের পথ দিয়ে মোল্লাহাটি গেলুম। ইন্দু গেল আমডোবে। আমি ও গুটকে মোল্লাহাটি কুঠী ও নীলের হাউজঘর দেখি এতকাল পরে। কি সুন্দর শ্যাম শোভা, অনুন্নত খেজুর গাছ, জলি ধানের ক্ষেত পথের দু পাশে, একটা সমাধি দেখলুম বাঁওড়ের ধারে মোল্লাহাটিতে। ফিরবার পথে খুব জামরুল পাড়লুম দুধারের গাছ থেকে। বেলা পাঁচটার সময় ফিরে রোয়াকে এসে বসেচি, খুকু এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে।

আজ সকালে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েচি, অপরূপ নীল মেঘ ওপারের চরের ওপরে ঝুলে পড়েচে। তাড়াতাড়ি এসে খুকুকে ডাকলুম—খুকু, খুকু, উঠে মেঘের অপূর্ব্ব রূপ দেখে যা—ও ঘুম ভেঙে উঠে ঘুম-চোখে মশারীর বাইরে মুখ বার করে বলল, আজ এত কাল পরে বর্ষা নামল বোধ হয়। পথেঘাটে কালো এত ধুলো—যে একখানা গরুর গাড়ি গেলে ধুলোয় সর্ব্বাঙ্গ ভরে যায়। শেষ জ্যৈষ্ঠে এমন শুকনো খট্‌খটে রাস্তা, এমন ধুলো কখনো দেখিনি। আজও ধুলো ভেজেনি পথের। এ বৃষ্টিতে দিনটা ঠাণ্ডা হল মাত্র।

এবার গ্রীষ্মের ছুটির প্রতিদিনটি যে আনন্দ বহন করে আনে, তা মনের আয়ুকে যেন বাড়িয়ে দিয়েচে। দেহের যৌবনের ন্যায় মনের একটা যৌবন আছে, মনের যৌবন চায় নব আনন্দ, নব নব ভাবরাজি, আশা, উৎসাহ, সৌন্দর্য্যময় চিন্তা, কল্পনা, ভক্তি, বিরাটত্বের স্বরূপ উপলব্ধি। এবারকার মত সোঁদালি ফুলের মেলা, তুঁত ফুলের ও বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ অন্যবার দেখা যায় নি, কারণ এবার ঝড়-বৃষ্টি বাদলা নেই বল্লেই হয়—খুকু এখানেই আছে, সে সর্ব্বদাই আসচে, গল্প করচে, গোপালনগরে বারোয়ারীর যাত্রা হবে, আমার বাল্যবন্ধু কালী অনেকদিন পরে গ্রামে এসেছিল, এই সব নানা কারণে গ্রীষ্মের ছুটিতে এমন আমোদ অনেক দিন হয় নি। খুকু এই সবে ন'দিদির ঘর খুলবার ছুতো করে এসে গল্প করে গেল উঠোনে দাঁড়িয়ে। এই সব বিরাট আকাশের তলে, বন-গাছের ছায়ায় যেসব সুখ দুঃখের ক্ষুদ্র প্রবাহ চলেচে—তার সংগে অল্প দিনের মধ্যেই আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েচি যেন, ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রথম আসি বারাকপুরে, এটি ১৯৩৯ সাল। এই এগারো বছর কি চমৎকার কাটল! কত বর্ষার শ্যামল-মেদুর আকাশ, কত হেমন্ত জ্যোৎস্না রাত্রি, কত শীতের অপূর্ব্ব সন্ধ্যা নানা অনুভূতিতে মধুর হয়ে উঠল। আমার জীবনের ১৯২৯-১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত এই যে সময়টা চমৎকার সময়।

ছুটি ফুরিয়ে এল। আর দশ-এগার দিন। কিন্তু এবার যেমন বৃষ্টি একদিনও হয়নি—ব্যাঙ-ডাকানি বর্ষা, সারারাত ধরে বৃষ্টি-ঝড় ; সে সব হয়নি বা নাইবার সময়ে ঘাটের পথে খাপরা কুচির ওপর দিয়ে জলের তোড় চলে যায়—কেঁচোর দল জলে বুকে হেঁটে যায় এ-ও এবার হয়নি। মাস ফুরিয়েচে। হাজ্‌রী পাগলার মাকে সেদিন পর্য্যন্ত আমবাগানে আম কুড়ুতে দেখেচি—আজকাল আর দেখিনে।

ক'দিন বারোয়ারির আসরে গোপালনগরের গণেশ অপেরা পার্টির গান হল। রোজ শুনতে যেতুম—একদিন তো বনগাঁ থেকে ন'টার ট্রেনে নেমে যাত্রা শুনে রাত দুটোতে ফিরি। শেষদিন যাত্রা হল হাজারি প্রামাণিকদের বাড়ি। সুধীরদা, জিতেন, আমি—তাস খেলা হল সন্ধ্যাবেলা। কারণ খুব মেঘ ছিল আকাশে, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হচ্ছিল বলে যাত্রা আরম্ভ হতে পারেনি।

ছুটি শেষ হয়ে এল প্রায়। বাঁশবনে পিপুল লতার বন দেখা দিয়েছে। ভেদ্‌লা ঘাসের কুচো সাদা ফুল মাঠে অজস্র ফুটতে শুরু করেচে। কোকিলের ডাক অনেক কমে এসেচে—তবে বৌ-কথা-কও ডাক্‌চে বেশী। এই যে লিখচি, জানালার উপরে বসে—হরি রায়ের বড় খেজুর গাছটা থেকে ডাঁসা খেজুরের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছে। আজ ও বেলা খুকুকে একটা কবিতা লিখে শোনালুম সকালে।

আজও সকালে বাঁওড়ের ধারের বট-অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় ছায়ায় বেলেডাঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়েচি। ছুতোর ঘাটার কাছে দেখি, রাখাল বাঁড়ুয্যের স্ত্রী স্নান করে আসচেন। বল্লুম, ও খুড়ীমা, আপনার ভাই চলে গিয়েচে ? উনি বল্লেন, সে তো সেদিনই গিয়েচে। আমিও যাব। এদেশে আবার মানুষ বাস করে ? বল্লুম, কেন, এদেশের ওপর হঠাৎ

অত চটে গেলেন যে! কোথায় যাবেন? বল্লেন, ভাইয়েদের কাছে চলে যাব। তারপর ওঁর ভাইদের গুণকাহিনী আমার কাছে সবিস্তারে বলতে লাগলেন। আমি তাঁর হাত এড়িয়ে খানিকটা এসে দেখি পথের ধারে পাতাল-কেঁড়ে হয়ে আছে। আদাড়ির নাতি মধুকে ডাকলুম, সেও বল্লে,—এগুলো পাতাল-কেঁড়ে। তারপর ভেদ্‌লা ঘাসের শয্যায় মাঠের মধ্যে গামছা পেতে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। বেশ লাগে! স্নান করে বড় আনন্দ পেলুম আজ—নদীর জল যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি যেন কাকের চোখের মত স্বচ্ছ! বাড়ি এসে শুনি এগুলো নাকি পাতালকেঁড়ে নয়।

সকালে ভাণ্ডারখোলা গেলুম, কাকার মেয়ে শৈলর সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে গেল গুটকে। রাস্তা বেজায় খারাপ—যাবার সময় রোদ ছিল খুব—পাল্লা ছাড়িয়ে বড় মাঠ—গাছপালা কম—কেবল একটা বড় বটগাছ আছে—হরিশপুরের মধ্যেও গাছ নেই—ভাণ্ডারখোলা গিয়ে পেঁছুলাম বেলা তখন দশটা। ওদের চণ্ডীমণ্ডপে আগে একবার গিয়েছিলুম, দেবব্রতের কথা ভাবতুম তখন। শৈলর সঙ্গে দেখা হল—অনেক দুঃখ করলে সে। ভাইয়েরা দেখে না, নিয়ে যায় না। আসবার সময় বাড়ির বাইরে তেঁতুল-তলার পথে দাঁড়িয়ে রইল—প্রণাম করে বল্লে, আপনি এসেচেন বড় শান্তি হয়েচে আমার। আমি যদি মরেও যাই—আমার মেয়ে দুটোকে দেখবেন আপনারা। বড় কষ্ট হল মেয়েটাকে দেখে—ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, খুব অবস্থাপন্ন ঘরে। কিন্তু ওর কপালক্রমে অল্প বয়সে বিধবা হল—এখন ভাসুর-দেওরেরা ওকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে আসবার সময় হরিশপুর ছাড়িয়েই কালো কাজল মেঘ বারাকপুরের দিকে জুড়ে যাচ্ছে—মাদেলার বিলের ওপর দিয়ে। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একটা বট-গাছতলায় আশ্রয় নিলুম—ততক্ষণে বসে 'War and Peace' পড়লুম গাছতলায়। ঝম্‌ ঝম্‌ বৃষ্টি নামল।

রাস্তায় হয়ে গেল ভয়ানক কাদা। পথ হাঁটা যায় না—কেবল পা পিছলে যাচ্ছে।

কাউকে পাড়ায় বলে যাইনি। এসে রোয়াকে বসেচি—খুকু ন'দিদিদের ঘরে কলের গান বাজিয়ে পাড়ার মেয়েদের শোনাচ্ছিল—নন্দর মার মুখে শুনলে আমি এসেচি। বার হয়ে এসে চুপি চুপি বললে—কোথায় গিয়েছিলেন?

—ভাণ্ডারখোলা।

ও গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর খুড়ীমা ঘাটে গেলে, ও এসে অনেকক্ষণ রইল। বল্লে,—মাকে পঞ্চাশবার জিগ্যেস করেচি,—মা, বিভূতিদা গেল কোথায়? একবার ভাবলুম বনগাঁ! কিন্তু বলে যেতেন তাহলে।

এই দিনই খুকু রাত্রে প্রস্তাব করলে কোথাও বেড়ানো যায় কি না। বল্লে, নৌকোয় করে বনগাঁ ওরা যাবে ৫ই আষাঢ়। তারপর সব ঠিক করা হবে। খুব উৎসাহ মনে।

একদিন সকালে পা মচ্‌কে গিয়ে ব্যথায় সারাদিন কষ্ট। কোথাও নড়তে-চড়তে পারিনি। রাত্রে গোপাল এসে ভাত দিয়ে গেল আমার বাড়ি।

এদিন নৌকো করে খুড়ীমা, আমি এবং খুকু বনগাঁ এলুম সন্ধ্যার সময়। বনসিমতলার ঘাট থেকে বিকেলে আমরা বিদায় নিলাম। ও রেকর্ডের বাক্স বইচে,

বল্লাম—রেকর্ডগুলো দে।

ও বল্লে—আচ্ছা, খোঁড়া পীর! থাক—আমিই বইচি!

গল্প করতে করতে আর কলের গান বাজাতে বাজাতে নদীর ওপর দিয়ে আসা গেল। এক একটা নৌকো আসে, আর বলি, খুকু, ভদ্রলোকের নৌকো আসচে—একটা ভালো গান দে।

ও অমনি (এই পর্য্যন্ত লিখে রেখেছিলুম, তারপর তিনমাস বড় ঝঞ্ঝাটে কাটল বলে লিখতে পারিনি, আজ আবার লিখচি পুজোর ছুটির মধ্যে, আজ ১৪ই অক্টোবর) একখানা ভালো রেকর্ড দেয়। এমনি করে বনগাঁ এসে পৌঁছানো গেল। সেই রাত্রে লণ্ঠন ধরে আমি ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকি—আর কুলিতে জিনিস বয়ে নিয়ে যায় খুকুদের বাসায়।

তার পরদিনের পরের দিন আমরা এলুম কলকাতায়—সেখানে থেকে আসাম মেলে রওনা। পদ্মার পুল দেখে খুকু খুব খুশি। পার্ব্বতীপুর স্টেশনে আমরা প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে খেলুম। রাত্রিতে খুকু কেবল আমায় জাগায় আর বলে দেখুন দেখুন—কত বড় নদী চলে গেল।

সকালে নেমে গৌহাটি। তখনই মোটর বাসে বশিষ্ঠ আশ্রম। ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে থেকে দুপুরে পাহাড়ে উঠি। সেইদিনই আমরা রওনা হই। বিকেলে পাণ্ডু-ঘাটে একটা খাবারের দোকানে খাওয়ার সময় খুকু বল্লে—দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওরা বিল দেবে তো! কথাটা আমার বড় ভালো লাগল। এরা আবার খাবার দোকানে বিল দেয় নাকি!

সকালে পার্ব্বতীপুরে আবার চা খেলুম সকালে। সেইদিনই বৈকালের ট্রেনে বনগাঁ।

খুকুর বিয়ে হল এই দিনে। আমি বিকেলের গাড়িতে বনগাঁ গেলুম। আমার হাতে ছিল একখানা 'লিপিকা', আমার কাগজ নতুন বার হয়েছে। সেখানা ওর হাতে নিয়ে গিয়ে দিলুম। ও এল বাইরের ঘরে। বল্লে—এত দেরিতে এলেন যে বড়! বিবাহ চুকে গেলে রাত তিনটের মেলে কলকাতা এলুম।

এদিন পাবনা গেলুম সভাপতিত্ব করতে। আর বছর এই দিনে নাগপঞ্চমীর দিন বাড়ি গিয়েছিলুম—খুকুর বাড়ি খেয়েছিলুম সেকথা মনে পড়ল। সৎসঙ্গ আশ্রমে গিয়ে নতুন মেজ বৌদিদির সঙ্গে আলাপ হয়। মেজ বৌদিদির দুই বোন গান করলে বেশ।

খুকুর পত্র পেলুম মানকুণ্ড থেকে। ও লিখেচে যেতে। বিকেলের গাড়িতে মানকুণ্ডু গেলুম। আমি, দেবু ও খুকু বেড়াতে গেলুম খাঁ-দের বাগানে। খুকু যত্ন করলে। অনেক কথা বল্লে। তার পরদিন চলে এলাম।

পুজোর ছুটি প্রায় শেষ হয়ে এল। বনগাঁতেই ছিলুম সারা ছুটি। খুকুও আছে বনগাঁয়ে। ওদের বাড়ি প্রায়ই দুবেলা বেড়াতে যাই। একদিন যাইনি, সেদিন সপ্তমী পুজোর দিন, হাজারীর বাড়ি গোপালনগর গেলুম বেড়াতে। অল্পদিন হল বর্ষা থেমেচে, শ্যামলী লতায় ফুল ধরেচে, আরও নানা বনফুলের সুগন্ধ সকালের বাতাসে। আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। হাজারী ওখানে খেতে বল্লে। সুধীরদা, জিতেন, আমি, বিজন—সবাই মিলে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। গত গ্রীষ্মের ছুটিতে

একদিন রাত্রে বারাকপুরের বাড়িতে যে লোকটি আমায় কবিতা শুনিয়েছিল, সেই কুণ্ডু মশায় আমাকে নিভৃতে ডেকে তার নতুন লেখা কবিতা শোনালে। গৌর কলুর দোকানে বসে অল্পক্ষণ গল্প করি। এসব জায়গায় আসিনি আজ চার মাস—সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের ছুটির পর আর আসিনি। এসব জায়গায় যেন বারাকপুরের জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমের ছুটির আবহাওয়া মাখানো, খুকু মাখানো, বকুলতলা মাখানো—আমার হাট করে নিয়ে যাওয়া, "ও খুকু হাট নিয়ে যা, খুড়ীমা কোথায়?" সেই সব দিনের শত স্মৃতি জড়ানো গৌর কলুর দোকানের সঙ্গে। ফিরবার পথে গাজিতলায় ভাঙনের ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলুম। ওই দূরে বনসিমতলার ঘাট, কে একটি ছোট মেয়ে যেন এখনও স্নান করে ভিজে চুলে ভিজে কাপড়ে বনসিমতলায় ঝোপের পাশ দিয়ে যেতে যেতে একবার চকিত নয়নে পিছন দিকে চাইলে। বনগাঁয়ে ফিরে সার্ব্বজনীন পূজার আরতি দেখতে গিয়েচি প্রফুল্লদের বাড়ি। আজ দুবেলাই খুকুদের বাড়ি যাইনি। একটু পরে ভিড়ের মধ্যে খুকু এসে দাঁড়াল, চারিদিকে চেয়ে দেখলে—তার-পর চৌকির ওপর উঠে দেখতে লাগল আর মাঝে মাঝে এদিকে চাইচে। বেজায় রাগ করেচে আজ সারাদিন যাইনি বলে। পরদিন সকালে ভয়ানক অনুযোগ ও অভিমানের পালা।

তারপর একদিন নকফুল হরিপদ চক্রবর্ত্তীর বাড়ি নৌকো করে নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম—আমি, মন্মথদা, বিভূতি। আমাদের ঘাটে নেমে গুটকেকে ডাকতে গেলুম, আমি বিভূতি ও মন্মথদা। গুটকে ইন্দুর ছেলে, গরীব বাপ, ভাবলুম নিয়ে যাই, ভালো-মন্দটা খেতে পাবে এখন। গিয়ে শুনি তার জ্বর।

সন্ধ্যার সময় নকফুল থেকে যখন ফিরচি, তখন দেখি দেবু একখানা নৌকো থেকে বলচে—ও বিভূতিদা!...দুজনেই বেড়াতে বার হয়েচে মহাষ্টমীর দিনটা!

বনগাঁতেই ছিলুম। খয়রামারির মাঠে বেড়াতে যেতুম। একদিন গিয়েছিলুম চাল্‌কী। নরেনদা এসে নিমন্ত্রণ করেছিল। অজস্র বন-তারার ফুল ফুটেচে বনে ঝোপে, ছাতিম ফুল ফুটেচে—বৃষ্টি থেমে যাওয়ার দরুন পথঘাট খট্ খট্ করচে শুকনো, বেশ লাগল। চাল্‌কীতে খেয়ে দেয়ে গেলুম বারাকপুর। আমার রোয়াকে চেয়ার পেতে বসলুম সেই জ্যৈষ্ঠ মাসের পরে। মনে হল এক্ষুনি খুকু যেন আঁচল উড়িয়ে আসচে পাশের বাড়ির শিউলিতলা থেকে। আর তার সঙ্গে ওভাবে জীবনে কখনই হয়তো দেখা হবে না। আর কোনদিন সে আঁচল উড়িয়ে পাশের উঠোনের পথটি বেয়ে আসবে না আগের মত। মনে পড়ল ওদের উঠোনের ওই বড় শিউলি গাছটার ফুল ফুটত এই পুজোর সময়—আমি বসে বসে এইখানে 'আইভ্যানহো'র অনুবাদ করতুম, আমার কাছে রোজ সন্ধে-বেলা আসাই চাই ওর--ভোরের গাড়িতে নানা ছুতো করে আমার বনগাঁ থেকে আসা—সেসব দিনের কথা কোনদিন ভোলা যাবে না। তারপর ঘাটের ধারে গুটকের সঙ্গে মাছ ধরা দেখতে গেলুম। সতুকাকা, ইন্দু, শ্যামাচরণদা মাছ ধরচে। ইন্দু গল্প করতে করতে পাকা রাস্তায় এল। বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বাড়িতে শুয়ে থেকে মন্মথদার বাড়ি এসে চা খেলুম।

তারপর ক্রমে ক্রমে ওখানে খুব আড্ডা হত। সন্ধ্যাবেলা খুকুদের বাড়ি যেতুম—ও গ্রামোফোন বাজালে একদিন। আমার জন্যে জরদার কৌটো এনে বল্লে—পারতি খাবেন? পারতি?

তারপর গত শনিবারে বনগাঁ থেকে চলে এলুম কলকাতা এবং সেইরাত্রেই ঘাটশীলা রওনা হই। ঘাটশীলার বাড়িটা বেশ হয়েচে। কমল খুব যত্ন করলে। যেদিন সকালে গেলুম ঘাটশীলা—সেদিনই দুপুরের গাড়িতে গালুডি গেলুম নীরদবাবুদের বাড়ি। শ্যামবাবুর সঙ্গে গেলুম আর বছর যে ঘরে জ্বর হয়ে পড়ে থাকতুম, সেই

ঘরটা। চিত্তবাবুর বাড়িতে পার্টি হল খুব। মেয়েরা যথেষ্ট যত্ন করে খাওয়ালেন, অটোগ্রাফ খাতায় সই করিয়ে নিলেন।

সন্ধ্যার ছায়ায় কালাঝোর ও সিদ্ধেশ্বর ডুংরি গম্ভীর দেখাচ্ছে। পশুপতিবাবু ও কমল বেড়াতে এল আমার বাসায়। আমি রোজ সুবর্ণরেখার তীরের চারা শাল ও কেঁদবনের মধ্যে রাঙামাটির ওপর দুপুর রোদে চুপ করে বসে থাকতুম। এই বেড়ানোর আনন্দটা যেখানে নেই সেখানে আমার ভালো লাগে না। গালুডি আগে এমনি ছিল, আজকাল সেখানে না আছে বন, না আছে নির্জ্জনতা।

পশুপতিবাবু, নুটু ও আমি কমলদের বাড়ির সামনে শালবনটাতে বসে অনেক গল্প করি। পেছনের শালবনেও গিয়েছিলুম—আমি একটা গাছে উঠে বসলুম—কমল হাসতে লাগল। বৈকালে সুবর্ণরেখার তীরে একটা বড় শিলার ওপর সবাই মিলে গিয়ে বসলুম। দুটি মেয়ে বেড়াতে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে—একটি কোথাকার স্কুলের মাস্টারনী, বেশ গান গাইলে।

পরদিন আবার গেলুম গালুডি। মহুলিয়ার হাট, সোমবার সেদিন। মহুলিয়ার হাট দেখতে গেলুম। নানা গ্রাম থেকে সাঁওতাল মেয়েরা সব জড় হয়েচে, মাথার চুলে ফুল গুঁজেচে, দিব্যি নিটোল কালো চেহারা, বেশ লাগে দেখতে। আমি মুক্ত শিলায় বসে বসে ভাবছিলুম অনেক দূরের একটি মেয়ের কথা। যখন শ্যামবাবুর বাড়িতে সেই কোণের ঘরটাতে বসে চা খাই, তখনও মনে হয়েচে অনেকদিন পরে কার্ত্তিক মাসে চূড়ামণি যোগের দিন ওদের বাড়ি গেলুম। যেখানে বন্যায় ছিল এক বুক জল—সেখানে এখন শুকনো খটখটে। ও চা দিতে গিয়ে বলেছিল—এই কাপ না এই ভাঁড়?

অনেক রাত্রের গাড়িতে নেমে ঘাটশীলা বাংলোতে একা আসচি। তারাভরা অন্ধকার আকাশ—শালবনের মাথায় বৃহস্পতি জ্বলচে। অনেক দূরে এক নদীর ধারের দোতলা বাড়ি ছিল একটা, বহুদিন আগের কথা। হয়তো এখন সেখানে কেউ থাকে না।...গৌরী। অনেকদিন পরে ওর কথা মনে হল।

ভাবলুম কাল আবার এই কাঁকর মাটি ছেড়ে বাড়ি যাব। বনময় যে ফুলের সুগন্ধ ও শ্যামলীলতার ফুলের গন্ধ পাব! কলকাতা এলুম—আমার সঙ্গে চন্দননগরের সেই মেয়ে দুটি। কাল যাব বনগাঁ। ভাবচি হাজারীর বাড়ি যাব। কালীপুজোর দিনটা বেশ কাটল পুজোর ছুটিটা। ওবেলা মাধব বলেচে রেকর্ড দেবে খুকুর জন্যে। ওর জন্যে কিছু টিপও নিতে হবে।

আবার এই ক'দিনের জন্যে দেশে গিয়েছিলুম। খুকু ওখানেই আছে। রোজই যেতুম ওর ওখানে। আসবার দিন অনেক কথা বল্লে। আজ মন্মথদের বাড়িতে কার্ত্তিক পুজোর নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম প্রতি বৎসরের মত। সেখানে অরুণ বল্লে, এলাহাবাদে উষার সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল—আমার নাম করেচে উষা। বনগাঁয়ে ভূপেনের সঙ্গে একদিন বিভূতি ও আমি রাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলুম।

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল—গত ডায়েরী লেখবার পরে। বনগাঁর বাসা উঠিয়ে দিয়েচি—এখন ঘাটশীলাতেই আমার বাড়ি। সেখানে নুটু, বোমা, খোকা, খুকী সকলেই রয়েচে। ষোড়শীবাবু বলে বনগাঁয়ে একজন আবগারী বিভাগের ইন্‌সপেক্টর এসেচেন—অতি ভদ্রলোক। ওঁর পরিবারের সঙ্গে আমার যথেষ্ট হৃদ্যতা হয়ে গিয়েচে। কালু বলে সে বাড়ির একটি ছেলে ঘাটশীলা যাবার সময় আমায় যথেষ্ট সাহায্য করেচে।

সুপ্রভা এসেছিল। তার পত্র পেয়ে গত সপ্তাহে দেওঘর যাই। কি যত্নই করলে ও! জামার হাতটা ছিঁড়ে গিয়েছিল—কাছে বসে বসে সেলাই করলে, ওর এ রকম সেবাযত্ন পাওয়ার সুযোগ কখনো ঘটেনি জীবনে।

তারপর ওর কথা বড় মনে হচ্ছে। ক'দিন মনে হচ্ছে। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওর কথা ভেবেচি। খুকুর সঙ্গে দেখা হয়নি সেই পুজোর ছুটির পর থেকে—বোধ হয় আর দেখা হবেও না, কারণ বনগাঁর সঙ্গে আমার কোন যোগই তো আর রইল না!

এক মাসে আরও কি পরিবর্ত্তন। সুপ্রভাকে কি দুঃখই দিলুম! আজও সে একখানা চিঠি পেয়েচে আমার। তার কথা সর্ব্বদাই মনে হচ্চে। শিলং একবার যেতে হবে শীগগির। গত সরস্বতী পুজোর দিন ঘাটশীলা গিয়ে তিনু, শান্ত, অমরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ে উঠলুম সুবর্ণরেখা পার হয়ে।

ভোরে ডাকলে এসে হরবাবু। তারপর মোটরে আমরা অর্থাৎ বুদ্ধদেব, আমি, রমাপ্রসন্ন, তিনু বা বাসু গেলুম বনগাঁ। অজিতবাবুর বাড়ি চা খাবার সময়ে S. D. O. ও মুন্সেফ এবং মনোজ বসু সেখানে। তারপর ঘেঁটুফুল ফোটার পথের মধ্যে দিয়ে আমরা বনগাঁ গেলুম। একবার মনে হল যেন আমার বাসা আছে এখানে—জাহ্নবী রান্না করচে, স্নান করে গিয়েই খাব।

বারাকপুর এলুম। পঞ্চবটীতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই ফণিকাকা, খাঁদু, হরিপদদা এল। এদের দেখে কষ্ট হয়। কি সংকীর্ণ ক্ষেত্রেই পড়ে রয়েচে। পূর্ণতর জীবন অনুভব করলে না। ফণিকাকা বল্লে—আজ গোপালনগরে বড় মারামারি হবে ভোট নিয়ে—দেখতে যাবে না? As if I care for votes! আমার বাড়ি গিয়ে ওরা বসল —তারপর নদীর ধারে যেতে ওরা সব মায়ের কড়াখানা দেখলে। সত্য কি শুভক্ষণে কড়াখানা কেনা হয়েছিল! আজ কত বছর হয়ে গেল। কত লোক দেখে গেল ওখানা।

বনসিমতলায় ওরা বসল, আমি ও রমাপ্রসন্ন বনের মধ্যে তুঁততলায় বসলুম। সুপ্রভার পত্রখানা পড়লুম—ইস্টারে শিলং যেতে লিখেচে। সত্যি, কি ভালো মেয়ে ও!

ভূষণ মাঝি ঘাটে নাইচে। স্নানের সময় সাঁতার দিয়ে ওপারে গেলুম। তারপর এলুম বাড়ি, খুকুদের বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার দাঁড়াই। কতবার এমনি ঘেঁটুফুল-ফোটা চৈত্রদিনে বনগাঁ থেকে দুপুর রোদে বারাকপুরে হেঁটে এসে ওকে ডেকেচি ওদের রান্নাঘরে গিয়ে—আজ কোথায় কে? সব শূন্য।

ইন্দু এসে গল্প করলে, আমাদের সঙ্গে নদীর ধার পর্য্যন্ত গেল। তারপর আমরা মোটরে গোপালনগরে এসে দুর্গা ময়রার দোকানে লুচি ভাজিয়ে খেলুম। আজ হাটবার, তবে ভোটের জন্যে অমৃত কাকা, চালকীর বিভূতি সবাই যাচ্ছে। হরিহর সিং তার দোকানে ডাকলে। মনে পড়ল গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ভাণ্ডারকোলা থেকে ফিরবার দিনে এর দোকানে বসেছিলাম। আর বসলুম এই।

তখনি বনগাঁ—সেখান থেকে বেনাপোল হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ি। এই ছ'ঘরের পথেও এই চৈত্র মাসে এই তিনটের সময় কত গিয়েচি। পাটবাড়িতে কতক্ষণ বসে আবার বনগাঁ।

মন্মথবাবুর বাড়ি সেই বিকেলে সেই রকম বসে সুপ্রভার গল্প করি। সুপ্রভার প্রশংসা শতমুখে করেও আমি যেন ফুরোতে পারিনে।

পথে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে দেখা রাণাঘাট গেটের কাছে—আমি ডাকলুম, তিনি চাইলেন, কথা হল না। মুন্সেফ সস্ত্রীক মোটরে ফিরে যাচ্চে—চেয়ে হাসলে।

সুপ্রভার পত্রখানা কাল রাত্রে লিখেছিলুম—বনগাঁ থেকে টিকিট কিনে সকালে পোস্ট করেচি ওবেলা।

কাল ইউনিভার্সিটি থেকে কাগজ আনব। সেদিন ইউনিভার্সিটির মিটিংএ অজয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ হল। প্রমথ, বিজয়, পরিমল, গোপাল হালদার আমরা সব একসঙ্গে বেরিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দিতে দিতে চা খাই। সেই দিনই রাত ন'টায় কমলরাণীর নিমন্ত্রণে ওদের সঙ্গে 'বিশ বছর আগে' দেখে এলুম রঙ্‌মহলে। মন্মথ রায়ও একদিন 'কুম্‌কুম্‌' দেখবার নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েচে এই দেড় মাসের মধ্যে। সুপ্রভার সঙ্গে দেখা করতে ঈস্টারে শিলং গেলুম। সেখানে জর্জ্জিনা ও সেবা প্রথমে বল্লে, সুপ্রভা ছুটিতে মিরালী চলে গিয়েচে। তারপর হাসতে হাসতে সুপ্রভা এল। ক'দিন খুব বেড়ানো গেল। ওখান থেকে চলে আসার কিছুদিন পরে ঘাটশীলা গেলুম—এবং সেখান থেকে এসে ঢাকা গেলুম রেডিওতে বক্তৃতা দিতে। রত্না দেবীর বাবার বাড়ি গিয়ে উঠলুম। বেশ কাটল সেখানে। ইতিমধ্যে সুপ্রভার বিবাহ হয়ে গেল গত ১৫ই বৈশাখ। আমি গত শনিবারের সাহিত্য-বাসর উপলক্ষে মুন্সেফবাবুর বাড়িতে গেলুম। মায়া ও কল্যাণী ছাড়লে না—ওদের বাড়িতে রইলুম। রাত্রে ওদের ছাদে গল্প। পরদিন আমাদের পুরোনো বাসায় গেলুম। সেই জানলার ধারে দাঁড়াই। পাঁচী এসেচে, দেখা হল।

আজ দেশ থেকে ফিরলুম। ঘাটশীলা যাব, গ্রীষ্মের ছুটি প্রায় শেষ হয়ে গেল। খুকু বনগাঁয়ে এসেছিল অনেকদিন পরে, ওর সঙ্গে দেখা হল দু'তিনদিনের জন্যে। কল্যাণী খুব সেবাযত্ন করেছিল। গ্রীষ্মের ছুটিটা এবার কি আনন্দেই কাটল! রোজ নদীজলে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! বিশেষ করে একদিন অনেক রাত্রে বনগাঁ খুকুদের বাড়ি থেকে ফিরে। আর একদিন কুঠীর মাঠের আঘাটার পাশে নেমে। সেই রকম আম কুড়ুচ্চে পাগলার মা, হাজারী—আজও দেখে এসেচি। এখনও খুব আম। এবার আদৌ বৃষ্টি হয়নি। আজ আষাঢ় মাস, দেশের পথে সর্ব্বত্র ধুলো, খানা-ডোবা সব শুকনো, ভীষণ গরম, এমন কখনো দেখিনি। সুপ্রভা লুকিয়ে পত্র লিখেছিল, বেলেডাঙ্গার আইনদ্দির বাড়ির পিছনে বসে তা পড়েছিলুম—আর চিঠি লিখেছিল জর্জ্জিনা। কাল ন'দি চলে গেল গোপালনগর স্টেশনে কলকাতার গাড়িতে, খুকুর সঙ্গে ওরা যাবে মানকুণ্ডু। কাল খুকুও চলে গেল বনগাঁ থেকে। পরশু সাব্‌ডেপুটি অজিত বসু, মুন্সেফ্ হরিবাবু, সবাই গিয়েছিলেন আমার বাড়িতে। আমাদের ভিটেতে গিয়ে মায়ের কড়াখানা দেখলে। তেঁতুল গাছের ওপর আমায় বসিয়ে ফটো নিলে। বাবার স্মৃতিস্তম্ভ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হল।

কাল সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নালোকে বেলেডাঙ্গা থেকে বেরিয়ে আসবার পর কুঠীর মাঠের আঘাটায় স্নান করে ফিরচি, আমাদের বাড়ির পেছনের বাঁশবনে কোথাও জ্যোৎস্না, কোথাও জোনাকির ঝাঁক জ্বলচে—থম্‌কে দাঁড়িয়ে রইলুম কতক্ষণ। এক অদৃষ্ট অনুভূতি! আবার যেন আমি বালক হয়ে গিয়েচি, এইমাত্র ভরতদের সঙ্গে সল্‌তে-খাগি আমতলাটার ময়না গাছের ধারে আম কুড়িয়ে ফিরচি—সারা গাঁ আমার শৈশবের

পরিবেশ অনুযায়ী বদলেচে—জ্যেঠাইমা, সইমা, হরিকাকা—সেই সময়ের মনোভাব—সংকীর্ণতা, দারিদ্র্য, অথচ কি মহার্ঘ আনন্দ...তা বর্ণনা করা যায় না—সে এক জগৎ—যেমন এবার আমি বিলবিলের ধারে বসে বসে কত মেয়েদের জলে ওঠা-নামা করতে দেখতুম, ওরা কাপড় কাচছে, বাসন মাজচে, পরস্পরের সঙ্গে গল্প করচে—ওদের এই এক জগৎ...the little pool in the woods—বেশ নামটি দিয়েচি ওই বিলবিলের ডোবাটার। ও নিয়ে একটা গল্প লিখব। এরা এই ক্ষুদ্র জগতে সবাই কিন্তু যথেষ্ট সন্তুষ্ট আছে—এর বেশী এরা চায়ও না, বোঝেও না কিছু। পাগলার মা আম কুড়িয়ে সন্তুষ্ট, নেলির মা থালা থালা আমসত্ত্ব দিয়ে সন্তুষ্ট, হরিপদদা গাঁয়ের মোড়লী করে সন্তুষ্ট। এর বেশী এরা কিছু চায় না।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গেল। কাল ঘাটশীলা থেকে ফিরচি। সঙ্গে ছিল হরিবোলার ছেলে মাদার। ও ফিরে গেল দেশে। ঘাটশীলায় বড় গরম পড়েছিল, দুদিন কেবল বৃষ্টি হয়েছিল। রোজ বিকেলে বেড়াতে যেতুম গালুডি রোডে সেই শাল বনটার মধ্যে, সেখান থেকে বনমাটির পথ যেখান দিয়ে পার হয়ে গেল সেই উঁচু জায়গায়। দূরের দিক্‌চক্রবালে নীল শৈলশ্রেণী মুক্ত ভূপৃষ্ঠের আভাস এনে মনকে বন্ধনশূন্য করে দিতে অপরাহ্ণের ছায়াভরা আকাশতলে, সেখানে বসে বসে সুপ্রভার চিঠি, খুকুর চিঠি পড়তুম। কোথায় রায়গড়, কোথায় মিরালী, সে এখন হয়তো এই বিকেলে বসে চুল বাঁধছে, এমনি সব কত ছবি মনে পড়ত। একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি এল, রাস্তার ধারের ছোট্ট সাঁকোর মধ্যে ঢুকে অতি কষ্টে বৃষ্টির ধারা থেকে নিজেকে রক্ষা করি।

পরশু বসে ছিলুম কত রাত পর্য্যন্ত ফুলডুংরি পাহাড়ের নীচে। একে একে দুটি একটি করে কত তারা উঠল অন্ধকার আকাশে—আমি যেন বিরহী তরুণ দেবতা, যুগান্তরের পর্ব্বতশিখরে বসে কত জন্মের প্রণয়িনীর কথা ভাবচি।

কোথায় এক ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরে বর্নাসমতলার ঘাট, সেখানে যে বালিকা ছিল, সে আর সেভাবে কখনো ও ঘাটে থাকবে না—কত বছর চলে যাবে, বালিকার দেহে নামবে জরা, কতকাল পরে বৃদ্ধা যখন একা একা ঘটি হাতে ঘাটের পাড় বেয়ে উঠবে, তখন সে কি ভাববে না তার অতীত কৈশোরের কথা—কত প্রণয়-লীলার স্থান—বর্নাসমতলার ঘাটটার কথা!

গৌরীর কথা মনে হল। অনেক দূরে আর এক গ্রাম্য নদী, তার ধারে একটা দোতলা বাড়ি—কতকাল আগে সেখানে যে মেয়েটি ছিল, তার দেহের নশ্বর রেণু হয়তো ওই নদীতীরের মৃত্তিকাতেই মিশিয়ে আছে এই কুড়ি বছর। সে জীবনে কিছুই পায়নি—সে বঞ্চিতার কথা আজ এই সন্ধ্যায় বিশেষ করে মনে এল।

আর এক বঞ্চিতা হতভাগী মিনতি। ওকে কখনো চোখে দেখিনি, কিন্তু ওর নাম শুনেচি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ওর দুঃখ দূর হোক।

কিন্তু সুপ্রভার দুঃখ কে দূর করবে? তার মন তো সাধারণ মেয়ের মন নয়—সে যে চিরজীবন কাঁদবে, তার কি উপায় করব? ওর জন্যে মন যে কি ব্যাকুল হয়েচে আজ ক'দিনই। নির্জ্জনে বসলেই ওর কথা সারা মন জুড়ে থাকে। ওর সঙ্গে দেখা করাই চাই, মন বড় ব্যাকুল হয়েচে দেখবার জনে।

কাল বনগাঁ থেকে এলাম। অজিতবাবুর বদলি উপলক্ষে সাহিত্যসভা ছিল। অজিতবাবু লিখেছিলেন, যাবার সময়ে আসবেন। ক'দিন বেশ কাটল। এবার ওদের পাড়াসুদ্ধ সকলে ডেকে ডেকে আনন্দ করলে, গল্প করলে। সুনীতিদিদি, শঙ্কুর মা

সবাই। বাস্তবিক মেয়েরা কি ভালো তাই ভাবি! ওদের মধ্যে খারাপও আছে জানি, নিজেই তার অনেক পরিচয় অনেক জায়গায় পাইনি কি আর? কিন্তু ভালো যখন হয় ওরা তখন তার তুলনা পুরুষদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌরী, সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, অন্নপূর্ণা—এদের প্রত্যেককে আমি জেনেচি—এরা দেবীর মত।

কি যত্ন-আদর করত সুপ্রভা! তার কথা আজকাল সর্ব্বদা মনে আসে। ভোলা কি যায়? না তা সম্ভব? এই তো জীবন!

কল্যাণী ছোট মেয়ে অবিশ্যি। কিন্তু সে এরই মধ্যে মেয়েদের স্বাভাবিক সেবা-প্রবৃত্তি আয়ত্ত করে নিয়েছে। ক'দিন বড় যত্ন করলে। বাইরের ঘরটাতে টেবিল-ঢাকা পেতে পরিপাটি করে পান সেজে, বিছানা করে কেমন করে রাখত! কাছে বসে গল্প শুনতে চাইত। একদিন হঠাৎ 'চম্পক জাগো জাগো' গানটার এক কলি গাইতেই আমার শিলং-এর কথা মনে পড়ল। সেই ঈস্টারের ছুটি, শিলং, কলেজের হোস্টেলে আমায় নিমন্ত্রণ করেচে—সুপ্রভার অসুখ, তবুও সে উঠে এল, আমি আমার রেডিওর নাটকটা পড়ব—জর্জ্জিনা ঘন ঘন ঘরে ঢুকচে, বার হচ্চে—এমন সময় ওরা গ্রামোফোনে রেকর্ড চাপালে, আমার মনের মধ্যে সত্যি কি যেন হয়ে গিয়েছিল গানের প্রথম কলিটা শুনেই—'চম্পক জাগো জাগো'। কল্যাণীকে বল্লুম—গানটা শোনাও না। গানটা সে গাইল। আমি বসে বহুদূরের কোন্ পাইনবনের স্বপ্ন দেখতে লাগলুম। সুপ্রভা—পাইনবন, লুম্ শিলং-এর মেঘাবৃত শিখরদেশ।

কল্যাণী ছেলেমানুষ কিনা, বলচে—আপনি চলে গেলে আমি বিছানা বাইরের ঘর থেকে উঠিয়ে ফেলব। মন কেমন করে, আপনার জায়গায় সেবার ছোট মামাকেও শুতে দিইনি—বলি, ছোট মামা ওঠ, অন্য জায়গায় গিয়ে শোও—এসব আমি তুলব। এই সময় গৌরীকে এনেছিলুম বারাকপুরে ১৯১৮ সালে। কতকাল আগে। সেই বাঁশ-বাগানে নিভৃত সন্ধ্যা নামত, বর্ষার দিনে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ত, বেশ মনে আছে। 'বানের জলে দেশ ভেসেছে, রাখাল ছেলে তুই কোথা' গানটা করতুম ইছামতী থেকে স্নান করে উঠে সকালে।

সময়ের দীর্ঘ বীথিপথ বেয়ে কত এল কত গেল! গৌরী...১৯১৮ সালের আষাঢ় মাসের শেষে তাকে নিয়ে এলুম বারাকপুর। রজনী মামার সঙ্গে বসে তাসখেলা হরিপদ দাসের চণ্ডীমণ্ডপে। "বানের জলে দেশ ভেসেচে রাখাল ছেলে, তুই কোথা, রাঘব বোয়াল মাছের সাথে সুখ-দুঃখের কই কথা"—এই গানটা ছিল দিন-রাত আমার মুখে। আমাদের পাড়ার ঘাট থেকে সকাল বেলা বর্ষা-স্নাত ঝোপঝাপের পাশ দিয়ে আসতে (যে ঝোপ থেকে এ বছর সুপ্রভার চিঠির জন্যে কত বনমল্লিকা তুলেছি এবং যে ঘাটটার নাম অনেক দিন পরে হয়েছিল বনসিমতলার ঘাট) ওই গানটা গাইতুম।

তারপর সে সব দিন চলে গেল। অনেক মাস কেটে গেল। তারপর আবার বহু লোকের ভিড় গেল লেগে।

কত লোক এল। তাদের কথা মনে হয় আজ। এসেচে, কিন্তু ওদের মধ্যে চলে যায় নি কেউ—আছে সবাই। অন্নপূর্ণা আছে, সুপ্রভা আছে, খুকু আছে। অদ্ভুত-ভাবে এরা সব এসেছিল। যায়নি কেউই। মন থেকে নয়, বার থেকেও নয়।

১৯৪০ সালে তাই আজ ১৯১৮ সালের কথা ভাবচি। আজ সুপ্রভার পত্র পেলাম। কত ভালো মেয়ে সে, আজও মনে রেখেচে। আর বছরে এ সময়ে মনে বড় কষ্ট ছিল।

জীবনের মাঝে মাঝে এমন কতকগুলি হর্ষোজ্জ্বল, হাসি-অশ্রু-ছলছল দিন

আসে, যাদের কথা চিরকাল মনে তো থাকেই, এমন কি একটু নিৰ্জ্জনে একমনে ভাবলে সেদিনের অনুভূতিগুলো পর্য্যন্ত এখনি আবার মনে আসে—অতি সুস্পষ্ট-ভাবে মনে আসে, যেমন সেদিনের বিস্মৃত গন্ধরাজি আবার আঘ্রাণ করি, আবার সে সব দিনের জীবনের কুশীলবদের চোখের সামনে দেখতে পাই।

এই রকম দিন আমার জীবনে যেগুলি এসেচে—তা চিন্তা করে দেখলুম কাল বসে। গোলমালে ওদের কথা মনে না থাকলেও দু'দশ বছর অন্তর মনে আসে হঠাৎ। সে সব দিনের আর একটা মজা আছে, তারা মস্ত বড় আশার বাণী, অজানার আনন্দ নিয়ে আসে—একটা কিছু যেন ঘটবে, দিনগুলি বৃথায় যাবে না—একটা এমন কিছু ঘটবে, যা জীবনে কখনো ঘটে নি—মনে হয়।

তারপর দেখা যায় কিছুই ঘটল না—দিনগুলো চলে গেল, কিন্তু আনন্দ রেখে গেল, স্মৃতি রেখে গেল।

যেমন প্রথম যাত্রার দল আমাদের গাঁয়ে এসেছিল আমার বাল্যকালে, নলে নাপিতের বাড়ি সন্ধ্যাবেলায় আমায় বলেছিল 'তুমি যাবে খোকা?' সেই সন্ধ্যা, সেই সুশ্রী যাত্রাদলের নটের দল—সে কথা জীবনে আর কখনো ভুললাম না। ভুললাম না মানে ভুলেই তো থাকি, কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থায় একমনে বসে ভাবলেই আবার মনে হয়।...

সুরেনের যখন পৈতে হয়, দুধুমামা থাকত, আমি দণ্ডী ঘরে গিয়ে সন্ধ্যাসেবা করাতুম—সেই একদিন যুগলকাকাদের বাড়িতে বাল্যে এমন ক'দিন কেটেচে বেশ মনে হয়—সুবাসিনীর সামনে যখন আমি অকারণে ছুটোছুটি করে বেড়াতুম বাল্যে, বকুল-তলায় খেলা করতুম, নাগপঞ্চমীর দিন ভরত ও আমি মনসাতলায় গিয়েছিলুম।

তারপর বহুকাল কেটে গেল। আর তেমন কোন দিনের কথা আমার মনে হয় না। এল গৌরী, ওকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে প্রথম যখন বারাকপুরে আনলুম, আষাঢ় ও প্রথম শ্রাবণের সেই দিনগুলির কথা...রজনীকাকার সঙ্গে তাস খেলতে খেলতে সেই অধীর ভাবে সন্ধ্যার প্রতীক্ষা, টিপ টিপ বৃষ্টি পড়চে বাঁশবনে, মাটির প্রদীপের আলোয় আমি ও গৌরী, তখন সে মাত্র চৌদ্দ বছরের বালিকা—এই ছবিটি, দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি, চিরদিন—চিরদিন মনে থাকবে।

সে গেল চলে। দিনগুলি নিরানন্দময় হয়ে গেল, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। প্রহরগুলি মৃত।

আনন্দ পেলাম চাটগাঁয় মণিদের বাড়ি গিয়ে। মণির সঙ্গে বসে গল্প করতুম, চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম, ওই দিনগুলি।

ওখান থেকে গিয়ে এসে বিভূতিদের বাড়ি এলাম। ও দিনগুলোর মধ্যে আমার মনে আছে, আমার জ্বর হল, কামাই করলাম দিনকতক, গেলাম না—বিভূতিকে ফোন করলাম, ঐ একদিন।

ভাগলপুরে এমন অনেকদিন গিয়েচে ইসমাইলপুর দ্বিরায়। পুরোনো কথা ভাবতাম শ্রাবণ মাসে রাসের সময় বড় বাসায় বসে, রঘুনাথবাবুর ঠাকুরবাড়িতে হেমেন রায় এসে নিয়ে গেল, আমি Keith-এর প্রাচীন দিনের মানুষ সম্বন্ধে বইখানা পড়তুম —কিংবা আমি Astronomy পড়তুম ভাদ্র মাসে বাইরের ঘরে শুয়ে, বীরভূমের সেই পণ্ডিতটা এসে গল্প করত—সেই সব দিন ভারি চমৎকার কেটেচে।

একখানা বই হয় এ সব দিনের আনন্দের কথা লিখলে—নতুন টেক্‌নিকে, নতুন ভাবে লিখতে হয়—একখানা ভালো উপন্যাস হয়।

তারপর এল খুকু। তার সাহচর্য্যে যে দিন কেটেচে—তার মধ্যে যখন আমি

'আইভ্যানহো' অনুবাদ করছিলুম, শিউলি গাছে ফুল ফুটত—সেই দিনগুলি আর বনগাঁয়ে ছাদে বেড়ানোর দিনটি, আর গত বছর গ্রীষ্মের ছুটিতে বারাকপুরে গ্রামোফোন দিয়ে কাটানোর দিনগুলির কথা ভুললে চলবে না। চিরকাল মনে থাকবে এগুলিও।

সুপ্রভার সঙ্গেও এমন অনেকদিন আনন্দে কেটেছে। বিশেষ করে এবার দেওঘরে ও ঈস্টারের ছুটিতে শিলংএ বেড়াতে যাওয়ার দিনগুলি। অনেক দিনের কথা হয়তো ভুলে যাব—কিন্তু শিলংএ যাপিত গত ঈস্টারের ছুটির দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে।

আর সর্ব্বশেষে এবার যে অজিতবাবু বনগাঁ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন—কল্যাণীদের বাড়ি রইলাম আমি—কল্যাণীর সেবাযত্ন আমার বড় ভালো লেগেছে, সুপ্রভা ছাড়া অন্য কোন মেয়ের মধ্যে এ ধরণের সেবা করার প্রবৃত্তি দেখিনি আমি। কল্যাণী যখন শচীনবাবুদের বাড়ির সামনে পুকুরঘাটে বসে রইল—সে কথাই আমার মনে পড়ে এখনও।

এই তো সবে সেদিন। আর এক সপ্তাহ পুরল। এই দিনটি আবার কতকাল আগেরকার বলে মনে হবে একদিন। একদিনের ডায়েরিটা পড়ে অবাক হয়ে ভাবব সেইদিনের সুপ্রভা, সেদিনের কল্যাণী, সেদিনের খুকু—কতকালের হয়ে গেছে!

বাসা বদলে বহু বছর পরে আবার ৪১, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের এদিকটাতে এলুম। অনেকদিন আগে এদিকটাতেই ছিলাম—আবার সেদিকেই এলুম। মন কেমন বড় খারাপ হয়ে গেল বিকেলে, অনেক পুরোনো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে কত পুরোনো কথা সব মনে পড়ল। বাবার জন্যে মন যেন কেমন করে উঠল, আর করে উঠল সুপ্রভার জন্যে। বারবেলা ক্লাবে যাবার আগে এই কথা কতবার মনে হল, সুপ্রভা আজ এতক্ষণ আমার চিঠি পেয়েছে।

বনগাঁ থেকে আজই এলুম। এই শ্রাবণ মাস, আজ ১লা, মটরলতা দোলানো খয়রামারির মাঠের সেই ঝোপটায় অন্য অন্য বছরের মত কালও বেড়াতে গেলুম। এ বছর সব বদলে গিয়েচে। সুপ্রভা নেই, খুকু নেই, জাহ্নবী নেই, বনগাঁর বাসা নেই, ৪১নং মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের সে মেস নেই।

নাগপঞ্চমীর ছুটিতে সেই শ্রাবণ মাসে বারাকপুর যাওয়া, খুকুদের দাওয়ায় বসে নলে নাপিতের ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ খাওয়া, খুকুর কত কথাবার্ত্তা—The apple tree, the singing and the gold!—কোথায় কি চলে গিয়েচে!

এবারও কল্যাণী বড় আনন্দ দিয়েচে। দেখ, অদৃষ্টে কি অদ্ভুত যোগাযোগ, এ স্নেহশীলা মেয়েটি আবার কোথা থেকে এসে জুটল বল তো! কোথায় ছিল ও আর বছর এমন সময়? অথচ এ বছর ওদের বাড়ির সঙ্গে কেমন একটা আত্মীয়তা হয়ে গিয়েচে—যেন কতকালের আলাপ! আমি কলকাতায় আসি-না-আসি তাতে কল্যাণীর কি? অথচ সে আমার আসতে দেবে না—এই মধুর শাসনটুকু করত সুপ্রভা, করত খুকু—আবার এ এল কোথা থেকে কে বলবে!

কাল (২৯শে জুলাই) আবার বনগাঁ থেকে এলুম। এবারও ওদের ওখানেই ছিলুম গিয়ে। কল্যাণীর যত্ন সমানই। কাল কিছুতেই আসতে দেবে না কলকাতায়—সোমবার থাকব, মঙ্গলবার থাকতে হবে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবার জো নেই—

মন্মথদা কিম্বা মুন্সেফের বাড়ি গিয়ে যে একটু গল্প করব, তাতে ঘোর আপত্তি ওঠাবে।

—গা ছুঁয়ে বলে যান ঠিক সাতটার সময় আসবেন! যদি না আসেন তবে আমি কিন্তু মরে যাব! তাতেই বা কি, আমি মরে গেলে, জগতের কার কি ক্ষতি!

মুন্সেফবাবুর বাড়ি গিয়ে দুবেলা আড্ডা দিই। বার্ণিয়ার সম্বন্ধে অনেক রকম কথা হল।

আবার ১১ই আগস্ট বনগাঁ থেকে এলুম। বেলুর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ ছিল, তা ছাড়া ছিল মাসিক সাহিত্য-বাসর। মায়াও ছিল এবার, গল্পে-গুজবে বেশ কাটল। নদীতে ঘোলা এসেচে, এদিন যখন স্নান করতে গেলুম জল খুব ঘোলা।

কল্যাণীর আসবার কথা বলে এলুম কলকাতায়।

কাল শনিবার বারাকপুরে গিয়েছিলুম। আর বছর তো সারা বর্ষাকাল ও শরৎ কাল দেশে যাইনি। গোপালনগরের বাজারে প্রথমেই গুটকের সঙ্গে দেখা। শ্যামাচরণ-দাদা দেখি বাজারে আসচে, তার মুখে শুনলুম কালী এসেচে। ভাদ্র মাসের বৈকাল, শুকনো পথ-ঘাট, বৃষ্টি নেই এবার, আকাশ নীল, গাছপালা ঘন সবুজ। বাড়ি গিয়ে দেখি বলা বোষ্টম আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েচে। আমি ইছামতীর ধারে গিয়ে কতক্ষণ বসে রইলাম ঘোলা জল ঘাসভরা মাঠ ছুঁয়েচে। ওপারের মাঠে ষাঁড়া ঝোপে সন্ধ্যার ছায়া নামল, আকাশে কত রকম রঙিন রঙের খেলা দেখা গেল, আমি জলে নেমে স্নান করলাম।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে--পাকা তালের গন্ধ পাওয়া যাচ্চে শ্যামাচরণদাদাদের বাগান থেকে। একটা তাল পড়ার শব্দ পেলুম। বাড়ি এসে খানিকটা বসে আছি, মনে হচ্ছে খুকু যেন এবার এল বিলবিলের ধারের পথটা দিয়ে। এবার ওদিকে বড় বন। সন্ধ্যার পরে খুব জ্যোৎস্না উঠল। এমন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না শুধু কোজাগরী পূর্ণিমার কথা মনে এনে দেয়, আর মনে আনে খুকুর কথা, নাদিদিদের বাড়ি থেকে এসে আমার উঠোনে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে গল্প করত। কালী এসেচে। ওদের বাড়ি কতক্ষণ কালীর সঙ্গে, সুপ্রভার গল্প করলুম। সুপ্রভার বিষয়ে অনেক কিছু জিগ্যেস করল।

আজ রবিবার সকালে কালী ও আমি প্রথমে গিয়ে বসলুম বাঁওড়ের ধারে ছুতোর ঘাটার বটতলায়। কলকাতা থেকে অনেকদিন পরে গ্রামে গিয়ে বনঝোপ দেখে বাঁচলাম। এ সব না দেখে আমি থাকতে পারিনে - সকালের বাতাসে নাটাকাঁটা ফুলের সুগন্ধ, বনটিয়া ডাকচে, কলামোচা পাখী ঝোপের মাথায় খেলা করচে। সইমা যাচ্ছেন নাইতে, আমায় বল্লেন—কবে এলে বিভূতি? তাঁর সঙ্গে গল্প হল খানিকক্ষণ। তারপর আমি আর কালী বেলেডাঙা হয়ে মরগাঙের ধারে বাবলা তলায় কতক্ষণ বসলুম, কালী ঘোঙা কুড়োলে, কুঠীর মাঠের জলার ধারে একটা নিবিড় ঝোপে দুজনে বসলুম। আর সব জায়গাতেই সুপ্রভার পত্রখানা পড়চি—একবার, দুবার, কতবার যে পড়া হল! দুজনে আবার আমাদের ঘাটে নাইতে এলুম, কালী সিটকি জালে চিংড়ি মাছের বাচ্চা ধরলে। আমি যখন রোয়াকে বসে থাকি, তখন যেন আবার মনে হল খুকু আসচে...এখুনি ঝোপের আড়ালে গিয়ে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে সে আসবে...

ঘুমিয়ে উঠে বিকেলে কালীর বাড়ি গেলুম। ওরা হাটে গেল, আমি আমাদের ঘাটে এসে বসলুম—ওখান থেকে নৌকো করে কুঠীর মাঠে এসে ঘাসের ওপর বনসিম ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার পত্রখানা আবার পড়ি। সুপ্রভা কোথায় কতদূরে

আজ!

কল্যাণী...ওর কথাও মনে হয়। এরা সব চলে গেল, তাই ভগবান যেন এই স্নেহময়ী মেয়েটিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার দু' শনিবার পরে তবে ওর সঙ্গে দেখা হবে। জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলা যাব। সুপ্রভাকে লিখেচি সেদিন সেখানে পত্র দিতে।

সন্ধ্যার ট্রেনে চলে আসব। হাট থেকে বৃদ্ধ মুসলমানেরা ফিরচে আমাদের গাঁয়ে। কারো মাথায় ধামা, কারো মাথায় ঝুড়ি। সবাই জিগ্যেস করে—বাবু কবে আলেন? আরামডাঙার আবদুল, নুটুর সয়া—সবাই। গোপালনগর স্টেশনে অনেকক্ষণ বসলুম। কত নক্ষত্র উঠচে—আজ সারাদিন পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র। বনগাঁয়ের কাছে ট্রেন আসতেই কল্যাণীর কথা মনে হল। একবার মনে হল নেমে ওর সঙ্গে দেখা করে কাল ট্রেনে যাব। মেসে এসে সেবার পত্র পেলুম।

এবার ভাল লেগেচে বাঁওড়ের ধারের বটতলায় বসা, কুঠীর মাঠে ছায়াস্নিগ্ধ ঝোপটি, মরগাঙের ধার, এবেলায় বনসিম ঝোপের ছায়ায় ঘাসের মাঠে বসা, সুপ্রভার চিঠি পড়া, কল্যাণী ও খুকুর চিন্তা। আর কালকার রাত্রের সেই ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কাল কত রাত পর্যন্ত চড়কতলার মাঠে ছিলাম; ফণিকাকা, গজন, কালো পাঁচু, ফকিরচাঁদ সবাই গল্প করলুম। কাল রাত্রে জেলেপাড়ায় কৃষ্ণ-যাত্রা-হবার কথা ছিল, সকলে জিগ্যেস করচে—কখন বসবে যাত্রা? ক্ষুদ্র জগতের ক্ষুদ্র আমোদ-প্রমোদ। খুব রাত্রে নাকি যাত্রা হয়েছিল—দেখতে পেলে না বলে আজ সকালে পিসীমা ও ন'দিদির কি দুঃখ!

খুকুর স্মৃতি সারা বারাকপুরকে, তার মাঠ, ঘাট, নদীর তীর সব আচ্ছন্ন করে রেখেচে—এবার গিয়ে বুঝলুম। নদীর ধারে সুপ্রভার, কারণ চিরকাল নদীর ধারে বসে সুপ্রভার পত্র পড়া আমার অভ্যাস।

অনেকদিন পরে ভাদ্র মাসে বাড়ি গিয়েছিলুম। ভারি আনন্দ নিয়ে ফিরলুম। কালী এসেচে, তাই আরও আনন্দ। সুপ্রভার অমন সুন্দর পত্রখানা সে আনন্দ আরও বাড়িয়ে দিলে। যে পৃথিবীতে সুপ্রভা আছে, সেখানে আমার ভাবনা কি? তারপর কল্যাণী যেখানে আছে, সেখানেই বা ভাবনা কি?

আমি যেটাকে মটরলতা বলতুম, কাল বেলেডাঙা যেতে বটতলার পথে কালী ওটাকে বল্লে—বড় গোয়ালে লতা। কিন্তু বড় গোয়ালে লতার ফল হয় সাদা, আর এক রকমের লতা আছে, খাঁজকাটা আঙুরের পাতার মত দেখতে, আঙুরের মতই থোলো বাঁধে।

আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবাগানটার পথে কাল বিকেলে ঘুম ভেঙে উঠে যাচ্ছি, তখন মনে কি এক অদ্ভুত অনুভূতি হল। যেন কি সব শেষ হয়ে গেছে, কি যাচ্চে, এই ধরণের একটা উদাস মনোভাব। প্রতিবারই এই স্থানটি আমাদের মনে অদ্ভুত ভাব জাগায়। বঙ্গবাসীর কথা, বাবার কথা, চীন ভ্রমণের কথা, কত কি মনে আনে। দরিদ্র সংসারে তালের বড়া খাওয়ার দিন সে কি উৎসব...সেও এই ভাদ্র মাসে। পিসীমা কাল তালের বড়া খাইয়েছিলেন কিন্তু।

১৯৩৭ সালেও ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীতে বাড়ি গিয়েছিলুম, তখনও খুকু গ্রামে ছিল না।

আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র জগৎটাতে ওরা বেশ আছে, কৃষ্ণ-যাত্রা শুনচে, দলাদলি করচে, গোপালনগরের হাট করচে, নদীতে ছিপ নিয়ে মাছ ধরচে, চড়কতলায় বসে রাত্রে আড্ডা দিচ্চে—বেশ আছে।

জন্মাষ্টমীর ছুটিতে ঘাটশিলার বাড়িতে এসেচি। বাড়ি এসেই সুপ্রভার চিঠি পেলাম। কি ভাল মেয়ে ও, তাই ভাবি। Always a loyal friend—ভারি আনন্দ হয়েচে ওর চিঠি পেয়ে। পরদিন সকালে উঠে কমলদের বাড়ি গেলুম—কমল মাছের সিঙাড়া ও চা খাওয়ালে। বৈকালে বাঁধের পেছনে শালবনে দিব্যি সবুজ ঘাসের ওপর গিয়ে বসলুম। ঘাসের ফুল ফুটেচে সাদা সাদা—রোদ রাঙা হয়ে আসচে, মিষ্টি শরতের রোদ—মনে পড়ল সুপ্রভার কথা...কত দূরে আছে শিলংএ, কি করচে এখন তাই ভাবি। সুবর্ণরেখার ওপরকার পাহাড়শ্রেণী বড় চমৎকার দেখাচ্চে। আর মনে হল খুকুর কথা, কল্যাণীর কথা। যাদের যাদের ভালবাসি, এ অপূর্ব্ব অপরাহ্নে সকলের কথাই মনে পড়ে।

রাত্রে ভট্‌চাজ সাহেবের বাড়ি সভা হল—বৌমা, উমা ওরাও গেল। অনেক রাত্রে আবার মোটরেই ফিরে এলুম।

গত রবিবারে ঠিক এই বৈকালবেলা বারাকপুরে—নদীর ধারে বনসিমলতার ঝোপের ছায়ায় বসে সুপ্রভার চিঠি পড়চি, কালীও এসেচে অনেকদিন পরে—ওর সংগে গল্প করচি—সে কথা মনে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে আমি বাসাডেরা ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানীর পথটা দিয়ে ফুলডুংরির পেছন দিয়ে দূরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে চললুম। মেঘান্ধকার সকাল, সজল হাওয়া বইচে, দু ধারের বন সবুজ হয়ে উঠেচে বর্ষায়, পাথরগুলো কালো দেখাচ্চে গাছপালার তলায়। সেবার যেখানে ভিক্টোরিয়া দত্ত, আমি, নীরদবাবু, সুবর্ণা দেবী চা খেয়েছিলুম, সেই উঁচু পাহাড়ের কাটিংটা দিয়ে বড় বড় গাছের তলা দিয়ে সোজা চললুম—দুধারে কি নিবিড় বন, পাথরের স্তূপ ছড়ানো, বড় একটা বটগাছ। এটা যেখানে নীচু হয়ে গেল, তার বাঁ দিকে একটা নিবিড় কুঞ্জবন ও লতাবিতান—বসবার ইচ্ছে থাকলেও বসতে পারলুম না, বেলা হয়ে গেল। একটা পাহাড়ী ঝর্ণা পার হয়ে (দুধারে কি শোভা সেখানে!) ওপারে গেলুম। বাঁ দিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা সুঁড়িপথ ধরে কিছুদূর গিয়েই দেখি সেই ঝর্ণাটা রাস্তা আটকেচে। আর না গিয়ে সেই ঝর্ণার ধারে যেখান দিয়ে খুব তোড়ে জলটা বইচে কুলুকুলু শব্দে—সেখানে জলে পা ডুবিয়ে বসে রইলুম। সুপ্রভার ও কল্যাণীর চিঠি দুখানা সেই ঘন বনের মধ্যে ঝর্ণার ধারে জনহীন অরণ্য প্রকৃতির নীরবতার মধ্যে বসে কতবার পড়ি। হাতীর ভয় করছিল বড়। এ সময় বুনো হাতীর সময়।

বৃষ্টি এল—একটা পথিক লোক কাছে এসে বসল। ও বল্লে—এখানে হাতীর ভয় নেই—তবে সকাল সকাল চলে যান বাবু।

বুরুডির পথ দিয়ে ঘুরে আবার সেই ঝর্ণাটা পার হয়ে চলে এলুম। একটা ছোট ফর্সা মেয়ে কপালে সিঁদুর দিয়েচে—আমি যেমন বললুম, "তোর নাম কি খুকি?" অমনি ছুটে পালাল।

আমি কত কি গাছপালার মধ্যে দিয়ে গ্রাম পার হয়ে এসে ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানীর পথটা ধরলুম। বড় বৃষ্টি পড়চে—ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ ঘুরে ঘুরে উড়চে পাহাড়ের চূড়ায় নীল বনরেখাকে বেষ্টন করে। বেলা দুটোর সময় ঘাটশিলায় পৌঁছলুম—বৌমা ভাত নিয়ে বসে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি বাঁধের জলে স্নান সেরে এসে খেয়ে সকলকে উদ্ধার করলুম।

দুপুরে খুব ঘুমুই। তুলসীবাবু মোটর নিয়ে এসে ফিরে গেল। রাত্রে দ্বিজুবাবুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। অমরবাবু ও বাসার চাকর বিনোদ রাত ১২টায় নাগপুর প্যাসেঞ্জারে উঠিয়ে দিয়ে গেল।

অনেককাল আগে এই সময় আমি আজমাবাদের কাছারীতে ছিলুম ভাগলপুরে।

জন্মাষ্টমীর ঠিক তেমনি মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—অনেক বছর আগে বারাকপুরের বাড়িতে যে রকম ছিল ১২ ভাদ্র, জন্মাষ্টমীর দিন। মণি চালে প্রদীপ দেখাচ্ছিল, গৌরী আমায় বললে—এসো, এসো, ও কিছু না—কোথায় আজ ওরা সব?

আজ ১২ই ভাদ্র। কতকাল আগে এমনি বেলাটিতে আমি কত আগ্রহের সঙ্গে বাড়ি গিয়েছিলুম সে কথা মনে পড়ল। আবার এই সময়ে এমন বর্ষার দিনে আমি আজমাবাদ কাছারীতেও ছিলুম। ঐ সময় আমি এক পয়সার খড়িমাটি কিনে কত আগ্রহ নিয়ে ট্রেনে চলেচি।

পুজোর ছুটি এসে গেল। মধ্যে G. B. Association থেকে আমায় একটা অভিনন্দন দিলে—পশুপতিবাবু, জ্যোৎস্না বৌমা, শৈলদা, তারাশঙ্কর—আরও অনেকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি আনন্দময় হয়ে উঠেছিল। এবার বড় লিখবার তাগিদ, কাল রাত্রে একটা গল্প লেখা শেষ হয়েচে—আজ থেকে লেখা বন্ধ। এবার রাঁচি হতে সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এসেছে। একবার চাটগাঁ যাবার ইচ্ছেও আছে।

আজকাল শরতের বৈকালে স্কুলের ছাদ থেকে কিম্বা পথে যাবার সময়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বহুদিন আগেকার বারাকপুরে যাপিত বাল্যদিনগুলির কথা—বিশেষতঃ পুজোর সময়কার কথা মনে পড়ে। বাবার এই সময়ে প্রতি বৎসর জ্বর হত—ঘরে ধুনোর গন্ধ বেরুতো সন্ধ্যার সময়, বাবা জ্বরের ঘোরে অস্ফুট কাতর শব্দ করত—আর আমরা ছেলেমানুষ তখন, ভাবতুম—এবার পুজোর সময়ে আমাদের কাপড় হল না—(বালকবালিকারা বড় স্বার্থপর হয়) মায়ের হাতে একদম টাকাপয়সা থাকত না—১৯১৩ সালের পুজোর সময় বাবা কলকাতা না কোথায় ছিলেন, এক পয়সাও পাঠান নি, আমাদের সে কি কষ্ট, মা আমাকে তক্তপোশখানার কাছে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যাবেলায় কি কথা বলেছিলেন সংসার ও বাবা সম্বন্ধে—সে-সব কথা মনে আসে কেবলই।

সুপ্রভার চিঠি আজও আসে নি, মন সেজন্যে ব্যস্ত আছে। এরকম তো কখনও হয় না!

খুকুর জন্যেও গত এক মাস রোজই ভাবি—হয়তো পুজোর সময় দেখা হবে, নয়তো হবে না—কত ভাবে এর কথা যে মনে হয়! বারবেলা ক্লাবে অভিনন্দনের দিন গভীর রাত্রে জ্যোৎস্না-মগ্ন ছাদে ওর মুখখানি মনে হয়ে মন কি খারাপ হয়ে গিয়েছিল! তারপর মনে হয়েছিল সুপ্রভার কথা—কল্যাণীর কথা।

কি জানি কারও সঙ্গে দেখা হবে কি না! রেণু লিখেচে অবিশ্যি করে যাবার জন্যে এবার। দেখি কি হয়।

*পুজো ফুরিয়ে গেল। ঘাটশিলাতে ছিলুম সপ্তমী পর্য্যন্ত। সেখানে গিয়েই সুপ্রভার হাতের একখানা রুমাল পেলুম। ক'দিন বেশ আনন্দ উপভোগ করা গেল ঘাটশিলায়। তুলসীবাবুর গাড়িতে সপ্তমীর দিন বৌমা, নীরদবাবু, রেখা, সুবর্ণা দেবী সবাই মিলে মৌভাণ্ডারে আরতি দেখতে যাওয়া গেল। বেশ শীত পড়েছিল সেখানে বাঁধের পাশে শালবনে বেড়াতে যেতুম—কি চমৎকার লাগত। মহাষ্টমীর দিন দুপুরের গাড়িতে আমি আর কমল কলকাতায় এলুম। গত পুজার কত কথা মনে হয়! জাহ্নবী নেই এ বছর। আর বছর কত প্রসাদ খাওয়া বনগাঁয়ে, ভেবে কি কষ্ট হয়! খুকুর কথাও মনে হয়েছিল সপ্তমীর আরতির সময়—সেদিন দুপুরে গালুডিতে

নীরদবাবুর বাড়ির বটতলায় পাথরের ঠেস্ দিয়ে বসে কেবল সুপ্রভা, সুপ্রভা—ও, কি ভাবেই ওর কথা! মনে হয়েছিল সেদিন। সেই দুপুরের রোদে কালাজোর পাহাড়ের দিকে চেয়ে সুপ্রভা—খুকু—এদের কথাই ভেবেচি।

বনগাঁয়ে এসে খুব আমোদ করা গেল। আর বছরের মত এবারও প্রফুল্লদের বাড়িতে সার্ব্বজনীন পুজো দেখলুম। একদিন বারাকপুরে গেলুম কল্যাণী ও নবু—ওদের নিয়ে। বনসিমতলার ঘাটে ওরা সবাই বনসিমের ফুল তুললে—গান করলে আমার বাড়ি বসে নদিদি, মেজখুড়ীমার সামনে। তারপর ওরা হরিপদদার বাড়ি গেল। ফিরে এসেই সেদিন আবার বিজয়া সম্মেলন গেল প্রফুল্লর বাড়ি। আজ বনগাঁ থেকে এলুম—রাত্রে চাটগাঁ যাবো ময়মনসিং হয়ে। কতকাল ধরে পশ্চিম যাই নি—বারো-তেরো বছর আগে। কেবলই যাচ্চি, অথচ পূর্ব দিকে।

খুকু আসে নি, যদিও আসবার কথা ছিল।

এইমাত্র সকালের ট্রেনে চাটগাঁ থেকে এলাম। ১৯৩৭ সালের পরে আর যাই নি। রত্না দেবীর স্বামী সমরবাবু ওখানে মুন্সেফ। রেণুরা হয়তো শহরের বাড়িতে নেই ভেবে ওঁর ওখানে গিয়ে উঠলুম। প্রকাণ্ড সাততলা বাড়ি—অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায় সাততলার ওপর থেকে—কর্ণফুলির দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। পরদিন সকালে রেণুদের বাড়ি গিয়ে দেখা করলুম। রেণু বল্লে—এইমাত্র আপনার কথা হচ্চিল। আমার হাতের নখ কেটে দিলে বসে বসে। কতক্ষণ ধরে কত গল্প হল। সুপ্রভার কথা উঠল—খুকুর কথা উঠল। আসবার দিন ভৈরববাজারে মেঘনা নদী পার হবার সময়ে ট্রেনে সুপ্রভার কথা আমার কি ভীষণ ভাবেই মনে এসেছিল। যাবার দিন সব গ্রামের ছায়ায় সুপুরি বনের ছায়ায় কল্যাণীকে কতবার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলুম। পূর্ব্ববঙ্গের মেয়েদের সঙ্গে আমার আলাপ কতকাল থেকে—সুপ্রভা, সেবা, রেণু, কল্যাণী, মায়া—সবাই পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে। ওদের টানেই কতবার এখানে এলুম। সারাদিন কল্যাণী আর কল্যাণী...কত গ্রামে ওকে কল্পনা করলুম—বিদ্যাময়ী কলেজের হোস্টেল দেখে মনে হল এখানে ওরা ছিল। রত্না দেবীর সাততলায় একদিন গানের আসর হল—কোজাগরী পূর্ণিমা সেদিন। গোপালবাবু গান গাইলে—কবীরের ও মীরার ভজন। আমার মনে হল তাদের কথা, যারা আনন্দ চেয়েও পায় নি—কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ পেয়ে তাতেই খুশি হয়ে জীবন কাটিয়ে গেল। জাহ্নবী নবদ্বীপে গিয়েছিল গঙ্গা-স্নান করতে, সেকথা—খুকু ডাকবাংলোর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল—কল্যাণীরা সেদিন ঘোড়ার গাড়ি করে বারাকপুর বেড়াতে গিয়েছিল—সে সব কথা। চোখে যেন জল এসে পড়ে। আমি ছোটবেলা থেকে কত আনন্দই পেলুম—কিন্তু আমার পরিবারের আর কেউ অত আনন্দ কোনদিন কল্পনাও করলে না। কক্সবাজারের তরুণী বধূ গাড়িতে যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। আমি তাঁকে 'মা' বলে ডাকলুম! পূর্ব্ববঙ্গের মেয়ে ভিন্ন এখানে কেউ আলাপ করত না।

রেণু, কল্যাণী ও খুকুর সঙ্গে একদিন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলুম। ওদের সীতাকুণ্ড গ্রামে যে বাড়ি আছে, সেখানে গিয়ে উঠলুম। মধুর মা বলে একজন ব্রাহ্মণ বিধবা আমাদের আদর-যত্ন করলেন। সুপুরির গুঁড়ির সাঁকো দিয়ে পার হয়ে রেণু ও আমি অতি কষ্টে মধুর মার বাড়ি গিয়ে পৌঁছুই। আমি তামাক খাচ্চি হুঁকোয় (মধুর মা সেজে দিল) দেখে রেণু তো হেসেই অস্থির। বুধু তার ক্যামেরাতে সেই অবস্থায় আমার ফটো নিলে। আরও অনেক ফটো নেওয়া হল পাহাড়ে উঠবার পথে। রেণু কেবল বলে—আপনার জন্যে আমার ভয়। আমি বলি—আর কোন ভয়

নেই—চল উঠে। কি সুন্দর দৃশ্য, কি শ্যামল বনানী, বিরাট বনস্পতিদের ভিড়। শম্ভুনাথের মন্দিরের কাছে রেণু, কল্যাণী ওরফে চণ্ডু জল খেয়ে নিল। যেমন আমি বলি চণ্ডু, রেণু অমনি বলে 'বাহির হইল! চণ্ডলা বাহির হইল!' অর্থাৎ আমার গ্রাম্য-জীবনের লেখক হবার সেই আশ্চর্য্য ঘটনাটির কথা। একটা গাছের ফটো নিতে গিয়ে ওদের জোঁকে ধরলে। জোঁক অবশ্যি আমাকেও ধরেছিল। আসবার পথে ওরা তেঁতুল পাড়লে একটা গাছ থেকে—তারপর ওদের বাড়ি এসে সবাই ভাত খাওয়া গেল সন্ধ্যাবেলা। রেণু বল্লে—আপনার সঙ্গে এ সম্পর্ক আর কখনও জীবনে পাব না! কত গল্প করতে করতে রাত্রি ন'টার সময় চাটগাঁ এলুম। রত্না দেবী খাবার করে নিয়ে বসে আছেন—ভাগ্যে আজ সীতাকুণ্ডে থাকি নি!

তার পরদিন। সকালে উঠে কেশব জিনিস নিয়ে স্টেশনে এল। রেণুর বই কেশবের হাতে দিয়ে দিলুম। চন্দ্রনাথের পাহাড় ধুম স্টেশন থেকে বেঁকে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলে গিয়েচে একেবারে হিমালয় পর্য্যন্ত। কি নিবিড় ঘন বনানী পাহাড়ের মাথায়। ওই একটা বিভিন্ন জগৎ যেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া স্টেশনে আসবার সময় মনে হল অনেক আগে একবার এ পথে গিয়েছিলুম—তখন আমার কি ছিল? এখন কত কে আছে—সুপ্রভা আছে, কল্যাণী আছে, খুকু আছে। ময়মনসিং স্টেশনে আসবার আগে এল বৃষ্টি। আজ কিন্তু ময়মনসিং স্টেশন ছাড়তেই গারো পাহাড় বেশ দেখা গেল—বিদ্যাগঞ্জ বলে একটা স্টেশন থেকে চমৎকার দেখা গেল। স্টীমারে যখন পার হচ্চি, ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার পিংনা বলে একটা স্টেশনে এসে স্টীমার দাঁড়াল। আমি কল্পনা করলুম সন্ধ্যায় নেমে আমি অনেকদিন পরে যেন কল্যাণীদের বাড়ি ওর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

হরেন ঘোষ আমার সঙ্গে ময়মনসিং স্টেশনে দেখা করলে। আবার বিদ্যাময়ী হোস্টেলটা ভাল করে দেখলুম। মায়া ও কল্যাণী এখানে পড়ত। হরেন ঘোষকে রমা দেবীর দেওয়া খাবার খাওয়ালুম। সিরাজগঞ্জে ট্রেনে উঠেই শুয়ে পড়লুম। ঘুম ভেঙে একেবারে দেখি ঈশ্বরদি। তারপরই ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি রাণাঘাট। ভোর হবার দেরি নেই। আবার ঘুমিয়ে পড়লুম—দেখি নৈহাটি। দেশে এসে গিয়েচি। স্টীমারের এঞ্জিনের কল প্রতিবারই দেখি—এবারও দেখলুম। পুজোতে খুব বেড়ানো গেল এবার। ঘাটশিলা, বনগাঁ, বারাকপুর, চাটগাঁ, ময়মনসিং—বহু জায়গা। কলকাতায় নেমে দেখি শ্রাবণ মাসের মত মেঘাচ্ছন্ন দিনটা। বৃষ্টিও বেশ নামল দুপুরে। আজই বনগাঁ হয়ে বারাকপুর যাব।

আনন্দের বিষয় এই যে, ১৯১২ সালে ব্রাহ্মণবেড়িয়া হয়ে চাটগাঁ থেকে যখন কলকাতায় ফিরি, তখন আমি ৪১নং মির্জ্জাপুরের যে দিকের মেসটায় থাকতুম—এবারেও সেইখানে এসে উঠেচি।

আজ স্কুল খুলেচে। বনগাঁ থেকে এলুম। আগের লেখাটা লিখবার পরে বারাকপুরে দু'দিন ছিলুম। আমার উঠোনের গাছে খুব শিউলিফুল ফুটেচে। খুকুর কথা কেবলই মনে হল সেখানে গিয়ে। কুঠীর মাঠে যেখানে বসে 'আরণ্যক' লিখতুম, সেখানটাতে বসে কতক্ষণ কাটালুম। নৌকো করে বিকেলে খুকুর মা'র সঙ্গে বনগাঁ আসবার সময় মনে পড়ল—১৯৩৯ সালের আষাঢ় মাসে খুকুর মা, খুকু এবং আমি বনগাঁয়ে এসেছিলুম। কল্যাণীর সঙ্গে দু'দিন কাটিয়ে গেলুম ঘাটশিলা। সেখানে এল বিভূতি মুখুজ্যে। তাকে নিয়ে ভট্চাজ সাহেবের মোটরে গালুডি। প্রোফেসার বিশ্বাসের বাড়িতে মেয়েদের পার্টিতে আমাদের নিমন্ত্রণ হল। সেই রাত্রেই রাঁচী রওনা হই বিভূতিকে নিয়ে। মুরী জংশন থেকে রাঁচী যাওয়ার রেলপথের দু'-

ধারে আরণ্য সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। পরদিন রাঁচী থেকে অনেকগুলি মেয়ে ও কলেজের ছেলেদের সঙ্গে হুড্রু ও জোনা জলপ্রপাত দেখতে গেলুম। জোনাতে সন্ধ্যার আগে একখানা পাথরে বসে কত কি ভাবলুম। হুড্রুর চেয়ে জোনা ভালো লাগল। কি জনহীন নিস্তব্ধতা চারিদিকের! মেয়েদের আসতে দেরি হতে লাগল, আমি ও বিভূতি ঘাসের উপর শতরঞ্চি পেতে শুয়ে রইলুম কতক্ষণ। সুপ্রভা, খুকু, কল্যাণী, গৌরী—সবার কথাই মনে হয়। ওদের সবাইকে আমার প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করি মনে মনে। সুপ্রভার চিঠি পেয়েছি রাঁচী এসেই। জোনাতে সে চিঠিখানা আমার পকেটে। জঙ্গলের মধ্যে বসে কতবার পড়ি। কল্যাণীর চিঠিখানাও। রাঁচী শহরটি বেশ সুন্দর! সুনির্ম্মল বসু ওখানে বেড়াতে গিয়েচে, তার সঙ্গে একদিন মাঠের ধারে বেড়াতে গেলুম। রাঁচী থেকে ফিরে ঘাটশিলা এসে দেখি ছোটমামা এবং নুটুর শ্বশুর সেখানে। কমল একদিন বেড়াতে এল। চলে এলুম কলকাতা। সেইদিন ছিল সকালে হাওড়ার পুল খোলা। স্টীমারে গঙ্গা পার হই। ন'টার ট্রেনে মানকুণ্ডু। খুকু আমাকে দেখে কি খুশি। কত গল্প, কত কথা। বাইরের দরজায় খিল দিয়ে এসে বসল। এতদিন পরে ও স্বীকার করলে, ছাদ থেকে রাঙা গামছা ও-ই উড়িয়েছিল। চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। দেখে কষ্ট হল বড়। আসবার সময় বল্লে —চেয়ে দেখলে দেখতে পাবেন আমি জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। সত্যি দাঁড়িয়েই রইল। সুপ্রভার কথা কত হল। কল্যাণীর কথাও বল্লুম। সেই দিনই রাত সাড়ে আটটার ট্রেনে বনগাঁ। 'বঙ্গশ্রী'র সুধাংশু যাচ্ছিল, তাকে ডেকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে গল্প করি আমার ভ্রমণের। বনগাঁ পৌঁছে সুন্দর জ্যোৎস্নার মধ্যে হেঁটে চললুম। বাড়ির সব দরজা বন্ধ করে ওরা ঘুম দিচ্চে। সুনীতিদের বাড়ি এসে বসলুম। সুধীরবাবু গিয়ে ডেকে তুল্লে। পরে একদিন কল্যাণীদের সঙ্গে নৌকো করে বারাকপুরে গেলুম পিকনিক করতে। আমাদের পাড়ার ঘাটে বনসিমতলায় কল্যাণী রান্না করলে। গ্রামের ঝি-বৌয়েরা আলাপ করতে এল। ওরা আমার বাড়িতে বসে গান করলে। সব এল শুনতে। ইন্দু রায়ের বাড়ি গেল সবাই মিলে। জ্যোৎস্না রাত্রি, বাঁশবনের মাথায় আমাদের বাড়ির পিছনে বৃহস্পতি ও শনি জ্যোৎস্নাভরা আকাশেও যেন জ্বল্‌জ্বল্ করচে। নৌকো ছাড়লুম। কল্যাণী আমার সঙ্গে বসে গল্প করলে নৌকোর বাইরে বসে। ঘাটবাঁওড়ের এপারে জ্যোৎস্নাভরা মাঠের মধ্যে চা করলে। কি চমৎকার লাগছিল! একটা বড় উল্কা সে সময় বেগনি ও নীল রংয়ের আলো জ্বালিয়ে আকাশের জ্যোৎস্নাজাল চিরে প্রজ্বলন্ত হাউইবাজির মত জ্বলতে জ্বলতে মিলিয়ে গেল।

সুন্দর কাটল এবার পুজোর ছুটি। গাড়িতে গাড়িতে কাটল সারা ছুটিটা। কোথায় চাটগাঁ, কোথায় রাঁচী! আজ ফিরেচি কলকাতায় বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ থেকে।

জীবনে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গেল ওপরের ওটা লিখবার পরে। গত অগ্রহায়ণ মাসে আমি বিবাহ করেচি। সম্প্রতি স্ত্রীকে নিয়ে ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। একদিন সুবর্ণরেখা পার হয়ে পাহাড়-জঙ্গলের পথে চললুম ওকে নিয়ে। বনের মধ্যে একটা ঝর্ণা আছে, তার ধারে বড় বড় পাথর পড়ে আছে—এক ধরণের কি ঘাস গজিয়েচে। গোলগোলি ফুল (coclo sperma Govripium) ফুটেচে তামাপাহাড়ে। দুজনে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট পাথরে বসলুম ছায়ায়। তারপর ঝর্ণার জল খেয়ে চললুম পাহাড়ের দিকে। ওপরে যখন উঠেচি, তখন বেলা দুটো। ও গোলগোলি

ফুল নিয়ে খোঁপায় পরলে। আমরা নেমে এলুম, তখন বেলা তিনটে।

তারপর শিবরাত্রির ছুটিতে ওকে আনতে গিয়ে বৈকালে দুজনে গেলুম ফুল-ডুংরিতে। চারিধারের পাহাড়ের শোভা এই বৈকালে অপূর্ব্ব হয়েচে। অনেক রাত পর্য্যন্ত বসে থাকার পরে ফিরে গেলুম।

গত মঙ্গলবারে ওকে নিয়ে বারাকপুরে গিয়েছিলুম। ও মায়ের ভাঙা কড়াখানার ওপরে ফুল দিলে, বড় ভালো লাগল আমার। বেশ মেয়ে কল্যাণী।

আমরা কুঠীর মাঠে গিয়ে কুল পাড়লুম সবাই মিলে। গুটুকে, ইন্দু রায়, সত্য সবাই ছিল। সন্ধ্যার সময় চলে এলুম।

কাল ছিল স্কুলের ছুটি। সকাল বেলা বনগাঁ থেকে বেরুলাম আমি, কল্যাণী, বেণু ও বাদু। বসন্তে ঘেঁটুফুল দেখব এই ছিল আশা, প্রথমে গেলুম চাঁপাবেড়ের রাস্তার ধারের পুকুরপাড়ে। সেখান থেকে শুকনো পুকুরটার মধ্যে দিয়ে আমরা গেলুম ওপারে। তারপর গ্রামের পথে একটা তিত্তিরাজ গাছের তলায় ঘেঁটুবনের ধারে চাদর পেতে বসলুম। তিত্তিরাজের ফল পেকে ফেটে আছে গাছে—কেমন গন্ধ।

যেতে যেতে চড়কতলার বনের একটা অংশের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। বেতগাছ ও কয়েক প্রকার নতুন ধরনের গাছপালা দেখলুম। কাঙ্গালীদের বাড়ি একটা কুল পেড়ে খেলাম। তামাক সেজে দিলে।

তখন বেলা প্রায় ১১টা। ওখান থেকে সোজা হেঁটে এলুম চালকী। পথে কত ঘেঁটুবনের শোভা—উঁচু পুকুরের পাড়টাতে চালকীতে ছেলেবেলায় যেখানে বসে কলের গান শুনেছিলুম, সেই দালানটা ভাঙা অবস্থায় দেখলুম। মিতেদের বাড়ির ওপর দিয়ে জাহ্নবীর বাড়ি এলুম। জাহ্নবীর ঘরে এসে কল্যাণীকে নিয়ে দাঁড়ালুম। কতদিন পরে আবার দাঁড়ালুম এসে জাহ্নবীর ঘরে।

ওরা ডাব খাওয়ালে, ভাত খাওয়ালে। দুপুরের পরে সকলে হেঁটে চলে এলুম বনগাঁ। চাঁপাবেড়ের পথে এল বৃষ্টি। একটা গাছের খোড়লে সবাই ঢুকে বসি। বৃষ্টি গেল কেটে খানিকটা পরে।

বেলা চারটেতে বনগাঁ ফিরি।

কাল জাহ্নবীর বনগাঁর বাসায় গিয়েচি, পাঁচী ডেকে নিয়ে গিয়ে চা করে দিলে, পায়েস খাওয়ালে। অনেকদিন পরে ওদের বাড়িতে গেলুম।

তার আগে মানকুণ্ডু খুকুর সঙ্গে গিয়েছিলুম একদিন। খুকু পুকুরের ধার দিয়ে আমাকে আসতে দেখেই ছুটে এল। ছাড়তে চাইলে না—তখুনি চা করে, খাবার করে খাওয়ালে।

গত রবিবারে বনগ্রাম সাহিত্য-সম্মেলন হয়ে গেল। তার আগের দিন আমি, কল্যাণী, কানু, বেণু সব বেরিয়ে চাঁপাবেড়েতে ঘেঁটুফুল দেখতে গেলুম—ওরা সব খাবার তৈরী করে নিয়ে গেল। কি সুন্দর ঘেঁটুফুল ফুটেচে চাঁপাবেড়ের ঘন জঙ্গলের মধ্যে মাঠের ধারে। বিকেল বেলা, আমরা বিলের মধ্যে দিয়ে মাঠের বনের ছায়ায় বসলুম। সবাই মিলে চা ও খাবার খেলুম। ওরা সব ছুটোছুটি করলে। কোকিল ডাকচে বনে, নীল আকাশ, ভারী আনন্দ পেলুম সেদিন। সাহিত্য-সম্মেলন হল তার পরদিন। গজন, হরিপদদা ও খুকু এল—ওদের চা ও খাবার খেতে দিলুম।

নববর্ষের আজ প্রথম দিন। গত বর্ষে অনেক নতুন ঘটনা ঘটে গেল। সুপ্রভার বিবাহ ও আমার বিবাহ তাদের মধ্যে দুটি প্রধান ঘটনা। পূর্বের জীবন একেবারে বদলে গিয়েচে।

আজ বনগাঁ থেকে এলুম রাত ন'টার ট্রেনে। কাল বারাকপুরে চড়ক দেখতে গিয়েছিলুম অনেক দিন পরে। আমি, গুটুকে ও নদু—তিনজনে যাই। অনেকদিন আগের মত চড়কতলায় কাদামাটি দেখলুম। শিবের জন্যে ধান ছড়ানো। বাড়ির পেছনে বাঁশতলায় বেড়াতে গিয়ে তেমনি শুকনো ফলের বীজের গন্ধ, পাখীর ডাক। তেমনি কোকিল ডাকচে—যেন গোটা জীবনটা সামনে পড়ে আছে মনে হল। বাবা ও মাও যেন আছেন।

বার্ণপুরে সাহিত্য-সম্মেলনে ও-সপ্তাহে কল্যাণীকে নিয়ে গিয়েছিলুম। সেখানে একদিন ওরা মোটর নিয়ে রতিবাটি কয়লার খাদ দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের। জীবনে এই প্রথম কয়লার খাদ দেখা হল ; বিভূতি মুখুয্যেও সঙ্গে ছিল।

১লা বৈশাখ খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল আজ বনগাঁয়ে। দুটি লোক হাটে গাছ-চাপা পড়ে মারা গেল।

কচা মারা গিয়েচে, বারাকপুরে গিয়ে সকলের মুখে সে বিবরণ শুনলাম। বড়ই শোচনীয় মৃত্যু।

কতদিন পরে আবার দেখলুম চড়ক—সেই কথাই বার বার মনে হচ্চে—এমন ধরণের লাঠি খেলা সেই দেখতুম বাল্যকালে, আবার কতকাল পরে যেন মনে হল দেশে আমাদের ঘরবাড়ি ঠিক তেমনি আছে, তেমনি পক্ষী-কাকলী-মুখরিত, শুক্‌নো ফলের বীজের গন্ধামোদিত আমার বাল্য-দিনগুলি। বাবা যেন এখনও বসে গান গাইচেন আমাদের ঘরের দাওয়ায়—আবার কবে যাত্রা বসবে—সেই আনন্দে দিনরাত চোখে নেই ঘুম।

তার অনেকদিন পরে, মনে আছে যেবার আমি ম্যাট্রিক দিই—সেই শেষবার কাদামাটির সময় চড়কতলার রৌদ্রে ছাতা ধরে দাঁড়িয়ে থাকি, পরের বছর আসি নি—থার্ড ইয়ারে এসেছিলুম, কিন্তু সে কথা মনে নেই। আজ কত বছর পরে আবার এলুম সেই কাদামাটি দেখতে।

গ্রীষ্মের ছুটির পরে স্কুল খুলেচে। অনেক কিছু ঘটে গেল গ্রীষ্মের ছুটিতে। দার্জ্জিলিং গিয়েছিলুম কল্যাণীকে নিয়ে—সেখানে অবজারভেটরি হিল থেকে নামচি—সুপ্রভা ও সেবার সঙ্গে দেখা। সুপ্রভার বাবাও ছিলেন। একদিন ওদের হোটেলে গিয়ে চা খাওয়া গেল। তারপর সেদিনই ঘুম থেকে আমি হেঁটে আসচি জলাপাহাড় রোড হয়ে—দেখি নীচে থেকে কে ডাকাডাকি করচে। চেয়ে দেখি সেবা ও বিপুল দাঁড়িয়ে। নেমে এলুম। কালিম্পং রোডের মোড়ে গাড়ির মধ্যে সুপ্রভা বসে আছে। পান দিলে খেতে। গল্প করে তখনি জলাপাহাড় রোড ধরে চলে এলুম দার্জ্জিলিং-এ। পথের দৃশ্য অপূর্ব্ব। কি হিমারণ্যের শোভা! কত কি ফুল ফুটে রয়েচে। অনেক ফুল তুলে আনলুম কল্যাণীর জন্যে। M. S. M. আপিসে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করলুম, সেদিন ট্রেনে যে সন্দেশ দিয়েছিল কড়াপাকের। কল্যাণী ধর্ম্মশালায় শুয়ে আছে—তাকে নিয়ে গিয়ে উঠলুম অকল্যান্ড রোডে। সেখান থেকে দার্জ্জিলিং-এর দৃশ্য কি সুন্দর দেখা যায়—বিশেষ করে আলো জ্বালবার দৃশ্য। নাম-বার দিন তরাই-এর ঘন অন্ধকার অরণ্য ও অসংখ্য জলপ্রপাত আমার মনে পূর্ব্ব-দৃষ্ট

কত দৃশ্যকে তুচ্ছ করে দিলে। বনগাঁ এসে একদিন বারাকপুর গিয়েছিলুম। ইন্দুর সঙ্গে নদীর ধারে বসে গল্প করলুম, হাজারি সিংয়ের দোকানে বসে রেজিনা গুহের গল্প হল। হাজারি সিং বল্লে—সে দেখ নি তোমরা, সাক্ষাৎ সরস্বতী! অথচ ও কখনো নিজেই দেখে নি। হাডাক্ জিঙ্কের গল্পও হল—যেমনি আজ গত ১৫।১৬ বছর কি তারও বেশি হয়ে আসচে। গাড়ি পাঠিয়ে ওঁরা জামাইষষ্ঠীতে নিয়ে গেলেন। তারপর ষষ্ঠীর দিন হঠাৎ প্রশান্ত মহলানবীশ, কাননবালা ও মিসেস্ মহলানবীশ গেলেন বনগাঁয়ে। সেখান থেকে গেলেন বারাকপুরে। আমার রোয়াকে গিয়ে বসলেন। শ্যামাচরণদা চা ও খাবারের ব্যবস্থা করলে।

আমি আষাঢ় মাসে একদিন গেলুম পাটশিমলে। পথে ভীষণ কাদা—বলদে-ঘোড়ামারি এক গ্রাম্য পাঠশালায় বসে মৌলবী সাহেবের সঙ্গে গল্প করি। সেখানে জল খেয়ে আবার রওনা হই। একটা বটগাছের তলায় বসি। তারপর আসসিংড়ি গ্রাম ছাড়িয়ে জামাদা বিলের আগাড়ের সেই শিকড়-তোলা বটগাছটার তলায় গিয়ে বসলুম। পাটশিমলে পেঁছে পিসীমার মুখে কত পুরোনো কথা শুনি। পেছনের বাঁওড়ে বর্ষার দিনে হিজল গাছের ঘাটে কত তৃপ্তি! সন্ধ্যাবেলা ডাঙা-উঁচু বনের মধ্যে দিয়ে প্যাটাঙির দিকে হাজরাতলার ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই জামগাছের শেকড়টাতে বসলুম। তার পরদিন আবার সেই পথেই ফিরি।

ঘাটশিলাতেও গিয়েছিলুম দ্বিজুবাবুর ওখানে. সন্ধ্যায় বসে রোজ গল্প হত। একদিন খুব বর্ষা। সন্ধ্যার আগে আমি সুনীলদের বাড়িতে এক স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। ফিরবার সময়ে নদীর ধারের পথ হয়েই ফিরলুম। এক জায়গায় নাবাল জমিতে অনেকখানি জল বেধেছিল। বৌমা ও উমাকে নিয়ে একদিন ফুল-ডুংরির পেছনকার শালবনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কি সুন্দর কুরচি ফুল ফুটেচে বনে। একটা ঝর্ণা বর্ষার জলে ভরপুর, এঁকে বেঁকে চলেচে বনের মধ্যে দিয়ে। ফুলডুংরি পাহাড়ে প্রায়ই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতুম। একদিন ঘন বর্ষায় সন্ধ্যার সময় একা কতক্ষণ পাহাড়ের ওপর বসে বসে ভাবলুম। এ ফুলডুংরি কতদিনের। পলাশীর যুদ্ধের দিনেও এমনি ছিল, আকবর যেদিন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখনও এমনি ছিল. বুদ্ধদেব যে রাত্রে গৃহত্যাগ করেন তখনও এমনি ছিল, যখন মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা বর্ত্তমান. যেদিন সম্রাট টুটেনখামেনের মৃতদেহ সাড়ম্বরে সমাধিস্থ করা হয়েছিল—সেদিনও এই ফুলডুংরি এমনই ছিল, আজ যার ওপর ধলভূম রাজার পার্ক তৈরী হচ্চে।

বনগাঁয়ে এবার খুকু ছিল অনেকদিন। সেই ১৯৩৯ সালের খুকু আর নেই। প্রায়ই সন্ধ্যায় কল্যাণীকে নিয়ে বেড়াতে যেতুম। ও গেল ৪ঠা আষাঢ়, সেদিন কল্যাণীকে সঙ্গে করে ওদের ছাদে বসে গল্পগুজব করা গেল। সন্তুও ছিল, রাম-দাসের মেয়ে।

খয়রামারি শ্মশানের পাশে মন্মথদা, যতীনদা, বিভূতিকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে যেতুম। ওটা নতুন আবিষ্কার। ইছামতীর জলে স্নান করে কি তৃপ্তিই পেতুম। এবারে কি ভীষণ গরম গেল। নেয়ে তৃপ্তি নেই ঘাটশিলায়। ইছামতীতে সন্ধ্যার সময়েও নাইতুম। শরীর যেন জুড়িয়ে যেত ঘাটশিলার পরে দেশে এসে। ঘাটশিলাতে নাইবার কি কষ্টই গেল ক'দিন। একে গরম, তাতে ভাল করে স্নান করবার মত পুকুর নেই। দ্বিজুবাবুর পুকুরের ঘোলা জলে একদিন নেয়েছিলুম।

যতীনদাকে গ্রহ-নক্ষত্রের কথা খুব বলতাম। Jean's ও Eddington-এর Astronomy-টা এ ছুটিতে খুব পড়া গিয়েচে ও আলোচনা করাও গিয়েচে। রোজ

তিনটের সময় কল্যাণীকে লুকিয়ে ও তার বকুনি সহ্য করেও ওদের আড্ডায় চলে যেতুম। যতীনদা দেখতুম বসে আছে। দুজনে আরম্ভ করতুম গ্রহ-নক্ষত্রের গল্প। কল্যাণীকে সন্ধ্যার সময় পারতপক্ষে বেরুতে দিত না। অন্ধকারে পালালে ছুটে গিয়ে ধরে আনত। ছাদে শুতাম প্রায়ই গরমে। মাঝরাত্রিতে দুজনে নেমে আসতাম। সকালে খুকুর বাড়ি যেতামই।

ভালো কথা, রেণুর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল এই ছুটিতে। যেদিন ঘাটশিলা যাই, তার আগের রাত্রে। বিভূতি মুখুয্যে, মনোজ এবং আমি বনগাঁ এলুম। গোপাল নিয়োগীর বাসায় যেতে ফুলির ছেলের সঙ্গে দেখা. সে নিয়ে গেল ওদের বাসায়। সেখানে ফুলির মার কাছে রেণুর ঠিকানা নিয়ে চলে গেলুম ক্যাম্বেলের সামনে দেখা করতে। রেণুই এসে দোর খুলে দিলে। খুব খুশি আমায় দেখে। সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়ে দিয়ে গেল। একখানি চিঠিও দিয়েছিল পুরী থেকে—নুটু নিয়ে গিয়েছিল ঘাটশিলাতে—বৌমা ছিলেন।

চমৎকার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হল।

দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর বাড়ি আড্ডা দিতে গেলুম সজনী. মোহিতদা, বিভূতি মুখুয্যে ও আমি। কলকাতার রাস্তা-ঘাট অন্ধকার। অনেক রাত পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া করে ফিরলুম। ২৪ পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট হিউজেস্ সাহেবও সেদিন সেখানে ছিল।

আজ একটা স্মরণীয় দিন। বহুকাল পরে আজ আমার বহুকালের পরিচিত আবাস ৪১, মীর্জাপুর স্ট্রীটের মেস ছেড়েচি। সেই হরিনাভি স্কুলের থেকে আজ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকে ওই মেসটাতে ছিলাম। এতকাল পরে আজ ছেড়ে অন্যত্র আসতে হল, কারণ মেসটা গেল উঠে। বিভূতি, দেবব্রত, খুকু. সুপ্রভা, রেণু—কত লোকের সঙ্গে ও-মেসের স্মৃতি সুখে-দুঃখে ছিল জড়ানো।

গত রবিবার ৬ই জুলাই নড়াইল সাহিত্য সম্মেলনে আমি ছিলুম সভাপতি—বনগাঁ থেকে যতীনদা, মন্মথদা, মিতে এদের নিয়ে গিয়েছিলুম। সিঙ্গে স্টেশনে নেমে একটা দোকানে খাবার তৈরী করতে বলে আমরা ভৈরবের ওপরে কাঠের পুলে গিয়ে বসলুম। জ্যোৎস্না রাত্রি। বাঞ্ছানিধি বলে জনৈক উড়িয়া ওপারে জঙ্গলবাধাল গ্রামে থাকে—সে তার মনিবের কত নিন্দে করলে। তারপর ময়রার দোকানে এসে লুচি সন্দেশ খেয়ে একখানা এক ঘোড়ার গাড়িতে এলুম আফ্রার ঘাটে। সেখান থেকে নৌকো করে ক'বন্ধুতে বসে গল্প করতে করতে জ্যোৎস্না রাত্রি ভাল করেই উপভোগ করা গেল। মিতে ও আমি নৌকোর ছই-এর ওপর গিয়ে বসে যতীনদাকে বার বার ডেকে ও ছইয়ে ঘা মেরে তার ঘুমের ব্যাঘাত করছিলাম। ভোরে পিয়ারের খালের ধারে নৌকো লাগল। সেখান থেকে ডিস্ট্রিক বোর্ডের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলুম রতনগঞ্জ। একটা দোকানে খেলুম খাবার। তারপর টাকুরে নৌকোতে উঠে, নড়াইল গিয়ে অজিতবাবুর বাসায় হাজির হই বেলা সাড়ে-আটটার মধ্যে। বৈকালে সভা সেরে চা-পার্টিতে স্থানীয় S.D.O. মুন্সেফ প্রভৃতির সঙ্গে গল্প। একটা নাটকাভিনয় দেখতে গেলুম টাউন হলে—তারপর অনেক রাত্রে খেয়ে গোরুর গাড়িতে রওনা। বেশ জ্যোৎস্না রাত্রি। খুব ঘন ঘন বন, বেতঝোপ পথের ধারে। আবার পিয়েরের খালে নৌকোয় উঠলুম। যতীনদাকে সবাই মিলে উত্ত্যক্ত করে তোলা গেল, কেন অজিত-বাবুর সামনে ভাড়া চেয়েছিল, এই কথা বলে। রাত্রে নৌকো থেকে পড়ে যাবার মত

হয়েছিল যতীনদা। ভোরে আফ্রার ঘাট থেকে হে'টে সিঙেগ স্টেশন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র রেখে স্নান করে নিয়ে চা ও সন্দেশ খাওয়া গেল। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ এসে নামলাম। কল্যাণী খুব খুশি। আহা, আসবার সময় রসমুণ্ডি নিয়ে আমার হয়ে ঝগড়া করে বকুনি খেলো রেণু খুকুর কাছে। আমায় বল্লে—আমার মরা মুখ দেখবেন, আজ যদি যাবেন—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব'র মত চলেই তো আসতে হল!

সামনের রবিবারে নীরদবাবু, সুবর্ণ দেবী, পশুপতিবাবু যাবে মোটরে বনগাঁ picnic করতে—সম্ভবত চালকী বিভূতিদের বাড়ি হবে রান্নাবান্না।

জীবন আবার কি ভাবে কোনদিক থেকে পরিবর্ত্তন হয়ে গেল তাই ভাবি। ৪১, মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের মেসে সেই পুরোনো ঘর আমার জন্যে রেখে দিয়ে ওরা আমায় সেখানে নিয়ে যাবার জন্যে ডাকলে—কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে হল না। মেসের মায়া এবার কাটাতে হবে—কল্যাণী খুব ধরেচে এবার ওকে নিয়ে বাসা করতে হবেই। ভেবেচি কলকাতা ছেড়ে বারাকপুরে থাকব। গ্রামের জীবন, ইছামতীর ঘোলা জল, মটরলতার দুলুনি—কতকাল ভোগ করি নি। জীবনে কোনদিনই গৃহস্থ হয়ে বারাকপুরে থাকি নি। এবার গার্হস্থ্য জীবন যাপন করবার বড় আগ্রহ হয়েচে। জীবনে বা কখনো হয় নি—এবার তা করেই দেখি না কেন! মুক্ত ও স্বাধীন জীবন দুদিন দেখি কাটিয়ে।

কাল রবিবারে নীরদবাবু ও সুবর্ণ দেবীরা এলেন বনগাঁ। আমি, কল্যাণী, মায়াদি, বেলু সবাই মোটরে চালকী বিভূতির বাড়ি গিয়ে বসা গেল। ডাব খেলাম। তারপর সুধাংশুদের বাড়ির রান্নাঘরে খিচুড়ি রান্না হল। ইতিমধ্যে যুথিকা দেবী ও পশুপতিবাবু গিয়ে হাজির। সবাই মিলে আনন্দ করে খাওয়া ও গল্প করা গেল। জাহ্নবীর ঘরে ওদের নিয়ে গেলাম—বেচারী জাহ্নবী যদি আজ থাকত! ওর অদৃষ্ট নিয়ে ও এসেছিল—চলে গেল নিজের অদৃষ্ট নিয়েই।

গোপালনগরের হাটে সবার সঙেগ দেখা। কল্যাণী, মায়াদি, সুবর্ণ দেবী সবাই হাট করচে। গজন, ফণিকাকা, নলে নাপিত, গুটকে, শ্যামাচরণদা—সবাই দেখলে। শ্যামাচরণদা সুবর্ণ দেবীদের হাট করে দিলে। আমরা আবার ফিরে এলুম বনগাঁ। সেখান থেকে চা খেয়ে ওরা চলে এল। কল্যাণীকে আজকাল বড় ভালো লাগচে। মঙগলবার পর্য্যন্ত ছাড়ে না—যেমন এসেচি কলকাতায় অমনি এক চিঠি—এ শনিবারে না এলে মরে যাব। বড় ভালবাসে।

আজ একটি মহা স্মরণীয় দিন বাঙালীর। সকালে উঠে লেখাপড়া করচি, বিশ্ব বিশ্বাস এসে বল্লে, রবীন্দ্রনাথ আর নেই। শুনেই তখনি রবীন্দ্রনাথের বাড়ি চলে গেলুম। বেজায় ভিড়—ঢোকা যায় না! সেখানে গিয়ে শোনা গেল রবীন্দ্রনাথ মারা যান নি, তবে অবস্থা খারাপ। ওখান থেকে এসে স্কুলে গেলুম। স্কুলে শুনলাম তিনি মারা গিয়েছেন ১২টা ১৩ মিনিটের সময়। স্কুল তখুনি বন্ধ হল। আমি ও অবনীবাবু, ক্ষেত্রবাবু, স্কুলের ছেলের দল কলেজ স্কোয়ার দিয়ে হে'টে গিরিশ পার্কের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে বিরাট শবযাত্রার জনতা আমাদের ঠেলে চলল চিত্তরঞ্জন এভিনিউ বেয়ে। রমেশ সেনের ভাই সুরেশের সঙেগ আগের দিন প্রমোদ-বাবুদের বাড়ি দেখা হয়েছিল—আমরা হাওড়া স্টেশনে তুলে দিয়ে যাই নীরদবাবুকে। সে আর আমি কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের মধ্যে দিয়ে সেনেটের সামনে এসে আবার পুষ্প-মাল্য শোভিত শবাধারের দর্শন পেলুম। পরলোকগত মহামানবের মুখখানি একবার

মাত্র দেখবার সুযোগ পেলুম সেনেটের সামনে। তারপর ট্রেনে চলে এলুম বনগাঁ। শ্রাবণের মেঘনির্ম্মুক্ত নীল আকাশ ও ঘন সবুজ দিগন্ত বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেতের শোভা দেখতে দেখতে কেবলই মনে হচ্ছিল—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নব প্রাতে জাগে নবীন জনম লভি—

অনেকদিন আগে ঠিক এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' পড়তে পড়তে বারাকপুরে ফিরেছিলুম—মায়ের হাতের তালের বড়া খেয়েছিলুম, সে কথা মনে পড়ল।

কল্যাণীকে শবাধারের শ্বেত-পদ্ম দিলুম, সে শুনে খুব দুঃখিত হল। তারপর হরিদার মেয়ের বিয়েতে গেলুম তাঁর বাড়ি। খেতে বসে খুব বৃষ্টি এল।

তারপর ক'দিন ছিলাম বনগাঁ। খুকু এল অসুস্থ অবস্থায়। রাত্রে কল্যাণীকে নিয়ে দেখা করতে গেলুম ওর সঙ্গে। আবার পরদিন নিশিদার বাড়িতে বৌভাত তাঁর ছেলের। সেখানেও গেলুম—যাবার আগে খুকুদের বাড়ি গিয়ে গল্প করলুম।

কিন্তু মনে কেমন যেন একটা শূন্যতা—রবীন্দ্রনাথ নেই! একথা যেন ভাবতেও পারা যাচ্চে না।

গত জন্মাষ্টমীর দিন বিকেলে এখানে এলো বিভূতি, মন্মথদা। ওদেব নিয়ে প্রথমে গেলাম শিবপুর লাইব্রেরীতে—তারপর রাত ন'টার ট্রেনে রওনা হয়ে নামলাম গালুডিতে। ভোরের দিকে সুবর্ণরেখার পুল পার হয়ে শাল-জঙ্গলের পথে উঠলুম এসে কারখানার চিমনিটার কাছে। কতকালের পরিত্যক্ত তামার কারখানা—লোকও নেই, জনও নেই। গুররা নদীতে স্নান সেরে সবাই মিলে পিয়ালতলার শিলাখণ্ডে বসে জলযোগ সম্পন্ন করলুম। তারপর তামাপাহাড় পার হয়ে নীলঝর্ণায় নামলুম। সেখান দিয়ে আসবার পথে একটা ঝর্ণার জল পান করে আমরা একটা ছোট্ট দোকানে কিছু চিঁড়ে ও চা কিনি। একটি ছোট্ট মেয়ে দোকানে ছিল, সে চা'র জল গরম করে দিলে। তারপর ঘন বনের পথে হেঁটে পাটকিটা গ্রামে পোঁছে গেলুম। গ্রামের বাইরে যে ছোট্ট ঝর্ণাটি, সেখানে বসে আমরা কিছু খেয়ে নিলাম। তারপর আবার হেঁটে রাণীঝর্ণার পাহাড় পার হয়ে ওপরে উঠলুম—দূরে সুবর্ণরেখা আবার দেখা যাচ্চে—বেলা তখন তিনটে। মুশাবনী রোডে নেমে কেঁদাড়ি গ্রামে পল্লীকবি বিষ্ণুদাসের বাড়ি এলুম। তারপর চা খেয়ে তিনুঝর্ণা পার হয়ে আমরা সুবর্ণরেখার খেয়াঘাটে ডোঙায় নদী পার হলাম। ভট্টাচার্য্য সাহেবের বাংলোয় বসে গল্প করে ঘাটশিলার বাড়ি এলুম। রাত্রে সেখানে বিধায়ক, কমল, অমর প্রভৃতির সঙ্গে বসে খাওয়া গেল।

পরদিন সকালের ট্রেনে চলে আসি কলকাতায় ও রাত সাড়ে-আটটার ট্রেনে বনগাঁ। কল্যাণীর সঙ্গে ভ্রমণের গল্প করি। খুকু এখানে এসেচে, তার সঙ্গে গিয়ে গল্প করি একদিন কল্যাণীকে নিয়ে ছাদে বসে।

এবার পুজোর ছুটি কাছে এসেচে। কি ভীষণ পরিশ্রম গিয়েচে—গ্রীষ্মের ছুটির পরে এই ক'টা মাস—বিশেষ করে গত এক মাস। সর্ব্বদা লেখা আর লেখা!...খেয়ে সুখ নেই বসে সুখ নেই। রোজ ভোরে উঠে কলঘরে যাই স্নান করতে, তখন ভাল করে অন্ধকার কাটে না, পাশের বাড়ির আলো জ্বলে—এসে সেই যে লিখতে বসি—একবারে বেলা দশটা। আর তিনটি দিন পরে ছুটি—কাল দুপুরের পর থেকে খাটুনির অবসান হয়েচে। সব লেখা দিয়ে দিয়েচি—হাতে আর কোন কাজ নেই। আজ তো একেবারেই ছুটি। ওবেলা বিদ্যাসাগর কলেজে Study Circle-এ এক

বক্তৃতা আছে—তাহলেই হয়ে গেল।

পুজোর পরে ছেড়েই দেব স্কুল। অবকাশ ও অবসরে ভাল ভাবে লেখা যাবে। জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। ঘড়ি-ধরা সময় অনন্তকে কি করেই আটকেচে! বিশ্বের ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ বৎসরের সময় অতি তুচ্ছ—কিছুই না—আমার মেসের ছোট্ট ঘরটিতে সাড়ে ন'টা যেই বাজল আমার হাতঘড়িতে—অমনি সময় গেল ফুরিয়ে। আমি জীবনে অবকাশ ভোগ করতে চাই এবার—আর চাই বারাকপুরে ছেলেবেলার মত বাস করতে দুদিন। দেখি এসব সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা!

বনগাঁ যাই নি অনেকদিন। ও শুক্রবারে যশোরে পূর্ণিমা-সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের শোকসভা ছিল। মনোজ, মহীতোষদা, আমি ও নীরদবাবু গিয়েছিলুম। আমি ও সুরেন ডাক্তার উঠেছিলুম অবিশ্যি বনগাঁ থেকে। সভাতে কল্যাণীর যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার জ্বর হয়েছিল বলে নিয়ে যেতে পারি নি। সভার পরে মণি মজুমদারের বাড়ি আমরা আহারাদি করলুম ও গিরীনদার সঙ্গে দেখা করে রাত্রের মেলে কলকাতা ফিরি—তারপর আর বনগাঁ যাওয়া ঘটে নি।

পুজো এসে গিয়েচে। কলকাতা থেকে শুক্রবার বনগাঁ থাকি মহালয়ার ছুটিতে—পরের সোমবারে স্কুল হয়ে পুজোর ছুটি হয়ে যাবে। কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছে আছে।

মনে আজ কেমন আনন্দ, এমন ধরণের অপূর্ব্ব আনন্দের দিন জীবনে ক'টাই বা আসে? আজ পুজোর আগে মহালয়ার ছুটি। সোমবার একেবারে ছুটি হচ্চে পুজোর। অনেকদিন বনগাঁ যাই নি—আজ ও-বেলা যেতে পারব ভেবে অত্যন্ত আনন্দ হচ্চে। গতকাল সকালে যশোর থেকে এসেচি সাহিত্য-সম্মেলন করে—বনগাঁ যখনই ট্রেনখানা গেল তখনই যেন মনে হল নেমে পড়ি। অনেকদিন পরে ইছামতী দেখলুম সেদিন। এমন আনন্দের দিনে পেছনে যদি বহু নিরানন্দপূর্ণ দিন না থাকে, তবে এমন দিন কখনই হতে পারে না। নিরানন্দের কঠিন, ধূসর মরুভূমি পার না হয়ে এলে আনন্দের মরুদ্বীপে পৌঁছুনো যায় না—দস্যুবৃত্তি করে যে আনন্দ লুটতে আসবে—রোজ যারা আনন্দ খুঁজে বেড়ায়...আনন্দ খুঁজে বেড়ানোই যাদের পেশা—তারা সত্যকার আনন্দ কি বস্তু—তার সন্ধান রাখে না। আনন্দের পেছনে আছে সংযম, ভোগের অভাব, আনন্দের দৈন্য—এসব অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে এসে তবে প্রকৃত আনন্দ রসের সন্ধান মেলে। আমি জীবনে অনেকবার এ ধরনের আনন্দভরা দিনের আস্বাদন করেচি- যেমন একদিন জাঙিগপাড়ায়—যখন বিজয় জ্যোৎস্নারাত্রে একটা হেনাফুলের ডাল হাতে নিয়ে দেখা করলে—তারপর ইসমাইলপুরে সেই অপূর্ব্ব আনন্দের দিন—অনেককাল পরে যখন কলকাতায় আসব সদরের হুকুম পেলুম—সেই বাঁকে সিং, সেই দিগন্ত বিস্তীর্ণ কাশবনের প্রান্তে আমাদের খড়ের কাছারী ঘর!—এখনও চোখের সামনে দেখচি।

অবকাশ পেলে ইসমাইলপুর অঞ্চলে একবার যেতে হবে—এ বছরই যাব ভেবেচি।

পুজোর ছুটি হল আজ—আজই বনগাঁ থেকে এসেচি—কল্যাণীর মনে দুঃখ হয়েচে হয় তো। কাল সে বলেছিল, যাবেন না খয়রামারি বেড়াতে বিকেলে, কিছুতেই যাবেন না। 'যেতে নাহি দিব'—কিন্তু ও বলে ছোট মেয়ের মত জোর করে, আমি ওর কোন কথাই রাখি নে, ওর কথা ঠেলে জোর করে চলে যাই। ও আবার বলে তবুও, বোঝে না যে ওর কথা রাখচি নে—অন্য মেয়ে হলে অভিমান করে আর বলে না। কিন্তু

রোজই বলে, রোজই কথা অবহেলা করি—অথচ ও বলতে ছাড়ে না একদিনও—সেই পুরোনো সুরে 'যেতে নাহি দিব'—ও সড় সরলা! অমন সরলা মেয়ে আমি কোথাও দেখি নি।

আজ ছুটি হলে শুনলুম স্কুলে শারদীয় উৎসব হবে। কিন্তু সে উৎসবে আমি থাকতে পারি নি—বড় দেরি হয়ে গেল বলে যোগ দিতে পারলুম না।

এলুম এম. সি. সরকার, মিত্র ও ঘোষ, 'দেশ' আপিস, ফুলুর মায়ের বাড়ি, ক্ষিতীশ ভট্‌চাজের 'মাসপয়লা' আপিস ও তারপর বাসা।

কল্যাণীর কথা কিন্তু বড় মনে হচ্চে আজ সারাদিন। তার চোখে জল দেখে এসেচি ভোরবেলা।

বারাকপুরে গ্রাম্যজীবন কিছুদিনের জন্যে যাপন করবার বড় ইচ্ছে—কতদিন যে এ ধরণের জীবন কাটাই নি—মাটির সঙ্গে যোগ রেখে...গ্রাম্য গৃহস্থ সেজে। আবার সেই শৈশবের জগৎটা আবিষ্কার করব—এই মনে আকাঙ্ক্ষা। আমাদের বাড়ির পেছনে বাঁশবনে, এই শরৎকালের দুপুরে গাছপালায়, ঘুঘুর ডাকে কি যেন মায়া মেশানো ছিল—বনভূমি যেন স্বপ্নমাখা. ১৯৩৪ সালের দোলের সময়েও আমি তেমনি স্বপ্নমাখা দেখেছি বনভূমিকে—মাত্র সাত বছর আগে। কিন্তু শহরের কলকোলাহলময় ব্যস্তসমস্ত জীবনযাত্রার মধ্যে যে স্মৃতি আমার মনে ক্ষীণ হয়ে আসচে, যে জীবনকে ভুলে যাচ্চি, আবার সে জীবনকে আস্বাদ করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে পড়েচি—অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও আমায় তা করতে হবে। অন্য লোকে সে কথা কি বুঝবে?

কল্যাণী কাল বলছিল আর বছরের মত—আমার গা ছুঁয়ে বলে যান, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবেন!

তা এলুম না। ওর মনে দুঃখ হল। গা ছুঁয়ে বল্লে' তাই যদি না করা যায়, তবে মানুষ মরে যায় জানেন? এও আপনি করলেন! লোকের জীবন-মরণটাও দেখলেন না? এই সন্ধ্যায় সেকথা ভেবে মনে কষ্ট হচ্চে—ওর কথাটা শুনলেই হোত ছাই। মিথ্যে ওর মনে কেন কষ্ট দেওয়া?

ওর তরুণ মনের স্নেহ ও আগ্রহকে বার বার করে ঠেলে গেলাম অবহেলায়—তবুও ও বোঝে না, মনে কিছু ভাবে না—আবার সেই রকমই বল্লে।

কাছের মসজিদে আজান দিচ্চে। ক'দিন খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে আজানের শব্দ শুনে ভাবলুম—এবার রাত ভোর হয়ে এসেচে। আর সে কি আনন্দ! সেই নীচের কলতলায় গিয়ে স্নান করে আসব।

*পুজোর ছুটি আজ শেষ হয়ে স্কুল খুলেচে। আজ এসেচি বনগাঁ থেকে। পরশু ঘাটশিলা থেকে যাই বারাকপুরে। মহাষ্টমীর দিন কল্যাণীকে নিয়ে ঘাটশিলা যাব পূর্ব্ব থেকেই ঠিক ছিল—সপ্তমীর দিন নকফুলে জয়গোপাল চক্রবর্ত্তীর বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে এসে পরদিন সকালেই রওনা। শেষরাত্রে ঘাটশিলা পৌঁছুব। মেসে ওকে নিয়ে এসে দেখি দার্জ্জিলিং-এ দেখা সেই ছেলেটি ও স্কুলের দুটি ছাত্র উপস্থিত। ওদের সাথে গল্পগুজব করে কেটে গেল সময়টা। তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি নিয়ে গেলুম। তারা জলটল খাওয়ালে। ফিরেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে খানিকটা অপেক্ষা করার পরে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরলুম। মিতে আছে ওখানে—শেষরাত্রে আমাকে ঘাটশিলা পৌঁছুতেই সে তামাক সেজে নিয়ে এল। তারপর ভোর হতেই বেড়াতে বেরুই আমরা।

গালুডিতে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে হেঁটে যাবার দিন যথেষ্ট আমোদ পেয়েছিলাম—আর

আমোদ পেয়েছিলাম নোয়ামুণ্ডি লাইনে বেড়াতে যাবার দিন। গালুডিতে কোজাগরী পূর্ণিমার দিন নীরদবাবু, মিস্ দাস, প্রোফেসর বিশ্বাস সবাই মিলে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' অভিনয় হল। তারপর ঘাটশিলার ভট্চাজ সাহেবের বাড়িতে একদিন পার্টি উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত ছিলাম—সেদিনও খুব আনন্দ করা গেল।

নোয়ামুণ্ডি যাবার দিন ভোররাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরে মিতে ও আমি ঘাটশিলা থেকে প্রথমে যাই টাটা। সেখান থেকে একখানা Special Train ধরে চাঁইবাসা। চাঁইবাসা বেশ সুন্দর জায়গা—অনেক এ্যাকোসিয়া গাছ রাস্তার দুধারে। বাজারে বড় বড় আতা বিক্রি হচ্চে, আমরা দু'তিন পয়সার আতা কিনে রাস্তার সাঁকোতে বসে পেট ভরে খেলুম—তারপর রেল লাইন ধরে স্টেশনে হাজির। ঝির্নাকিপানি স্টেশনে থৈ থৈ করচে মুক্ত দিগন্ত—অমন মুক্তরূপা ভূমিশ্রী আমি বড় ভালবাসি—বেশী দেখি নি অমন দৃশ্য—এটা নিশ্চয়ই। কেন্দপোসি ছাড়িয়ে দুধারে বিজন অরণ্যভূমি, বনে সহস্র টগর (micalia champak) ফুলের গাছ—আর শেফালী—কি একটা ফুলের ঘন সুগন্ধে ত্রিশ মাইল দীর্ঘ রাস্তার প্রতি মুহূর্ত্তটি রেলের কামরা আমোদ করে রেখেচে। নোয়ামুণ্ডি ছাড়িয়ে বন আরও বেশী—সত্যিই সে বনের শোভা ও গাম্ভীর্য্য মনে অন্য ভাব জাগায়—তা শুধু কমনীয় সৌন্দর্য্যের ভাব নয়—যা জাগায় বাংলাদেশের বনঝোপ, সে যেন চৌতালের ধ্রুপদ—মনে গম্ভীর ভাব জাগায়। ফিল্মের অভিনেত্রীর হালকা প্রেমের মিষ্টি সুরের গান নয়—ফৈয়াজ খাঁর মালকোষ কিংবা পুরিয়া। গাম্ভীর্য্য আছে, উদাত্ত ভাব জাগায়—অথচ মিষ্টত্ব বলতে সাধারণতঃ লোকে যা বোঝে তা কম।

যখন ফিরি তখন চারিধারে লৌহ-প্রস্তরের ছড়াছড়ি দেখে ভগবান সম্বন্ধে বড় একটা অদ্ভুত ভাব মনে এসেছিল—পদার্থ, নক্ষত্র জগৎ, বিশ্বের বিরাটত্ব প্রভৃতি নিয়ে। জঙ্গলের মাথায় পশ্চিম আকাশে শুকতারা, মাঝ-আকাশে বৃহস্পতি। রাত ১২টার ট্রেনে ঘাটশিলা এসে নামলুম।

তারপর আর একদিন গালুডি যেতে হল নীরদবাবুর গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে। সেদিন মিতে, মিতের স্ত্রী, বৌমা, কল্যাণী সবাই গিয়েছিল। পশুপতিবাবুর স্ত্রীকে সেখানে দেখলাম। খুব খাওয়া-দাওয়া হল।

আসবার আগের দিন সৌরীন মুখুয্যের ভাইপো এসে বল্লে—ধারাগিরি আমরা যাব কি না। আমি ফুলডুংরি পাহাড়ের কোলে গালুডি রোডের ধারে যে আম গাছ, ওখানে বসে রইলুম—ছেলেটি এসে আমায় খবর দিলে। গাড়ি ঠিক হয়ে গেল। পরদিন সকালে আমরা তিনখানা গাড়ি করে সবাই মিলে (বৌমা ও নুটু তখন ওখানে নেই) রওনা হই। ধারাগিরির পথের শোভা, বিশেষতঃ পাশটার শোভা দেখে আমার দার্জ্জিলিং অকল্যাণ্ড রোডের কথা মনে পড়ল। তবে অকল্যাণ্ড রোড শহরের মধ্যে—আর এর চারিধারে শ্বাপদ অধ্যুষিত বিজন অরণ্যভূমি—এই যা পার্থক্য। সেখানে ঝর্ণার ধারে বসে কল্যাণী যখন রান্না করচে—তখন আমি 'পথের দাবী' পড়চি। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগল যে গত ১৯২৬ সালে ভাগলপুরে থাকতে সুরেন গাঙ্গুলীর পল্লী-ভবনে বসে আমি প্রথম 'পথের দাবী' পড়ি। সেও বিহারে, এবারও পড়লাম বিহারে। তখন এও জানতুম না আমায় আবার বিয়ে করতে হবে। জীবনের জটিল রহস্যের সন্ধান কে কবে দিতে পেরেচে?

খাওয়া-দাওয়ার পরে কল্যাণী, উমা, আমি ও সৌরীনবাবুর ভাইপো পাহাড়ে উঠে ধারাগিরি ঝর্ণার ওপরের অংশে গিয়ে কতক্ষণ বসলুম। ফিরবার পথে শালবনে কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠল!

গত সোমবারে ওখান থেকে দুপুরের ট্রেনে রওনা হয়ে মেসে এলুম সন্ধ্যার সময়।

নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার দু'দিন বন্ধ। সময় নষ্ট করি কেন? তখুনি ট্রেনের খোঁজে শেয়ালদ' গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ছাড়ছে। তাতে উঠে চলে গেলুম রাণাঘাট—খিনুদের বাড়ি গিয়ে উঠি। তারা চা খাওয়ালে। খিনু অনেকক্ষণ গল্প করলে। পরদিন ভোরের ট্রেনে গোপালনগরে এসে নামলুম—নিজের দেশের মাটিতে পা দিতেই যেন শরীর শিউরে উঠল। সেই আবাল্য পরিচিত প্রথম কার্ত্তিকের বনঝোপের সুগন্ধ, বনমরচে লতায় থোকা থোকা ফুল-ফোটা, সেই স্নিগ্ধ হেমন্তের ছায়া। গোপালনগর বাজারে রায়সাহেব হাজারি প্রথমে ডাক দিলে, তারপর পাঁচু পরামাণিকের দোকানে সেই কুণ্ডুমশায়—যুগল ময়রার দোকানে বসে টাটকা তেলেভাজা কচুরী কিনে খেলুম—বিষ্ণু জল দিলে খেতে। বাড়ি আসতে আটটা বেজে গেল। বুড়ী পিসীমার বাড়ি ন'দি বসে গল্প করচে—ওদের দাওয়ায় গিয়ে বসি—ঘাটশিলা ও কল্যাণীর পাহাড়ে ওঠার গল্প হয়। নদীতে স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ নদীজলের স্নেহস্পর্শে যেন সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। নদীর তীরে বনঝোপের কি মায়া, বনসিমলতার ঝোপের কি ঘন ছায়া, থোকা থোকা বেগুনি রংয়ের বনসিমলতার ফুল ফুটেচে—বনমরচে ফুলের সুবাস সর্ব্বত্র। মন ভরে গেল আনন্দে, এমন আনন্দ আর কোথাও পাই নি মুক্ত কণ্ঠে তা স্বীকার করি। বাল্যের কত স্মৃতি মিশিয়ে আছে এই সুবাসের সঙ্গে—তা কত গভীর, কত করুণ! জিতেন কামারের বাড়িতে সুরপতি মিস্ত্রী রোয়াক গাঁথচে—সেখানে ইন্দু রায় নিয়ে গিয়ে বসালে পরদিন সকালে। মুচুকুন্দ চাঁপার তলায় পতিত, গজেন, মনো রায়, ফণিকাকা মিটিং বসিয়েচে। সেখানে এলো হাজারি ঘোষের জামাই লালমোহন। তার সঙ্গে ওরা স্কুলের মাস্টার বরখাস্ত করা নিয়ে বাধালে ঝগড়া। আমি সরে পড়লুম বেগতিক দেখে। বৈকালে নৌকোয় গুটকে ও আমি বনগাঁ এলুম—যেন জাহ্নবীর বাসা এখনো আছে—ছুটির পরে সেখানে যাচ্চি। লিচুতলায় এসে মনোজ, জয়কৃষ্ণ, যতীনদার সঙ্গে বসে ভ্রমণ-কাহিনী বর্ণনা করি। বিকেলে শুধু ছিলুম সরোজ ও আমি, মন্মথদাও। 'সন্ধ্যাবেলায়' গোপালদা, যতীনদা, জয়কৃষ্ণ, মনোজ, মন্মথদা ও বিনয়দা। খুব জ্যোৎস্না। কাল গেল জগদ্ধাত্রী পূজো। আজ সকালে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা এসেচি। আজ বৃহস্পতিবার, এইমাত্র বারবেলা থেকে এলুম—আর কেউ ছিল না, রাম, বুদ্ধদেববাবু ও আমি।

এইমাত্র ঘাটশিলা থেকে এলুম ফিরে। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে বারাকপুর গিয়েছিলুম আবার। ফুচু স্টেশনে এসেছিল—ছটা ডিম নিয়ে রাঁধতে দিলুম মানুকে বাড়ি পৌঁছে। খুব জ্যোৎস্না। পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

কুঠীর মাঠে বেড়িয়ে এসে ন'দির সঙ্গে একটু বসে গল্প করি। শিউলি ফুলের সুবাসের সঙ্গে বনমরচে ফুলের গন্ধ মিশিয়ে জ্যোৎস্নারাত্রি মধুর করে তুলেচে শত অতীত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনে। ফণি রায়ের পরিবারবর্গ থাকে বন্ধুদের বাড়ি। কতদিন পরে ওদের বাড়ি বসে চা খেলুম। তারপর গদা কামারের বাড়ি গিয়ে ইন্দু, গজেন, অমূল্য কামার প্রভৃতির সঙ্গে গান করি ও শুনি। পরদিন সকালে হয়তো বনগাঁ থেকে সবাই পিক্‌নিক্ করতে আসবে। ন'দি ও বুড়ী পিসীমার সঙ্গে গল্প করি মানুদের দাওয়ায়। পরদিন সকালে এলো খোকা ও সুরেন। স্নান সেরে বনমরচে ফুলের সুগন্ধের মধ্যে রইলুম বসে কতক্ষণ। তারপর চলে আসি বনগাঁ।

শুক্রবার মন্মথদার আড্ডা।

আজ ফিরচি ঘাটশিলা থেকে এইমাত্র। গত রবিবারে আবার ধারাগিরি গিয়েছিলুম—মিতেরা ও আমরা। এবার pass-এর নীচে সেই খরস্রোতার খাদ থেকে

কুলুকুলু নদীজলের সঙ্গীত আমাদের কানে মধু বর্ষণ করলে। বন্য পিটুলিরা, শিউলি—আরও কত কি বন্য ফুল ফুটেচে বনে। ধারাগিরি যাওয়ার পথে গ্রাম ঝর্ণার কাছে আমরা চা খাচ্চি বসে—এমন সময় নুটু আর সুরেশ সাইকেলে করে এসে যোগ দিলে আমাদের সঙ্গে। তারপর ধারাগিরি পৌঁছে কল্যাণী, মিতের বৌ ওরা চড়ালে খিচুড়ি—আমরা উঠলুম পাহাড়ে—মিতে ও আমি। ওপরের সেই দুরারোহ পথ ধরে আমরা গেলুম ধারাগিরির স্রোত ধরে আরও নিবিড় বনের মধ্যে। বড় বড় শাল, আম ও মোটা মোটা লতা—বন্য বিহঙ্গের কাকলি এখানে অপূর্ব্ব। মিতে একমনে শুনতে লাগল। কত বন্য কুসুমের সৌরভ—আর সর্ব্বোপরি অসীম নিস্তব্ধতা। সোরু-ঝর্ণার শিখা-নৃত্য—জ্যোৎস্নারাত্রে শিলাখণ্ডে ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্যের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বনদেবীরা বাস করেন এ বনে। এসে খিচুড়ি খাওয়ার পূর্ব্বে ঝর্ণায় স্নান সমাপন করি। তারপর খাওয়া সেরে গরুর গাড়িতে রওনা। আবার সেই ঘাটটা সন্ধ্যার ছায়ায় অতিক্রম করি। ঘন বন নীচে, হাতী তাড়াবার জন্যে স্থানে স্থানে গাছের ওপরে মাচা। ভাত রেঁধে খাচ্চে বনের মধ্যে। আমরা আগে আগে—মিতেদের গাড়ি পেছনে। মিতে সকলের পেছনে হেঁটে আসচে। কল্যাণীর সঙ্গে আমি আসচি। নুটু ও সুরেশ সাইকেলে সবার পেছনে। দ্বিতীয় ঝর্ণা পার হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্রমে নক্ষত্র উঠল—ছায়াপথ জম্ জম্ করতে লাগল। এখানে ওখানে উল্কা খসে পড়তে লাগল। রাত ন'টায় আমরা বাড়ি ফিরে ওবেলার রান্না খিচুড়ি খাই। উমা ও শান্তি এবার যায় নি।

মধ্যে আবার ঘাটশিলা গিয়েছিলুম। সাদা পাথরের স্তূপটার ওপর বসে কল্যাণীকে নিয়ে গল্প করেছিলুম জ্যোৎস্নারাত্রে। তবে এবার বিশেষ দূর কোথাও বেড়ানো হয় নি—মিতের সঙ্গে ফুলডুংরির নীচের বনটায় একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়ে বসেছিলুম। গত সপ্তাহে গিয়েছিলুম বনগাঁ, বাড়ি বদল করে আমরা গিয়েচি বিনয়দার শ্বশুর নুটু মুন্সেফ যে বাসায় থাকত—সেই বাসাটায়।

কাল রাত্রে শৈলজার 'নন্দিনী' বইখানা দেখে এলাম। বাঙালীর মনে যে কান্নার ফোয়ারা যোগাতে পারবে, সেই হাততালি পাবে। এ ছবিখানাতেও অনেকদিন পরে পুনর্মিলনের প্যাঁচ কষে দর্শকের চোখে জল আনার যথেষ্ট সুব্যবস্থা। তবে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েচে ছবিখানা, এটা বলতেই হবে। কথাবার্তাও স্বাভাবিক। সুকৃতি ও আমি গিয়েছিলাম 'রূপবাণী'তে, শৈলজা আমাদের ফার্স্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলে, গল্প করলে অনেকক্ষণ কাছে বসে। ছবি ভাঙলে বাসে চলে এলুম। মিতে কাল বিকেলে এসেছিল, আজ ঘাটশিলা এতক্ষণ গিয়ে পৌঁছেচে।

আজ কোন কাজ ছিল না, ওবেলা বসে বসে পরীক্ষার কাগজগুলো দেখলুম স্কুলের (Class) ছেলেদের—তারপর রমাপ্রসন্নের বাড়ি বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল গৌর পালের সঙ্গে। স্কুল ও কলকাতা দুইই ছাড়ব শিগগির। যেখানে যা আগে আগে করতাম—তা আর একবার ঝালিয়ে নিচ্চি। যেমন, আজ এবেলা গেলুম সাঁতরা-গাছি ননীর বাড়ি, জতু নেই, তার মার সঙ্গে বার হয়ে গিয়েচে। ননীর কাছে বসে বসে ঘাটশিলা ও কল্যাণীর গল্প করলুম, ধারাগিরির বর্ণনা করলুম—মাস্টার মশাইও ছিলেন। তিনি আবার কোথায় যাত্রা হচ্চে বলে উঠে চলে গেলেন—আমরা বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করি, কল্যাণীর চিঠি ওকে পড়িয়ে শোনাতে হল। ননী বড় প্রকৃতি-রসিক, বল্লে—আমি ঘাটশিলা যাব বেড়াতে। আমি ওকে যেতে বলেচি।

একটা নতুন জীবনের শুরু। এখনও চাকরিতে আছি. কিন্তু ১লা জানুয়ারী ১৯৪২ থেকে চাকরি ছেড়ে দেব। সেটা কাগজে কলমে অবিশ্যি. আসলে ছেড়েই দিয়েচি। বেশ স্বাধীন জীবনের আস্বাদ এখন থেকেই পাচ্চি। ঘাটশিলাতে এসেচি —কলকাতা থেকে আসবার সময় জাপানী বোমার ভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নরত জনতার ভিড়ের মধ্যে অতি কষ্টে ইন্টার ক্লাসে একটু জায়গা করে নিলাম। প্রথমটা মনে হয়েছিল জায়গা পাব না—সেকেন্ড ক্লাসের টিকিট কাটব।

অনেক পরে মেস্ ছেড়ে দিলুম এবার। রাত্রে আমার এক ছাত্র এসে মেসেই শুয়ে রইল—শেষরাত্রে উঠে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকারের মধ্যেই দুখানা রিক্শা করে ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছানো গেল। ১৯২৩ সালে কলকাতায় মীর্জ্জাপুর স্ট্রীটের মেসে ঢুকেছিলাম—সেই থেকে ওই একই মেসে. একই অঞ্চলে কাটিয়েচি। কতকাল পরে মেসের জীবন ছেড়ে দিয়ে চলে এলাম। বহুদিনের পুরোনো কাগজ-পত্র বিক্রি করে ফেললাম। বোঝা বাড়িয়ে লাভ কি! পুরোনো কাগজপত্রের ওপর মায়াবশতই তাদের এতদিন ছাড়তে পারি নি– আজ জাপানী বোমার হিড়িকে যে সেগুলো ছেড়ে এলুম তা নয়—আনবার জায়গা নেই–এনে ঘাটশিলায় এই ছোট বাড়িতে রাখি কোথায়?

রোজ সকালে শালবনে এসে বসে লেখাপড়া করি। মিতেরা এখানে ছিল. ভয় পেয়ে চলে গিয়েচে। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেচে. দিগন্তনীল শৈলশ্রেণী ও প্রান্তরে অপূর্ব্ব শোভা। এই সব পরিপূর্ণ অবকাশের মধ্যে দিয়ে চমৎকার ভাবে উপভোগ করি— অবশ্য অবকাশের সময় এখনও ঠিক আসে নি—কারণ এ সময় তো বড়দিনের ছুটি আছেই—চাকরি যে ছেড়ে দিয়েচি—সে জ্ঞানটা এখনও এসে পৌঁছয় নি মনে। তার ওপর জাপানী বোমার ভয়। মৌভান্ডার কারখানা কাছে—সবাই বলচে. এখানে কি বোমা না পড়ে যায়!

অনেকদিন পরে আমার রিপন কলেজের সহপাঠী বন্ধু কল্যাণের সঙ্গে সেদিন দেখা হল নদীর ধারে স্বামীজীর আশ্রমে। তাকে বাড়ি নিয়ে এসে চা খাইয়ে দিলাম। তার পরদিন বিকেলে ওকে নিয়ে বেড়িয়ে এলাম 'বিজয় কুটির' পর্যান্ত ও নুটুর ডাক্তারখানা।

দেশে এসে বহুদিন পরে বারাকপুরে বাড়ি সারিয়ে বাস করচি। বৈশাখ মাসের প্রথমে এখানে এলুম—এর আগে চালকীতে ছিলাম। বেশ লাগচে—গোপালনগরে স্কুলে মাস্টারি করি। রোজ মর্নিং স্কুল থেকে ফিরে নদীতে স্নান করে আসি। বেশ লাগে।

আজ সকালে প্রায় দুমাস পরে এই ডায়েরী লিখচি। ক'দিন খুব বর্ষা গেল— আজ পরিষ্কার আকাশে ঝলমলে রোদ। আকাশের কি অপূর্ব্ব নীল রং! আমি রোয়াকের ঠেস্ বেঞ্চিটাতে বসে লিখচি। সবুজ গাছপালার ডালের ওপরে অয়স্কান্ত মণির মত উজ্জ্বল নীল আকাশ। আজ 'অনুবর্ত্তন' বইখানা লেখা শেষ করে কপি পাঠিয়ে দিলাম।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘাটশিলায় গিয়েছিলাম দিন দশ-বারো। রোজ ফুলডুংরিতে বেড়াতে যেতুম। একদিন শালবনের মধ্যেও বেড়াতে গিয়েছিলাম। সুবোধবাবু একদিন এসে রাখামাইনস পর্যন্ত নিয়ে গেল।—সুবর্ণরেখা পার হয়ে ধনঝরি পাহাড়ের দিকে চোখ রেখে বসলুম. কি অদ্ভুত শোভা! হেঁটে গালুডি এলুম.

প্রোফেসার বিশ্বাসের বাড়ি খেয়ে চলে এলুম বাড়ি।

বারাকপুরে কল্যাণী ও আমি রোজ নদীর ঘাটে নাইতে যাই দুবেলা। ওপারে মাধবপুরের চরের দৃশ্য বড় সুন্দর। অস্তদিগন্তের নানা রঙে রাঙিন মেঘস্তূপ ভরা আকাশ যখন মাধবপুরের চরের ওপর ঝুঁকে থাকে, তখন সত্যই অদ্ভুত শোভা হয়।

এ সময় এখানে আর এক দৃশ্য। বিলবিলের জলে সকালে নুঁদিদি কাপড় কাচচে, খয়েরখাগী গাছের কাঁটাল পাড়া হচ্চে খুড়ীমাদের, সাদা সাদা তেলাকুচো ফুল ফুটেচে খুকুদের লেবু গাছটায়, আমার ঠেস্ বেঞ্চির পাশে—বেশ পরিচিত দৃশ্য। তবে এ সময় আষাঢ় মাসের ২১শে পর্য্যন্ত কখনো বারাকপুরে আসি নি। ৭।৮ই আষাঢ় চলে যাই ফি-বছর। ১৯২৮ সালে কেবল ছিলাম—তারপর আর থাকি নি। যে বছর বোর্ডিংয়ে যাই, তার আগের বছর ছিলাম। বারাকপুরে বর্ষা-দিন যাপনের সৌভাগ্য এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কখনো হয় নি।

গৌরীর কথা কাল রাত্রে মনে পড়ল। কল্যাণীর কাছে গৌরীর কথা বল্লুম। এই সময় আমরা কি করতাম, কাল ছিল সেই দিন, যেদিন বহুকাল আগে আমি মাঝের গাঁ থেকে হেঁটে এসেছিলুম, গৌরীকে প্রথম নিয়ে এসেছিলুম এই গাঁয়ে।

কল্যাণীকে কোলাঘাটে নিয়ে যাব সামনের শনিবারে। ও এখন চার-পাঁচ মাস সেখানে থাকবে।

অনেকদিন পরে আকাঙ্ক্ষিত বারাকপুরের জীবনকে আবার ফিরিয়ে পেয়েচি। বাল্যদিনের পরে এই আবার। এখানে সংসার করচি বহু দিন পরে। নতুন সংসার নতুন ঘর-কন্না। এই চেয়ে এসেছিলুম বহুদিন থেকে। এখন আমি জীবনে দর্শক মাত্র নই, জনৈক অভিনেতাও বটে।

ওগো সখি, ওগো মোর প্রিয়া, তব স্মৃতিখানি
মধুমাখা আঁকা রবে মম হৃদিতলে
চিরদিন। বহু প্রীতি ভালবাসা দিয়ে
এ জীবনে রাঙাইলে স্বপ্নমাধুরিমা,
ভুলিবার নহে যাহা কভু। নিশীথের মর্ম্মর
বাতাসে, অবিশ্রান্ত বিহগ-কূজনসনে—
কত নিশা, কত জ্যোছনা-যামিনী,
শরতের শান্ত সন্ধ্যা—পউষের স্বর্ণরাঙা মধুর বৈকা
আমারে হেরিয়া প্রীতিপূর্ণ হাসিমাখা ডাগর নয়নে
সিঞ্চিয়াছ স্বর্গের অমৃত। কত ঢিল
ফেলা অতর্কিতে মোর ঘরে, কিশোরীর
কত চঞ্চলতা মাঝে মন মম
ঘুরিয়া ফিরিবে। বকুলের তলে কত গল্প
নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে। যবে ঘাট
থেকে সিক্তদেহে, আসিতে উঠিয়া—
আমি কত ছল করি লোভাতুর
দৃষ্টি মেলে রহিতাম চাহি—
বলিতাম—বড় ভাল দেখি তোরে স্নানার্দ্র বসনে।
তুমি হেসে শাসনের ছলে তর্জ্জনী
তুলিয়া চলে যেতে দ্রুতপদে। সিক্ত
চরণের দুটি চিহ্ন বহু যুগ ধরি
আঁকা রবে সে ঘাটের মৃত্তিকার পথে।

হে অরণ্য কথা কও

'বন্ধুবর বিজয়রত্ন কবিরাজকে'

বড় রচনার ফাঁকে ফাঁকে—দৈনন্দিন কাজের মধ্যে এমন কিছু লিখতে ইচ্ছে করে যার সঙ্গে প্রতিদিনকার ইতিহাসের কিছু যোগ থাকে, অথচ যা খুশি তাই লেখা যায়, মনের মধ্যে যখন যে ভাব ফেনিয়ে ওঠে—ভাল সাহিত্যের দরবারে যে সব কথার জবাবদিহি করতে হয় না। তাই থেকেই ডায়েরী লেখার শুরু—এগুলো যে কোন দিন ছাপার মুখ দেখবে তা মনে ছিল না। প্রকাশকের চাপে হঠাৎ একখণ্ড ছাপা হল—তারপর আরও, তৃণাঙ্কুর, ঊর্ম্মিমুখর, উৎকর্ণ। পাঠকরা আগ্রহ করে পড়েন এর স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েই ডায়েরীর এই ক-টা পাতা ছাপতে সাহস পাওয়া গেল।...অরণ্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা যেখানটায় বেশী, বর্ত্তমান গ্রন্থে সেই সব অংশগুলোই প্রকাশ করা হয়েছে। ইতি।—

কাল বারাকপুরে ফিরে এসেচি সুদীর্ঘ ন'মাস পরে। আগের ডায়েরী লেখার পর দশ-এগারো মাস কেটে গিয়েচে। গত আষাঢ় মাসেই কল্যাণী অসুখে পড়ে, ভাদ্র মাসে একটি কন্যাসন্তান হয়ে মারা যায়—তারপর কল্যাণী একটু সেরে উঠলে গত ১৫ই ভাদ্র ওকে নিয়ে যাই কোলাঘাটে শ্বশুরবাড়ীতে। শ্বশুর মশায় তখন ছিলেন কোলাঘাটে, গত পূজার সময় যে ভীষণ ঝড় হয় সে সময় আমি তখন ওখানেই। তারপর ওঁরা চলে গেলেন ঝাড়গ্রামে, কল্যাণীও সঙ্গে গেল, সেখান থেকে আমরা গেলুম ঘাটশিলা গত কার্ত্তিক মাসে। এতদিন ওই অঞ্চলেই ছিলুম, কাল এসেচি এখানে।

মঙ্গলবার দিন যখন গাড়ী এসেচে খড়গপুর, তখন বাংলা দেশের ঘাসভরা মাঠ, টলটলে জলে ভর্ত্তি মেদিনীপুর জেলার খাল বিল দেখে আমাদের ইছামতীর কথা মনে পড়লো। খড়গপুর থেকে তখন সবে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ছেড়েচে, কল্যাণী বলে উঠলো—"আজই চলো বারাকপুর যাই, ইছামতী টানচে।"

আমারও মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে তখন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামটির জন্যে। যত দেশ-বিদেশেই বেড়াই, যত পাহাড়-জঙ্গলের অপূর্ব্ব দৃশ্যই দেখি না কেন, বাল্যের লীলাভূমি সেই ইছামতীর তীর যেমন মনকে দোলা দেয়—এমন কোথাও পেলাম না আর। কিন্তু সেদিন আসা হোলো না, এই ক'দিন কাটলো কলকাতা ও ভাটপাড়ায়। তারপর কাল বনগাঁ হয়ে বাড়ী এসেচি কতকাল পরে।

চোখ জুড়িয়ে গেল বাংলার এই বন-ঝোপের কোমল শ্যামলতায়, তৃণভূমির সবুজত্বে, পাখীর অজস্র কলরোলে। সিংভূমের রুক্ষ, অনুর্ব্বর বৃক্ষ-বিরল মরুদেশে এতকাল কাটিয়ে, যেখানে একটা সবুজ গাছের জন্যে মনটা খাঁ খাঁ করে উঠতো, মনে আছে কাশিদার সেই বাঁধের ধারে খানিকটা সবুজ ঘাস দেখে ও সেদিন রাজবাড়ী যাবার পথে একজনদের বাড়ী একটা ঝাঁকড়া পত্রবহুল বৃক্ষ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে ছিলাম-- সেই সব প্রস্তরময় ধূসর অঞ্চল থেকে এসে এই পাখীর ডাক, এই গাছপালার প্রাচুর্য্য কি সুন্দর লাগছে! যেন নতুন কোন দেশে এসে পড়েচি হঠাৎ, বাল্যের সেই মায়াময় বনভূমি আমার চোখের সামনে আবার নতুন হয়ে ফিরে এসেচে. সব হয়ে উঠেচে আজ আনন্দ-তীর্থের পুণ্য বাতাস-স্পর্শে আনন্দময়, নতুন চোখে সব আবার দেখচি নতুন করে। আজ ওবেলা ইছামতীতে নাইতে নেমে সে কি আনন্দ! ও পারের সেই সাঁইবাবলা গাছটা, আর বছর আমি আর কল্যাণী নাইতে নেমে যে গাছটার ডালপালার মধ্যে আটকে-পড়া অস্ত-সূর্য্যের রাঙা রোদের অপূর্ব্ব শ্রী মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখতাম—সে গাছটা তেমনি আছে। তারপর বিকেলে নগেন খুড়োর ছেলে ফুচুর সঙ্গে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই নাবাল জমিটার ধারে নরম সবুজ ঘাসের উপর বসে ভাবছিলাম গত মার্চ মাসে দেখা মানভূমের সেই নার্কাটি-টাঁড় বনের কথা, মানভূমের বৃক্ষলতাহীন পথের কাঁকর ছড়ানো টাঁড়ের কথা, বামিয়াবুরু ফরেস্টে উনিশ শো ফুট উঁচু পাহাড়ে সেই রাত্রিযাপনের কথা, চাঁইবাসাতে ভবানী সিং ফরেস্ট অফিসারের বাড়ীর বিস্তৃত কম্পাউণ্ডে বসে গত চৈত্র সংক্রান্তির অপরাহ্ণে চা খেতে খেতে দূরবর্ত্তী বরকেলা শৈলমালার আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার সে দৃশ্যের কথা--মাঠাবুরু পাহাড়ে শালবনের মধ্যের উঁচু পথ দিয়ে কাঠ-কয়লা মাথায় করে বয়ে নামাচ্চে যে হো মেয়েরা, যাদের মজুরী চারবার দুর্গম পথে ওঠানামা করলে মাত্র সতেরো পয়সা, তাদের কথা —গত পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমায় বহরাগড়া থেকে কেশুর-দা রিজার্ভ (বাঁশের) ফরেস্ট দেখতে যাওয়া ও বগরাচোড়া গ্রামের সেই উড়িয়া ব্রাহ্মণ ও গ্রাম্য স্বর্ণ বাউড়ি দেবীর মন্দিরের পাশে স্তূপীকৃত প্রাচীন পাথরের দেব-দেবীর হাত-পা ভাঙা মূর্ত্তিগুলির কথা। বাঘমুণ্ডী পাহাড়ের মাথায় সেদিন দুপুরে আমি, সুবোধ ও সিন্‌হা

সাহেব বসে ছিলাম, শৈলসানুতে বসন্তের পুষ্পিত লতা, পলাশ ও গোলগোলি, নীচের উপত্যকায় অজস্র ঘেঁটু ফুল। সুবোধ ঘোষ 'আরণ্যক' পড়ে শোনাচ্ছে সিন্‌হা সাহেবকে আমি বসে বসে একদৃষ্টে বাঘমুণ্ডী শৈলারণ্যের সে সুন্দর রূপ দর্শন করচি, সেই শঙ্খ ও শোভা নদীর কথা (কি চমৎকার নাম দুটি। শঙ্খ ও শোভা!)—এই সব কত কি ছবি গত ক'মাসের স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে হাত্‌ড়ে বার করে দেখচি মনের চোখে আর চোখ চেয়ে দেখচি বাংলা দেশের যশোর জেলার এক ক্ষুদ্র পল্লীর মাঠে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্যের সামনে বসে, সামনে আমার শৈলমালার ampitheatre-এ ঘেরা ভাল্‌কী ফরেস্ট নয়, (হঠাৎ মনে পড়লো ভাল্‌কী ফরেস্টের মধ্যে আমার আবিষ্কৃত সেই অপূর্ব্ব বন্য সরোবর "লিপুদারা"র কথা, সেই উত্তুঙ্গী চুনা পাথরের শৈল-গাত্র, সেই নটরাজ শিবের মত দেখতে সাদা গাছটা যার নাম আমি রেখেছিলুম শিববৃক্ষ, সেই লিপুকোচা গ্রামের লোকদের সন্ধ্যার অন্ধকারে বন্য হস্তীর ভয়ে মশাল জ্বালিয়ে আমাকে ও ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হাকে আমাদের বনমধ্যস্থ তাঁবুতে পেঁাছে দেওয়া), এ হোল আসসেওড়া, বাঁড়া, শিমুল কেঁয়োঝাঁকা গাছের বন, চারিদিকে ছায়া-ভরা অপরাহ্নে কোকিল-কূজনে চমক ভেঙে যায় যেন, ভাবি এ বাংলা দেশ, বাংলা, চিরকালের বাংলা মা। নতুবা এত বিল্বপুষ্পের সুগন্ধ কোথায়? এত পাখীর ডাক কোথায়? যারা চিরদিন গ্রামে পড়ে থাকে, তারা কি বুঝবে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মহনীয় রূপ, তাদের মন তো আকুল হয়ে ওঠেনি বাংলার বাঁশবনের ছায়ায় ঘাটের ধারের মাটির পথে বেড়াবার জন্যে, চোখ পিপাসিত হয়ে ওঠেনি একটু সবুজ বনশ্রী দেখবার জন্যে?

রাত অনেক হয়েচে। আমি ডায়েরী লিখচি, কল্যাণী পাশে শুয়ে বই পড়চে। অনেক দিন পরে দেশে এসে ও খুব খুশি। আজ বলচে ওবেলা, "আমাদের এ বাড়ীটা কেমন ভালো, কেমন ছাদ—না? সত্যি, বাড়ীটা আমারও ভাল লাগচে। ঘন ছায়াভরা বাগান ও বনে ঘেরা, ঐ বড় বকুল-গাছটায় বাল্যদিনের মত জোনাকীর ঝাঁক জ্বলচে জানালা দিয়ে দেখচি, বিলবিলের ডোবায় কট্‌কটে ব্যাঙ ডাকচে আর বনে ঝোপে কত কি কীটপতঙ্গ যে কুস্বর করচে তার ইয়ত্তা নেই।

আবার মনে পড়চে সেই কতদূরের শঙ্খ ও শোভা নদীর তীর, গভীর নাকটিটাঁড়ের বনমধ্যস্থ কৃষ্ণ প্রস্তরের রসই গণ্ডশৈল ও আদিম মানবের চিহ্নযুক্ত গুহা, ভাল্‌কী জঙ্গলে বন্য বরমকোচা গ্রামের সেই মুণ্ডা যুবতীটি, যে আমায় বলেছিল—"তুই কি করচিস এ বনে আমাদের? ভালো ভালো জায়গা দেখে বেড়াচ্ছিস্ বুঝি?" অবিশ্যি এত ভাল বাংলায় বলেনি।

আর মনে পড়চে নিমডির বনে সেই পলাশ ফুলের শোভা গত বসন্তে ও মাঠা গ্রামের সাঁওতালের মত চেহারা সেই ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যের কথা। সুদূর নাকটিটাঁড়ের বন ও বন্য শঙ্খ নদীর তীরবর্ত্তী জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শিলাসন। সাঁওতালের মত দেখতে, মিশ কালো—নাম বল্লে, ভুবনেশ্বর বাঁড়ুয্যে। আমি চমকে উঠেছিলাম।

বাইরে হঠাৎ গিয়ে দেখি কৃষ্ণা চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ উঠেচে—বাইরে জ্যোৎস্না। কল্যাণীকে ডেকে নিয়ে বাইরে গিয়ে বসলুম। খুব বৌ-কথা-কও পাখী ডাকচে। বাঁশবনে রাতজাগা আর একটা কি পাখী ঠক্ ঠক্ শব্দ করচে। বাংলা পল্লীর জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ প্রাণ ভরে দেখি কত রাত পর্য্যন্ত বসে বসে।

খুকু নেই বারাকপুরে, বিয়ে হয়ে এখান থেকে চলে গিয়েচে কোথায় তার শ্বশুর-বাড়ী—সেখানে। বহুদিন দেখা হয়নি তার সঙ্গে।

জীবনই এ রকম, এক যায়, আর আসে।

মহাকালের বিরাট পটভূমি নিত্য, শাশ্বত—তার সামনে জগতের রঙ্গমঞ্চে কত নরনারীর আসা যাওয়া!

ভালো কথা, গত মাঘ মাসে কলকাতায় সুপ্রভার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তার একটি খুকী হয়েচে, নাম তার রেখেছে রাখী, বেশ খুকীটি। সুপ্রভা আমার খুকীর কথা কত জিজ্ঞেস করলে।

রেণুর সঙ্গেও এবার কলকাতায় দেখা, সে বেথুনে পড়চে সেকেন্ড ইয়ারে। বোমা পড়বার তৃতীয় দিনে তারা পালিয়ে গেল কলকাতা থেকে তাদের দেশে। এখনও ফেরেনি দেখে এলুম।

এখানে এসে জীবন আরম্ভ করেছি আট মাস পরে। আজ সকালে ইছামতীতে নাইতে নেমেছি, বেলা ৮৷৷টা হবে, শান্ত নদীজল, ওপারে সবুজ ঘাসেভরা মাঠ ও ঝিঙে-পটলের ক্ষেত, এপারে ফণি চক্কত্তির জমির বাগান, সাঁইবাবলা ও শিরীষ গাছের আঁকা-বাঁকা ডাল-পালার সৌন্দর্য্য। কোকিলের ছেদহীন কূজন সকালের আকাশ যেন ভরিয়ে রেখেচে, প্রস্ফুট তুঁত ফুলের সুবাস বাতাসে। কালু মোড়লের ছেলে গনি ও নগেন খুড়োর ছেলে ফুচু ঘাটে নাইচে। গনি আমের চালান নিয়ে গিয়েছিল নফর কোলের বাজারে। একচল্লিশ দিন কলকাতায় ছিল, আজ এসেচে। দেশে এসেচি আজ চারদিন, এখনও এখানকার নতুনত্ব কাটেনি। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে যে কত সৌন্দর্য্য তা দেখবার সুযোগ ও সুবিধা কি সকলের ঘটে? চৈতন্যকে প্রসারিত করে দেওয়া চাই, নতুবা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে কিছুই হয় না। মনকে তৈরি করে নিতে হয় এজন্যে, এর সাধনা চাই। বিনা সাধনায় কিছু হয় না। উচ্চতর অনুভূতির জন্যে মনের আকূতি সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। আকূতি থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

আজ হাওড়া সঙ্ঘ থেকে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে সভাপতিত্ব করবার তাগিদ এল।

কলকাতা থেকে ফিরেচি কাল বৈকালে। ইউনিভারসিটির মিটিংএ সেখানে অনেকদিন পরে সুনীতিবাবু ও বহু পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা। মায়াদি ও বেলুকে নিয়ে রাত ৯টার সময়ে বাণী রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কলকাতার অন্ধকার ভরা রূপের সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল। গ্রামে ফিরলুম রবিবার বৈকালে, বেশ একটু মেঘবৃষ্টি দেখা দিলে, সামান্য একটু কাল-বৈশাখী বৈশাখের বিকেলে। তারপরেই আকাশে দেখা দিলে রাঙা মেঘস্তূপ, আমি বেড়াতে গেলুম নদীর ধারের মাঠে, গাছপালার কি চমৎকার সৌন্দর্য্য। মুগ্ধ করে দেয় আমাকে, চেয়ে দেখে সত্যিই বিস্ময় লাগে। কত কি গাছ, কত ধরনের পাতা। বিশ্বরূপের কত কি রূপ! যেদিকে চোখ পড়ে অবাক চোখে চেয়ে থাকি। বরোজপোতার বাঁশের বনে কচু ঝাড়, বেত গাছের মত পাতা কি একটা গাছ, তারই পাশে বাঁশের ডগা নত হয়ে আছে —নিভৃত নিরালা বনভূমি, কোথায় সেই নাকটিটাঁড়ের শালবন করন্ধা পুষ্প-সুবাসিত অপরাহ্নের বাতাস, মাঠাবুরু পাহাড়ের শিখররাজি। বিরাট হস্তীমুণ্ডের মত পরিদৃশ্যমান কাঁড়দাবুরুর শিখর—আর কোথায় বাংলার শ্যাম সৌন্দর্য্য। নদীজলে বিকেলে নাইতে নেমে ইছামতীর কালো জলে দেখি ভগবানের আর একটি রূপসৃষ্টি।

যিনি অগ্নিতে যিনি জলেতে
যিনি শোভন এ ক্ষিতিতলেতে

উপনিষদের ঋষিরা শুধু দার্শনিক ছিলেন না, দ্রষ্টা ছিলেন, কবি ছিলেন।

পরশু এলুম উত্তরপাড়া রাজবাড়ীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব সম্পন্ন করে। মাস্টার মশায় অতুল গুপ্ত, সজনী, বুদ্ধদেব, বাণী রায় সবাই এক সঙ্গে যাওয়া গেল। বেশ

মজা করে মিটিং করা গেল—ভাটপাড়ার আকাশলতার সঙ্গে দেখা হল অনেকদিন পরে —প্রায় আঠারো বছর পরে। ঘটে গেল জিনিসটা আমার সেই গল্পটির মত। একটি ছোট ছেলে এসে বল্লে, "আপনাকে আমার মা ডাকচেন।"

গেলুম একটা পুরোনো দোতলা বাড়ী—রাজা জ্যোৎস্নাকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদের সামনে।

একটি মেয়ে এসে ঝুপ্ করে নীচু হয়ে পায়ের জুতোর উপর দুহাত বুলিয়ে বল্লে—"দাদা, কেমন আছেন? কি ভাগ্যি যে আপনি এলেন এখানে!"

—"ও, আশা না?"

"হ্যাঁ দাদা। এখন বড়-মানুষ হয়ে গিয়েচেন—আপনি কি এখন গরীব বোনকে চিনতে পারবেন?"

ঠিক একটি ছোট গল্প। কিছুদিন আগেই এ গল্প আমি লিখেচি কি একটা কাগজে।

পরদিন ফিরলুম বনগাঁয়ে। স্টেশনে নেমে অম্বরপুরের একখানা গরুর গাড়ী যাচ্চে—তাতেই চড়ে বসলুম—প্রথম শেওড়া গাছ ভাট গাছ দেখে আমার কি আনন্দ!

এবার বিভূতিদের বাড়ী গিয়ে উঠেছিলাম।

সিংভূমের ডিভিসনাল ফরেস্ট অফিসার মিঃ সিন্‌হা হঠাৎ এসে হাজির। পচা রায় ও আমি ওঁকে নিয়ে বেলেডাঙ্গার পুলে গেলাম। চাঁদ উঠেচে, আজ পূর্ণিমা। ঝাড় ঝাড় সোঁদালি ফুল মাঠে। কত ঝোপে ঝোপে পাকা বৈঁচি তুলে খেতে খেতে আমরা গেলুম। ক্লান্ত দেহে জ্যোৎস্নালোকে ইছামতীর জলে এসে নামি আমাদের বনসিমতলার ঘাটে। মিঃ সিন্‌হা সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে—তিনুও ছিল। উঠে মাধবপুরের সবুজ ঢেউ-খেলানো ঘাসের মাঠ দেখে এল ওরা। পরদিন S. D. O.-কে আনালুম, হাট থেকে ফিরে এসে দেখি S. D. O. ও সুরেন বসে। তাদের চা খাওয়ানো গেল—নিগ্রোর প্রতি আমেরিকানদের অত্যাচারের কত কাহিনী বর্ণনা করেন মিঃ সিন্‌হা।

তার আগের দিন ঊষা চৌধুরী এসে হাজির। আমি নারায়ণদা'র শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ খেতে সবে বসেচি—এমন সময় কল্যাণী চিঠি লিখে পাঠালে—মিসেস্ চৌধুরী এসেচেন। উনি এখুনি চলে যাবেন। তখুনি এসে দেখি ঊষা সত্যিই খাটের ওপর বসে আছে। ওকে নিয়ে আমরা সবাই গেলুম নদীর ধারে। ঊষা নদী দেখে খুব খুশি—বালিকার মত খুশি।

অতএব বোঝা গেল বিদেশাগত দুটি লোকেরই ভাল লেগেচে আমাদের স্বচ্ছসলিলা ইছামতী—পুলিনশালিনী ইছামতী।

আবার কাল কলকাতা গিয়ে সজনীর সঙ্গে ঊষাদের বাড়ী বেড়াতে গিয়ে বহুকাল পরে অশ্বিনী—আমাদের ৬০, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের সেই বাল্যবন্ধু অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা।

অনেকে গল্প করচি—ঊষারা কাল চলে যাচ্ছে লাহোরে—অনেকে দেখা করতে এসেচে—হঠাৎ ওর মধ্যে একটি লোক বল্লে—বিভূতি না?

অবাক হয়ে বললুম—চিনতে পারচি নে তো?

—তা চিনতে পারবে কেন? আমি অশ্বিনী।

তখনি আমি তার শার্ট ধরে টেনে আনতে আনতে বললুম—দাও দিকি আমার প্রথম বিয়ের সেই ঘড়িটা—। আজ ২৭ বছর পরে দেখা—সেই সময়ই ও আমার ঘড়িটা নিয়ে গিয়েছিল—গৌরীর বাপের দেওয়া সেই পকেট ঘড়িটা। কত বছর আগে!

মহাদেব রায়কে নিয়ে গেলুম শ্রীমতী বাণী রায়ের বাড়ী। চা খেয়ে কত গল্প। বেশ ভাল বেলফুল ফুটেছিল, তুলে দিলেন ওঁরা। ওঁর মা সুলেখিকা গিরিবালা দুখানা বই উপহার দিলেন।

মহাদেববাবুর সঙ্গে পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ৬ই মে রওনা হবো হাওড়া থেকে।

রোজ নদীর কালো জলে গিয়ে সন্ধ্যায় নামি। কালও কুঠীর মাঠ বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যায় স্নান করতে নামলাম আমরা দুজনে। রাঙা মেঘ করেচে সারা আকাশময়, ওপারের সাঁইবাবলা গাছটার ফাঁকে ফাঁকে রাঙা আলো যেন আটকে আছে। কি কালো জল। ভগবান যেন অত্যন্ত শান্ত রূপ ধরে আছেন—যেমন তাঁর অত্যন্ত অপরূপ মূর্ত্তি দেখেছিলাম সেদিন নতিডাঙার মরাগাঙের ধারে বসে। পাশে নতিডাঙ্গার প্রকাণ্ড বটগাছটা, ওপারে আরামডাঙ্গার মাঠে আউশ ধানের কচি সবুজ জাওলা ও খেজুর গাছের সারি। সাদা সাদা বক চরচে ঘন সবুজ কচুরিপানার দামে। এ জগতে যেন যুদ্ধ নেই, অশান্তি নেই, চালের দোকানের দীর্ঘ শ্রেণী নেই, উড়ন্ত এরোপ্লেন থেকে বোমাবর্ষণ নেই।

আম কুড়োনো এ সময় একটা আনন্দের ব্যাপার। আজ সকালে নদীর ধারে যাচ্চি, তেঁতুলতলী আম গাছটার তলায় দেখি হাজারী জেলেনী আম কুড়ুচ্চে। আমি যেতে না যেতে খপ্ করে একটা আম তুলে নিলে তলা থেকে। তখনও ভাল করে ভোর হয়নি। পাগলা জেলের মা আর হাজারী জেলেনী এই দুজন আম কুড়ুবার উদ্বেগে বোধ হয় রাত্রে ঘুমোয় না—নইলে অত সকালে ওঠে কি করে? সেদিন পাগলা জেলের মা ওর ঝুড়ি থেকে একটা পাকা আম আমায় দিয়ে গিয়েছিল। এইমাত্র একটা মশা মারলুম।

আজ কল্যাণীকে নিয়ে ফুচু, হর, বুধো প্রভৃতি ছোট ছোট ছেলেরা নৌকো নিয়ে বেড়াতে গেল বিকেলে, আমিও সঙ্গে গেলুম। অনেক দিন ওপারে যাইনি—মাঠ ছাড়িয়ে যে একটা পথ আছে, সেটা ভুলে গিয়েছিলুম। সেই পথ পর্য্যন্ত গিয়ে একটা নিমগাছ থেকে ডাল ভেঙে নেওয়া হোল দাঁতনের জন্যে। আমি নিজে নৌকো বেয়ে ঘাটে ভিড়িয়ে দিলাম—যেমন ও-বেলা তেঁতুলতলা থেকে সাঁতার দিয়ে এসেছিলুম আমাদের ঘাটে। জলে নামলুম দুজনে, জল খুব বেড়েচে। আর বর্ষার আকাশে মেঘের দৃশ্য অদ্ভুত। সেই সাঁইবাবলা গাছটার ডালে ডালে রাঙা আলো। দেখে একটা অনুপ্রেরণা মনে জাগলো—বিশ্বের মহাশিল্পীর পরিকল্পনার মহনীয়তা আমার চোখের সামনে সুপরিস্ফুট। নীল আকাশের দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করি—এই পটভূমি নিয়ে এদেশের একখানা Epic উপন্যাস লিখবো আমি। নীল কুঠীর পুল থেকে শুরু করবো।

গত ৫।৬ দিন ভীষণ বর্ষার পর আজ প্রথম রোদ উঠেচে। এখনও অনেক আম—তেঁতুলতলীতে আম কুড়ুই রোজ। গাছতলায় পাকা আম কুড়ুই। আজ ভোরে মুখ ধুয়ে ফিরচি নদীর ঘাট থেকে, বাঁশতলীর একটি টুকটুকে আম টুপ্ করে পড়লো আমার সামনে—কুড়িয়ে নিয়ে এলুম। কল্যাণী সেটি লক্ষ্মীকে দিলে।

বিকেলে শ্যামাচরণ দা'র ছেলে হর বল্লে, নৌকোয় বেড়াতে যাবেন না? আমি তখন বেরিয়ে গিয়েছি বাঁশ-বাগানের পথে গাব গাছটার কাছে। অনেকদিন যাইনি নৌকোতে

—কেবল যা গিয়েছিলুম কাল না পরশু। নলে জেলের নৌকো ছাড়া হোল। বেশ মেঘমুক্ত বিকেলটি, না গরম, না ঠাণ্ডা। দুধারে দীর্ঘ দীর্ঘ নলখাগড়ার শ্যামল সবুজ ঝোপ, ছোয়ারা লতা, বন্যেবুড়ো গাছের সারি, জলজ ঘাসের ঝোপ—সবুজ, সবুজ, এত সবুজও আছে এদেশে ; সবুজ সৌন্দর্য্যের ফুলঝুরি যেন চারিধারে। ক্রমে কুঠী ছাড়িয়ে গেল। নীলকুঠী এখন আর নেই, ভাঙা হাউজ ঘর আছে—এমন ঘন বন সেখানে যে দিনমানেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। ঐ সেই ঝিনুকের স্তূপ নদীর ধারটাতে, গত ফাল্গুন মাসে ছেলেরা ঝিনুক তুলেচে—তার পচা গন্ধ আকাশ বাতাস ভরিয়েছে, কাছে যাওয়া যায় না। কুঠী ছাড়ালুম, অবার নদীর দুপারে ঘন সবুজ উলুবন, জলের পাড়ে জলজ ঘাস ও বন্যেবুড়োর গাছ, উচ্ছে পটলের ক্ষেত, কুমড়োর ক্ষেত—শান্ত স্তব্ধ পল্লীশ্রী, এতদিন ছোটনাগপুরের ঊষর কাঁকর ও পাথরের দেশে বাস করে এসে চোখ জুড়িয়ে গেল, মন জুড়িয়ে গেল।

সবাইপুরের কাছে এসে ইছামতীর তীরের সৌন্দর্য্য আরও রহস্যময় হয়ে উঠলো। যেন তীরভূমির এই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা, ওই প্রাচীন ষাঁড়া গাছগুলো আমায় চেনে আমার বাল্যকাল থেকে, যেন এখনি বলবে—এই দ্যাখো সেই খোকা কত বড় হয়েচে! সবাইপুরের বাঁক ছাড়িয়ে অদূরে কাঁচিকাটার খেয়ায় কারা পার হচ্চে। একটি ছোকরা, সঙ্গে একটি প্রৌঢ়া, দুটি ছেলেমেয়ে, একখানা সাইকেল। ছোকরা বল্লে, আশুর হাটে তাদের বাড়ী। পাশেই মরগাঙের খাল, বহুদিন পরে আমি ঢুকলাম নৌকো করে এই খালের মধ্যে। ছোট একটা বাঁশের পুলের তলা দিয়ে বা ধারে আরামডাঙার বাঁশবন খেজুর বাগানের তলা দিয়ে ঐ গ্রামের একটা ঘাটে পৌঁছুই। ছোট্ট খালের এই ঘাটটি ঠিক যেন একটি ছবি। ছায়ানিবিড় স্নিগ্ধ অপরাহ্ণ, নীল-আকাশ, ঘন সবুজ জলজ ঘাস ও দূর্ব্বাস্তৃত তৃণ-ক্ষেত্র—সামনে কতকগুলি প্রাচীন গাছের আধ অন্ধকার তলায় একটা পুরোনো ইটের দরগা। কত কাল এদিকে আসিনি, আমারই গ্রামের পেছনে আরামডাঙার এই ঘাট কখনো দেখেছি বলে মনে হয় না—হয়তো কখনো আসিই নি—অথচ কোথায় লিপুদারায় সেই বন্য সরোবর, ভালকীর সেই ঘন অরণ্য, মানভূমের মাঠাবুরু শৈলশ্রেণী, বামিয়াবুরু ও চিটিমিটি, রাঁচির পথে হিনি জলপ্রপাত ও পোড়াহাট রিজার্ভ ফরেস্ট। কোথায় দিল্লী, কোথায় আগ্রা, কোথায় চাটগাঁ, কোথায় শিলং, দার্জ্জিলিং কোথায় না গিয়েচি! অথচ জীবনে কখনো আসিনি আমার গ্রাম থেকে মাত্র দু মাইল দূর আরামডাঙার এই ছবিটির-মত সুন্দর, তীরতরু-শ্রেণীর নিবিড় ছায়াতলে অবস্থিত প্রাচীন পীরের দরগা ও ছোট্ট ঘাটটিতে। একটা বড় শিউলি, গাছ, আমগাছ, বড় এক ঝাড় জাওয়া বাঁশ ওপারের, সামনে ছোট্ট খালের ঘাটটি—হাত দশ-বারো চওড়া মরগাঙের খালের এপারেই বর্ষা-সতেজ উলুবন, দূরবিস্তৃত মাঠ বেলেডাঙার সীমানায় মিশে গিয়েচে। সূর্য্যাস্তের রাঙা রঙ আকাশে।

পরদিন বিকেলে গেলুম আরামডাঙার এপারে 'কলাতলার দোয়া'তে। নতিডাঙার বড় বটগাছটা ছাড়িয়ে ওপথে কতদূর গেলুম। এ পথে কত কাল আসিনি। ডাঁশা-খেজুর তলা বিছিয়ে পড়ে আছে পথের ধারে খেজুর গাছের। মোল্লাহাটির পথে শুধুই ঝুরি নামানো প্রাচীন বটের ছায়া, ঘন পত্রপল্লবের আড়ালে পড়ন্ত বেলায় বৌ-কথা-কও ডাকচে।

আজ নৌকোয় বেড়াতে গিয়েছিলুম একেবারে মাধবপুর। অনেককাল আগে এই রকমই নৌকোয় বেড়াচ্ছিলুম আমি আর ভরত। বহুকাল আগে আমার বাল্যকালে,

দিগম্বর পাড়ুইয়ের একখানা খেয়া নৌকোতে আমি ভরত হাটবারের দিন লোক পারাপার করতাম রায়পাড়ার ঘাটে। এক মেঘাবৃত সন্ধ্যায় মাঠ ভেঙে গিয়েছিলুম মাধবপুরে পার্ব্বতীদের বাড়ী। পার্ব্বতী বিশ্বাস জাতে কাপালী, গোপালনগরের হাটে বেগুন বেচে, আমাদের সঙ্গে ছেলেবেলায় রাখাল মাস্টারের পাঠশালায় পড়তো। সেই আর এই।

তারপর কত জায়গায় বেড়ালুম জীবনে—এই সুদীর্ঘ বত্রিশ বছরের মধ্যে কিন্তু মাধবপুর আর কখনো আসিনি। গ্রামের মধ্যে ঢুকে প্রথমেই গোয়ালপাড়া—একটা লোক গাড়ু হাতে পথে যাচ্চে, জিজ্ঞেস করতে বল্লে, ঋষি ঘোষের বাড়ী। একটা বড় কাঁঠাল বাগান, অনেক কাঁঠাল ঝুলছে, জেলি বল্লে—দেখুন দাদা, কত আম পেকে!

চাষা গাঁ মাধবপুর। সব খড়ের ঘর, ঝক্‌ঝকে তকতকে উঠোনে সিঁদুর পড়লে তুলে নেওয়া চলে। গোলাপালা, ছোট ডোবা, বাঁধানো মনসাতলা ইত্যাদি মাটির পথের দুধারে। একটা চালাঘরে কয়েকখানা বেঞ্চি পাতা। সেটা নাকি গ্রাম্য পাঠশালা। কয়েকটি লোক সেখানে বসে আছে। একটি ছোকরার বাড়ী বসিরহাটে—সে নানু প্রসাদকে চেনে।

সামনে মনসা সিজের বেড়া দেওয়া একটা পুরানো কোঠা বাড়ী—নগেন রায় বলে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী। তিনি ছ বছর হোল বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গিয়েচেন—তাঁর স্ত্রী থাকেন বাড়ীতে, ছেলেপুলে নেই।

এই মাধবপুর, ক্ষুদ্র কৃষকদের গ্রাম মাত্র—কিন্তু আমার মনে চিরকাল রহস্যময় হয়ে ছিল। ভালো করে আজই দেখলুম এ গ্রামকে, বত্রিশ বছর আগে সেই যে ভরতের সঙ্গে এসেছিলুম, সে অতি অল্পক্ষণের জন্যে এবং শুধু পার্ব্বতীদের বাড়ীতেই। গ্রামটা ভাল করে বেড়িয়ে দেখলুম এত কাল পরে—আজ প্রথম।

মনে পড়লো সংসারের টানাটানি হোলে বাবা আসতেন এই মাধবপুরে এক এক বিকেল বেলায় নৌকায় পার হয়ে—আমার বাল্যকালে। বাবার পুণ্যচরণ-ধূলিপূত মাধবপুর!

পরদিন বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নতিডাঙার বটতলা পেরিয়ে মরগাঙের ধারের সেই জালি ধানের ক্ষেতটাতে বসি। কি শান্তি, কি শ্যামলতা এই দৃশ্যটার। ওপারে আরামডাঙারমাঠ, খেজুর চারা—গরু চরচে, মরগাঙের ঘন সবুজ কচুরীপানার দামের ওপর শুভ্রপক্ষ বক বেড়াচ্ছে মাছ খুঁজে খুঁজে—পাশেই বাবলা কাঁটার বেড়া দেওয়া একটা ঝিঙে ক্ষেতে হলদে ঝিঙের ফুল ফুটে আছে এই মেঘভরা বিকেলে। যিনি সূর্য্যে, নক্ষত্রে নিওন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন গ্যাস ও নানা ধাতুর আগুন জেলে রেখেচেন তিনিই এই শ্যামল সবুজ শান্ত তৃণতরু, এই সৌন্দর্য্যভরা পল্লীদৃশ্যের সৃষ্টি করেচেন, তিনিই আগুনে, তিনিই জলেতে—অদ্ভুত contrast! সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকটাহের সৃষ্টি শুধু এই শ্যাম বনশোভার, এই তৃণাবৃত প্রান্তরকে সম্ভব করবার, রূপ দেবার প্রাক্-আয়োজন মাত্র। আগুন কেন? জল সম্ভব হবে বলে।

হঠাৎ দেখি মেঘ করে আসচে। কালবৈশাখী নিশ্চয়—ছুটতে ছুটতে এক মাইল এসে নদীতে আমাদের বনসিমতলার ঘাটে নামি। কি চমৎকার নদীজল, পুণ্য-সলিলা ইছামতী প্রতি সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় গত দশ-পনেরো বছর ধরে আমায় কত কি শিখিয়েচে। ভগবানের কত রূপই প্রত্যক্ষ করেছি ইছামতীতে সাঁতার দিতে দিতে এমনি কত নিদাঘ সন্ধ্যায়, বর্ষা অপরাহ্ণের বৃষ্টিধারামুখর নির্জ্জনতায়। আজ দেখলুম, কুঠীর দিকে কি অদ্ভুত কালো মেঘসজ্জা—উড়ে আসচে ভাঙা নীল কুঠীটার জঙ্গলের দিক থেকে আমাদের ঘাটের দিকে। কি সে অদ্ভুত রূপ! বিশ্বরূপের এ

সব রূপ—এ পটভূমিতে, এমন অবস্থায় দেখবার সৌভাগ্য আমায় দিয়েচেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনিই দয়া করে যাকে দেখতে দেন, সে-ই দেখে।

সারাদিন কাটলো ট্রেনে। তিনবার অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখলাম—একবার ব্রাহ্মণী নদীর সেতুর কাছে বিস্তৃত কটা রংয়ের বালুরাশির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় দ্বিধারা ব্রাহ্মণী বয়ে চলেচে—দূরে নীল পর্ব্বতমালা, ঘন সবুজ বনানী। বাংলাদেশের বন অথচ তার পেছনে আকাশের গায়ে সিংভূমের চেয়ে শ্যামলতর শৈলশ্রেণী। আর একবার এই রকম দৃশ্য দেখলাম কটকের এপাশে মহানদীর সেতু থেকে এবং ওপাশে কাটজুড়ির সেতু থেকে। ট্রেন যত পুরীর কাছাকাছি আসতে লাগলো বনবনানী ততই শ্যামলতর, নারিকেল কুঞ্জ ততই ঘনতর, দোলায়মান বেণুবনশ্রেণী ততই নবতর রূপ পরিগ্রহ করতে লাগলো। ভুবনেশ্বর স্টেশনের কাছে অনেকদূর পর্য্যন্ত মাকড়া পাথরের মাঠভূমি বা টাঁড় এবং এক প্রকারের সাদা ফুলফোটা ঝুপি গাছের ঘন সবুজ বন। বাংলাদেশের চেয়েও শ্যামল এসব অঞ্চলের তৃণভূমি ও বনানী। বনপুষ্পের বৈচিত্র্য তেমন চোখে পড়লো না। বর্ষার দিন, ভুবনেশ্বরের এদিক থেকে বর্ষা শুরু হয়েচে, ক্রমে বৃষ্টি বাড়চে বই কমচে না। পুরীর ঠিক আগের স্টেশন হোল মালতীপাতপুর। উড়িষ্যার এই ক্ষুদ্র পল্লী যে একটি শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যভূমি শুধু তার ঘন নারিকেলকুঞ্জ ও শ্যাম বন-শোভায়—এ আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

পুরী স্টেশনে গজেনবাবু ও সুমথ এসে আমাদের নামিয়ে নিয়ে যেতে যেতে গল্প করচে—হঠাৎ সামনে দেখি অকূল সমুদ্রের নীল জলরাশি! সে কি পরম মুহূর্ত্ত জীবনের! সমস্ত দেহে যেন কিসের বিদ্যুৎ খেলে গেল। কল্যাণী দেখি হঠাৎ অবাক হয়ে হাঁ করে চেয়ে আছে। সমুদ্র দেখেছিলুম বহুকাল আগে কক্সবাজারে—আর এই ২০।২১ বছর পরে আজ পুরীর সমুদ্র দেখলুম।

সন্ধ্যায় জগন্নাথের মন্দির দেখে এলুম। শ্রীচৈতন্য যেখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন, সে স্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সর্ব্বশরীর যেন অবশ হয়ে গেল। আধ অন্ধকার গর্ভ-দেউলে বহু নরনারী দাঁড়িয়ে জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করচে—ভক্তবৃন্দের মুখে হরিধ্বনি, নানা মন্দিরের গর্ভগৃহ, সেখানে বাঁধা প্রদীপের মিটমিটে আলোয় কত কি দেবদেবীর বিগ্রহ যুঁই ফুল ও পদ্মমালার সুগন্ধ বাতাসে, বিরাটকায় পাষাণ দেউল, কোথাও সংস্কৃত স্তোত্র উচ্চারিত হচ্চে পান্ডাদের মুখে—আমাদের সঙ্গী পান্ডা বলচে এই নীলাচল, এখানে শুধু নীলমাধবের মন্দির তৈরি হয়েচে—বাইরের আনন্দবাজারে নারিকেলের তৈরি নানা রকম মিষ্টান্ন ভোগ ও তাদের সংস্কৃত নাম, প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ যেন এখানে বাঁধা পড়ে আছে।

সকাল থেকে দুর্য্যোগ চলচে। পুরীর বীরেন রায় একজন প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। তিনি এবং কয়েকটি ভদ্রলোক এলেন গজেনবাবুর ওখানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ধার্য্য হলো ওবেলা আমায় নিয়ে নাকি সম্বর্দ্ধনা করবেন, সেকথা বলে গেলেন।

বেড়িয়ে ফিরবার পরেই অত্যন্ত বৃষ্টি শুরু হোল। এদিকে পান্ডাঠাকুরের ছড়িদার বলে গেল যে একটার সময় মহাপ্রসাদ পাঠাবে। ক্ষিদেতে নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, বাইরে ভীষণ দুর্য্যোগ, মহাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেই। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো, প্রায় সাড়ে চারটে বিকেল—তখন 'কণিকা' প্রসাদ এল।

হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দর্শন করতে যাবার পূর্ব্বে কল্যাণী আমি উমা সবাই মিলে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলুম। কল্যাণী বহু ঝিনুক কুড়ুলে। অনেক-

দিন আগে এই দিনটিতে বারাকপুরে খুকু আমার সঙ্গে নাইতে গিয়ে 'মাটি আনি' বলে আমায় ফাঁকি দিয়ে ডাঙায় উঠে ছুট দিয়েছিল। তখন সে ব্যাপারটাতে কি দুঃখই হয়েছিল মনে। পায়ে হেঁটে চালকী চলে গিয়েছিলুম জাহ্নবীর ওখানে, মনে কষ্ট নিয়ে। আজ কোথায় জাহ্নবী, কোথায় সে খুকু, কোথায় বা সে দিনের মনের কষ্ট! জীবনে একদল যখন চলে যায়, তখন বড়ই কষ্ট হয় প্রথম প্রথম, কিন্তু শীঘ্রই অপরদল এসে তাদের স্থান পূর্ণ করে—তারাই আবার হয়ে দাঁড়ায় কত প্রিয়।

গজেনবাবুদের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখতে গেলুম। শ্রীচৈতন্যদেব এখানে ছিলেন আঠারো বছর—তাঁর শ্রেষ্ঠ ভক্ত হরিদাস ঠাকুর যখন মারা যান, তখন তিনি নিজে ওঁকে কাঁধে বয়ে নিয়ে এসে এখানে সমুদ্রতটে বালুকা খুঁড়ে সমাধিস্থ করেন। কালক্রমে এখন সেখানে বড় বড় বাড়ী হয়ে উঠেচে চারধারে। স্থানটি অতি শান্তিপ্রদ, মনে একটি উদাস পবিত্র ভাব এনে দেয়। দুটি বালক শিষ্য হাতে ঝুলি নিয়ে মালা-জপ করচে, তারাই সব দেখালে।

সেই পথেই পুরুষোত্তম মঠে গিয়ে পেছনের একটি অতি সুন্দর স্থানে বসলুম। ডাইনে দূরপ্রসারী ঝাউবন, পাশেই টোটা গোপীনাথের বাগানে অজস্র কাঁঠালগাছ, সামনে বিস্তৃত বালুচরের পারে অপার নীলাম্বুরাশি সফেন ঊর্ম্মিমালা বুকে নিয়ে তটভূমিতে আবার আছড়ে পড়চে। সে দৃশ্য দেখে আর চোখ ফেরাতে পারিনে, উঠতে ইচ্ছে হয় না। এই তো বিশ্বরূপের মন্দির, এই আকাশ, এই ঝাউবন, এই অপার নীল সমুদ্র। এ ছেড়ে কোথায় যাবো?

গজেনবাবু কেবল বলে, বিভূতিবাবু, সভার সময় হোল। সাতটাতে সভা।

সুমথবাবু বল্লে—আপনাকে দেখচি ওঠানো দায়, সভার সব লোক এসে হাঁ করে বসে থাকবে—চলুন।

১৮০শ্রী তীর্থপতি মহারাজ এই পুরুষোত্তম মঠের মোহান্ত। তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন গৌড়ীয় মঠ থেকে প্রচার করতে। তাঁর সঙ্গে বহু আধ্যাত্মিক আলোচনা হোল। বৈষ্ণবদের কি বিনয় ও ভক্তি। অত বড় পণ্ডিত বল্লেন হাত জোড় করে, আমি আপনাদের দাসানুদাস হতে চাই। আবার কবে দেখা পাবো?

ওখান থেকে এসে সবাই গেলুম সভাস্থলে। ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করলেন। আমার গলায় ফুলের মালা দিয়ে আমার রচনা সম্বন্ধে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা অনেকে বল্লেন। গজেনবাবু ও মিঃ পালিত বল্লেন, আমার 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' নাকি রোঁমা রোঁলার 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর চেয়েও বড়।

দিব্যি জ্যোৎস্নারাত্রে কল্যাণী, উমা, বীরেন রায়, গজেনবাবু, সুমথবাবু সবাই মিলে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে এলুম। উত্তাল সমুদ্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে, হু হু হাওয়া বইচে, যাকে বলে সত্যিকারের 'sea breeze' বা ডাচ্ 'Zee brugge' অর্থাৎ সমুদ্রের হাওয়া।

রাত্রে আবার ভীষণ বৃষ্টি। সকালে উমা ও কল্যাণী সমুদ্রে স্নান করতে গেল। ওরা সমুদ্রে স্নান করে খুব খুশি হয়ে এল।

একটু পরে বৃষ্টি কেটে গিয়ে বেশ রোদ উঠলো—উমাকে রেখে কল্যাণীকে নিয়ে আমি শ্রীমন্দির দর্শন করতে যাচ্চি, পথে ছাতার মঠ ও রাধাকান্ত মঠ দেখে বার হচ্চি, এমন সময় মহাদেববাবু পেছন থেকে ডাকচেন। সঙ্গে প্রতাপবাবু। আমরা গিয়ে এবার মঠ দেখি। ভারতবর্ষের মধ্যে এই মঠটি সবচেয়ে বিত্তশালী। কেমন নীচু-নীচু ঘরগুলি, দেওয়ালে নানারকম quaint ছবি আঁকা, পাথরের কাজকরা থাম, খাঁচায় টিয়া ময়না পাখী, শান্ত পরিবেশ—যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো রাজপ্রাসাদ। তারপর

গেলুম মন্দির দেখতে। গজেনবাবুর মা সেখানে উপস্থিত, তিনি বল্লেন, রত্নবেদী দেখবার দেরি আছে একটু, বৌমাকে নিয়ে একটু বোসো। একটি সাধু ভাগবত পাঠ করচেন, সেখানে খানিকটা বসি। তারপর মন্দিরের সব দিক ঘুরে ঘুরে দেখলুম বেলা বারোটা পর্য্যন্ত। মন্দির তো নয়, পাহাড়। ঐ আবার সেই কথা মনে পড়ে—প্রাচীন দিনের ভারতবর্ষ সেখানে যেন অচল হয়ে বাঁধা পড়েছে পাথরের বাঁধনে। গগনচুম্বী গম্ভীরা কি অসাধারণ শক্তি ও বিরাটত্বের পরিচয় দিচ্ছে! জগমোহনের কি গঠনভঙ্গি! নাটমন্দিরের সরল ও সহজ স্থাপত্যের মধ্যে একটি সখ্য ভাব জড়ানো। ভোগগৃহের সামনে সেই স্তম্ভ বর্ত্তমান আজও, যে স্তম্ভটিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্য প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শন করতেন। পাণ্ডারা এক জায়গায় তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখায়—আমার বিশ্বাস হোল না যে সে তাঁর আঙুলের ছাপ—আর দেখালেই বা কি। শ্রীচৈতন্য এসেছিলেন অধ্যাত্ম বিষয়ে পথ দেখাতে, ধর্ম্ম-উপদেশ দিতে। তাঁর প্রচারিত নামধর্ম্মের মাহাত্ম্য যদি কেউ ভাল না বোঝে, তবে তাঁর হাতের আঙুলের ছাপ দেখে সে কোন্ স্বর্গে যাবে?

মন্দির দেখতে বেজে গেল সাড়ে বারোটা। কিছু কিছু মিষ্টান্ন ভোগ কিনে উমার জন্যে বাড়ী আনা গেল। ভোগ আসতে দেরি হয়, আজও হোল—বেলা সাড়ে চারটার সময় ভোগ এল।

আজ সমুদ্রের উত্তাল রূপ। ঝড়বৃষ্টি কেটে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়েচে, সুনীল সমুদ্র যেন নিজের আনন্দে নিজে মত্ত হয়ে বড় বড় ঢেউ তুলে কূলে আছড়ে আছড়ে পড়চে। দীর্ঘ টানা ঢেউয়ের রাশি মাথায় সাদা ফেনার পুঞ্জ নিয়ে বহুদূর-ব্যাপী একটি রেখার সৃষ্টি করেচে। দুপুরবেলায় কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সে রূপ দর্শন করলুম। সুমথবাবু এসে বল্লে, চলুন চা খেয়ে আসি আর সস্তায় জুতো নিয়ে আসি মুচিপাড়া থেকে। ওর সঙ্গে বেরিয়ে হঠাৎ আবার সমুদ্রের সঙ্গে দেখা। আর আমি যেতে পারলুম না কোথাও। অবাক হয়ে চেয়ে বসে পড়লাম। কি বিরাটত্বের আভাস ওই দূরবিসর্পী নীল রূপের মধ্যে, ঊর্ম্মিমালার সফেন আকুলতায়, তটরেখার বিলীয়মান শ্যামলিমায়। স্থলভূমির শেষ হয়ে গেল এখানে, দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত এই নীলাম্বুরাশির ওপার নেই, আবার এপারে এই এসিয়া মহাদেশের উত্তর প্রান্ত, ইনিসে ও লেনা নদীর মুখ। অবিশ্যি দক্ষিণ মেরু মহাদেশের তুষারাবৃত নির্জ্জন ভূভাগের কথা তুলচি নে এখানে। নুলিয়ারা সেই বিক্ষুব্ধ বীচিমালা পার হয়ে ডিঙিতে মাছ ধরে আনচে—একটা sword fish দেখলুম আনচে—প্রকাণ্ড করাত-খানা ঝক ঝক করচে।

মুচিপাড়ার জুতো দেখতে গিয়ে একটা দোকানে বসে সবাই গল্প করচি। একটি পথচলতি লোক এসে হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি সে গালুডির সেই হরিপদ ডাক্তার। অনেকদিন পরে দেখে খুব খুশি হই। বল্লে—বেড়িয়ে বেড়িয়েই জীবনটাকে নষ্ট করলুম বিভূতিবাবু।

সন্ধ্যাবেলা আমার এখানে আড্ডা বসলো—অনেকগুলি ভদ্রলোক এলেন আড্ডা দিতে—যদু মল্লিকের পৌত্র বৃন্দাবন মল্লিক প্রভৃতি। জ্যোৎস্নারাত্রে আবার সমুদ্রের ধারে গিয়ে কতক্ষণ গল্পগুজব করি।

সন্ধ্যায় আজ বীরেন রায়, বৃন্দাবন মল্লিক, গজেনবাবু, সুমথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে চক্রতীর্থে সমুদ্রতীরে বালির ওপর গিয়ে কতক্ষণ বসে ছিলাম। দ্বাদশীর জ্যোৎস্না সমুদ্রের উপর পড়ে তার তরঙ্গরাজির রূপ বদলে দিয়েচে, ধূ ধূ নির্জ্জন বালুচরের গায়ে আছড়ে এসে পড়চে ঊর্ম্মিমালা—চৈতন্যদেব চক্রতীর্থে সমুদ্রের এই রূপ দেখেই

নাকি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েন—আজ ৪৫০ বছর আগের কথা। সেই সমুদ্র এখনও ঠিক তেমনি আছে, সেই তরঙ্গ-ভঙ্গ, সেই নির্জ্জন বালুতট, সেই ঝাউবনশ্রেণী, সেই উদাস অস্পষ্ট চক্রবালরেখা।

বীরেন রায় আজ সকালে প্রাচীন তোসালি নগরের অনেক পুরোনো পুঁথি, পোড়ামাটির খেলনা, পাথরের মালা ইত্যাদি দেখালেন। উড়িষ্যার প্রাচীন শিলা সংগ্রহ ইনি করে এসেচেন চিরকাল ধরে। কত টাকা নষ্ট করেচেন এদের পেছনে অথচ ক্লিভ্‌-ল্যান্ড মিউজিয়ম থেকে যখন ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ওঁর সংগৃহীত জিনিসগুলি কিনতে চাইলে, তখন উনি তাদের না দিয়ে সামান্য ছ'হাজার টাকা নিয়ে আশুতোষ মিউজিয়মে দান করলেন। আজ গালুডির সেই হরিপদবাবু ভোরে আমার এখানে এসেছিলেন।

সবাই মিলে খুব আড্ডা দিয়ে চা খাওয়া গেল 'আদর্শ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার'-এ—তারপর ওরা সব মুচিপাড়ায় গিয়ে জুতো দেখলে। বৃন্দাবন মল্লিক এসে রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীতে নিয়ে গেল। চক্রতীর্থে জ্যোৎস্নায় বেলাভূমির বালুর ওপর বসে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ফিরে এলুম আমার বাসায়। কত রাত পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা। বীরেন রায় একবার এক বড় বুদ্ধমূর্ত্তি জঙ্গলের মধ্যে কি ভাবে আবিষ্কার করেছিলেন, সে গল্প করলেন। হঠাৎ বুদ্ধের ধ্যানি-প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখে বলে উঠলেন, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি। ঢেন্‌কানল স্টেটে এক প্রাচীন মন্দির দেখতে গিয়ে উনি পড়েছিলেন king cobra-র হাতে। ভগবান সর্ব্বভূতে আছেন ভেবে হঠাৎ নাকি মহিম্নস্তোত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলেন চোখ বুজে। অনেকক্ষণ পরে চোখ খুলে দেখলেন সর্প অদৃশ্য হয়েচে।

দুপুরের পরে গোবর্ধন মঠে গিয়ে একটি চমৎকার গোপালমূর্ত্তি দর্শন করলুম। দোর বন্ধ রয়েচে দেখে আমি দোর খুলে গিয়ে মেজেতে চুপ করে বসলুম—কেমন একটি সুঘ্রাণ বেরুচ্ছে পুষ্প ও চন্দনের। শ্বেত প্রস্তরের মেজেতে ঠাণ্ডা ও শান্ত পরিবেশের মধ্যে গোপালের মূর্ত্তির সামনে বসে রইলুম কতক্ষণ।

সকালে উঠে সামনের ঘরের বুড়ো-বুড়ীকে নিয়ে হরিদাস ঠাকুরের মঠে গেলুম ও পুরুষোত্তম মঠে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ম্ম-উপদেশ শুনলুম।

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী', সর্ব্বদা জেগে থাকতে হবে। আলস্যই পাপ। আসবার সময়ে শঙ্কর মঠের শ্রীগোপাল বিগ্রহ দেখে চলে এলুম। ছোট্ট ঘরটিতে পুষ্প-চন্দনের সুবাস। আহারের পর একটু বিশ্রাম করে কল্যাণী ও উমাকে নিয়ে যাচ্ছি—একটি বাড়ীতে কথকতা হচ্চে 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' এর। অনেকক্ষণ বসে শুনলুম। মন্দিরের কাছে হরিদাস ঠাকুরের সিদ্ধ বকুল দেখতে গেলুম। ৫০০ বছরের পুরোনো বকুল গাছ আজও দাঁড়িয়ে! মোহান্ত মহারাজের সঙ্গে আলাপ হোল। কলকাতার একটি সুন্দরী মহিলাকে 'মা' বলে মনটাতে বড় ভক্তি হোল।

আজ সকালে বীরেন রায়ের বাড়ী বসে তাঁর দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহাবলী দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হোল, আজ না পয়লা আষাঢ়। চলুন গিয়ে কালিদাস উৎসব করা যাক্‌। এমন সময়ে এল বৃন্দাবন মল্লিক, বল্লে—আপনি বলেছিলেন 'দেবযান' পাঠ করবেন লাইব্রেরীতে—অনেক লোক এসে বসে আছে।

গেলুম। যাবার আগে সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ী 'রমা ভিলা'তে গিয়ে খানিকটা বসলাম। ১৯২৩ সালে একবার সিদ্ধেশ্বরবাবুদের বাড়ী থেকে এখানে আসবার

কথাবার্ত্তা সব ঠিক, আমি আমার মেস্ থেকে বাক্সবিছানা সব বেঁধে নতুন একটা শতরঞ্চি কিনে (যখন কিনি সুসার কাকা আবার তখন সেখানে উপস্থিত) মুটের মাথায় চাপিয়ে ওদের বাড়ী এসে দেখি সিদ্ধেশ্বরবাবুর জ্বর হয়েচে, যাওয়া হবে না। ১৯২৪ সালে পৌষ মাসে আর একবার ওরা পুরী আসে, আমি যাই ভাগলপুরে। নরেন এসেছিল আমার স্থানে। ১৯৩৪ সালে সুপ্রভা ও তাঁর বাবা যখন আসেন, তখনও আমার আসবার সমস্ত ঠিক, সুপ্রভা চিঠি লিখলে, আমি পুরীর টিকিট পর্য্যন্ত কিনে আনলাম। সমুদ্রস্নানের জন্যে একটা কোমরবন্ধ পর্য্যন্ত কিনলাম কিন্তু আসা হোল না।

এতদিন পরে 'রমা ভিলা'তে বসে সব পুরোনো কথাই মনে পড়ছিল। আজ আর কেউ নেই—কোথায় বা সেই সিদ্ধেশ্বরবাবু, কোথায় বা অক্ষয়বাবু। এত সাধ করে 'রমা ভিলা'র সদর ফটক সেবার ১৯২৩ সালে করানো হোল—ওরা কোথায় চলে গেল! গেটটি আজও আছে দেখে এলুম।

লাইব্রেরীতে কালিদাস উৎসব সম্পন্ন হোল। প্রিয়রঞ্জন সেনের দাদা কুমুদবন্ধু সেন বক্তৃতা দিলেন। আমি কিছু বললাম সভাপতি হিসেবে। মনে পড়লো বারাকপুরে গ্রীষ্মের ছুটি অতিবাহিত করবার সময়ে প্রতি বৎসর খুকুর কাছে বলতাম—আজ ১লা আষাঢ়, খুকু এসো কালিদাসকে স্মরণ করি। এতকাল পরে ভাল করেই স্মরণ করা হোল কালিদাসকে। বিকেলে আবার খুরদা রোড থেকে আমাকে নিতে এল—সেখানেও ওবেলা 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হবে। পুরী থেকে তো কাল চলেই যাবো। খুরদা রোড পর্য্যন্ত ফার্স্ট ক্লাসে নিয়ে গেল রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়কে, তুষারকান্তি ঘোষকে এবং আমাকে। জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, গুমট বেশ। ডাঃ সরকারের বাংলোর বাইরের মাঠে সবাই মিলে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হোল। রাধাকুমুদবাবু ও তুষারকান্তিবাবু ভূতের গল্প আরম্ভ করলেন—রাত সাড়ে দশটায় সভা। আমার প্রথম বক্তৃতা—সবাই খুব হাততালি দিলে। মহাদেব রায়ের বক্তৃতা অতি চমৎকার হয়েছিল।

পরদিন সকাল আটটার সময় থেকে সারাদিন ট্রেনে। মহানদী ও কাটজুড়ি নদীদ্বয়, দূরের নীল শৈলমালা, কাটজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুচর ও তার ধারে সুদৃশ্য কটক শহরটি বেশ লাগলো। সারাদিন চলেচে ট্রেন, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখা পার হয়ে বাংলাদেশে পড়লাম। অমরদা' রোড্ স্টেশন থেকে কয়েকটি গোরা সৈনিক উঠলো এবং সারারাত গানে-গল্পে তাদের সঙ্গে বেশ কাটানো গেল।

ভোরে সাঁতরাগাছি। টিকিট নিয়ে নিলে এখানে এবং হাওড়া নেমেই সোজা শেয়ালদা' হয়ে বারাকপুরে চলে এলুম। এতদিন পরে ইছামতীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। কোথায় ভুবনেশ্বরের কুচিলা বন, খণ্ডগিরি উদয়গিরির গুহাবলী, পাথার তীর্থ পুরীর নীলাম্বুরাশি—আর কোথায় নলখাগড়া বন্যেবুড়ো গাছের সারি ও ইছামতী নদী।

বিকেলে নদীর ধারে নিবারণের পটলের ভুঁইয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। শান্ত বর্ষা, শ্যামল গাছপালা। বিশ্বরূপের আর এক রূপ এখানে। কুঠীর মাঠে সেই জায়গাটায় গেলুম যেখানে খুকুর আমলে একটা বালির ঢিবি ছিল, খেঁকশেয়ালীতে গর্ত্ত করেছিল—আমি গিয়ে বসতুম।

বাদলা নেমেছে—মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ইন্দু রায় ও হাবু-ফুচুকে সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে যাই। হাবু ও ফুচুর সঙ্গে কালও গিয়ে কাঁচিকাটার পুলের নীচে কচুরি-পানার জড়ো করা স্তূপের উপর বসে আরামডাঙার শ্যামল মাঠ ও খেজুর গাছের

সারির দিকে চেয়ে মনে হলো এ যেন ঠিক সেই বিলিতি ছবিতে South-sea Island-এর দৃশ্য দেখচি। বর্ষা-সতেজ কচি ঢোঁচরা ঘাসগুলো জলের ধারে কেমন বেড়ে উঠেচে আর তার কি শোভা। একটা রাখাল ছোঁড়া মরগাঙের ধারের ক্ষেত থেকে কাঁকুড় তুলে খাচ্চে দেখে হাবু তাকে কেবল বলতে লাগলো—ও ভাই, একটা কাঁকুড় দে না তুলে ক্ষেত থেকে!

অনেক অনুরোধ উপরোধে সে একটা মাঝারি সাইজের কাঁকুড় তুলে নিয়ে আসতেই হাবু ও ফুচু সেটার ভাগ নিয়ে ঝগড়া বাধালে। প্রবহমাণ ক্ষীণকায় তটিনীর কূলে বসে পুঁটিমাছ ধরা ছোট্ট ছিপ ফেলে মাছ ধরি আর কাঁচা কাঁকুড় খাই—বেশ লাগে এ জীবন!

আজ বেলা তিনটের সময় ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি ও সেই সঙ্গে ঝড়। ঝড়বৃষ্টির কোনো কামাই নেই আষাঢ় মাস পর্যন্ত। দিনগুলি ঠাণ্ডা, সজল বাতাস বয় সারাদিন। আজ মেঘবৃষ্টির পরে বেড়াতে বার হই বাঁওড়ের ধারের পথ দিয়ে নতিডাঙার সেই বটগাছটা পর্য্যন্ত। সেই বিশাল প্রাচীন মহীরুহ তার ঘন সবুজ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আছে মজা নদীর ধারে, দূরে বিস্তৃত মাঠে আউশ ধানের জাওলা বেড়ে উঠেচে, যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন শ্যাম ভূমিশ্রী - আর সকলের ওপর উপুড় হয়ে আছে আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ। কি নব নীল নীরদ-মালা, দেখে মনে হল তখুনি বিশ্বশিল্পীর এ শিল্প আমি না যদি দেখি, তবে এ পাড়াগাঁয়ের কেউই আর দেখবে না। শিল্পী হিসাবে, কবি হিসাবে আমার কর্ত্তব্য হচ্চে এই অদৃশ্য সৌন্দর্য্যের অপরাজিত আয়তনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হওয়া। মেঘের কোলে এক জায়গায় সাদা বক উড়চে—ঠিক বেলে-ডাঙার পুলটার কাছে। খেজুর গাছ আছে একটা সেইখানে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসচি। অবাক হয়ে গেলুম উড়ন্ত বক দুটিকে সেই বর্ষার মেঘ থম্‌কানো অপরাহ্ণে কাজল কালো মেঘের গায়ে উড়তে দেখে। জগতে এত সৌন্দর্য্যও আছে! কোথায় এর তুলনা? ধন্যবাদ হে মহাশিল্পী, তুমি আজ আমাকে তোমার সৃষ্ট রূপজগৎকে দেখবার সুযোগ দিলে। এর ভাষা সৌন্দর্য্যের ভাষা, কি বলতে চায় এ মুখর প্রকৃতি—এই বন, মেঘ, তৃণাবৃত প্রান্তর, উড়ন্ত বক, খেজুর গাছের সারির মধ্যে দিয়ে নীরব গম্ভীর ভাষায়, তা যে কান পেতে শুনতে চায় সে শুনতে পাবে। কিন্তু ওই যে বাগ্‌দীরা মরগাঙের ধারে বসে মাচা বেঁধে সারি সারি জলি ধান পাহারা দিচ্ছে—ওরা কেউ শুনতে চায়ও না, পায়ও না।

সকালবেলা আজ বাঁওড়ের ধারের পথে বেড়াতে গেলুম। নীল আকাশ, গাছ-পালার প্রাচুর্য্য, বনবিহঙ্গের কূজন আমার মনকে অপূর্ব্ব আনন্দরসে অভিষিক্ত করে রাখলে। একস্থানে বসে চারিধারে চেয়ে চেয়ে দেখি—কি চমৎকার অপরূপ সৌন্দর্য্য-শিল্প ভগবানের। কুঠীর মাঠে পেয়ারা গাছটার তলায় এসে বসলুম নরম সরস সবুজ ঘাসের ওপর গামছা পেতে। যেন কত বন, এমন সবুজ তেলাকুচা লতার তাজা সাদা সাদা ফুল ও ঝলমলে সূর্য্যালোকে প্রজাপতির আনন্দ নৃত্য দেখে দেখে সারাজীবন কাটিয়ে দিলেও আমার আনন্দ কখনও পানসে হয়ে যাবে না—এই রৌদ্রদীপ্ত প্রভাতের আনন্দ, এই তরুলতার শ্যামল রূপের আনন্দ, নীল আকাশের আনন্দ।

বিষম বর্ষা নেমেচে আজ ক'দিন। বিরাম-বিশ্রামহীন বর্ষা, মেঘমেদুর আকাশ। কাল আমরা (কল্যাণী, তিনু ও আমি) বিকেলে কুঠীর মাঠ দিয়ে মরগাঙের খাল পার হয়ে আরামডাঙা বলে ছোট মুসলমানের গ্রামটিতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। একটা বাড়ীতে বৌয়েরা কল্যাণীকে খুব যত্ন করে পিঁড়ি পেতে দিলে, পান সেজে দিলে,

একটা কাদের ছোট ছেলে এনে ওর কোলে দিয়ে আপ্যায়িত করলে। বেশ লাগলো ওদের সরলতা। মরগাঙের ধারে যখন বসেচি, তখন সবুজের কি বিপুল সমারোহ চারিদিকে! সামনে আরামডাঙা, ওদিকে বেলেডাঙা যেন সবুজের সমুদ্রে ডুবে আছে। যখন আমাদের ঘাটের কাছাকাছি এসেচি, তখন মেঘের ফাঁকে আষাঢ়ী পূর্ণিমার পূর্ণ-চন্দ্র একটু একটু উঁকি মারচে—মেঘভাঙা সেই জ্যোৎস্নাতেই আমরা নদীজলে স্নান করতে নামলুম। সন্ধ্যায় ট্রেন যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। কিন্তু গতকাল রাত্রে জ্যোৎস্নার কি অপূর্ব্ব শোভা রাত দশটার পর দেখা দিল সারাদিনের বৃষ্টিস্নাত আকাশে! বাইরের রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেখি আকন্দ পাতা, সজনে গাছ, বাঁশ ঝাড়, বন কাপাসের ডাল——এ সবের ওপর সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নার কি শোভা—বিশ্বরূপকে একেবারে প্রত্যক্ষ করলুম সামনে। ছেলেবেলা যখন পাঁচড়া হয়েছিল—তখন এ সময় দেশে ছিলুম, আর কখনো থাকিনি।

আজ বড় সুন্দর শরতের রোদ। নাইবার পূর্ব্বে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসি কুঠীর মাঠে, প্রজাপতি উড়চে ফুলে ফুলে। শ্যামল বনঝোপ কি সুন্দর চারিদিকে। কে যেন এসে পেছন দিক থেকে চোখ টিপে ধরবে সব সময়েই মনে হয়। উঠে আসতে ইচ্ছে করে না—কি সৌন্দর্য্য! ঘাটে এসে যখন স্নান করতে জলে নামি—তখন নদীর ওপারের নীল শোভা হৃদয় মুগ্ধ করে দিলে। কাল বনগাঁ থেকে জমি কিনে ফিরে আসবার পথে ইন্দু বারিক, আমি ও সন্তোষ খুব ভিজে গেলুম ঝড়-বৃষ্টিতে।

পরশু নুটু ধলভূমগড়ে ফিরে গেল। অনেকদিন পরে সে দেশে এসেছিল—দিন চারেক ছিল। একদিন ইন্দুর সঙ্গে বেলেডাঙার ধারের সেই সুন্দর জায়গাটাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম—একদিন মরগাঙে আমাদের কেনা জমিগুলোতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পরশু বিকেলে ইন্দু, মধু কামার ও খুড়ো মাছ ধরচে—আমি বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে হাজির। আকাশের এই অদ্ভুত রং ও রচনার তলায় দলে দলে মানুষে এই রকম মরগাঙের ধারের মত জাল ফেলচে, ছিপে মাছ ধরচে, যুগল ঘোষের মত গরু চরাচ্ছে, তামাক খাচ্চে, পটলের ভুঁই নিড়ুচ্চে—এমনি ঝিঙের ক্ষেতে হলুদ ফুল ফুটচে, কত শত বছর থেকে ভরসন্ধ্যেবেলা—এমনি শান্ত অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা চলচে।

কাল ঊষার পত্র পেলুম লাহোর থেকে, ম্যাট্রিক পাশ করেচে খবর দিয়েচে। সুখী হলুম খবর পেয়ে। সামনের শনিবারে পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের ছোট মেয়ে বুড়ির বিয়ে। সেখানে নিমন্ত্রিত আছি, যেতে হবে শনিবারে।

ক'দিন ভীষণ বৃষ্টির পরে আজ দুদিন আকাশ একটু পরিষ্কার হয়েচে। গত শনিবার ২৬শে শ্রাবণ অক্ষয়বাবুর মেয়ে ছোট বুড়ির বিয়ে হয়ে গেল—সেখানে রাম-জোড়, ছট্টু সিং, সরণপ্রসাদ, যুগল তাদের সঙ্গে দেখা। বহুদিন পরে ইসমাইলপুরের সেই আবহাওয়া যেন ফিরে এল। আগামী শনিবারে এখান থেকে ঘাটশিলা যাবো, নুটু চিঠি লিখেচে।

পরশু ফণি কাকা মাছ ধরতে গিয়েছিল সুন্দরপুরের নীচে মরগাঙে, আমি তার খোঁজে সুন্দরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম। ওপথে অত দূর অনেক দিন যাইনি। বন-কলমীর ফুল ফুটেচে, ঝোপের মাথায়, চারিধার ভরপুর সবুজ, কি অদ্ভুত শোভা ঝোপগুলির। এই ঝোপ-ঝাপ এ অঞ্চলের একটি বৈশিষ্ট্য—এর সৌন্দর্য্য বর্ষাকালে-যে দেখবে সে মুগ্ধ হবে। আর আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা। সেখানে ছোট

ছোট পাতাওয়ালা ভ্যাদ্‌লা-ঘাস হয়েচে, যেন সবুজ মখমলের আসন বিছানো, মাথার ওপর নত হয়ে আছে, পেয়ারা ডালটি। সুরেনদের বাড়ীর পেছনে আর একটা ঝোপে বনকলমী ফুটেচে দেখে সেদিন আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। বিশ্বশিল্পীর এই অপূর্ব্ব সৃষ্টির ও সৌন্দর্য্যের প্রকাশ মনের গভীর অন্তস্তলে সচেতন ভাবে গ্রহণ যে করতে পারে, এ পৃথিবী, ফুলফল, নীল আকাশ, উদার ভূমিশ্রী তার কাছে আপন-রূপে ধরা দেয়।

কাল কলকাতা গিয়েছিলুম—সকালে গিয়ে রাত নটায় ফিরি। আজ ক'দিন থেকেই আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়ে সাঁতার দিয়ে চলে যাই, কুলে কুলে ভরা নদীর ধারে বনঝোপ, সাঁইবাবলা গাছ, নীল আকাশ, শরতের রোদ, ঘুঘুর ডাক—সত্যিই যেন বহুকাল পূর্ব্বেরই বিস্মৃত বাল্যদিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। সাঁতার দিয়ে বাঁশতলায় উঠি, তারপর নিভৃত বনচ্ছায়ায় একস্থানে একটি বনকলমী ফুলের ঝোপের কাছে বসে রইলুম, ওদিকে কি একটা গাছের মাথায় মাকাল লতা উঠে কেমন একটা চমৎকার ঝোপের সৃষ্টি করেচে। রোদ না থাকলে, নীল আকাশ না থাকলে কি শরৎ মানায়? এতদিন শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি! গরম রোদ হবে, লতাপাতার কটুতিক্ত গন্ধ বার হবে, তবে শরতের স্বপ্নলোক নামবে নীল আকাশের অনন্ত মুক্তির চন্দ্রাতপতলে।

আজ কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে সেই পেয়ারা গাছটার তলায় চুপ করে বসি—গাছে উঠিও। গাছে উঠলে যেন অন্য মানুষ হয়ে যেতে হয়--বন্য-প্রকৃতির সঙ্গে যোগা-যোগ যেন আরও নিবিড় আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। নিবারণের ভূঁই থেকে জলে নাম-লুম ও সাঁতার দিতে দিতে কত নল-খাগড়ার বন, ভাসমান কচুরিপানার দাম, কলমী-লতার পাশ কাটিয়ে দোদুল্যমান কত বাবুই পাখীর বাসা, নীল আকাশের তলায় শরৎ মধ্যাহ্নের শুভ্র মেঘস্তূপের দিকে চেয়ে চেয়ে এসে পেঁৗছুলাম বনসিমতলার ঘাটে।

অভিলাষ জেলে ওপারে দোয়াড়ি ঝাড়তে ঝাড়তে বলছে—বাবু ঘোলার গাঙে এমন ভেসে বেড়াচ্চেন কেন? কত আপদ বালাই থাকে, বিপদের কথা কি বলা যায় বাবু? অমন বেড়াবেন না।

অপূর্ব্ব শান্তি ও আনন্দ পাই প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে এমনি ধারা মিশিয়ে দিয়ে।

বিকেলে আজ বাঁওড়ের ধারে বেড়াতে গিয়ে সেই অশ্বত্থ গাছটার ওপর উঠে বসলুম খানিকক্ষণ। দূরে বাঁওড়ের নির্ম্মল জল, আমার চারিপাশে নিস্তব্ধ বনানী। এক জায়গায় কি অজস্র বনকলমী ফুলই ফুটেচে! জেলেপাড়ার ঠিক পেছনের মাঠ-টাতে। সাঁকারীপুকুরের রাস্তা দিয়ে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম।

আজ দুপুরে দুলো সাঁওতালের সঙ্গে হেঁটে এলুম বরাজুড়ি। শরতের নীল আকাশ, দূরে দূরে নীল শৈলশ্রেণী, বাটাইজোড় পার হয়ে ঢ্যাংজুড়ি সারাডোবা প্রভৃতি সাঁওতালী গ্রাম পার হয়ে গেলুম অবশেষে বরাজুড়ি বলে গ্রামে, খোলার অর্ডার দিতে। খোলা অর্থাৎ চাল ছাইবার খাপরা। কি সুন্দর গ্রামটি, ঢুকেই আমার ভাল লাগলো, ছায়া নেমে এসেচে শরৎ অপরাহ্ণের মৌলবনে ও শালবনে, দীঘিতে রক্তমৃণাল ফুটেচে, শ্যামা ধানের ক্ষেত ঠেকচে সুদূরের নীল শৈলমালায়। কার্ত্তিক গোরাই বলে একজন দোকানদার আমাকে খাতির করে চা খাওয়ালে—বল্লে, ধানের জমি বড় সস্তা। দোকানে লোকে এ বিশ্বব্যাপী দুর্দ্দশার দিনে ঘটি বাটি বাঁধা রেখে ছোলা, কলাই (এ দেশে বলে বিরি) নিয়ে যাচ্চে। সন্ধ্যার আগে চলে এলুম! তখন বেশ ছায়া নেমেচে, গুটকে

কেবলই মংলার নিন্দে করচে সারাপথ। আজ এসে পড়লুম সেই চমৎকার কথাটি—

"On the contrary, the wise man is conscious of himself, of God. If the road I have shown to lead to this is very difficult, it can yet be discovered. And clearly it must be very hard when it is so seldom found. For how could it be that it is neglected practically by all, if salvation were close at hand and could be found without difficulty? But all excellent things are as difficult as they are rare."

Ethics—Spinoza

"The really valuable things in human life are individual—what is of most value in human lift is more analogous to what all the great religious teacher have spoken of."

Power—Bertrand Russel.

"The ultimate realities of the universe are at present quite beyond the reach of science, and probably are for ever beyond the comprehension of the human mind." —Sir James Jeans.

"There can never be any real opposition between religion and science; for the one is the complement of the other. It was not by accident that the greatest thinkers of all ages were deeply religious souls."

—Max Planck.

ওপরের কথাগুলো সমর্থন করে আমারই অনুভূতির, যে অনুভূতির কথা আমি এই ডায়েরীর নানা স্থানে নানা আকারে লিখেছি। সেই স্তব্ধ চিন্ময় ভাবলোক যার সন্ধান মেলে নদীতীরে নেমে-আসা অপরাহ্নের নির্জ্জনতায়, বনঝোপে ফোটা বনকলমী ফুলের উদাস শোভায়, আঁধার নিশীথে মাথার ওপরকার জ্বলজ্বলে নক্ষত্র ছিটানো ছায়াপথের বিরাট ইঙ্গিতে। যে জীবনরহস্যের মূল ঊর্দ্ধ্বাকাশে, শাখাপ্রশাখা ধরণীর ধূলিতে।

মিঃ সিন্‌হার মোটরে আমি ও কল্যাণী ধলভূমগড়ে নুটুর বাসায় এসে দেখি গুট্‌কে, মংলা ও গোপাল উপস্থিত। ওখানে বিকেলের দৃশ্যটি বেশ চমৎকার হয়েচে; চা খেয়ে চলি আবার মোটরে, চাকুলিয়া থেকে বর্ষাস্নাত বনের দৃশ্য দেখতে দেখতে মান সমুড়িয়া হয়ে বহরাগড়া ডাকবাংলো পেঁছে গেলুম। সেদিন কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করি। পরদিন অর্থাৎ গতকাল খাড়া মৌদা হয়ে বম্বে রোড দিয়ে দুধকুন্ডী রিজার্ভ ...টর বাংলোতে। খড়ের ঘাটোয়ালি বাংলো, চারিধারে আম ও ফলবান বৃক্ষের ...। নিকটেই বন আরম্ভ হয়েচে, জানালা দিয়ে চোখে পড়চে—এতোয়া বৃষ্টিস্নাত বনভূমি থেকে বন্য শনের ফুল ও বন্য কলাফুলের মত কি ফুল নিয়ে এল। বৃষ্টি পড়চে—কল্যাণী রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' পড়চে, আমি টেবিলে বসে ভাবচি, এ যেন আমার ক্রীত মৌজা, ওই বন আর এই ঘাটোয়ালি বাংলো যদি আমার থাকতো এমন নির্জ্জন স্থানে তবে লিখবার কত সুবিধাই না হোত। কতক্ষণ পরে মিঃ সিন্‌হা বন তদারক করে ফিরে এলেন, আমরাও একটা বনের মধ্যে যেতে যেতে বনবিভাগের রোপিত বোনা গাছ ও শিশুগাছ দেখলাম। বিকেলে বাংলোতে বেড়াতে এলেন হেডমাস্টার মহাশয়। কাল এখানে মিটিং আছে। কি থৈ থৈ করচে space এখানে ডাকবাংলোর আশেপাশে,

অস্ত আকাশের রং অতি অদ্ভুত। গত ফেব্রুয়ারী মাসে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসীর আশ্রমে গিয়ে দেখি আশ্রমটা একেবারে ভেঙে পড়ে গিয়েচে, চালের খড় খসে পড়চে, আমরা সন্ধ্যার পরে আসবার সময় দুটি ছোকরাকে সেখানে দেখলুম—সেই অন্ধকারে ঘরের মধ্যে তারা কি করচে! ওরা নাকি ওখানে আমোদ করতে এসেচে। এই ভাঙা বাড়ীতে এরা গল্প করে বসে। আমাদের তখনই মনে সন্দেহ হোল—পরে শুনলুম ওরা ওখানে বসে গাঁজা খায়। মৃদু জ্যোৎস্নালোকে কতক্ষণ সাঁকোর ওপর বসে ভগবদ্বিষয়ে চর্চ্চা করি। কত রাত পর্য্যন্ত গল্প করলুম বাংলোতে বসে।

সকালে মেঘ ও ঠাণ্ডা দিন। মোটরে কল্যাণী, আমি ও মিঃ সিন্‌হা চলে গেলুম কেশরদা বাঁশবনে। এই বিরাট বাঁশবনের রোপণ ইত্যাদি কাজ বনবিভাগ থেকে করা হয়েচে। নুরুল হক Ranger বল্লে—হুজুর, দু হাজার কাঁটালের চারা পোঁতা হয়েচে।

আমরা কেশবদা গ্রামে চলে গেলুম। এই গ্রামটি বাঙালী ও উড়িয়া অধিবাসীদের গ্রাম। কথার মধ্যে অনেক উড়িয়া শব্দ মেশানো। আমাদের মোটর যেতে অনেক লোক এল—বল্লে, এবার খাদ্যের অভাবে বড়ই কষ্ট হয়েচে লোকের। কল্যাণীকে নিয়ে গ্রাম্য-দেবী স্বর্ণ বাউড়ীর মন্দির দেখি। বহু পুরোনো মূর্ত্তি—নাকমুখ ভাঙা, মন্দিরের আশপাশে অমন ছোট-বড় কত মূর্ত্তি পড়ে আছে। কৃষ্ণ পাণ্ডা বলে ওই মন্দিরের পূজারীর বাড়ী আমরা গিয়ে বসলুম। ওরা কল্যাণীকে নামিয়ে নিয়ে গেল। মাটির ঘর, দেওয়ালে সুভাষ বসু ও গান্ধীর ছবি। একটা লোকের বোধ হয় জ্বর হয়েচে, সে খাটিয়ায় শুয়ে আছে—বল্লে, ম্যালেরিয়া নয়, কারণ ম্যালেরিয়া জ্বর এখানে নেই। কঙ্কালসার ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এল ২৫।৩০টি, এরা নাকি ডোমদের ছেলে, সারা-দিন ভিক্ষে করে বেড়ায় ; এক এক মুঠো সবাই দেয়। চিন্তামণি পাণ্ডা এক ধামা মুড়ি নিয়ে ছেলেদের এক এক মুঠো মুড়ি সবাইকে দিলে, তারপর তারা কাঠ ও গরু চরানো নিয়ে দুঃখ করলে। আমাকে পাণ্ডাঠাকুর বাড়ীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে চিঁড়ে, দই ও দুধ খাওয়ালে। একটা ঘরে নিয়ে গেল, বেতের ঝাঁপি যে কত রয়েচে সারি সারি—পুরীর দোকানের সেই বেতের ঝাঁপির মতো। কোনো ঘরে একটা দরজা জানলা নেই, অন্ধকার সব ঘর। বেলা একটার সময় ওখান থেকে ডাকবাংলো গিয়ে স্নানাহার সেরে নিই। তখনই একটা স্কুলের ছেলে ডাকতে এলে, আমরা গেলুম মিটিংএ। হেড্‌মাস্টারের বাড়ীতে চা ও খাবার খেলুম সাহিত্য সভার পরে। গ্রীক যুবক ডিওডোরাসের যেন আবির্ভাব হোল বহু শতাব্দী পরে।

সন্ধ্যার সময় কল্যাণীকে নিয়ে সুবর্ণরেখার এপারে বোনাজি ঘাটে গিয়ে বসলুম। ওপারে ময়ূরভঞ্জের শৈলমালা, বড় একটা শৈলমালার ওপর প্রকাণ্ড একখানা কালো মেঘ ঝুঁকে পড়ে আছে। এপারে মাঠে নিসিন্দে গাছের বেড়ার ধারে বসে আছি। ভগবানের উপাসনা করলুম সেখানে। কল্যাণী গাইলে, যো দেবগ্নৌ যোঽপ্সু ইত্যাদি উপনিষদের সেই গভীর বাণী।

জ্যোৎস্না উঠেচে—চতুর্থীর ভাঙা চাঁদ। কিন্তু থৈ থৈ করচে মুক্ত space বহরাগড়া ডাকবাংলোর সামনে। কত রাত পর্য্যন্ত আমরা জেগে বসে থাকি রোজ রোজ। এমন দূরপ্রসারী space আর কোথায়? জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা বেড়াতে গেলাম সেই সন্ন্যাসীর ভাঙা আশ্রমটির কাছে।

সকালে বহরাগড়া থেকে বেরিয়ে ধলভূমগড়ে নুটুর মেডিক্যাল ক্যাম্পে এলুম। সেখানে ভাত খেয়ে আবার মোটরে বার হই। একটা কুলীর মেরুদণ্ড ভেঙে গিয়েচে ডিনামাইট ফাটাতে গিয়ে। কল্যাণী তাকে দেখে বড় কাতর হয়ে পড়লো। ধলভূমগড়ের

ক্যাম্পটি বেশ জায়গায়। সামনে দূরবিস্তৃত শালবন ও সবুজ ধানবন। আজ চাকুলিয়ার হাট, সাঁওতাল মেয়েরা ঝাঁটা নিয়ে বিক্রি করতে আসচে চাকুলিয়ার হাটে। কল্যাণী কেবল বলচে, ঝাঁটা কিনলে হোত!

ওখান থেকে এলুম ঘাটশিলা। বেলা ৫টার সময় চা খেয়ে আবার মোটরে বার হই এবং সুবর্ণরেখা সেতু পার হয়ে রাখা মাইন্‌স মিলিটারি ক্যাম্পে লেফ্‌টেনাণ্ট জহুরী ও বোসের আতিথ্য গ্রহণ করি।

সকালে রাখামাইন্‌স থেকে চা খেয়ে বার হয়ে কালিকাপুর রোড আপিসে এসে গল্পগুজব করি। সেখানে হেলিওডোরাসের গল্পটি পাঠ করি। বেশ জায়গা কালিকাপুর। চাঁইবাসা এলুম বেলা বারোটার সময়ে। দ্বিজুবাবু এলেন ঘাটশিলা থেকে—খুব মিটিং হোল। সারারাত্রি কোলহান পার্কে রাত জেগে আবৃত্তি ইত্যাদি করা গেল ও শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চলে এলুম মোটরে চক্রধরপুর। দ্বিজুবাবুকে নামিয়ে দিয়ে আমরা সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে পোড়াহাট পাহাড় ও বনানীর মধ্যে দিয়ে হেসাডি বাংলোতে পৌঁছুলুম। মোটরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল আজ আমাদের দেশের হাটবার ছিল।

মোটরেই ঘুমিয়ে নিলাম। ভোর হোল—চা খেয়ে চলে এলুম হিড্‌নি falls-এ। স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য। উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র বেয়ে এই বড় ঝর্ণাটি পড়চে—চারিপাশে ঘন বনানী, চুনা পাথরের ধ্বসে পড়া চাঁই। স্নান করার সময়ে রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বনের মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে চলার পথ বেয়ে আমি, সুবোধবাবু, মিঃ সিন্‌হা ও পরেশ সান্ন্যাল চলে এলুম। জলপ্রপাতের এপারে পাথরের আসনে বসে লিখচি। জলপ্রপাতের গম্ভীর শব্দ বনের বনস্পতিতে প্রতিধ্বনিত হচ্চে যুগ-যুগান্তের বাণীর মত। কি গভীর শোভা! একধারে বনে অসংখ্য Lantana Camera ফুটে আছে। কানের কাছে সুবোধ কেবল বলচে, চলুন, ফিরে যাই, চলুন ফিরে যাই। এই নির্জ্জন বনের মধ্যে এই অপূর্ব্ব গম্ভীর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে সেই সৌন্দর্য্য-স্রষ্টার উদ্দেশে প্রার্থনা নিবেদন করি। এই স্থানে বনের পরিবেশের মধ্যে বসে তাঁর কথাই আগে মনে পড়ে। ওপরে নীল আকাশ, চারিদিকে বনশ্রেণীর নির্জ্জনতা—সত্যিই হরি রায়ের কথা, আমাদের গ্রামের বহু হতভাগ্যের কথা এখানে না মনে হয়ে পারে?

এবার এই ক'দিনের মধ্যে কত জায়গায় বেড়ালুম। বহরাগড়ার সেই মুক্ত space, কেশরদা গ্রামের সেই উড়িয়া পাহাড় বাড়ী, ধলভূমগড়ের মুক্ত সবুজ ধানের ক্ষেত ও শালবন, রাখা মাইন্‌স-এর মিলিটারি ক্যাম্পে চাঁদ ওঠা রাত্রে বোসের সঙ্গে গল্প করা। সকালে এলুম কালিকাপুর, সেখান থেকে চাঁইবাসা, আবার কল্যকার মত শেষরাত্রের জ্যোৎস্নালোকে চাঁইবাসা থেকে ৪২ মাইল দূরবর্ত্তী হেসাডি বাংলোতে মোটরে আগমন পোড়াহাট অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর আজ এই হিড্‌নি জলপ্রপাতে স্নান সকালবেলা!

চলার গান সার্থক হোক জীবনে। চরৈবেতি।

সামনে চেয়ে দেখি উত্তুঙ্গ শৈলগাত্রের গায়ে থাকে থাকে ঘনশ্যাম বনানী, রাঙা পাথর ও মাটির ক্ষয়িত পর্ব্বতগাত্র, অনেক উঁচুতে বড় বড় বট অশ্বত্থের মত বনস্পতি, তার ওপরে শরৎ দুপুরের নীল আকাশ, পাশেই বিশাল হিড্‌নি প্রপাতের তুলোর বস্তার মত দ্রুত নীয়মান জলধারা, তার ডানপাশে আবার বন, তার নীচে ল্যাণ্টানা ক্যামেরার জংলী রঙীন ফুল। ছায়া পড়েচে মেঘের—অন্য কোনো শব্দ নেই, শুধু জলপতন

ধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত নৈঃশব্দ্য আর বনবিহঙ্গ কাকলী। প্রকৃতির এমন নিভৃত লীলা নিকেতনে মন সৃষ্টিমুখী হয়ে ওঠে, বিশ্বের স্রষ্টার অপূর্ব্ব রহস্যের দিকে মন যায় চলে—এখানে মানুষ ছোট হয়ে গেছে—এই আকাশ, এই কোয়ার্টজাইটের চাঁই বাঁধানো সুবিশাল শিলাসন, এই বনানী, এই ফেনপুঞ্জবাহী দ্রুতপতনশীল জলধারা—এরাই বড়।

পরেশবাবু সেখানে বসে গান গাইছেন। মিঃ সিন্‌হা ডায়েরী লিখচেন—সুবোধ সর্ব্বদা ব্যস্ত, সে চলে গিয়েচে মোটরে। কল্যাণীকে একবার আনতে হবে এখানে। কতদূর এখান থেকে বারাকপুর, কুঠীর মাঠের আমার সেই পেয়ারাগাছের তলাটা, কূলে কূলে ভরা ইছামতী ও তার তীরে কাশের ফুল ফোটা চরভূমি! সেই আমাদের নৌকো করে বনগাঁয়ে যাওয়া আজ যেন স্বপ্ন বলে মনে হয় না কি!

সত্যিই মনে হচ্চে কে যেন আমায় হাত ধরে দেশে-বিদেশে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন নতুবা তো গ্রামে বসে বারিক মণ্ডল ও ফণিকাকার সঙ্গে ধান বোনার গল্প করতাম, হরিপদদার সঙ্গে মোকদ্দমার ষড়যন্ত্র করতাম।

ভগবানকে এজন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।

তারপর কি চমৎকার রাস্তা দিয়ে মোটরে এসে বসলুম। সুবোধবাবু যে রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সে রাস্তা এটা নয়, এপথে বড় বড় বনস্পতির ঘন ছায়া—এক ক্ষুদ্র ঝর্ণার ওপর পাথরের সাঁকো, একটা শিউলি গাছে যথেষ্ট কুঁড়ি ধরেচে। যেন ঋষির পবিত্র তপোবনের স্থান। তারপর চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়ের শোভাও অদ্ভুত। মোটর চলচে কালকার রাত্রের বনভূমি ভেদ করে। বনকলমী ফুল আরও কত কি ফুল বনের মধ্যে ফুটেচে এই বর্ষাশেষে। ২000 হাজার ফুট উঁচু টেবো বাংলোর ধার দিয়ে গাড়ী চলেচে—পাশে বর্ষার উদ্দাম এক পাহাড়ী নদীর গৈরিক জলধারা। শিউলি গাছ মুকুলিত হয়েচে এ বনেও। সুবোধকে বলি—সাহিত্যিকদের জন্য আপনারা P.W.D. থেকে এখানে একটা বাংলো তৈরি করে দিন না। যেখান থেকে সমতলভূমির দৃশ্য সুন্দর দেখা যায়, সেখানেই একথা উঠলো। জলতেষ্টা পেয়েছিল, রাঁচি রোডে নেমে নাক্‌টি বাংলোতে এসে গাড়ী থামিয়ে জলের সন্ধানে গেল ড্রাইভার। বেলা তখন একটা, কিন্তু ডাকবাংলোর চৌকিদারের টিকি দেখা গেল না কোথাও। তখন জলের আশা ছেড়ে দিয়ে চক্রধরপুরে এসে জল খাওয়া গেল, নগেনবাবুর ছেলে জল নিয়ে এল।

রাত্রে সুবোধবাবুর বাড়ী দু'চারটি ভদ্রলোকের সামনে গল্প পাঠ করলুম।

আজ দিনটি বেশ পরিষ্কার। পরশু রাত্রে সারারাত্রি হৈ-হৈ-এর পরে খুব আরামের ঘুম হয়েচে। সুবোধ ও অবিনাশবাবু এসে চা খাওয়ার সময়ে গল্প করলেন--চালের দর, ট্রেনে ভীষণ ভিড়। প্রেমচাঁদের গল্প 'বেটি কা ধন' ও 'সুহাগ কী শাড়ী' দুটি হিন্দীতে পাঠ করা হোল চায়ের টেবিলে। এখানে বেশ সাহিত্যিক আবহাওয়া। মনে পড়চে কাল এ সময়ে সৌন্দর্য্যময় বনভূমির মধ্যে বসে ছিলাম। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সেই উত্তুঙ্গ শৈলগাত্র, রাঙা মাটি ও চুণা পাথরের ধ্বস্ নামা খাড়া দেওয়াল, সেই অজস্র Lantana পুষ্প। আজ আকাশ খুব নীল, হেসাডি ডাকবাংলোতে কাটানোর উপযুক্ত দিন যেন এগুলি।

সন্ধ্যায় সুবোধবাবুর বাড়ীতে চায়ের আসরে আমার গল্প দুটি পড়া হোল—গ্রীক যুবক হেলিওডোরাস কি করে বাসুদেবের ভক্ত হোল ও 'ভিড়'। রাত্রে ফিরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়ি। কোল্‌হান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে মিত্র, আরও কয়েকটি উকীল

উপস্থিত ছিলেন।

ভোরে উঠে আমি ও মিঃ সিন্‌হা চা খেয়ে হিন্দী সাহিত্যিক প্রেমচাঁদের বই পড়ি। জগৎ সিং এসে ভাণ্ডে ভাণ্ডে অর্থাৎ 'আমি বার বার বলচি' গল্পটি করলেন। এই গল্পটি ওঁর মুখে কতবার শুনেচি—যতবার শুনি, নতুন লাগে প্রতিবার। সুবোধবাবু এসে বল্লে—সে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কেম্পের গাড়ীতে টাটা চলে যাচ্ছে। একটু পরে ঘাটশিলা থেকে মুকুল চক্কত্তি এল। তার পর আমরা মোটরে বার হয়ে ভবানী সিংহের বাড়ী যাই। গত ৩০শে চৈত্র এঁর বাড়ীতে কম্পাউণ্ডে বসে আমরা চা খেয়েছিলাম—চাঁইবাসার বাইরে অপূর্ব্ব মুক্ত space-এর বাহার, একদিকে নীল শৈলমালা—বরকেলা ও সেরাইকেলা। আমার মনে হল সেরাইকেলা শৈলমালাই বরাবর গিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরার পাহাড়ে শেষ হয়েছে, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। মস্ত বড় হাট বসেচে চাঁইবাসায়—বাসমতী চাল বিক্রি হচ্ছে ৩২্ টাকা মণ। কিন্তু অত সুন্দর চাল।

সেই সন্ধ্যায় ট্রেনে এসে টাটানগর পৌঁছে গেলুম ও বাদাম পাহাড়ের যে গাড়ীখানা প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে, তাতেই শুয়ে রইলুম। ছোটনাগপুরের অধিবাসী হয়ে গিয়েচি আজকাল। বরকাকানা ও মুরী থেকে রাঁচি এক্সপ্রেস আসবে তারই সন্ধানে বার বার গাড়ী থেকে নামচি কিন্তু গাড়ী পেলুম না। ভোরে বম্বে মেল ধরে ঘাটশিলা পৌঁছুই। আসানবনী ছাড়িয়ে দূর থেকে আমাদের অতি পরিচিত সিদ্ধেশ্বর ডুংরির মোচাকৃতি শিখরদেশ দেখে মনে কি আনন্দ! বাড়ী এসেচি মনে হোল বহুদিন প্রবাস যাপনের পর। ওই সেই মিলিটারি ক্যাম্প রাখা মাইন্‌স-এর—শনিবার রাত্রে যেখানে লেফটেনাণ্ট জহুরী ও বোসের অতিথি হয়ে রাত কাটিয়েছিলাম। গালুডির বিষ্ণু প্রধান যাচ্ছে এ গাড়ীতে, সে নমস্কার করে বল্লে, কোথায় নামবেন? আমি বল্লাম, ঘাটশিলায়।

রেডিও বক্তৃতা দিয়ে বারাকপুর গিয়েছিলুম একদিনের জন্যে। শিউলি ফুল ফুটচে দেখে এসেচি। বেশ লাগলো একটা দিন। তবে ম্যালেরিয়াতে সবাই ভুগচে। ফণি রায় ও আমি একসঙ্গে বেলা দুটোর গাড়ীতে চলে এলুম। ঘাটশিলা যেদিন এলুম, সেদিন সুরেশবাবুও এলেন আমার সঙ্গে।

ক'দিন খুব জ্যোৎস্না। আজ চতুর্দ্দশী, কাল কোজাগরী পূর্ণিমা। রাত ৮॥০টা পর্য্যন্ত দ্বিজেন মল্লিকের বাড়ী বসে গল্প করলুম—তারপর মনে হোল আজ জ্যোৎস্নাটি মাটি করবো? কোথাও যাবো না। অত রাত্রে সেই অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাতে হন্ হন্ করে হেঁটে চলে গেলুম ফুলডুংরি।

রাত ন'টা। বেশি রাত্রির জ্যোৎস্না। আমার সেই প্রিয় স্থানটিতে পাথরের ওপর গিয়ে যোগাসনে বসলুম। দূরে বুরুডি ও বাসাডেরা পাহাড় ও বনানীর মাথায় একটি নক্ষত্র অনন্তের হৃদ্‌স্পন্দনের মত টিপ টিপ করে জ্বলচে। জ্যোৎস্নাস্নাত বনভূমি ও ফুলডুংরি পাহাড়ের সে রূপে মন মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে উঠেচে। মুখে কথা বলতে পারি নে—এমন একটি অবশ, আড়ষ্ট ভাব। ভগবানের উপাসনা এখানে নীরব ও ভাবঘন, সমাহিত। বিশাল প্রান্তরের যেদিকে চাই—জ্যোৎস্নালোকিত ধরিত্রী যেন জন্মমরণ-ভীতি-ভ্রংশী কোন্ মহাদেবতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের আনন্দে নিস্পন্দ সমাধিতে অন্তর্মুখী। শুধু দেখা যায় বসে বসে এর অপূর্ব্ব রূপ, শুধু অনুভব করা যায় গোপন অন্তরে এর সে নীরব বাণী। চারিদিকে নিঃশব্দ, এক তো নির্জ্জন প্রান্তর—এত রাত্রে এখানে কেউ আসে না—ভূতের ভয়ে স্থানীয় লোক এদিকে নাকি থাকে না বেশি রাত্রে—মানুষের গলার সুর এতটুকু কানে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট

হয়ে যায় আমার। সুতরাং প্রাণভরে এই নির্জ্জনতা ও নৈঃশব্দের বাণী শুনলাম বসে বসে কত রাত পর্য্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা এখানে বসলে ভয় হয়—এই বুঝি কোন কলকাতার চেন্‌জার বাবুরা পুত্রপরিবারসহ হাওয়া খেতে এসে পড়ে কলকোলাহল করতে করতে! এত রাত্রে মন একেবারে নিরুদ্বেগ সেদিক থেকে। বেশ জানি এ সময় জনপ্রাণী আসবে না এদিকে। মন শঙ্কাশূন্য ও নিরুদ্বেগ না হোলে কি প্রকৃতির সৌন্দর্য্যসুধা উপভোগ করা যায় ঠিকমত ?

আমি ক'দিন ধরে ভাবচি এমনি সব নির্জ্জন স্থানের কথা। সেদিন পাঠকবাবু বলছিল, রায়পুর (C.P.) থেকে ১৮৪ মাইল দূরে বাস্তার স্টেটের রাজধানী জগৎদলপুরের গল্প। ধাম্‌তারি ছাড়িয়ে (রায়পুর থেকে ৫০ মাইল দূর) ঘন বন পথের দুধারে—এমন এক বনের মধ্যে মানববসতি থেকে বহুদূরে খুব বড় বড় গাছের ছায়ায় শিলাসনে বসে আছি, সকাল বেলাটি, অসংখ্য পক্ষীকুলের কলরব, অদূরে স্নিগ্ধসলিলা গোদাবরী (ওখানে অবিশ্যি গোদাবরী নেই, আমার কল্পনা) কুলুকুলু রবে উপলবন্ধুর পথে বনপাদপের ছায়ায় ছায়ায় বয়ে চলেচে। নির্ভয়ে বিচরণশীল মৃগযূথ আমার শিলাসনের কাছে কাছে তৃণ আহরণ করচে—এমন একটি ছবি প্রায়ই মনে আসে।

কাল বিকেলে ফণি এল—ওর সঙ্গে অমরবাবু এসেচেন কিনা দেখতে গেলুম। পথে ব্রাউন সাহেবের সঙ্গে দেখা—ব্রাউন বল্লে, অমরবাবু আসেনি। তারপর রেলের বাঁধের ওপর দুজনে বসলুম, বেশ চাঁদ উঠেচে। পরশু কল্যাণী, উমা ও বৌমাকে নিয়ে ফুলডুংরি বেড়াতে গিয়ে অনেকক্ষণ বসে ছিলাম।

আজ মিঃ সিন্‌হা চিঠি লিখেচেন তাঁর সঙ্গে সারেণ্ডা বেড়াতে যাবার জন্যে। ৮ই তারিখে এখান থেকে চাঁইবাসা যাবো—সেখান থেকে সারেণ্ডা রওনা হবো। সারেণ্ডা বিখ্যাত অরণ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি অপূর্ব্ব। সিংভূমের বিখ্যাত বন। ওখানে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ কি ছাড়তে আছে ?

ঘাটশিলা থেকে বন ভ্রমণের জন্য বেরিয়ে রাত ১১টার গাড়ীতে চাঁইবাসা রওনা হই। সঙ্গে রইল ওভারসিয়ার নসিরাম। বেশ শীত রাত্রে। সিন্‌হা সারেণ্ডা বনের ভার পেয়েছিলেন এ মাসে। গোটা বনটা ঘুরে আসবেন, আমায় নিমন্ত্রণ করেচেন। তাঁরই আহ্বানে আসা।

চাঁইবাসাতে সুবোধবাবুর আপিসে বসে সকালে চা খেলুম ও অনেক গল্পগুজব হোল। কাল বেলা একটার সময় চাঁইবাসা থেকে রওনা হয়ে এলুম হাটগামারিয়ায় পরেশ সান্যালের ওখানে। তারপর বনপথে মোটর ছুটলো। টক্‌টকে লাল মাটির পথ ও দুধারে ঘন জঙ্গল। আগে নোয়ামুণ্ডী, পরে এলুম গুয়া। দুই জায়গাতেই টাটা ও আর একটি কোম্পানীর লৌহ সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েচে—লোহার পাহাড় কেটে লৌহপ্রস্তর টন্‌ টন গাড়ী বোঝাই করে নিয়ে চলেচে। গুয়াতে একটি বাঙালী ভদ্রলোকের বাড়ী চা-পানান্তে আবার ঘনতর জঙ্গলের পথে এলুম কুম্‌ডি বাংলোতে। নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কারো নদী পার হয়ে অদ্ভুত বনশোভা—ফুটন্ত পিটুনিয়া ও বন্য কাঞ্চনের প্রাচুর্য্যের মধ্যে সন্ধ্যায় গাড়ী কুমডি পৌঁছে গেল। ডাকবাংলোর কাছেই বনের ভেতর দিয়ে কোইনা নদী কলকল শব্দে বয়ে চলেচে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী—কাল রাসপূর্ণিমা। জ্যোৎস্নারাত্রে আমরা পায়ে হেঁটে কোইনা নদী পার হয়ে বনের মধ্যে কতদূর বেড়াতে গেলুম। লোকালয় নেই কোথাও—গুয়া ছাড়িয়ে ষোল মাইল অবিচ্ছেদে অরণ্যপথ দিয়ে এসে বনবিভাগের এই বাংলো। বনের পথে বেড়াতে বেড়াতে

দেখলুম সেই বিরাট অরণ্যের প্রাচীন বনস্পতি শ্রেণীর মধ্যে শুক্লা চতুর্দশীর জ্যোৎস্নার রূপ। জ্যোৎস্নাস্নাত বিশাল অরণ্যানী যেন প্রাচীন ঋষির মত শান্ত, সমাহিত। এক-একটা গাছ নাকি ১৫০।১৬০ বছরের। আমার প্রপিতামহের শৈশবেও এ সব গাছ এমনিই ছিল।

বড় ঠাণ্ডা। শিশির পড়চে। কারো নদীর ধারে অনেকক্ষণ বসে তারপর বাংলোতে ফিরে এলুম। বন্য হস্তীর ভয়ে বেশিক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে বসতে সাহস হোল না।

আজ বেলা ১২টার সময়ে মোটরে রওনা হয়ে মাইল চারেক গিয়ে এক বনের মধ্যে গাড়ী রেখে শশাংদা বুরু আরোহণ শুরু করলাম। শশাংদা বুরু সারাণ্ডা অরণ্যের সর্বোচ্চ পাহাড়—উচ্চতা ৩০৩৮ ফুট। প্রায় কালিম্পং-এর উচ্চতা। মোটর ছেড়ে ৫।৬ জন লোক বনপথে পাহাড়ের গা কেটে বনবিভাগের তৈরি রাস্তা বেয়ে চলেচি। একদিকে শৈলগাত্রে নিবিড় অরণ্য, দুটি ঝর্ণা বনের মধ্যে কলধ্বনি করে নেমে চলেচে। বনের মধ্যে বন্য কদলী-বৃক্ষ—ঠিক যেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের মত। একটা স্থানে এসে পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করলুম। খাড়া উঠেচে, অতি দুরারোহ শৈলগাত্র, নিবিড় বনের মধ্যে সোজা হয়ে উঠে চলেচে। একটা বনমোরগ আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে বনের মধ্যে পালালো। বড় বড় মোটা মোটা শাল, ধ, রকম, আসান, লুদাস, পানজন, আর্দ্দী, বন্য কাঞ্চন, টীহড় লতা আরও শ' দুশো রকমের গাছ ও লতাপাতা। ৬০।৭০ বছরের পুরোনো টীহড় লতা (bohinia vallai) গাছের কাছে ঠেলে উঠেচে। এক এক জায়গায় পাহাড়ের ও বনের ফাঁকে দূরের ছোট বড় পাহাড় চোখে পড়ে। চাড্ডা গাড়া নামক পার্ব্বত্য ঝর্ণার কলকল জলপতন ধ্বনি বনে বনে, স্তরে স্তরে যেন নেমে চলেচে নীচের দিকে—উপত্যকার নিবিড় অরণ্যে এ গম্ভীর শব্দ একটি উদাত্ত সংগীতের সৃষ্টি করেচে। বড় ক্লান্তি হচ্চে। এত দুরারোহ পাহাড়—শেষের দিক যেন আরও বেশি। পা যদি সামান্য একটু পাথরেও আটকে যায়—তাও যেন তুলে ফেলতে কষ্ট হচ্চে। ঘন ঘন হাঁপাচ্চি—মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে এক রকম যন্ত্রণা হচ্চে। ধূমপান করবার জন্যে সেই খাড়া পথের এক জায়গায় বসলুম। সামনের দৃশ্য আরও স্পষ্ট করবার জন্যে সংগের বনবিভাগের গার্ড কুড়ুল দিয়ে bohinia vallai-র একটা মোটা লতা কেটে দিলে। Forest Officer ও রেঞ্জ অফিসার শ্রীরাসবিহারী গুপ্তকে একটি গল্প শোনালুম। দুজনেই শুনে খুব খুশি। যেখানে চাড্ডা ঝর্ণা পড়চে—সেখানে নালা পার হবার সময়ে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—Take courage in both hands, দাদা। আমি বললুম—একটা হাত আটকানো—লাঠি ধরে আছি যে! প্রকাণ্ড আম গাছ বনের মধ্যে এই স্থানে দেখলুম। আজ গোপালনগরের হাট, এতক্ষণ হাটে চলেচে লোকে।

ওপরে উঠে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে চলে গিয়ে একটা জলাশয়ের ধারে এলুম। সেখানে নরম কাঁদায় কত রকম পশুর পদচিহ্ন। হো ফরেস্ট গার্ডকে আমরা ডেকে বললুম—কি কি জঙ্গলের জানোয়ারের পায়ের দাগ আছে দেখ। সে দেখে বল্লে—হুজুর হাতী, বাইসন, সম্বর, বুনো শুওর বেশি।

আমি বললুম—বাঘের পায়ের দাগ?

—নেই হুজুর। বাঘ এখন এখানে জল খেতে আসবে না। একটা গাছের ছায়ায় গাছের ডাল-পালা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। চা পান করে বেলা ৪টার সময় রাসবিহারীবাবু বল্লেন—চলুন, বড্ড হাতীর ভয় বেলা পড়লে। তারপর এখানে কি

ভাবে একটা বাঘের গর্জ্জন শুনেছিলেন, সে গল্প করলেন। হো কুলী বললে—বাবু রাং আনা—উনি বুঝতে পারেন না। শেষে দেখলেন কুলী পিছিয়ে পড়চে। তখন শুনলেন বাঘ ডাকচে বনের মধ্যে। আর একবার একটা হাতীর হাতে পড়েছিলেন, কুলী ছিল সঙ্গে। সে ওঁকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঢালুর দিকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে গেল। আসবার সময় আরও অদ্ভুত দৃশ্য। হলুদে রোদদুর পাহাড়ের মাথায়, আরণ্যবনস্পতি-শীর্ষে। নামচি, নামচি—সেই দুরারোহ পথে হড়কে পড়ে যাওয়ার ভয় প্রতি মুহূর্ত্তে। রোদ কমে এল। বনের ছায়া নিবিড়তর হচ্চে। এক জায়গায় barking deer ডাকচে, ঠিক কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ আওয়াজ করে। বনের আমলকী পাড়িয়ে নিয়ে খেতে খেতে এলুম। বনের মধ্যে কামিনী ফুলের গাছ দেখলুম এক স্থানে।

নীচে নেমে বনের মধ্যে দিয়ে প্রায় দেড় মাইল হেঁটে এসে আমাদের মোটরের কাছে এলুম। গুয়া রেল স্টেশন থেকে শশাংদাবুরু প্রায় ১৬॥ মাইল। এ অপূর্ব্ব বনশোভা যদি কেউ দেখতে যান তবে হেঁটে তাঁকে আসতে হবে এই ১৬॥ মাইল পথ। কোথাও কোনো লোকালয় নেই—শশাংদাবুরু মালভূমি বা তার আশপাশে কোথাও একখানা বন্যগ্রাম পর্য্যন্ত নেই। পথে যথেষ্ট বন্য হস্তীর ভয়। আমরা মোটরে আসচি কুম্‌ডিতে শশাংদাবুরু থেকে নেমে—হঠাৎ ফরেস্ট গার্ড হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে —হাতী! হাতী!

আমরা সকলে চেয়ে দেখি উপত্যকার ওপারে শৈলসানুর বনে একটা লাল রংএর ধুলো মাখা হাতী বনের মধ্যে আমাদের দিকে পিছন ফিরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কেবলই ভাবচি শশাংদাবুরুর ওপরে কেউ যদি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বেশ হয়।

আজ আবার রাসপূর্ণিমা। সন্ধ্যায় বাংলোর বারান্দাতে বসে চা খাচ্চি—পূর্ণ-চন্দ্র উঠলো বনের মাথায়। গোপালনগরের হাট করে বাড়ী ফিরচে পণ্ডা মাস্টার ওর গরুর গাড়ীতে। বাংলোটি চমৎকার স্থানে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, ঘন বন। পাশেই দিনরাত শুনচি কোইনা নদীর কুলুকুলু শব্দ বনের মধ্যে। জ্যোৎস্নারাত্রে নদীর ধারে একটা শালগাছের শুক্‌নো গুঁড়ির ওপর গিয়ে বসলুম। আমি ও মিঃ সিন্‌হা। জল চক্‌ চক্‌ করচে জ্যোৎস্নায়।

আজ ভগবানের বিরাটরূপ প্রত্যক্ষ করেচি শশাংদাবুরুর শৈলারণ্যে—তিনিই সব জায়গায় ছড়িয়ে রয়েচেন। প্রাচীন বনস্পতিতে তাঁর গম্ভীর রূপ—আবার বন্য ভুঁদাম, বন্য চিরেতার অতি সুন্দর পুষ্পে তাঁর কমনীয় রূপ। তিনি অব্যক্ত, অনন্ত।

আমার মনে হয় সারেণ্ডা ভ্রমণের মন ছিল আমার বহু দিনের। তাই তিনিই দয়া করে যোগাযোগ ঘটালেন। এ এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা জীবনের। সেই শৈলশীর্ষে রাঙা রোদ, ঘন বনে সেই চাড্‌ডা ঝর্ণার জলপতনধ্বনি, সেই প্রাচীন বনস্পতি-শ্রেণী, দূরে দূরে অগণ্য শৈলমালার সমারোহ—সেই সুগন্ধি বন্য কুসুমরাজি—এ সব যদি আমি না দেখতুম মনের মধ্যে এর ছবি যদি না এঁকে রাখতুম—তবে আমার জীবন ফাঁকা থেকে যেতো। হে বিশ্বশিল্পী, তোমাকে এই করুণার জন্য ধন্যবাদ।

কি চমৎকার কমলালেবু কুমডি বনবিভাগের বাংলো-সংলগ্ন বাগানে। ফলভারে গাছ অবনত হওয়া বলে—সত্যিই তাই। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সকালে খেয়ে দেয়ে আমরা বনপথে থলকোবাদ রওনা হলুম। সারাণ্ডা অঞ্চলের বনের মধ্যে কোথাও ফাঁক নেই—৩৩০ বর্গ মাইল (ছয় লক্ষ একর) ব্যাপী ছেদহীন নিবিড়

অরণ্য। কোইনা নদী পার হয়ে কিছুদূরে বড় বড় শাল গাছ দেখা গেল। পথে বনে সত্যিই চাঁপাফুলের গাছ দেখা গেল—ভেড্‌লোডিয়া নয়, সত্যিই চাঁপা। কোদলিবাদ নামক বন্য গ্রামে একটি বনান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ছিলেন ১৯২৬ সালে—যখন তিনি প্রথম বনবিভাগে ঢোকেন। আমরা সেই কুটিরে গেলুম—বন এসে পৌঁছেচে ঘরের উঠানে। চারিধারে বন ও পাহাড়। মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—অদূরে বনে barking deer ডাকতো—কত শুনেছি! বিকেল ৪টার সময় থলকোবাদ বাংলোতে এসে গাড়ী থেকে নামলুম। জঙ্গল ও পাহাড়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র শৈলোপরি এই অতি সুন্দর বাংলোটি অবস্থিত। আমরা পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাচ্চি, নিকটের শৈলারণ্যে কর্কশ স্বরে একটা পাখী ডেকে উঠলো। বিজয় আরদালী বল্লে—ময়ূর। সে এই সারাণ্ডা বিভাগে অনেকদিন আছে। তারপর একটা গম্ভীর শব্দ শোনা গেল—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বর। আমি বাংলোর পিছনে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে খানিকটা বসলুম। পাথর বেরিয়ে আছে, শুকনো খটখটে জায়গা। অজস্র বনতুলসীর গাছ। সন্ধ্যার আগে আমরা থলকোবাদ গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে বেড়াতে গেলুম। আমি, রাসবিহারী গুপ্ত ও মিঃ সিন্‌হা। ঘন বন, অন্ধকারে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকচে। ওঁরা প্রথমটা যেতে চাননি হাতীর ভয়ে। সারেণ্ডা অরণ্য বন্যহস্তীতে পরিপূর্ণ। একজন কর্ম্মচারী বল্‌ছিল বাংলোর কম্পাউণ্ডে রোজ রাত্রে হাতী আসে। যেখানে সাইনবোর্ডটা আছে, সেখানে তিন দিন আগে হাতী এসে সাইনবোর্ডখানা উপড়ে ফেলেছিল খুঁটিসুদ্ধ। আবার পোঁতা হয়েচে। বনের মধ্যে আমরা বসে আছি, সেই ঘন-অন্ধকারে ভরা বনভূমির কি রূপ! ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায় এখানে, এই সময়ে। চাঁদ উঠলো একটু পরে দূরে বনের মাথায়। রাসবিহারীবাবু বল্লেন—আজ দেখচি পূর্ণিমা। আমিও লক্ষ্য করলুম পূর্ণচন্দ্রই বটে। যদিও ভেবেছিলুম কালই পূর্ণচন্দ্র উঠেছিল। দুটি লোক বনের মধ্যে সুঁড়িপথ বেয়ে অন্ধকারে আসছিল—আমাদের দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ালো। কাছে এলে বল্লুম—কোথায় গিয়েছিলি? তারা বল্লে—বাজারে।

—কোথায় বাজার?

—বালজুড়ি।

—কতদূর?

—পাঁচ ক্রোশ বাবু। বোনাইয়ের মধ্যে।

শুনলুম এই অরণ্যের দক্ষিণে কেউন্‌ঝর ও বোনাই স্টেট্—পশ্চিমে গাংপুর। উড়িষ্যার বনপর্ব্বত-সঙ্কুল দুটি রাজ্য। কি চমৎকার পূর্ণচন্দ্র উঠলো বনের ফাঁক দিয়ে। পেছন দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচি বনের গাছের গায়ে জ্যোৎস্না পড়ে অদ্ভুত শোভা হয়েচে। এ বারাকপুরের বাঁশবন নয়—শ্বাপদসঙ্কুল বন্যগজ-অধ্যুষিত ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমি—সারাণ্ডা। সিংভূমের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, নিবিড়তম ও ঘনতম অরণ্য।

কয়েকটি গাড়োয়ান Bengal Timber Co.'র কাঠ বোঝাই করে থলকোবাদ গ্রামে সন্ধ্যাবেলায় গাছতলায় রেঁধে খাচ্চে। আমরা গিয়ে আলাপ করলুম। তাদের নাম রিকসা, নীলা, সল মাহাতো। বাড়ী জেরাইকেলা। দিন এক টাকা হিসাবে পায় গাড়ী-ভাড়া বাবদ। ঘন-জঙ্গলের পথে প্রত্যেক মাসে তিনবার আসে ভাড়া বইতে। ছ'দিন করে থাকে।

আমরা বল্লুম—কি রাঁধচিস?

—ভাত আর দাল।

—আর কিছু?

—না বাবু।

বনের মধ্যে রওনা হবে শেষরাত্রে উঠে। এই ভীষণ শীতে শালগাছের তলায় মুক্ত হাওয়ায় শুয়ে রাত কাটাবে। বিছানা নেই—একখানা বন্য খেজুরের ছেঁড়া চেটাই ও আধছেঁড়া পাতলা মলিন কাঁথা সম্বল। শুনলুম পথে বাঘের উপদ্রব আছে। গত বৎসর চলন্ত গাড়ী থেকে বাঘে অনেক বলদ নিয়ে পালিয়েছিল। রাসবিহারীবাবু এ উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সম্বলপুরের অরণ্যে সকাল আটটার সময় গরুর গাড়ী থেকে বলদ নিয়ে গিয়েচে বাঘে—তিনি জানেন, স্বচক্ষে দেখেছেন।

ভাবলুম—এই দরিদ্র সরল লোকগুলিই ভারতবর্ষের প্রাণবস্তু। অথচ কি দুঃখ-পূর্ণ জীবন এদের! নিরাবরণ আকাশতলে হিমবর্ষী রাত্রে কাঁথা গায়ে শোবে, বাঘের মুখে রাত্রে গাড়ী চালাবে—মজুরি কত, না দৈনিক এক টাকা!

অনেক রাত্রে বাংলোর বাইরে চেয়ার পেতে বসলুম। অদূরে গম্ভীর শৈলারণ্যের জ্যোৎস্নাস্নাত রূপ কি বর্ণনা করা যায়? ভগবানকে যদি ঠিকমত উপলব্ধি করতে চাও, তবে এইখানে এই পটভূমিতে সেই বিরাটের রূপ ধ্যান কর—লোকালয়ের কলকোলাহল থেকে বহুদূরে ময়ূর-নিনাদিত অরণ্যভূমির প্রান্তে। এই হিমবর্ষী আকাশতলে ঐ দরিদ্র গাড়োয়ানদের ছেঁড়া চেটাইতে শুয়ে রাত কাটাও। একটা প্রবন্ধ লিখব, প্রবন্ধটার নাম দেবো—'বনান্তে সন্ধ্যা'। ভগবানের সৌন্দর্য্য সে সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করচি—যেদিকে চাই, সেদিকেই বিরাটের আসন পাতা, সেই মহাশিল্পীর হাতের কাজ চারিদিকে ছড়িয়ে। জয় হোক তাঁর।

এক জায়গায় পাতার কুঁড়ে বেঁধে জনকতক লোক রেঁধে খাচ্চে সন্ধ্যাবেলা। ওদের হো ভাষায় কি জিজ্ঞেস করলে রাসবিহারীবাবু। ওরা হো ভাষাতেই জবাব দিলে। শুনলাম ওদের বলে 'আরাকাশি', বোনাই ও গাংপুর স্টেট্ থেকে আসে আমের কাঠ চেরাই করতে। ওদের পাতার কুঁড়ের কাছে একটা বিরাট আট ফুট পরিধি-বিশিষ্ট শালগাছ, উচ্চতায়ও প্রায় ৫০।৬০ ফুট। বনস্পতি একেই বলে—বৃক্ষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা হয় দেখলে।

গভীর রাত্রি। আমরা বাংলোর বাইরে ত্রিশ গজ আন্দাজ গেলুম। রাসপূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র মাথার ওপর উঠেচে। একটা উঁচু টিলা—অথবা সেটা এই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ চূড়া—সেখানে ঘাস নেই, শুকনো খটখটে জায়গা—মাঝখান দিয়ে পথ, দুধারে শাল ও আমলকী বন। আজ বৈকালে যেখানে গিয়ে বসেছিলুম সেখানটাতে গিয়ে দাঁড়াই। জ্যোৎস্নার বর্ণনা নেই—এ জ্যোৎস্না-স্নাত বনভূমি ও অদূরবর্ত্তী শৈলমালার বর্ণনা নেই। কে দিতে পারে এর বর্ণনা? গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে একমাত্র শব্দঘন বনের কোথায় অবিশ্রান্ত জলপতনধ্বনি। এ ধ্বনি বনের মধ্যে চাড্ডা ঝর্ণায় শুনেছি শশাংদাবুরু আরোহণের সময়, এ শব্দ শুনেছি কাল ও পরশু রাত্রে কোইনা নদীতে ঘন বনে—কুম্‌ডি বাংলোতে—আবার থলকোবাদ বাংলোতেও শুনচি। কোথায় একটা সম্বর হরিণ পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে গম্ভীর আওয়াজ করলে। মাথার ওপরে দু-চারটা নক্ষত্র, সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যাচ্চে।

টিলার দক্ষিণে যে শালবন, তার শিশিরসিক্ত পত্রপুঞ্জ জ্যোৎস্নায় চক্‌চক্ করচে। ডাইনে একটা গাছের গায়ে বন্যহস্তী তাড়ানোর উঁচু মাচা। এই গভীর রাত্রে অরণ্য-নিঃশব্দতার মধ্যে—দূরবর্ত্তী অপরিচিত পাহাড়ী ঝর্ণার জলপতনধ্বনি ও দু-একটা নৈশপাখীর কূজন দ্বারা দ্বিখণ্ডিত যে গম্ভীর নৈঃশব্দ্য, এর মধ্যে কান পেতে থাকলে যেন কার বাণী শুনতে পাওয়া যায়। শুনলামও তাঁর বাণী, শুনে সারা হৃদয়মন

জয়ধ্বনি করে উঠলো সেই বিরাট স্রষ্টা, সেই সৌন্দর্য্যশিল্পী, সেই রহস্যময় অনন্তের উদ্দেশে। মুখে কিছু বলা যায় না। পনেরো মিনিট বাইরে ছিলাম এই পৌর্ণমাসী রজনীর মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে বাংলো থেকে কিছুদূরে বনের মধ্যে টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে বাংলোর সাদা বাড়ীটা বা কোনো লোকালয়ের চিহ্ন চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় একা আমি এই জনহীন গভীর বনভূমিতে এই গভীর রাত্রে আকাশ ও বনের দিকে চেয়ে আছি—এই পনেরো মিনিটে পনেরো বছরের জ্ঞান সঞ্চয় হোল। চোখ যেন খুলে গেল। তাঁর জয় হোক।

সকালে উঠেচি—মিঃ সিন্‌হা ডেকে বল্লেন—ময়ূর দেখুন! পাশের উপত্যকায় মাঠের মধ্যে ছ-সাতটি বড় বড় ময়ূর দেখে বড় খুশি হই। বেলা দশটার সময় মোটরে বার হয়ে আমরা 'কোদলিবাদ ১৫-এর' ঘন জঙ্গলে গেলুম। কায়াউলি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রথমে পেলুম। বড় বড় পাথর বাঁধানো জায়গা। পাথরের ওপর দিয়ে নদী বয়ে চলেচে। বনের পথে নামচি উঠচি—দুধারে শৈলশ্রেণী—আবার এক ঝর্ণা। তারপর কোইনা নদী ঘন বনের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে। কোইনা নদীর পাষাণময় তীরের ঘন বনের ধারে বসে আমি ১৯৩১ সালের ব্ল্যাকউড্‌স ম্যাগাজিনে 'Cast adrift in the woods' বলে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়তে লাগলুম। মাঝে মাঝে মুখ তুলে চেয়ে দেখি ঝোপ ও লতা দিয়ে তৈরি নিবিড় বন যেন বাংলাদেশের বনের পদ্ধতি-বিশিষ্ট—যেন কুঠীর মাঠের বন—শুধু শাল আসান নয়। পথে তিন রকমের ফুল অজস্র ফুটে—দেবকাঞ্চন, বন্য পিটুনিয়া ও ঈষৎ সুগন্ধ-বিশিষ্ট এক রকমের হলদে ফুল, বেশ দেখতে। কামিনী ফুলের গাছ জঙ্গলের মধ্যে যথেষ্ট। সকালে চমৎকার আলোছায়ার খেলা জঙ্গলে- নিবিড় ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য্যালোক এসে পড়েচে, বন্য-পক্ষীর কূজন, কোইনা নদীর মর্ম্মর কলতান, বামে নদীর ওপারে প্রায় দুশো গজ দূরে পাহাড়শ্রেণী কি সুন্দর লাগছিল। ভগবানকে মন থেকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। আরও কিছুদূরে গিয়ে কোইনা নদী আর একবার ঘুরে আমাদের পথে এসে পড়ল—এখানে একদিকের পাড় উঁচু ও প্রস্তরময়, নিবিড বনাবৃত। এখানে অনেকক্ষণ বসলুম। কমলালেবু দিলেন মিঃ গুপ্ত। কি পাখীর গান! কি বনানীশোভা! ভূতধাত্রী ধরিত্রী অপূর্ব্বরূপে সজ্জিতা এই ঘনবন পর্ব্বতান্তরালে।

আজ সকালে উঠে ঘন বনের পথে মিঃ সিন্‌হা, মিঃ গুপ্ত ও আমি রওনা হই বোনাই স্টেটের সীমানা দেখতে। পথে গভীর অরণ্যের মধ্যে কোইনা নদী (যার সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েচে কুম্‌ডি বাংলোর পাশে) কুলুকুলু তানে বয়ে চলেচে, হঠাৎ আমার নজর পড়লো প্রস্তরবহুল একটি চমৎকার জায়গা কোইনা নদীর মধ্যে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বনের মধ্যে যেখানেই এসব দেশে নদী বয়ে যায়, সেখানে গতিপথে নানা সুন্দর দৃশ্যের সৃষ্টি করেই অগ্রসর হয় নদী, পদে পদে রমণীয় শোভা বিতরণ করতে করতে চলে। পাথরের বড় বড় চাঁই, গাছপালা, বিহঙ্গকাকলী, সুগন্ধি তরুচ্ছায়া, মর্ম্মর জল-কলতান—যাকে বলে বিউটি স্পট্‌ (beauty spot) তার আর বাকী রইল কি? কিন্তু এ জায়গার বিশেষত্ব এই, এখানে নদীর মধ্যে যে চড়া সৃষ্ট হয়েচে, যেখানে বালি, বড় জোর পাথরের নুড়ি কি দু-দশখানা পাথরের চাঁই থাকা উচিত ছিল, সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান মাকড়া পাথর (Labrite) দিয়ে যেন বাঁধানো। কত হাজার বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কোইনা নদী এমনি বয়ে চলে মাটি ক্ষইয়ে তুলে ফেলে তলাকার পাথর বার করে ফেলেচে, সে পাথরেরও নানাস্থানে

মৌচাকের মত অসংখ্য গর্ত্ত সৃষ্টি করেচে। তার প্রায় ৫০।৬০ হাত চওড়া, ১৫০ হাত লম্বা এক সমতল পাষাণের চত্বর-মত নদীর খাতের মধ্যে, কে যেন পাথর দিয়ে বাঁধিয়ে রেখেচে। ঘন বন এর উভয় পাশে, থলকোবাদ নিজেই বনের মধ্যে—সেখান থেকে ছ' মাইল এসেচি মোটরে ঘনতর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—তারপর এই সুন্দর ছায়াভরা, পাষাণময়, জলকলতানমুখর, জনহীন স্থানটি। আরও কিছুদূরে একটি বন্যগ্রাম, নাম করমপদা, তার ওধারে নুয়াগাঁও ও বনগাঁও ব'লে আরও দুটি গ্রাম। গ্রাম বলতে যা বোঝায় তা এসব নয়, বনবিভাগ থেকে এদের বিনা খাজনায় চাষের জমি দেওয়া হয়। ফসল করে তুলতে পারে না বন্যহস্তী ও সম্বর হরিণের উপদ্রবে। বনগাঁও গ্রামের দৃশ্যটি ছবির মত। গাড়ী থেকে নেমে আমরা একটা ছোট্ট টিলার ওপরে বসলুম শাল-গাছের ছায়ায়, আমাদের সামনে ক্ষুদ্র কোইনা নদী সরু নালার মত বয়ে চলেচে, কারণ এই নদীর উৎপত্তিস্থান অদূরবর্ত্তী বোনাই সীমান্তের শৈলমালা, এখান থেকে মাইল খানেক মাত্র দূর। নদীর ওপারে ঢেউ-খেলানো জমি পাহাড়ের মত উঠে গিয়েচে, তার গায়ে হরিৎবর্ণ ফুলে ভরা সরগুঁজা ক্ষেত, সবুজ কুরথীর ক্ষেত, দশটা খড় ও মাটির কুটির, গরু মহিষ চরচে মাঠে, মেয়েরা কাজ করচে ক্ষেতে, ওদের সকলের পেছনে কেউন্‌ঝর রাজ্যের ঘনবনাবৃত শৈলমালা। স্থানটি গভীর অরণ্যের মধ্যে এবং চারি-দিকে দূরে দূরে পাহাড়। আরও এগিয়ে গেলুম বোনাই রাজ্য ও সারেণ্ডা বনের সীমান্তে। একটা উঁচু পাহাড়ের গায়ে পাঁচশ' ফুট জায়গা ফাঁকা, সব গাছ কেটে সীমা চিহ্নিত করা হয়েচে। তারপর আমরা নেমে গেলুম—ভাবলুম, বোনাই স্টেট্ একবার বেড়িয়ে আসা যাক না। রাস্তা ক্রমশঃ নীচের দিকে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—কোনোই পার্থক্য নেই সারেণ্ডা অরণ্যের সঙ্গে। মোটা মোটা লতা বড় বড় প্রাচীন বনস্পতিশ্রেণীকে পরস্পর সংযুক্ত করেচে, ফাঁক রাখেনি কোথাও, কালকার সেই হলুদ ফুল পথের ধারে আলো করে ফুটে আছে, নিস্তব্ধতা তেমনি গভীর, যেমন কিছু পূর্ব্বে সারেণ্ডাতে দেখেচি।

নেমে যেতে আমাদের সামনে পড়লো একটা সংকীর্ণ উপত্যকা, দুদিকে পাহাড়-শ্রেণী দ্বারা ঘেরা। শুধুই বনস্পতির সমারোহ, শুধুই বনশীর্ষ, শুধুই সবুজের মেলা। একটা কুসুম গাছের তলায় আমরা বসলুম। বনের মধ্যে কর্কশস্বরে কি পাখী ডাকচে। ফরেস্ট গার্ডকে বললুম—ময়ূর? সে বল্লে- নেহি হুজুর, ধনেশ পাখী। বড় বড় ঠোঁটওয়ালা ধনেশ পাখী দেখেচি বটে, কিন্তু দেখেচি কলকাতায় খাঁচায় বন্দী অবস্থায়। এমন ঘন বনে তার আদিম বাসস্থানে, উড়িষ্যার বোনাই স্টেটের অরণ্যে ওর ডাক শুনবো, এ ভাগ্য কখনো হয়নি। ভেবে দেখলুম যেখানে বসে আছি, নিকটতম রেলস্টেশন থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪০ মাইল- এও জীবনে কখনো ঘটেনি! কলকাতায় যেতে হোলে এখান থেকে কদিনের হাঁটাপথে গুয়া বা জেরাইকেলা গিয়ে ট্রেনে চড়তে হবে।

বসে আছি, আমাদের সামনের সরু-পায়ে-চলা পথ দিয়ে এক কৃষ্ণকায় তরুণ দেবতার মত যুবক, হাতে-বোনা খাটো মোটা কাপড় পরনে, এক হাতে তীরধনু, অন্য হাতে একটা পুঁটুলিতে কি বাঁধা—মাথায় লম্বা লম্বা কালো চুলে কাঠের চিরুনি গোঁজা—ব্যস্ত ও চঞ্চলভাবে কোথায় চলেচে। আমরা ডাকলুম ওকে। সে বল্লে গির্জ্জায় যাচ্চে, বড় ব্যস্ত। হো ভাষায় বল্লে—মিঃ গুপ্ত তার সঙ্গে কথা বল্লেন এবং সে কি বলচে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। নাম তার মসি, কি তার হাসি, কি তার মুখের সুন্দর ভঙ্গি। তাকে না দেখলে এই গভীর আরণ্য-প্রদেশ যেন জীবন্ত হয়ে উঠতো না। প্রাচীন দিনের মৌন অরণ্য যেন মুখর হয়ে উঠলো ওর মুখের ভাষায়। ভাল

লেগেচে সেই বন্য যুবকের আনন্দ-চঞ্চল গতি, হাসিমাখা মুখ, সরল চোখের চাহনি। নিকটেই কুম্ভী বলে একটা গ্রাম আছে বোনাই স্টেটের। পথে ঢেতী নায়েক বল্লে—গাঁয়ের লোককে বাঘে মেরেচে, পাঁচ বছর আগে সে নাকি দেখেচে। এক বৃদ্ধ লোককে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলাম, তার নাম শামো, তার ভাইয়ের নাম কামো। উড়িয়া ভাষায় কথা বল্লে।

তারপর রাত্রে ও-বেলার সেই কোইনা নদীর সুন্দর জায়গাটাতে এসেচি। ঘন বনের মধ্যে চাঁদ উঠেচে, আমরা মোটরে এসে পেঁৗছুলাম। শামো (কামোর ভাই—সে নিজের পরিচয় দিতে গেলে সর্ব্বদাই ভাইয়ের উল্লেখ করে।) এবং কয়েকটি লোক এই বনের মধ্যে আগুন করে বসে আছে। আমাদের জন্যে তাদের এখানে থাকতে বলা হয়েছিল।

জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনভূমি। রাত্রি দেড়টা। বিশাল সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে পার্ব্বত্য কোইনা নদীর কলতানের মধ্যে বসে আছি, কৃষ্ণাদ্বিতীয়ার চাঁদ মাথার ওপর এসেচে। মহামৌন অরণ্যানী যেন এই জলকলতানের মধ্যে দিয়ে কথা বলচে। কি সে অদ্ভুত, রহস্যময় সৌন্দর্য্য—এর বর্ণনার কি ভাষা আছে? যে কখনো এমন হাজার বর্গ মাইল নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে বন্য-নদীর পাষাণতটে জ্যোৎস্নালোকিত গভীর নিশীথে না বসে থেকেচে, তাকে এ গম্ভীর সৌন্দর্য্য বোঝাবার উপায় নেই। এই বন্য-হস্তী-ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত অরণ্যের মধ্যে এই কোইনা নদী হাজার হাজার বছর এমনি বয়ে চলেচে, হাজার হাজার বছর ধরে প্রতি পূর্ণিমায়, প্রতি শুক্লপক্ষে, চাঁদ এমনি উঠে বনভূমি পরিপ্লাবিত করেচে, এই কোইনা নদীর এই সুন্দর স্থানটিতে আলো-ছায়ার জাল বুনেচে, এমনি সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করেচে—কিন্তু কেউ দেখতে আসেনি এর অদ্ভুত রূপ। নদীর মধ্যে ক্ষুদ্র যে একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েচে, সেই জলটি অনবরত পড়ে পড়ে এক ক্ষুদ্র সরোবরের মত হয়েচে...ওপারের বিরাট বনস্পতিশ্রেণীর ছায়া এখনও তার ওপর থেকে অপসারিত হয়নি—যদিও চাঁদ মাথার ওপরে, জলপ্রপাতের জলধারা চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করচে, শিকররাশি গভীর শীতের রাত্রের ঠাণ্ডায় জমে ধোঁয়ার মত উড়চে—ওর পাষাণময় তটে বসে মনে হোল, বনের মাথায় ওই যে দু'চারটি নক্ষত্র দেখা যায়, ওই নক্ষত্রলোক থেকে অপরিচিত রূপসী দেববালাগণ অদৃশ্য চরণে নেমে আসেন এমনি জ্যোৎস্নাশুভ্র নিশীথ রাত্রে এই গভীর অরণ্যানীমধ্যস্থ সরোবরে জলকেলি করতে ইতর চক্ষুর অন্তরালে। মহাকাল এখানে অচঞ্চল, স্তব্ধ, মৌন বনস্পতিশ্রেণীর মত ধ্যান-সমাহিত। এই আকাশ, এই নির্জ্জন জ্যোৎস্না, এই নিশীথ রাত্রি, এই গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলচে—সে শব্দহীন বাণী ওই বন্য নদীর চঞ্চল কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠচে প্রতি ক্ষণে—কিংবা গভীর অরণ্য নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পেঁৗছে দিচ্চে। চুপ করে বসে জলের ধারে আকাশের দিকে চেয়ে, চাঁদের দিকে চেয়ে, বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে জ্যোৎস্না-লোকিত শীর্ষদেশের দিকে চেয়ে সে বাণীর জন্য চোখ বুজে অপেক্ষা করো—শুনতে পাবে। সে বাণী নৈঃশব্দ্যের বটে, কিন্তু অমরতার বার্ত্তা বহন করে আনচে। এই অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েচে এই অরণ্য-শান্তির মধ্যে, বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েচে এখানে—এই সমাহিত স্তব্ধতায়—নগরীর কল-কোলাহলের মধ্যে নয়। আজ এখানে এসে মনে হচ্চে, অশোকের সময়েও এই কোইনা নদী ঠিক এমনি বয়ে চলতো এই গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে—এই অরণ্য আরও গভীরতর ছিল—তারও পূর্ব্বে আর্য্যদের ভারতবর্ষ প্রবেশের দিনেও এই নদী এখানে এমনি চঞ্চল কলোচ্ছ্বাসে নৃত্যশীলা বালিকার নূপুরবাজানো পা-দুটির মত নৃত্য-

ভঙ্গিতে ছুটে চলতো, উদাসীন প্রকৃতি এমনি সাজিয়েছিল এ বনভূমিকে কিন্তু কেউ কখনো দেখুক না দেখুক—প্রশ্নও করেনি। আজ আমরা এসেচি, করুণাময় বিশ্ব-শিল্পী যেন প্রসন্ননেত্রে হাসিমুখে নীরবতার মধ্যে দিয়ে ওই জলকলতানের মধ্যে দিয়ে বলচেন—কেউ দেখে না, কত যুগ-যুগান্তর থেকে এমনি সাজিয়ে দিই—প্রতি দিনে, প্রতি সন্ধ্যায়, প্রতি রজনীতে—আজ এলে তোমরা এতদিনে? বড় আনন্দ হচ্চে আমার। দেখ, ভাল করে দেখ।

জয় হোক তাঁর, জয় হোক সে মহাদেবতার!

তারপর শ্যামের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলি। ওর ভাই কামো কেমন আছে? সত্তর বছরের বৃদ্ধ, এই করমপদা নামক বন্য গ্রামেই তার জন্ম, আর কোথাও যায়নি—যাবেও না। পঞ্চাশ বছর আগে একবার চাঁইবাসা গিয়েছিল—রেলগাড়ী জীবনে কখনো চড়েনি। তাকে আমরা মোটরে জাতিসিয়াং পর্য্যন্ত নিয়ে এলুম।

তারপর সেই নিবিড় অরণ্যের শিশিরসিক্ত গাছপালায় গভীর রাত্রের জ্যোৎস্না-লোক পড়েচে—সে কি চমৎকার রূপ! মোটরে ফিরবার সময় চেয়ে দেখি কত গাছ, কত পাথর, কত নিবিড় বনঝোপ—আমার ঠাকুরদা সেদিন ছেলেমানুষ ছিলেন—এসব বনে তখনও ঠিক এমনি জ্যোৎস্না পড়তো—হে প্রাচীন অরণ্যানী, এই অঞ্চলের যে ইতিহাস তুমি জানো, কেউ তা জানে না।

পরদিন সকালে চা পান করে মোটরে বেরুলাম আমি ও মিঃ সিন্‌হা। সুন্দর পাহাড় ও বনের পথে খুব উঁচু পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা। এক জায়গায় বনের মধ্যে O. T. T. কোম্পানী রেলওয়ে স্লিপার চেরাই করচে। আজই সকালে একদল ময়ূর দেখেছিলুম থলকোবাদ বাংলো থেকে। লৌহপ্রস্তর ছড়িয়ে পড়ে আছে বনের মধ্যে, কোনো-কোনোটি বেশ ভারী, প্রায় ৫০ ভাগ লোহা আছে শতকরা। ওখান থেকে আর এক জায়গায় এসে শৈলচূড়ার ওপারের রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—দূরে দূরে আরও পাহাড় দেখতে পেলাম। কিন্তু নেমে দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে গিয়ে আর কিছুই দেখতে পাইনে, বড় বড় গাছে চোখের দৃষ্টি আটকেচে। কমলালেবু খেলুম বসে। একটা পাইথনের খোলস পড়ে আছে পথে, মুড়ে দিলেন কাগজে মিঃ গুপ্ত। তারপর দূর দূর পাহাড়ের দৃশ্য দেখতে দেখতে, পাশের চওড়া বনাবৃত উপত্যকাভূমির দিকে চোখ রেখে নামচি—ওপর থেকে দেখতে পাচ্চি পথ নেমে নেমে চলেচে এঁকেবেঁকে পর্ব্বতের গা দিয়ে। হঠাৎ একটি সুন্দর স্থানে এলুম, বাংকিগাড়া বা ওরেপুরা বলে একটি নদী বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে। ওপরের টিলার বড় বড় শালগাছের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি কুটির। পথে একটা শালগাছ দেখেছিলুম একশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরোনো, দশ ফুট বেড় গুঁড়ির। আমার ঠাকুরদাদা যখন জন্মাননি, প্রপিতামহ ঠাকুর যখন যুবক, তখন এই শাল ছিল ক্ষুদ্র চারা, কি শক্তি ছিল ওর মধ্যে যে এই ক্ষুদ্র দু ইঞ্চি চারা এই বিশাল বনস্পতিতে পরিণত হয়েচে, এখনও নাকি বাড়চে। ব্রহ্মশক্তি রয়েচে বিশ্বের সব তাতে। এই সব না দেখলে শুধু 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' আওড়ালে কি হবে। উপলব্ধি করা চাই। ব্রহ্মশক্তিকে উপলব্ধি করা চাই। বাবুডেরাতে চা পান করে আমরা রওনা হলুম—বেলা সাড়ে তিনটা। তারপরেই ঘন বনের পথ, নিবিড় ট্রপিক্যাল অরণ্যানী যেন, ডিকেনড্রাম ফুল ফুটে আছে—ফুল নয়, কচি পাতা, দেখতে ফুলের মত। একদিকে ওরেবুরা বয়ে চলেচে সংকীর্ণ উপত্যকা-পথে নিবিড় বনের মধ্যে দিয়ে। আসাম অঞ্চলের মত অরণ্য। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। একস্থানে মোটরের পথে আবার এই সুন্দরী পর্ব্বতদুহিতা আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালা। কুলুকুলু-তানে ওর সানুনয় অনুরোধ, আমাকে ভাল করে দেখ। চলে যেও না। এই

স্থানটিতে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত, নদীর মধ্যেই। সুনিবিড় বনস্পতিশ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় নদী বয়ে চলেচে, এক পাড়ে দুটি তিনটি কুটির বনের মধ্যে। সাবাই ঘাস বিছানো। তার ওপর বসে ভগবানের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি মনে মনে উপভোগ করলুম। চমৎকার স্থান বটে। পেছনের বড় বড় গাছে অপরাহ্ণের রাঙা রোদ। যেন মুনিঋষিদের আশ্রম, মনে হয় পুরাকালে কোনো উপনিষদের কবি ও দার্শনিক ঋষি এমনই সুন্দর, নিভৃত, শান্ত বনঝর্ণার তারের কুটিরে পার্ব্বত্য অরণ্যের ঘন ছায়ায় বনকুসুমের সুগন্ধ, চঞ্চল উচ্ছ্বাসময়ী বন্য নদীর নৃত্যছন্দের নূপুর-ধ্বনি ও বিহঙ্গের কলতানের মধ্যে বসে সমাহিত মনে উপনিষদ রচনা করেছিলেন, বিশ্বদেবের উপাসনা আপনাআপনি সরল ও সহজ আনন্দের মধ্যে দিয়েই এখানে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তাঁর উদ্দেশে মনের কৃতজ্ঞতাই তাঁর পূজার অর্ঘ্য। এই স্থানটির নাম দিলুম বনশ্রী।

জেরাইকেলা থেকে আট মাইল এ স্থান, সোজা রাস্তা, চলেচে জেরাইকেলা স্টেশন।

আবার চলেচি, পথে জেরাইকেলা থেকে পাঁচ মাইলে পড়লো সাম্‌টা নালা। এমন চমৎকার নদীগুলির নাম এদেশে মোটেই সুন্দর নয়—বড় কর্কশ নাম দেয় হো ভাষায়। আমাদের বাংলা দেশের অনেক বাজে নদীরও নাম এদের চেয়ে কত ভাল। এই সাম্‌টা নালা পার হয়েই এক রাস্তার মোড়—এক রাস্তা গিয়েচে থলকোবাদ তিরিলপোসি হয়ে। সাম্‌টা নালা বেয়ে কিছুদূর এসে গাছপালার প্রকৃতি যেন বাংলা দেশের মত। ঘন নিবিড় বনানী, বনকলা গাছ, ঝোপঝাপ লতাপাতা, ঠিক যেন বাংলা দেশ। আমার ভিটেতে বারাকপুরে যে গাছ আছে, যার চটি জুতোর মত ফল হয়, এখানে ছোটনাগপুর ইন্‌ডাস্ট্রিস থেকে যেখানে গাছ কেটেচে সেখানে অবিকল এমনি গাছপালা। শালগাছ নেই, বাংলার মত আরণ্য গাছ। দশ মাইল দূরে একটি অতি সুন্দর উচ্চ স্থান থেকে ঠিক যেন হিমালয়ের দৃশ্য—সামনে সংকীর্ণ উপত্যকায় সামটা সাপের মত দুটি কুণ্ডলী দিয়ে বেঁধে কুণ্ডলীর বেষ্টনীর মধ্যে সবুজ একটি দ্বীপ সৃষ্টি করেচে—সামনে স্তরে স্তরে পাহাড় উঠেচে, তার ওপর দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলেচে—দূরে একটি কুটি দেখা যাচ্চে উপত্যকার ওপারে সবুজ বনানীর মধ্যে ডুবে আছে। শুনলাম নিকটেই কোথায় বনের মধ্যে একটি জলপ্রপাত ও একটি গুহা আছে। 'In the mountain fastnesses of Hazaribag' ভাগলপুরের সেই উকীল বাবুর কথা মনে পড়লো। সে পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখবার বাসনা ১৯২৬ সাল থেকেই আছে, তহশিলদারের ভাইয়ের মুখে সাতনামা পাহাড়ের বর্ণনা শুনে যা দেখবার বাসনা জেগেছিল। ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াবো, এই তো চাই। তারপর আমার মুক্তি হোক না হোক, আমি স্বর্গে যাই না যাই—এসব ভাবনা আমার নেই। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব্ব শিল্পী যিনি এই দৃশ্য সৃষ্টি করেচেন যুগে যুগে তিনি থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনি সুন্দর ভাবে কল্প থেকে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে, রূপে রূপে তিনি লোক-লোকান্তর পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল, চপল, আনন্দোজ্জ্বল নৃত্যচ্ছন্দে হেসে গেয়ে। তিনি দীর্ঘজীবী হোন, চিরজীবী হোন।

ফরেস্টার বুড়ীউলি হো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লে—ওই হেন্দেকুলি B. T. T. কোম্পানীর কুলীর তাঁবু। আমরা চলে এলুম পাহাড়ের পথ ঘুরে ঘুরে শুধু বনফুলের শোভা দেখতে দেখতে হেন্দেকুলী তাঁবুতে। এখানে বনবিভাগের একটা ছোট্ট বাংলো আছে পথের পাশের উঁচু টিলাতে। নিচেকার জমিতে সামটা নালার ধারে অনেক কুলি মেয়ে-পুরুষ সন্ধ্যায় সারি সারি আগুন জেলে ভাত রাঁধচে। ওরা

গাঙপুর স্টেট থেকে এসে 'আরাকাশি' অর্থাৎ কাঠ চেরাইয়ের কুলীর কাজ করচে। সেই বনের মধ্যে ঘন ছায়ায় জন কুড়ি-ত্রিশ মেয়ে-পুরুষকে ভাত রেঁধে খেতে দেখে এমন ভালো লাগলো! ওপরে পাতা-ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসে ওদের সঙ্গে গল্প করি আগুনের পাশে বসে। ওদের টিলার বাংলো থেকে সামনের পাহাড়ের ও চারিপাশের বনের দৃশ্য অতি গম্ভীর। এই হেন্দেকুলি ক্যাম্প জেরাইকেলা স্টেশন থেকে দশ মাইল। বেড়াতে এসে এখানেও একদিন থাকা যায়। হেন্দেকুলি ছাড়িয়ে জঙ্গল আবার নিবিড়তর, সামটা নালার দিকে পথ ঘুরে ঘুরে নামতে লাগলো হেন্দেকুলি থেকে—ক্রমেই ঘন জঙ্গল, এখানে দুটি-তিনটি রঙীন্ বন-মোরগকে পথের এপাশ থেকে ওপারে জঙ্গলের মধ্যে উড়ে যেতে দেখলুম—তখন সন্ধ্যা হয়ে আসচে, অন্ধকারে অরণ্যপথ নিবিড় হয়ে গম্ভীর শোভা ধরেচে। ফরেস্টার বলচে, এ পথে বড় বাঘ আর হাতীর ভয়। গাড়োয়ানদের গরু প্রায় বাঘে মারে। হাতী তো এখন এই সন্ধ্যায় বার হয়। বাঘও এই সময় পাওয়া যায়। দুদিকের কালো অন্ধকারে, ঢাকা বন যেন চেপে ধরেচে ক্ষুদ্র মোটরখানা। ভয় করচে দস্তুরমত। আমরা অবিশ্যি থলকোবাদ পৌঁছবার আগে একটা Barking deer (কোৎরা) ছাড়া আর কিছুই দেখলুম না। চা খেয়ে বাংলোতে আগুনের ধারে বসে গল্প করলুম, তারপর আমার বাংলোর কাছেই অন্ধকারে একটু বেড়িয়েও এলুম। কাল সারারাত্রি কেটেচে জাতি সিরাং-এ কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভে। আজ ঘুমুতে হবে সকাল সকাল। কোৎরা ডাকচে গভীর বনে। ভাঙা চাঁদ উঠেচে বনের মাথায়। রাত ভোর হোল ঘুমিয়ে।

পরদিন সকালে উঠলুম। খুব ভোর। অদূরবর্ত্তী শৈলচূড়ার বনানীশীর্ষে এখনও প্রাতঃসূর্য্যের আলো পড়েনি। যেখানে জল গরম হচ্চে, সেখানে আগুন পোয়াতে গেলুম। Ada Cambridge-এর 'The Retrospect' বইখানা পড়লুম রোদে বসে। আজ এখুনি থলকোবাদ থেকে চলে যাবো তিরিলপোসি। কল্যাণীকে ও মন্মথ-দাকে পত্র দিয়েছি। কল্যাণীর জন্যে মন কেমন করচে।

ভাবলুম, ওকে আনলে হোত। এই দৃশ্য দেখে কি খুশিই হোত।

বারাকপুরের লোক এখন কি করচে? আমাদের মোটর বারান্দার সামনে এনে জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে। দুপুরবেলা। ১২৷৷টা হবে, সামনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্ব্বত্য অরণ্যের পটভূমিতে শুভ্রকাণ্ড শিমূল গাছটার দিকে চেয়ে কত কথাই মনে হয়। বারাকপুর, সেই ইছামতী তীরের বনঝোপ থেকে এ সময় বনমরচে ফুলের সুগন্ধ উঠচে—কত দিন দেখিনি। বিরাট সারেণ্ডা অরণ্যানীর মধ্যে বসে প্রকৃতির মনোহর রূপ, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, এই বনানী, এই শৈলমালা দেখতে দেখতে বহুদূরের সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামটির সেয়াকুল-ঝোপের কথা কেন বার বার মনে পড়চে। কেন পড়চে কে বলবে?

থলকোবাদ বাংলো থেকে বের হয়ে বাংলোর সামনে পয়োপ্রণালী দেখতে ঢুকলুম জঙ্গলের মধ্যে। এমন জঙ্গল যে ভয় হোল এই দুপুরেই বুঝি বাঘে ধরে। মোটর ছেড়ে গিয়েছিলুম, আবার চলে এলুম গাড়ীতে। ছোট্ট যে পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্চে থলকোবাদের সামনে, জেলার গেজেটিয়ারে তার উল্লেখ আছে। সারেণ্ডার ও সাধারণতঃ সিংভূমের সব পার্ব্বত্য নদী ও ঝর্ণা সম্বন্ধে কর্ণেল ডলটনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ—
"In the reserved forests the wooded glens and valleys, traversed by river and hill streams, have a peculiar charm. Here will be found

pools, shaded and rock-bound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

থলকোবাদ বাংলোর নিকটে যে ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলকুল শব্দে বনের নীরবতা ভগ্ন করে আপন মনে নেচে চলেচে, তার সম্বন্ধেও একথা বলা যায়। যদিও ওরেবুরা ও সামটা নালা সম্বন্ধে এবং কোইনা নদী সম্বন্ধে একথা বেশি খাটে।

কর্ণেল ডলটনের উক্তি আমি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে বসে পড়ি বোধ হয় ১৯৩৪ সালে। তখন থেকেই সারেণ্ডা ফরেস্ট দেখবার ইচ্ছে ছিল। কে জানতো তা এভাবে পূর্ণ হয়ে একদিন, ন বছর পরে সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে তিরিলপোসি বন্য গ্রামের বনবিভাগের বাংলোতে বসে একথা লিখবো।

আরও কিছুদূর এসে এক জায়গায় বনের মধ্যে ঢুকে আমরা শিশিরদা বলে একটা জলাভূমি দেখতে গেলুম। সুনিবিড় বনানী, ঢুকতে যাচ্চি এমন সময় ভীষণ চীৎকারে বনভূমি কাঁপিয়ে কি জানোয়ার ডেকে উঠলো। সঙ্গের ফরেস্টার বল্লে—কোৎরা অর্থাৎ Barking deer—কিন্তু সামান্য হরিণে যে এত শব্দ করতে পারে প্রথমে এ বিশ্বাস হচ্ছিল না। বনের চেহারা দেখে ভয় হয়ে গেল। ডানদিকে পাহাড়ের সানুদেশে নিবিড় অরণ্য, বাঁয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা জলাভূমি, শুধু দাম দলে পূর্ণ, জল দেখা যায় না—অজস্র কাশফুল ফুটেচে—এই পাহাড়ী পাথরের দেশে এমন জলাভূমি আর কোথাও দেখিনি—সারা সিংভূমে আছে কিনা সন্দেহ। সারেণ্ডাতে তো নেইই।

আমরা পাঁচ-ছজন যাচ্চি—মিঃ সিন্‌হা, তিরিলপোসির ফরেস্টার, একজন হো, দুজন গার্ড। কিন্তু ওরাই বলেচে বুনো হাতীর বড় ভয় এখানে, যেতে যেতে জলার ধারে হাতীর পায়ের চিহ্ন দেখলাম অনেক জায়গায়। একটা প্রকাণ্ড আমগাছকে কি একটা শক্ত লতায় এমনি জড়িয়ে ধরেচে যে দেখে কেমন যেন বিস্ময় বোধ হোল। কখনো দেখিনি এমন, আমগাছের পাতা দেখা যায় না নীচের দিকে, যা কিছু পাতা সবই সেই লতাটার। তারপর একটা নরম মাটিওয়ালা জমি পড়লো। সেখানকার বড় গাছগুলো কাটা হয়েচে বনবিভাগ থেকে—ফলে এক প্রকার কাঁটাওয়ালা ফলের গাছ হয়েছে আমাদের দেশের ওকড়া ফলের মত। পা রাখবার স্থান নেই এতটুকু।

ফরেস্টার বল্লে—এই জায়গায় একটা 'খো' আছে পাহাড়ের গায়ে।

—'খো' কি ?

—কেভ্।

আমরা তো তখনি কৌতূহলী হয়ে উঠলুম। দেখতেই হবে গুহা। মিঃ সিন্‌হা একবার বল্লেন—চলুন, বেলা যাচ্ছে, জায়গাটা ভাল নয়। ফরেস্ট গার্ড কিছুক্ষণ আগে হাতীর গল্প বলছিল। একজন ফরেস্টারকে কি ভাবে বেলা চারটার সময় তিরিলপোসি থেকে আসবার সময় হাতীতে তাড়া করেছিল, কি ভাবে সে সাইকেল ফেলে পালালো। এই বনের মধ্যে এ গল্প সাহসপ্রদ নয় একথা বলাই বাহুল্য। তবে বুনো-হাতী ও বাঘের গল্প সারেণ্ডার সর্ব্বত্র এ ক'দিন শুনে শুনে খানিকটা অভ্যস্তও হয়ে গিয়েছি।

বল্লুম—চলুন, দেখেই আসা যাক একবার।

সেই কাঁটাওয়ালা ফলগুলো কাঁটার মত কাপড়ে ও জামায় বিশ্রীভাবে বিঁধে যেতে লাগলো। এক জায়গায় সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় নরম মাটিতে কি দেখে ফরেস্টার হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। বল্লে—বাঘের পায়ের দাগ। বড় বাঘ।

—ঠিক তো ?

—একেবারে ভুল নেই—

ফরেস্ট গার্ড'ও বল্লে—বড় বাঘের পায়ের দাগ। আর দেখুন, হুজুর, এগুলো বাইসনের—

তা বলে তো ফেরা যায় না। বল্লুম।

এক জায়গায় বন্য অশ্বগন্ধার পাতা তুলে দেখালে ফরেস্টার। আর একটা পরিষ্কার স্থান দেখিয়ে বল্লে—সম্বর এখানে রোদ পোয়ায়। সম্বরের পায়ের দাগ দেখুন কত—

সত্যি, অনেক জানোয়ারের পায়ের দাগ বটে। সম্বর কিনা জানি না, গরু বা মহিষের পায়ের দাগের মত--তবে তার চেয়ে কিছু ছোট। বাইসনের পায়ের দাগ ঠিক মহিষের মত।

ফাঁকা জায়গা পার হতে পনেরো মিনিট সময় লাগলো। স্থানটি অতীব wild—তিনদিকে বনাবৃত পাহাড়ে গোল করে ঘিরেচে, জল ভূমির দিকে সংকীর্ণ ফাঁক। লোহা-চোয়ানো রাঙা জলের একটা ঝর্ণা ফাঁকা মাঠ দিয়ে জলাভূমির দামদলের মধ্যে প্রবেশ করলো। রাস্তা থেকে অনেক দূর, প্রায় এক মাইলের বেশি। লোকালয়ের তো চিহ্নই নেই এসব অঞ্চলে। তার ওপর কাঁটাওয়ালা ফলের নীচু আগাছার জঙ্গলের মধ্যে বাইসন, হাতী ও বাঘের পায়ের দাগ। বেলা পড়ে এসেচে। জানোয়ারে তাড়া করলে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু গুহা না দেখে ফিরচি না। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম মাঠ পেরিয়ে--সামনে যে পাহাড় তারই নীচে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড গুহা, মুখের দিকে প্রায় মাটি থেকে ন' ফুট উঁচু, লম্বায় পঁচাত্তর ফুট। গুহার মাঝখান দিয়ে পাহাড়ের ওপর দিক থেকে ক্ষুদ্র একটি লোহা-চোয়ানি রাঙা জলের ঝর্ণা বেরুচ্চে। ভেতরের দিকে উচ্চতা ক্রমশঃ কমে কমে এক-ফুট দেড়-ফুট দাঁড়িয়েচে, যেখান থেকে রাঙা ঝর্ণা বেরুচ্চে সেখানে।

কি গম্ভীর দৃশ্য!

ঘন ছায়া বনে, ঘন অন্ধকার গুহার ভেতরের দিকে। গুহা ওখানে শেষ হোল না, ভেতরের দিকে আরও আছে, দেখাই যায় না। গুহার সামনে ঠিক গুহার ছাদ ছুঁয়ে মোটা মোটা প্রাচীন ধওড়া ও আমগাছ। আমগাছ ও ধওড়া গাছে কাছির মত লতা উঠেচে জড়িয়ে জড়িয়ে--গুহার মধ্যে বসে শুধু দেখা যাচ্চে সামনের নিবিড় সুপ্রাচীন জঙ্গল। অন্ধকার নামচে বনস্পতির ভিড়ে। রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডের বনবর্ণনায় কবি বাল্মীকি প্রাচীন ভারতবর্ষের বনের যে চিত্র দিয়েচেন, সেই বর্ব্বর অরণ্য-আকৃতি এই গুহার সামনে, আশেপাশে, সর্ব্বত্র বহু মাইল নিয়ে। দেখলে ভয় হয়, কৌতূহল হয়, বিস্ময় হয়—আবার কি জানি কেন শ্রদ্ধাও হয়।

হঠাৎ ফরেস্টার বল্লে—পাশে আর একটা গুহা আছে—

—কতদূরে?

—এই পাশেই হুজুর।

দুর্গম লৌহপ্রস্তরের boulder ও জলা, নরম মাটি ঘন জঙ্গলে। জমি উপরের দিকে উঠেচে। পাশের পাহাড়ের ছাদটা ক্রমনিম্ন হয়ে এসে এই গুহা তৈরী করেচে বেশ বোঝা যাচ্চে। কিন্তু পাহাড় ক্ষইয়ে গুহা তৈরী হোল কি ভাবে? ঐ লোহা-চোয়ানো ঝর্ণা কি এর হাতিয়ার?

পাশেই সে গুহা দেখলুম। ঢুকলাম তার মধ্যে। এটা আরও বড়, বাঁদিকে উঁচু ঢিবি-মত, লোহা-চোয়ানি জল রাঙা পলি ফেলে আনন্দাজ লক্ষ বৎসরে এই মাটির স্তূপ তৈরি করেচে। ফরেস্টার দেখালে—আবার একটা বাঘের পায়ের দাগ দেখুন হুজুর—

সত্যি, ঠিক গুহার মুখে লোহা-চোয়ানো রাঙা মাটিতে।

—আরও দেখুন, শাহী আর হরিণের পায়ের দাগ—বহুৎ।

—শাহী কি?

মিঃ সিনহা বল্লেন—পর্কুপাইন—

ভাবলুম বাঘ আর অন্যান্য বন্য-জন্তুর আড্ডা তো হবেই এমন গুহাতে। এরও সামনে তেমনি ঘন জঙ্গল, খুব মোটা একটা জংলি আমগাছ। নিবিড়, দুর্ভেদ্য জঙ্গল চারিপাশে।

কত কথা মনে আসে।

প্রাগৈতিহাসিক মানব কি এ গুহায় বাস করতো? মেজের মাটি খুঁড়লে বোধ-হয় তাদের চিহ্ন পাওয়া যায়। কত লক্ষ বছরের মৌন ইতিহাস এই গুহার মেজেতে আঁকা আছে—ওই সব বন্য জন্তু-জানোয়ারের মত। কতকাল আগে, পৃথিবীর কোন্ আদিম শৈশবে এ গুহা তৈরী হয়েচে আপনা-আপনি—কোন্ আদিম মানববংশ প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম অরণ্যানীর মধ্যে এখানে বাস করতো, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর দূরে মন চলে যায় মহাকালের বীথি-পথ বেয়ে। বিস্ময়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায়।

বেশি ভাবতে পারা যায় না। ঐ বনানী-শীর্ষে রাঙা রোদ যেমন আজ, তেমনি কত লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি সূর্য্যাস্ত, সূর্য্যোদয়, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি পূর্ণিমা অমাবস্যা দেখেচে এই সুপ্রাচীন পার্ব্বত্য-গুহা—যার তুলনায় বেদ-গাথা রচয়িতা ঋষির, উপনিষদের কবিদার্শনিকেরা, বেদব্যাস, বাল্মীকি, বুদ্ধ, কপিলাবাস্তু, অশোক, কলিঙ্গযুদ্ধ—কালকার কথা।

আচ্ছা, কেউ থাকতে পারে এখানে রাত্রে একা? উপনিষদের ঋষিরা কি এমনি নিবিড় বনের গুহায় একা থাকতেন? এখনও কি সাধুসন্ন্যাসীরা ঠিক এমনি নির্জ্জন অরণ্যে এমনি গুহায় একা থাকেন?

এসবের উত্তর কে দেবে? মাথা ঘুরে ওঠে যেন ভাবলে। কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা মনে জাগে। মানুষের গতায়াত নেই এ গুহায়, তাই এত অদ্ভুত লাগচে, ভয় হচ্চে। এস্থান যদি লোকালয়ের মধ্যে হোত, রেল স্টেশন থেকে এক মাইল হোত, সাধু-সন্নিসিরা ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতেন, দেওঘরের তপোবনের গুহার মত—তবে কি এমন অদ্ভুত লাগতো? মোটেই না।

ফরেস্টার বল্লে—চলিয়ে হুজুর। বহুৎ জানোয়ার রহ্‌তা হ্যায় হিঁয়া চলিয়ে হিঁয়াসে—

মিঃ সিনহা বল্লেন—বেলা প্রায় চারটা, চলুন, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না—

আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফলের জঙ্গলের মাঠ ও নিবিড় বন পার হয়ে তিরিলপোসি—থলকোবাদ রোডে গাড়ীর কাছে এলুম। আসবার সময় আবার হাতীর গল্প উঠলো—কে যেন বল্লে—এখানে হাতী তাড়া করলে পালাবার পথ নেই—সত্যিই বটে। এক-দিকে জলা, অন্যদিকে পাহাড়ী ঢাল, বনে ভরা। পেছনে সেই কাঁটাওয়ালা বীচির জঙ্গল। কি একটা বোঁটকা গন্ধ পেলুম এক জায়গায়।

ফরেস্টার বল্লে—সেও পেয়েচে বটে। যাবার সময় এত ভয় হয়নি, আসবার সময় বোধ হয় বাঘ আর হাতীর পায়ের দাগ দেখবার দরুনই মনের মধ্যে এই ছায়ানিবিড় অপরাহ্নে বিশেষ সাহস খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বেলা সাড়ে পাঁচটায় তিরিলপোসি বাংলোয় পৌঁছে গেলুম।

আজ সকালে চা খেয়ে জঙ্গলের মধ্যে অনেকদূর গেলুম পায়ে হেঁটে। সিংলুম

নালা বলে একটি অতি চমৎকার ঝর্ণা বা পাহাড়ী নদী থেকে খানা কেটে জল আনা হচ্ছে তিরিলপোসি গ্রামের শস্য-ক্ষেত্রে। সেটা দেখতে গেলুম আমরা। সিংভূম বা সারেণ্ডাতে যেখানে বনের মধ্যে পাহাড়ী ঝর্ণা সেখানেই সৌন্দর্য্য—এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। সুন্দর পাথর বিছানো ঠাণ্ডা জায়গায় জলে পা ডুবিয়ে নিবিড় বন-ছায়ায় বসে ঝর্ণার মর্ম্মরধ্বনি শুনতে লাগলুম একা একা। চোখে পড়চে শুধু গভীর নিস্তব্ধ অরণ্য, যেদিকে চাই। বেলা বারোটায় ফিরে এলুম। বিকেলে বোনাই স্টেটের বালজুড়ির দিকে যে রাস্তা গিয়েচে পর্ব্বত ও অরণ্য ভেদ করে সেদিকে চললুম। সামনে ঘোর জঙ্গলের দিকে রাস্তা নেমে গিয়েচে দেখে মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—সন্ধ্যে হয়েচে, আর এখন জঙ্গলে যাওয়া ঠিক হবে না। এই তো জানোয়ারদের বেরুবার সময়। যদি হাতী তাড়া করে, ওপরের দিকে উঠে পালাতে গেলেই হাতীতে ধরবে, বড় বিপজ্জনক। মাকড়সার জাল বনে সর্ব্বত্র।

সুতরাং ফিরলুম। একটা বড় পাথর বিছানো স্থানে গাছের তলায় বসলুম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে, সামনের জমি ঢালু হয়ে গিয়ে সিংলুম নালার খাতের দিকে চলেচে। তার ওধারে ঘোর বনে সমাচ্ছন্ন শৈলমালা, অন্ধকার দেখাচ্ছে। একটা গাছের ডাল মাথার অনেক ওপরে নত হয়ে আছে। মন এ সব স্থানে সম্পূর্ণ অন্যদিকে যায়। কত ধরনের চিন্তা মনে আসে। জীবনের রহস্যের গভীরতার দিকে আপনাআপনি ছুটে চলে।

কল্যাণীর কথা আজ সারাদিন মাঝে মাঝে মনে হচ্চে। হয়তো আমার চিঠি ও পাবে কাল।

ঠিক সন্ধ্যায় হয়তো বনগাঁ লিচুতলা ক্লাবে যতীনদা, মন্মথদা, সুবোধদা সব বসে গল্প করচে, আজ বিশ বছর রোজ যে ভাবে গল্প করে, তার ব্যতিক্রম নেই।

খুব ভোরে উঠেছিলুম, বেশ জ্যোৎস্নায় নীরব সামনে পর্ব্বত ও অরণ্য। শুকতারা জ্বল জ্বল করচে পূর্ব্বদিকের আকাশে। থলকোবাদ থেকে কাঠবোঝাই গরুর গাড়ীর দল শেষরাত্রি আড়াইটায় উঠে চলেচে জেরাইকেলা। এখন পাঁচটা হবে। সকালে বনের মধ্যে বেড়াতে গিয়ে বসি, বড় বড় শালগাছ, ওদিকে বনাবৃত পর্ব্বত. চারিদিকেই পাহাড় ও বন মাঝে ফাঁকা ক্রমনিম্ন একটু মাঠমত—সেখানে মোটা মোটা শালগাছ ও শালচারা। ঘন বনে ঘেরা পর্ব্বতের পটভূমিতে শৈলচূড়ার একটি বড় গাছ ছোট্ট দেখাচ্ছে। বিশ্ব-দেবের উপাসনা এখানেই সার্থক ও সম্পূর্ণ।

চা-পানান্তে অপূর্ব্ব বনপথে গাংপুর স্টেট্ ও সারেণ্ডার সীমানায় অবস্থিত টিকালিমারা নামক গ্রামে চললুম। এ পথ তৈরী হয়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় কখনো মোটর আসেনি, গরুর গাড়ীও চলে না, সবুজ ঘাসবনে ঢাকা রাস্তা, কোন্‌টা বন কোন্‌টা রাস্তা চিনবার জো নেই। মনে হচ্চে যেন মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলেচে। দুধারে নিবিড় বন, অনেক ভাল দৃশ্য থলকোবাদ থেকে জেরাইকেলা রাস্তার চেয়ে। গরুর গাড়ীর চাকার দাগ নেই পথে, জন নেই, প্রাণী নেই, সকালের আলো এসে পড়েছে সুদীর্ঘ ও প্রাচীন শাল, আমলকী, পাঠডুমুর, ধওড়া গাছের শীর্ষভাগে—কোথাও মোটা মোটা লতায় জড়াজড়ি করে বেঁধেচে ডালে ডালে, গুঁড়িতে গুঁড়িতে, দেবকাঞ্চন ফুল ফুটেচে, সর্ব্বত্র শিউলি গাছের তো জঙ্গল, এত শিউলি গাছ এদিকের বনে যে এমন অন্য কোথাও দেখিনি, কোথাও ফলে ভরা আমলকীর ডাল পথিপার্শ্বের বিশাল গাছ থেকে রাস্তার ওপর নত হয়ে আছে ছবির মত, কোথাও পাহাড়ী ঝর্ণা বড় বড় শিলা-খণ্ডের ওপর দিয়ে ছায়ানিবিড় সুঁড়ি-পথে কুলুকুলু বয়ে চলেচে, কোথাও বা একটা

বন-মোরগ মোটরের শব্দে রাস্তার ওপর থেকে ওপাশের বনে উড়ে পালালো, কোথাও রাস্তা ক্রমে নামচে, নামচে, সামনে উচ্চ-বনাবৃত শৈলমালা—আমরা ঠিক যেন চলেচি পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা মারবার জন্যে ব'লে মনে হচ্চে, কোথাও রাস্তা ও মোটর একেবারে ডুবে যাচ্চে গভীর বনের মধ্যে সমতল উপত্যকায়, সেখানে চারিদিকে বন ও পাহাড়ের সবুজ দেওয়াল কিছু দেখা যায় না—আবার কোথাও পাহাড়ের গায়ে উঠে চলেচি, কোথাও সুদীর্ঘ বনস্পতিশ্রেণী ছায়াভরা বনবীথির সৃষ্টি করেচে, গাছে গাছে চীহড়ের লতা দুলচে।

অবশেষে আমরা বিটকেলসোয়া গ্রামে পেঁছে গেলুম। চারিদিকে উঁচু পাহাড়, ছোট ছোট ছেলে-পিলে মোটরের শব্দ শুনে ছুটে এল। প্রেমানন্দ নামে একজন মুণ্ডা খ্রীষ্টান আমাদের সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো। একটা কাঠের ও খোলার ঘরে গ্রাম্য গীর্জ্জা। শুনলাম এ গ্রামের বেশির ভাগ অধিবাসী মুণ্ডা খ্রীষ্টান। মনোহরপুর থেকে জন নামে এক 'প্রীস্ট' (এখানে পাদ্রীকে এই বলে) এসে রবিবারে এদের উপাসনা করায়। প্রেমানন্দ এক সময়ে প্রচারকের কাজ করবার জন্যে এই গ্রামে এসে এখানেই রয়ে গিয়েচে। বেশ বড় খোলার বাড়ী করেচে, লাউ কুমড়া লতা উঠিয়েছে। একটি গৃহস্থের নাম ফিলিপ টোপনো। ঘন্‌শা মুচির মত চেহারা। এত খ্রীষ্টান এখানে কেন? এ কথার উত্তরে ফরেস্টার খুণ্টিয়া বল্লে—পালকোটের রাজা এক সময়ে হো-দের ওপর বড্ড অত্যাচার করে। তখন এরা খ্রীষ্টান হয় মিশনারীদের প্ররোচনায়।

বাঘের বড় অত্যাচার এই সব বন্য গ্রামে। তিন মাস আগে একজনকে বাঘে ধরে-ছিল। ওরা গরু চরাচ্ছিল বনের ধারে, বাঘে এসে ওকে ধরে। সঙ্গের লোকেরা টাঙি দিয়ে বাঘ তাড়িয়ে দেয়। বেলা বারোটার সময় ওকে বাঘে ধরে। লোকটার নাম সামুয়েল মান্‌কি। আমাদের বারাকপুরের গ্রামের বাসানে পাড়ার যে কোনো মুসলমান ছোকরার মত চেহারাটা। গাছের ছায়ায় বসে লোকটাকে ডেকে আমরা তাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলুম—কত বড় বাঘ রে?

—খুব বড় বাঘ হুজুর।

—তোর কোনো হুঁশ ছিল?

—না, আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।

একটা বাড়ীতে মস্ত বড় একটা শুক্‌নো পাতার টোকা ঝুলছে। দেখতে চাইলাম, নিয়ে এসে দিলে। বোহিনিয়া ভ্যালাইয়ের বড় বড় পাতা দিয়ে করে।

এক স্ত্রীলোক পাতার কুঁড়েঘরে বসে কাঁদচে। তার স্বামী মারা গিয়েচে শুনলাম! তার কান্না দেখে বড় কষ্ট হোল। মানুষের দুঃখের প্রকাশ যেমন বাংলাদেশে, এখানেও এই সুদূর বন্য গ্রামেও তেমনি। কোনো তফাৎ নেই।

দক্ষিণ পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ওপারে গাংপুর স্টেট। দক্ষিণ-পূর্ব্বে বোনাই স্টেট্। যে রাস্তায় আমরা এলুম এই রাস্তা চলেচে বোনাই স্টেটের বালজুড়ি গ্রামে, এখান থেকে পাঁচ মাইল। নিভৃত বনের মধ্যে বালজুড়ির পথে এক জায়গায় খ্রীষ্টান মুণ্ডা কুলীরা কাজ করচে। তাদের হাজিরা নেওয়া হোল ঘন বনের ছায়ায় বসে। এই পথে আজ মাস দুই আগে প্রকাণ্ড নরখাদক রয়েল বেঙ্গল ব্যাঘ্র একটি মানুষ মেরেচে।

কুলীদের নাম:—

নান্দী কুই

সুনি কুই

রাইমতী কুই

চাম্পু কুই

রাহিল কুই
ক্রিষ্টিনা কুই
যশোমনি কুই
বোবাস মুণ্ডা
ইলিসাবা কুই

বাইবেলের বহু চরিত্রই এই বন জঙ্গলে মাটি কাটচে, সবাই মেয়েছেলে। 'কুই' এদেশে হো ভাষায় কুমারী মেয়ের নামের শেষে বলে।

বর্ষাকালে দুমাস গ্রামের লোক জংলী ফলমূল খেয়ে বেঁচে থাকে। এখানে বলে "কান্দা"। নানারকম মিষ্ট কন্দও নাকি আছে। তাছাড়া জংলি আম, বেল ও কাঠ-ডুমুরের পাকা ফলও বনে মেলে। কাঠডুমুর (Ficus Cunsia) বাংলাদেশে নেই—এই অঞ্চল ছাড়া অন্যত্র কোথাও দেখিনি। প্রেমানন্দ গ্রামের মুণ্ডারি বা সর্দ্দার। বল্লে—এখানে চালের বড় কষ্ট, বোনাই স্টেটে ⁄৬ সের চাল টাকায়. কিন্তু এখানে আনতে দেয় না হুজুর। পথের মধ্যে বোনাই আর সারেণ্ডার সীমানায় সিপাই বসিয়ে রেখেচে।

চলে এলুম। একটা ঝর্ণা গ্রামের মধ্যে দিয়ে বইচে—এর নাম বিটকেল-সোয়া নালা। আসলে এই গ্রামের নামেই এর নাম। স্বচ্ছন্দগতি নৃত্যপরায়ণা বন্য নদীর নাম আর বাঘের ভয় বনে। এই একমাত্র লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে বয়ে গিয়ে আবার নাচতে নাচতে ঢুকে পড়লো বোনাই স্টেটের অরণ্যভূমিতে। তার এই নাম!

বেলা বারোটা। আমরা ফিরলুম, চমৎকার শান্ত গ্রামখানি। এই ঘন বনের মধ্যে এর জন্ম ও মরণ। বিস্‌রার বাজার থেকে চিনি, আটা, তেল আনে। বিস্‌রা ষোল মাইল দূর এখান থেকে। মহুয়ার তেল খায়, ও নাকি ঘি'র মত, স্যামুয়েল মান্‌কি বল্লে। খ্রীষ্টান হয়েচে বটে কিন্তু অসুখ হোলে বনে গিয়ে লুকিয়ে বোংগা পুজো করে।

ফিরে এলুম বনের পথ দিয়ে। স্নান করে খেয়েই তখুনি আবার মোটরে বার হই টোয়েবু নামে একটি নিবিড় বনে অবস্থিত জলপ্রপাত দেখতে। তিরিলপোসি বাংলো থেকে থলকোবাদের পথে চার মাইল গিয়ে গাড়ী রেখে হেঁটে চল্লুম বনের মধ্যে। সঙ্গে ফরেস্টার খুণ্টিয়া, দুজন ফরেস্ট গার্ড, মিঃ সিন্‌হা। বনে অত্যন্ত আগাছা, বিশেষতঃ সেদিনকার সেই ওকড়া জাতীয় ফল। ক্রমশঃ নিবিড় থেকে নিবিড়তর বনে ঢুকে গেলুম। এমন বনের চেহারা এই সারেণ্ডাতেও আর দেখিনি। কিন্তু অদ্ভুত সৌন্দর্য্য সে ঘোর বনের। বিশাল বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রির্টাম ডিকেনড্রামের সাদা পাতা গজিয়ে ঠিক ফুলের মত দেখাচ্চে, এ লতা যে অত উঁচুতে উঠতে পারে তা জানতাম না। একস্থানে সুঁড়িপথের দুধারে নদী কাঁঠান নামক এদেশী গাছের জঙ্গল, বড় বড় আমগাছ, শালগাছ, মোটা মোটা লতা ডালে পালায় জড়িয়ে দুর্ভেদ্য ও দুষ্প্রবেশ্য করে রেখেচে বনভূমি। ভয় হয় এ বনে ঢুকতে, বিশেষত যে রকম হাতী আব বাঘের ভয় বনে। এক এক স্থানে সুঁড়িপথটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে কিছুই দেখা যায় না। চলেচি, পথ আর ফুরোয় না। ওকড়া জাতীয় শুক্‌নো ফল সারা গা এমন কি মাথায় চুলে পর্য্যন্ত আটকে যাচ্চে। কোথাও নিবিড় সেগুন বন, কোথাও জলা-ভূমি, কোথাও কাঁটাবন, পথ নেই বল্লেই হয়। এক স্থানে নরম মাটিতে মস্ত বড় বাঘের পায়ের থাবা আঁকা। হাতীর নাদ আর পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র। বাইসনের পায়ের দাগও আছে। এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড দুটি দাঁড়িয়ে বনের দিকে চেয়ে আপনাদের মধ্যে কি বলতে লাগলো। কি ব্যাপার? বাঘ দেখেচে নাকি, না হাতী? মিঃ সিন্‌হা ধমক দিয়ে বল্লেন—আরে ক্যা হায় বোলো না? ওরা বল্লে—বানর, হুজুর।

ক্রমে একটা প্রস্তরময় স্থানে এলুম। একটি পাহাড়ী ঝর্ণা পাথরের ওপর দিয়ে চলেচে। আমি ভাবলুম, এই বুঝি সে জায়গা! কিন্তু ফরেস্ট গার্ড থামে না। চলেচে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, শুধু তার পৃষ্ঠদেশ দেখতে পাচ্চি। এই সরু বনপথ নাকি বোনাই স্টেট্ থেকে আসবার শর্টকাট্—তাই ওদিকের বালাজোড় প্রভৃতি স্থান থেকে এ পথে পথিক লোক আসে। কিন্তু কেমন সে পথিক যে এই বন্যগজ ও ব্যাঘ্র-অধ্যুষিত নিবিড় ও দুর্ভেদ্য বনপথ দিয়ে শর্টকাট্ করে সোজা সড়ক ছেড়ে, কত বড় তার বুকের পাটা তা বুঝতে পারলুম না। আবার কিছুদূর গিয়ে আর একটি প্রস্তরময় স্থানেও পাহাড়ী নদী। এখানে ক্ষুদ্র একটি cascade-এর সৃষ্টি করে ঝর্ণাটি চলেচে বয়ে। বেশ জায়গাটি, ভাবলুম, পেঁছে গিয়েছি বুঝি—এই সেই টোয়েবু ঝর্ণা। দু-চারটি বন্যঘাসে ছাওয়া কুটির এখানে রয়েচে বনস্পতিদের ছায়ায়, বনবিভাগের কুলীরা গত বর্ষাকালে লতা কাটতে এসে এখানে ছিল ; তারাই তৈরি করে রেখেচে—এখন কে আর থাকবে এখানে? শুনেছিলুম মাত্র দু' মাইল, অথচ তিন মাইল এসে গিয়েচি, আন্দাজে মনে হচ্চে, এক ঘণ্টা ধরে অনবরত হাঁটচি, অথচ টোয়েবু জলপ্রপাতের শব্দও তো শুনচিনে কোথাও। আবার পাহাড়ের মত উঁচু পথে পাথর ডিঙিয়ে চড়াইয়ের পথে উঠি, উৎরাইয়ের পথে নামি—একস্থানে ফণি-মনসার গাছ অনেক, কালো পাথরের রুক্ষ জমিতে যথেষ্ট জন্মেচে। এবার বাঁদিকে জলের শব্দ পেলুম—আমাদের হাত-পাঁচেক নীচে অনেকখানি স্থানে পাথর বেরিয়ে আছে, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়চে। এ ছাড়িয়েও ফরেস্ট গার্ড চলে যাচ্ছে।

আমরা বলি—আর কতদূর?

—এই হুজুর, তবে নামতে হবে নীচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ওপরের পথটা ছেড়ে মালভূমির নীচের দিকে নামতে লাগলুম উপত্যকায় সমতলে। কাঁটায় ও কণ্টকময় বনফলে এই চার মাইল আসতে পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে রি রি করে জ্বলচে। কিন্তু নেমে গিয়ে হঠাৎ যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যভরা দৃশ্য ক্লান্ত চক্ষুর সামনে খুলে গেল, তার বর্ণনা দেওয়া বড় কঠিন। সেই ছায়ানিবিড় অপরাহ্ণে, সেই বাঘের পায়ের থাবা-আঁকা ঘোর জঙ্গলের পথে না হেঁটে এলে, সেই জনমানবের চিহ্নহীন বনানীর গোপন অন্তরালে লুকানো গম্ভীর দর্শন জলপ্রপাতের কথা কি করে বোঝাবো?

অনেক বড় বড় চৌরস পাথরের বড় বড় boulder ঝর্ণার মুখে পড়ে আছে, তারই একটার ওপরে গিয়ে বসলুম। বেলা তিনটা বাজে, এখুনি সেখানে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমার সামনে একটা জলাশয়, ঘন কালো ঈষৎ সবুজাভ তার জল। এই জলাশয় নাকি অত্যন্ত গভীর, জলের চেহারা দেখলে তা বোঝা যায় বটে—'টোয়েবু' মানে মোচড়ানো ঘাড়'। এক হো জাতীয় লোক ওখানে মাছ ধরতে এসেছিল স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। মাছ ধরে ধরে সে স্ত্রীকে ডাঙার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিল, স্ত্রী লুফে লুফে নিচ্চে —একবার হঠাৎ বিস্মিতা স্ত্রীর হাতে এল তার স্বামীর সদ্য-মোচড়ানো ঘাড়টা। সেই থেকে বন্য অপদেবতার ভয়ে এখানে কেউ মাছ ধরতে আসে না। অথচ মাছ নাকি খুব আছে।

আমাদের সামনে জলাশয়ের ওপারে প্রায় সত্তর-আশি ফুট লৌহ-প্রস্তরের (Heamatite quartzite) অনাবৃত দেয়াল খাড়া উঠেচে, তার শীর্ষে অপরাহ্ণের হলুদে রোদ, তার গায়ে গাছের মোটা শেকড় ঝুলচে। বড় বড় ঝুলন্ত পাথরের চাঁই জায়গায় জায়গায় যেন মোটা শেকড়ের বাঁধনে আটকে আছে ফাটলের গায়ে। এই পাহাড়ের দেয়ালের বাঁদিকে প্রায় সাত-আট ফুট চওড়া জলধারা দুটি ধারায় বিভক্ত হয়ে সশব্দে

প্রায় ২৫ ফুট ওপর থেকে নীচের বন্য অপদেবতার লীলাভূমি সেই সরোবরটাতে পড়চে। এই স্থানটি নিবিড় বনে ঘেরা, একটা সংকীর্ণ গহ্বরের বা বড় ইঁদারার মত—যেন ইঁদারার মধ্যে বসে মাথার দিকে চেয়ে আছি। বড় বড় আম, গাচাকেন্দু বা গাবগাছ, বেত, ফার্ন, লম্বা লম্বা তৃণ, লুদাম, করন্ড আরও অসংখ্য বন্য গাছে ছায়ানিবিড়। জলপতনধ্বনি দ্বারা দ্বিখণ্ডিত সেই গম্ভীর আরণ্যনিঃশব্দতা সুদূর অতীতের কথা, অন্তরের কথা, বিশ্বদেবের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কথাই কানে কানে বলে, সমাহিত মনে শুনতে হয়। এই রকম জলাশয় সম্বন্ধেই কর্ণেল ডলটনের সেই উক্তিটি খাটেঃ—
"Pools, shaded and rock-bound in which Diana and her nymphs might have deported themselves."

অনন্তের মৌন ইতিহাস এখানে আঁকা আছে পাথরের দেওয়ালের স্তরে স্তরে। বৈদিক আর্য্য ঋষিদের আমলেও এই ঝর্ণা ঠিক এমনি পড়তো ঘোর বনের মধ্যে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে এখানে লক্ষ লক্ষ পূর্ণিমার চাঁদ উঠেচে, লক্ষ লক্ষ অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার হয়েচে, বন্য-জন্তুর বংশের পর বংশ নির্ভয়ে জলপান করেচে- রেল হবার আগে, বনবিভাগের সৃষ্টি হওয়ার আগে বন্য লোক ছাড়া অন্য কারো চোখেই পড়েনি এ সৌন্দর্য্যভূমি। কে আসবে মরতে পথহীন জঙ্গলে, জানেই বা কে, খোঁজই বা করত কে? এই বিংশ শতাব্দীতেও এ স্থান নিকটবর্ত্তী রেলস্টেশন থেকে বনপথে একুশ মাইল। তার মধ্যে তেরো মাইল নিবিড় বনানী, শেষের চার মাইল নিবিড়তর বন, যার মধ্যে দিয়ে কোন সময়েই দলবদ্ধ না হয়ে বা উপযুক্ত পথপ্রদর্শক না নিয়ে আসা উচিত নয়। পথ হারিয়ে যাবার খুবই সম্ভাবনা, একবার পথ হারিয়ে গেলে জনমানবের চিহ্নহীন এই ঘোর জংগলের মধ্যে বনাহস্তীর পদতলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখে প্রাণ হারাতে হবে। অথচ কি সৌন্দর্য্য-ভূমিই লুকিয়ে রেখেচে প্রকৃতিদেবী মানবচক্ষুর অন্তরালে। হলদে রোদ রাঙা হয়ে আসচে, আর থাকা ঠিক নয়। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল। নিবিড় পথে চার মাইল গিয়ে মোটরে উঠতে হবে। এই পড়ন্ত বেলাতে হাতী বাঘ বেরিয়ে থাকে সাধারণত। রওনা হয়ে ঝর্ণার ওপারের দিকটাতে চওড়া পাথরের ওপর অনেকটা বসলুম। কতদূর লৌহপ্রস্তরের তৈরী ঢালু পর্ব্বতগাত্র বেয়ে ঝর্ণাটা নীচে নেমে ওই জলপ্রপাতের ও ঝর্ণার সৃষ্টি করচে। এ আর একটি অপূর্ব্ব স্থান কিন্তু আর বসা চলে না। আবার সেই দুর্গম পথে রওনা হলাম। পথে সেই ঘাসের কুটিরগুলির স্থানে এসে মনে হোল বড় চমৎকার, এখানেই থেকে যাই। সেগুনের জঙ্গলের মধ্যে নরম মাটিতে আমি একটা নরম পায়ের দাগ দেখিয়ে বল্লাম—দেখুন আর একটা।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন—বহুৎ বড় পায়ের দাগ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

তখন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। বনানী অন্ধকার হয়ে এসেচে- হঠাৎ মনে পড়লো আজ আমাদের দেশে গোপালনগরের হাট, পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রি করচে, মনো খুড়ো পানের দোকানে পান বিক্রি করচে। ওরা সেই ক্ষুদ্র স্থানে জন্মে চিরকাল ওখানেই আনন্দে আছে, জগতের কিই বা দেখলে?

এক জায়গায় বড় বড় আমগাছ, কি ফুলের সুগন্ধ বাতাসে, ঠাণ্ডা সন্ধ্যাবাতাসে বনানী থেকে বারাকপুরের পল্লীপ্রান্তে এ সময় যেমন সুগন্ধ ওঠে তেমনি পাচ্চি। রাধালতার ফুল এখানেও দেখলাম ঝোপের মাথায়। ঝন্দী কাঁটালের কালো পাতার রাশি অন্ধকার আরও কৃষ্ণতর করে তুলেচে। ওই ফুটন্ত বনস্পতি-শীর্ষে কম্‌প্রটাম ডিকেনড্রাম লতার ফুল শোভা পাচ্ছে। ঘন গম্ভীর দৃশ্য বনানীর। সন্ধ্যায় সারেণ্ডা ফরেস্টের নিভৃত বনপথ দিয়ে যাওয়া এ অভিজ্ঞতার তুলনা হয় না।

ফরেস্টার এক জায়গায় এসে বললে—ঠিক এখানে মল্লিকবাবু ফরেস্ট রেন্‌জার মস্ত বড় রয়েল বেঙ্গল টাইগার দেখেছিল—রাস্তা পার হয়ে বনের দিক থেকে ওদিকেই যাচ্ছিল, মল্লিকবাবু বলে—চাকরি ছেড়ে দেবো, সারেণ্ডায় আর চাকরি করবো না।

প্রতিপদে ভয় হচ্ছে। একবার ফরেস্ট গার্ড বনের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালো। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে উঠলো—কি রে! দাঁড়ালি কেন? সে বল্লে—জংলী মোরগ হুজুর।

ধড়ে প্রাণ এল যেন—চলো বাপু। বন-মোরগ দেখে আর এখন কাজ নেই। এই সুনিবিড় অরণ্যে হাতী ও বাঘ হায়েনা চলাফেরা করচে, মানুষ মারচে—তার গল্প থলকোবাদে শুনেচি, কুর্মাডিতে শুনেচি, বনগাঁয়ে শুনেচি, আবার আজ বিটকেল-সোয়াতেও শুনেচি। নিজের চোখে দু-তিন দিন বড় বাঘের থাবার দাগ দেখলুম মাটিতে—এবং তা হয়তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের। আজই দেখেচি এক জায়গায় হাতী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েচে তার দাগ। হাতীর বাইসনের ও সম্বরের পায়ের দাগ তো সর্ব্বত্র—ওর হিসেব কে রাখে। সুতরাং বন পেরিয়ে যাওয়াই ভালো।

ফরেস্টার বলচে—কাছেই এসেচি মোটরের দুরশি আছে। তখন একবার বনের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে নিলুম। কি গম্ভীর দৃশ্য অরণ্যানীর, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কত উঁচুতে রাধালতা আর কম্‌প্রিটাম লতার কচি পাতা। ঘন বনে অন্ধকার হয়ে এসেচে। লোকালয় থেকে বহুদূরে সারেণ্ডা ফরেস্টের অভ্যন্তরভাগে দাঁড়িয়ে গোপালনগর হাটের কথা ভাবচি।

বাড়ী এসে অগ্নিকুণ্ডের পাশে বসে এই ডায়েরী লিখচি। খেয়েদেয়ে একবার বাইরে গেলুম, কি ঝক্‌ঝক্ করচে নক্ষত্রগুলি পাহাড়ের মাথায়, অনন্ত ব্যোমে মহারুদ্রের জ্যোতিঃত্রিশূলের মত Orion জ্বলছে—এখানে ওখানে কত তারা, বিরাট ছায়াপথ জ্বলজ্বল করচে—বিশ্বদেবের ভাণ্ডারে কত অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত কোটি beauty spot—তাঁর অনন্ত দৃষ্টি কি করে আমরা বুঝব—শুধু মনে মনে তাঁর জয়গান করেই বিস্ময়ের অবসান করি।

রাত সাড়ে চারটায় উঠলুম, বাইরে গেলুম। জ্যোৎস্না উঠেচে, কালকের মত শুকতারা জ্বলজ্বল করচে, দূরের পাহাড়ের মাথার দিকে চেয়ে বাল্যের বারাকপুরের বাঁশবনে বাড়ী, বাবা-মার কথা মনে এল। শৈশবের সমস্ত অবস্থা—আমাদের দারিদ্র্য, বালক হয়ে আমার সমস্ত মনের ভাব যেন আমাকে পেয়ে বসলো শেষরাত্রে। জীবন কি অপূর্ব্ব! কি অমৃতময়! জন্মে জন্মে শত শত বারাকপুরের মধ্যে দিয়ে শত বৈচিত্র্য, পিতামাতার কোলে বার বার আসি-যাই ক্ষতি কি? শুধু যেন বিশ্বদেবকে মনে রাখি, তাঁর অনন্ত রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য দেখবার চোখ যেন পাই।

সকালে শালবনে বেড়াতে গেলুম। দূরে পাহাড়ের মাথায় কাল যেমন দেখেছিলুম একটা গাছ—বড় বড় বনস্পতি চারিধারে, বনের শান্ত শ্যামল সমারোহ। প্রাণভরে দেখি। চেয়ে থাকি।

শেষরাত্রে কালীর বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখলুম। আশ্চর্য্য, পুঁটিদিদি যেন মা'র মত স্নেহে আমায় কি খেতে দিলেন। অল্প বয়সের পুঁটিদিদি।

আজ সকাল ন'টায় তিরিলপোসি থেকে স্নানাহার করে বার হয়েচি। সারেণ্ডা অরণ্যে ফাঁক কোথাও নেই—শুধুই চলেচে জঙ্গল। এক জায়গায় নেমে আমরা পাৎলা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম, সেখানে কাঠকয়লার ভাঁটা করে কয়লা পুড়ুচ্চে। তারপর

কিছুদূর এসে এক জায়গায় দীঘা নামক বন্যগ্রাম। তার প্রান্তভাগে 'বিরহোর' নামক যাযাবর বন্য জাতির আবাস, নেমে দেখতে গেলুম। অনেক ছেলেমেয়ে ও পুরুষ রোদে বসে চীহড় লতার দড়ি পাকাচ্চে। এই ওদের উপজীবিকা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেচে দড়ি, শিকা—সব তৈরি করে চীহড়ের বাকল থেকে। খুব শক্ত দড়ি হয়। এক গ্রামে সপ্তাহ দুই থাকে, তারপর অন্য গ্রামে চলে যায়। কোথাও নির্দ্দিষ্ট জায়গা নেই থাকবার। একটি রূপী বাঁদর নিয়ে এল বিক্রি করতে। আমরা নিলাম না। বেশ সুন্দর পাথরে-কোঁদা চেহারা ওদের।

দীঘা ছেড়ে সামটা গ্রামের পথে আমরা চললুম। আবার জঙ্গল, পাশে একটা ঝর্ণা ও গভীর খাদ। এক এক সময় মনে হয় সরু পথে গাড়ীগুলি উল্টে যাবে। তেমনি গভীর অরণ্য। এপথে অনেক বন্য বাঁশ দেখলুম পাহাড়ী ঢালুর জঙ্গলে, এক জায়গায় বন্যকদলীও দেখা গেল।

সামটা গ্রাম বনের বাইরে। খ্রীষ্টান ও হিন্দুর বাস, তবে হো-দের বাসই বেশী। একটি ছেলে নাম বল্লে, চন্দন তাঁতি। একটু সভ্য কাপড় পরা ওরই মধ্যে। বল্লাম—তুমি খ্রীষ্টান?

--না, আমি হিন্দু।

-কালী-দুর্গা পূজা কর, না বোঙ্গা পূজা কর—

বোঙ্গা পুজো করি।

একটা গাছের নীচে এরা মুরগী বলি দেয় ও আতপ চাউল নৈবেদ্য হিসেবে দেয়। সিংবোঙ্গা এদের পরম দেবতা---সূর্য্যদেব। আরও বিভিন্ন বোঙ্গা আছে—এক এক রোগের এক এক বোঙ্গা।

সামটা থেকে এলুম জেরাইকেলা। এখানে এক ছোকরার সঙ্গে আলাপ হোল Range আপিসে। বাড়ী খুলনায়, এখন এখানেই দু-তিন বৎসর জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করে বাস করচে। রেঞ্জ্ আপিসে দেখা করতে এল—শুনলাম এখানে বেশ ম্যালেরিয়া।

জেরাইকেলা থেকে রওনা হয়ে তিন মাইল যেতে গভীর অরণ্য শুরু হোল। এক-দিকে গভীর অরণ্যভরা নদীখাত, অন্যদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। পোঙ্গা পর্য্যন্ত সমানই অরণ্য। এক্সপোর্ট নাকা নামক বনবিভাগের কর্ম্মচারীর আবাসস্থানের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলচি, একজন লোককে ডুলি করে নিয়ে যাচ্চে, জঙ্গলে B. T. T. কোম্পানীর কাজ করছিল, ম্যালেরিয়া ধরেচে।

আবার জঙ্গল। পোঙ্গা এলুম বেলা আড়াইটাতে। আগে এখানে B. T. T. কোম্পানীর আপিস ছিল, এখন কিছু নেই। পোঙ্গা থেকে মনোহরপুরের পথে রওনা হই। মিঃ সিন্‌হা ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসে বনবিভাগের শিক্ষানবীশী করতে এই পথে একা সাইকেলে আসেন, অতি দুরারোহ ও জঙ্গলাকীর্ণ পথ- এর আগে বনের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর। কি ভাবে একা এখানে এলেন, আজ তাঁর মুখে শোনা পর্য্যন্ত এই পথ দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল—এবার সে পথও দেখলুম এবং কোল বোংগা নামক গ্রামে যে কুটিরে তিনি রাত্রি কাটিয়েছিলেন, সেটাও দেখলুম। কুলিরা সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছে আর তাঁর জিনিস নিয়ে যেতে চাইল না। এখন সে কুটিরের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে, পূর্ব্বে আঠারো বছর আগে বন এখানে ঘনতর ছিল। কোলবোংগার প্রান্তে এক পাহাড়ের ওপর একটি ছোট্ট কুটিরে এক গোঁসাই জাতীয় কৃষক বাস করে। বৃদ্ধ গোঁসাই ধান ঝাড়চে পাহাড়ের ওপরে খামারে। সেখান থেকে সুন্দর দৃশ্য চারিদিকে এবং খুব কাছে উঁচু পর্ব্বতমালা ও শিখরদেশ। সভ্যতার চিহ্ন কিছু কিছু দেখা গেল এর পরে, ঘিনডুং নামক স্থানে—এক্সপোর্ট নাকার আপিসের

সামনে কয়েকটি বালক স্কুল থেকে আসচে। তাদের কাছে ডাকলুম, ওরা মনোহরপুর ইউ. পি. স্কুলে পড়ে, ছ' মাইল দূরবর্ত্তী কোলবোংগা গ্রাম থেকে রোজ মনোহরপুরে পড়তে যায়।

মনোহরপুর এলুম—দূর থেকে রেলের ধোঁয়া দেখে মনে আনন্দ হোল। কোইনা নদী পার হয়ে মনোহরপুর বাজারে এলোম—চায়ের দোকান, খাবারের দোকান—কি আশ্চর্য্য জিনিস যেন। চোখে চশমা ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াচ্ছে, এ যেন এক নতুন দৃশ্য আজ আট-ন'দিনের জঙ্গলের গভীর নিৰ্জ্জনতার পরে। দোকান বলে জিনিস আছে দুনিয়ায়, সেখানে পয়সা দিলে তুমি সিগারেট, খাবার, চা কিনে খেতে পারো—ডাকঘর আছে, ইচ্ছামত চিঠি লিখে ফেলতে পারো, এ যেন নতুন অভিজ্ঞতা।

মনোহরপুর বাংলো স্টেশনের কাছে একটি পাহাড়ের ওপরে। বেলা পাঁচটায় সেখানে পেঁৗছে গেলাম। চারিদিকের দৃশ্য ও দূরের শৈলশ্রেণী দেখা যায় এই পাহাড়ের ওপরে বসে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি বাংলার কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে ভাবচি ঐ ঘন শৈলারণ্য থেকে এসেচি, ওরই মধ্যে কোথায় সেই শিশিরদা জলভূমি, গুহা, ওরই দুৰ্গম প্রদেশে সেই অপূর্ব্ব-সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত, জাতিসিরাং, বাঘের থাবা আঁকা সেগুন বন।

বনের দেবতা মারাং বোঙ্গাকে প্রণাম।

আজ সকালে উঠে একটু বেড়াতে গেলুম। বাঙালীর মুখ অনেকদিন দেখিনি। মনোহরপুর বাজারের পথে সুধীর ঘোষ বলে এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে উঠলুম। তাঁর বাড়ী খুলনায়। আনন্দ হওয়াতে তিনি চা খাওয়ালেন, ভাত খেতে বল্লেন। বড় ভদ্রলোক। সেখানে বসে সারেণ্ডা ফরেস্টের গল্প করলুম। এসে চা খেয়ে 'দেবযান' লিখতে বসি। মিঃ সিন্‌হা আফিস তদারক করতে গেলেন। রেন্‌জ্ অফিসারের নাম সুলেমান কারকাট্টা, হো খ্রীষ্টান। রোদ পিঠে দিয়ে বসে লিখলাম অনেকক্ষণ। তারপর তেল মাখলুম রোদে বসে। মনে পড়চে নদীর ধারের কথা বারাকপুরের, হয়তো ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে এতদিন। ফণিকাকা তামাক খেতে খেতে গল্প করেচে বারিকের সঙ্গে। সামান্য বিশ্রাম করলাম খাওয়ার পরে, তারপর ঘুম ভেঙে গেল। সেদিন শ্যামাচরণদা'র বোন পুঁটিদিদিকে স্বপ্ন দেখেছিলুম, যেন মায়ের মত যত্ন করচে। কল্যাণীর কথা ভাবচি, এতক্ষণে সে কি করচে?

বাইরে চেয়ে দেখচি, রোদ পড়েচে পাহাড়ের শালগাছের গায়ে। বিকেলের রোদ, হঠাৎ মনে পড়লো বাসান গাঁয়ে মোহিনীকাকার চণ্ডীমণ্ডপের কথা। কে আছে সেখানে এখন? কি করচে তারা? মুরাতিপুরে আমার মামার বাড়ীর সেই ছাদটি, সেই শৈশবের লীলাভূমি কলামোচা আমতলা—এত স্থানে বেড়ালুম, এখনও যেন মামার বাড়ীর পিছনের বাঁশবন রহস্যময় মনে হচ্ছে। শৈশবের মতই বারাকপুরের তেঁতুলগাছটার তলায় আমাদের বাড়ীর পাঁচিলের পিছনে কখনো যাইনি, বাগানে, পাড়ার বহুস্থানে কখনো যাইনি আমাদের গাঁয়ে। উঠে পাহাড়ের ওপরে রোদে একটা পাথরে বসলুম। বাংলোর ঠিক পিছনেই পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ অংশ। তার একটু নীচের অংশে আমাদের বাংলো। এক মিনিটেই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে বসলুম। আমার সামনে বিস্তৃত সারেণ্ডা ও কোলহান শৈলমালা, আংকুয়া লৌহখনি লাল দেখাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ে মাথায়। সারেণ্ডা পর্ব্বতমালা ও ছোটনাগপুর মালভূমির সংযোগস্থলে সারেণ্ডা টানেলের মধ্যে দিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ চলে গিয়েচে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব্ব দিকে! ঐ পর্ব্বতমালার ওপারে বহুদূরে ঘাটশিলা, যেখানে কল্যাণী রয়েচে। তারও বহুদূরে

ওধারে বারাকপুর, আমার উঠানে ছায়া পড়েচে. কুটির মাঠের সেই জলাভূমিটি, তিনু. যেখানে ধান করেছে, যার ধারে জেলেরা জমি চষেচে এবার দেখে এলাম—ওদের কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে ঐদিকে কোথায় সেই বনমধ্যস্থ গুহা, ঐদিকে কোথায় সেই অতি সুন্দর টোয়েবু জলপ্রপাত, কোথায় সেই বাঘের পায়ের থাবা আঁকা সেগুনবন, কোইনা নদীর গর্ভস্থ পাষাণময় স্থান জাতিসিরাং, দেবকাঞ্চন ফুলের মেলা। বিশ্বদেবের উপাসনা এমন স্থানেই সম্ভব ও সার্থক।

চা খেয়ে বেড়াতে বার হই। গিরিনবাবুর সঙ্গে দেখা, দেবীবাবুর শ্বশুর। অনেকদিন আগে পোসোইতা স্টেশনে দেখা হয়েছিল। ইনি আমায় জঙ্গল দেখাবেন, এক সময় ধারণা ছিল। হরজীবন পাঠক এখানকার একজন লক্ষপতি কাষ্ঠব্যবসায়ী। মোটা মোটা শাল কাঠ পড়ে আছে বহুদূর পর্যন্ত স্টেশন ইয়ার্ডে। বনস্পতি উচ্ছেদ করে এ ব্যবসা আমার পোষাবে না। যিনি বনস্পতিতে আছেন, আমি তাঁকে মানি। মনে হবে প্রাণীহত্যা করচি। অরণ্যের সৌন্দর্য নষ্ট করচি। তবে কথা এই—B. T. T. কোম্পানী জঙ্গল উজাড় করে পয়সা লুটে ইংলণ্ডে পাঠাচ্চে। আমাদের দেশের লোক হরজীবন পাঠক কিছু খায় তো ভালই।

কোইনা ও কোয়েল নদীর সংগমস্থান দেখতে গিয়ে বেলা গেল। প্রকাণ্ড বড় খ্রীষ্টান মিশন নদীর ধারে। তারপর নৃসিংহদাস সাধুজীর আশ্রমে গিয়ে বসলুম : বেশ শান্তিপূর্ণ স্থান, দক্ষিণ কোয়েল নদীর তীরে। নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি আছে মন্দিরে, সাধুজীর এক চেলা এখন মোহান্ত, উনি মারা গিয়েছেন এক-দেড় বৎসর। আরা জেলার এক পণ্ডিতজী—বড় দীন, বিনয়ী-হরজীবন পাঠককে খুব খাতির করলে। জী সরকার, বৈঠিয়ে, জী সরকার, দেখিয়ে।

এত ভাল লাগতো কেন পণ্ডিতজীকে? বল্লে সাধুজী যব রহতে তব মেজাজ একদম গদ্‌গদ্ হো যাতা। বহুৎ রঙিলা সাধু থে। পণ্ডিতজী খোসামোদ করচে পুনঃপুনঃ লক্ষপতি ধনী হরজীবন পাঠক ও মোহান্তজী দুজনকেই। রোজ সন্ধ্যা-বেলা পণ্ডিত সম্ভবতঃ আশ্রমে এসে বসে, গল্প করে, প্রসাদ-ট্রসাদ পায়।

নৃসিংহদাস সাধুর ইষ্টদেবতা এক রুদ্র শিলামূর্ত্তি। তিনি নাকি সব বাড়ী বাগান, তাকে করে দিয়েচেন। সুন্দর ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে বাগানে। চাঁপা, মল্লিকা, আম, হেনা, দারুচিনি, এলাচ—সব গাছ আছে এ বাগানে! সাধুজী আমাদের পান-জৌর ও কলা দিলেন প্রসাদ স্বরূপ। পানজৌর কখনো খাইনি, দেখলুম ধনের গুঁড়ো আর চিনি। আশ্রমটি সত্যিই ভাল লাগলো।

বাড়ী এসে উঠলুম, রাত আটটা। মন্মথদা আজ আমার চিঠি পেয়েচে, কল্যাণীও পেয়েচে। মন্মথদার বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে নিশ্চয়ই সব বসে গল্প করচে, আমার চিঠিখানা পড়চে।

আজ সকালে উঠে রোদে বসে খানিকটা লিখি 'দেবযান'। তারপর কোল বোংগার পথে যেতে পাণ্ডেমগুটু বলে একটি গ্রামে পাহাড়ের ওপর কিছুক্ষণ বসলুম। সুলেমান কারকাট্টা ও মিঃ সিন্‌হা বস্তী তদারক করছিলেন, সেই সময় আমি পাশের পাহাড়টাতে গাছের ছায়ায় বসি। সামনে বেশ সুন্দর দৃশ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়। একটা গাছ ঠিক চাঁপাগাছের মত, কিন্তু একটি ছেলে বল্লে ওতে ফুল হয় না, ছোট ছোট বীচিমত হয়—অর্থাৎ mendcandia exerta, এই গাছই এ দেশে সর্ব্বত্র, দেখতে চাঁপা গাছের মত। ছেলেটির নাম দিবাকর দাস, হিন্দিতে কথা বলে, জাতে তাঁতি। এদেশে হিন্দু হোলেই তাঁতি হবে, নয়তো গোঁসাই হবে। বাকী সব হো আর মুণ্ডা। ভাষা হো ছাড়া আর কিছু নেই—তবে একটু শিক্ষিত লোকে হিন্দী জানে। ছোকরা চাকুরি

চায় এক্সপোর্ট নাকার গার্ড। বলে দিলুম চাকুরির জন্যে। যদি ওর হয় বড় আনন্দ হবে আমার।

কোল বোংগা গ্রামে সেই গোসাঁই-এর বাড়ীটা ওই পাহাড়ের মাথায়। তারপর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে অনেকদূর গেলুম। সেদিন যে নদীগর্ভে বসে চা খেয়েছিলুম পাথরের ওপর, তার নামটি বেশ ভাল—'মহাদেব শাল'। ওটা পার হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে ঘন লতা-দোলানো নিবিড় জঙ্গলের পথে আবার দুটি নদী পার হলুম—বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে গভীর বনচ্ছায়ায় কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলেচে। সকালে কত কি পাখী ডাকচে বনে বনে। নিস্তব্ধ বনানী, একই দৃশ্য সারেণ্ডার ঘনজঙ্গলে। সাড়ে পাঁচ মাইল মাত্র দূর মনোহরপুর স্টেশন থেকে, অথচ কি নিবিড় বন। ধলভূমে এমন বন নেই কোথাও।

ফিরে আসতে কোইনা নদীর ধারে একস্পোর্ট নাকার আপিসে তদারক করতে দেরি হয়ে গেল। বাড়ী ফিরে স্নান করে কিছু বিশ্রাম করলুম। পাহাড়ের ওপর বাংলোর পিছনে গিয়ে বসি রাঙা রোদভরা বিকেলে। চারিদিকে স্তরে স্তরে ঘননীল শৈল-শ্রেণী, একটার পেছনে আর একটা, তার পেছনে আর একটা, থৈ থৈ করচে শুধুই পাহাড়। ডাইনে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের গায়ে রাঙা লৌহপ্রস্তর বার হয়ে আছে—ঐ হোল চিড়িয়া খনি। বেঙ্গল স্টীল কোম্পানী ওখান থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে এনে ছোট রেলযোগে মনোহরপুর এনে ফেলচে স্টেশনের পাশে। কত কথা মনে পড়লো পড়ন্ত রোদে দূরের শৈল-শ্রেণীর দিকে চেয়ে। কল্যাণী রয়েচে কতদূরে, কি এখন করচে, ওর জন্যে মন হয়েছে ব্যস্ত। আর পাঁচদিন কোনরকমে কাটলে হয়। গৌরীর কথা—আজ ২১শে নভেম্বর, সেই ২০নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে এই সময় প্রথম গিয়েচি, সেই উদ্বেগ, 'যতবার আলো জ্বালাতে যাই' সেই গানটার কথা। এই সময়েই সে মারা যায়। জাহ্নবীর কথা—সেও এই সময়, বোধ হয় আজই হবে। আজই আবার গোপালনগরের হাট, এতক্ষণে পঞ্চামাস্টার বেগুন বিক্রী করচে, মনো খুড়োর দোকানে লেগেচে ভিড়। সেই ছায়াভরা বনপথে ছোট এড়াঞ্চির ফুল ফুটেচে হয়তো। ১৯৩৫ সালে আজকার দিনে আশুতোষ হলে কবি নোগুচির বক্তৃতা শুনেছিলুম আর ভেবেছিলুম গ্রামের নাজন হয়তো নদীর ধারে মাঠে কলা-বেগুনের ক্ষেতে গরু চরাচ্চে। আজও তাই ভাবচি, দূরে গেলেই দেশের কথা আমার মনে পড়ে। কল্যাণী দেশে যেতে চায়, ওকে নিয়ে যাবো।

বিকেলে মিঃ সিন্‌হা, আমি ও হরজীবন পাঠক আশ্রমে বেড়াতে গেলুম। সুন্দর লতাবিতান, কত ফুলফলের গাছ। নদীর ধারে নিভৃত কুটির-মধ্যে বিশ্রামের জন্য বেদী, হেনা ফুলের গৌরভ। পবিত্র পুরনো তপোবনের শান্ত পরিবেশ। খাঁটি ভারতীয় সভ্যতা ও আবহাওয়া। নৃসিংহদাস বাবাজির সমাধি ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখেচে, সেখানে তার চেলা বসে গাঁজা খাচ্চে সন্ধ্যায়। নদীর ধারে লতাকুঞ্জমধ্যে ক্ষুদ্র শিব-মন্দির। মন আপনিই অন্তর্মুখী হয়ে যায় এই জায়গায় এসে। সাধুজির কাছে বসলুম, তিনি আসনে বসে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়চেন, ধুনি জ্বলচে সামনে। ইনিই বর্ত্তমান মোহান্ত।

ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীর চাটুজ্যের বাড়ী এলুম আমরা সবাই। সুধীরবাবু অতি বিনয়ী, আমরা গিয়েচি বলে বড় খুশি। চা এনে দিলেন, ঘন ঘন পান ও সিগারেট দিলেন। সরল, অমায়িক ভদ্রলোক—আমাদের দেশের মত কথার টান। বল্লেন—এক-সঙ্গে বসে দুটি খাবো বড্ড ইচ্ছে ছিল, তা হোল না। আপনি দয়া করে আমার এখানে এসেচেন।

অনেকদূর পর্য্যন্ত উনি আর হরজীবনবাবু আর একটি ছোকরা সঙ্গে এলেন। সুধীরবাবু পানিতরের কথাও জানেন, আমার প্রথম শ্বশুর-বাড়ী। বল্লেন—'পান্‌তর', বাবা যেমন বলতেন। কতকাল পরে ঐ গ্রামের ঐ উচ্চারণ শুনলাম এতদূরে বসে।

বিশ্বদেবের জয় হোক।

সকালে মনোহরপুর থেকে এখানে আসবো, হরজীবন পাঠক ও সুধীরবাবু এসে খুব গল্পগুজব করলেন। আমি আর কখনো মনোহরপুর আসি না আসি, বাংলোর পেছনের পাহাড়টাতে উঠে বসে রইলুম পূর্বদিকে চেয়ে।

খেয়ে বেলা দুপুরের পর মোটরে উঠে কোল বোংগার পথে পোংগা আসবো, এক জায়গায় ফরেস্ট গার্ড আমাদের অতি দুর্গম ও ভীষণ কাঁটাজঙ্গলের পথে বাঁশবন দেখাতে নিয়ে গেল পাহাড়ের ওপারে লুবড়া নালা ভ্যালিতে। অতি কষ্টে সেখানে গিয়ে পৌঁছে আমি বনের মধ্যে উপত্যকার দিকে মুখ করে বসলুম, মিঃ সিন্‌হা, রেন্‌জার সুলেমান কারকাট্টা ও ফরেস্টার--ওরা সব নীচে চলে গেল। সুলেমান বল্লে --বহুৎ steep নালা, আপ তো উতারনে নেহি সকেঙ্গে--

আমি বসে দূরের পাহাড়শ্রেণীর শোভা দেখচি সামনের গাছপালার ফাঁক দিয়ে। এমন সময় ওরা ফিরে এল, আমার জেদ ধরে গেল যে ওরা যা কোরেচে আমিও তা পারবো। এই জেদ থেকেই সারেন্ডা পর্ব্বতারণ্যের মধ্যে একটি সুন্দর এমন কি সুন্দরতম স্থানের আবিষ্কার করা সম্ভব হোল।

মিঃ সিন্‌হা বল্লেন--আসুন, আসুন--দেখুন কেমন সিনারি। আমি গিয়ে চেয়ে অবাক হয়ে গেলুম। মাত্র চল্লিশ ফুট নেমেচি যেখানে বসে ছিলুম সেখান থেকে। একখানা চওড়া পাথর যেন শূন্যে ঝুলচে, তার নীচে আরও কয়েক থাক প্রস্তরের সোপান, মাত্র হাত ছ-সাত- তারপরই প্রায় ন'শো ফুট খাড়া নীচু উৎরাই- পাথর ফেলে দেখলুম চার-পাঁচ সেকেণ্ড পরে তবে প্রথম পতনের শব্দ পাওয়া যায়, তারপরে গুরুগম্ভীর শব্দে গড়াতে গড়াতে যে কোন অতলস্পর্শ গহ্বরে গিয়ে পড়ে। মাথা নীচু করে গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা হয় না, মাথা ঘুরে পড়ে যাবো ঐ অত্যন্ত নীচে উপত্যকার মেজেতে, যেখান বন্য বাঁশঝাড়, আরও কত কি গাছের মাথা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপের মত দেখা যাচ্চে। আমাদের এই পাহাড়টার উচ্চতা ২২২৬ ফুট, ১৫০ ফুট আর উঠতে হয়তো বাকী, সবটুকুই উঠেচি তা ছাড়া। সামনে ৯০০ ফুট খাড়া নীচু উৎরাই সরল রেখায় নেমে গিয়েচে। আমাদের সামনে ১৬৫৬ ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের মাথা—আমাদের নীচে একটু ডানদিকে ঘেঁষে। সামনের উপত্যকাভূমি নিবিড় সবুজ, মেষলোমের মত বৃক্ষশীর্ষে ভর্ত্তি। তার ওপারে স্তরে স্তরে উঠেচে শৈলশ্রেণীর পেছনে শৈলশ্রেণী, সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত। আমাদের এই vantage point-টি একটি খাঁজে অবস্থিত, দুদিকে চলে গিয়েচে বনাবৃত দুই শৈলবাহু বহুদূর পর্যন্ত। বাঁদিকের বাহুতে অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে বহু স্থানে, একটা বটগাছ হয়েচে, আরও অনেক বড় বড় গাছ থাকে থাকে নেমে হঠাৎ যেন শূন্যে ঝুলচে। ঐ একটা শিববৃক্ষ আমাদের কত নীচে ডানদিকে, ঐ মনোহরপুর টাউনের অস্পষ্ট সাদা সাদা বাড়ীগুলি দেশলাইয়ের বাক্সের মত দেখাচ্ছে, কোল বোংগার পাহাড়টা সমতলভূমির সঙ্গে মিলে সমান হয়ে গিয়েচে এতদূর থেকে। বনভূমি নিনাদিত হচ্ছে ময়ূরের কেকারবে, নিম্নের উপত্যকার জঙ্গলে। এই নির্জ্জন গহনারণ্যে ময়ূরের কেকারব ওপরে দ্বিপ্রহরের নীলাকাশ, বহু বহু নিম্নে সংকীর্ণ উপত্যকায় পার্ব্বত্য ঝর্ণা লুবড়া নালার কালো খাত—আমাদের আশেপাশে বিশাল বনস্পতিশ্রেণী, আমলকী গাছ, বাঁশঝাড়, পাহাড়ের অনাবৃত

প্রস্তরময় অংশ, চীহড় লতা, রামদাঁতনের কাঁটা লতা, শূন্যে ঝোলা একটি কি গাছ আমাদের সামনে—এক ধরনের লজ্জাবতী ফুলের মত বনফুল—পর্ব্বতসানুতে, যেন এক বিরাট চিত্রকরের বিরাট ছবি। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখের সামনে মুক্ত হল! না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য্য, ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। আমাদের কত নীচে বাঁশবনে পাখী উড়ছে একদল। ন'মাইল এ স্থান মনোহরপুর থেকে। তারপর অতি কষ্টে বহু দুর্গম কাঁটাবন ভেঙে আবার মোটরের কাছে এসে পেঁছিলাম। পথ-প্রদর্শক না থাকলে অসম্ভব নামা পুনরায় পথে। ফরেস্ট রেন্‌জার পথ হারিয়ে গেল। আমরা অন্যদল অন্যপথে ভুলে চলে গেলুম। নামচি, নামচি—রাস্তা আর আসে না। তেমনি রামদাঁতনের কাঁটালতা সর্ব্বত্র—পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল কাঁটায়। এই স্থানে কখনো কেউ আসেনি আমি বলতে পারি।

মিঃ সিন্‌হা এ পথে এসেছিলেন ১৯২৫ সালে নভেম্বর মাসে—ঠিক এমনি সময় কোল বোংগা থেকে সাইকেলে। যতই অগ্রসর হই বোংগার দিকে, সেই ঘোর জঙ্গলের মূর্ত্তি দেখে মনে হয় এ দেখচি ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এই পথে একটি তরুণ যুবক একা কি ভাবে এসেছিল তাই ভাবি। তিনি তখন নব বিবাহিত, পথের চেহারা দেখে ভয়ে উইল করতে চাইলেন, এক এক স্থানে এমন জঙ্গল যে চারিধার থেকে চেপে ধরচে ঘোর জঙ্গলে। ঝর্ণার জল খেতে খেতে অগ্রসর হয়ে এই পোংগায় এসে পেঁছোন। এক দিকে একটা ঝর্ণা, বড় বড় পাথর—অবশেষে আমরা পেঁছে গেলুম একটা খোলা জায়গায়। সুরগুজার ক্ষেতে ফুল ফুটে আছে দেখে মনে হোল লোকের বাস দেখচি রয়েচে এখানে। এইখানে B.T.T. কোম্পানীর করাতের কারখানা ছিল আগে। জায়গাটার নাম হোল পোংগা। এই ব্রিটিশ কোম্পানী সিংভূমের এ অঞ্চলের বনভূমির যাবতীয় কাঠ কেটে চালান দিচ্চে আজ চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে। এদের শেয়ার-হোল্‌ডারদের মধ্যে পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার পর্য্যন্ত আছে। একটা খুব বড় চালাঘরে এদের ফরেস্ট ম্যানেজার মিঃ লক্‌নার থাকে। কেরানীদের থাকবার জন্য একটা ধাওড়া ঘর আছে। দু-একজন বাঙালী মেয়েকে যেন দেখলাম, তবে ঠিক বলতে পারি না।

তারপর মাইল খানেক এগিয়ে এসে আমরা উসুরিয়া বলে একটা জায়গায়, মিঃ সিন্‌হা যে ঘরে থাকতেন ১৯২৫ সালে, তাই দেখতে গিয়ে দেখি সেখানে বসবাস নেই। কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দর স্থান। উসুরিয়া বলে একটি পাহাড়ী নদী বয়ে যাচ্ছে খুব শব্দ করে, বেশ চওড়া নদী—অসংখ্য পাথর ছড়ানো। একদিকে কি সুন্দর বনের বড় বড় গাছ ও পাষাণময় উচ্চ তীর। অপরাহ্ণের ছায়া পড়ে এসেচে, রোদ হলদে হয়েচে—পানিতরের তেতলা বাড়ীর ছোট্ট ঘরটা যেন এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ নদীর ধারে বসে রইলুম, কুলুকুলু শব্দ যেন এই বনশ্রীর অনন্ত সঙ্গীত। যেদিন ভারতে প্রথম বেদগাথার উদাত্ত সুর ধ্বনিত হয় উসুরিয়া ঝর্ণা তখন বহু বহু প্রাচীন। বেদপারগ ও রচয়িতা ঋষিদের অতি অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের শৈশবেও এ এমনি বয়ে চলতো ঘন-তর বনানীর মধ্যে, আপনাতে আপনি মত্ত, চপল খুশিতে ভরা বন্য মেয়ের মত প্রাণোচ্ছল নৃত্যচ্ছন্দে ছুটে ছুটে, আজকার দিনের মত তখনও তার দুধারে ফুটতো দেবকাঞ্চনের ফুল, বন্য শেফালী, পাষাণের তটে কত শরৎ ও হেমন্ত সকালে ঝরা ফুলের রাশি ছড়িয়ে দিত আজও যেমন দেয়, কত চাঁদ উঠেচে, কত পাখী গেয়েচে ওর দুধারের শৈলারণ্যে। সে কি প্রাণ-মাতানো কুহুকুহু ধ্বনি, বাঁদিকের বাঁকে বড় বড় গাছের মাথায় কর্মপ্রিটাম ডিকেনড্রাম লতার কচিপাতায় হল্‌দে রোদমাখা সে কি সৌন্দর্য্য, কি শান্তি, কি নিস্তব্ধতা—কাদা নেই, ধুলো নেই—শুধু পাষাণময় তীর,

উপলবিছানো নদীগর্ভ। এইসব স্থানে প্রাচীন দিনে তপোবন ছিল নইলে আর কোথায় থাকবে?

এরই কাছে ঘন বনের মধ্যে বনবিভাগের সংরক্ষিত অঞ্চলে (Preservation plot) ১৮০।২০০ বছরের পুরানো শালগাছ দেখলুম। আমার ঠাকুরদাদা যখন বালক, তার আগে থেকেও এ গাছ এখানে রয়েচে তবে তখন ছিল চারা মাত্র। বনস্পতিদের যারা দেখেনি, তারা উপনিষদের ঋষিদের মন্ত্র 'যো ওষধিষু, যো বনস্পতিষু' এ কথার মর্ম্ম বুঝবে না।

সন্ধ্যার আগে আমরা অপূর্ব্ব সুন্দর বনপথে ছোটানাগ্‌রা এলুম। সামনে গুয়ায় উঁচু পাহাড়, আগে ভেবেছিলুম সলাইয়ের চিড়িয়া খনির। রাঙা পাথর বার করা জায়গাটা যেমন মনোহরপুর বাংলোর পাহাড় থেকে দেখা যায় তেমনি। সুন্দর জায়গাটি—স্টেশন থেকে কুড়ি-বাইশ মাইল দূরে, চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা বনে ঘেরা স্থানটি—তবে একটা বন্য গ্রাম আছে, তারা বাজরা সরগুঁজা ইত্যাদি বুনেচে ক্ষেতে। পোংগা থেকে ছোটা নাগরার এই রাস্তাটির অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য, একদিকে বড় বড় পাথর ও নির্জ্জন ঘন বনের মধ্যে দিয়ে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি সৃষ্টি করতে করতে ছুটে চলেচে উসুরিয়া নদীটি—বাঁদিকে ঘন বন, কম্‌প্রিটাম ডিকেনড্রামের মোটা মোটা লতা গাছের মাথায় ঠেলে উঠে এদিকে ওদিকে নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে দুলচে, যেমন উসুরিয়া নদীর দুধারে উঁচু মাস্তুল-সমান বনস্পতিদের মাথায় এমনি লতা দুলছিল, সাদা সাদা কচি পাতার সম্ভার নিয়ে, যেন সাদা ফুল ফুটেচে ঝোপের মাথায়। রোদ রাঙা হয়ে এসেচে গুহা পাহাড়ের মাথায়। আমরা ওদিক দিয়ে ঘুরে আবার এদিকে এসে পড়েচি। এই পাহাড়ের ওপারে গুয়া, steep রাস্তা দিয়ে উঠে বনের মধ্যের পথে সাড়ে ছ' মাইল মাত্র, কিন্তু মোটরের রোড দিয়ে বাইশ মাইল।

আমি বললুম—তবে শশাংদাবুরু এখান থেকে কেন দেখা যাবে না? তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়—সেদিন শশাংদাবুরুর মাথা থেকে আমরা ছোটানাগরা দেখেছিলুম—এখান থেকে কেন শশাংদাবুরু দেখা যাবে না?

গুয়ার সমশ্রেণীতে যে পাহাড় টানা চলে গিয়েচে—তারই এক জায়গায় শশাংদাবুরু খুব উঁচু· আমরা ঠিক করলুম।

সন্ধ্যায় একটি ঝর্ণার ধারে নিবিড় অন্ধকার বনে, গ্রাম থেকে কিছুদূরে বসি। সারেণ্ডার সব স্থানই ভাল, কত সহস্র beauty spot যে এর মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়ানো—তা কে বলবে? আমার আবার সব জায়গাই ভাল লাগে মনে হয়, সুতরাং চারিদিকেই beauty spot-এর ভিড়ে দিশাহারা হয়ে আছি। নক্ষত্র উঠেচে অন্ধকার আকাশে বনস্পতি-শীর্ষে। চলে এলুম তাড়াতাড়ি, কি জানি হাতীটাতী আসতে পারে।

বড় শীত। আগুনের পাশে বসে সারদানন্দের 'রামকৃষ্ণদেবের জীবনী' পড়ি।

আজ সকালে উঠেচি খুব ভোরে। সূর্য্য তখনও ওঠেনি। বেশ শীত। চা খেয়ে বসে লিখচি। তার পরে সালাইয়ের পথে পাঁচ মাইল গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের গায়ে হেন্দেসিরি পাঠকজির saw-mill দেখতে গেলুম। কাছেই একটি ঝর্ণা বয়ে যাচ্চে, নির্জ্জন বনে ঘেরা beauty spot, তার মধ্যে ছোট্ট কারখানাটি। একটা পাহাড়ের ওপর মালিকের জন্যে এক ছোট্ট বাংলো করে রেখেচে, মাটির মেজে গোবর দিয়ে রেখেচে। এখানে বসে লেখাপড়ার কাজ বেশ চলে।

বেলা একটার সময় ফিরে তেনতারি ঘাটে গিয়ে কোইনা নদীতে পার হওয়া যায় কিনা দেখে এলুম। কোইনা নদীর সঙ্গে বার বার দেখা হচ্চে, প্রত্যেক বাংলোতে থাকতে। কেবল দেখা হয়নি তিরিলপোসি থাকতে। অপূর্ব্ব শোভা এই বন্য নদীর,

তেন্‌তারি ঘাটেও তাই, বড় বড় পাথর বাঁধানো তটভূমি বনস্পতিশ্রেণীর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেচে। এক জায়গায় চুপ করে বসে রইলাম।

Range Officer বল্লে, ছোটানাগরা নামের অর্থ এখানে একটা লোহার নাগরা বা ঢোল আছে বনের মধ্যে পড়ে, প্রাচীন দিনে মানুষের চামড়া দিয়ে ঢাকা হোত এবং বাজানো হোত।

পথে আসতে মোটরের স্প্রিং ভেঙে গেল, বেলা তখন দুটো। এসে স্নানাহার করে কিছু বিশ্রাম করলুম। 'দেবযান' লিখি।

তারপর বেলা পড়লো—পশ্চিম দিকের পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন, চারিধারে পাহাড়ে-ঘেরা জায়গাটার কি চমৎকার শোভা হোল। আমরা একটু বেড়িয়ে এলুম পথ দিয়ে। একটা ঘাসওয়ালা পাহাড়ে উঠতে গিয়ে কাপড়ে ঘাসের বিচি লেগে গেল।

বাংলোর পেছনে ছোট্ট টিলাটার পাথরের ওপরে বসলুম সন্ধ্যায়। আকাশে নক্ষত্র উঠেচে, বনের মাথায়, পূর্বদিকে গাছের আড়ালে পড়েচে সেই জ্বলজ্বলে নক্ষত্রটা, ফুলডুংরি থেকে সেদিন রাত্রে যেটা দেখেছিলুম। পশ্চিম আকাশে বনের পাথরে পাহাড়ের মাথায় অস্তদিগন্তের রাঙা আভা।

অসীম নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত সৃষ্টি। একমনে বসে যোগাসনে সেই বিশ্ব-স্রষ্টার কথা যাঁরা চিন্তা করেন, এইসব সন্ধ্যায়, এই সব বনানীর শান্ত পবিত্রতায়—তাঁরা সাধু, যোগী। তাঁদের কথা জানি না, তবে চারিদিকে চেয়ে এই সন্ধ্যায় মন ভরে উঠলো বটে। বিশ্বদেবের উদ্দেশে আপনিই মাথা নত হয়ে আসে। দূরের ক্ষুদ্র বারাকপুর গ্রামে এখন নদীতীরে ছায়া পড়েচে, দূর মাঠে পড়েচে, লিচুতলা ক্লাবে মন্মথদা ও যতীনদা বসে গল্প জুড়েচে—কল্যাণী ঘাটশিলায় সন্ধ্যাদীপ দেখাচ্চে, কতদিন তার সঙ্গে দেখা হয়নি।

জীবনের কত অদ্ভুত রহস্য—অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! এমন স্থানে এমন সময়ে জীবনটাকে ভেবে দেখবার অবকাশ পায় ক'জন? কর্ম্মকোলাহলমুখর শহুরে মানুষ নিজেকে বুঝতে জানতে পায় না। এই নিস্তব্ধ গভীর বনপ্রান্ত, ঐ শৈলমালা, অগণ্য নক্ষত্রদল মাথার ওপরে, সন্ধ্যার মায়া—আলো-মাখানো দিগন্ত, বনশীর্ষ, শৈলচূড়া, ঝিঁঝিঁর ডাক—সবই মনকে অন্তর্মুখী হতে সাহায্য করে।

আজ শীত কম। অনেকক্ষণ বসে রইলুম পাহাড়টাতে। তারপর অন্ধকার ঘনীভূত হোল। মিঃ সিন্‌হা বাংলোর টেবিলে বসে লিখচেন দেখতে পাচ্ছি, হাতীর বা বাঘের ভয়টা তত নেই এখানে।

উনি ডাকলেন—দাদা—

আমি বল্লাম—যাই—

আজ সকালে উঠে আমরা মোটরে সলাই বাংলোতে এলুম। পথে ছোটানাগরা গ্রাম ছাড়িয়ে একটা লতা-ঝোপের মধ্যে দুটি লোহার ঢোল পড়ে আছে। একটা ছোট, এক ফুট ব্যাস বিশিষ্ট, অন্যটি আড়াই ফুট ব্যাস বিশিষ্ট। এই জঙ্গলে এক রাজা ন—তার নাম অভিরাম টুং। তার আমলে এখানে বাড়ী ছিল। ছোট ঢোলটা চামড়া দিয়ে ছাওয়া হোত ও বাজানো হোত।

সলাই বাংলোটি বড় চমৎকার স্থানে অবস্থিত। বামে, সম্মুখে, অতি নিকটেই ঘন বনাবৃত পর্ব্বতমালা দুহাজার ফুট উঁচু। পর্ব্বতের পটভূমিতে সামনেই খুব বড় মোটা প্রায় দশ ফুট ব্যাস যুক্ত গুঁড়িওয়ালা এক শিমুলগাছ। তার পেছনে অসংখ্য

বনপাদপ, নটরাজের মত তাণ্ডব নৃত্যের ভঙ্গীতে শাখাবাহু ছড়িয়ে কি একটা গাছ বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েচে। প্রভাতের শিশিরসিক্ত নিস্তব্ধ বনস্থলীতে কতপ্রকার বনবিহঙ্গের অদ্ভুত কুজন। বারান্দায় চেয়ার পেতে শুনচি একটা পাখী টুং টুং টুং টুং করে ডাকচে, আর একটা পোষা টিয়ার মত যেন বুলি বলচে, চোখ বুজে কান পেতে শুনচি ও পক্ষীকুলের কলতান। বাম দিকের খুব উচ্চ পাহাড়ের এক জায়গায় অনেকখানি অনাবৃত পাথর বেরিয়ে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে। ঈষৎ কুয়াশা লেগে আছে সামনের পর্ব্বতগাত্রে—যেন মনে হচ্চে নীচেকার বনে বুঝি কেউ আগুন দিয়েচে, তারই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে উঠচে পাহাড়ের গায়ে। বাঁদিকে পাহাড়ের নীচে কোইনা নদী বইচে পদে পদে সৌন্দর্য্যভূমি রচনা করে। ট্রলি করে লো যেতে যেতে ঘন বনের ডান দিকে দু জায়গায় এমন সুন্দর চওড়া পাষাণময় নদীগর্ভ বনের ফাঁকে চোখে পড়লো। তার ওপারে কম্‌প্রিটাম লতার ফুল-ফোটা বিশাল শৈলসানুর অরণ্যানী। কি গম্ভীর শোভা! সিংভূমের ও সারেণ্ডার বনান্তরালে কত স্থানে কত সৌন্দর্য্যভূমি ভগবান যে ছড়িয়ে রেখেচেন, কৃপণের মত দু'একটাকে গুনে গেঁথে রাখেননি—ধনী দাতার মত দু'হাত পুরে ছড়িয়েছেন হাজারে হাজারে। এই পথ দিয়ে ট্রলিতে সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরবার সময় রাঙা রোদ মাখানো পর্ব্বত ও বনানীশীর্ষে সামনের দুইয়া লৌহখনির অনাবৃত রক্তবর্ণ লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বতগাত্রে বহু উচ্চ শৈলশিখরে মোটা মোটা লতা দোলানো, অসংখ্য দেবকাঞ্চন ফুল-ফোটা, ময়ূর ও ধনেশ পাখীর ডাকে মুখর অরণ্যানী দেখতে দেখতে ওই কথাই বার বার মনে পড়ছিল। সন্ধ্যায় ফিরবার পথে ঘন ছায়া পড়েছে বনে বনে, চারিধারে পাহাড়ের ছায়া—কোনো অজানা বনপুষ্পের সুবাস অপরাহ্ণের শীতল বাতাসে। আমি মিঃ সিন্‌হাকে বল্লুম কিসের বেশ গন্ধ পেয়েছেন? Range Officer সুলেমান কারকাট্টা ছিল ট্রলিতে, সেও কিছু বুঝতে পারলে না। আংকুয়া জংসন থেকে চিড়িয়া মাইন্‌স্‌ পর্য্যন্ত একটা লাইন গিয়েচে, একটা গিয়েচে দুইয়া মাইন্‌সে। এ দুটিই বেংগল আয়রণ ও স্টীল কোম্পানীর খনি। মনোহরপুর থেকে এই পনেরো মাইল এরা ঘন বন পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে ছোট লাইন পেতেচে এ দুই লৌহপ্রস্তরের পর্ব্বত থেকে ore নিয়ে যাবার জন্যে, মনোহরপুর রেলওয়ে সাইডিং-এ। কলকাতার ক'জন এই সুন্দর রেলপথটির খবর রাখে? আংকুয়া জংসনে একটা সেলুন পেলুম, তাতে চিড়িয়া মাইন্‌সের বড় সাহেব মিঃ মেরিডিথ যাচ্ছে। তার সংগে গল্প করতে গেলুম। সে বল্লে, চিড়িয়াতে ফুটবল আছে, টেনিস আছে, রেডিয়ো আছে। আবার চলেচি ছোট্ট ট্রেনে বনপথে, বাঁদিকে হামশাডা নদী বনের পথে মর্ম্মর শব্দে বয়ে গিয়ে কোইনাতে মিশেচে। চিড়িয়াতে পৌঁছে দেখি সামনের বহু উঁচু পাহাড়ের গা বেয়ে খাড়া রেলপথ উঠেচে পর্ব্বতশিখরে। Skip উঠেচে মোটা তারের বন্ধনে- রাঙা ধুলো-মাখা হো কুলী মেয়েরা সর্ব্বত্র কাজ করচে। আমাদের Skip দিয়ে ওপরে উঠবার সময়ে বেশ লাগলো, কখনো উঠিনি—কিন্তু ভয়ও করলো খুব। কল্যাণী কখনো উঠতে পারতো না এ পথে—ও যা ভীতু! ওপরের শিখরে উঠে নীচে চেয়ে সমতলভূমির অপূর্ব্ব দৃশ্য চোখে পড়লো। ১৪৩০ ফুট ওপর থেকে নীচের দিকে দেখচি এমন ভাবে, ঠিক যেন একটা উঁচু বাড়ীর ছাদের কার্নিসে ঝুঁকে আছি। এ সব দৃশ্য চোখে না দেখলে বোঝানো যায় না।

এই লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলমালা লেদাবুরু, অজিতাবুরু ও বুদ্ধাবুরু, এই তিনটি নামে অভিহিত। এর সর্ব্বোচ্চ শিখর হোল বুদ্ধাবুরু ২৭০০ ফুট উঁচু। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের বিরাট শৈলগাত্র সেদিন পনেরো মাইলদূর মনোহরপুর বাংলো

থেকে দেখেছিলাম। সৃষ্টির আদিম যুগে এত লোহা পৃথিবীর উষ্ণ গলিত ধাতুস্রাব থেকে তৈরি হয়েছিল কিংবা ফুটন্ত গর্ভকেন্দ্র থেকে ঠেলে উঠেছিল—কে বলবে! মাথা ঘুরে যায় এই বিরাট বস্তুপুঞ্জ এক জায়গায় পর্ব্বতাকারে জমাট বাঁধা অবস্থায় দেখলে। কি সে মহাশক্তি, কোন সে মহাদেবতা—এই সব বস্তুপিণ্ড যিনি লীলাচ্ছলে সাজিয়ে গিয়েচেন, কোন্ প্রচণ্ড শক্তির বলে এই বিশাল লৌহপর্ব্বত পৃথিবীগর্ভ থেকে উত্থিত হয়েচে, এসব ভূতত্ত্ববিদেরা বলবেন. আমরা শুধু বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে চেয়েই আছি।

আমরা চলেচি আসলে 'আংকুয়া ২৯' নামক বনবিভাগের চিহ্নিত অংশে, একটি ন্যাকি জলপ্রপাত আছে, তাই দেখতে। খনির খাদ হচ্ছে পাহাড়ের ওপারে, আমাদের সামনে আবার প্রায় ৪০০।৫০০ ফুট উঁচু খাড়া রেলপথে Skip উঠেচে আরও উচ্চতর পর্ব্বত শিখরাঞ্চলে। রাঙা লৌহপ্রস্তরের ধুলিমাখা হো কুলি মেয়েরা হাসিমুখে কাজ করচে। এদের মধ্যে অনেকে দেখতে বেশ সুন্দর।

মাইল দেড় খনির করা workings-এর মধ্য দিয়ে হাঁটবার পরে আমরা জঙ্গলে প্রবেশ করলুম—এসব রিজার্ভ ফরেস্ট। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। সেই যে এক-প্রকার কাঁটাওয়ালা ফল, ওকড়া ফলের মত, যা কাপড়ে লেগে সেদিন টোয়েবু যাবার পথে জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তা এখানেও লাগতে লাগলো। অতি দুর্গম পথ —একটি নালা ধরে নালার খাতের পাষাণ বাঁধানো—একদম লৌহপ্রস্তর বাঁধানো—গর্ভ দিয়ে বড় ছোট পাথর ডিঙিয়ে ন্যমচি, নামচি, নামচি। ফরেস্ট গার্ডকে বলচি আমরা, ও Falls কেত্না দূর?

সে প্রথমে বল্লে—এক মাইল। এখন বলচে দেড় মাইল। তারপর পথ যতই দুর্গম হয়ে আসে, ও ততই বলে, দু' ফার্লং।

কিন্তু একেবারে বিরাট wilderness-এর মধ্যে দিয়ে ক্রমনিম্ন পাহাড়ী ঝর্ণার পাষাণময় গতিপথ বেয়ে নামচি, নামচি—আশেপাশে চেয়ে দেখচি তৃণ, পান্‌জন, বট, আসান, শিববৃক্ষ (sterculia urens), পান, আরও কত মোটা মোটা লতা, কম্‌প্রিটাম লতা, বন্যকন্দ, বন্য অশ্বগন্ধা—কত কি গাছপালা। এক জায়গায় বড় বড় পাথর বেরিয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে, ঝর্ণার জল পড়ে একটা গর্ত্ত-মত সৃষ্টি করেচে পাথরের ওপর। ছোট্ট একটি গুহাও।

ফরেস্ট গার্ড একটা জায়গায় এসে বল্লে—আওর তিন ফার্লং।

সেখানে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েচে। নালাটা হঠাৎ চল্লিশ ফুট ওপর থেকে নীচে পড়ে একটা গভীর খাতের সৃষ্টি করেচে এবং গভীর থেকে গভীরতর খড্ কেটে ক্রমনিম্ন খাড়া ঢালু পথে বহু, বহুদূরে নেমে গিয়েচে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে—দূরে জলপতনধ্বনি শুনতে পেলুম বটে।

অদ্ভুত, গম্ভীর এই স্থানের দৃশ্য। বর্ণনা করা যায় না। আমরা দেখলুম আরও তিন ফার্লং গিয়ে আজ আর ফিরতে পারবো না। চিড়িয়া খনির Skip বন্ধ হয়ে যাবে। তখন দুর্গম ঢালুপথে হেঁটে নিচে নামবে কে?

ফরেস্ট গার্ড বল্লে—জলপ্রপাত ওখান থেকে দেখা যাবে না। ঢালুপথে অনেকটা নামতে হবে—তিন ফালং গিয়ে, তবে দেখা যাবে।

তিনটে বেজেচে—'আংকুয়া ২৯' Falls মাথায় থাকুক্। ১৭৬০ ফুট পর্ব্বত-শিখর যেখানে বসে আছে, পার্ব্বত্য ঝর্ণা সেই গভীর খাতের একেবারে প্রান্তে। সুলেমান কারকাট্টা বল্লে ম্যাপ দেখে—এ জায়গাটা ১৭৬০ ফুট উঁচু।

সেখানে বসে টিফিন বক্স্ থেকে বার করে পুরী, কাটলেট, কলা ইত্যাদি খেলুম।

ফরেস্ট গার্ড দুটি খড়কুটো জ্বালিয়ে চা করলে। মহিষের দুধের মাখন জমে গিয়েচে শীতে, মাখন-চা হোল।

খেয়ে সেই বনের পথে আবার ফিরলুম। কি ভীষণ নিস্তব্ধ জনহীন wilderness! যে এসব না দেখেচে, তাকে এর গাম্ভীর্য্য কিছুই বোঝানো যাবে না। সারেণ্ডা অরণ্যের অন্তরালে হাজারো সৌন্দর্য্যভূমি ছড়ানো—আমি আফ্রিকায় যেতে চেয়েছিলুম বন দেখতে! আবার সেই কাঁটাওয়ালা ফল—এদেশী নাম 'মিন্‌ডো জোটে', কাপড়ে জামায় লেগে ভারি হয়ে গেল। উঠচি, উঠচি—চড়াইয়ের দুর্গম পার্ব্বত্যপথ। অতি কষ্টে চলেচি, ঘন ঘন হাঁপাচ্চি। কক্‌ কক্‌ শব্দ করে বিচিত্র বর্ণের বন-মোরগ পালিয়ে গেল।

খনিতে এলুম, বেলা পড়েচে, কি সুন্দর সমতলের দৃশ্য। অনাবৃত লৌহপ্রস্তরের শৈলগাত্রেরই বা কি ভীমদর্শন চেহারা। এক জায়গায় অনেকখানি কোয়ার্টজাইট পাথর বেরিয়ে আছে অনেক ওপরে—যেমন নিচের ঝর্ণার দুধারে অনেক জায়গায় অতি অদ্ভুতভাবে ছিল। Skip দিয়ে একটি তরুণী হো মেয়ে উঠে এল বেশ শান্তভাবে। যারা কখনো Skip-এ ওঠেনি তাদের মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা। আমরা নামচি, অনেকগুলি রাঙা ধূলিমাখা কুলি মেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে দেখচে, এঞ্জিন ড্রাইভারকে বলচে—ঠারো, ঠারো।

নামবার সময়ে ঢালুর দিকে চেয়ে ভয় করলো—যেন কোন্‌ নরকে নেমে চলেচি। যদি শেকল ছিঁড়ে যায়, তবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে হবে। ট্রেনে এলুম আংকুয়া জংসন—ট্রলিতে সেই অপূর্ব্ব বনপথে এলুম সবাই। বড্ড ঠাণ্ডা বাতাস লাগচে সামনে থেকে ট্রলির বেগে, বনপুষ্পের সুবাস বাতাসে, দুপাশে বনে বনে অজস্র দেবকাঞ্চন (bohinia) purpuria) ফুল ফুটে। ধনেশ পাখী ডাকচে বনে। বাঁদিকে কোইনা নদীর ওপারে পর্ব্বত-শীর্ষে ও বনস্পতি-শীর্ষে রাঙা রোদ। সলাই বাংলো তিন মাইল, ওখানে আমাদের মোটর আছে।

ওই সামনে দুইয়া খনির শিখরদেশ দেখা যাচ্চে রাঙা দগ্‌দগে ঘার মত সবুজ শৈলগাত্রে—ঠিক সবুজ নয়, ধূসর শৈলগাত্রে।

এ বনে যজ্ঞডুমুর ও শিমূল, আম ও পানজন গাছ অনেক, আলোকলতা ও চটি-জুতোর মত ফল বিশিষ্ট সেই গাছটাও যথেষ্ট। শেষোক্ত গাছটা আমাদের বারাক-পুরের ভিটেতে আছে।

মনেও পড়লো বারাকপুরের কথা—কুঠির মাঠে শীতের অপরাহ্ন নেমেচে, আল-কুশীর লতা দুলচে বনে ঝোপে, ইন্দু রায় তার বাড়ীতে বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করচে—বেশ দেখতে পাচ্চি।

সলাই থেকে তখনি মোটর ছাড়া হোল। সুলেমান কারকাট্টাকে আমরা মোটরে উঠিয়ে নিলুম—নতুবা সাইকেলে এই সন্ধ্যায় সলাই থেকে ছোটনাগড়া সাড়ে সাত মাইল ভীষণ বনের পথে যেতে হবে। হাতীর বড় ভয় এ সময়। বাঁদিকে সেই সুউচ্চ প্রায় ২০০০ ফুট উঁচু পর্ব্বতমালার দিকে চেয়ে আছি। মোটর ছুটচে বেগে, কখনো ঘন বনে ঢুকচে কম্‌প্রিটাম লতার শাদা কচি পাতা দোলানো ঝোপের মধ্য দিয়ে, কখনো উঠচে, কখনো নেমে পার্ব্বত্য নদী পার হচ্চে। আমি দেখচি বাঁদিকের পাহাড়ে কোথাও খানিকটা অনাবৃত পর্ব্বতগাত্র, কোথাও একটা গাছ। এই সন্ধ্যায় কল্যাণীর কথা বড় মনে হচ্চে, ওকে হয়তো কাল দেখবো।

অনেক দূরে ইছামতীর পারে একটি তেতলা বাড়ীর ওপরের ঘরটিতে—সেখানে এখন কেউ থাকে না—যে ছিল, অনেক কাল আগে সে কোথায় গিয়েচে। গৌরী—তার

কথা মনে হচ্চে আজ সন্ধ্যায়। এই সময়ে সে মারা গিয়েছিল আজ বিশ বৎসর আগে। ভগবান তার মঙ্গল করুন।

দুদিকের বন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিবিড়তর দেখাচ্চে, সেদিনকার সেই ছোট্ট ঝর্ণাটি পার হলুম, যার ধারে লতাকুঞ্জে রাজা অভিরাম টুংয়ের ঢোল পড়ে আছে।

অনেক রাত্রে একবার আমি বাইরে এলুম, আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নক্ষত্রসমূহ ঠিক হীরকখণ্ডের মত জ্বলচে, গুয়ার পাহাড়ের মাথায় একটা নক্ষত্র দপ দপ করচে, একবার নিবচে আবার জ্বলচে যেন। আকাশে নক্ষত্রসমূহের এমন দীপ্তি বাংলা দেশে তো দেখিই নি, এমন কি মনে হয় ঘাটশিলাতেও দেখিনি।

একটা সারেণ্ডা বা সিংভূম দর্শনেই আমি মুগ্ধ, কিন্তু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অমন কত অনন্ত কোটি beauty spot ছড়ানো রয়েচে, ঐ সব নক্ষত্রে নক্ষত্রে কি বিচিত্র জীবন-ধারা, আত্মার অনন্ত গতিপথে ওদের নিয়েও তাঁর লীলা। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। বন পাহাড়ের মাথার ওপরে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের লীলা, শুধু তাঁর কথাই মনে আনে।

সকালে উঠে দেখি খুব কুয়াশা হয়েছে, সাদা ধোঁয়ার মত কুয়াশার রাশি উপত্যকা থেকে উঠচে ওপরে, গুয়ার পাহাড় ঢেকে দিলে। বড্ড শীত। পাহাড়ের নীচে বনশ্রেণী কুয়াশায় ঢাকা, ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠলো। সূর্য্যদেবকে প্রণাম করলুম।

আজ এখান থেকে চলে যাবো। সারেণ্ডা অরণ্যের কাছে বিদায় নিলুম, হে সুপ্রাচীন অরণ্য, তোমায় প্রণাম করি। শত বিস্ময়ের সৌন্দর্য্যভূমি তোমার মধ্যে হাজার বৎসর ধরে লুকানো ছিল, কেউ আসেনি দেখতে—এতদিন দেখে ধন্য হয়ে গেলাম। আজ ষোল দিন ধরে বনপুষ্প সুবাস উপভোগ করেচি তোমার বনে বনে, তোমার বনবিহঙ্গের কলগীতি শুনে কান জুড়িয়েচি শহরের কলকোলাহলের পরে, তোমাকে প্রণাম করি। কত দেবকাঞ্চন ফুল, কত লুদাম, কত অপরিচিত নাম-না জানা ফুল, কেকাধ্বনি জলপ্রপাতের জলপতনধ্বনি জনহীন গহন বনে, সেই গুহা দুটি, কত বন্যলতার অদ্ভুত মনোরম ভঙ্গি, ধনেশ পাখীর কর্কশ চীৎকার, ক্ষুদ্র barking deer এর ঘেউ ঘেউ শব্দ, বন্য বানরের ডাক (যেমন কাল ডাকছিল আংকুয়া জলপ্রপাতের বনে), অপূর্ব্বদর্শন বনাবৃত শৈলমালা, লৌহপ্রস্তরের বিশালকায় খনি—এ সব দেখবার শুনবার, উপভোগ করবার অভিজ্ঞতা যে কত দুর্ল্লভ তা আমি জানি। সেইজন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দিই, যিনি আমাকে এখানে এনেচেন।

আজ সকালে চা খেয়ে মোটরে রওনা হই গুয়াতে। গাড়ীর স্প্রিং ভেঙে গিয়েচে বলে জিনিসপত্র কুলির মাথায় পাঠানো হোল গুয়াতে। মোটর ছেড়ে আসচি, পথে ঝর্ণার পথে কিছুদূরে আমাদের পাচক বিরশা চলেচে হেঁটে। কার্ডিনাল উলসির কথা মনে হোল ওকে দেখে। আজ বনের পথে মোটর চলেচে, আমি ভাবচি প্রায় চারশো মাইল পথ অতিক্রম করে চাঁইবাসা গিয়ে ট্রেন ধরে আজই হয়তো রাত একটা-দেড়টায় বাড়ী পেঁছে যাবো। খুব আনন্দ হচ্চে আজ সারা পথটি। তেনতারি ঘাটে কোইনা নদী পার হলুম। এখানে সাত-আটজন কুলি আমাদের গাড়ী ঠেলবার জন্যে অপেক্ষা করচে।

ঘন জঙ্গলের পথে যাবার দিনের সেই কুম্‌ডি রাস্তার মোড়ে এলুম। বরাইবুরু বলে যে গ্রামটি কারো নদীর ধারে সেটি ছাড়ালুম। গুয়া এলুম মিঃ রাসবিহারী গুপ্তের বাড়ী, সেখানে মহিলা সমিতির সভানেত্রী আশা দেবী ও আরও কয়েকটি মহিলা দেখা করতে এলেন আমার সঙ্গে। মিসেস্ গুপ্ত পরিতোষ করে আমাদের

খাওয়ালেন। অনেকদিন পরে যেন সভ্যজগতে এসেচি বলে মনে হচ্চে। আমরা তিনটের সময়ে মোটরে রওনা হই, বরাইবুরুতে কারো নদী পার হয়ে জামদার পথে চল্লুম হাটগামারিয়া। আজ হাটবার গোপালনগরের, জগন্নাথপুরের হাট দেখে আমার সেকথা মনে পড়লো। পণ্ডা মাস্টার বেগুন বিক্রি করচে ইঁদারার ওপরে বসে। রোদ রাঙা হয়ে আসচে। পিছনে দেখা যাচ্চে কেউন্‌ঝর রাজ্যের পাহাড় ও বন, বামে কোল্‌হান ও সারেণ্ডার শৈলমালা। হাটগামারিয়া এসে পরেশবাবুর আপিসে আমরা চা খেলুম—তারপর কেঁদ্‌পোসি স্টেশনে এলুম ট্রেন ধরতে। আমি এখান থেকেই যাবো ঘাটশিলায়। আজই যাবার জন্যে মন উদ্বিগ্ন। মণীন্দ্র নন্দীর নাতি আলাপ করলেন। তিনি এখানে চীনামাটির খনির ম্যানেজার। 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাকি তাঁর খুব ভাল লেগেছে।

ট্রেনে উঠলুম, লেখা আছে ইন্টার ক্লাস, কিন্তু কাজে সেকেন্‌ ক্লাস, বেশ আরামে বিবেকানন্দের 'ভক্তিযোগ' পড়তে পড়তে এলুম—মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে ধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে ভাবি। এতক্ষণ হাট শেষ হয়ে গেল, লোকেরা সব বাড়ী ফিরচে। লিচুতলায় আড্ডা বসেচে। বিরশার সংগে আবার দেখা চাঁইবাসা স্টেশনে। ডাক-আরদালি কামরায় এসে সেলাম করে বকশিশ চাইলে।

বড্ড দেরি করে ট্রেন টাটায় এল। রাঁচি এক্সপ্রেস ছেড়ে গিয়েচে– সারারাত্রি ওয়েটিং রুমে চেয়ারে বসে কাটালুম। নৈহাটির এক গার্ড এখানে কি করচে, তার সঙ্গে সারারাত গল্প করি। দুজন ছোকরা ওয়েটিং রুমে আমায় চিনতে পেরে বসবার জায়গা করে দিল।

রাত শেষ হয়ে গেল। ৬টায় ট্রেন এল, ভীষণ শীত। ঝিমুতে ঝিমুতে ঘাট-শিলায় এলুম। মনে খুব আনন্দ। ষোল দিন পরে বাড়ী ফিরচি, ঘি ও ধুনো হাতে ঝুলিয়ে চলেচি। শান্ত এসেচে বম্বে থেকে, প্ল্যাটফর্ম্মে দেখা। ও গেল পুঁটুর কাছে। কল্যাণীরা ঘি দেখে খুব খুশি। বাড়ী আসতে সবাই খুশি।

উষা চিঠি দিয়েচে কাশ্মীর থেকে, অজিতবাবু চিঠি দিয়েচেন রাঙামাটি (চট্টগ্রাম) থেকে—বাড়ী এসে পেলুম।

পরের দিন সন্ধ্যায় শচীন ও ফণির সংগে বসে বসে চালভাজা খাচ্ছিলাম। সারেণ্ডাতে কত ভাল জায়গা দেখেচি তার একটি তালিকা ওদের কাছে বল্লাম। প্রথমে ধরি কুম্‌ডির পাশে কোইনা নদী। ২য়, শশাংদাবুরু; ৩য়, থলকোবাদ বাংলো, ৪র্থ, জাতি-সিরাং (Matrock) ৫ম ভানগাঁও ও বোনাই সীমান্ত ; ৬ষ্ঠ, বাবুডেরা ; ৭ম, বনশ্রী ও বাবুডেরা থেকে সাম্‌টার তেমাথার পথ ; ৮ম, হেন্দেকুলি ক্যাম্প ও তৎপূর্বে সামটা নালার loop ৯ম, শিশিরদা জলা ও গুহাদ্বয় ; ১০ম, থলকোবাদ বাংলো থেকে বনপথে কোইনা নদী ও তীরবর্তী বনভূমিতে কোইনা নদীর loop ; ১১শ, টোয়েবু জলপ্রপাত ও সেখানে যাবার বনপথটি ; ১২শ, বিট্‌কেলসোয়া গ্রাম ও সেখানে যাওয়ার পথটি ; ১৩শ, মহাদেবশাল ঝর্ণা ও কোল বোংগা গ্রাম ; ১৪শ, নৃসিংহদাস বাবাজীর আশ্রম, মনোহরপুর ; ১৫শ, হেন্দেসিরি ; ১৬শ, ছোটানাগরা বাংলো ; ১৭শ, সলাই বাংলো ; ১৮শ, সলাই থেকে আংকুয়া যাবার পথ ও পাশে কোইনা নদীর পাষাণময় গর্ভ ; ১৯শ, চিড়িয়া খনি ; ২০শ, Lyall's look-out, রামদাঁতনের কাঁটা-লতা ভেঙে সেখানে গিয়েছিলাম ; ২১শ, উসুরিয়া ঝর্ণা ; ২২শ, বড় বড় শালের preservation plot ; ২৩শ, আংকুয়া জলপ্রপাত ; ২৪শ, সেচনের পয়োপ্রণালী ; ২৫শ, বড়া নাগরা ও ছোট নাগরা (ঢোল দুটি ও অভিরাম টুং রাজার ভগ্নমন্দির) ; ২৬শ, পোংগা যে কুটিরে মিঃ সিন্‌হা ১৯২৫ সালে ছিলেন।

অনেকদিন লিখিনি। কাল সন্ধ্যায় ইন্দুবাবুর গাড়ীতে ধলভূমগড় থেকে ফিরে এসেচি। ৫ই জানুয়ারী তারিখেও একবার গিয়েছিলুম। বড় ভাল লাগে ও জায়গাটা। মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এখানে ওখানে খড়ের ঘরের সারি—এরোড্রোমের লোকদের বাসস্থান। শাল, মহুল, হরীতকী ছাড়া বিদেশী কোন রোপিত ফুল ফলের বৃক্ষ নেই. কোঠাবাড়ী এক-আধখানা বেশি নেই। বাঁদিকে দূরে চারচাকীর জঙ্গল দেখা যায়। শুকনো শালপাতার বেড়ার গন্ধ রোদ ঝাঁ-ঝাঁ দুপুরে ইসমাইলপুরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চারচাকীর বনটি অতি চমৎকার, সেদিন যখন জ্যোৎস্না উঠলো আর কোনো বাড়ী-ঘর দেখা যায় না—অত বড় বিরাট মুক্ত space যেন মায়াময় হয়ে উঠলো। যে কোনো সময় ঘরে বা বারান্দাতে বসে সামনে চোখে পড়ে ভালকী পাহাড় ও তা পটভূমিতে ঋজু ঋজু সুদীর্ঘ শালতরুশ্রেণী—কাল আবার মেঘ করাতে দৃশ্যটি এত সুন্দর হয়েছিল। নীল হয়ে উঠেচে শৈলমালা। এখানে যদি কলকাতার শৌখীন লোকেরা বাড়ী করে টাউন বানাতো, বাড়ীর নাম দিতো 'সন্ধ্যানিবাস' 'অলকা' 'বনবীথি' 'Hill view' 'অক নিলয়' 'Forest side' ইত্যাদি, বালিগঞ্জ ফ্যাশানে সামনে ঢাকা টানা বারান্দা করতো কাঁচের প্যানেল বসানো, লম্বা জানালায় ফ্রেম বসানো, লতাপাতা আকারের লোহার রেলিং বসানো গেট্ বসাতো—তাহলেই এই শালবন ও শৈলশ্রেণী, লাল মাটি ও কাঁকরের উচ্চাবচ ঢিবির সঙ্গে, এই রৌদ্রস্নাত দূর দিগন্তের সঙ্গে, এই লাল ধুলো মাখা সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে আর কোনো যোগ থাকতো না। সে হয়ে উঠতো একটা টাউন—বালিগঞ্জের অক্ষম ও সক্ষম অনুকরণে। যেমন নষ্ট হয়েচে দেওঘর বা মধুপুর বা শিমুলতলায়। এবং নষ্ট হয়েছে খানিকটা ঝাড়গ্রামও।

বারাকপুর গিয়েছিলুম ধান চাল গোছাতে। গেলুম সেদিন গুটকের সঙ্গে রাঁচী প্যাসেঞ্জারে। যাবার পূর্ব্বে দ্বিজুবাবুর বাড়ীতে বেদান্ত ও ব্রহ্মবাদ সম্বন্ধে কত আলোচনা করি—ফিরে এসে আর দেখা হয়নি। কলকাতায় পৌঁছে—রমেশ ঘোষালের বাড়ী গিয়ে 'তালনবমী' পুস্তকের contract হোল। সেখানে দেখলুম 'Indian Arts and Letters' বলে পত্রিকা, যাতে আমার কথা লিখেচে। সেদিনই তিনটার ট্রেনে বনগ্রামে গিয়ে বন্ধুর বাসায় থাকি। টরু আছে এখানেই। ভীষণ শীত রাত্রে। লিচুতলায় মনোজবাবু, যতীনদা, মন্মথদার সঙ্গে জমাট আড্ডা। মিতে এসে বল্লে 'স্বপ্ন বাসুদেব' বড় ভাল লেগেচে। অন্ধকারে মনোজবাবু ও আমি মিতের সঙ্গে এলুম সুরেনের বাড়ী। সন্তু এল অনেক রাত্রে। কত গল্প—বিশেষতঃ সারেণ্ডা বনভ্রমণের। সকালে উঠে ননকুর আনা কেক ও pastry চা দিয়ে খাই। মিতের বাড়ী দুপুরে খেয়ে গৌরী ও মিতের সঙ্গে ভাগবদ্প্রসঙ্গ আলোচনা করলুম। তারপর বারাকপুরে গেলুম। সজনে ফুলের সুগন্ধ সর্ব্বত্র। ইন্দু ও শ্যামাচরণদার বাড়ী বসে গল্প করি। পরদিন নদীতে স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। ঘুমিয়ে উঠে হারিকেন হাতে ইন্দু রায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে বাজারে বা 'নগরে' গেলুম—যেমন ছেলেবেলায় দেখতুম অমৃত কাকাকে করতে। যেন আমি এই বারাকপুরের একজন চাষীবাসী গৃহস্থ, খাজনা আদায় করে বেড়াই। বারিকের বাড়ী থেকে ধান ও খাজনা আদায় করতে গিয়ে রস খাই ও বেগুন নিয়ে আসি তপজ্জলের বাড়ী থেকে কাপড়ে করে—ঠিক গ্রাম্য গৃহস্থের জীবন। এখনও ছোট এড়াঞ্চির ফুল গাছে গাছে—একরকম কণ্টকলতার থোলা থোলা ফুলের কি সুবাস। সজনে ফুলের গন্ধ পথের বাতাসে।

বিকেলে মল্লু মাস্টারের বাড়ী গিয়ে বসলুম। মেলা স্কুলের ছেলেরা এল, ননী

মাস্টার এল, শশধর মুহুরী এল। সারেণ্ডা ফরেস্টের গল্প করি ওদের কাছে ; চা খেয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ী চলে এলুম। যুগল ময়রার দোকানে একটা লেডিকেনির দাম চার আনা—তাই খেয়ে একটু জলযোগ করি।

এই সেই সময়—যে সময় ১৯৩৭ সালে আমি পাটনায় গিয়েছিলুম সভা করতে। শিবপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। মোজার্টের minuet in c minor শুনছিলুম গঙ্গার ধারের বালির চড়ার দিকে চোখ রেখে। উড়ে বেয়ারা তত্ত্ব নিয়ে এসেছিল খুকুদের বাড়ী—সে সব দিন অতীতের গহন কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হতে চলেচে। কোথায় আজ খুকু।

পরদিন সকালে কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম, গাছে গাছে কুল পেকেচে—মনে আসছে ১৯০৪ সালের সেই সরস্বতী পূজো। আমার একেবারে শৈশব তখন—অস্পষ্ট মনে হয় একটু একটু। কুঠীর মাঠের গাছপালা বনঝোপের কি চমৎকার শোভা। পেয়ারাতলায় বসে ভগবানের কথা চিন্তা করলুম। কাছিম কাটচে সাঁইবাবলা তলার ঘাটে। ওপারের ঘাটে গিয়ে স্নান করলুম। তারপর বুধো ঘোষের খামারে আমার ধান ঝাড়া ও মাড়া হচ্চে, সেখানে গেলুম। একজন হ্যাটপরা লোক যাচ্চে হরিপদদার বাড়ীতে—তাকে ডেকে এনে বসালুম। হাটে গেলুম লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মুখ ব্যথা।

তিনটি ঘটনা বড় ভাল লাগলো এবার গ্রামে। বড়-চারা আমগাছ তলায় নিবিড় ঝোপে শুধু পত্ররাশির ওপর একা বসে বনপুষ্প সুবাসের মধ্যে রোজ দুপুরে কত কথা চিন্তা করতুম, কত কি পাখি ডাকত বনে, ভগবানের দানের মত কোথাও আমড়া পড়তো, গান গাইতুম 'তব আসন পাতা এ বনতলে'—আমারই তৈরী গান, এবং ওর ওই একটিই লাইন। গান তৈরী করতে তো জানি না!

দ্বিতীয় ঘটনা—বিকেলে গিয়েচি ঘুমিয়ে উঠে বরোজপোতার বাঁশবাগানে বেড়াতে। শুকনো বাঁশের পাতা পড়ে আছে সর্ব্বত্র। হঠাৎ দেখি এক অপূর্ব্ব ছবি—সিঁদুর-কৌটো আমগাছটার পাশে একটা চারা সজনে গাছের একটা মাত্র ডালে থোলো থোলো সজনে ফুল ফুটেচে, তারই পাশে সিঁদুর-কৌটো আমডালে একটা চিল বসে আছে—ওদের ওপরে নীল আকাশ। যেন চীনা চিত্রকরের ছবি একখানা। কতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, পা আর ওঠে না। ফিরে এসে ইন্দুর সঙ্গে আবার বারিকের বাড়ী গেলুম চালকীতে। সূর্য্য অস্ত যাচ্চে, আমি ওর উঠোনে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাচ্চি কল্‌কে হাতে। তারপরে পাকা রাস্তার ওপরে মুচিপাড়ায় সজনে সাঁকোতে গিয়ে বসে আমডোবের গল্প শুনি ইন্দুর মুখে। তৃতীয় ঘটনা এইটিই। কোথায় টাটানগরের সভা সেদিনকার, কোথায় সারেণ্ডা বনকান্তারের শৈলমালা আর কোথায় চালকী গ্রামে আমার প্রজা বারিকের বাড়ীতে গরুর গাড়ীর ওপর বসে তামাক খাওয়া!—

পরদিনও বিকেলে বারিকের বাড়ী যাবার আগে প্রমোদের বাবার সঙ্গে কথা বলি। তিনি তামাক খাওয়ালেন। অন্ন বলে মেয়েটির শ্বশুর। কত নিন্দে করলেন কুটুম্ব বাড়ীর। উনি জ্বরে পড়ে আছেন, ওঁকে দেখে না—ইত্যাদি। বারিকের বাড়ী গিয়ে খুব বকাবকি করলুম ধান দিচ্চে না বলে। ওখান থেকে সোজা চলে এলুম কুঠির মাঠে অপূর্ব্ব বনপথে, কণ্টক লতার পুষ্পের সুগন্ধের মধ্যে। আগে বসলুম নদীর তীরে নিবারণ ঘোষের বেগুন ক্ষেতের জমিতে, সেখানে আর বছর আমি আর কল্যাণী নতি শাক তুলতে আসতুম। তারপর এখান থেকে মাঠের মধ্যে জলার ধারে। রোদ একেবারে রাঙা হয়ে এসেচে, শিমুল গাছে মুকুল দেখা দিয়েচে, শীত আজ অনেক কম।

কুল পেকেচে গাছে—অনেক পেড়ে খেলুম—কিছু নিয়ে এলুম ইন্দু রায়ের ছেলেমেয়ের জন্যে। ফিরবার পথে অন্ধকার সন্ধ্যায় আমাদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়ালুম—ওপারে একটি মাত্র তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করচে সন্ধ্যা-আকাশে। যেন আমি ১৯৩৪ সালের বড়দিনের ছুটিতে ব্যারাকপুর এসেছি, খুকু রোজ সন্ধ্যায় আমার কাছে স্লেট্‌ পেন্সিল বই নিয়ে পড়তে আসে—আমি বসে বসে মেটে প্রদীপের আলোয় 'দৃষ্টিপ্রদীপ' লিখতুম।

শ্যামাচরণ দা'র বাড়ী বসে গল্প করে এদিন ওদের বাড়ীর খিড়কির পথে আমাদের পুরোনো ভিটের সামনে দিয়ে ফিরি। যেমন ফিরতুম বাল্যকালে, যখন মা ছিলেন, বাবা ছিলেন—আমাদের পুরোনো ভিটের বাড়ীটা বজায় ছিল। সে সব কত কালের কথা!

পরদিন আবার সকালে বড় চারা আমতলায় বসলুম বনের মধ্যে শুষ্ক পাতার রাশির ওপর গামছা পেতে। এই বনের মধ্যে নিভৃতে চুপ করে বসে বন-বিহঙ্গের কাকলী শুনতে আমার যে কি ভাল লাগে। জীবনকে গভীর ভাবে অনুভব করি এই নিৰ্জ্জন বনতলে একা বসে। "আনন্দদ্ধ্যেব খল্বিমাণি সর্ব্বাণি ভূতানি জায়ন্তে"—উপনিষদের বাণীর সার্থকতা ও সত্যতা এখানে বসে বুঝতে পারি।

হাটে গিয়ে পাটালি কিনলাম। ফিরে এসে সেদিন সন্ধ্যায় যে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হোল—তা এ ক'দিনের সব অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল। সন্ধ্যায় বনভূমিপ্রান্তে ক্ষীর-পুলি গাছের পেছনটাতে একা বসেচি চুপ করে—সামনে ছোট এড়াঞ্চি ফুলে ভরা ঝোপ-ঝাপ, সাঁইবাবলা গাছের পত্রশীর্ষ বনপুষ্প-সুবাস, পাখীর ডাক—সন্ধ্যায় অন্ধকার নেমে আসচে, বনভূমি আজও তেমনি স্বপ্নমাখা—কি সুন্দর মধুমাখা সন্ধ্যা! কল্যাণী আমায় বলতো—মান্‌কু, এখানে বসবো!

এই মাঠে।

সেকথা মনে পড়লো এই সন্ধ্যায়। তার চোখে অসীম নির্ভরতার দৃষ্টি।

কলকাতায় এলুম পরদিন গরুর গাড়ীতে। তিনু আমার সঙ্গে এল রাণাঘাট স্টেশনে কচু কুমড়ো নিয়ে ওর দাদার শ্বশুরবাড়ীর জন্যে। মাঝের গাঁয়ে মহীতোষ দা'র সঙ্গে স্টেশনে দেখা অনেকদিন পরে।

কলকাতা থেকে আমতলায় গেলুম শ্বশুরবাড়ী। সেই জাঙ্গিপাড়া স্কুলে যখন কাজ করতুম, গৌরী মারা গিয়েছিল—সেই সব শোকাচ্ছন্ন দিনের ছাপ আছে এই সব লাইনের গাছে পালায় মাঠে। সেই পথ দিয়েই আবার শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি এতকাল পরে। খুব আশ্চর্য্য না?

কলকাতায় এবার দুজন লোকের সঙ্গে দেখা হোল বহুকাল পরে। খেলাত স্কুলের পুরোনো হেড্‌মাস্টার ক্ল্যারিজ সাহেব—আজকাল সে একজন ইহুদী স্কুলের হেড্‌মাস্টার বউবাজারে। একেই নিয়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের সৃষ্টি 'অনুবর্ত্তন'-এ। আর ভাগলপুরের অম্বিকা ঘোষ যার সঙ্গে অনেকদিন আগে ভাগলপুর থেকে দেওঘর হেঁটে গিয়েছিলাম। 'অভিযাত্রিক'এ এ ঘটনার উল্লেখ করেছি। অম্বিকাকে একখণ্ড 'অভিযাত্রিক' উপহার দিলুম। ওর সঙ্গে ১৪।১৫ বছর পরে দেখা হোল—ও দেখতে তেমনিই আছে।

আজ সবাই মিলে চারখানা গরুরগাড়ী করে বনের পথে ধারাগিরি যাওয়া গিয়েছিল। সারাপথ এমন enjoy করেছি কি বলবো। কাশিদা ছাড়িয়ে লাল শালুক ফোটা সেই বড় বিলটা, যেখানটার নাম ঢ্যাং-জোড়, সেটা ছাড়িয়ে ধবলীর বন, তারপর বুরুডি গ্রাম, তা ছাড়িয়ে বুরুডি ঘাট অর্থাৎ পাস্‌, তারপর বাসাডেরা গ্রাম—একেবারে চতুর্দ্দিকে

বন সমাচ্ছন্ন উপত্যকায় ঘেরা, সেখানে মুকুলবাবুর কর্ম্মকর্ত্তা শিরীশ বেশ চমৎকার একটি ঘর বানিয়েচে দেখলুম, দেখলে থাকতে লোভ হয় এই নির্জ্জন বনাবৃত উপত্যকায়। এই ঘরের সামনে দিয়ে মুকুলবাবুর তৈরি রাস্তা পাহাড়ের ওপর চলে গিয়েচে, নিশ্চয়ই জ্যোৎস্নারাত্রে বা ছায়াস্নিগ্ধ বৈকালে এই পথের বন্য আমলকী, আম, পিয়াল ও তেঁতুলতলায় বেড়ানো বড় মনোরম হবে। একদিন যাবো ওখানে ও রাত কাটাবো রমাপ্রসন্ন ও গৌরী এখানে এলে।

আমরা ঘাট অর্থাৎ পাস্ পার হয়ে গেলুম পদব্রজে। সবাইকে গরুরগাড়ী থেকে নামতে বাধ্য করলুম। এই রাস্তাটার একটা নিবিড় বন্য সৌন্দর্য্য আছে, বাঁদিকে খাড়া পাহাড়ের দেওয়াল উঠেচে, ডাইনে ৬০০।৭০০ ফুট গভীর খাদ, তার তলা দিয়ে খরস্রোতা (নদীর নাম, বিশেষণ নয়) নদী উপলাস্তৃত বন্ধুর পথে বয়ে চলেচে, চারিধারে কত রকমের গাছপালা, কত মোটা মোটা লতা, বনফুলের মধ্যে এক রকমের কুচো কুচো নীল ফুল আর হুটবা (Indigofera Pulchera) ফুটেচে। বাঁদিকের পাথরের দেওয়ালের গায়ে—বনবিহঙ্গের কাকলী বনের শাখায় শাখায়, ঘাট অতিক্রম করে বাসাডেরা উপত্যকায় এসেই মুকুল চক্কত্তি কনট্রাকটরের ওই ছোট্ট খড়ের ঘরটা দেখে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। এমন সুন্দর শান্ত, নিভৃত শৈলমালা ও বনানী বেষ্টিত উপত্যকায় থাকে কিনা মুকুল চক্কত্তির কর্ম্মচারী শিরীশ? শিরীশকে আমি জানি, সে কি বুঝবে এই বনভূমির সৌন্দর্য্য? সে সকালে উঠে বনের মধ্যে চলে যায় কাঠ কাটানোর জন্যে, কাঠ চেরাই করবার জন্যে—তারপর গাড়ী বোঝাই দিয়ে শাল-বল্লা পাঠায় ঘাটশিলা স্টেশনে--যে বনের গাছ কেটে ব্যবসা করে, বনলক্ষ্মী কি তার সামনে মুখাবগুণ্ঠন অপসারিত করেন?

বেলা দেড়টার সময় আমরা ধারাগিরি পৌঁছে গেলুম। সঙ্গে এতগুলো মেয়েমানুষ ছিল, সবাই বড়লোকের বাড়ীর বৌ-ঝি, একবার কি কেউ বল্লে— জায়গাটা বেশ ভালো, কি বেশ, কি চমৎকার! কিছু না, পয়সাই আছে, কিন্তু চোখ নেই। মেয়েমানুষগুলোর হাতে এক গোছা করে সোনার চুড়ি, কানে কানপাশা, কত রকমের সেজেছে--কিন্তু এসেই 'ওরে, অমুক ওদিকে যাস্‌নি, অমুক তোর ঠাণ্ডা লাগবে'—হৈ চৈ চীৎকার, গোলমাল, 'বকা কোথায় গেল দ্যাখ্ দ্যাখ্ (কুকুরের নাম) এই সব ব্যাপার। অমন চমৎকার বনপাহাড়ের সৌন্দর্য্যের দিকে কেউ চেয়েও দেখলে না, কেবল আমি আর প্রভাত দুজনে মুগ্ধ হয়ে বসে রইলুম কতক্ষণ। তারপর খিচুড়ি রান্না হোল, বটতলায় বসে ডাক্তার রক্ষিত, আমি ও প্রভাতকিরণ--তিনজনে খিচুড়ি খাওয়া গেল, তাস খেলা গেল, গল্পগুজব করা গেল। তারপর বেলা পড়লে ছায়াভরা বিকেলে সবাই পাহাড় থেকে ফিরলুম।

কাল বিকেলে দুবলাবেড়া এলুম হলুদপুকুর থেকে। রাত্রে টাটানগরে ছিলুম, মিঃ ভর্ম্মার বাড়ীতে। অনেকে দেখা করতে এল। রাত দেড়টা পর্য্যন্ত 'দেবযান' সম্বন্ধে গল্প। সুশীলবাবুর মোটরে স্টেশনে এলুম ভোর ছ'টাতে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে এক মাড়োয়াড়ির দোকানে চা ও খাবার খেয়ে ব্যারোজ সাহেবের মোটরলরির জন্যে অপেক্ষা করলুম। ব্যারোজ সাহেবের লোক বল্লে--রাত্রে যা বৃষ্টি হয়েচে, ও-রাস্তায় গাড়ী আসা মুশকিল। শোনা গেল দুবলাবেড়া এখান থেকে ষোল মাইল। দিনটি মেঘাচ্ছন্ন ও ঠাণ্ডা। হেঁটে বেরিয়ে পড়ি আমি ও মিঃ ভর্ম্মা। কেমন কাঁকরের পথটি এঁকে-বেঁকে আমাদের সামনে দূর থেকে বহুদূরে সুদূর নীল শৈলমালা ও বনপ্রান্তরের দিকে চলে গিয়েচে। ঐ হোল রাইরক্ষপুরের পথ—এ পথ চলে গেল বারিপদা

হয়ে বালেশ্বর ও কটক। আমরা বনের দিকে অগ্রসর হচ্চি—ঐ শৈলমালার মধ্যে কোন এক অনাবৃত ছায়াভরা উপত্যকায় দুবলাবেড়া গ্রাম। সেখান থেকে ভ্যানেডিয়ম ore আসচে।

প্রথমে পড়লো নড়সা নদী। পথের দুধারে কালো পাথরের পাহাড়, যেন পাথুরে কয়লার স্তূপ, এসব পাহাড় প্রায়ই অনুর্ব্বর, বৃক্ষলতাহীন—ক্বচিৎ কোন পাহাড়ে এক-আধটা শিববৃক্ষ দণ্ডায়মান। হাঁড়িয়ালি বলে একটা গ্রামে এক বাড়ী থেকে শাঁকের আওয়াজ শুনে এক ছোকরাকে বল্লুম—এদের বাড়ীতে শাঁক বাজচে কেন?

—সত্যনারাণ পুজো হচ্ছে।

—কি জাত এরা?

—মহারাণা।

—সে কি?

—জ্যোতিষ।

—ব্রাহ্মণ?

—ওই।

এদেশে হাঁ বলতে জানে না, বলে—'ওই'

এ গ্রামের নিচেই হাঁড়িয়ালি বলে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। হেঁটে পার হয়ে গেলুম। রাস্তা হাঁটতে কি আনন্দই হচ্চে সকাল বেলাটা। ধূ ধূ করচে মুক্ত উচ্চাবচ ভূমিভাগ, যেন space-এর সমুদ্র, তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম, ছোট বড় কালো পাথরের পাহাড়, পলাশ, শিববৃক্ষ, মহুল ও আসান। শালগাছ বেশী চোখে পড়লো না। এক স্থানে পথের ধারে বড় গাছের তলায় একটা চওড়া পাথরে বাংলা অক্ষরে লেখা আছে—

মৃতু বাসেরা সর্দ্দার।

সাং চাকড়ি, সন ১৯৪৯।

অর্থাৎ উক্ত গ্রামের বাসেয়া সর্দ্দারকে অমর করবার চেষ্টা। এই গ্রাম পার হয়ে একটা পার্ব্বত্য নদী—নদীর নাম লুপুং, কিছুদূরে এই নামের একটা গ্রাম। পথের দুধারে আমের গাছ- এমন অদ্ভুত ধরনের বউল ধরেচে, আর তার কি ভরপুর সুবাস! একটা চারা আমগাছ দেখে মনে হোল গাছটাতে ফুল ধরেচে। নদীটার ধারে এক বিশাল সুপ্রাচীন অর্জ্জুন গাছের শাখা-প্রশাখার তলে আম্রমুকুলের সৌরভের মধ্যে কিছুক্ষণ বসে রইলাম। বেলা হয়েচে, পথ হেঁটে খিদেও পেয়েচে। কয়রাসাই গ্রামের পাশে একটা কালো পাথরের পাহাড়ের নিচে একটা কুলগাছ, অনেক কুল পেকেচে দেখে সেখানে কুল কুড়ুতে গেলাম। পথে কতকগুলি ছেলে স্কুলে যাচ্চে, কয়রাসাই গ্রামে একটা পাঠশালা দেখে এসেচি বটে পথের ধারে। আমরা ছেলেদের নাম জিজ্ঞেস করলুম। একজন বল্লে—তার নাম দিবাকর তাঁতি। একজনের নাম ধনুর্ধর বাস্কে।

—কি জাত।

—বাস্কে জাত।

এই সময়ে একটু একটু বৃষ্টি পড়তে লাগলো। আমাদের সামনে ডানদিকে জোজুডি শিখরদেশ (২০০০ ফুট) দেখা যাচ্চে, দূরে নারদা (১৭০৬ ফুট) শিখর। সামনের শৈলমালার ওপারেই ময়ূরভঞ্জ, অগণ্য বন্যহস্তী ঐ সব পাহাড়ে। দিন থাকতে থাকতে দুবলাবেড়া পৌঁছুলে বাঁচি। কোয়ালি গ্রামে পৌঁছে গেলুম তখন বেলা একটা। এক কুম্ভকারের বাড়ীতে আশ্রয় নিলুম বৃষ্টির সময়। তাদের খোলার চালা, মাটির দেওয়াল। মেয়েদের হাতে রূপোর অলংকার। কপালে সিঁদুর। কথা বাংলাই—তবে বড্ড বাঁকা বাঁকা এবং একটু উড়িয়া-ঘেঁষা। ওরা মুড়ি খাওয়ালে তেলনুন দিয়ে মেখে এনে।

হঠাৎ এক বৃদ্ধ উড়িয়া ব্রাহ্মণ এসে ভিক্ষা চাইলো। তার নাম বাইধর মিশ্র, বাড়ী পুরীর কাছে মালতী-পাতপুর। ওর বারো বছরের ছেলে বাড়ী থেকে আজ দু-তিন মাস ভিক্ষে করতে বেরিয়েচে এবং খবর পাওয়া গিয়েচে ছোকরা সিংভূমে এসেচে। তাই বাইধর খুঁজতে বেরিয়েচে ছেলেকে। হলুদপুকুর স্টেশনে নেমে গাঁয়ে গাঁয়ে বেড়াচ্চে। উড়িয়া ভাষায় বল্লে—কাল রাতে এক মণ্ডলের বাড়ী উঠেছিলুম, এমন ঝড়বৃষ্টি এল, ভাত রান্না করতে পারলুম না। কিছু খাইনি রাত্রে। ওকে আমরা কিছু পয়সা ও মুড়ি দিলাম। একটু তেল দিলাম, ও একটা ফাঁপা বাঁশের লাঠির মধ্যে তেলটুকু পুরে নিলে। কি সুন্দর সরল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। হেসে বল্লে—বাবু, বাড়িকে বাড়ি, চুঙ্গাকে চুঙ্গা। খুব খুশী।

আমরা কোয়ালি থেকে বৃষ্টি থামলে বেরিয়ে গুররা নদী পার হলুম। (রাখা মাইন্‌সের সেই গুররা নদী, এখানে ছাৎনা পাহাড় থেকে বেরিয়েচে) তারপর বন ও জঙ্গলের পথে এলুম হরিনা গ্রামের মহাদেব স্থানে। এই বনের মধ্যে এক ভাঙা মন্দির, চারিদিকে বট, আমলকী, পলাশ, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষরাজি, মানুষের হাতের নয়, স্বাভাবিক বন! দেবস্থান বলে লোকে কাটেনি। ওখানে একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার পথে বেরুই। পথ চলার আনন্দ এমন একটা নেশা আনে মনে, ছোট্ট একটা বন দেখলেও মনে হয় অদ্ভুত জিনিস দেখচি। বাহ্যজগৎকে গ্রহণ করে যে মন, সে শুধু উপভোগ করে ক্ষান্ত থাকে না, সৃষ্টিও করে। গুররা নদী পার হবার পরে আর একটা ক্ষুদ্র নদী পেলুম, সেটা পার হয়ে বেগ্‌নাড়ি গ্রাম। সামনের পাহাড়ে খারিয়া জাতিরা জুম্ চাষ করচে বন কেটে, বোধহয় সে বাঁকা জায়গাতে খড় হয়েচে, শুকে খড়ের ক্ষেত রাঙা দেখাচ্চে, বেগনাড়ি গ্রামের পাশ দিয়ে পথটি, অনেকগুলো বড় বড় গাছ পথের ধারে, বাঁশঝাড়, তেঁতুল, মহুয়া, অর্জ্জুন। এতক্ষণ দেখছিলুম মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে শাড়ী—এখানে দেখলুম মেয়েদের মোটা হাত-বোনা কাপড় দুটুকরো জড়ানো—হো বা সাঁওতালদের ধরনে। অনেক টোমাটো ক্ষেত পথের পাশে।

একটি বৃদ্ধ মহিষ চরাচ্চে, তাকে বল্লাম—দুবলাবেড়া কতদূর?

সে বল্লে—সামনে মাগুরু আর নেংগাম লাগালাগি, নেংগাম আর দুবলাবেড়া ভিড়াভিড়ি।

নতুন ভাষা শিখলাম। 'ভিড়াভিড়ি' মানে কাছাকাছি, কিন্তু এখানেই গোলমাল। ১৪ মাইল পথ তখন হাঁটা হয়ে গিয়েচে, ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্তও বটে—সে অবস্থায় এ দেশের লোকের মুখে 'ভিড়াভিড়ি' শুনে খুব আশ্বস্ত হলুম না। এরা তিন মাইলকেও কাছাকাছি বলতে পারে। একটা পাহাড় দেখিয়ে বল্লে—ঐ পাহাড়টা দেখচিস্, ঐ পাহাড়টা ঘুরে যেতে হবেক। এ জায়গাটি চেয়ে দেখি বড় চমৎকার। তিনদিকে শৈলমালা ও নিবিড় বন আমাদের পথকে ঘিরেচে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে, অবিশ্যি দূরে দূরে। জোজুড়ি শিখরদেশ আর দেখা যায় না, নারদা peak ডাইনে বহু পিছনে, অস্পষ্ট দেখা যাচ্চে, রোদ ফুটেচে পশ্চিম গগনে, অথচ বাঁদিকের ছাৎনা ও আটকুশী শৈলমালা সাদা কুয়াশার মত মেঘে ঢাকা। যেন দার্জ্জিলিংয়ের কুয়াশা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইচে সেদিক থেকে।

একদিকে শাল কেঁদবন পথের পাশেই। বড় বড় শিলাখণ্ড সর্ব্বত্র। পাহাড়টা খুব উঁচু, ঘুরে যাবার সময় বাঁ-পাশে পর্ব্বতসানুতে বনশোভা বেশ দেখালো পড়ন্ত রোদে। পাকা কুল খেতে খেতে যাচ্চে একদল বন্য মেয়ে। দুবলাবেড়া তাঁবুতে পেঁছুলাম বেলা পাঁচটাতে। পাহাড়ের নিম্নসানুর বন যেখানে শেষ হয়েচে, সেইখানেই তাঁবু পাতা।

মিঃ বারোজ্ তাঁবুতে বসে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে গল্প করচে। বল্লে—পথে বৃষ্টির জন্যে মোটর পাঠাতে পারিনি, এখন পাঠাচ্ছিলাম। চা ও খাবার খেয়ে ধড়ে প্রাণ এল।

রাত্রে একটু জ্যোৎস্না উঠলো। কি শোভাই হোল তাঁবুর পেছনের পর্ব্বতসানুর বনের। শালগাছ নেই এ বনে। কেঁদে, পড়াশি, শিবগাছ, কুল, কম্প্রিটাম লতা, বড় বড় বিরাটকার শিলাখণ্ডের ওপর টৈরি লতা ও মোটা চীহড় লতার ঘন ঝোপ, আমলকী, নিম ইত্যাদি নিয়ে জঙ্গলটা। বৈচিত্র্য আছে এ বনে, একঘেয়ে শালবন বড় খারাপ।

মিঠাই ঝর্ণার ওপারে লখাইড়ি গ্রামে খাড়িয়া জাতির বাস। তাদের মাদল বাজচে জ্যোৎস্না রাত্রে। এ একেবারে বন্য জায়গা, বারোজ বল্লে, বড় বুনো হাতীর উপদ্রব। গত বৎসর বন্যহস্তীতে নিকটের কেরু-কোচ গ্রামের একটা লোককে মেরে ফেলেছিল। কি সুন্দর বনশোভা। জ্যোৎস্না পড়েচে উপত্যকার ওপারের আটকুশী শৈলশ্রেণীর এদিকের ঢালুতে—এ যেন বনপরীর দেশটি। শিউলি গাছের জঙ্গল তাঁবুর পেছনে শৈলসানুতে। শরৎকাল হলে প্রস্ফুটিতে শেফালির সৌরভ ভেসে আসতো শীতল নৈশ বাতাসে।

এই যে লিখচি, সামনে পাহাড়ের মাথায় বর্ষার সাদা মেঘপুঞ্জ জমেচে। তাঁবুর দোর থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে গাছগুলোকে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের একটি কথা মনে পড়ে গেল, "A nation's history has three stages. Success then as a consequence of success, arrogance and injustice; then as a consequence of these, downfall."

কাল সারাদিন বৃষ্টিতে তাঁবুতে বসে। কোথাও বেরুতে পারিনি। তাঁবুর পেছনে লুদাম, করম ও ধ গাছ, একটা ধাতুপ ফুলগাছে প্রথম বসন্তের রাঙা রাঙা ফুল ফুটেচে। পাহাড়ের সানুতে জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে বড় বড় শিলাখণ্ড। যে কোনোটাতে আরাম করে বসে চিন্তা করা যায় বা লেখা যায়। কিন্তু বাদলাবৃষ্টিতে সব ভিজে। সন্ধ্যায় বারোজ সাহেবের বাংলোতে বেড়াতে গিয়ে বসলুম খানিকক্ষণ। পূর্ব্ব আকাশের পাহাড়ের ওপর দিয়ে ভাঙা মেঘের ফাঁকে পূর্ণচন্দ্র উঠলো। মিসেস্ বারোজ বন্য হস্তীর গল্প করলে। এক পেয়ালা কোকো পান করে এই শীতে বেশ আরাম করে বুনো হাতী ও মাতাল ভালুকের গল্প শোনা গেল। আর বছর মাগড়ু গ্রামের নিকটবর্ত্তী পথে একটা ভালুক পেট ভরে মহুয়া ফুল খেয়ে যখন গাছ থেকে নামলো —তখন সে ঘোর মাতাল, টলতে টলতে চলেচে।

রাত্রে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি শুরু হোল। সারারাত্রি বৃষ্টি।

আজ সকালেও বৃষ্টি পড়ছিল। বেলা হলে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা বিকেলে মাগড়ু ও চেংশম গ্রামে বেড়াতে গেলুম। ডাইনের প্রকাণ্ড পাহাড়শ্রেণীর পাশ দিয়ে আসান পড়াশির বনের ছায়ার পথ, বনে পিয়াল গাছের মুকুল ধরেচে, বাতাসে আম্র ও পিয়াল মুকুলের সৌরভ, কালো কালো স্তূপের ওপর টৈরির জঙ্গল, বামে পোটরী ও কুন্দরুকোটা পাহাড়—ওখানে নাকি একটা সোনার খনি ছিল, বিলিংহাম নামে এক সাহেবের। এখন খনির কাজ বন্ধ শুনলুম। ওই পাহাড়ের ওপর দিয়ে অস্ত আকাশের তলায় তলায় ময়ূরভঞ্জ যাবার পথ। আমরা যখন ফিরলুম তখন বেলা পড়ে এসেচে, বন্য কুক্কুট ডাকচে ডানদিকের শৈলসানুর গহন অরণ্যের মধ্যে।

রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠলো। আমরা তাঁবুর পিছনের শৈলশ্রেণীর ওপরে একটা পাথরের চাতালে রাত দুটো পর্য্যন্ত বসে আগুন জ্বালিয়ে গল্প করলুম। ভালুক ও বন্য হস্তীর ভয়ে (এবং শীতের জন্যেও বটে) আগুন জ্বালানোটা নিতান্ত দরকার।

আজ বিকেলেই দেখে এসেচি মাগড়ু গ্রামে লাখন মাঝি বলে একটা সাঁওতাল যুবকের একটা চোখ ভালুকে একেবারে উপড়ে দিয়েচে—অবিশ্যি ঘটনাটা ঘটেছিল মাগড়ু থেকে দুবলাবেড়া যাবার পথে জংগলের ধারে। লাখন টাঙি হাতে জাচ্ছিল দুবেলাবেড়া, ভালুক মহুলগাছ থেকে নেমে ওর ওপর এসে পড়ে, উভয়ে জড়াজড়ি ও ধস্তাধস্তি হয় তার ফলে লাখনকে একটা চক্ষুর মায়া কাটাতে হয়েচে। পরশু রাত্রে বারোজ সাহেবের মুরগীর ঘরে বাঘ এসেছিল, সকালে আবার দাগ দেখা গিয়েচে। এই সব শুনে নির্জ্জন পাহাড়ের ওপর গভীর রাত্রে আমরা তিনটি প্রাণী বসে থাকবার সময় যে খুব নিরাপদ ভাবছিলুম নিজেদের এমন কথা বল্লে মিথ্যে বলা হবে।

কিন্তু সব বিপদকে অগ্রাহ্য করা যায় সে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাত্রির শোভা দেখবার জন্যে। পাহাড়ের ওপরে শুকনো শালগা, দোকা (Odina wodier), অজস্র বন্য শিউলি, শিববৃক্ষ, গোলাগোলি, পড়াশি ; বনতুলসী, ও করম (Adina cordifolia) গাছের জংগলে নিশীথ রাত্রির জ্যোৎস্না পড়েচে, সামনের উপত্যকা ও ওপারের আটকুশি ও পোটরা পাহাড়শ্রেণীতে বনে বনে সেই জ্যোৎস্না এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেচে—যেন এই জনহীন নিশীথে বনদেব ও দেবীরা এখানে নামেন নিঃশব্দ পদক্ষেপে, তাঁদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয় বিশ্বের অধিদেবতার নীরব জয়গান।

এই বনে (এ পাহাড়টি ছাড়া, এর ওপর বেশির ভাগ শুধুই শেফালি গাছ) এ সব গাছ তো আছেই আরও আছে তুন, লতা, পলাশ Butea Suberpa, বোংগা, সর্জ্জম লতা, শাল, আসান, পিয়াল, মহুয়া, অর্জ্জুন ; বট, কদম্ব, কুসুম, ধওড়া, রাজ জেহুল, কুর্জি, রোহান (Soymida Febrifuga) বাঁশ, পিয়াশাল, চীহড়লতা, বেল প্রভৃতি গাছ আছে। অবিশ্যি কোনো একটা জায়গায় এত রকমের বৃক্ষ একসঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকে না বা নেইও, মানুষের তৈরি বাগান ছাড়া। অরণ্যের প্রকৃতিই তেমন নয়, যেখানে যে গাছ আছে সেখানে সেটাই বেশি। শাল তো শালই, অর্জ্জুনই —এমন রকম।

আজ সকালে তাঁবু থেকে বার হয়ে দুবলাবেড়া গ্রামের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ে উঠলুম। সুন্দর বনপথে উঠলুম। ঘাটশিলা থেকে ষোল মাইল হবে। দূরে ভাস্কি পাহাড়শ্রেণী দেখা যাচ্চে। এখন বেলা সাড়ে পাঁচটা। এখানে বসে এই মাত্র চা ও খাবার খেয়েচি। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, সামনে সমতলভূমি নীল কুয়াসায় অস্পষ্ট। একটা শিলাখণ্ডে বসে থাকবার সময় গাছপালার ছায়ায় এসে মনে হোল হিমালয়ের পর্ব্বতারণ্যে বসে আছি। পড়াশি বাঁশ, সোঁদাল প্রভৃতি গাছ। কাল সকালে আমাদের তাঁবুর পেছনে পাহাড়টার বড় পাথরের চাতালটাতে কতক্ষণ কাটিয়েচি। আকাশ ছিল সুনীল, তার তলায় শুকনো শালগাছ ও দোকা গাছের আঁকাবাঁকা ডালপালার ভঙ্গি —সে একটা দেখবার জিনিস। একটা শিলাখণ্ডে রৌদ্রে কতক্ষণ শুয়ে রইলুম। রৌদ্র-স্নাত দ্বিপ্রহরে চারিদিকের সে বন্য সৌন্দর্য্য আমাকে অভিভূত করে তুললে। সত্যই এ সৌন্দর্য্য যেন সহ্য করা শক্ত। প্রাণভরে ভগবানের শিল্প রচনা দেখি। বিকেলে আমরা ঘাটদুয়ার বলে একটি অতি চমৎকার স্থানে গেলুম, তাঁবু থেকে ৪ মাইল দূরে মুসাবনীর পথে। ছাতনাকোটা ও রাঙামাটিয়া নামে দুটি সাঁওতাল গ্রাম পথেই পড়ে —সাঁওতালদের মাটির ঘরগুলি দেখবার জিনিস বটে, পরিষ্কারভাবে লেপা-মোছা, রাঙা ও কালো মাটি দিয়ে চিত্তির করা দেওয়ালের গায়ে আলপনার মত পাখি আঁকা, গাছ-পালা আঁকা। ঘাটদুয়ার জয়গাটাতে দুদিক থেকে দুটি শৈলমালা এসে ক্রমনিম্ন হয়ে শেষ গিয়েছে—মধ্যে হাত পাঁচেক সমতলভূমি, এক পাশে একটা পার্ব্বত্য নদী বড় বড় শিলাখণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলেচে। ঘন বন দু পাশে, ঝর্ণার ওপরে অনাবৃত

শিলাস্তর থাকে থাকে কাৎ-ভাবে এসে পড়েচে—প্রায় একশো ফুট কি দেড়শো ফুট উঁচু। স্তরগুলো একটার ওপরে একটা সাজানো, একটি থেকে আর একটি গুনে নেওয়া যায়। দুটি গুহা আছে জলের ওপরেই, গত বৎসর নাকি এক খাড়িয়া পরিবার ওতে বাস করতো। আমরা যখন ফিরলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, সম্মুখে আঁধার রাত। বিভিন্ন পার্বত্য নালায় ওপরকার পাথর চোখে দেখা যায় না, কোনোরকমে হোঁচট খেতে খেতে পথ চলি। কিন্তু ঝক্‌ঝকে তারাভরা আকাশের মহিমময় রূপ দেখে সব কষ্ট ভুলে গেলুম। এদিকে বারোজ সাহেবের বাংলোতে ডিনার খাওয়ার কথা, রাত হোল প্রায় সাড়ে আটটা তাঁবুতে পৌঁছতে। ডিনার খেয়ে ফিরতে এগারোটা বেজে গেল। বারোজ বল্লে, সন্ধ্যাবেলা তোমরা বাঘের ডাক শুনতে পেলে না সামনের পাহাড়ে! সাড়ে ছ'টার সময়ে খুব ডাকছিল বাঘ।

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মিঠাই ঝর্ণার কাছে চুকলু-বাগাল গ্রামে খাড়িয়া জাতি দেখতে গিয়েছিলুম। দুবলাবেড়া ছাড়িয়ে খানিকটা গিয়ে পথ উঠেচে পাহাড়ের ওপরে। ঘন বনের মধ্য দিয়ে পথ, একটা কি গাছের ডালে দুটো চিল বসে আছে। ওপরে উঠতে উঠতে পা ধরে গেল—তখন একটা বড় পাথরের ওপরে বসলুম, একটা বড় মহুয়া গাছ সোজা উঠেচে দূরের পাহাড় ও সমতলভূমির পটভূমিতে। ভগবানের নৈকট্য এসব জায়গায় যত অনুভব করা যায়, এত কি কলকাতা কি টাটানগরে বসে সম্ভব? টাটানগর কেন বললুম, সিংভুমের বনে বাস করে তাঁবুতে, টাটানগরের নাম করবো না এটা অন্যায়। আমরা চড়াই পথে চলেচি, বুনো বাঁশ, আমলকী, পাপড়া, কর্কট, পড়াশি, মহুয়া গাছের তলা দিয়ে, কোথাও পথের পাশে কুঁচ ফলে আছে ঝোপে, কোথাও এক রকম হলুদে ঘাসের ফুল ফুটে আছে। ঠান্ডা বাতাস বইচে, আকাশে কালো মেঘ।

পাহাড়ের ওপর উঠে দুজন খাড়িয়ার বাড়ী—তাদের মেয়েরা শুধু আছে, আমাদের দেখে সোজা পালালো। তারপর আমরা গেলুম চুকলু বাগালের বাড়ী। খড়ের ছাউনি, নিচু মাটির ঘর, এমন চমৎকার দৃশ্য চারিদিকে, শিলং কি কার্সিয়ংএর বড়লোকের বাড়ীও এমন জায়গায় হলে গর্ব্বের বিষয় হতে পারে। চুকলুর ছেলে আনন্দপুর স্কুলে পড়ে। কাল রাত্রে চুকলুর গরুটা নাকি বাঘে মেরেচে সামনের পাহাড়ে। সবটা খেয়েচে? আমরা জিগ্যেস্ করি।

সে বলে—উয়াকার মুড়িটা নিয়ে গেছে। বাকিটা ডুংরিটাতে রাখি গেলে!

এটার নাম চরাই পাহাড়, ২১০৬ ফুট উঁচু। হিমালয়ের মত দৃশ্য চারিদিকে। একটা উঁচু ডুংরির ওপর গিয়ে আমরা বসলুম, গ্রানিটের সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার চারিপাশে, ভাঙ ভাঙা গ্রানিটের boulder—ফাঁকে ফাঁকে খড়, দু-চার ঝাড় বন্যবাঁশ, একটা সাথীহীন মহুয়া। সামনের সমতলভূমির দৃশ্য এত উঁচু থেকে বড় চমৎকার দেখাচ্চে।

একটি সাঁওতাল তীরধনুক হাতে এসে হঠাৎ হাজির। তার নাম জিগ্যেস করলে নাম বলে না। জিগ্যেস করে জানা গেল ওর বাড়ী রাঙামাটিয়া গ্রামে, সে এবং তার দুজন সঙ্গী এসেচে বাঘে-মারা গরুটার অর্দ্ধভুক্ত দেহটা খুঁজে নিতে। এই গ্রানিট পর্ব্বতচূড়ায় আসলে সেটাই সে খুঁজতে এসেচে। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করবার অবকাশ নেই ওর।

ওই।

একটু পরে আমরা আমাদের গ্রানিট চূড়ায় বসে দেখচি, তিনজন সাঁওতাল অথবা হো নীচের বনে শুষ্ক শালের পাতার রাশির ওপর দিয়ে মচ্‌মচ্ করে হাঁটিতে হাঁটিতে

বনের সর্ব্বত্র আতিপাতি করে খ্‌্জচে কালকার সেই বাঘে-খাওয়া গর্র ম্তদেহটার জন্যে। ঘণ্টাখানেক খ্‌্জবার পরে ওদের অধ্যবসায় সার্থক হোল, দেখি আমাদের চ্ড়া থেকে সামান্য উঁচ্ আর একটা ড্‌ংরির মাথায় দ্‌টি লোক মরা গর্ বাঁশে ঝ্‌লিয়ে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্চে।

আমাদেরও চা ও খাবার এই সময় দ্‌বলাবেড়া থেকে এসে পেঁাছ্‌লো। চা খেয়ে নিয়ে আমরা রওনা হই। নিচে নেমে একটা খাড়িয়ার কুটির। ওর মধ্যে আমরা ঢ্‌কে দেখি—একটা মলিন চেটাই, কয়েকটি হাঁড়ি-কলসী, লাউকোটে তৈরী একটা হাতা, চীহড় পাতার একটা ঠোঙা, দ্‌টো শ্‌কনো ধ্‌্ধ্‌ল, একটা উদ্‌খল—এই তার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি।

ঢ্‌কল্‌ বাগাল বল্লে—হাতীর ভয়ে আমরা হিই রাতে বাইরে শ্‌ই আজ্ঞে। নইলে ঘর ভাঁঙি দিবেক।

—তোরা হাতী এলে কি করিস?

—হাতী খেদ্‌বো।

এই গ্রামের নাম গামীরকোচা। আমার মনে হোল পড়ন্ত হল্‌দে রোদে এই বন পর্ব্বত, দ্‌রে দ্‌রে অগণ্য শৈলমালা ও গ্রানিট শিখর, অরণ্যাব্‌ত সান্‌দেশ ও নিচেকার সমতলভূমির কিছ্ অংশ দেখে—যে, এই খাড়িয়া অধিবাসীরা খ্‌বই গরীব হয়তো—কিন্তু অনেক শহ্‌রে বড়লোকের চেয়ে ভাল জায়গায় বাস করে এরা। দার্জ্জিলিং কার্সিয়াং বা শিলং-এর চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয় এদের বাড়ীর মাটির নিচ্ দাওয়া থেকে চতুষ্পার্শ্বের পার্ব্বত্যদ্‌শ্য। যেদিকেই চাই—সামনের ময়্‌রভঞ্জের দিকেই হোক্‌ বা বামে ভাল্‌কি ও ম্‌সাবনীর দিকেই হোক—শৈলমালার পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে শৈলমালা, তাদের পেছনে আবার উচ্চতর শৈলমালা—সজল নীল কুয়াশায় অস্পষ্ট, কোনোটাতে হলদে রোদ, কোনোটার মাথায় মেঘের ছায়া, কোনোটা কুয়াশায় ধোঁয়া ধোঁয়া। এই সব দেখতে দেখতে ঘন বনের পথে নামল্‌ম।

সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, তাঁব্‌তে এল্‌ম। একট্‌ পরে শ্‌নি সামনে পাহাড়ে বাঘের 'হাঁকোর' 'হাঁকোর' আওয়াজ। দ্‌বার তিনবার শ্‌নলাম। একট্‌ পরে বারোজ সাহেব তাঁব্‌তে বেড়াতে এল—সে বল্লে, কাল সন্ধ্যায় এমনি ডাকছিল বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়া এমন আওয়াজ করবে না। নির্জ্জন বন পাহাড়ের ধারে তাঁব্‌, অন্ধকার রাত্রি, এমনি বাঘের ডাকে ভয় যে না হোল মনে, তা বলতে পারিনে।

বারোজ বল্লে—খাড়িয়ারা সপ্তাহে একবার মাত্র ভাত খেয়ে থাকে গরমকালে। আর কিছ্ জোটে না। খাড়িয়া কুলি মেয়েরা পয়সা নিয়ে গেল মজ্‌রির, তার পরদিন এল না ওরা খনিতে কাজ করতে। টাকা হাতে পেয়ে ভয় পেল।

বল্লে—এ সব টাকা আমাদের?

—হ্যাঁ।

—কত আছে?

—দ্ টাকা। গ্‌নতে জানিস না?

—নেই জানি।

এত গরীব কিন্তু এত সরল।

ধলভূমের দ্‌শ্য যে এত wild ও এত ভালো তা আগে জানতুম না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে তিনি দেখবার স্‌যোগ দিয়েচেন।

রাত্রি দশটা। ডায়েরি লিখতে লিখতে তাঁব্‌র বাইরে এসে দেখি কৃষ্ণা তৃতীয়ার ভাঙা চাঁদ অনেকটা উঠে গিয়েচে আকাশে—পেছনের পর্ব্বতসান্‌র দোকা, শালগা ও

পাষড়া গাছগুলো ঈষৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কি সুন্দর দেখাচ্চে—মায়াময়, অপরূপ। এই সরু সংকীর্ণ উপত্যকার সবটা চাঁদের আলোতে আলো হয়ে উঠেচে। কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরে, কখনও চাই তারা-ভরা আকাশের দিকে, কখনও চাই জ্যোৎস্নাস্নাত দোকা ও শালগা গাছগুলির দিকে।

আজ সকালে চা খেয়ে স্নান করে তাঁবুর সামনে পাহাড়টিতে উঠে সেই শিলাখণ্ডে বসলুম—এখুনি আজ চলে যাচ্ছি এই সুন্দর বনভূমি ছেড়ে। আবার কবে আসবো কে জানে? একটু রোদ উঠেচে, এ পাহাড়ের মাথায় সব শুকনো গাছ, শিউলি বন শুকনো, দোকা গাছগুলো শুকনো শিউলি কি আমড়া গাছের মত, শুকনো বনতুলসীর জঙ্গল, নিষ্পত্র শিববৃক্ষ, নিষ্পত্র গাছে হলুদরঙের গোলগোলি ফুল ফুটে আছে, কালো পাথরের ফাঁকে ফাঁকে শুকনো খড় বন। কি একটা শুকনো কাঁটা গাছ অজস্র—সব শুকনো গাছ এখানে, ভারি চমৎকার লাগে কালো পাথরের ওপর নিষ্পত্র শুকনো গাছের বন। ভগবানের আশ্চর্য্য শিল্প কি সুন্দর ভাবে এখানে ফুটেচে!

বেলা এগারোটাতে মোটর ছেড়ে প্রথমে পেঁছুলাম মহাদেব শাল। বননিকুঞ্জের অন্তরালে পাপিয়া ও কত বনপাখীর কলকাকলি। বহুকালের পুরোনো পাথরের কালী প্রতিমা। একটা খড়ের চালাঘরে শিবলিঙ্গ পোঁতা আছে—গর্ত্তের মধ্যে মাথা-টুকু মাত্র দেখা যায়। বড় একটা বট গাছ, অনেক আসান ও পলাশ গাছ, কোথা থেকে আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসছে, প্রাচীন দিনের মুনি ঋষিদের তপোবন যেন। মেঘ-মেদুর প্রভাতের স্নিগ্ধ আকাশের তলে কি মনোরম ছবিই এরা রচনা করেছে! মনে হোল আরও অনেকক্ষণ বসে থাকি এখানে—কিন্তু সময় ছিল না।

মহাদেব শাল থেকে বার হয়েই দেখি বারোজ সাহেব ওর মোটরে ফিরচে। আমাদের দেখে নামলো। ও বল্লে, মহাদেব শাল খুব পুরোনো স্থান। বারোজ এ অঞ্চলের অনেক সংবাদ রাখে। ওকে বিদায় দিয়ে আমরা আবার গাড়ীতে উঠলুম,—কোয়ালি গ্রামে সেদিনকার সেই বাড়ীটা দেখলুম, সেদিন যেখানে বসে মুড়ি খেয়ে-ছিলুম। হলদুপুকুর পার হই। কালিকাপুর রেন্‌জ্ আপিসে মিসেস ভর্ম্মার সঙ্গে দেখা হোল। কাপড়গাদি ঘাটের কাছে দৃশ্য বড় সুন্দর—দুধারে পাহাড় ও জঙ্গল, বাঁদিক দিয়ে একটা পার্ব্বত্য ঝর্ণা বয়ে চলেচে। সামনের পাহাড়ে আর বছর একদল হাতী দেখেছিলেন—মিঃ সিন্‌হা বল্লেন। মিঃ সইয়ারের বাংলোটা পড়ে আছে রাখা মাইন্‌সে—ভূতের বাড়ী হয়ে। একটা কুল গাছ থেকে পাকা কুল পেড়ে খেলুম ভাঙা ক্লাব-বাড়ীটার পেছনে।

বাড়ী পেঁছে চা খেয়ে নুটু, উমা ও বৌমাকে নিয়ে বুরুডি ও বাসাডেরা ঘাটের (hill pass) বনের মধ্যে মোটরে গেলুম বেড়াতে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসচে বনে, গম্ভীর দৃশ্য চারিদিকে। খাদের গভীরতা প্রায় ৫০০।৬০০ ফুট—সেখানে বহু নিচে দিয়ে খরস্রোতা নদী (খরসুতি নদী, এখানকার ভাষায়) বয়ে চলেচে, আমি, নুটু, বৌমা খরস্রোতার ওপরে দাঁড়িয়ে আছি—ওপারের পর্ব্বতারণ্যে ময়ূর ডাকচে। সন্ধ্যা হোল, আমরা পাহাড় থেকে নেমে শালবনের মধ্যে দিয়ে চলে এলুম, নুটুকে গান গাইতে বল্লেন মিঃ সিন্‌হা। আমরা সবাই সেই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম ও গান শুন-লুম। তারপর ডাকবাংলোতে এসে চা খাই বৌমা, নুটু ও আমি।

পরদিন সন্ধ্যায় বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে দেখা রাজবাড়ীতে। আমি বল্লাম, হরিয়ানা গ্রামের গভীর বনের মধ্যে যে মহাদেব শাল আছে, সেখানটা বড় সুন্দর তপোবনের মত। কিন্তু যাত্রীদের বসবার জায়গা নেই, ভাঙা মন্দিরেরও সংস্কার দরকার। আপনি রাজসরকার থেকে ওটা করে দিন।

অমরবাবুর বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করলুম রাত্রে।

কোথায় দুবলাবেড়া, ঘাটশিলা—আর কোথায় বারাকপুর! এক দিনের মধ্যে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েচি—কোথায় চাকড়ি গ্রামে বাসেয়া সর্দ্দারের স্মৃতি-প্রস্তর, কোথায় চরাই পাহাড়ের শিখর! কোথায় দোকা ও শালগা বন! আজ এ বারাকপুরে আম্রমুকুলের ঘন সুবাস ভরা অপরাহ্ণের বাতাসে জানালা খুলে দেখ্‌ছি সামনের খুড়ী-মাদের বাঁশঝাড়ের মাথায় রাঙা রোদ, কোকিল ও কত কি পাখী ডাকচে—আমি একটা ঘরে বসে লিখচি। শুকনো বাঁশপাতা-ঝরা পথের ওপর বৈকালের ছায়া নেমে এসেচে, ঘেঁটুফুল ফুটেচে আমার উঠোনে, ওদের বাঁশতলায়, আমি বসে বসে দেখচি। কল্যাণী গিয়েচে ফকিরচাঁদের বাড়ী বৌভাতের নিমন্ত্রণ খেতে, মানু ও নগেন খুড়োর বৌয়ের সঙ্গে। এমন চমৎকার পরিপূর্ণ বসন্তের মধ্যে বারাকপুরে আসতে পারা একটা সৌভাগ্য। এত সুগন্ধ বাতাসে, এত ঘেঁটুফুল শুকানো পাতা ছড়ানো বাঁশঝাড়ের তলায়। সকালের ঈষৎ শীতল বাতাসে যখন আম্রমুকুলের সৌরভ ভেসে আসে, পাখী ডাকে—তখন মনে হয়, একটা যেন কিছু হবে, এমন দিনের শেষে বৃহত্তর কিছু, মহত্তর কিছু অপেক্ষা করে আছে যেন—আমার ছেলেবেলাতে ঠিক এই সময় মনের অকারণ উল্লাস অনুভব করতুম এমনি ধারা।

কাল বিকেলে কুঠীর মাঠের রাস্তা ধরে আসতে আসতে হঠাৎ এসে পড়লুম শাঁখারি-পুকুরে বাঁশবনের ধারে। নক্ষত্র উঠেছে আকাশে, আকাশের শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ জ্বল-জ্বল করচে, আম্রমুকুলের ঘন সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে। কতকাল আসিনি শাঁখারি-পুকুরের বাঁশবাগানে—ছিরেপুকুরের ওপাড়ের পথে—সেই ত্রিশ-বত্রিশ বৎসরের পুরাতন বাল্যদিনগুলি ছাড়া। বিশ্বশিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই পৃথিবী, এই পৃথিবীর বসন্ত, এই মানুষের মন। আমি না যদি থাকতুম, এ বসন্ত শোভা, এ শুক্লাপঞ্চমীর জ্যোৎস্না কে আস্বাদন করতো? মানুষের মনের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টির লীলারস আস্বাদ করচেন। যে সমজদার, যে রসিক শিল্পীমনের অধিকারী সে ধন্য—কারণ ভগবান তার চোখ দিয়ে, মন দিয়ে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। সুতরাং সমজদারের চোখ ভগবানের চোখ, সমজদার রসিকের মন ভগবানের মন—যা সৃষ্টিমুখী হোলে একটা গোটা বিশ্ব সৃষ্টি করে ফেলতে পারে চক্ষের পলকে।

কি চমৎকার রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি শিমুল গাছটার শোভা নদীর ধারে ফণি চক্কত্তির জমিতে! দুপুরে নীল আকাশের তলায় রোজ রাঙা ফুলগুলির দিকে চেয়ে দেখি স্নান করতে যাওয়ার সময়ে। চোখ ফেরাতে পারিনে। কাল আবার দুটো প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসচে অত উঁচু গাছটার ফুলে ফুলে। প্রজাপতি—যার জন্ম শুঁয়োপোকা থেকে। শুঁয়োপোকা জীবন পরিত্যাগ করে প্রজাপতি রূপ পরিগ্রহ করেচে, নীল আকাশের তলায় সৌন্দর্য্যলোকে বিচরণের অবাধ অধিকার লাভ করেচে। ঐ রাঙা ফুলে ভরা শিমুল গাছ, ঐ নীল আকাশ, ঐ উড্ডীয়মান রঙীন প্রজাপতি ও সব যেন একটা বড় দর্শনের গ্রন্থ—শুধু যে ভাষায় ঐ গ্রন্থ লেখা তা সবাই পড়তে পারে না; বুঝতে পারে না। গভীর দর্শন-তত্ত্ব ও বইয়ে লেখা রয়েচে—লেখা রয়েচে আত্মার অমরত্বের গোপন বাণী, লেখা রয়েচে তার কামচার শক্তির অলেখা ইতিহাস। যে ঐ ভাষা বুঝতে পারে সে জানে।

কাল দুপুরে ছিরেপুকুরের ওপারের রাস্তা দিয়ে শাঁখারিপুকুরের মধ্যে দিয়ে স্নানের পূর্ব্বে খানিকটা বসলুম, তারপর বাঁশবনের ছায়ায় ঝরা-বাঁশপাতার পথ দিয়ে

পুকুরের একস্থানে এসে দাঁড়ালুম, সেখানে ঘেঁটুফুলের একেবারে নিবিড় ভিড়। তেতো সুবাস ছড়াচ্চে দুপুরের বাতাসে। ওখানে দাঁড়িয়ে মাঠের দিকে চাইতেই সেই উত্তর মাঠের রাঙা ফুলে-ভর্ত্তি বড় শিমুল গাছটা চোখে পড়লো। আমি সৌন্দর্য্যে যেন কেমন অভিভূত হয়ে পড়লুম, আর নাবতে পারিনে, অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারিনে। সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি হোল—সে অনুভূতি এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে, তার কথা আমি কাল সারাদিন ভুলিনি। এবং সেকথা এখানে লিখেও রাখলুম এজন্য যে এই সব দুর্ল্লভ অনুভূতিরাজি যখন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন এই ক'টি লাইন পড়লে কালকার অনুভূতির বাণী আমার মনে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনুভূতির প্রথম কথা হোল—মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো—অভীঃ, ভয় নেই।

কিসের ভয় নেই? কোনো কিছুরই না। "ন মৃত্যু ন শঙ্কা" ভগবান যুগ-যুগান্তরে, কল্প থেকে কল্পান্তরে আমার এবং তোমার হাত ধরে চলেচেন, আনন্দ ও প্রেমের স্নিগ্ধ ধারার মধ্যে দিয়ে। সকল জন্ম-মরণ পার করে তিনি নিয়ে চলেছেন। জরা নেই, মৃত্যু নেই। এমন কত বসন্ত দ্বিপ্রহর কত ঘেঁটুফুল সুবাস বিতরণ করবে, অনাগত জীবনদিনে কত গ্রামে—কত মাতা-পিতার স্নেহ আদর পরিবেশিত হবে, কত ভবিষ্যৎ রাত্রির জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হবে সেই সুমধুর আয়ুষ্কালগুলি, কত কোকিল ডাকবে, কত রক্তশিমুল-ফুল ফুটবে। জীবন ও জন্ম দুদিনের, ভগবান সখা ও সাথী অনন্ত কালের। জীবের ভয় কি? অবিনশ্বর তুমি, অবিনশ্বর আমি—আমরা ভগবানের চিরদিনের লীলাসহচর, ভগবান চিরদিন আমাদের লীলাসহচর।

কাল দুপুরে চিল-ওড়া নীল আকাশ থেকে এই আনন্দের বাণী নিঃশব্দে নেমে এল সেই ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ভগবানের নীরব আশীর্ব্বাদের মত। মন অমৃতে পূর্ণ হয়ে গেল। শিরায় শিরায় সে কি জীবনস্রোত! কি উচ্ছল রস ও আনন্দের প্রবাহ।

কথাটা লিখেই রাখলুম, যদি ভুলে যাই। অন্য কেউ যদি এর পরে পড়ে, আশা করি সে এই নৈঃশব্দের বাণীর গভীরতা বুঝতে পারবে, তারও জীবনে এই বাণী দেবে অমৃতের সন্ধান। জয়যুক্ত হোক আম্রমুকুল ও ঘেঁটুফুল সুবাসিত এই কাননের শান্ত দ্বিপ্রহরটি।

সকালে শাঁখারিপুকুরের ধারে বাঁশবনে ঝরা পাতার ওপর বসে ছিলুম। বাঁশ বনের নিচে ছায়ায় ঘেঁটুফুল ফুটেচে, আম্রমুকুলের সুবাসে বাতাস মদির, এখানে ওখানে মাঠে শিমুল ফুলের কি শোভা! চুপ করে বসে নলে নাপিতের আম বাগানের পুষ্পভারনত শাখা-প্রশাখাগুলির দিকে চেয়ে রইলুম। কোকিল ডাকচে, উষ্ণ মাটির গন্ধ বেরুচ্চে, শুকনো বাঁশপাতা হাওয়ায় ঘুরে ঘুরে পড়চে, যেমন পড়তো আমার বাল্যকালে। ঘেঁটুফুলের তেতো সুবাসে মনের মধ্যে আমার কেমন একটা আনন্দ আনে। ত্রিনয়নী পিসিমার সঙ্গে খেলাঘরের মধুর বসন্ত-মধ্যাহ্নগুলির কথা মনে হয়—ত্রিশ বৎসর আগেকার সেই অতীত ফাল্গুন দিনের বার্ত্তা এই ঘেঁটুফুলের সুবাসে খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে ফিরে আসে, আমি বাঁশগাছে হেলান দিয়ে বসে অবাক ভাবে দূরে রোদ-ভরা মাঠের দিকে চেয়ে থাকি।

দুপুরে বসে 'অশনি সংকেত' উপন্যাসের একটা অধ্যায় লিখি। কল্যাণী গিয়েচে ও-পাড়ার পাঁচী যুগিনীর কালীমার মন্দিরে। সঙ্গে গিয়েচে বুড়ী পিসিমা ও

মানু।

কাল পাঁচী এসে কতক্ষণ গল্পগুজব করলে। আমি এর কয়েকদিন আগে দোলের দিন রেডিও বক্তৃতা দিতে কলকাতা গিয়েছিলুম। সেখানে সুনীতিবাবু, মিঃ সিং প্রভৃতির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কাল জগো ও ফুচুর সঙ্গে বেলেডাঙায় একটা বাবলার ডাল আনতে গিয়েছিলাম। ঘোষেদের বাড়ীর পিছনে কি অপূর্ব্ব ঘেঁটু-ফুলের সমাবেশ ও কি ওদের সম্মিলিত সুগন্ধ। এই ঘেঁটুফুল কেন যে আমাকে মাতিয়ে দেয়, তা কি করে বলবো। অমন ঘেঁটুফুলের সুবাস আমি এ বছর অন্ততঃ আর কোথাও দেখিনি। কোথায় লাগে সিনেমা থিয়েটার দেখার আনন্দ! ভগবানের কথা কেন যে এত মনে হয়! আইনদ্দির নাতি এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলে, সেই ছোকরা, যে স্কুলের আমার ছাত্র ছিল, সম্প্রতি গুরু ট্রেনিং পাশ করেচে। বড় চমৎকার লাগলো আজ ঐ ঘেঁটুফুলের শোভা। দুঃখের বিষয় কেউ এ সব দেখতে আসে না।

আজ অপরাহ্ণে ছিরেপুকুরের ওপারে আমবাগানের তলায় ঘেঁটুফুলের ঘন বনের মধ্যে কতক্ষণ বসে রইলুম। এমন ফাল্গুন দিনে এমন ঘেঁটুফুলের সমারোহের মাঝ-খানে জীবন কোনদিন কাটাইনি। চিরকালই বিদেশে কাটিয়ে এসেচি। হয় ভাগল-পুরে নয় কলকাতায়, কিংবা মানভূমে, ঘাটশিলায়, ঝাড়গ্রামে। আজ বসে আছি, ঘেঁটুফুলের বনের মধ্যে, ফুলের ঘন সুবাসের মধ্যে। ফুলে ভর্ত্তি ঘেঁটুবন আমার চারপাশে ঘিরে, লতাপাতার সুগন্ধ, সামনে গাছে তিত্তিরাজের আধ-ফাটা ফলের থোলো ঝুলচে, কোকিল ডাকচে। ধন্য হোক ভগবানের নাম। ধন্য হোক সেই মহাশিল্পীর শিল্পসৃষ্টি।

ক'দিন ধরে গণি ও সয়ারামের মোকর্দ্দমার বিচার করচি পল্লীমঙ্গল সমিতির অধিবেশনে। কাল রাত্রেও চড়কতলায় অধিবেশন হয়ে গেল। এ গ্রামের ঝগড়াবিবাদ মিটবে না। যত চেষ্টা করি বিবাদ থামাতে, তত আরো বেড়ে যায়। কাল বিকেলে কুঠীর বাঁধানো গাঁথুনিতে কতক্ষণ বসে রইলুম—সব শুকনো লতা, পাতা, কাঠ, ডাল, তুঁতফল ইত্যাদির গন্ধ বেরোয় এ সময়। ভারি আরামের গন্ধটা। এ পারের মাঠে কতক্ষণ বসে একটা মূর্ত্তি কল্পনা করবার চেষ্টা করলুম নির্জ্জনে। সমিতির অধি-বেশনের পূর্ব্বে গিরিনদার বাড়ী এসে দেবপ্রয়াগের কথা হয়। সে শুধু খাবার জিনিসের গল্প। খোয়ার লাড্ডু বানিয়ে কি ভাবে উনি পান্ডাদের খাইয়েছিলেন—সে গল্প। উনি বল্লেন—আবার চলো তুমি আমি বেরুই। আমি হবো স্বামীজী, তুমি প্রধান শিষ্য। ইন্দুর বাড়ীতে ইন্দু সুবর্ণপুরের দাসুবাবুর গল্প করলে। দাসু-বাবু বলতো—আর কি খাই আজকাল? একটি রুই মাছের মুড়ো ও গাওয়া ঘি রোজ খাদ্য ছিল—ইত্যাদি। চড়কতলায় খুব মিটিং। মুসুরি ডালের ক্ষেতে কতকটা মুসুরি খেয়েচে, তাই নিয়ে ঘোর তর্ক। সয়ারাম বলে—আড়াই মন মুসুরি হবে। ঘোর বিবাদ।

গভীর রাত্রে খুব ঝড়বৃষ্টি। কল্যাণী বলচে, ওগো, জানালা বন্ধ করো, ভেঙে যাবে যে!

ঘুমের ঘোরে ভয়ে বলচে।

কাল খুব ঝড়বৃষ্টি বিকেলে। রাধাবল্লভের জামাই কেষ্টর বাড়ী সন্ধ্যার পরে

উপনিষদ ও গীতার ব্যাখ্যা হোল। অনেক লোক শুনতে এসেছিল, সতীশ ঘোষ, মন্তি দা'র ছেলে যুগল, ললিত, লালমোহন, ফণিকাকা, গজন, ফকিরচাঁদ ইত্যাদি। শান্তি-পুরের এক অদ্বৈত বংশের গোস্বামী মশায়ও উপস্থিত ছিলেন। লালমোহনের বাড়ীর পিছনের যে পথটা দিয়ে আমি সকালে গেলাম সে পথে জীবনে কখনো যাইনি—নতুন দেখলাম। বারাকপুরেও এমন সব জায়গা তা'হলে আছে যা আমি জীবনেও কখনো দেখিনি।

রাত এগারোটার সময় ফিরে এলুম। অনেক রাত্রে ভীষণ মেঘ গর্জ্জন, তার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কল্যাণী চমকে উঠেচে ঘুমের ঘোরে।

এ খাতায় অনেকদিন পরে আবার 'বনগ্রাম' কথাটি লিখচি। পাঁচ বৎসর পরে আবার বনগ্রামে বাসা করেচি—জাহ্নবীর বাসার কাছেই। আবার পুরোনো দিনের মত সকালে উঠে খয়রামারি বেড়াতে যাই, সেই গাছপালার ফাঁকে বসে দাঁতন করি। পুরোনো দিনের পুনরাবৃত্তি বড় ভাল লাগে। কোথায় ঘাটশিলার বনমধ্যস্থ হ্রদে সকালে স্নান করতে যাওয়া এই সময়ে, কোথায় নাকটিটাঁড়ের বন, ১লা বৈশাখ বরকেলা পাহাড়শ্রেণীর সামনে ভবানী সিংয়ের বাড়ীর কম্পাউণ্ডে বসে চা খাওয়া, বোরো নদীতে একসঙ্গে স্নান—হরদয়াল, আমি, ভবানী, সুবোধ ঘোষ, যোগীন্দ্র সিন্হা—আর বছরই তো। সে কি মজা! চাঁইবাসার সে ঘরদোর এখনও মনে পড়চে। কোল্হান পার্ক, মাঠা পাহাড়ের বাংলো—ইত্যাদি। কোথায় সেই চরাই পাহাড়ের শিখরদেশ। এসব থেকে কোথায় আবার সেই বনগাঁর বাসা। ঘড়ি বাজে ঢং ঢং করে, যতীন দা'র বাসায় মন্মথদা'র বাসায় আড্ডা দিচ্চি—ইউনিভার্সিটির খাতা দেখে উঠে বাজার করচি, ওপারের হাট থেকে গুড় কিনে আনচি, কয়লার দোকানে কয়লা কিনচি। এ সব জিনিস বহুদিন বনগাঁয়ে করিনি।

কাল কাপ্তেন চৌধুরীর মোটরে বিকেলে বিশ্বনাথ ও যতীন দা'কে নিয়ে বেনা-পোল হরিদাস ঠাকুরের মঠে বেড়াতে গেলুম। আজ পাঁচ বছর আগে একবার এখানে এসেছিলুম। বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, মন্দিরের সামনে চাতালে বসে আমরা হরিদাসের কাহিনী পাঠ শুনচি, প্রদীপের আলোয় বিশ্বনাথ পড়চে, ওদিকে চাঁদ উঠেচে, মন্দিরের চারিপাশে ঘন বনে শান্ত স্তব্ধতা নেমে এসেচে—বড় ভাল লাগছিল। হীরা নটির মূর্ত্তির সামনেও আরতির পঞ্চপ্রদীপ ঘোরানো দেখে আমি বিস্মিত ও অভিভূত হোলাম। কার কৃপায় পতিতা আজ দেবী হয়েচে? সেই বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বপালক ভগবানের ছাড়া আবার কার কৃপায়? এক বুড়ী আছে, সে প্রণাম করে বলে—জীবই শিব। এখানে বুড়ী আছে আজ যোল বছর। ১৩১০ সালে এই মঠ ও মন্দির তৈরি হয়। ভোলানাথ গোস্বামী বলে এক সাধক ভক্ত, বাড়ী তাঁর মামুদকাটি, স্বপ্নে আদেশ পান এখানে হরিদাসের সাধনকুঞ্জের পুনরুদ্ধারের। এখানে এসে স্থানীয় নায়েব মহাশয়ের সাহায্যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে এই তুলসী জঙ্গল ও আটখানা ইঁট আবিষ্কার করেন। তখন এখানে বাঘের আড্ডা ছিল। বুড়ীটি বড় অদ্ভুত, সে-ই এসব গল্প করলে। বড় ভক্তিমতী আর বড় বিনয়ী—বৈষ্ণব ধর্ম্ম এদের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেচে, 'তৃণাদপি সুনীচেন' এই কথার সত্য ওরা জীবনে আঁকড়ে ধরেচে, পালনও করেচে।

আজ বিকেলে পাঁচটার সময় কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতে গেলুম বারাকপুরে। মিতে, মন্মথ দা, যতীন দা, আমার সঙ্গে। কাপ্তেন চৌধুরী পথের পাঁচালীর দেশ দেখতে

চেয়েছিলেন, তাঁকে বকুলতলা, সলতেখাকীতলা, ছিরেপুকুর, পুরোনো ভিটে, বরোজ-পোতা, হরি রায়ের পাঠশালা—সব দেখলুম। দেখে ভদ্রলোক খুব খুশি। তারপর ফণিকাকার বাড়ী এসে দেখি চড়কের 'শয়াল খাটা' হচ্চে! বাল্যকালে আমার মনে কি উন্মাদনার সৃষ্টি করতো এই 'শয়াল খাটা'। রামনবমী থেকে শুরু হোত, সেটা যেন একটা ফাঁকতাল্লা, তারপর চড়ক তার আনুষঙ্গিক কাঁটাভাঙা, 'শয়াল খাটা' নীলপুজো, মেলা, গোষ্ঠবিহার, সং—পরে সকলের শেষে যাত্রা বারোয়ারী। এ আনন্দের তুলনা ছিল? আজও সেই 'শয়াল খাটচে' সন্ন্যাসীর দল, গ্রামের ছেলেমেয়ে সেই ভাবে জড় হয়েচে—কিন্তু আমার মধ্যে সে আনন্দ আজ নেই। মীনা, কেতো—সবাই দেখচে বসে দেখলুম। চড়কগাছ হবে বলে একটা কি গাছও কাটা হয়েচে চড়কতলার মাঠে। বেলা পড়ে গিয়েচে। ওখান থেকে বেরিয়ে গাঙের ধার দিয়ে কুঠীর কাছে এলুম। ভাঙা কুঠী দেখালুম কাপ্তেন চৌধুরীকে, যেমন বাল্যকালে আমাদের গ্রামে যে কেউ আসুক, তাকে কুঠী দেখাবোই। রামপদকে দেখিয়েছিলুম, বামনদাস মুখুয্যেকে দেখিয়ে-ছিলুম। আজও দেখাচ্চি ১৩১০ সাল ১৩১১ সালের পরেও। কুঠী হয়ে গেলুম মোল্লাহাটি—বেলেডাঙা, নতিডাঙার পথ দিয়ে। অনেকদিন—প্রায় ৫।৬ বছর মোল্লা-হাটি আসিনি। ডাকবাংলোটাতে গিয়ে বসলুম, মেমসাহেবের গোর দেখলুম—সাহেব-দের নীলকুঠীর ধ্বংসস্তূপের ওপর প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় বেড়িয়ে বেড়ালুম—কোথায় আজ সেই লালমুখো, ফালমান সাহেবের দল, কোথায় তাদের বলদর্পিতা, গর্ব্বিতা মেমের দল। মহাকাল অন্ধকার আকাশে বিষাণ বাজিয়ে সব অবসান করে দিয়েচে।

সন্ধ্যায় ফিরে এলুম। মালপাড়ার কাছে হরিপদদা'র সঙ্গে দেখা। এসে রাত্রে আবার আড্ডা।

কাল সামটাতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম সতীনাথ মিত্রদের বাড়ী। প্রায় একমাস লিখিনি এ খাতায়। এর মধ্যে আমার স্ত্রী একটি মৃত কন্যাসন্তান প্রসব করলে, তার শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়লো। এই সব কারণে লেখা হয়নি অনেকদিন

কাল সামটায় যাবার পথে উলুসী গেলুম। কাপ্তেন চৌধুরীর গাড়ীতেই গেলুম। যে উলুসীতে মধুকানের বাড়ী, সেই উলুসী। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রভাতী বায়ু বাংলার পল্লী অঞ্চলের নানা পুষ্প-সুবাসে সুরভিত। বিল্বপুষ্প, তুঁত গাছের ছোট ছোট ফুল। পথের দুধারে ফুলে ভরা সোঁদালি গাছ যেন নুয়ে পড়চে।

কতকাল আগে মধুকান মারা গিয়েচেন, আজ এতকাল পরে তাঁর জঙ্গলে-ভরা ভিটে দেখতে প্রায় একশ বছর পরে আমরা এসেচি।

আমরা পল্লীকবির ভিটেতে দাঁড়িয়ে আছি, বৌ-কথা-কও পাপিয়ার ডাকের মধ্যে —একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক জল নিয়ে যাচ্চে। সে মধুকানের বংশের মেয়ে। তার মুখে আমরা মধুকানের গান শুনতে চাইলুম। সে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল আমাদের। আমরা বল্লুম—মধুকানের কোনো খাতা আছে ঘরে?

সে বল্লে—হ্যাঁ।

নিয়ে এল দুখানা খাতা। ১২৭৪ সালে মধুকান মারা গিয়েছেন। সেই সময়ের খাতা। তিনি মদ খেয়ে পড়ে থাকতেন—সেই সময় মুখ দিয়ে যা বলে যেতেন—মুহুরীরা লিখে নিত। একটি বৃদ্ধ মধুসূদনের একটি গান গাইলেন।

ওখান থেকে বেলা সাড়ে বারোটার সময় চলে এলুম সামটাতে। রাধানাথ দা ব্রজ এরা ছিল। ডাকবাংলোয় মোটর পাঠিয়েছিল আমার জন্যে। দুটি নিদ্রিত সুন্দর মুখের ছবি আমাকে সম্পূর্ণ অন্য এক ছবি মনে করিয়ে দিলে।

ওদের বাড়ীর নীচে কচুরিপানায় বোজানো ব্যাতনা বা বেত্রবতী নদী বয়ে গিয়েচে। এ নদী এখন একেবারে মজা। একসময়ে নাকি স্টীমার চলতো। বিকেলে নাভারণ ডাকবাংলোতে ফিরে হাট দেখতে গেলুম বিজয়কে নিয়ে। বেত্রবতী নদীর পুলটার ওপর বসে বসে ভগবান সম্বন্ধে কেমন এক অদ্ভুত অনুভূতি হোল। সেই নিদ্রিত দুটি সুন্দর মুখের ছবি।

ক'দিন অতি ভীষণ গরম গিয়েচে। কাল যখন রাত্রে মন্মথ দা'র বাড়ীর আড্ডা থেকে ফিরি, তখন হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে যে কি ভয়ঙ্কর গুমট দেখা দিল। আমার মনে হোল এ গুমটে রাত্রে মশারির মধ্যে কেমন করে শোবো। কিন্তু যেমন বাড়ী এসেছি—অমনি আকাশে মেঘ জমে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হোল। বিদ্যুৎ চমকাতে লাগলো। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ জোলো বাতাসে। কল্যাণী বল্লে—বাদলা হবে। আমি বল্লাম—তা হোলে তো বাঁচি। কিন্তু আসলে বাদলা হোল না। আধ-ঘণ্টাটাক বৃষ্টি হয়েই থেমে গেল।

সকাল তখনও ভাল করে হয়নি, ভাইজাগ প্যাসেঞ্জার এসে ভুবনেশ্বরে দাঁড়ালো। আমি অন্ধকারের মধ্যে নেমে গিয়ে গাড়োয়ানদের সঙ্গে দরদস্তুর চুক্তি করে মহাদেব-বাবুকে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুললাম। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দিয়ে গাড়ী চলচে, পথের দুধারে নক্সভমিকার জঙ্গল। একটু পরে ফর্সা হোল, গাড়োয়ান বল্লে—এই নালাটা ছাড়িয়ে এক মাইল গেলেই উদয়গিরি খণ্ডগিরি। একটু পরেই সাদা জৈন মন্দিরটি চোখে পড়লো সামনের পাহাড়টির ওপরে। গরুর গাড়ীও গিয়ে দাঁড়ালো পাহাড়ের তলায়। ঘড়িতে দেখলাম ভোর সাড়ে পাঁচটা।

সুন্দর পরিবেশটি। সামনে বনাবৃত পাহাড়, মাটির রং লাল, বড় বড় প্রস্তর যেন মাকড়া পাথরের চত্বর। পথের ধারে একটি জৈন ধর্ম্মশালা। নিচে থেকেই দেখলুম পাহাড়ের গায়ে কাটা সরু সরু থামওয়ালা দর-দালান মত—অনেকদিন আগে নির্ম্মল বসুর তোলা ফটো-এ্যালবামে উদয়গিরির এই সব গুহার ছবি যেমন দেখে-ছিলুম। কিন্তু পাহাড়ের ওপর গিয়ে চারিদিকে চেয়েই মনে হোল এ পাহাড় দুটির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে আমাকে কেউ কোনো কথা বলেনি এর আগে। পাহাড়ের ওপরটা সমতল পাষাণ বেদিকার মত। বনে বনে পাখী ডাকচে, বন্য যূথিকা ফুটে সুবাস বিতরণ করচে, মেঘমেদুর আকাশ, দূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরে দূরে ছোট বড় পাহাড়। কত মুনিঋষির তপস্যাপূত মনোরম স্থানটি। ব্যাঘ্রগুম্ফাটি বড় চমৎকার, ঠিক একটি বাঘের মুখ খুদে বার করেচে আস্ত পাহাড় কেটে। আমরা অনেকক্ষণ একটা পাথরের চাতালে বসে তারপর নেমে এলাম নীচে। একটা বৃদ্ধা বসে আছে একটা বাড়ীতে, ধর্ম্মশালার পাশে, সে বল্লে, আমি আচার, মুড়ি বিক্রি করি।

বল্লাম—কুলের আচার আছে?

—আছে।

তারপর যে আচার আনলে তা নুন মাখানো শুকনো কুল—তাকে আচার বলা চলে না। নিলুম না সে কুলের আচার। খণ্ডগিরিতে উঠলাম তারপরে—সেখানে নামবার পথে বনের দৃশ্য বেশ উপভোগ্য। ডাকবাংলোর বারান্দায় খেতে বসেচি, এমন সময় এল ঝড়বৃষ্টি। বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে গেল খুব। জৈন ধর্ম্মশালায় চা বিক্রি হয় জানতাম না—সেখানে কয়েকটি লোককে চা খেতে দেখে গিয়ে বসলাম—চা-ও পাওয়া গেল।

আবার ভুবনেশ্বর রওনা হলাম গরুর গাড়ীতে। পথের ধারে শুধুই নক্সভমিকার

বন, আর একটা গাছ—তার নাম মহীগাছ। সেই বনযূথিকার নাম নাকি আঁধি কলি, এখানে ও ফুল খায়। অবাধ দৃষ্টি কত দূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে, থৈ থৈ করচে, space-এর সমুদ্রে দূরের ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির চূড়া যেন ডুবে আছে। মাটির রং রাঙা, তার পাষাণ বাঁধানো ওপরটা। গরুর গাড়ীর চাকা গিয়ে গিয়ে পাথরে কেটে গিয়ে চাকায় লিকের সৃষ্টি হয়েচে।

ভুবনেশ্বর পেঁছুতেই ছোট বিশ্বনাথ পাণ্ডার খপ্পরে পড়ে গেলুম! সে বিন্দু সরোবরের ধার থেকে আমাদের নিয়ে এল, তুললে এক ধর্ম্মশালায়। গৌরীকুণ্ডে আমাদের স্নান করাতে নিয়ে গেল—স্নানান্তে দুধকুণ্ডের জল পান করে যেমন পিছু ফিরেছি, অমনি পাণ্ডার দল ফেউয়ের মত পিছু লাগলো। কোনক্রমে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ধর্ম্মশালায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করা গেল। তারপর মন্দির দেখতে বার হই। বহু অতীত দিনের আনন্দচ্ছন্দ যেন পাথর হয়ে জমে আছে সে বিশালকায় পাষাণ দেউলের বুকে। একটি নর্ত্তকী মূর্ত্তির কি ত্রিভঙ্গ দেহ, কি মুদ্রার সুষমা! পাষাণ খোদাই লিরিক কবিতা। নক্মভমিকার জঙ্গলে অতীতের ইতিহাস চাপা পড়ে যায় যায়। ঝম্পা সিংহ, উদো গজ সিংয়ের কথা জানি নে।

স্টেশনে ফিরবার পথে আবার ভিখিরির দল গরুর গাড়ীর পিছু পিছু করুণ সুরে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করতে করতে ছুটলো প্রায় এক মাইল রাস্তা। ট্রেন আসতে দেরি ছিল। হু হু সমুদ্রের হাওয়া বইচে, আমরা শুয়ে রইলুম প্ল্যাটফর্ম্মে। চারটের সময় গাড়ী এল। ঐ দূরে উদয়গিরি, ঐ খণ্ডগিরির ওপর জৈন মন্দির। গাড়ী চলেছে—গাড়োয়ান ওবেলা দেখিয়েছিল খুরদা রোডের দুটি রাঙা কাঁকরের পাহাড়, তার ওপর দুটি গাছ—সে পাহাড় দুটো কাছে এল। খুরদা রোড স্টেশনে আর বছরে 'ডিটেকটিভ' নাটকের অভিনয়ে যে বেশ নাম করেছিল সেই ইন্দুবাবু এসে আলাপ করলেন। আবার সেই মালতীপাতপুরের নারিকেলকুঞ্জ। যেন পাপুয়া নিউ হেব্রা-ইডিস্-এর বেলাভূমির ছবি। পুরী স্টেশন থেকে ফিরবার পথেই বনগাঁর হরিবাবু ও তার ছেলে বামনের সঙ্গে দেখা হোল। আমরা ধর্ম্মশালায় জিনিসপত্র রেখে জগন্নাথের মন্দিরে গেলুম দর্শন করতে। ঠাকুরের সিঙার বেশ দেখলুম। মন্দিরে বাইরের চত্বরে খোলা হাওয়ায় সুমথবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। আর বছর আর এ বছর। সেই মন্দিরের নানাস্থানে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠকের সম্মুখে কৌতূহলী ও ধর্ম্মপিপাসু শ্রোতার ভিড়। এ দোকান ও দোকান ঘুরে সুমথবাবু খাবার জিনিস কিনতে লাগলো। রাত ন'টার পরে ফিরি। একসঙ্গে খেতে বসি—গৌরীশঙ্কর, সুমথ ও মহাদেববাবু। ওরা রাত্রেই চলে গেল।

নীল সমুদ্র! আবার সেই উত্তালতরঙ্গময় নীল সমুদ্রের গর্জ্জন!

সকালে উঠে প্রথমেই গেলুম হরিদা'র বাড়ী। বামন বল্লে, তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমি আর বছরের সেই বালিয়াড়ি ও শাল গাছ-দুটির পাশ দিয়ে কতবার মঠে গেলুম, সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি আবার দর্শন করলুম। পুরুষোত্তম মঠে সেই স্বামীজীর ধর্ম্মো-পদেশ শুনলুম। ফিরবার পথে ভূপেন সান্ন্যালের বাড়ী গেলুম। তাঁর স্ত্রী জলখাবার খাইয়ে তবে ছাড়লেন।

বড় রোদ চড়েচে। বালিয়াড়ির পথে আবার যাত্রা। সেই পলং গাছ পথে পড়লো। ধর্ম্মশালায় ফিরে আর বছরের মত খিদেতে ছট্‌ফট করি। একটা বাজে, তিনটে বাজে, কোথায় মহাপ্রসাদ? এই আসে, এই আসে—কিছুই না। বীরেন রায় মশায় এলেন—আমরা আহারান্তে বসে গল্প করি। জানালা দিয়ে দেখি বাঁদিকের

জানালায় ঢেউ-সঙ্কুল নীল সমুদ্র, ডানদিকের জানালা দিয়ে চোখে পড়ে জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দিরের চূড়া—পুরীর দুই বিরাট বস্তু।

'কাকে ফেলে কাকে রাখি কেহ নহে উন।' বিকেলে হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ওয়াজেদ আলি ও অমিয় চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দেখা করে সমুদ্রতীরে অনেকক্ষণ বসে বসে হরিদা ও বীরেনবাবুর সঙ্গে চীনাবাদাম খেতে খেতে জ্যোৎস্নালোকে গল্প করি। ওখান থেকে উঠে ধর্ম্মশালায় এসে দেখি 'দেশ' সম্পাদক বঙ্কিম সেন ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করবেন। হরিদা'কে নিয়ে এসে বসালুম সভায়।

অনেক রাত পর্য্যন্ত জ্যোৎস্নালোকের সমুদ্রের শোভা দেখি ছাদ থেকে। জগদ্বন্ধু আশ্রমের স্বামীজী পরিমল দাস ও আর একটি ছাত্র এসে গল্প করলেন। স্বামীজী একখানা বই দিলেন পড়তে—প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী। পুরীতে একটা সুবিধে, সব সময়েই ভগবানের কথা বলবার লোক মেলে। অনেক রাত হয়েচে, ঘুম আসে না চোখে। গরম নেই, হু হু সমুদ্রের হাওয়া, শেষ রাত্রে বেশ শীত ধরিয়ে দিলে।

সকালে উঠে হরিদাস মঠে গেলুম। মলয়াবাস বলে একটা বাড়ীতে হরিদার সঙ্গে বসে চা খাই। প্রসাদ আসে না তখনো, সবাই খোঁজ নেয় কেন প্রসাদ এল না। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক বেশি রকম খবর করলেন। ভোগ কিনে খেলুম আনন্দবাজার থেকে। পুরীর বাসনের দোকান থেকে একটা ঘটি কিনে পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে সভা করি। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমিয় চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন। চমৎকার জ্যোৎস্না ছিল। সুখময়বাবুর বাড়ী চা খেতে গিয়ে নিরাশ হলুম। সেই সময় এল ঝড়বৃষ্টি। শেষরাত্রে ফস্‌ফরাসের দীপ্তিবিশিষ্ট আলোকোৎক্ষেপী ঢেউ যেন জ্বলচে অন্ধকারে। আমরা বিছানা ঘাড়ে করে স্টেশনে এলুম। ভোরবেলা ট্রেনে ছাড়লো।

সারাদিন ট্রেনে, মাঝে মাঝে ভিড় হয়, মাঝে মাঝে ভিড় চলে যায়। কটক স্টেশনে কতকগুলি রাজবন্দী নেমে গেলেন, এঁরা বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আসচেন। একজনের নাম কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, এঁরা ন' পুরুষ হোল উড়িষ্যায় বাস করছেন, পূর্ব্বে বাংলা দেশে বাড়ী ছিল। ভদ্রক স্টেশনে স্নান করলুম কলের জলে, তখন বেলা সাড়ে তিনটা। ধানমণ্ডল স্টেশন ছাড়িয়ে কেবল পাহাড়, সামনে ও দূরে। মাটির রং লাল, অনেক মনসাগাছ জঙ্গলে, ঝাটিজঙ্গলের বড় শোভা। যাজপুর রোডের কাছে এসে আমার মনে হোল এবার চক্রধরপুরের সমান্তরাল রেখায় এসে পোঁছেচি—তখুনি একটা লোক বল্লে—এখান থেকে চাঁইবাসা চক্রধরপুর রোড আছে—এই দেখুন সেই রাস্তা। একটু পরে বৈতরণী নদী পার হলুম, সন্ধ্যার কিছু আগে সুবর্ণরেখাও পার হওয়া গেল। এই শেষ বড় নদী এ লাইনে। আগে সুবর্ণরেখা, তারপর বৈতরণী, তারপরে ব্রাহ্মণী, তারপরে মহানদী, তারপরে কাটজুড়ি। আর কোন নদী নেই এদিকে। আর যা আছে সে সব অনেক দূরে—যেমন গোদাবরী রাজমাহেন্দ্রিতে।

খড়্গপুর স্টেশনে ট্রেন এল রাত্ত এগারোটা। মেচেদা স্টেশনে এল বৃষ্টি। ভোরবেলা আবার বৃষ্টি এল সাঁৎরাগাছি স্টেশনে। ননীর সঙ্গে দেখা করবো বলেই এখানে নামলাম।

পুরী থেকে এলুম শুক্রবার, গেলুম গোপালনগরে হাজারি প্রামাণিকের ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের নিমন্ত্রণে। শশীর মুহুরী ও আমি একসঙ্গে বসলাম বাড়ীর ভেতরে। জিতেন দফাদার বল্লে—কি রকম, পুরীর লোক এখানে কেন? এখানে

কেমন বারোয়ারী যাত্রা হয়ে গেল, আপনি ছিলেন না।

ওরা ভাবলে আমি না-জানি কতদিন পুরী গিয়েছিলাম।

বৌভাতের নেমন্তন্নে বেশ ভালই খাওয়ালে এ বাজারে। লুচি, পোলাও, মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, ছ্যাঁচড়া, চাটনি, দই, পায়েস; সন্দেশ; রসগোল্লা; আম; কাঁটাল। হাজারি বল্লে—তোমায় বরযাত্রি নিয়ে যাবার বড় ইচ্ছা ছিল ভাই। আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। পুরীতে ছিলাম, কি করবো। খাওয়ার পরে সেকেন পণ্ডিত ও মল্ল বাইরে এসে বসে কতক্ষণ গল্প-গুজব করলে। স্কুলের চাকুরির নিয়োগপত্র দিলে মল্ল। ২৬শে জুন চাকুরিতে যোগ দিতে হবে। আমার ইচ্ছে নেই, কিন্তু ওরা ছাড়ে না, কি করি।

বাহাদুর ও আমি হেঁটে চলে এলুম বেলা তিনটার সময়। কাল গিয়েছিলুম আবালুর হরিদাস ঠাকুরের পাটবাড়ীতে বেনাপোলে। কাপ্তেন চৌধুরী ডাকবাংলো থেকে লোক পাঠিয়ে আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন। ওঁর জিপ গাড়ী কাল কলকাতা পাঠানো হচ্চে সারানোর জন্যে, তাই আজ আমাকে নিয়ে চল্লেন হরিদাস ঠাকুরের পাট-বাড়ীতে। আশ্চর্য্য ঠিক সেদিন যে সময় ভদ্রক যাচ্চি বালেশ্বর থেকে, আজ সেই সময় বনগাঁ থেকে বেনাপোলে চলেচি। পুরীতে দেখে এসেছি সেদিন এই মহাপুরুষের সমাধি, আজ যশোর জেলার একটা অজ পাড়াগাঁয়ে বাঁশবন ঘেরা ক্ষুদ্র জায়গাটিতে তাঁর সাধনস্থান দর্শন করলুম। সন্ধ্যায় চাঁদ উঠলো, আরতি আরম্ভ হয়েচে, গুমট গরম। বেশ লাগচে এই পবিত্র নিভৃত তপোবনটি। যশোর জেলার গৌরব যে অত বড় মহাপুরুষ একদিন এখানকার মাটিতে জন্মেছিলেন, এখানকার জলে বাতাসে পুষ্ট হয়েছিলেন। নদীয়ায় যেমন শ্রীচৈতন্য, ঠিক তেমনি সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী জেলায় হরিদাস ঠাকুর।

সন্ধ্যার পর ফিরে এসে লিচুতলায় জ্যোৎস্নায় বসে মিতে, যতীনদা, শিবেনদার সঙ্গে আড্ডা দিলুম।

গোপালনগর থেকে প্রতিদিন মাঠের পথ ধরে যাতায়াত করি। আউস ধানের ক্ষেতে বড় বড় ধানের সবুজ গোছা, গাছের মাথায় মাকাল লতার বড় ঝোপ, পাখীর ডাক—এ সবের মধ্যে দিয়ে বিকেলে স্কুল থেকে ফিরি। সেদিন মেঘমেদুর সন্ধ্যায় নদীর জলে গা ধুতে নেমেছি, সন্ধ্যার বেশি দেরি নেই, কুটির দিকে চেয়ে দেখি যতদূর চোখ যায়, মেঘলা আকাশ নেমে উবুড় হয়ে রয়েচে সবুজ মাঠের ওপরে।

কিন্তু যে দৃশ্যটা আমায় মুগ্ধ করলে, সেটা হচ্চে এই—সাঁইবাবলা গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকী পোকা জ্বলচে নিবচে। তখনও রাতের অন্ধকার নেমে আসেনি, অথচ জোনাকির হুল থেকে বেশ আলো ফুটেচে। সে যে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ভগবানের হাতের শিল্প, আইডিয়ারূপী ব্রহ্মের প্রকাশ এর প্রতি রেণুতে রেণুতে...এ সত্যি দেখবার মত জিনিস। কতক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলুম। আজ পাড়াগাঁয়ের অখ্যাত, নিভৃত কোণে, এই মেঘভরা বাদল সন্ধ্যায় এত বড় সৌন্দর্য্য কারও দেখবার অপেক্ষা রাখচে না। এ আপনাতে আপনি মহান। এ জানিয়ে দেয় যে বিশ্বশিল্পীর চিত্রের পটভূমি হিসেবে বিশ্বের সকল স্থানই মহিমময় পবিত্র,—তাঁর নীরব বাণী এদের বাতাসে, ধূলিতে, পত্রের মর্ম্মরে, এই জোনাকী পোকাগুলোর জ্বলন্ত নিবন্ত আলোক-পুঞ্জে।...

সেই বারাকপুরের মেঘমেদুর দিনগুলি। বড় ভাল লাগে এরকম দিন। ঝোপে ঝোপে মটর লতার থোলো থোলো বুনো আঙুরের মত মটরফুল ঝুলচে। ওপাড়ার ঘাটে ঘোলা নদীজল যেখানে তীরের ঘাসবন ছুঁয়েচে, সেখানে এমনি এক ঝোপে কি সুন্দর সাদা সাদা ঈষৎ সুগন্ধ ফুল ফুটে আছে, তার পাশেই সেই মটর ফল দুলচে। কয়েকদিন ধরে সকালে ওপাড়ার ঘাটে বেড়াতে যাই খুব ভোরে। রোজ সকালে সেই ফুলে-ভর্ত্তি ঝোপটির সামনে দাঁড়িয়ে ওপারের সবুজ ধানের ক্ষেতের দিকে চেয়ে থাকি। ভগবানের আবির্ভাব এই নব প্রভাতের সজল বর্ষাশ্যামল বনানিকুঞ্জে, ঐ দূরবিস্তৃত বননীল দিগন্তের মেঘলা সকালে শাখায় শাখায় বনবিহংগের কলকাকলীতে।

কলকাতায় মেসে থেকে যখন চাকুরি করি স্কুলে, তখন সুদীর্ঘ তেরো বছরের মধ্যে এই সব দিনে বারাকপুরের বর্ষাসিক্ত বনঝোপের বিরহ আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠতো। বাল্যে কত খেলা করেছি আমি, কালী, ভরত, কচা এই বনতলে ঝোপের ছায়ায় ছায়ায়। কত কি পাখীর গান শুনেছি। কত পাকা মাকালফল তুলে এনেছি উত্তর মাঠের বন থেকে,—শাঁখারিপুকুরের ধারের গাছপালায় ওপরে-ওঠা মাকাললতা থেকে—মনে হোত সেই রহস্যময় বিচিত্র বাল্য মনোভাব, সেই ঝোপের তলায় বেড়ানো, তখন বোধ হয় বনপরীরা সংগে নিয়ে খেলে বেড়াতো—বুঝতাম না সংসারের কিছু, বুঝতাম শুধু তেলাকুচোর ফুল, বনকলমীর ফুলের বাহার হয়েচে কোন ঝোপে, কোথায় টুকটুকে মাকাল ফল ঝুলচে কোন গাছে—এই সব। বনপরীদের সংগী ছিলাম তখন। মনে এতটুকু ধুলো মাটি লাগেনি সংসারের। কি অপূর্ব্ব আনন্দে মন মেতে উঠতো যখন দেখতাম গাছে থোলো থোলো পটপটির ফল ফলে আছে। এ সব ফল খাওয়া যায় না, পাখীরও অখাদ্য কোনো কোনো ফল। সুতরাং রসনা তৃপ্তির লোভ নয়—এ সব ফলে খেলা হয় এইটেই ছিল তখন বড় কথা। দেখতে ভাল লাগে এইটেই ছিল বড় আনন্দের উৎস। খেলা আর আনন্দ। লীলাই সবচেয়ে বড় কথা। শেকস্‌পীয়র বুঝেছিলেন, তাই বলেচেন, "The play is the thing." play! লীলা, খেলা। সংসারে শাশ্বত মানবাত্মার লীলাভূমি। এখানে তারা আসেনি ঘরবাড়ী বানাতে, আসেনি ব্যাংকে অর্থ জমাতে, আসেনি রায়বাহাদুর হয়ে, 'স্যার' হয়ে মোটর চড়ে বড় ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর হতে। ওসব তাদের মনের ভুল, মায়া অথবা মোহ। নিজের রূপটি ভুলে যায় তাই ওসব করে।

তারপর যা বলছিলুম। ওই সব বাল্যসংগী, বনানিকুঞ্জ, ফুলফল, নদীতীরের সাঁইবাবলা ও কুঁচলতার ঝোপ, সূর্য্যাস্তের আভা-পড়া বেলেডাঙার মরগাঙ, বিলের টলটলে জল—এদের ছেড়ে কলকাতার অপকৃষ্ট এঁদো-পড়া মেসবাড়ীর নোংরা ঘরে বিদ্যার্জ্জন ও চাকুরির জন্যে বাস করে কি কষ্টই না পেতুম। মনপ্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো। ভাবতাম, এমন দিন কি কখনো আসবে না যখন আবার দেশে ফিরে যাবো? গ্রামে বর্ষাকাল কখনো কাটাইনি। বাল্যদিনের পরে চিরকালই স্কুল বোর্ডিংয়ে, কলেজ হোস্টেলে ও মেসে কাটচে ১৯১২ সালের পর থেকে। কখনো কি আবার ঢল-নামা বর্ষায় ইছামতীর ধারে কালো বনসিমলতার ঝোপের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসবো না মনের আনন্দে, আর কি কখনো শুনবো না কুঞ্জে কুঞ্জে পত্রমর্ম্মর, গাঙশালিক ও কুকো পাখীর ডাক, বাঁশঝাড়ে জড়াপটি পাকানো বাঁশের কট্‌কট্‌ শব্দ?

এতকাল পরে সে স্বপ্ন আবার সার্থক হয়েচে, ফিরে পেয়েছি বাল্যকালের সেই বর্ষাসজল, শ্যামল দিনরাতের স্বপ্ন...স্বপ্ন...! আজও তেমনি মটরলতা ঝোলে ইছামতীর

তীরের বনে বনে, তেমনি পাখি ডাকে, তেমনি সুবাস বেরোয় নাটাকাঁটার হলুদ রংয়ের ফুলের থোকায় থোকায়। বিশ্বের অধিদেবতা যেমন সত্যি এরাও তেমনি সত্যি, শাশ্বত সুন্দর। মরে না, ঋতুতে ঋতুতে পুনরাবর্ত্তিত হয়, নবরূপে ফিরে আসে—যুগ যুগ ধরে চলেচে ওদেরও লীলা।

"The play is the thing..."

ইচ্ছে আছে এবার একটা বইয়ে হাত দেবো—নাম দেবো তার 'ইছামতী'। বড় উপন্যাস। তাতে থাকবে ইছামতীর ধারের গ্রামগুলির অপূর্ব্ব জীবন-প্রবাহের ইতিহাস—বনানিকুঞ্জের মরাবাঁচার ইতিহাস, কত সূর্য্যোদয়, কত সূর্য্যাস্তের নিষ্কিঞ্চন, শান্ত ইতিহাস।

কালই জন্মাষ্টমীর ছুটিতে কলকাতায় গিয়েছিলুম, অতুলকৃষ্ণ কুমার মহাশয়ের মোটরে কাল সারা সকাল ঘুরে বেড়িয়েছি। বাণী রায়দের বাড়ী গেলুম, দেবেন ঘোষ রোডের মেস থেকে পুত্র-শোকাতুর ভদ্রলোকটিকে নিয়ে মোটরে করে দু-এক জায়গায় ঘুরলুম। কলকাতায় বেশিদিন আর থাকতে পারিনে—ভাল লাগে না।

সজনী দাস এখানে নেই, ভাগলপুরে গিয়েচে বেড়াতে।

কাল স্কুল থেকে ফিরলুম মাঠের পথ দিয়ে। কি কালো নিবিড়কৃষ্ণ মেঘ করেচে সেই অপূর্ব্ব ঝোপটির পেছনে মুচিপাড়ার দিকের আকাশে। একটা তেলাকুচো পাতার মস্ত বড় সবুজ ঝোপ আছে এ মাঠে। মস্ত তেঁতুল গাছ বেয়ে ঝোপটা উঠে গাছের মাথা ঢেকে দিয়েচে ঘন সবুজ উত্তরচ্ছদে।

আমি যখনই এপথে স্কুলে যাই, তখন দেখি এই ঝোপটা। মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি একদিন এই ঝোপের মাথাটা সাদা সাদা ফুলে ভরে দিও, আমি দুবেলা স্কুলে যাওয়া আসার পথে দেখতে দেখতে যাবো। কি সুন্দর দেখাবে তখন, ভাবলেও আনন্দ হয়। কাল কোথায় যেন দেখলুম রেললাইনের ধারে কোন ঝোপে বনকলমী ফুল ফুটেচে। কিন্তু আমাদের গ্রামের মধ্যে যে যে ঝোপে বনে বন-কলমীর ফুল ফোটে সেখানে গিয়ে দেখেচি, কোথাও ফোটেনি। এই শ্রাবণের শেষের দিকেই কিন্তু ও ফুল ফোটে।

আজ দেখি একটা বনবিড়াল ঝোপের তলা দিয়ে কালু মোড়লের ধানক্ষেতের দিকে যাচ্চে। বেশ বড় বনবিড়াল, লেজের দিকটা ডোরা কাটা। আমি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম, একদৃষ্টে দেখতে লাগলুম, সাড়া পেলেই লেজ তুলে এখুনি দৌড় দেবে। মিনিট খানেক পরে দিলেও তাই, কি করে আমার উপস্থিতি অনুভব করতে পেরেচে। একদৌড়ে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হোল।

বাড়ী এসে চা খেয়ে মেঘলা বিকেলে বাঁশবনের দিকে বারান্দায় ইজি-চেয়ার পেতে আরাম করে বসে প্রিস্ট্লির 'Good Companions' পড়ি। কয়েক পাতা পড়তে না পড়তে বৃষ্টি বলে আর কোথায় আছি। সেই যে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নামলো, চললো সারারাত।

আজ খুব ভোরে কল্যাণী ও আমি বৃষ্টির মধ্যে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম। শ্রাবণ মাসের ঘন বর্ষার প্রাতঃকাল, সে কি শোভা হয়েচে উত্তর মাঠে, কি কালো কালো মেঘ বড় শিমুল গাছটার মাথায়, মাঠ ভরে গিয়েচে বৃষ্টির জলে, মাঠের ধারের ঝোপে ঝোপে নাকজোঁয়াল ফুল (gladislasily) ফুটে আলো করে আছে। এই বর্ষা-ভেজা হাওয়ায় মুক্তির স্বপ্নলোকে মন উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে...যে মুক্তি মেলে এমনি মেঘ-কজ্জল শ্রাবণদিনে টুপটাপ জল-ঝরা ছাতিম বনে, নটকান ফুলের বনে, পাপিয়ার ডাকে

দোয়েলের ডাকে। (আজ ভোরে যখন শুয়ে আছি বিছানায়, কি চমৎকার পাপিয়া ডাকছিল!) সেই বৃষ্টির এক হাঁটু জলে আকাশ-ভরা কালো মেঘের তলে দাঁড়িয়ে মনে হোল ঋষিদের সেই পবিত্র গাথাঃ—

সৃজিয়া বিশ্ব করিয়া পালন প্রলয়ে ন্যাশেন যিনি
শোভনা বুদ্ধি আমা সবাকার প্রদান করুন তিনি।

ছুটির দিনটা। সারাদিন বৃষ্টি হয়নি। হাজারী জেলেনী সকালে টাটকা রিটে মাছ দিয়ে গেল গাঙের। এখন ঘোলা জলে অনেক মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেলে মাছ আর চিংড়িই বেশি। রিটে মাছ খুব তেলালো সুস্বাদু মাছ, ইছামতী ছাড়া অন্য কোন নদীতে বড় একটা পাওয়া যায় না। দেড় টাকা সের। যুদ্ধের আগে যে মাছ ছিল পাঁচ আনা সের, এখন তাই দেড় টাকায় পাওয়া ভার। কল্যাণী কাঁচা মাছ তেল-ঝোল করে বড় চমৎকার। আজও তাই করলে, আর ঢেঁড়স ভাতে। সাড়ে বারোটার সময়ে কল্যাণী ও আমি নদীতে স্নান করতে নামলাম। কি সুন্দর মাকাল লতার ঝোপটা জলের ধারে। নাটাকাঁটার একটা সুগন্ধি ফুল তুলে কল্যাণীর হাতে দিলুম, ও খোঁপায় গুঁজলে।

বিকেলে হাবু ও ফুচুকে নিয়ে অপূর্ব্ব রঙীন আকাশের তলায় বাঁওড়ের ধারের বট অশথ গাছের ছায়ায় ছায়ার চলে গেলুম মরগাঙে। অনেকদিন এদিকে আসিনি। পথে পথে সবুজ ঝোপঝাপের কি ভরপুর সৌন্দর্য্য। বাঁওড়ে জল বেড়েচে অনেক, ডাঙার কাছে জলিধানের ক্ষেতে বকের দল চরচে, ওপারের অস্তদিগন্তের পটভূমিতে পাটক্ষেতে চাষারা পাট কাটচে, কোথাও কোথাও জলিধান কাটচে, মাড়ল গাজিপুরের কাওরারা শূওয়ের পাল চরিয়ে বেড়াচ্চে বাঁওড়ের কাঁদায় কাঁদায় (কাঁদা = তীর) শূওরের পাল মাটি খুঁড়ে মুথো ঘাস তুলে খাচ্চে, টাটকা মুথো ঘাসের শেকড়ের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

মরগাঙের ধারে গিয়ে দেখি ফণিকাকা ইন্দু রায় মাছ ধরে ফিরচে। আমরা বল্লাম, কি পেলে? ওরা ভাঁড় দেখালে। কিছুই পায়নি। কাঠের বড় কষ্ট হয়েচে, আমি এক বোঝা শুকনো কাঠ কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করলাম। শুকনো বটের ডাল, ষাঁড়ার ডাল, তিত্তিরাজের ডাল। কুঠির মাঠের পথে এসে নিবারণের বেগুন ক্ষেতের নীচে নদীতে স্নান করতে নামলুম। মাধবপুরের চরের ওপর আকাশের কি অদ্ভুত ইন্দ্রনীল রং! তারই পটভূমিতে বড় একটা শিমূল গাছ, কাশবন, আউশ ধানের ক্ষেত মায়াময় দেখাচ্চে। নদীজলে সেই অদ্ভুত নীল রংয়ের প্রতিচ্ছায়া।

চাটগাঁ থেকে রেণুর পত্র পেয়েছি কাল। ওর সঙ্গে যোগ এতদিন পরেও ঠিক বজায় আছে। কোথায় চলে গিয়েচে খুকু, কোথায় সুপ্রভা।

দুদিন মোটে বৃষ্টি নেই। খরতর রোদে পুড়ছি। কাল বহুকাল পরে নদীর ধারে পুরনো পটপটি তলায় বেড়াতে গিয়ে জলে নেবে কলমীশাক তুলে আনলুম। আমার বাল্যকালে এখানে সায়ের ছিল, আইনদ্দি কয়াল ধান মাপতো। তারপর বহু-দিন মনু রায় এ জমি বন্দোবস্ত নিয়ে পটলের ক্ষেত করে। নদীর বাঁকের এ জমির সে অপূর্ব্ব শোভা নষ্ট করেচে, বাল্যের সে মটরলতা দোলানো শোভাময় ঝোপঝাপ, সে নিভৃত স্বপ্নভরা লতাবিতান কুড়ুলের মুখে অন্তর্হিত হয়েচে বহুকাল, কেন? না, মনু রায় বা তার পুত্রপরিবার পটল ভাজা খাবে। এখন আর সে পটলের ক্ষেত নেই। তাই বেড়াতে গিয়েছিলাম। নদীর ধারে (একটা ছোট বিছে যাচ্চে, দেওয়াল বেয়ে

উঠচে, কেন ওটা মারবো ?) গিয়ে দাঁড়াই। ওপারে পাটকিলে ও খাঁটি সিঁদুরে রঙের মেঘের ছটা ঠিক সূর্য্যকিরণের ছটার মত অর্দ্ধেক আকাশ জুড়ে বিরাজ করচে। যেন কোনো বিরাট পুরুষ অনন্ত, অসীম বিরাট বাহু প্রসারিত করে সারা ব্যোম ছেয়েচেন। সেই অনাদ্যন্ত বিরাট পুরুষ যেমনি ঐ ক্ষুদ্র পুষ্পিত লতার মধ্যে প্রাণরূপী, তেমনি আবার ধারণাতীত বিরাটত্বের, বিশালত্বের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। তেঁতুল-তলার ঘাটে নদীর দিকের ঝোপটাতে সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল দুলচে, মটরলতায় ফলের থোলো ঝুলচে—শ্রীঅরবিন্দের কথায় "সচ্চিদানন্দ যেমন বল্মীকস্তূপে তেমনি সূর্য্যমণ্ডলে"। 'সূর্য্যমণ্ডলে' কথাটা তিনি বলেন নি, বলেচেন "in the system of suns" অর্থাৎ বহু বিরাট সূর্য্যাকার নক্ষত্রসমূহ-দ্বারা গ্রথিত বিশ্বে।

মুক্তি! মুক্তি! মনের মুক্তি! আত্মার মুক্তি। এই সন্ধ্যায় সীমাহীন আকাশের দিগন্তলীন অভ্র-বাহু যে দেবতার ছবি মনে আনে, তিনি আর তাঁর এই শ্যামল বর্ষাপুষ্ট বনকুঞ্জ সুবাসিত লতাপুষ্প মুক্তি দিতে সমর্থ। কিন্তু মুক্তি নিচ্চে কে ? সবাই তুচ্ছ জিনিস নিয়ে ব্যস্ত। হে বন্ধ জীব, সন্ধ্যার আকাশতলে দাঁড়িয়ে সেই পরিপূর্ণ, অবাধ সেই মুক্তির বাণী শ্রবণ কর। একমুহূর্ত্তে বন্ধতা ছুটে যাবে, (অর্থাৎ দূরে যাবে) অমরত্ব নেমে আসবে প্রাণে মনে।

কাল রাত্রের ভীষণ গুমট গরমের পরে আজ নদীতে নামলুম স্নান করতে। অমনি ওপারের চরের দিকে চেয়ে দেখি নবনীল নীরদপুঞ্জ দিগন্তের নিচে থেকে ঠেলে উঠে ঝড়ের বেগে উড়ে আসচে এপারের দিকে, ভগবানের স্নিগ্ধ করুণার মতো। কেউ কি দেখেচে এমন কাজল কালো মেঘের সজল অভিযান, ঘন মেঘমালার এলোমেলো আলু-থালু হয়ে উড়ে আসার এ অপূর্ব্ব দৃশ্য ? আমার মনে পড়লো ভাগলপুরের আজমাবাদ কাছারিতে এই ভাদ্র মাসেই আমি একবার এ দৃশ্য দেখেছিলাম, সেও এই রকম সকালবেলা। বেনোয়ারী মণ্ডল পটোয়ারিকে ডেকে তাড়াতাড়ি দেখালাম সে দৃশ্য। আর কাকে দেখাই ? সেখানে আর কেউ ছিল না। বেনোয়ারী মণ্ডলকে প্রকৃতি-রসিক বলে আমি ডাকিনি, কাউকে ডেকে ভালো জিনিসের ভাগ দেবো বলেই ডেকেছিলাম, মনে আছে বেনোয়ারী উড়ন্ত মেঘপুঞ্জের দিকে খানিকটা চেয়ে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে বল্লে—হ্যাঁ, বাবুজি, আচ্ছা হ্যায়। এইমাত্র সংক্ষিপ্ত comment করে সে এই বাতুল বাংগালী বাবুর পাশ কাটিয়ে কাছারি ঘরে খতিয়ান লিখতে ঢুকলো।

আজ কেন ওই মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে আমার চোখে জল এল তা কে বলবে ? ভগবানের কথা মনে করেই চোখে জল এল কি ? তাঁর অসীম দয়ার কথা স্মরণ করেই কি ?

হয়তো হবে...

কিন্তু এ সম্পূর্ণ অকারণ। আমি কি জানি নে এমন খর, ঊষর মরুভূমির দেশের কথা যেখানে মাসের পর মাস কেটে যায় ১২০°।১২৫.০° ডিগ্রী উত্তাপের মধ্যে, যেখানে এক বিন্দু বারিপাতের সুদূর সম্ভাবনাও থাকে না।

তবু ভগবানের দান, ভগবানের দান। সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব দেশে তাঁর অসীম করুণার দানকে যেন মাথা পেতে নিতে পারি। প্রাকৃতিক কারণে মেঘ সঞ্চিত হয়েচে আকাশে, উড়ে আসচে ঊর্দ্ধস্তরের বায়ুস্রোতে—এর মধ্যে 'ভগবানের দান' কি আবার রে বাপু ? যতো সব সেণ্টিমেণ্টাল ন্যাকামি।

হে অনন্ত, হে অসীম, হে দয়াল তোমার বহু দূত, বিশ্বের সব দেশে কত চর—

সব কিছুর পেছনে তোমার প্রকাশ, তোমার মহান অভ্যুদয়—এ সত্যকে যেন না ভুলি। সব রকম দানকে যেন তোমার হাতের অমৃত পরিবেশন বলে মেনে নিতে পারি।

আজ সকালে উঠলাম। মনে খুব আনন্দ। হয়তো বা শহরে রোদ ফুটবে খুব। পটপটি তলার সায়েরে গেলুম নদীর ধারে, পূর্ব্বদিকে সামান্য কিছু মেঘ, আকাশ মোটামুটি বেশ পরিষ্কার। ওপাড়ার ঘাটে মুখ ধুয়ে ওপারের শোভা দেখি একমনে। সেই সাঁইবাবলা গাছ থেকে মটরলতা দুলচে, সেই সাদা ফুলে ভরা লতায় কিছু কিছু ফুল এখনও দেখা যাচ্চে। একটা নৌকো এসে লেগেচে—ছইওয়ালা নৌকো।

বল্লাম—কোথাকার নৌকো গো?

—আজ্ঞে বাবু, বাজিতপুরের।

—সে কোথায়?

—মাজদে'র সন্নিকটে।

—কি কিনবে?

—কাপড় কিনতে এসেচি গোপালনগরের বাজারে।

—কবে সেখান গিয়ে পেঁাছোবে?

—আজ বেলা বারোটায় ছাড়লে কাল সন্দের সময় নৌকো আমাদের ঘাটে লাগবে।

বাড়ী আসতেই বৃষ্টি নামলো। সে কি ঝমঝম্ বৃষ্টি! দুটি ঘণ্টা ধরে এক-ঘেয়ে অবিরাম ভন্না বৃষ্টি! 'ভন্না' মানে অবিরাম মুষলধারে বৃষ্টি। হরিবোলার ছেলে নীলু এল একটা পাকা তাল নিয়ে। বেশ সুন্দর তালটা। হাবু বসে 'ঊর্ম্মি-মুখর' পড়তে লাগলো। নীলু পড়তে লাগলো 'পথের পাঁচালী'।

আজ ওবেলা কলকাতায় যেতুম ১১টার ট্রেনে। কিন্তু যে বৃষ্টি। তা ছাড়া গুরুদাস ঘোষের ছেলের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে দুপুরে। সে বিশেষ করে ধরেচে, না গেলে চলবে না।

কল্যাণী চিঁড়ে দই আমসত্ব দিয়ে কলা দিয়ে ফলার মেখে নিয়ে এল। এর যা আস্বাদ, কলকাতায় এ রকম পাওয়া যাবে না। ঘরের পাতা দইও নেই সেখানে। টাটকা চিঁড়েও পাওয়া যায় না সেখানে। এখানে গোলার ধানের চিঁড়ে, যত ইচ্ছে খাও।

কাল বিকেলে চারটার সময় উড়ে-আসা নীল মেঘের কোলে কোলে সাদা মেঘ-খণ্ডের দৃশ্য আর তার নিচে মেঘের ছায়ায় কালো গোপালনগরের বাঁওড়ের দৃশ্য আমায় একেবারে মুগ্ধ করেছিল। তারপর কাল রাত্রি থেকে নেমেছে ভীষণ বৃষ্টি। সারারাত ঘুমের মাঝে ফাঁকে ফাঁকে শুনেচি ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়চে...পড়চে। আজ সকালে ওপাড়ার ঘাটে বেড়িয়ে এলাম—মনু রায়ের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে। সর্ব্বত্র জল আর জল —খানা, ডোবা, বিল, বাঁওড় জলে থৈ থৈ করচে। ইছামতী কূলে কূলে ভরা, সেই লতাটাতে সাদা সাদা ফুল ফুটেচে—ভরপুর বর্ষার দৃশ্য! কতকাল দেখিনি এসব, এই বর্ষণমুখর মেঘান্ধকার প্রভাতে ওপারের জলে-ভেজা নলখাগড়া বন, বন্যেবুড়োর বন, কতকাল দেখিনি বর্ষা-প্রভাতে ভাদ্র মাসের ইছামতীর কূলে কূলে ভরা অপরূপ রূপ! তার বদলে দেখে এসেচি মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের বাড়ীর তেতলা থেকে নিচের রাস্তার একহাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে পাঁউরুটিওয়ালা ভোরে অদ্ভুত সুর করতে করতে চলেছে। "এক এক পয়সার রুটি লেও, দু' দু' পয়সার রুটি লেও—বোম্বাইয়ের রুটি লেও, বোম্বাইয়ের রুটি!" জল ছিটিয়ে বাস চলেচে একহাঁটু জলের মধ্যে, যেন স্টীমার

চলেচে জলের মধ্যে দিয়ে। সারি সারি ট্রাম মৌলালির মোড়ে আটকে আছে...কিংবা সারারাত্রি বৃষ্টির দরুন ট্রাম বেরোয়নি।...বাবুরা প্রাণের দায়ে আপিসে চলেচেন জুতো-জোড়া খবরের কাগজে মুড়ে বগলে নিয়ে হাঁটুর কাপড় তুলে...ট্রামে বাসে জানালা বন্ধ, লোকজন বাদুড়ঝোলা হয়ে চলেচে, ভেতরে বাইরে অসম্ভব ভিড়। বহুক্ষণ ধরে দেখে দেখে ও দৃশ্য চোখ ক্লান্ত হয়ে গিয়েচে...আর ভাল লাগে না ওসব। এমন ভাদ্র মাসের মেঘ-কালো প্রভাত তার ভরা নদীজল ও বৃষ্টিস্নাত সাঁইবাবলার ও মাকাললতার ঝোপ এবং চরের নলখাগড়ার বন নিয়ে অক্ষয় হয়ে থাকে জীবনে, মির্জ্জাপুর স্ট্রীটের ফিরিওয়ালা জলে ভিজে যত খুশি 'বোম্বাইয়ের রুটি' বিক্রি করুক গে।

ঠিক আজ তেমনি প্রভাত—তেমনি মেঘান্ধকার, শীতল, বর্ষণমুখর ভাদ্রের প্রভাত। ৭টা বেজেচে অথচ আমি ভাল করে খাতায় লেখা দেখতে পাচ্ছি নে আধ অন্ধকারে। যেমন কতকাল আগে আজমাবাদ কাছারীতে আমি সেই নকছেদী ভকতের দেওয়া বেল-ফুলের ঝাড়ের পাশের চেয়ারে বসে 'পথের পাঁচালী' লিখতাম, মুহুরী গোষ্ঠবাবু বসে হিসেব বোঝাতো, উত্তর বিহারের বন্যার জলে-ডোবা মকাইয়ের ক্ষেত আর কাশবন —সেই উদ্দাম ঘোড়ায় চড়া, সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের নীল দৃশ্য, সেই দিগন্তলীন মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট—সেই সব দূর অতীতের ছবি আজকার দিনে মনে জাগে। সে হোল আজ আঠারো বছর আগের কথা, মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে আঠারো বছর—কত কাল!

কিন্তু এ দিনে আর একটি অদ্ভুত স্মৃতি জড়ানো আছে জীবনে। ১২ই ভাদ্র সেবার ছিল জন্মাষ্টমী, মনে পড়ে? মনে পড়ে সেই আকুল আগ্রহে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা, সেই মাটির প্রদীপ হাতে একটি কিশোরীর ছবি খড়ের ঘরের দাওয়ায়? নাঃ —এসব কথা মনের গভীর গহনে সুগোপনেই থাকুক, এখানে লিখবো না কিছু।

শুধু সেই অপূর্ব্ব দিনটির স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকার এই ক'টি কথা লিখে রাখলাম।

পুরীতে যে মেয়েটি এই খাতাখানি আমায় দিয়েছিল আজ ঘন সারেণ্ডা অরণ্যের মধ্যে বসে তার সে খাতাটিতে লিখচি। আজ ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সাল। বেশ শীত, থলকোবাদ বনবিভাগের বাংলোতে বসে আছি, আগুন জ্বলছে ঘরে। আজ সকালে মোটরে মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে নুরাগাঁও গিয়েছিলাম। পথে পড়লো জাটিসিরিং বলে একটা অপূর্ব্ব সুন্দর জায়গা, কোইনা নদীর গর্ভে। তিন বৎসর আগে জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে এসেছিলুম, এমনি শীতের দিনে, রাত ১০টার পরে। এখানে বসে কিছু লিখেছিলুম মনে আছে। চারিদিকে ঘন অরণ্যভূমি, সামনে কেউন্‌ঝর স্টেটের পাহাড় ও বন, পেছনে বোনাইগড়ের বন, প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল ব্যাপী বন অরণ্য ঘিরে রেখেচে আমাদের।

বড়দিনের ছুটিতে এখানে বেড়াতে এসেছি। মনোহরপুরের পাহাড়ের ওপর যে সুন্দর বাংলোটি আছে বনবিভাগের, সেখানে ছিলাম দুদিন। তারপর এলুম এখানে। নির্জ্জন বনপথে সেবার যেখানে বনমুরগী দেখেছিলাম, এবারও সেখানে সন্ধ্যার আগে বনমুরগী দেখা গেল। বাড়ীর পাশে চরে বেড়াচ্ছিল, মোটরের শব্দ শুনে উড়ে গেল। থলকোবাদ আসবার কিছু আগে বন্য ময়ূর দেখলাম, রাস্তার এ পারের বন থেকে ওপারের বনে ঢুকলো। আবার সেই থলকোবাদ বাংলো! সেই অরণ্যের সুগন্ধ, সেই নির্জ্জনতা।

কাল বাবুডেরা ও বলিবা থেকে ফিরবার পথে এই নির্জ্জনতা আমার বুকে এত বেশি যেন একটা গুরুভারের মত চেপে ধরছিল। শুধুই গাছ আর বন, আর লতা আর পাথর, আর পাহাড়। লোক নেই, জন নেই, লোকালয় নেই। আমি এখানে কতদিন একা থাকতে পারি? যদি ধরো বাবুডেরার পথে সেই পাহাড়টার ওপরকার তৃণভূমিতে, যেখানে মাদুর পেতে বসে আমি আর সিন্‌হা দুঘণ্টা গল্প করলুম ও লিখলুম—সেখানে আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কিছুদিন থাকতে হয়, একটিও মানুষের মুখ না দেখে, একজনেব সঙ্গেও একটি কথা না বলে? শুধু অন্ধকার বা আধ-জ্যোৎস্না রাত্রে মাথার ওপরকার আকাশে দেখবো পরিচিত কালপুরুষ বা সপ্তর্ষি নক্ষত্র-মণ্ডল, তাদের চারি পাশে ছড়িয়ে আছে অগণ্য তারা, আর নিচে আমার সামনে, পিছনে অন্ধকারাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্যের সীমারেখা, ক্বচিৎ বা শুনবো বন্য হস্তির বৃংহিত-ধ্বনি, বন্য কুকুরের ডাক, কখনো বা কোৎরার (barking deer) বিকট চীৎকার।

ওপরে বিরাট নীচেও বিরাট। ওপরে, নীচে, তোমার চারিপাশে বিরাটের গম্ভীর মূর্ত্তি থম্ থম্ করছে। বাংলা দেশের মাঠে মাঠে এ সময়ে ফুটেচে বনধুঁধুলের হল্‌দে ফুল, ছোট এড়াঞ্চির সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল—সেগুলো মিষ্টি, চমৎকার লিরিক কবিতা। মনকে মুগ্ধ করে, আনন্দ দেয়। এখানে প্রকৃতি এপিক কাব্য লিখে রেখেচে গম্ভীর অরণ্যাবৃত শৈলশিখরে, লোহপ্রস্তর দিয়ে বাঁধানো নদীকূলে, তারা-ভরা বিশাল আকাশপটে, বন্যজন্তু-অধ্যুষিত আরণ্য অন্ধকারে। সে গম্ভীর এপিক কাব্য সকলের জন্যে নয়—কাল রাত দুটোর সময় বাংলোর বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে সামনের অন্ধকারাচ্ছন্ন নিস্তব্ধ বনানী ও শৈলমালার দিকে তাকিয়ে দেখেছি—সে দৃশ্য সহ্য করতে পারা যায় না—মনকে স্তব্ধ করে, অভিভূত করে, ভয় এনে দেয়। বিরাটের উপাসনা সকলের জন্যে নয়, বাংলার পল্লীপ্রকৃতি যেখানে ঠুংরি এখানে তা চৌতালের ধ্রুপদ—সকলের জন্যে নয় এ সব।

ওই বন ওদিকে পাথর বাৎনী, জেরাইকেলা থেকে আরম্ভ করে এদিকে ঝিনডুং, লোরো কোদালিবাদ, ধরমপকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি ঘন বন, কত মোটা মোটা শাল গাছ কোথায় কোন্ শূন্যে উঠেচে—কলের চিমনির মত। ১৫০।২০০ বছরের প্রাচীন বনস্পতি। এসব অঞ্চলে যখন সভ্য মানুষে পদার্পণ করেনি, রেল হয়নি, মোটর ছিল না, পথঘাট তৈরি হয়নি—তখন এই সব বনস্পতি ঘন বনের মধ্যে ধীরে ধীরে বেড়ে রঙ্গনগাঢ়ার পথের ধারে যে বিশাল শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যার তলায় শাদ-রলা। আমার মায়ের যেদিন বিয়ে হয়েছিল সেদিনটিতে এই গাছ এত বড়ই ছিল। এই সব ভেবে আমার মনে যে কি আনন্দ পাই, থলকোবাদ গ্রামের পাশে বোনাইগড় আর রঙ্গনাগাঢ়ার পথের ধারে যে বিশাল শালবৃক্ষটি আজ সন্ধ্যায় দেখলুম যার তলায় শাদ-বেড়ার সেই গাড়োয়ান ক'টি ভাত আর কচু দিয়ে কলাইয়ের ডাল রেঁধে খাচ্ছিল।—দণ্ডের পর দণ্ড আমি ঐ গাছটির দিকে চেয়ে এই রকম চিন্তায় মশগুল হয়ে আপন-হারা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকতে পারি।

ইসমাইলপুর দিবরার খড়ের কাছারিঘর থেকে বার হয়ে এমনি শীতের রাত্রে হঠাৎ বাইরে গিয়ে দাঁড়াতুম মনে পড়ে। সেখানেও ছিল সামনে পিছনে নির্জ্জন বনভূমি আর ছিল সে কি ভীষণ শীত। হাতের আঙুলগুলো জমে ঠাণ্ডা হয়ে যেতো—এত কাল পরে আবার এই ক'দিন সেই হারানো অনুভূতিগুলো ফিরিয়ে পাই রোজ রাত্রে। সেই নির্জ্জন, অন্ধকার আরণ্য-ভূমি, সেই ভীষণ শীত, সেই সীমাহীন বিরাটের মুখো-মুখি হওয়া, সেই স্তব্ধ ও মৌন বিস্ময়-ভরা আনন্দ! জয় হোক সে বিশ্বদেবতার যিনি আমাকে আবার এখানে এনেচেন!

ক'দিন থেকে বন্যহস্তীর উপদ্রবে এখানকার আরাকুসি অর্থাৎ কাঠচেরাইয়ের কুলীরা বড় বিব্রত হয়ে পড়েচে। কাল সন্ধ্যায় বনতুলসীর শুকনো জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পাহাড়ের ওপরের একটা ঝর্ণা পার হয়ে বোনাইগড়ের পথে এদের কাছে গিয়েছিলাম। একটা বিশাল শাল গাছের তলায় এরা বসে ডাল রান্না করছিল ঘটিতে। ভাত আগেই রান্না হয়ে গিয়েছিল। চারিধারে নিৰ্জ্জন জঙ্গল। ভীষণ শীত।

জিজ্ঞেস করলাম—কি নাম? কোথা থেকে আসচো?

ওরা বাংলা বোঝে না। হো ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার ক্রিয়াপদ মিলিয়ে এদের কথ্য ভাষা। যা বল্লে, তার মানে এই যে তারা গাড়োয়ান, কাঠ বইবার জন্যে যদি গাড়ীর দরকার হয়, সেজন্যে জঙ্গলে কাজ খুঁজতে এসেচে।

সঙ্গে ওদের দেখলুম শুধু একখানা করে খেজুর পাতার বোনা চেটাই, একখানা পাত্‌লা রেজাই, একটা হাঁড়ি আর একটা ঘটি।

জিজ্ঞেস করলাম—কোথায় শোবে রাত্রে?

—এইখানে। গাছতলায়।

—হাতীর ভয় আছে এখানে জানো? কাল রাত্রে আরাকুসিদের বড় বিব্রত করেচে।

—আগুন আছে বাবু।

—আগুন তো আরাকুসিদেরও ছিল, বুনো হাতী আগুন মানেনি। দাঁত দিয়ে ও-বছর একটা লোককে গিঁথে ফেলেছিল মাটির সঙ্গে। সাবধানে থাকাই ভালো।

—না বাবু, হাতীর ভয় করলে আমাদের চলবে না। কোথায় যাবো বাবু?

—এই ভীষণ শীতে শোবে এই গাছতলায়!

—আমরা চিরকালই তাই করি। আগুনের ধারে শুলে শীত লাগবে না।

এরা কিছুই গ্রাহ্য করে না, না বুনো হাতী, না এই দুর্দ্দান্ত শীত, না এই অন্ধকারে আরণ্যরজনীর নিৰ্জ্জনতা। এই সব বন্য অঞ্চলে এরা মানুষ, আজন্ম যাতায়াত করচে এই বনপথে, বৃক্ষতলে নিশিযাপন এদের দৈনন্দিন অভ্যেস। ওদের ডাল নামলো। শুধু ডাল আর ভাত শালপাতায় ঢেলে খেতে লাগলো। ডালের মধ্যে সাদা সাদা কি ভাসচে দেখে বল্লাম—ওগুলো কি ডালে?

—পেক্‌চি।

—সেটা কি?

—কান্দা।

—তাই বা কি?

বুঝলাম না জিনিসটা। মনে হোল কোনো জংলী ফলটল হবে। পরে বনবিভাগের হিন্দি-জানা কৰ্ম্মচারী নিকোডিম হো-কে জিজ্ঞেস করতে জানলুম, জিনিসটা হোল বনকচু।

এই হোল ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষকে বুঝতে হোলে এই সব লোকের সঙ্গে মিশতে হবে। কি সামান্য এদের খাওয়া, কত তুচ্ছ এদের শোওয়া, শীতকে এরা শীত জ্ঞান করে না, বুনো হাতী মানে না, বাঘ মানে না—যদি দু'টাকা কি দেড় টাকা গাড়ীর ভাড়া মেলে, তবুও খায় বনকচু সিদ্ধ আর ভাত।

গাছের মাথায় সন্ধ্যা নামলো ফিরবার পথে। একফালি চাঁদ উঠেছে শালগাছের মাথায়। বনতুলসীর জঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসচে ঠাণ্ডা বাতাসে। নিকটে পাহাড়ী উমুরিয়া নালার মৰ্ম্মর শব্দ। বোনাই গড়ের পথ ঘন বাঁকে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে, সেখান থেকে ধোঁয়া উঠচে। বোধ হয় ওখানেও আরাকুসি বা গাড়োয়ানেরা রাত্রিযাপন

করছে।

পথের ধারে গাছের তলায় তলায় কত লোক আগুন জেবলেচে, রান্না করচে। এরা সবাই জেরাইকেলা কিংবা বিসবা থেকে কাজ খুঁজতে এসেচে। কারণ এই জঙ্গলের মধ্যে এই গ্রামেই দুটি কাঠ ব্যবসায়ীদের আড্ডা আছে। কাঠ কেটে ও চেরাই করে ২৫।২৬ মাইল দূরবর্তী রেলস্টেশনে পাঠাবার জন্যে 'আরাকুসি' দরকার, কুলি দরকার, গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান দরকার। তাই এখানে এত লোক আসে।

ওরাই আসবার সময় বলেছিল, রোজ রাত্রে হাতীতে তাদের বড় জ্বালাতন করে। হাতীর উপদ্রবে ওরা পালিয়ে ফরেস্ট বাংলোর কম্পাউণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল পরশু রাত্রে।

গ্রামের লোকে বলেছিল হাতীর উপদ্রবে গাছের কলা থাকে না, ক্ষেতের কোনো ফসল থাকে না। সব খেয়ে যাবে। উঁচু মাচা করে তাই ওরা সারা রাত ফসলের ক্ষেতে চৌকি দেয়। শীতকালে এখন ক্ষেতে কোনো ফসল নেই, কাটা হয়ে গিয়েছে, আছে কেবল কুরথি। যেখানেই পাহাড়ের তলায় কুরথি ক্ষেত, সেখানেই উঁচু কোনো গাছের ওপরে মাচা বাঁধা। রাত্রে ফসল পাহাড়া দিতে হবে।

থলকোবাদ বাংলোর পেছনে যে ছোট পাহাড়ী বন আর উঁচু রাঙা মাটির ডাঙ্গা তাতে শীতের দিনে একরকম ঘাস হয়েচে, খুব নরম, সরু সরু সাবাই ঘাসের মত। এই ঘাসের মাঝে মাঝে শুকিয়ে গিয়ে সোনালি রং ধরেচে।

আজ দুপুরের পর বাংলো থেকে বার হয়ে এই নির্জ্জন পাহাড়ে উঠে ঘাসের উপর একা বসলুম। আমার পেছনের ঢালুতে আসান, অর্জ্জুন, ধ, করম, শাল, পিয়াল, আমলকী গাছের বন। ওদিকে বনের মাথা ছাড়িয়ে আর একটা পাহাড় ঠেলে উঠেচে। কি যে অনুভূতি হয়, এখানে বসে চুপ করে চোখ বুজে থাকলে। শুকনো ঘাসের ভরপুর গন্ধ। সোনালি রোদ। কত কি পাখীর ডাক। কান পেতে শোনা যাবে পাহাড়ের বনে বনে এদিকে ওদিকে কত অজানা পাখীর ডাক। বাংলা দেশের পরিচিত পাখী এরা নয়। আমি এদেশের পাখীর সুর চিনি না। কেবল চিনি বনটিয়া আর ধনেশ পাখীর ডাক। পাহাড় ও বনের পটভূমিতে বুনো পাখীদের সঙ্গীত এই নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে শুধু মনকে বিরাটের দিকে নিয়ে যায়। তাঁর কথাই এখানে বসে ভাবতে ইচ্ছে করে। ধ্যানস্তিমিত নেত্র সেই মহান শিল্পীকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিল প্রাচীন ভারতের কোন অরণ্যের অভ্যন্তরে। এমনি নির্জ্জন দুপুরে।

একটু পরে মোটরে গেলুম বেড়াতে থলকোবাদ বাংলো থেকে চার মাইল দূরে একটা ঝর্ণা দেখতে। সন্ধ্যার দেরি নেই। মোটরের রাস্তা থেকে কিছুদূরে সেই ঝর্ণাটা। মস্ত বড় শিলাস্তৃত চাতাল সেখানে। কত লক্ষ বৎসরে ধরে এই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি ওপরের নরম রাঙা মাটি কেটে shale ও greisen পাথরের এই চাতাল তৈরি করেছে। কত লক্ষ বৎসর ধরে এই ঝর্ণা চলচে এখান দিয়ে। সময়ের বিরাট ব্যাপ্তির কথা ভাবলে আমরা ক্ষুদ্র মানুষ আমাদের মাথা ঘুরে যায়।

সামনে সেই ক্ষুদ্র ঝর্ণাটি কুলকুল করে পাথরের ওপর দিয়ে বইচে। আমি ঘন বনের মধ্যে মোটা লতা দোলানো একটা বটগাছের তলায় শিলাসনে বসে আর একটা মস্ত বড় মসৃণ পাথর ঠেস দিয়ে লিখচি। সেই সব পাখীর ডাক। এ জায়গাটা বড় ঘন বনের মধ্যে। একে তো এই সারেণ্ডা অরণ্যই নির্জ্জন ও বহু বন্যজন্তু-অধ্যুষিত। তাতে এ জায়গাটা আবার থলকোবাদ থেকে চার মাইল দূরে বনের মধ্যে। বাঘ ও হাতীর ভয় এখানে খুব। মাঝে মাঝে সতর্ক দৃষ্টিতে পেছন দিকে চাইচি, শুকনো পাতার ওপর খস্ খস্ শব্দ হোলেই। মিঃ সিন্হা অদূরে আর একটা গাছের তলায়

বসে আছেন।

এসব স্থানে বসে শুধু বিরাটের চিন্তা মনে আসে। লক্ষ বৎসর এখানে মাপ-কাঠি। বিরাট আকাশ, অনন্ত নাক্ষত্রিক শূন্য, মহাকালের অনন্ত পথ যাত্রা...মনের মধ্যে যে সুর বেজে ওঠে, পৃথিবীর ভাষায় সে সুর বোঝানো যায় না, সে অনুভূতি অমরত্বের আস্বাদ বহন করে আনে, তুলনা নেই সে ecstasyর—

আর শুধুই ছবি মনে আসে সে বিরাট দেবতার, কত ভাবে, কত দিক থেকে। বহু প্রাচীন দিনে ভারতবর্ষের এমনি কোন অরণ্যের শিলাতলে বসে ব্রহ্মসূত্রকার মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন 'রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানম্'—বিশ্ব রচনা দেখে মনে হয় এর মধ্যে কোন বিরাট শিল্পচেতনা সব সময়ে সক্রিয়।

সেই মহান, বিরাট শিল্পীকে বন্দনা করি। জয় হোক বিশ্বের সে অধিদেবতার। মহাকবি তিনি, অনাদ্যন্ত শাশ্বত যুগ ধরে এই রকম শিলাস্তৃত ঝর্ণার তটে, অনন্ত নীহারিকামণ্ডলী ছড়ানো আকাশপটে, বনকুসুমের পাপড়ির দলে, বিহঙ্গকাকলীতে, জাতির উত্থানে পতনে চাঁদের আলোয় তরুণীর নির্ম্মল প্রেমের ব্যথায়, শোকে, বিরহের গানে, অগ্নিপুচ্ছ ও ধূমকেতুদলের যাতায়াতে, দেশ ও মহাদেশের অবনমন, পুনরুত্থানে তিনি আপন মনে তাঁর বিরাট এপিক কাব্য লিখেই চলেচেন। কিন্তু অত বড় মহাকাব্য পাঠ করবার মত শক্তিধর পাঠক কোথায়? দু-একটা সর্গের এক-আধ পংক্তি কেউ হয়তো পড়ে, কেউ বোঝে কেউ বোঝে না।

আকাশে গোধূলি নেমেচে। রাঙা গোধূলি। বনের মধ্যে দিয়ে আমার এই বট-তলার শিলাসনে ওর আলো এসে পড়েছে। জলের মর্ম্মর কলতান যেন ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে চোখে। শীতও নেমেচে খুব।

বিজয় ড্রাইভার এসে বলচে—যাবেন না বাবু?

বুনোহাতী কিংবা বাঘ আর একটু পরে জলপান করতে আসবে এই ঝরণায়। যাওয়াই ভালো।

বাংলোয় ফিরলুম অন্ধকার গিরি-বনপথ ধরে। আশপাশের অন্ধকার জঙ্গলের দিকে চাইলে প্রাণে ভয় আসে। এ এক অন্য জগৎ।

বাংলোয় ফিরে পাহাড়ের প্রান্তে বাংলোর কম্পাউণ্ডে বসে আছি। আমার সামনে অনেক নীচে উপত্যকাভূমি, তার ওপারে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বনাবৃত শৈলমালা। বাঁ দিকে কম্পাউণ্ডের বড় তুন গাছের মাথায় অষ্টমীর চাঁদ উঠেচে—দূরের অন্ধকার শৈলমালার ওপরে একটি নক্ষত্র জ্বলজ্বল করচে। সেদিকে চেয়ে মন আমার কোথায় কতদূরে চলে গেল। ওই তারার চারিপাশে কি আমাদের মত গ্রহরাজি কিছু আছে- সেখানে বাস করে আমাদের মত জীবকুল? এই রকম বনানীর সৌন্দর্য কি ওদের মধ্যে আছে? আমাদের মত সুখ দুঃখ, প্রেম বিরহের লিপি কি ওখানেও লেখা?

সেকথা জানি না জানি—এই কথাটা জানি যে বিরাটের আসন ওখানেও পাতা। তাঁর মহাকাব্যের ছন্দের ঝঙ্কারের মধ্যে ওদেরও স্থান রয়েচে।

Out beyond the shining of the furthest star
Thou art ever stretching infinitely far,
Yet the hearts of children hold, what worlds can not,
And the God of glory loves the lowly spot.

আমাদের গ্রামের ইছামতীর নদীর ধারে বল্লার ভাঙনে সেই হলদে তিৎপল্লা ফুলের মধ্যেও তিনি, বনসিমতলায় মাঠের সেই মাকাল লতার ঝোপে পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মধ্যেও তিনি।...

অনেক রাত্রে চাঁদ ফুটফুটে আলো দিচ্চে।

আবার পাহাড়ের ধারে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম। দূরের সেই পাহাড়শ্রেণী, তার মাথার ওপরকার আকাশে অগণ্য তারা। কি মহিমা বিরাটের। তুমি আমাকে ভালবেসে এখানে এনেচ, তোমার এ বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ দিয়েচ। কিন্তু আমি তোমার এ রূপের সামনে দিশাহারা হয়ে যাই, দেবতা। আমার সেই তিৎপল্লা ফুলের ঝোপই ভালো। বনসিমতলা ঘাটের সেই মাকাল ফলই ভালো। তোমার এ রূপ দেখে আমি ভয় পাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের বিকেল।

নদীর ধারের ঘন নিবিড় বন সেকেলে প্রাচীন আমগাছের তলায়। কুঁচতলা বয়ে উঠেচে বৃদ্ধ আমগাছের ডাল। বাঁশগাছের আলগা থেকে নেমে এসেচে বড়-গোয়ালে লতার কচি ডগা, এবার বোশেখ মাসের শেষে দিনকয়েক বৃষ্টি হওয়াতে লতা পাতা চারা গাছের এত বৃদ্ধি। যেখানে কিছুদিন আগে পরিষ্কার তৃণলতাশূন্য ভূমি দেখেছি —এখন সেখানে দশ বর্গহাত জমিতে গজিয়ে উঠেচে বুনো উচ্ছে, বুনো করলা, বড় গোয়ালে লতা, করমচা লতা, বুনো সূর্য্যমণি ফুলের চারা, জামের চারা, তরমুজের চারা, আরও কত কত জানা অজানা বুনো গাছপালার চারা।

এখন বৃষ্টি নেই। আজ ক'দিন খুব গরম, খর সূর্য্য উঠেছে মেঘলেশশূন্য নীল আকাশে, দিক্‌দিগন্ত প্রখর রৌদ্রে জ্বলে পুড়ে যায়, অপরাহ্ণে কিন্তু গহন ছায়া নেমে আসে মাঠে ঘাটে পথে, বনযুঁইয়ের সুগন্ধে বাতাস হয় সুরভিত, বাঁশঝাড়ের মগডাল দুলিয়ে, আম্রবন-শীর্ষ কাঁপিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে নদীর বাঁক থেকে, নদীর স্নিগ্ধ কালো জলে ঢেউ উঠে পানকলস শেওলার কুঁচো সাদা ফুলের সারিকে ন্যাড়িয়ে দেয় ডাঙার দিকে, পানকৌড়িকে উড়িয়ে দেয় সাঁইবাবলার ডাল থেকে, শেফালি ফুলের হলুদ পাপড়ি ঝরিয়ে দেয় নিবিড় বনের তলায়, বর্ষাপুষ্ট তৃণভূমির তলে কিংবা নবোদ্ধত চারা গাছের মাথায়। গোধূলির রাঙা আলো বনে, মাঠে, চরে, জলে, নল-খাগড়া আর কষাড় ঝোপে, উড়ন্ত বকের সারির পাখায়। এই নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে ছায়া-গহন প্রাচীন আমবাগানে ঢুকে দেখছি বনের কোন্ কোণে তিনি পত্রশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে দেখেছিলাম এই নিষ্ফর্জনে।

আমি অবিশ্যি দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাইনি।

ছায়া-ঝোপের নিবিড় আশ্রয়ে তিনি শুয়ে ঘুমিয়ে আছেন। নারীর মত সুকুমার কমনীয় মুখে এক অপার্থিব ভাব মাখা, দীর্ঘ দীর্ঘ চোখ দুটি নিমীলিত দীর্ঘ কালো জোড়া ভুরুর তলায়। সুন্দরী নারীর মত লাবণ্যভরা মুখ। মুখ ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে ওঁর। ঝুর ঝুর করে ঝরা পাপড়ি ঝরে পড়েচে সোঁদালি ফুলের ওঁর শয্যার ওপর। ডালে ডালে বনের পাখি নেচে নেচে উড়ে বেড়াচ্চে, কত কি বন্যলতার গাছ ওপরের ডাল থেকে নেমে এসে দুলচে ওঁর বুকের কাছে, মুখের কাছে। তিৎপল্লা ফুল ফুটে আছে একটু দূরে একটা ঝোপে, রঙিন প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, পিড়িং পিড়িং দুর্গাটুনটুনি ডাকচে, উঁচু গাছের মগডালে ডাকচে কুল্লো, কি সুন্দর গোধূলির রাঙা রোদ সাজানো বনকুঞ্জ, কি স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় বীথিতল!

কিন্তু হঠাৎ মনে হলো তিৎপল্লা ফুল তো এখন ফোটে না, ও ফোটে শীতের প্রথম মাসে দুপুর বেলা।

এখন ও ফুল কেন?

তা না, মনে হোলো মহাশিল্পী, মহাকবি উনি, নিজের অনন্ত শয্যার অন্তর্নিদ্রার স্থানটি নিজের ইচ্ছামত সাজিয়ে বসবেন আমি যেসব ফুল ভালবাসি বা দেখেছি তাই দিয়ে। শুধু কি ফুল? কত কি সুদর্শন, সুকুমারগ্র বন্যলতা, যা নিতান্ত এই বাংলার পল্লীপ্রান্তরে সুপরিচিত। নেই সেখানে অর্ক ও কোবিদার। নেই কুরুবক, অশোক পুন্নাগ ও চম্পক, বর্ষা-সাথী নীপও চোখে পড়ে না। হে পূর্ব্বাচলের সবিতা, তোমার জবাকুসুম-সঙ্কাশ রশ্মির বিকীরণও এখানে তপস্যার অভাবে প্রবেশ লাভ করেনি। কি পুণ্য করেছিল এই প্রাচীন দিনের গাঙ্গুলী বংশের আমবাগান, কি তপস্যা করেছিল ইছামতীর তীর-তরুশ্রেণী?

ভালো করে চেয়ে দেখবার জন্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম সেই বনে।

কি সুন্দর অপরূপ স্নিগ্ধ ছবিখানা আমার সামনে।

বিপুল মহাসাগরে ইথারের মহাসমুদ্র, যেখানে কোটি তারা ডোবে জ্বলে, তার মধ্যে ক্ষুদ্র একটি সবুজ খড়ের দ্বীপ পৃথিবী।

বিশ্বের রাজাধিরাজ পরম সৌম্য, পরম প্রেমী অধিদেবতা, যাঁর তৈরী আব্রহ্মস্তম্ব এই জগৎ, এই মহাজগৎ, সেই পরম রহস্যময় দেবতা আজ কেন শায়িত এই আমবাগানে! সোঁদালি ফুল ঝরচে তাঁর সুকুমার লাবণ্য-মাখা মুখের ওপর, সে মুখ দেখে তক্ষনি ভালবাসতে ইচ্ছা করে—বিশেষ করে যখন মনে হয় জগতে ক'জনই বা ওঁকে জানে ভালবাসে বা ওঁর কথা ভাবে। উনি সব চেয়ে বেশি অবহেলিত জগতের মধ্যে। কচি কচি লতা দুলচে, একটু দূরে রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড়ে ঝাড়ে, আবার নীল বনকলমির ফুলে ভর্ত্তি একটা লতা উঠেছে ষাঁড়াগাছের মাথায়, অকালে একটা শিমুলের শাখায় রাঙা রাঙা ফুল ফুটে আছে, টুকটুকে মাকালফল ঝুলচে, লেজ-ঝোলা হল্‌দে পাখী বসে আছে, যে ফুল কেউ দেখে না ও কেউ আদর করে না, তেমন ফুল ফুটে আছে তাঁর বনতলে, তাই দিয়ে রচিত হবে, তাঁর পত্রশয্যা।

প্রণাম, হে খেয়ালী দেবতা, প্রণাম।

ছোট একটা লতা উঠচে আমার রোয়াকের ঠেস্-দেওয়ালের পাশের নারিকেল গাছটা বেয়ে। আমার বাড়ীর ওদিকটাতে ঘন বনঝোপ। আগে যুগল কাকার ভিটে ছিল ওখানটাতে, ছেলেবেলায় তাঁর কাছে আমি কিছুদিন অঙ্ক কষতাম, কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরে তাঁর ছেলেরা এ গ্রাম থেকে উঠে অন্যত্র গিয়ে বাস করচে, এখন সেখানে ঘন ছোট এড়াঞ্চি, গোয়ালে লতা, সোঁদালি, গাঁধালে শাক, বনমৌরি ও আদাড়ে কাশের জঙ্গল।

আমি ঠেস্ দেওয়ালটাতে বসে বসে লিখি। হঠাৎ দেখলাম একদিন নারকোল গাছের গা বেয়ে একটা লতা উঠেচে। ভাল করে দেখলাম, বুনো তিৎপল্লার লতা, যারা জানে না তারা বলে তেলাকুচো। কিন্তু তেলাকুচো লতা একটু অন্য রকমের। ফুলের গড়ন তো সম্পূর্ণ আলাদা।

দিনে দিনে পাতাটি বেড়ে উঠে নারকোল গাছ বেয়ে ঠেলে উঠতে লাগলো। আমি অবাক হয়ে রোজ রোজ চেয়ে দেখি। ক্রমে তার ফুল হোল, যে ফুলের কুঁড়ি এ সব অঞ্চলের দুলে মেয়েরা নাকে নোলক করে পরে। আমরাও বাল্যে পরেছি। ফুলের সময়টাতে রঙবেরঙের কত প্রজাপতির বাহার। সুকুমার লতাগ্রভাগ নারকোলগুঁড়ি ছেড়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে দুলচে বাতাসে, তাদের গাঁটে গাঁটে সাদা সাদা ফুল আর ফুলে ফুলে হলদেডানা নীলডানা প্রজাপতিকুলের মুক্তপক্ষ-সঞ্চরণ। এরা

বনান্তস্থলী একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মুখরিত করে রাখে সারা সকালবেলাটা; আমি লেখা ছেড়ে মাঝে মাঝে সেদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি।

একদিন ওর ফলের জালি পড়লো। জালি পুষ্ট হয়ে তেলাকুচো আকারের ফলে পরিণত হোল। ক্রমে একদিন ফল পেকে টুকটুকে লাল দেখালো। ছোট্ট একটা দুর্গা-টুনটুনি পাখি এক শ্রাবণ অন্ধকারের মেঘমেদুর শ্যামলতা ও অতলস্পর্শ শান্তির মধ্যে দেখি ফলটার পাশের লতার ডগায় বসে মহা আনন্দে রাঙা ফলটি ভোজন করচে। কি অপূর্ব্ব আনন্দই বা সেটুকু পুঁচকে পাখির খাওয়ার ভঙ্গির মধ্যে। তখনও দুলচে উপরের দিকের লতাগ্রভাগে কত সাদা কুচো কুচো ফুল নোলকের মত, কত সবুজ কচি ফলের জালি।

ওর পিছনে বিশাল, প্রাচীন বকুল গাছটা। বর্ষার দিনে মেঘের ঘন ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে ওর তলা। আর্দ্র লতাকোণে কি সুগন্ধ ফুল ফুটেছে—জলভরা বাতাসে তার সুবাস। এই শ্যামল বনানীর নিবিড় পটভূমিতে সেই তিৎপল্লার লতাটা কি সুন্দর দেখায়। ঠেস দেওয়ালে বসে বসে চেয়ে দেখতে দেখতে এক-একদিন কি আনন্দ যে পাই।

শুধু ঐ ক্ষুদ্র তিৎপল্লার লতা আর তার ফুল নয়, এক অদ্ভুত ও আশ্চর্য্য জিনিস দেখি ওর মধ্যে। ও সামান্য বন্যলতা নয়। গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে সন্ধ্যায় এক মনে ওর দিকে চেয়ে থেকে দেখো। অসীমের মহিমময় বাণী এসে পেঁছবে তোমার মনে।

কি বিপুল সমারোহ করতে হয়েচে ওই বুনোলতাকে বাঁচিয়ে রাখতে, ওর ফুল ফোটাতে, ওর ফল পাকাতে! সূর্য্যের বিশাল অগ্নিকুণ্ডটা আকাশের দূর প্রান্তে বসাতে হয়েচে ওর জন্যে, কত কি গ্যাস, কত রাসায়নিক পদার্থ সৃষ্টি করতে হয়েছে ওর জন্যে, কোটি কোটি মাইল ইথারের সমুদ্র ভেদ করে সূর্য্যরশ্মিকে পৃথিবীতে ছুটে আসতে হয়েচে ওকে বাঁচিয়ে রাখবার ব্যগ্র আগ্রহে। তবে আজ ওর ফুল ফুটেচে, ওর ফল পেকে লাল টুকটুক করচে।

ক্ষর-ব্রহ্মের প্রাণময়ী বার্ত্তা বহন করে এনেচে ওই বন্য লতা লোকলোকান্তরের অসীমতা থেকে। যে মহাশিল্পীর হাতের ও অতি সুকুমার শিল্প, সেই শিল্পীর স্বাক্ষর আছে ওর পাতায়, ফুলে, লাবণ্যময় দুলুনিতে। ওর মধ্যে দিয়েই তাঁকে প্রত্যক্ষ কর।

ঘাটশিলা থেকে আমি মনোহরপুর রওনা হই বেলা দুটোর ট্রেনে। গত পুজোর ছুটিতে দেশ থেকে ঘাটশিলায় এসেছিলাম বেড়াতে। বন্ধুবর অমর মিত্রের বাসার সামনে মাঠে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রে বসে গল্পসল্প করছি, এমন সময়ে খবর পেলাম আমাদের দেশের স্কুল থেকে একটি ছেলে বেড়াতে এসে আমাদের বাসায় উঠেছে।

রাত্রে ছেলেটির সঙ্গে কথা হোল, সে এসেচে বন ও পাহাড় দেখতে। কখনো দেখেনি একটা বড় রকমের বন, বড় একটা পাহাড়। সেই রাত্রেই ভাবলাম ওকে সিংভূমের সব চেয়ে বড় বনের অর্থাৎ সারেণ্ডা অরণ্যের একটা অংশ দেখিয়ে দেবো।

অনেকে হয়তো জানে না, সিংভূমের অর্থাৎ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ছোটনাগপুরের মধ্যে দুটি বৃহৎ অরণ্যানী বর্ত্তমান। প্রথমে একথা বলা উচিত, ছোটনাগপুরের এ অংশকে প্রাচীন বাংলা পুঁথিতে ঝাড়খণ্ড বা ঝারিখণ্ড বলা হোত অর্থাৎ বনময় দেশ। এখন সভ্যতা বা রেলপথের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সিংভূমের বন প্রায় নিঃশেষ হয়ে সেই জায়গায় হয়েছে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙালীদের উপনিবেশ, কল-কারখানা (যেমন টাটা, মৌভাণ্ডার) বা ফসলের ক্ষেত। বন যা এখনো পূর্ব্ব সিংভূমে

আছে, তাও থাকতো না, যদি গভর্ণমেণ্ট থেকে বনকে কানুনের বেড়া দিয়ে ঘেরা না হোত। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে আইনের গণ্ডী দিয়ে বনকে রক্ষা না করলে ছ'বছরের মধ্যে (গড়পড়তা হিসাবে অবশ্যি) একটা দশ বর্গমাইল ব্যাপী বনভূমি কাবার হয়ে যায় মানুষের কুঠারের সামনে।

পূর্ব্ব সিংভূমের মধ্যে কয়েকটি বড় উপনিবেশ গড়ে উঠেচে—ঘাটশিলা, গালুডি, চাকুলিয়া ও টাটা। শেষেরটির নাম জগৎ-বিখ্যাত। কারখানার জন্যেই এখানে অন্ন-সংস্থানের উপনিবেশ।

পূর্ব্ব সিংভূমে প্রকৃতির পূজারী-ভক্তেরা বন দেখতে পাবে না বিশেষ, যা দেখতে পাবে তা এমন কিছু নয়। ক্বচিৎ দু-একটি স্থান ছাড়া। এমন একটি স্থান হোল ঘাটশিলার সাত মাইল উত্তরে ধারাগিরি নামক একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত ও আশপাশের পাহাড় বনানী। আর একটি স্থান সুবর্ণরেখার ওপারের তামাপাহাড় ও সানুদেশ। এই সব বনেই অল্পবিস্তর বন্যহস্তী, নেকেড়েবাঘ, ভালুক, ময়ূর ইত্যাদি দেখা যাবে। তবে এদের সংখ্যা এত কম যে পাঁচ বছর বনে বনে বেড়িয়েও আমি এ পর্য্যন্ত একটা জ্যান্ত জানোয়ারকে আমার দৃষ্টিপথের পথিক করাতে সমর্থ হইনি—দুটি একটি শেয়াল বা কাঠবেড়ালি ছাড়া।

তা সত্ত্বেও আমি জানি, জানোয়ার এখানে আছে।

আমার দু-একটি শিকারী বন্ধু এ বিষয়ে দুঃখময় অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছেন। যেমন গালুডির লুনা নার্সারির মোহিনী বিশ্বাস মহাশয়। ইনি ভালুক শীকার করতে গিয়ে রীতিমত জখম হয়েছিলেন ভালুকের হাতে। বেঁচে গিয়েছিলেন কোনরকমে কিন্তু একখানা হাত অকর্ম্মণ্য হয়েছে চিরকালের জন্য।

এখন বলবো পশ্চিম সিংভূমের কথা।

বন যা আছে, এখনো পশ্চিম সিংভূমেই আছে। এ অঞ্চলের বড় বন দুটি। সারেণ্ডা ও কোল্‌হান। দুটিই রিজার্ভ ফরেস্ট। সারেণ্ডা অরণ্যানী বৃহত্তর, প্রায় ৪০০ শত বর্গ মাইল। ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ বনানী হচ্ছে এই সারেণ্ডা। আমি তিন বৎসর আগে একবার এই দুটি দেখবার সৌভাগ্যলাভ করেছিলুম বন-বিভাগের বড় কর্ম্মচারী জে. এন. সিন্‌হার সমভিব্যাহার তাঁর মোটরে।

সে অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার কথা এমন বিচিত্র সৌন্দর্য্যের রেখাপাত করেছে আমার মনে যে তিন বৎসরেও তা এতটুকু ম্লান হয়নি। বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে কতবার গল্প করেছি সারেণ্ডা বনের নানা বিচিত্র সৌন্দর্য্যভূমির কথা, নানা জলপ্রপাতের কথা, নানা পাথরের বাঁধানো বন্য নদী ও ঝর্ণার কথা, নানা বনপুষ্পের সুরভিবাহী দক্ষিণা বায়ুর কথা, শিলাতলে বিছিয়ে থাকা বন্যশিউলির কথা, গভীর রাত্রে বন্য বিভাগের বাংলো-ঘরে শুয়ে আশপাশের বনে কোথাও বন্যহস্তীর বৃংহিতধ্বনি শুনবার কথা।

তাই ভাবলুম ছেলেটিকে নিয়ে এই সুযোগে আর একবার সারেণ্ডা অরণ্য দেখতে বেরুবো।

কিন্তু এর মধ্যে একটা কথা আছে।

পশ্চিম সিংভূমের এই অরণ্য-অঞ্চল মোটরযোগে ভিন্ন দেখা দেখা প্রায় অসম্ভব। চার শত বর্গমাইল ব্যাপী এই বনভূমির কোথায় কি আছে তা সাধারণের জানবার কথাও নয়। সুতরাং বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদের সাহায্যও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ট্রেনে উঠে এ বন দেখবার সুযোগ প্রায় নেই, কেবল একটি উপায় ছাড়া।

সেই উপায়টি অবলম্বন করা গেল।

মনোহরপুরের স্টেশন থেকে একটা লাইট রেলওয়ে চলে গিয়েছে চোদ্দ মাইল

দূরে চিড়িয়া পাহাড়ে। এই পাহাড় থেকে ইণ্ডিয়ান স্টীল করপোরেশন লৌহপ্রস্তর সংগ্রহ করে বার্ণপুরের কারখানায় চালান দেয়। রেল-লাইনটা ওদেরই। এই রেলপথ গভীর অরণ্যের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে প্রায় আট নয় মাইল কিম্বা আর একটু বেশি। এইটি সারেণ্ডা অরণ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তদেশে।

সুতরাং যদি মনোহরপুর থেকে চিড়িয়া খনির রেলে চড়া যায় তাহলে বিনা মোটরে সাত-আট মাইল বন অনায়াসে দেখা যেতে পারে। চিড়িয়া রেললাইন খনি-ওয়ালাদের নিজেদের তৈরী, যাত্রী-বহনের উদ্দেশ্যে তা তৈরী হয়নি, বাইরের কোন লোককে উঠতে দেয়ও না। এজন্যে বনবিভাগের লোকের সাহায্য দরকার।

বেলা তিনটের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা ঘাটশিলা থেকে উঠে সন্ধ্যায় সময়ে চক্রধরপুরে গিয়ে নামলুম। এই পর্য্যন্তই টিকিট করা হয়েছিল। এর পরেই পাহাড় জঙ্গলের বেশ ভাল দৃশ্য রেলপথের দুধারে পড়বে, কিন্তু নৈশ অন্ধকারে আমরা সে সব কিছুই ভালো করে দেখতে পাবো না। তার চেয়ে রাত্রিটা চক্রধরপুর স্টেশনে কাটিয়ে পরদিনের ভোরবেলা যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার আসে, তাতে ওঠাই যুক্তিযুক্ত। সবটা দিনের আলোয় দেখতে পাওয়া যাবে।

চক্রধরপুর স্টেশনে ওয়েটিংরুমে গিয়ে বিছানাপত্র বিছিয়ে নিয়ে আমরা সটান্ শুয়ে পড়লাম। আদ্রা প্যাসেঞ্জার এল একটু পরে। কয়েকটি ভদ্রলোক ওই ট্রেনে রাঁচি ও পুরুলিয়া থেকে এলেন। একটি ভদ্রলোকের নাম মিঃ দুবে। রেলপুলিসে কি কাজ করেন। আমার সঙ্গে দু-এক কথায় খুব আলাপ জমে গেল। পথে কি চমৎকার ভাবেই আলাপ জমে। আমি অনেকবার দেখেছি রেলে দূরদেশে বেড়াবার সময় রেল-কামরার মধ্যেকার যাত্রীরা পরস্পর আত্মীয় হয়ে গিয়েছে। এ ওকে জলপাত্র দিচ্ছে ব্যবহার করতে, ও একে সিগারেট দিচ্ছে, এ খাওয়াচ্ছে ওকে—ওদের মধ্যে শিখ আছে, পাঞ্জাবী আছে, বিহারী আছে, বাঙালী আছে। একটি সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে ওদের মধ্যে, দেড়দিন বা দুদিনের জন্যে। এমন কি বিদায় নেবার সময় কষ্ট হয়, সবাই পরস্পরের ঠিকানা নেয় চিঠি দেবে বলে।

যদিও শেষ পর্য্যন্ত হয়তো চিঠি দেওয়া হয় না।

এখানে মিঃ দুবের সঙ্গে আমার এই ধরনেরই আলাপ হয়ে গেল। তিনি আমার সুবিধা অসুবিধা দেখবার জন্যে কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি করে বলবো।

অনেক রাত্রে দেখি মিঃ দুবে আমায় ডাকাডাকি করচেন।

--ঘুমুলেন নাকি ?

—না। কি বলুন!

—একটা পথের কথা আপনাকে বলে দিই। যখন আপনি পাহাড় জঙ্গল বেড়াতে ভালোবাসেন, রাঁচি থেকে একটি পথ লোহারডগা হয়ে যশপুর স্টেটের মধ্যে দিয়ে সম্বলপুর জেলার ঝার্সাগুড়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই পথে রাঁচি থেকে মোটর বাস যায় যশপুর স্টেশনের রাজধানী যশপুর নগর পর্য্যন্ত। সেখান থেকে অন্য এক মোটর বাসে কুঞ্জীগড় হয়ে ঝার্সাগুড়া আসা যাবে। কখনো যাননি এ পথে ?

যাওয়া তো দূরের কথা নামই শুনিনি, সন্ধানই জানিনে।

সেই রাতটি আমার বড় মূল্যবান। মিঃ দুবে আমার উপকার করেছিলেন এ পথের সন্ধান আমায় দিয়ে। এই বিস্তৃত ভারতবর্ষের নানা স্থানে কত সৌন্দর্যস্থলী বিদ্যমান, কত নিবিড় পর্ব্বতকন্দনের অভ্যন্তরে, কত অরণ্যভূমির নিভৃত অন্তরালে, কত গোপন বন্যনদীর শিলাস্তৃত তটদেশে কে তাদের খবর রাখে! পথের কথা যে বলে দেয়, জীবনের বড় উপকারী বন্ধু সে।

আমি জানি হাওড়া স্টেশন থেকে দুশো মাইলের মধ্যে কত সুন্দর স্থান আছে, সেখানে নিবিড় বন আছে, পাহাড়ী ঝর্ণা আছে, বনলতার সৌন্দর্য্য আছে, জলজ ঝিলির ভিড় আছে ছায়াবৃত বন্য নদীতটে। দেখে অনেক সময় নিজেরই অবিশ্বাস হয়েছে কলকাতার এত কাছে এমন সুন্দর স্থান থাকতে পারে!

রাত ভোর হয়ে গেল। একটু পরেই নাগপুর প্যাসেঞ্জার এল। আমরা তাতেই উঠে মনোহরপুরের দিকে রওনা হলাম। চক্রধরপুর ছাড়িয়ে তিনটি স্টেশনের পরেই পোসাইতা স্টেশনের কাছে ঘন বন। এখানে একটা টানেল আছে, তাতে ভুলক্রমে রেলওয়ে গাইড বইয়ে বলা হয় 'সারেণ্ডা-টানেল'। কিন্তু প্রকৃত সারেণ্ডার সঙ্গে এই টানেলের পাহাড় ও বনভূমির কোনো সম্পর্ক নেই। এ স্থানটি কোলহান বিভাগের অরণ্যের অন্তর্ভুক্ত। সারেণ্ডা অরণ্য কোনো রেলপথের নিকটে নয়, ট্রেনে বসে এ লাইন থেকে সাধারণতঃ যে বনানী দেখা যায় তা হোল এই কোলহান অরণ্যভূমি, তারও খুব সামান্য অংশই রেলে চড়ে দেখা সম্ভব। আরও পশ্চিমে গিয়ে যে বন পর্ব্বত দেখা যায় সেগুলো হলো বামড়া, আনন্দগড় ও বোনাইগড় প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। তার পরেই পড়ে সম্বলপুর জেলার রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব্ব-উত্তর অংশ। তার পরে এল বিলাসপুর। বিলাসপুর ছাড়িয়ে নাগপুরের পথে অনেক দূর পর্য্যন্ত রুক্ষ, ঊষর, সমতল প্রান্তরের একঘেয়ে দৃশ্য চক্ষুকে পীড়া দেয়। তার পরে আসে দ্রুগ বা দুর্গ। এখান থেকে পুনরায় বন পর্ব্বতের দৃশ্য শুরু হলো, এই পথেই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের বহু-বিজ্ঞাপিত সালকেশা অরণ্যভূমি। আমি একবার জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রাত্রিতে আর একবার অন্তসূর্য্যের বিলীয়মান আলোয় এই বন-প্রদেশ দর্শন করি। নিঃসন্দেহে বলা যায় ট্রেনে বসে যে কেউ দুর্গ ও ডোঙ্গলগড়ের মধ্যে একটু কষ্ট করে চোখ মেলে চেয়ে থাকবেন, তাঁর কষ্ট সার্থক হবে।

তবে এখানে একটা কথা, সকলে কি সব জিনিস ভালবাসে! যার চোখ যে জন্যে তৈরী হয়ে গিয়েছে! সে জন্যে দোষ কাউকে দেওয়া যায় না।

বনানী ও পাহাড়পর্ব্বতের দৃশ্য, মুক্ত space-এর দৃশ্য যাঁর ভালো লাগে না—তাঁর সঙ্গে কি তা বলে ঝগড়া করতে হবে। তাঁর হয়তো যা ভালো লাগে, আমার তা ভালো লাগে না, সুতরাং তিনিও তো আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন তা নিয়ে।

মনোহরপুর নামলাম বেলা দশটার সময়।

একটা কুলীকে জিজ্ঞেস করলাম—ডাকবাংলো কোথায়?

—পাহাড়ের ওপরে। কিন্তু সে ডাকবাংলো নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের বাংলো।

—সে আমি জানি, তুমি পথ দেখিয়ে দিতে পারো?

—সোজা পশ্চিম দিকে চলে যান।

পাহাড়ের ওপরে উঠতে গিয়ে ডানদিকে দেখি বনবিভাগের আপিস। ভাবলাম, চিড়িয়া পাহাড়ে যাবার একমাত্র উপায় হলো রেল। সে রেলে চড়তে হলে খনিওয়ালাদের অনুমতি দরকার। বনবিভাগের কর্ম্মচারীরা সে বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন ভেবে আমি আপিসের দিকেই গেলাম। তা ছাড়া বনবিভাগের অনুমতি ব্যতীত তো পাহাড়ের ওপরের বাংলোতেও থাকা যাবে না। আপিসে জিজ্ঞেস করে জানা গেল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী গুপ্ত বর্ত্তমানে এখানের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। রাসবিহারীবাবুকে আমি জানতাম খুবই, ১৯৪৩ সালে সারেণ্ডা বন পরিভ্রমণের সময়ে তিনি আমার সঙ্গী ছিলেন।

বল্লাম—রাসবিহারীবাবু আছেন?

একজন আরদালী বল্লে—না বাবুজী। তিনি বনের কোনো কাজে বেরিয়েছে

গিয়েচেন।

—কখন আসবেন?

—ঠিক নেই। দেরি হবে।

আমি তাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়া লাইট রেলের সাইডিংএ যাবো ভাবচি এমন সময়ে রাসবিহারীবাবুর বাসা থেকে একজন চাকর এসে বল্লে—আপনাকে মাইজি নিয়ে যেতে বলেচেন বাসাতে—

—কোন মাইজি?

—রাসবিহারীবাবুর স্ত্রী।

বাসাতে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও আমাকে জানতেন। চা ও জলখাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমি এখনি চিড়িয়া রেলে যেতে উদ্যত হয়েছি শুনে বল্লেন—এখন কেন যাবেন? সে ট্রেন ছাড়বার সময় হয়েছে। এখান থেকে সাইডিং এক মাইল দূরে। গিয়ে গাড়ী পাবেন না। তার চেয়ে ধীরেসুস্থে স্নান করে বিশ্রাম করুন।

কথা শুনলাম না। আমার বন-ভ্রমণের তৃষ্ণা তখন অত্যন্ত বলবতী। মাইল খানেক ছুটতে ছুটতে গিয়ে আমরাও যেই সাইডিংএ পেঁৗচেছি ট্রেনও ছেড়ে দিল। বাধ্য হয়ে ফিরলাম। এসে দেখি রাসবিহারীবাবু কাজ থেকে ফিরেছেন। আমাকে দেখে খুব খুশি। দুজনে গল্প করতে করতে স্নান করে এলাম নদীতে। ওঁদের অতিথিপরায়ণতার কথা অনেক দিন মনে থাকবে।

বিকেলে তিনজনে বেরুলাম বেড়াতে।

রেলপথের ওপারে সুধীরবাবুর বাসা। এসে ওঁর সঙ্গে খুব আলাপ হয়েছিল। রাসবিহারীবাবুকে নিয়ে সুধীরবাবুর বাসায় গেলাম। তিনিও আমায় দেখে খুব খুশি। বিদেশে বাঙালীদের মধ্যে খুব হৃদ্যতা। আমাদের সন্ধ্যাবেলা চা খেতে বল্লেন, রাত্রেও তাঁর ওখানে না খেলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন জানিয়ে দিলেন।

সুধীরবাবুর বাসা থেকে আমরা গেলাম নৃসিংহ বাবাজীর আশ্রম দেখতে। এই স্থানটি অতি মনোরম। কোয়েল নদীর পাষাণময় তটের ওপরে একটি শ্যাম কুঞ্জবিতান। কত কি ফুল-ফলের গাছ এখানে যত্ন করে তৈরি করা হয়েছে, বিশেষ করে ফুলের গাছ। বকুল, নাগকেশর, চাঁপা থেকে আরম্ভ করে ক্ষুদ্র সন্ধ্যামণি পর্য্যন্ত সব রকমের পুষ্প এখানে দেখা যাবে। ফুলের বাগান বলে মনে হয় না, মনে হয় ছায়ানিবিড় এক বনানী, মধ্যে মধ্যে ঘন বনের বুক চিরে পাথরের নুড়ি বিছানো সরু পায়ে চলার পথ পরস্পরকে কাটাকাটি করে সুবিন্যস্ত ভাবে সোজা এদিকে ওদিকে চলে গিয়েছে। আশ্রমের ফটক ছাড়িয়ে প্রথমেই একটা পাথর-বাঁধানো চত্বরের চারিপাশে কতকগুলো ছোট বড় পাকাবাড়ী। সাধুসন্ন্যাসীদের থাকবার জন্য বড় বড় ঘর ও বারান্দা। এই ঘর-বাড়ীর পেছনে আর কোন মানুষের বাসের ঘর নেই, ঘন বননিকুঞ্জের মাঝে মাঝে লতাপাতা ঢাকা ছোট ছোট দেবমন্দির, তাঁর কোনোটায় রামসীতা, কোনোটাতে শ্রীকৃষ্ণ, কোনোটতে শিবলিঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় মন্দিরটি নৃসিংহদেবের। বনের মাঝে মাঝে পুষ্পবিতানের আড়ালে পাথরের আসন। বোধ হয় সাধুদের ধ্যানধারণার জন্যে, কিংবা যে কেউ বসে বিশ্রাম বা চিন্তা করতে পারে। সাধুর খুব ভিড় আছে বলে মনে হোল না, বরং মনে হয়েছিল সমস্ত আশ্রমটিতে লোক খুবই কম। এত নির্জ্জন যে বাগানের মধ্যে ঢুকলে ভয় করে, পথ হারিয়ে গেলে কেউ দেখিয়ে দেবার লোক নেই। সমস্ত আবহাওয়াটি অতি শান্ত ও পবিত্র। একটি সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন এক জায়গায়।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে।

নৃসিংহদেবের ঘণ্টাধ্বনি আশ্রমের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছে। মন্দিরে দীপ জ্বলছে। অনেকগুলি হারিকেন লণ্ঠন এখানে ওখানে গাছের গায়ে ঝুলছে। আমার প্রথমেই মনে হলো এত কেরোসিন তেল আসে কোথা থেকে?

সাধুজী বোধ হয় আশ্রমের মোহান্ত।

আমরা সামনে গিয়ে বল্লাম—প্রণাম মহারাজ।

সাধুজী আমাদের আশীর্ব্বাদ করে বসতে বল্লেন। কিছু ধর্মকথা শোনালেন। তুলসীদাসের 'রামচরিতমানস' থেকে কিছু বাণী উদ্ধৃত করে ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের বিদায় নিয়ে চলে আসবার সময় সকলের হাতে হাতে প্রসাদ দিলেন, কলা আর কচুরি —আর একটা জিনিস এদেশে দেবমন্দিরে ভেট হিসেবে খুবই ব্যবহৃত হয়। এর নাম 'পানজেরি'—জিনিসটা হলো ধনেভাজার গুঁড়ো আর চিনি একসঙ্গে মেশানো।

সুধীরবাবুর বাড়ীতে খেয়ে ফিরবার পথে রাসবিহারীবাবু সাইডিংএ ফোন করলেন স্টেশন থেকে। পরদিন সকালে ট্রেন ছাড়বে, তাতে একটা সেলুন জুড়ে দিতে বলে দিলেন। সকালে গাড়ীতে চড়বার সময় 'সেলুন' এর অবস্থা দেখে আমার চক্ষু-স্থির। একখানা মালগাড়ী, যাকে বলে covered wagon, তবে দুখানা কাঠের বেঞ্চি পাতা আছে তার মধ্যে এই যা।

পাঁচ মাইল গিয়েই ছোট গাড়ী নিবিড় অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলো। আমি বড় ভালবাসি সারেণ্ডার এই অপরূপ নির্জ্জনতা। এত বড় বড় শাল ও আসান গাছও সিংভূমের অন্য অঞ্চলে দেখা যায় না। মোটা মোটা কাছির মত লতা এগাছ থেকে ওগাছে জড়াজড়ি করে রয়েছে। বড় বড় কুরচি ফুলের গাছ। এত বড় কুরচি গাছ আমি তো কোথাও দেখিনি। বন্য শণের বড় বড় হলদে ফুল রেললাইনের দুধারে যেদিকে চোখ যায়, সেদিকে ফুটে আছে। বাঁ দিকে একটা পাহাড়ের সারি, হঠাৎ পাহাড়-শ্রেণীর ফাঁক দিয়ে কখন পার্ব্বত্য নদী কোয়েল এসে মিশলো রেললাইনের পাশে। দুই তট শিলাস্তৃত, মাঝে মাঝে সাদা লিলির সঙ্গে মিশেছে হলুদ রং-এর বন্য শনের (wild flax) ফুল, পাহাড়ের বেগুনি রংয়ের দেবকাঞ্চন।

আমাদের গাড়ী এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গেল। স্থানটি বড় বড় বনপাদপে ছায়া-নিবিড়।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, আসুন বনের মধ্যে।

—কোথায়?

—আপনাকে আমাদের শিমুল গাছের নার্সারি দেখিয়ে আনি।

—গাড়ী কতক্ষণ থাকবে?

—সে ভয় নেই। যতক্ষণ আমরা ফিরে না আসি।

অনেকদূর চললাম বনের মধ্যে। এক জায়গায় অনেকগুলো শিমুলের চারা সার দিয়ে পোঁতা। বনবিভাগ থেকে এখানে শিমুল গাছের আবাদ করা হয়েছে তাই একে বলা হয় শিমুল চারার নার্সারি। এখান থেকে চারা তুলে অন্য জায়গায় রোপন করা হবে। রাসবিহারীবাবু আমাদের সব বুঝিয়ে দিলেন। শিমুলগাছ নাকি বেশ দামে বিক্রী হয় দেশলাই-এর কারখানার মালিকদের কাছে।

রাসবিহারীবাবু বল্লেন, সাবধানে থাকবেন, বড় বড় বাঘ আছে সারেণ্ডা ফরেস্টে।

—দিনমানে বেরোবে?

—সব সময় বেরুতে পারে।

—লেপার্ড না 'দি রয়েল বেঙ্গল'?

—রয়েল বেঙ্গলই বটে।

—আপনি কখনো বাঘের হাতে পড়েছেন?

—দশবার পড়েও বেঁচে গিয়েছি। চলুন সে গল্প আংকুয়া বাংলোয় বসে চা খেতে খেতে করা যাবে।

গাড়ী আবার ছাড়ালো। আবার চলেছে বনের মধ্যে দিয়ে।

বন যেন নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে। কোনো লোকালয় নেই। বনের মধ্যেই ছোট্ট একটা স্টেশন। তার নাম লোরো জংসন। এখান থেকে ঘনতর বনের মধ্যে একটা লাইন বেঁকে পূর্ব্বদিকে অদৃশ্য রহস্যপথে অন্তর্হিত হোল, না জানি ওদিকে আবার কত বন, কত ঝর্ণা, কত বিচিত্র লতার দুলুনি, কত সৌন্দর্য্যময়ী বনস্থলী। মন যেন নেচে ওঠে, চোখ পিপাসিত দৃষ্টিতে সে দিকে চেয়ে থেকে।

—ও লাইনটি কোথা গেল?

—রাসবিহারীবাবু বল্লেন, দুধিয়া মাইন্‌স্। ছেইয়া।

—সে কতদূর?

—তা এখান থেকে ন' মাইল।

—ওপথে যাওয়ার উপায় কি?

—হেঁটে বা ট্রলিতে যাবেন!

—নিশ্চয়ই যাবো। আপনি ব্যবস্থা করবেন?

—যখন বলবেন, করে দেবো।

বেলা ন'টার সময় ট্রেন চিড়িয়াতে পোঁছলো। রেল লাইনের বাঁদিকে ৩০০৩ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় বুদ্ধবুরু ও অজিতাবুরু। বুদ্ধদেবের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এদের, এদেশী ভাষার নাম। পাহাড়ের ওপর থেকে লৌহপ্রস্তর কেটে নামানো হচ্চে, পাহাড়ের ওপর থেকে নীচু পর্য্যন্ত ট্রলি লাইন আছে। ছোট লাইনটা এখানেই শেষ হয়ে গেল। আশপাশের ছোটখাটো পাহাড়ের ওপর খনির ম্যানেজার, ওভারসিয়ার প্রভৃতির বাংলো। একজন বাঙালী ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ হলো, তিনি এই খনির ডাক্তার, নাম ডাঃ কানাইলাল গাঙ্গুলী। ভদ্রলোক অতি অমায়িক, প্রথম আলাপেই আত্মীয়তা প্রদর্শন করে তাঁর বাংলোতে সেদিন আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। আমাদের সময় কম ছিল বলেই তাঁর এ সদয় প্রস্তাবে আমরা রাজী হতে পারিনি।

বনপথে হেঁটে একটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ক্ষুদ্র একটি বনগ্রাম পার হয়ে আমরা আংকুয়া ফরেস্ট বাংলোতে পোঁছলাম।

কি সুন্দর এই আংকুয়া বাংলোটি, কি মনোরম এর পরিবেশ।

একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এই বাংলো, পাহাড়ের পাদমূল ধৌত করে বইচে একটি পাহাড়ী নদী, বাংলোর সামনে পাহাড়ের মাথায় সমতলভূমিতে চেয়ার পেতে আমরা বসলাম। ছোট টেবিল সামনে পেতে চা দিয়ে গেল, বাংলোর চৌকিদার। সঙ্গে আমাদের খাবার ছিল। অমন জায়গায় বসে চা খাওয়ার অভিনবত্ব আমি ভালভাবে উপভোগ করবো বলে অদূরবর্ত্তী গম্ভীর বনভূমির দিকে চেয়ে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। কত রকমের গাছ চারিদিকে—অর্জ্জুন, আসান, শাল, ধও, পিয়াসাল। বাতাসে বনভূমির স্নিগ্ধ গন্ধ।

ডাকবাংলোর চৌকিদারের বৌ, একটি স্বাস্থ্যবতী হো রমণী, আমাদের জলটল এনে দিচ্ছিল। জিজ্ঞেস করে জানা গেল মেয়েটি মিশনারী স্কুলে দিনকতক পড়েছিল, সুতরাং শাড়ী-ব্লাউজ পরে। সামান্য একটু ইংরিজীও জানে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ হো ও মুণ্ডা জাতীয় লোক খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করেছে, অনেকেই রাঁচি মিশনারী

কুলের ফেরৎ।

আংকুয়া বাংলো থেকে যেন উঠতে ইচ্ছে করছিল না। এমন চমৎকার কানন-ভূমিতে এমন বাংলোতে বাস করা একটি বিশেষ সৌভাগ্য। তবে অরণ্যকে ভাল না বাসলে কেউ এখানে বাস করতে পারবে না। বাংলোর চৌকিদারকে বল্লাম—রাত্রে এখানে বাঘ আসে?

—রোজই হুজুর।

—হাতী?

—ওভি। ভালুক ভি বহুৎ আসে।

—তোমরা থাকো কি করে?

—কাঁড় নিয়ে বসে থাকি হুজুর। আগুন করি।

এই তো অবস্থা। যত বড় প্রকৃতির রসিকই হোক না কেন, এ নির্জ্জন অরণ্য-ভূমিতে কিছুদিন বাস করতে হোলে নিছক প্রকৃতিরসিকতা ছাড়াও আর কিছু থাকা দরকার। সেটা হোল নির্ভীকতা, নির্জ্জনবাসের শক্তি, নিত্য নূতন বিলাসের লোভ-সম্বরণ। জীবন হবে এখানে সব রকম উপকরণের বাহুল্য বর্জ্জিত, austere, অন্তর্মুখী। তবে এখানে আনন্দ, নতুবা একদিনের মধ্যেই পালাই পালাই ডাক ছাড়তে হবে।

ফিরবার পথে চিড়িয়া থেকে ট্রেন পেলাম না। খনির লোকেরা আমাদের জন্যে ট্রলি করে দিলেন, চোদ্দ-পনেরো মাইল পথ বিকেলের ঘন ছায়ায় দুধারের বনভূমির মধ্যে দিয়ে ট্রলি করে আসার সে কি আনন্দ! এই আসার পথে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল যা ভুলবার নয়। সারাপথ বাতাসে যেন গাজিপুরের দামী আতরের গন্ধ ভুরভুর করচে। বাড়িয়ে এতটুকু বলচি না। ট্রলির একজন কুলীকে জিজ্ঞেস করলাম, সে কি কানে আতরমাখা তুলো গুঁজেছে? সে তো অবাক। রাসবিহারীবাবুকে বল্লাম, তিনি কোন্ তেল মেখেচেন? রাসবিহারীবাবু বল্লেন, গন্ধটা তেল বা আতরের নয়, নানা বনকুসুমের সম্মিলিত সুবাস।

—কি ফুলের?

ট্রলি থামিয়ে থামিয়ে আমরা রেল লাইনের কাছাকাছি যত রকমের ফুল ফুটেছিল, সব তুলিয়ে আনিয়ে দেখলাম। ও-সব কোন ফুলেরই সুবাস নয়। দেবকাঞ্চন গন্ধহীন, বন্য শনের ফুল গন্ধহীন, অর্কিডের দু-একটা ফুল, যা চোখে পড়লো গন্ধহীন। তবে কোন ফুলের গন্ধ? শালের ফুল এখন ফোটে না। কুরচি ফুলও তাই।

অথচ গোটা চোদ্দটা মাইল পথ সে সুবাসে আমোদ করতে লাগলো। ঘন, মিষ্ট, তীব্র সুবাস।

রাসবিহারীবাবু এর কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না।

বন ছেড়ে আমাদের ট্রলি যখন মুক্ত প্রান্তরে বের হোল, তখন দূরদিগন্তে বোনাইগড় রাজ্যের শৈলশ্রেণীর পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

—দিনলিপি সমাপ্ত—